Md. Shahjahan
Founder & Chairman
SJF Bangladesh

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল

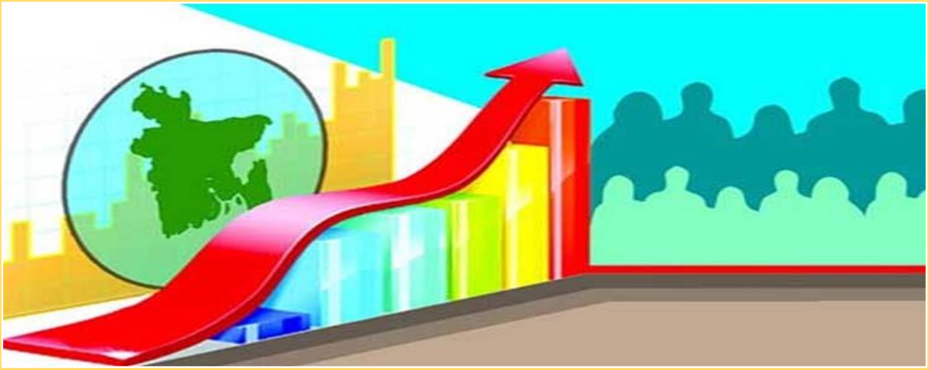

Courtesy : SJF Bangladesh

প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য :

- প্রকাশনায় : SJF Bangladesh
  Banani, Dhaka.
- প্রথম সংস্করণ : আগস্ট, ২০২২
- প্রচ্ছদ অংকনে : নিগার শাহ্‌জাহান ও তাবাস্‌সুম সাদিয়া।
- কম্পোজ ও ডিজাইন : সোহেল আরমান।
- মূল্য : ২,৫০০/= টাকা।
- বইটি পাওয়া যাবে : **SJF Bangladesh**
  বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ।
  Contact : 88 01819 011372
  88 01866551265
  Email : info@sjfbd.org
  shahjahan2357@gmail.com
- To Download PDF Copy : www.sjfbd.org

- কপিরাইট : লেখক কতৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :-

বইটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সনে একই সাথে প্রকাশিত হয়েছে, যা **www.sjfbd.org** এর হোম পেজ থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।

সূচীপত্র :-

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.০	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭ - ১০
	প্রথম অংশ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি।	
১.১	অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ।	১২ - ১৪
১.২	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রযাত্রার উত্থান।	১৫ - ২৮
১.৩	উন্নত দেশ হিসাবে আগামীর বাংলাদেশ।	২৯ - ৩৬
	দ্বিতীয় অংশ : গ্রামীণ অর্থনীতি :	
২.১	গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান চিত্র।	৩৮ - ৫১
	তৃতীয় অংশ : গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন :	
৩.১	গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন।	৫৩ - ৫৯
৩.২	কৃষিখাতের আধুনিকায়ন।	৬০ - ৮৯
৩.৩	গ্রামপর্যায়ে কুঠির শিল্পের প্রসার।	৯০ - ১০২
৩.৪	উপজেলা পর্যায়ে SME খাতের বিকেন্দ্রিকরন।	১০৩ - ১১৩
৩.৫	গ্রামীণ আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন।	১১৪ - ১২২
৩.৬	গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।	১২৩ - ১৪৩
৩.৭	উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।	১৪৪ - ১৫৪
৩.৮	গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনসন স্কীম চালুকরা।	১৫৫ - ১৬৬
৩.৯	মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকরা।	১৬৭ - ১৭৯
৩.১০	” পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়” স্থাপন।	১৮০ - ১৮৬
	চতুর্থ অংশ : নগর অর্থনীতির উন্নয়ন :	
৪.১	নগরায়ন ও নগর সম্প্রসারন।	১৮৮ - ১৯৭
৪.২	নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন।	১৯৮ - ২১১
৪.৩	নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।	২১২ - ২১৭
	পঞ্চম অংশ : জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন :	
৫.১	কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।	২১৯ - ২৩০
৫.২	কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা।	২৩১ - ২৪৬
৫.৩	বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা।	২৪৭ - ২৬০
৫.৪	স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও আধুনিকায়ন।	২৬১ - ২৮৯
৫.৫	টেকসই শিল্পায়ন ।	২৯০ - ৩২৩
৫.৬	তৈরী পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।	৩২৪ - ৩৩৯
৫.৭	আই.সি.টি খাতের উন্নয়ন ও প্রসার।	৩৪০ - ৩৬২
৫.৮	সেবাখাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।	৩৬৩ - ৩৭৫
৫.৯	রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন।	৩৭৬ - ৪১৩
৫.১০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন।	৪১৪ - ৪৩৯
৫.১১	টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন।	৪৪০ - ৪৫৮
৫.১২	বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।	৪৫৯ - ৪৭৫

SJHBD

৫.১৩	প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহার।	৪৭৬ - ৪৯৯
৫.১৪	বন ও পরিবেশ উন্নয়ন।	৫০০ - ৫১০
৫.১৫	পানি ও নদী সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা।	৫১১ - ৫১৯
৫.১৬	পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার।	৫২০ - ৫৩০
৫.১৭	সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসার।	৫৩১ - ৫৪১
৫.১৮	রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।	৫৪২ - ৫৬১
৫.১৯	কর ব্যবস্থা সহজীকরন।	৫৬২ - ৫৭৫
৫.২০	সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রিজার্ভ বৃদ্ধি করা।	৫৭৬ - ৫৯০
৫.২১	সরকারি দায় দেনা সীমিত রাখা।	৫৯১ - ৫৯৭
৫.২২	দুর্ণীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।	৫৯৮ - ৬০৮
৫.২৩	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন।	৬০৯ - ৬২১
৫.২৪	রেফারেন্স	৬২২ - ৬৩১

SJFBD

নির্বাহী সারসংক্ষেপ :

নির্বাহী সারসংক্ষেপ :

" **বাংলাদেশ** " বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ছোট্ট একটি দেশ, ভারত ও মিয়ানমারের সাথে যার সীমান্ত বিস্তৃত। আয়তনে ছোট হলেও ভৌগলিক অবস্থানের কারনে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে এদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে চীন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ এবং চীন ও আমেরিকার মধ্যে চলমান বানিজ্য বিরোধের কারনে এ সমস্ত দেশের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে আরোও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামীতেও বহাল থাকবে। তাছাড়া, এদেশের স্বর্গীয় জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, উর্বর মাটি, জ্বলে ও স্থলে অজস্র অনাবিস্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তা শ্রম এবং এদেশের মানুষের মেধা ও কর্মতৎপরতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত। জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারনে দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনো দেশের জন্য বাংলাদেশ একটি বড় ও আকর্ষণীয় বাজার, যেখানে বিনিয়োগ ও বিপননের ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান।

১৯৪৭ সাল অবধি বাংলাদেশ ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অংশ ছিল, পরবর্তীতে যা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এদেশ নির্বাচিত ও অনির্বাচিত /সামরিক সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। আকার ও আয়তনের তুলনায় এদেশের জনসংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেশি হওয়ায় এবং শিল্প, বানিজ্য ও প্রযুক্তিগত দিকথেকে পিছিয়ে থাকার কারনে এদেশের অর্থনীতির কাঙ্কিত বিস্তার ঘটেনি। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং অর্থনৈতিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারনে অতীতের সরকারগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারি পদক্ষেপ নিতে ব্যার্থ হয়েছে। ফলে স্বাধীনতার পর কয়েকযুগ পেরিয়ে গেলেও দেশের অর্থনীতিতে মানসন্মত পরিবর্তন সম্ভব হয়নি এবং কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, প্রযুক্তি এবং শিল্প ও বানিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় এদেশ অদ্যাবধি অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে।

SJFBD

তবে, ২০০৯ সালে বর্তমান আওয়ামিলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ পরবর্তী সময়গুলোতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশকিছু কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়ে কৃষি খাতের আধুনিকায়নে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, আই.টি ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে বেশকিছু মেগাপ্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যেগুলোর বেশিরভাগই বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সময়কালে তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিঠ্যান্সের পরিমাণ উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে শতাধিক রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত করন অঞ্চল তৈরী করা হয়েছে। ফলে বিগত এক যুগে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গড়ে ৭.৫০% এর উপরে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে ধারাবাহিকভাবে (জুন, ২০০৯ সময়ে রিজার্ভ ছিল ইউ.এস.ডলার ১০.৩৪ বিলিয়ন, যা আগষ্ট, ২০২১ নাগাদ দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৪৮.০৬ বিলিয়ন)। এ সমস্ত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের দেশথেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার শর্তাবলী পূরনের স্বপক্ষে জাতিসংঘ স্বীকৃতি অর্জন করেছে, বাংলাদেশের জন্য যা নিঃসন্দেহে সন্মান ও গৌরবের বিষয়। চলমান মেগাপ্রকল্প সমূহ সমাপ্ত হওয়ার পর দেশে ব্যবসা বানিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, ফলে আগামীতে কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়নে উল্ল্যেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পাশাপাশি জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে আশাকরা যায়।

বর্তমান সরকারের আরোও একটি সাহসী উদ্যোগ হচ্ছে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ কে উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহন, যা নিঃসন্দেহে অনেক বৃহৎ ও প্রশংশনীয় চ্যালেঞ্জ।

তবে, স্বল্প আয়ের দেশ হিসাবে বর্তমানে উন্নত দেশসমূহের কাছথেকে বাংলাদেশ ব্যবসা, বিনিয়োগ ও ঋণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করে আসছে, ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার পর ঐ সমস্ত সুবিধার বেশির ভাগই তখন আর থাকবেনা। ফলে তখন রপ্তানি বানিজ্য ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অনেকটা প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হতে হবে, যা সেই সময়ে দেশে শিল্পায়ন, নতুন কর্মসংস্থান এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিরক্ষেত্রে অনেকটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিতে পারে। উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম শর্তই হচ্ছে কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিপ্লব আনার মাধ্যমে দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলা, যা দেশে কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিপূর্বক জীবনমান উন্নয়নে বড় আকারের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরনের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ-আয়ের দেশের তালিকায় পোঁছানো কঠিন হতে পাবে, তবে অবশ্যই সম্ভব। কঠিন এজন্যই বলা হচ্ছে, যেহেতু ২০২০ সাল নাগাদ দেশে দারিদ্রতার হার ৪০ শতাংশের উপরে, দেশের ৭৩% জনগোষ্ঠি এখনো গ্রামে বসবাস করে, যাদের সিংহভাগের জীবন জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল। বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙ্গন এদেশের বেশিরভাগ গ্রামীণ জীবনের প্রায় নিত্যসঙ্গী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাস্স্থান ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার পূরনের দিকথেকে এদশের মানুষ এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া, শিল্প ও প্রযুক্তির দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে বলা চলে। কাজেই, এদেশের সরকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাঝে এই বিশ্বাস জাগ্রত হওয়া খুবই জরুরি যে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান সকল সমস্যা বাস্তবসন্মত উপায়ে মোকাবেলা করার মাধ্যমে আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হবোই হবো। কেননা, সরকার ও জনগণের লক্ষ্য এক না হলে শুধুমাত্র সরকারের একার পক্ষ্যে বৃহৎ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অসম্ভব।

২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছানোর বৃহৎ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলাই হবে আমাদের প্রথম কাজ, যারজন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও দূরদর্শী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং কৌশল। যে কৌশলে আগালে এদেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ সমূহ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জনপূর্বক দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সকল মৌলিক অধিকার পূরনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করবে, একটি উন্নত দেশের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহকে আরোও বেগবান ও কার্যকরি করে তুলতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সময়োপযোগি ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে আমার দীর্ঘ প্রায় ৪ (চার) বছরের গবেষণালব্ধ বই **" বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল "** রচনা করা হয়েছে, যা প্রস্তবনার আকারে সরকার ও জাতির কাছে উপস্থাপন করা হলো।

যে সমস্ত সেক্টরের উপর বিস্তারিত তথ্য এ বইতে উপস্থাপিত হয়েছে :

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে ঐ সমস্তক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, চলমান অর্থনীতির বিভিন্নক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমূহ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন দেশি বিদেশি গবেষণা, আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ এবং বাস্তবতার আলোকে বিস্তারিত প্রস্তাবনা তুলেধরা হয়েছে। তাছাড়া, ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরনে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে যে সমস্তক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার, যেমন, গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন, নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরা, রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে আয়কর ব্যবস্থার সহজিকরন, কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে অপারগ নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষার প্রচলন, শিল্পায়ন বৃদ্ধিকল্পে অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রসার ও উন্নয়নে বিস্তারিত

প্রস্তাবনা এ বইয়ে তুলেধরা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত সেক্টরের উপর এ বইতে বিস্তারিত তথ্য উপাত্য ও দিক নির্দেশনা উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :-

ক) গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে :

১. গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন।
২. কৃষির আধুনিকায়ন।
৩. গ্রাম পর্যায়ে কুঠিরশিল্পের প্রসার।
৪. উপজেলা পর্যায়ে এস.এম.ই খাতের বিকেন্দ্রিকরন।
৫. গ্রামীণ আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন।
৬. উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিকরা।
৭. উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।
৮. দারিদ্রের কৌটা শূন্যে নামিয়ে আনতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম চালুকরা।
৯. মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকরা।
১০. গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালনায় "পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন"।

খ) নগর অর্থনীতির উন্নয়নে :

১. নগরায়ন ও নগর সম্প্রসারন।
২. নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন।
৩. নগর উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

গ) সামগ্রীক অর্থনীতির উন্নয়নে :-

১. কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
২. কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।
৩. বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা।
৪. স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও আধুনিকায়ন।
৫. টেকসই শিল্পায়ন।
৬. পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।
৭. আই.সি.টি খাতের প্রসার ও উন্নয়ন।
৮. সেবাখাতের প্রসার ও উন্নয়ন।
৯. রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন।
১০. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের উন্নয়ন।
১১. টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন।
১২. বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
১৩. প্রাকৃতিক সম্পদ আহরন ও সদ্ব্যবহা
১৪. বন ও পরিবেশ উন্নয়ন।
১৫. পানি ও নদী সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থ
১৬. পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার।
১৭. সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসার
১৮. রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।
১৯. কর ব্যবস্থা সহজীকরন।
২০. সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রিজার্ভ বৃদ্ধি।
২১. সরকারি দায়দেনা সীমিত রাখা।
২২. দুর্ণীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
২৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন।

উপরোক্ত সকলক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমূহ, আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে এ সমস্তক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এবং সকলক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নয়নে বিস্তারিত প্রস্তাবনা এ বইয়ে তুলেধরা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে বিরাজমান সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করনে এবং ঐ সমস্ত সমস্যার যথাযথ উত্তোরনে এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথাযথ দিকনির্দেশনা ঐ সমস্ত প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে, যা আগামীতে এদেশে একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

SJFBD

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বইটি রচিত হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি সেক্টরে বিরাজমান সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলেধরার পাশাপাশি ঐ সমস্ত সমস্যার যথাযথ সমাধানে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এ বইতে রয়েছে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকার সমূহের জন্য এদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও পরিচালনায় দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করবে আশাকরি। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমার এ প্রচেষ্টার ছিটে ফোঁটাও যদি কাজে আসে এবং সরকার ও জাতি এ প্রচেষ্টার দ্বারা যদি নুন্যতম উপকৃত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হবে। প্রসঙ্গক্রমে বইটির কোনো অংশে কোনো রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উঠে আসলে অথবা অন্য কোনো ভূল ভ্রান্তি ঘটে থাকলে, তারজন্য আমি সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থী। পরিশেষে, এদেশের প্রতিটি মানুষ স্ব-স্ব অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নে কাজ করে এবং দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে এদেশের মানুষের আজন্ম লালিত স্বপ্ন এদেশকে " **সোনার বাংলায়** " পরিনত করতে অবদান রাখবেন, এ প্রত্যাশায় শেষ করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বইটি একই সাথে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়েছে, যার pdf কপি www.sjfbd.org এর হোম পেজ থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।

ধন্যবাদান্তে :-

মোহাঃ শাহ্জাহান
Founder & Chairman
SJF Bangladesh
Mob : 88 01819 011372
E-mail : info@sjfbd.org
Web : www.sjfbd.org

SJFBD

প্রথম অংশ :

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি।

অধ্যায় : ১.১

অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ।

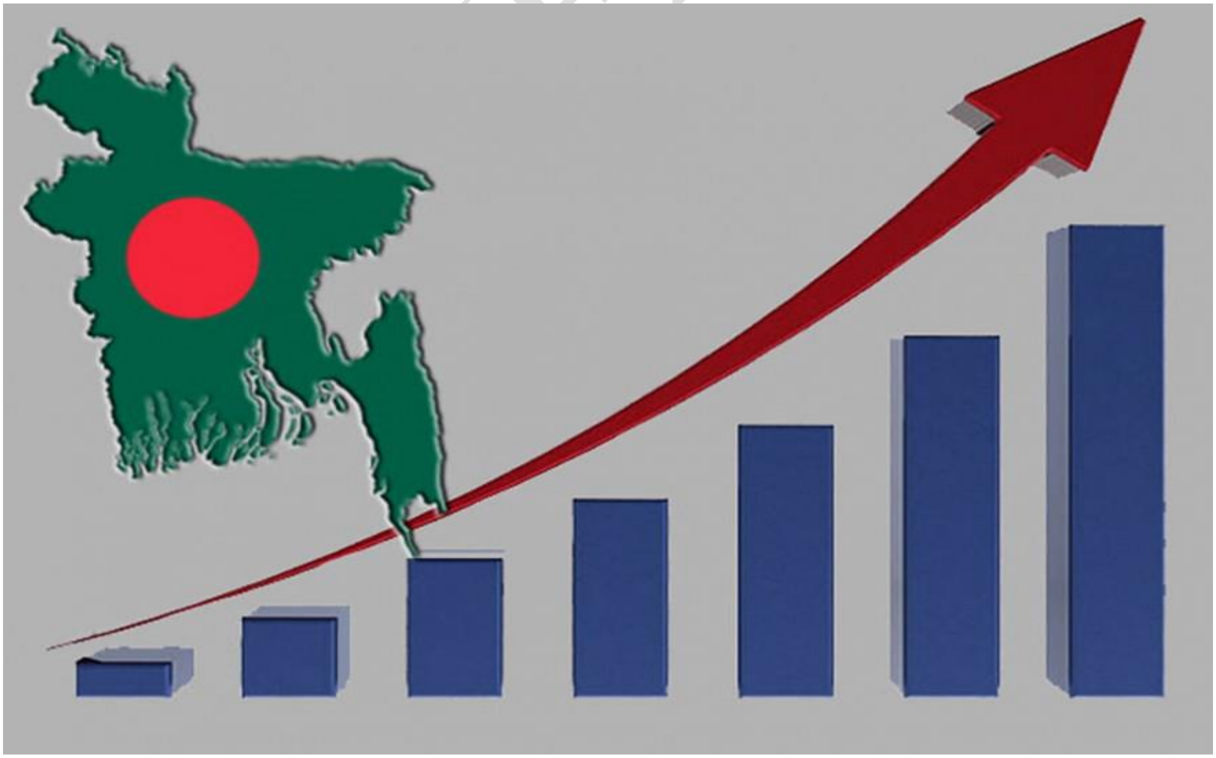

ক) অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ :

অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ :

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে, পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী, সে যে আমার জন্মভূমি।" সে আমার বাংলাদেশ। প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যে ঘেরা, ধন, ধান্যে, পুষ্পে ভরা অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। স্বর্গীয় আবহাওয়ার অধিকারি, শত শহস্র বিস্তৃত নদী নালা, উর্বর মাটি, জলে ও স্থলে অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ আর মন মাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মহিমান্বিত যে দেশ, সে আমার জন্মভূমি, প্রিয় বাংলাদেশ। মাটির অভাবনীয় উর্বরা শক্তির ফলে এদেশে চাষাবাদ যেমন সহজ, তেমনি প্রকৃতির অসাধারণ গুণে এদেশে উৎপাদিত প্রতিটি জিনিষ স্বাদে ও গুণগতমানে অনন্য। আয়তনে ছোট হলেও ভৌগলিক অবস্থান ও পরিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে এদেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

এদেশের মানুষ জন্মগতভাবে বুদ্ধিদীপ্ত ও কর্মঠ এবং যে কোনো প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলায় অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারি। এদেশের যুব সমাজ তেজোদ্দীপ্ত, সাহসী এবং অকুতুভয়, যারা অধিকার প্রতিষ্ঠায়, সংগ্রামে, আন্দোলনে নিজেদের পৌরুষের প্রমাণ দিয়েছে বার বার। আতিথিয়েতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এদশের মানুষ।

যে সমস্ত সম্ভাবনার কারণে এদেশ অপার সম্ভাবনাময়, যে সমস্ত কারণে সমৃদ্ধশালী দেশের কাতারে পোঁছাতে এদেশের মানুষের লালিত স্বপ্ন একদিন সফল হবেই এবং যে সমস্ত অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা এদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ত্বরান্বিত করবে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :-

১. এদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও অনুকুল প্রাকৃতিক পরিবেশ।
২. পরিপার্শ্বিক অবস্থা।
৩. অঢেল কর্মক্ষম জনসংখ্যা।
৪. সাহসী, অদম্য, প্রণোচ্ছ্বল ও কর্মঠ যুব শ্রেণী।
৫. সম্ভাবনাময় গ্রামীণ অর্থনীতি।
৬. সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নের সুযোগ।
৭. সরাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়, যেগুলোকে কৃষির আওতায় এনে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান ।

৮. বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠা চরসমূহকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসা।
৯. যে কোনো বিরুপ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে এদেশের মানুষের অদম্য শক্তি ও সাহস ।
১০.জলে ও স্থলে অজস্র অনাবিস্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ।
১১.শিলপায়নের অনুকুল পরিবেশ।
১২. মাটির অসাধারণ উর্বরা শক্তি এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান।
১৩. আন্তর্জাতিক বাজারে এদেশে উৎপাদিত পণ্যের গ্রহনযোগ্যতা ।
১৪. শস্তা শ্রম বাজার।
১৫. এদেশের মানুষের প্রযুক্তি ও পরিস্থিতি দ্রুত রপ্ত করার ক্ষমতা।
১৬. আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দ্রুত নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।
১৭. বন্ধুসূলভ পররাষ্ট্র নীতি।
১৮. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে দক্ষিণ এশিয়ায় এদেশের গুরুত্ব।

এদেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা যদি এদেশে বিরাজমান অন্তর্নিহিত এসব সম্ভবনা যথাযথভাবে অনুধাবন করেন, মনে প্রানে বিশ্বাস করেন এবং এই সম্ভবনাসমূহ কাজে লাগানোর যথাযথ উদ্যোগ নেন, তাহলে সেদিন আর বেশি দুরে নয়, যে দিন এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়, জীবন যাত্রার মান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সবকিছু ঈর্শনীয় উচ্ছ্বতায় পৌছবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সফলতার দিকথেকে এ দেশ হয়ে উঠবে অনন্য, যে দেশে জন্ম নিয়ে মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করবে এবং পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ পাবে দেশের প্রতিটি মানুষ। যেখানে থাকবেনা দারিদ্রতার কষাঘাত, সামজিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক হানাহানি। সমাজে থাকবেনা কোনো অনাচার অত্যাচার, আইনের শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এদেশ হবে সুখ ও সমৃদ্ধির অনন্য ঠিকানা। এদেশে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানুষ জীবনের ক্রান্তিলগ্নে পিছনফিরে তাকিয়ে আত্শতৃপ্তির হাঁসি দিয়ে বলতে পারবে " মানুষ জীবনে যা কিছু করতে পারে তার সবই আমি করেছি, সব পেয়েছি, সব ভোগ করেছি"। আমরা আছি সবচেয়ে সুন্দর সেই দিনগুলোর অপেক্ষায়, যেদিন এ দেশ বিশ্ব অর্থনীতির নেতৃত্ব দেবে, আর হয়ে উঠবে সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার **"সব পেয়েছির দেশ"** সোনার বাংলাদেশ।

দরকার শুধু দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুদুর প্রসারি ও বাস্তবসন্মত পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ দেশ নিয়ে যাদের নেতিবাচক ধারণা আছে, এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি যাদের আস্থা নেই, এদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা দ্বিধাদ্বন্ধে ভূগছেন এবং যারা এদেশে জন্ম নিয়ে নিজেকে " **বাঙ্গালি** " পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই " দেশের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করুন এবং এদেশের সম্ভাবনাগুলো মাথায় রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করুন আর তা বাস্তবায়নে কাজে নেমে পড়ুন " দেখবেন জীবনের স্বার্থকতা কত দ্রুত আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে"।

****

SJIFBD

অধ্যায় : ১.২

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রযাত্রার উত্থান।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রযাত্রার উত্থান

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রযাত্রার উত্থান।

খ) বিগত দুই দশকে যে সমস্তক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ।

১) দারিদ্রতা হ্রাস।
২) কৃষিখাতে সাফল্য।
৩) শ্রম রপ্তানিতে সাফল্য।
৪) শিক্ষাখাতে অগ্রগতি।
৫) আই.সি.টি সেক্টরে সাফল্য।
৬) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য।
৭) সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন।
৮) সামাজিক ও অন্যান্য গুরুত্বক্ষেত্রে অগ্রগতি।

ক) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রযাত্রার উত্থান :

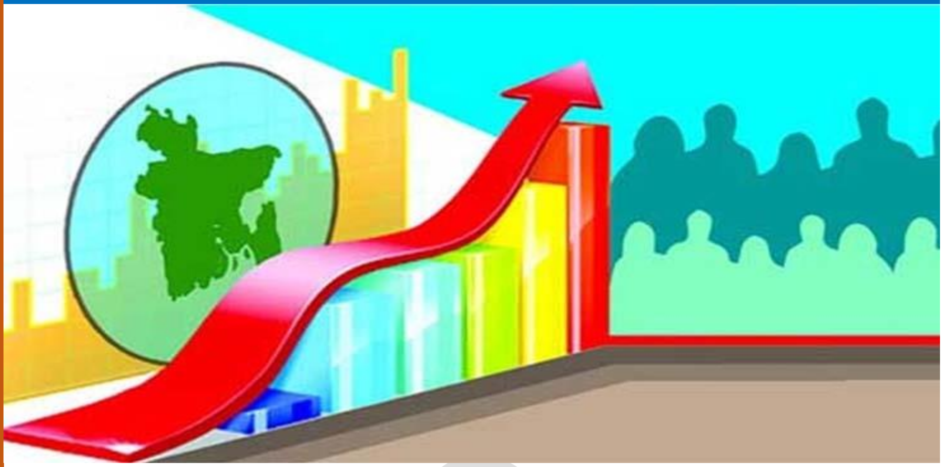

SJFBD

প্রায় ২৪৭ বছর (১৭০০ - ১৯৪৭) বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খলে এবং ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালে স্বাধীকার আন্দোলনে গর্জে উঠেছিল এদেশের নীপিড়িত জনতা। স্বাধীনতা অর্জনের পর বহু ছড়াই উৎরাই পেরিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৫ দশক পর অর্থনৈতিকভাবে ঘুড়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে এ দেশ। নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা, সাহস এবং সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের দ্বারপ্রান্তে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছানোর স্বপ্নে বিভোর। সামাজিক ও অর্থনীতির বহু সূচকে বাংলাদেশ এরিমধ্যে আশ পাশের দেশসমূহকে পিছনে ফেলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। হেনরি কিসিঞ্জারের আখ্যায়িত তলাবিহীন ঝুড়ি আজ দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে সারা বিশ্বে সমাদৃত।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রযাত্রার উত্থান :

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের অর্থনীতি বিবিধ কারণে, যেমন- সীমিত সম্পদ, অদক্ষ ও অতিমাত্রার জনসংখ্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনুন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, অনুন্নত অবকাঠামো এবং আরোও বহুবিধ কারণে অনেক প্রতিকুলতা ও অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। বিগত সরকারগুলো এ সমস্যা সমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে উঠার মত বাস্তবভিত্তিক এবং কার্যকরি পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আশানুরুপ চাঙ্গা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। এসময়কালে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি অসংখ্য দেশি / বিদেশি এন.জি.ও এবং দাতাগোষ্ঠী এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখা সত্বেও কাঙ্কিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়নি। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১০ পর্যন্ত এ চার দশক সময়কালে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অনেকটা স্থবির ছিল। ২০০৯-১০ অর্থবছর নাগাদ দেশের জাতিয় বাজেটের আকার ছিল টাকা ১১৩,৮১৯ কোটি, এডিবি সাইজ টাকা ২৮,৫০০ কোটি, জি.ডি.পির আকার ইউ.এস.ডলার ৩৯১.৭০ বিলিয়ন, মাথাপিছু আয় ইউ.এস.ডলার ৭৮১, বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ ইউ.এস.ডলার ১০.৩৪ বিলিয়ন এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ ২৬.২৫%। ঐ সময়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং সামাজিক ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বেশিরভাগ সূচকে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশসমূহের তুলনায় এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে।

তবে, ২০০৯ সালে আওয়ামিলীগ সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ

করেন। এ সময়ে কৃষিখাতে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি তৈরী পোশাক খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয় এবং বিদেশে শ্রম রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে দেশে দারিদ্রতার হার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যৎ ও জ্বালানি খাতের উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় এ সময়ে।

সরকারের গৃহীত বিবিধ পদক্ষেপের কারনে ২০১০ সালের পর থেকে কৃষিক্ষেত্রে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি শিল্প, ব্যবসা বানিজ্য ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট অন্যান্যক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতির সূচনা হয় এবং দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। ২০১৫ সালের পর থেকে অবকাঠামো উন্নয়নে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, বন্দর, আই.সি.টি ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ডজন খানেক মেঘাপ্রকল্প হাতে নেওয়া হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে ২০২০ সাল নাগাদ এদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি অর্জন করতে সমর্থ হয়। গত এক দশকে দেশে জাতিয় বাজেটের আকার বেড়েছে কয়েকগুণ, রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, আমদানি ও রপ্তানি খাত, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এবং অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব অগ্রগতি লক্ষ্যনীয়। এ সময়কালে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে গড়ে ৬.৭২ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ইউ.এস. ডলার ৭৮১, তা বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ইউ.এস. ডলার ২,০৬৪ এবং উল্ল্যেখ করার মত বিষয় হলো শীঘ্রই বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের কাতারে সামিল হতে যাচ্ছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত আয়ের দেশের তালিকায় পৌছার লক্ষ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত দুই যুগের ব্যবধানে অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে অগ্রগতির চিত্র স্মারণী-১.২(১) এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো।

স্মারণী-১.২(১) : ২০০০-০১ থেকে ২০১৯-১০২০ সময়কালে বাজেট ও এডিপি সাইজ, জি.ডি.পি, মাথাপিছু আয়, মুদ্রাস্ফিতি, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এবং বিনিয়োগের চিত্র :-

Financial Year	National Budget		GDP			Inflation Rate (%)	Reserve (US$ Billion)	Total Investment as % of GDP
	Budget (TK. In Crore)	ADP (TK. In Crore)	GDP In billion US$ PPP	GDP growth (%)	GDP Per Capita (Current US$)			
2000 – 2001	38,524	17,500	193.2	5.4	415	1.94	1.52	24.17
2001 – 2002	42,306	19,000	205.7	4.4	413	2.79	1.31	24.34
2002 – 2003	44,854	19,200	221.9	5.3	446	4.38	1.72	24.68
2003 – 2004	51,980	20,300	241.9	6.3	475	5.83	2.62	24.99
2004 – 2005	57,248	22,000	265.5	5.4	499	6.49	3.22	25.83
2005 – 2006	64,383	23,626	292.4	6.6	510	7.17	2.83	26.14
2006 – 2007	69,740	26,000	319.7	6.4	558	7.22	3.88	26.18
2007 – 2008	87,137	25,600	344.0	6.2	635	9.93	5.28	26.20
2008 – 2009	99,962	25,400	365.0	5.7	702	6.66	5.79	26.21
2009 – 2010	113,819	28,500	391.7	5.9	781	7.71	10.34	26.25
2010 – 2011	132,170	35,130	425.8	6.46	862	10.91	11.17	27.42
2011 – 2012	163,590	41,080	460.8	6.52	883	8.69	9.17	28.26
2012 – 2013	191,738	52,366	496.5	6.01	982	6.78	12.75	28.39
2013 - 2014	222,491	60,000	537.3	6.06	1,119	7.35	18.09	28.58
2014 - 2015	250,506	75,000	581.6	6.55	1,248	6.41	22.32	28.89
2015 – 2016	295,100	93,894	629.9	7.11	1,402	5.92	27.49	29.65
2016 – 2017	340,605	110,700	710.5	7.28	1,564	5.44	32.28	30.51
2017 – 2018	400,266	148,381	785.9	7.86	1,698	5.78	33.43	31.23
2018 - 2019	464,573	173,000	869.4	8.13	1,856	5.44	32.03	31.60
2019 - 2020	523,190	202,771	961.4	5.24	2,064	5.65	35.85	31.76

Source : BBS, Ministry of Finance, World Bank and other Sources.

স্মারণী-১.২(১) এর তথ্য সমূহ চিত্রাকারে প্রদর্শন :

Size of National Budget and ADB during F.Y 2000-01 to 2019-20 :-

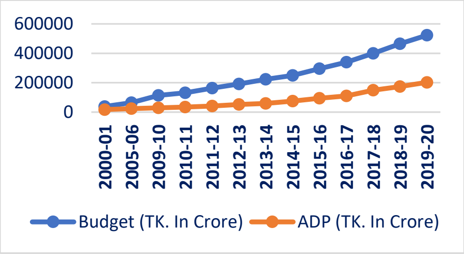

GDP Growth Rate during F.Y 2000-01 to 2019-20 :-

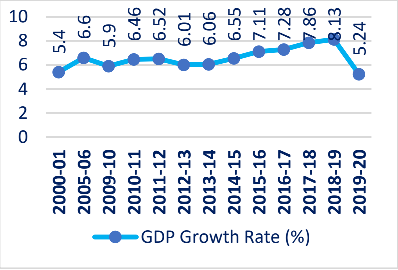

Scenario of Increase GDP Per Capita during F.Y 2000-01 to 2019-20 :-

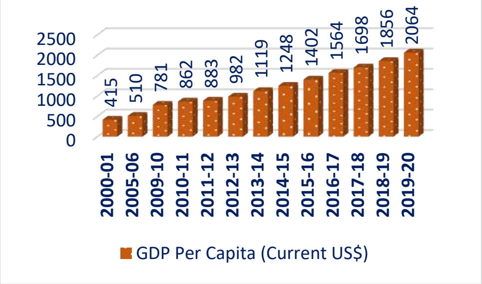

Scenario of Foreign Exchange Reserve during F.Y 2000-01 to 2019-20 :-

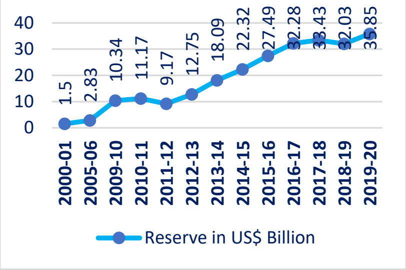

খ) বিগত দুই দশকে আরোও যে সমস্তক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে :

বিগত দুই দশকে আরোও যে সমস্তক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে :

বাংলাদেশে মূলত ২০০০ সালের পর থেকে সামাজিক ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়, ২০১০ পরবর্তী সময়কালে তা বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে এবং বিভিন্ন সূচকের অগ্রগতি বিশ্ববাসীর নজরে আসে। এ সময়কালে কৃষি সেক্টরে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্রতার হার হ্রাস, শিক্ষা, শ্রম রপ্তানি, আই.সি.টি এবং সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথ অনেকটা সুগম করেছে।

বিগত ২০১০-২০২০ সময়কালে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক সমূহের অগ্রগতির পাশাপাশি সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু বড় প্রকল্প এরিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরোও কয়েকটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বন্দর উন্নয়ন, নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, মেট্রো রেল, পদ্মা সেত, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ এবং রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত একাধিক মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সময়কালে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচক গুলোর ক্ষেত্রেও যথেষ্ঠ অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ সামাজিক ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সেক্টরের অগ্রগতির চিত্র নিম্নে তুলেধরা হলো :-

১) দারিদ্রতা হ্রাস :

দারিদ্রতা হ্রাস :

২০০০ পরবর্তী সময়ে দারিদ্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংশনীয়। ২০০০ সালে দেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মিলিয়ে দারিদ্রতার হার ছিল ৮৩.২%, ২০১৯ সাল নাগাদ তা নেমে এসেছে ৩১%। এ ২০ বছরের ব্যবধানে দেশে দারিদ্রতার হার হ্রাস পেয়েছে ৩২.২%, যা প্রকৃতপক্ষে অনেক বড় অগ্রগতি। অন্যদিকে ২০০০ সাল নাগাদ দেশে পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয় ছিল ৫,৮৪২ টাকা (গ্রামে ৪,৮১৬ টাকা এবং শহরে ৯,৮৭৮ টাকা) HIES 2016 সময়কালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৯৮৮/= (গ্রামে ১৩,৩৯৮/= এবং শহরে ২২,৬০০/=)। স্মারণী-১.২(২)

স্মারণী-১.২(২): ২০০০ থেকে ২০১৯ সময়কালে দাদ্রিতা হ্রাস ও পরিবারপ্রতি গড় আয়ে অগ্রগতির চিত্র :-

Index	2000	2005	2010	2015	2019
Poverty & Extreme Poverty					
a) Poverty Rate (%)	48.9	40.0	31.5	24.3	20.5
b) Extreme Poverty Rate (%)	34.3	25.1	17.6	12.9	10.5
Average Household Income	**5,842**	**7,209**	**11,479**	**15,988**	
a) Rural (BDT)	4,816	6,095	9,648	13,398	
b) Urban (BDT)	9,878	10,463	16,475	22,600	

Source : BBS and Ministry of Finance.

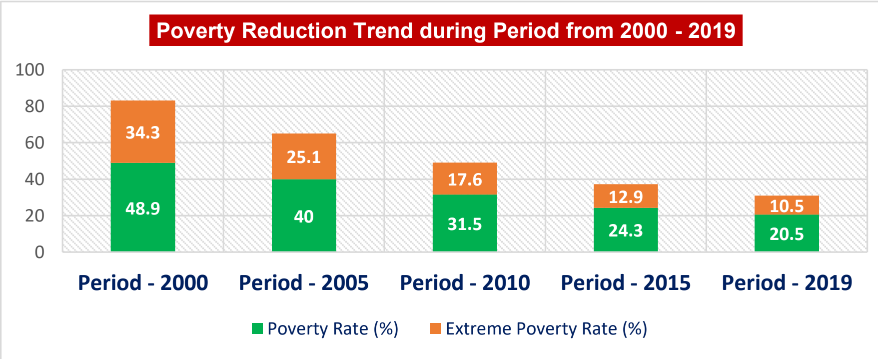

২) কৃষিখাতে সাফল্য :

কৃষিখাতে সাফল্য :

এদেশের কৃষি সেক্টর যে সম্ভাবনার জ্বলন্ত উদাহরণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, এদশের মানুষ তা এরিমধ্যে প্রমাণ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে দেশের জনসংখ্যা বর্তমান সময়ের তুলনায় অর্ধেকের চেয়েও কম থাকা সত্ত্বেও ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত দেশে খাদ্য ঘাটতি থাকতো প্রচুর, বর্তমানে ২০২০ সালে জনসংখ্যা ১৭.০০ কোটির বেশি হলেও দেশে এখন কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই, বরং উদ্বৃত্ত থাকছে। ২০০০ পরবর্তী সময়কালে দেশের কৃষিসেক্টরে বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে খাদ্যোৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি মৎস উৎপাদন, পেল্ট্রি ও গবাদি পশু উৎপাদনেও অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০১৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং জলজ উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে।

অর্থবছর ২০০০-০১ সময়ে দেশে ধান, মাছ, গবাদি পশু ও পোল্ট্রি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে, ধান ২৫০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, মাছ ১৭.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন, গবাদি পশু ৩৭৯.০০ লক্ষ এবং পোল্ট্রি ১৭৬৫.১০ লক্ষ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে, ধান ৩৬৩.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন, মাছ ৪৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন, গবাদি পশু ৫৫৫.৩৪ লক্ষ এবং পোল্ট্রি ৩৪৭০.৩৫ লক্ষ। স্মারণী-১.২(৩)

স্মারণী- ১.২(৩): ২০০০-০১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে খাদ্য, মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদি পশু উৎপাদনে অগ্রগতির চিত্র :-

Products	Financial Year						
	2000-01	2010-11	2014-15	215-16	2016-17	2017-18	2018-19
Rice (Lakh MT)	250.85	335.42	347.10	347.01	338.04	362.79	363.91
Fish (Lakh MT)	17.81	30.62	36.84	38.78	41.34	42.77	43.84
Livestock (No. in Lakh)	379.00	516.66	539.72	543.57	647.45	551.39	555.34
Poultry (Lakh)	1765.10	2788.06	3122.93	3206.33	3292.00	3379.98	3470.35

Source: BD Economic Review

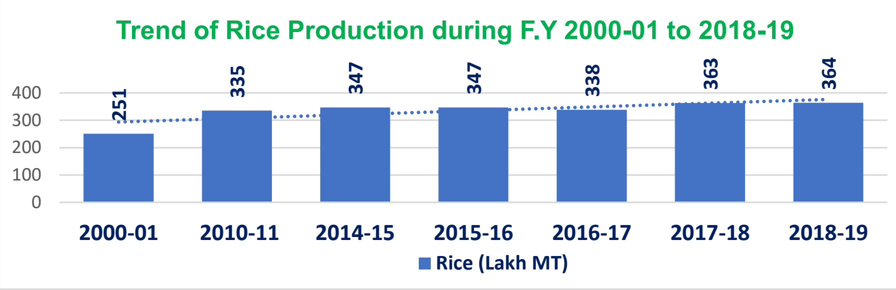

৩) শ্রম রপ্তানিতে সাফল্য :

বিদেশে শ্রম রপ্তানি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম করে, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালি করে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ২০১০ সাল পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে শ্রম রপ্তানি এবং আন্তমূখী রেমিট্যান্স প্রবাহ দুটোই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিগত এক দশকে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে বিদেশে শ্রম রপ্তানির পরিমাণ ছিল গড়ে বছরে ৬,০৮,০০০ জন এবং আন্তমূখী রেমিট্যান্স এর পরিমাণ গড়ে বার্ষিক ইউ.এস.ডলার ১৪,৫৮০.৫০ মিলিয়ন, যা এযাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

শ্রম রপ্তানিতে সাফল্য :

স্মারণী- ১.২(৪) : ১৯৯০- ২০১৯ সময়কালে শ্রম রপ্তানি ও আন্তমূখী রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির চিত্র :-

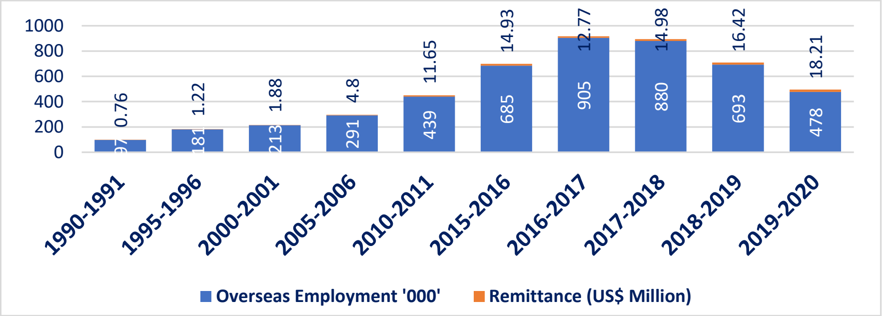

Source: BD Economic Review

৪) শিক্ষাখাতে অগ্রগতি :

শিক্ষাখাতে অগ্রগতি :

স্বাধীনতার পর থেকে ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত দেশে শিক্ষার প্রসার অনেকটা সীমিত ছিল, কিন্তু ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে শিক্ষার সকল স্তরে নিবন্ধনের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ এবং কর্মমূখী ও মানসন্মত উচ্চশিক্ষা থেকে আমরা এখনো যথেষ্ঠ দূরে রয়েছি। অর্থবছর ২০০০-০১ সময়কালে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মোট নিবন্ধনের হার ছিল যথাক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে ৯১.২%, মাধ্যমিক ৪৯.৭৬% এবং টার্সিয়ারি পর্যায়ে ৫.৬৩%, অর্থবছর ২০১৮-১৯ নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে ১১৬.৪৭%, মাধ্যমিক ৭২.৬৯% এবং টার্সিয়ারি পর্যায়ে ২০.৫৭%। স্মারণী- ১.২(৫) বিগত দুই দশকের ব্যবধানে দেশে শিক্ষার সকল স্তরে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে নিসন্দেহে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যা অপরিহার্য।

স্মারণী- ১.২(৫) : ১৯৮০-৮১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মোট নিবন্ধনের চিত্র :-

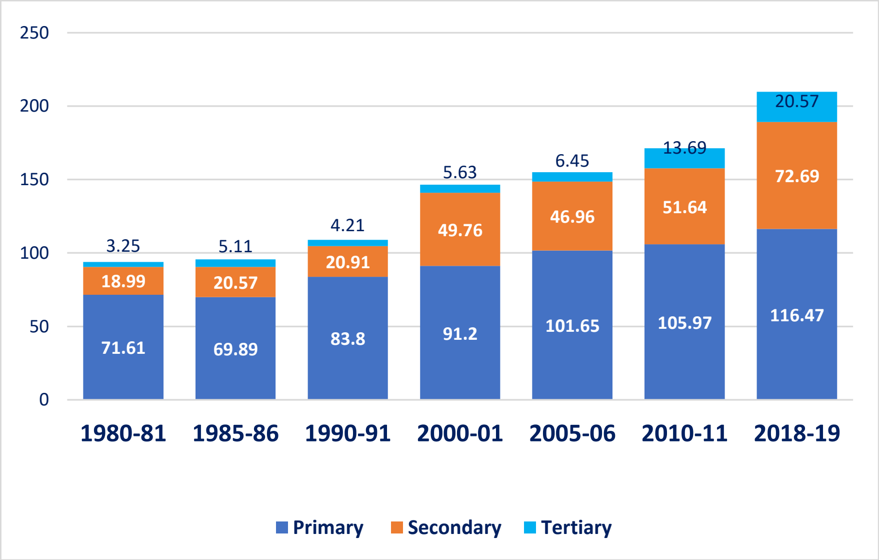

Source: Induxmundi

৫) আই.সি.টি সেক্টরে সাফল্য :

আই.সি.টি সেক্টরে সাফল্য :

১৯৮০ পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের ব্যাপক উত্থান ঘটেছে এবং এ সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ICT পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিপূর্বক রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের পর থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হলেও ২০১০ সালের আগ পর্যন্ত এ খাতের অগ্রগতি তেমন চোখে পড়েনি। ২০০৯ সালে আওয়ামিলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে গণ্য করে ডিজিটালাইজেশনের উপর জোর দেওয়া হয়। ফলে ২০১০ পরবর্তী সময়ে সরকারের ডিজিটালাইজেশন কনসেপ্ট বাস্তবায়নে দেশে আই.সি.টি অবকাঠামো নির্মাণ, অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি, সাবমেরিন ক্যাবল ও 4G টেকনোলজি কানেকটিভিটি, সরকারি অনলাইন পরিসেবা, অনলাইন ব্যাংকিং, মানব সম্পদ উন্নয়নে আই.সি.টি প্রশিক্ষণ এবং দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশনের আওতায় নিয়ে আসাসহ দৃশ্যমান অনেক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে, যা সরকারের ই-গভর্মেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন যথেষ্ঠ সম্বাবনাময় করে তুলেছে। ফলে ২০২০ সাল নাগাদ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা দঁড়িয়েছে প্রায় ৬৬.৪৪ মিলিয়ন, মোবাইল ব্যবহারকারির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৩ মিলিয়ন এবং আউট সোর্সিং এ বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে, যা দেশের অর্থনীতির বিকাশে নতুন সম্ভাবনা যোগ করেছে।

আই.সি.টি সেক্টরে দৃশ্যমান অগ্রগতির ফলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিগত বছরগুলোতে আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ৩১৩.২৫ মিলিয়ন, যা ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৬০৬ মিলিয়ন স্মারণী- ১.২(৬)। এ দশ বছরের ব্যবধানে আই.সি.টি খাতে রপ্তানি বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, ২০২৫ সাল নাগাদ যা ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার কথা ভাবছে সরকার।

স্মারণী- ১.২(৬) : ১৯৯৬-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানির চিত্র :-

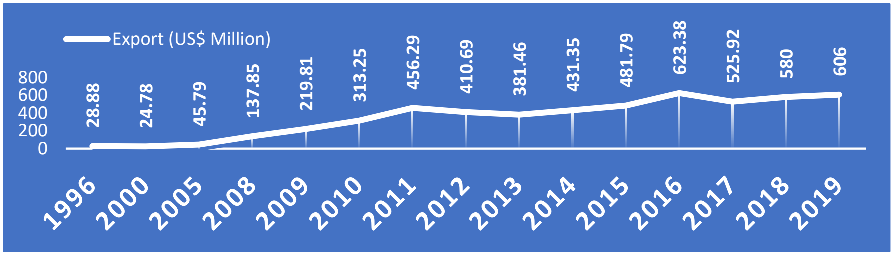

Source: Indexmunfi

৬) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য :

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য :

২০০৮-৯ সাল নাগাদ দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫,৭১৯ মেগাওয়াট এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন ৪,১৬২ মেগাওয়াট এর মধ্যে সীমিত থাকলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দৃশ্যপট পাল্টাতে শুরু করে। অর্থবছর ২০০৯-১০ সময়কালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫,৮২৩ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ৪,৬০৬ মেগাওয়াট, অর্থবছর ২০১৮-১৯ সময়কালে এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৮,৯৬১ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ১২,৮৯৩ মেগাওয়াট। এ ১০ বছর সময়কালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ১৩,১৩৮ মেগাওয়াট (২২৫.৬২%), প্রতিবছর গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩১৩.৮ মেগাওয়াট (২২.৫৬%)। স্মারণী- ১.২(৭)

স্মারণী- ১.২(৭): অর্থবছর ২০০০-১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনের চিত্র :-

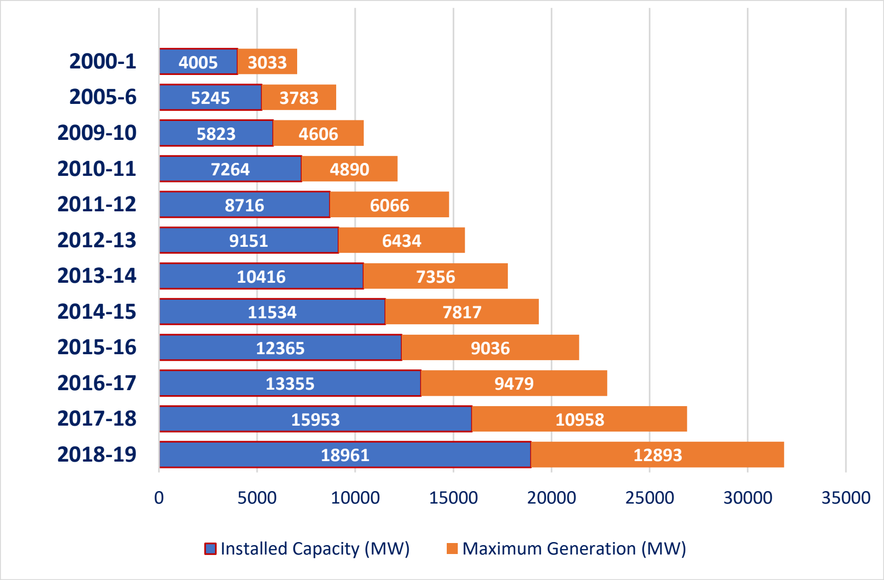

Source: Researchgate

৭) সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন :

সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন :

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধিপূর্বক দেশব্যাপি সকল সেক্টরে শক্তিশালি অবকাঠামো গড়ে তোলা। ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে SDG 9: Resilient Infrastructure, Sustainable Industrialization and Innovation” অর্জন বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। আশার কথা হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়নে পিছিয়ে থাকলেও বর্তমান সরকার অবকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত দিয়েছেন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে এরিমধ্যে প্রায় ডজন খানেক মেঘা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, বেশ কয়েকটি প্রকল্প এরিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরো বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়ার চিন্তা চলছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে (অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০) সময়কালে বিভিন্ন সেক্টরে বার্ষিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্ধের পরিমাণ ও বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার স্মারণী- ১.২(৮) এর মাধ্যমে নিন্মে তুলেধরা হলো ।

স্মারণী- ১.২(৮) : অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে সেক্টর অনুযায়ী সংশোধিত এডিপি বরাদ্ধের চিত্র :-

Economic Sectors	Financial Year				(TK. In Crore)
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Agriculture	4,410.05	5,741.6	5,283.52	6,918.24	6,623.53
Rural Dev. & Institutions	9,046.13	10,761.43	16,722.00	15,154.25	15,777.91
Water Resources	2,609.49	3,342.11	4,147.31	5,000.87	6,552.79
Industries	1,711.35	974.12	1,563.55	2,046.27	3,238.10
Power	15,478.21	13,447.57	22,340.32	23,225.36	23,631.78
Oil, Gas & N. Resources	1,068.17	1,067.87	1,346.48	2,209.12	2,417.07
Transport	19,212.13	27,360.23	37,513.22	38,099.58	47,431.92
Communication	1,434.82	1,915.79	937.44	2,021.01	1,739.64
Water Supply & Housing	11,092.38	14,391.17	15,146.83	20,371.84	26,839.25
Education & Religion	10,101.74	12,845.97	14,186.56	15,468.65	20,429.10
Sports & Culture	261.00	314.19	318.61	653.66	587.93
Health & F. Welfare	5,556.47	5,655.33	9,607.51	10,902.07	10,108.40
Mass Media	117.98	176.00	219.65	250.39	171.25
Social Welfare & W. dev.	424.48	347.19	431.86	649.71	798.06
Public Administration	2,327.43	2,344.55	2,118.91	4,964.3	5,137.49
Science & Technology	1,808.38	5,472.04	12,593.18	13,353.63	16,790.43
Labour & Employment	421.29	450.77	356.25	464.3	544.37
Others	3,918.50	4,092.07	3547.80	5,246.75	4,101.56
Total :	**91,000.00**	**1,10,700.00**	**1,48,381.00**	**1,67,000.00**	**1,92,921.00**
Yearly Growth Rate (%)	21.33	21.65	34.04	12.55	15.52

Source: MOF

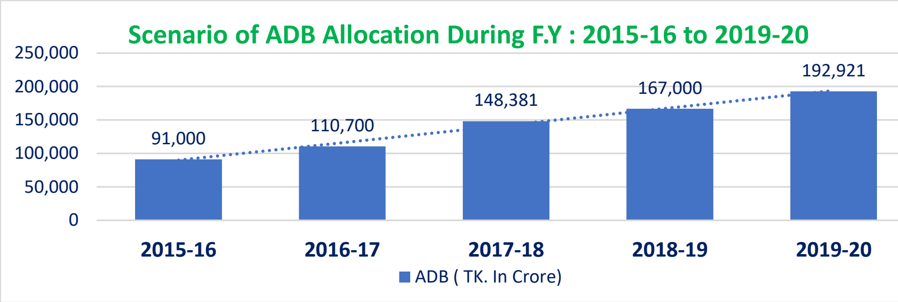

৮) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহে অগ্রগতি :

১৯৮০ পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক সমূহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যারমধ্যে মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এবং গড় আয়ু অন্যতম। ২০০০ সালে প্রতি ১০০,০০০ প্রসবের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যু ছিল ৪৩৪ জন, যা ২০১৯ সাল নাগাদ ১৬৫ জনে পৌঁছেছে। ১৯৮০ সালে প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে যেখানে ১৩৩ জন শিশু মারা যেত, ২০১৯ সালে তা নেমে এসেছে ২১ জনে। ১৯৮০ সালে প্রতি ১০০০ নবজাতকের মধ্যে যেখানে মারা যেত ৮৬.৫ জন শিশু, ২০১৯ সালে তা নেমে এসেছে ১৯.১ জনে। ১৯৮০ সালে ৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১৯৮.৬ জন, ২০১৯ সাল নাগাদ তা নেমে এসছে ৩০.৮ জনে এবং ১৯৮০ সালে দেশে গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৫২.৯ বছর, ২০১৯ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৪৩ বছর।

স্মারণী- ১.২(৯) : ১৯৮০-২০১৯ সময়কালে সামাজিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ্ ক্ষেত্রে অগ্রগতির চিত্র :-

Index	YEAR						
	1980	1990	2000	2005	2010	2015	2019
Maternal Mortality Rate	-	-	434	343	258	200	165
Infant Mortality Rate	133	99	64	50	36	29	21
Neonatal Mortality Rate	86.5	64.2	42.8	35.1	28.3	22.5	19.1
Under 5 Mortality Rate	198.6	143.8	86.5	64.7	48.7	37.5	30.8
Life Expectancy at Birth	52.9	58.21	65.45	67.77	69.88	71.51	72.43

Source: BBS, World Bank and other Sources.

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহে অগ্রগতি :

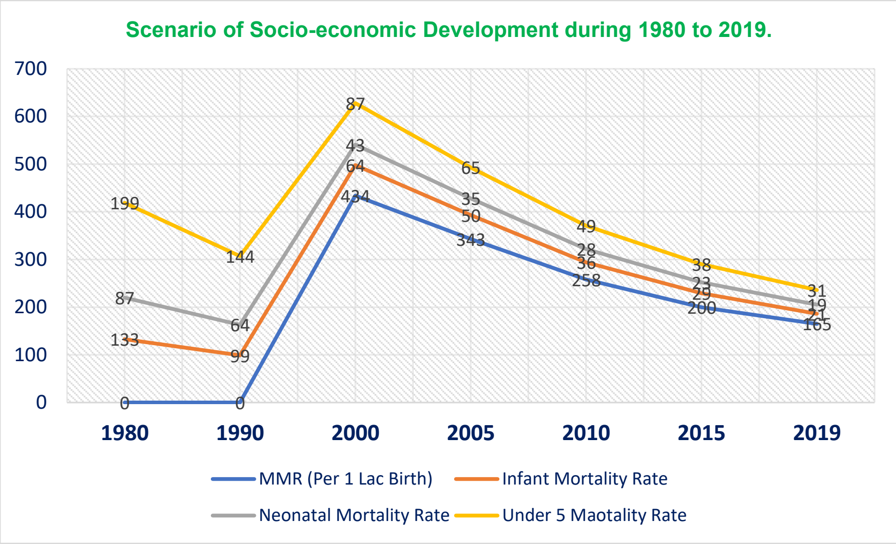

দেশের অর্থনীতি শক্তিশালি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরো বেগবান করে মুক্ত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উন্নতি নিশ্চিত পূর্বক ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য পূরণই এখন সরকারের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তবে সরকারের একার পক্ষে একাজ কঠিণ। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে দল মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সরকারের এ মহৎ ও বৃহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দেশের উন্নয়নে সামিল হলে এ দেশকে আধুনিক, সমৃদ্ধশালি ও উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কারণ এ দেশ সকলের এবং সকল নাগরিকের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় এদেশ এগিয়ে যাবে এটাই কাম্য, সরকারের কর্ম প্রচেষ্টা জনগণের আশা আকাঙ্কার প্রতিফলন ঘটাবে মাত্র, এটাই গণতন্ত্রিক দেশের নীতি। এর ব্যত্যয় যদি হয়, তবে লাভ কারো হবে না, কিন্তু ক্ষতি হবে সবার।

SJHBD

****

অধ্যায় : ১.৩

উন্নত দেশ হিসাবে আগামীর বাংলাদেশ।

উন্নত দেশ হিসাবে আগামীর বাংলাদেশ।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) উন্নত দেশ হিসাবে আগামীর বাংলাদেশ।
খ) উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ।
গ) উন্নয়ন নিশ্চিতে SDG লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ পূরন।
ঘ) ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরনে ” Economic Action Plan”.

ক) উন্নত দেশ হিসাবে আগামীর বাংলাদেশ :

উন্নত দেশ হিসাবে আগামীর বাংলাদেশ :

বাংলাদেশ যেহেতু মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সকল শর্তাবলী ইতিমধ্যে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে এতদসংক্রান্ত জাতিসংঘ স্বীকৃতি অর্জন করেছে, এখন সংগত কারনে বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে এ অর্জন ধরে রাখার পাশাপাশি দ্রুত উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান করে নেওয়া। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত অর্থনীতির দেশের তালিকায় স্থান পেতে হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আগামীতে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার বিকল্প নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কাঙ্কিত আধুনিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির সামগ্রীক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে ? দেশের মৌলিক অবকাঠামো, সম্পদের সুসম বণ্টন, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সরকারের আচরণ বিধি, দেশে শিক্ষার মান, জীবন যাত্রার মান ইত্যাদির সঠিক মাপকাঠি নিশ্চিত করতে এবং দেশের ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরনে সরকারের ভবিষ্যৎ এ্যাকশন প্ল্যান কেমন হওয়া উচিৎ, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে সামনের দিনগুলোতে আগানোই হবে যথাযথ অগ্রযাত্রার পথে আগানো।

উন্নত অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় ?

অর্থনীতির পরিভাষায় উন্নত অর্থনীতি বলতে “A developed economy is typically characteristic of a developed country with a relatively high level of economic growth and security. Standard criteria for evaluating a country's level of development are income per capita or per capita gross domestic product, the level of industrialization, the general standard of living and the amount of technological infrastructure.

Non-economic factors, such as the human development index (HDI), which quantifies a country's levels of education, literacy and health into a single figure, can also be used to evaluate an economy or the degree of development”.

SJ.FBD

একটি সমৃদ্ব অর্থনীতি বলতে সার্বিকভাবে একটি উন্নত দেশকে বুঝায় যেখনে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে ঐ দেশের মাথা পিছু আয়, শিল্পায়ন, জীবন যত্রার মান এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর পর্যাপ্ততা বুঝায়। তছাড়া, অ-অর্থনৈতিক বিষয়, যেমন মানব উন্নয়ন সূচক যা দেশের শিক্ষার মান, স্বাক্ষরতার হার ও স্বাস্থ্য সূচক যদি একক ডিজিটের মধ্যে থাকে, তা ঐ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি / মাত্রা পরিমাপের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খ) উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ :

Characteristics of Economic growth in a Country :-

Simon Kuznet (Nobel Prize winner for economics in 1971) identified 6 characteristics of growth. (However the study was based on the experiences of developed nations.) These characteristics were:

I. High rates of growth per capita output and population.

II. High rates of increase in total factor of productivity (TFP) i.e. output per unit of all inputs.
III. High rates of structural transformation of the economy.
IV. High rates of social, political and ideological transformation.
V. Propensity to trade
VI. Limited spread of economic growth.

উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ :

কাজেই, দেশে সমৃদ্ধ ও টেকসই অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নিশ্চিত করতে হলে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের আলোকে আমাদের অর্থনীতি বিচার করতে হলে, একটি দেশের ডেভেলপমেন্ট লেভেল নির্ণয়ে বিচার্য মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির বিষয়গুলো, যেমন - Income per capita or per capita gross domestic product, the level of industrialization, the general standard of living and the amount of technological infrastructure and Human Development ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরোও ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন প্রয়োজন এবং আগামির পথ চলায় এ সমস্ত বিষয় প্রাধান্য দিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পাসাপাশি অন্যান্য সামাজিক সুচক সমূহ, যেমন -সামাজিক নিরাপত্তা, সু-শাসন প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র সু-সংহত করার বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অনুকুল বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরী, কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করাসহ জীবন মান উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট অন্যান্য সূচক সমূহের পর্যাপ্ত উন্নয়নে কাজ করতে হবে, যা এদেশের অর্থনীতিকে পরিপক্ক বা Mature Economy তে পরিণত করবে, যেখানে নিম্মোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ বিরাজমান।

- A mature economy is the economy of a nation with a stable population and slowing economic growth.
- These economies have reached an advanced stage of development, categorized by slowing GDP growth, decreased spending on infrastructure, and a relative increase in consumer spending.
- Countries with mature economies include the United States, Canada, Australia, Japan and several nations in Western Europe.

SIFBD

গ) উন্নয়ন নিশ্চিতে জাতিসংঘের এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ পূরণ :

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করতে জাতিসংঘের **"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০"** পূরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উন্নয়ন সংশিষ্ট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতির ভিত্তিতে জাতিসংঘভূক্ত দেশসমূহের মাঝে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাপকাঠি নির্ধারনের প্রথা চালু রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপি কার্যকর করা হচ্ছে। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত অর্থনীতির দেশের তালিকায় স্থান পেতে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের **"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০"** যথাযথভাবে পূরনের বিকল্প নেই।

উন্নয়ন নিশ্চিতে জাতিসংঘের এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ পূরণ :

এই লক্ষ্যমাত্রা পূরনে বাংলাদেশকে ২০৩০ সাল নাগাদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সূচকে নির্ধারিত অগ্রগতি অর্জন এবং দেশে গণতন্ত্র সুসংহত ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার জন্য প্রয়োজন কৃষিখাতের আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, জ্বালানিসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকলক্ষেত্রে মানসন্মত উন্নয়ন।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের নির্ধারিত এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা পূরনে বাংলাদেশ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এ এজেন্ডার যথাযথ বাস্তবায়নে সরকার কতৃক বিবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যারমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, সামগ্রিক অর্থনৈতিকক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নে " Economic Action Plan 2020-2041" এবং Delta Plan 2100 হাতে নেওয়া হয়েছে। এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন বিশ্লেষণে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি থাকলেও, অনেকক্ষেত্রে অগ্রগতির হার হতাশাব্যঞ্জক। ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নগামী দেশসমূহের এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নে তুলেধরা হলো :-

SDG Goals	Countries					
	Bhutan	Sri Lanka	Nepal	Bangladesh	India	Pakistan
1: Poverty	Good On track	Good On track	Moderate, On Track	Moderate, On Track	Moderate, On Track	Moderate, On Track
2: Zero Hunger	Poor, Improving	Poor, Improving	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving	Poor, Improving	Poor, Improving
3: Good Health & Wellbeing	Moderate, maintaining	Poor, Improving	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving	Poor, Improving	Poor, Stagnating
4 : Quality Education	Poor, Improving	Poor, Improving	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Poor, Stagnating
5 : Gender Equality	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving		Poor, Stagnating
6 : Clean Water & sanitation.	Insufficient data	Good on track	Insufficient data	Insufficient data	Poor, Improving	Insufficient data
7 : Affordable and Clean Energy	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving		Poor, Improving
8 : Decent Work and Economic Growth	Insufficient data	Good on track	Poor, Improving	Poor, Stagnating	Moderate, On Track	Poor, Improving
9 : Industry Innovation and Infrastructure	Insufficient data	Poor, Improving	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving	Poor, Improving	Poor, Improving
10 : Reduced Inequalities	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data
11 : Sustainable Cities and Communities	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Worsening
12 : Responsible Consumption and Production	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data
13 : Climate Action	Good, Maintaining	Good, Maintaining	Moderate, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Moderate, Stagnating
14 : Life Below Water	Insufficient data	Poor, Improving	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Improving	Poor, Stagnating
15 : Life on Land	Poor, Maintaining	Poor, Improving	Poor, Stagnating	Very Poor, Worsening	Poor, Stagnating	Poor, Worsening
16 : Peace Justice and Strong Institutions	Insufficient data	Poor, Worsening	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating
17 : Partnerships for Goal	Poor, Maintaining	Poor, Worsening	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Insufficient data

Source: Bangladesh SDG Progress Report 2020

ঘ) ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণে " Economic Action Plan".

২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণে " Economic Action Plan".

স্বাধীনতা পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনীতি, সম্পদের অপ্রতুলতা, অতিমাত্রার জনসংখ্যা, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প কারখানার অপ্রতুলতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি বহুবিধ কারনে এদেশের অর্থনীতি ছিল জরাজীর্ণ একথা যেমন সত্যি, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারগুলোর অদক্ষতা, অদূরদর্শীতা , ক্ষমতার লোভ ও দুর্নীতিগ্রস্ততার কারনে ঐ সমস্ত সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনে ব্যর্থ হয়, ফলে বেকারত্ব প্রকট হয়ে উঠে, দেশে দারিদ্রতার মাত্রা ক্রমশ মহামারি আকার ধারণ করে এবং সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও দীর্ঘ সময় ধরে এদেশের অর্থনীতি আশানুরুপ বিকশিত হতে পারেনি।

তবে দেরিতে হলেও গত এক দশকে দেশের অর্থনীতি অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতির আকার ও আয়তন বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানিখাতের প্রসার ও বিদ্যুৎ খাতে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক সূচক গুলোতেও যথেষ্ঠ অগ্রগতি হয়েছে এরিমধ্যে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে পরিপক্ক ও অগ্রগামি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির এ ধারাবাহিকতার ফলস্বরুপ সহসা বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের কাতার ছেড়ে মধ্যম আয়ের কাতারে স্থান পেতে যাচ্ছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে বহুল সমাদৃত। সামনের দিনগুলোতে দেশের এ অগ্রযাত্রা আরোও বেগবান করার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে এ দেশের শক্তিশালি অবস্থান তুলে ধরতে তাই প্রয়োজন শক্তিশালি উদ্যোগ ও কার্যকর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

অবশ্য ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণে সরকার **Action Plan 2020-2041** প্রণয়নের মাধ্যমে আগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের এ বৃহৎ পরিকল্পনা তাই দেশের অবস্থান, জলবায়ু এবং সার্বিক অন্যান্য পরিষ্থিতি বিবেচনায় হওয়া উচিত যথেষ্ঠ বাস্তব সন্মত, যুগোপযোগি এবং বাস্তবায়ন যোগ্য, সাধ ও সাধ্যের যথার্থ সমন্নয়ের প্রতিফলন ঘটবে যেখানে । যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ পরিকল্পনা প্রনয়নে আগানো উচিৎ, তার কয়েকটি নিন্মে তুলে ধরা হলো :-

১. বাংলাদেশ একটি গ্রামভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর দেশ। ৬৪,০০০ গ্রাম নিয়ে গঠিত এদেশের ৭৩ শতাংশ জনগোষ্ঠি এখনো গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের জীবন জীবিকা কৃষি নির্ভর। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা ও টেকসই করার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত পূর্বক এদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে এটাই বাস্তব। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির দ্রুত

বিকাশের লক্ষ্যে তাই **"গ্রামীণ অর্থনীতি"** আলাদা মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি।

২. ভৌগলিক অবস্থান, সামাজিক প্রেক্ষিত ও অন্যান্য পরিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণ, যেমন- নদীমাতৃক এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া কৃষি উপযোগি এবং দেশের ৭৩% জনগোষ্ঠি কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে জড়িত। কাজেই এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে কৃষিখাতের উন্নয়ন এবং এ খাতে জড়িত বিশাল জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

৩. আমাদের সক্ষমতার জায়গাগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করন পূর্বক ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঐ সক্ষমতার ক্ষেত্রগুলো সর্বোচ্চ শক্তিশালি করার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এ শক্তি কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ। যেমন - জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক সমৃদ্ধ এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে বিশাল সংখ্যক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি রয়েছে। বিশাল সংখ্যক কর্মক্ষম এ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিনত করার মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ শক্তি কাজে লাগানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত শ্রমশক্তি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার অপূর্ব সুযোগ আমাদের রয়েছে, যা কাজে লাগানোর উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৪. যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা এখনো যথেষ্ঠ পিছিয়ে আছি, বাড়তি গুরুত্ব ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ঐ ক্ষেত্রগুলোকে দ্রুত উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন- দেশে মানসন্মত ও কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় কারিগরি, প্রযুক্তি, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিবন্ধনের হার বৃদ্বির মাধ্যমে পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহন করা, যাতে ভবিষ্যতের হাল ধরার মত যোগ্য লোকের অভাব না পড়ে।

৫. ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরনে এদেশে শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি কৃষি বিল্পব সমান গুরুত্ববহ। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও বিজ্ঞান সন্মত চাষাবাদের পাশাপাশি কৃষি বহুমূখীকরন ও বানিজ্যীকিকরনের মাধ্যমে রপ্তানি খাতে কৃষি সেক্টরের অবদান বৃদ্ধি করার সময় এসেছে।

৬. বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ, পর্যটন ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতে যুগোপযোগি উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি।

৭. কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতের উৎপাদন (ফসল, শাকসব্জি ও তরিতরকারি, মসলা জাতিয় পণ্য, যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ ইত্যাদি, হাঁস, মুরগি ও অন্যান্য গবাদি পশু, দুধ, ডিম, মাছ, মাংশ ও ফলমূল) যাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরনের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করা যায়, সে বিষয়ে গভীর দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। কেননা, বাংলাদেশের মত একটি নদী মাতৃক ও কৃষি প্রধান দেশে কাড়ি কাড়ি বৈদেশিক মূদ্রা খরচ করে কৃষি পণ্য, যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মাছ, মাংশ, ডিম ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে, এটা সত্যিই বেমানান। এ বিষয়ে কঠোর সিদ্বান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

৮. শিল্পের কাঁচা মালের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পুরাপুরি আমদানি নির্ভর, যা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। কাঁচামাল আমদানিতে সিংহভাগ বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয় হয়ে গেলে ঐ শিল্প লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা যেমন কমে যায়, তেমনি সিংহভাগ আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল কোনো শিল্প বেশি সময় টিকে থাকাও অসম্ভব।

৯. দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে উদ্ভাবনী তত্ব ও ফর্মূলা দ্রুত বানিজ্যিকীকরন পূর্বক দেশের উন্নয়নে সকল উদ্ভাবনি শক্তি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে বৃহৎ পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা জরুরি।

SJFBD

১০. উৎপাদনশীল খাতের আকার আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি ক্ষেত্র প্রসারিত করে রপ্তাতি আয় বৃদ্ধি করতে এ খাতের উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাই বৃহৎ স্বার্থে আগামী কয়েক বছর অনুৎপাদনশীল বৃহৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ কমিয়ে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো উচিত।

১১. সবুজ অর্থনীতির পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনীতির মানসন্মত উন্নয়নে দূরদর্শী পরিকল্পণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২. আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায়, গণতন্ত্রায়ন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিকেন্দ্রিকরণ, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করনপূর্বক ঐ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দ্রুত কাটিয়ে উঠার কার্যকর উপায় সমূহ এ পরিকল্পনায় গুরুত্বের সাথে স্থান পাওয়া উচিৎ।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, একশন প্ল্যান ২০২০-২০৪১ কোনো সাধারণ বা গতানুগতিক পরিকল্পনা নয়। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি অনন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বিশ্বের শক্তিশালি অর্থনীতির দেশ সমূহের তালিকায় স্থান করে নিতে এবং মুক্ত অর্থনীতির এ যুগে নিজ দেশের অবস্থান জানান দিতে এ মহা পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল লক্ষ্য, যা হওয়া উচিৎ লক্ষ্য পূরনের ক্ষেত্রে বাস্তব সন্মত ও সম্ভাবনাময় এবং শতভাগ কার্যকরি, যাতে আগামি ২০ বছর সময়কালে এ পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্কিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যার্থ হতে না হয়।

****

SJFBD

দ্বিতীয় অংশ :

গ্রামীণ অর্থনীতি।

অধ্যায় : ২.১

গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান চিত্র।

গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান চিত্র।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

১) **এক নজরে গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান চিত্র।**

ক) দেশের ৭৩% জনগোষ্ঠী এখনো গ্রামে বসবাস করে।
খ) গ্রামীণ পরিবার সমূহের একটি বড় অংশ উপার্জনহীন।
গ) বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ গ্রামে প্রায় নিত্য সঙ্গী।
ঘ) বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র।
ঙ) গ্রামাঞ্চলে বসত বাড়ীর সিংহভাগই নিন্মমানের।
চ) কৃষিই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা।
ছ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৪৬.৭০% এখনো দরিদ্র।
জ) গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার হার অস্বাভাবিক কম।
ঝ) টপ ও বটম ৫% পরিবারের মাসিক গড় আয়।
ঞ) গ্রাম ও নগর ভেদে পরিবারপ্রতি মাসিক আয়ের তারতম্য।
ত) গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
থ) গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

এক নজরে গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান চিত্র :

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত গ্রামনির্ভর। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৩ শতাংশের বসবাস গ্রামে এবং কৃষিই গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। মোট কর্মসংস্থানের প্রায় অর্ধেক কৃষি সেক্টরে, যা গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্রতা হ্রাস এবং গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে বড় আকারের ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস গ্রামীণ অর্থনীতি। স্বাধীনতার পর থেকে জি.ডি.পিতে কৃষিসেক্টরের অবদান গড়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকে অর্থনৈতিক সেক্টরে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জি.ডি.পিতে শিল্পসেক্টরের অবদান ক্রমান্বয়ে কৃষি সেক্টরকে ছাড়িয়ে যায়। ফলে অর্থবছর ২০০০-০১ সময়কালে জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অংশ ২৫.০৩% থাকলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ১৩.৬৫%।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির আকার আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় যথেষ্ঠ প্রসারিত। বিগত এক দশকে দেশের বাজেট ও জি.ডি.পির আকার বেড়েছে কয়েকগুণ এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্বের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। এ সময়কালে শিল্প ও সেবাখাতের প্রসার, রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহের ইতিবাচক ধারা এবং বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান রিজার্ভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু, সে তুলনায় গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি আজো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবিকার একমাত্র সংস্থান কৃষি সেক্টরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি বলা চলে, যা দেশের অর্থনীতির কাঙ্কিত গতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশের কৃষিখাতে প্রসার ঘটেছে সত্য, কিন্তু কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন ঘটেনি। ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়ছেনা, তেমনি উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার দরুন কৃষকেরা লাভবান হতে পারছেনা। তাছাড়া, প্রতিবছর বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও ফসল হানি এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে চাষাবাদ ব্যাহত হওয়া দেশের বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলের জন্য আজো অতি সাধারণ বিষয়।

এক নজরে গ্রামীণ অর্থনীতির বর্তমান চিত্র :

গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও আয় রোজগারের সুবিধা না থাকায় এবং কৃষি লাভজনক না হওয়ায় সেখানে দারিদ্রতা ও সামাজিক অনগ্রসরতা যথেষ্ঠ প্রকট, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং জীবনমান উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কৃষি শ্রমিকদের সিংগভাগই ভূমিহীন, বছরের বেশিরভাগ সময় যারা অর্ধ বেকার অথবা ছদ্ম বেকার হিসাবে দিন কাটায়। গ্রামীণ নারীদের প্রায় শত ভাগই পারিবারিক কাজকর্ম ব্যাতিত অন্য কোনো অর্থনৈতিক কাজ কর্মে তাদের সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ পরিবার এক ব্যাক্তির আয় রোজগারের উপর নির্ভরশীল। ফলে গ্রামীণ সমাজে নারীরা আজো অবহেলিত, কোনঠাসা ও মযাদাহীন এবং অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতার শিকার।

একথা ভূলে গেলে চলবেনা যে, এদেশে টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরি, কেননা, দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠির বসবাস গ্রামে এবং সামগ্রিক অর্থনীতির বড় অংশই গ্রামীণ অর্থনীতি। গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে প্রয়োজন গ্রামীণ অবকাঠামো ও গ্রামীণ বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যাবস্থার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিপূর্বক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবন মানে মানসন্মত পরিবর্তন আনা।

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি টেকসই করে তুলতে কেন গ্রামীণ অর্থনীতির মানসন্মত উন্নয়ন এত জরুরি, নিন্মে তার কয়েকটি উদাহরন তুলেধরা হলো ।

ক) দেশের ৭৩% জনগোষ্ঠি এখনও গ্রামে বসবাস করে :

দেশের ৭৩% জনগোষ্ঠি এখনও গ্রামে বসবাস করে :

HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫৯.৫৮ মিলিয়ন ও মোট পরিবার ৩৯.৩৩ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসকারি জনসংখ্যা ১১৬.০৯ মিলিয়ন (৭২.৭৫%) এবং শহরে বসবাসরত জনসংখ্যা ৪৩.৫০ মিলিয়ন (২৭.২৫%)। ঐ সময়কালে পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ছিল সমগ্র দেশে ৪.০৬ জন, গ্রামে ৪.১১ জন এবং শহরে ৩.৯৩ জন। অর্থাৎ শহরের তুলনায় পরিবার প্রতি গড় সদস্যসংখ্যা গ্রামে প্রায় ৫% বেশি।

স্মারণী- ২.১(১) : HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা, মোট পরিবার এবং পরিবার প্রতি গড় জনসংখ্যা গ্রামে ও শহরে :-

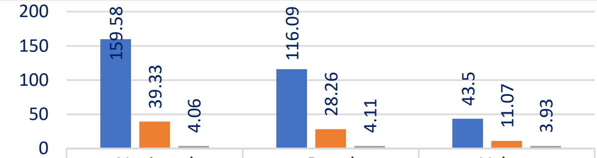

	National	Rural	Urban
TOTAL Population (Million)	159.58	116.09	43.5
Total Household (Million)	39.33	28.26	11.07
Average Household Size	4.06	4.11	3.93

Source: HIES 2016

খ) গ্রামীণ পরিবারসমূহের একটি বড় অংশ উপার্জনহীন :

গ্রামীণ পরিবার সমূহের একটি বড় অংশ উপার্জনহীন

HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট ৩৯.৩৩ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে ৩.৯৬ মিলিয়ন পরিবারে কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নেই, যাদের মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ৩.১৮ মিলিয়ন (৮০%) পরিবার এবং অবশিষ্ট .৭৮ মিলিয়ন (২০%) পরিবারের বসবাস শহরে। অর্থাৎ দেশে এখনও (৩.৯৬ X ৪.০৬) = ১৬.০৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠির সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় দিন কাটে যার ৮০% এর বসবাস গ্রামে।

অন্যদিকে একজন মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল এমন পরিবারের সংখ্যা সমগ্র দেশে ২৫.৫৩ মিলিয়ন, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ১৮.৬৪ মিলিয়ন (৭৩%) এবং শহরে ৬.৮৯ মিলিয়ন (২৭%)। অর্থাৎ গ্রামে বসবাসকারি পরিবারগুলোর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পরিবার এখনও একজন মাত্র উপার্জনকারি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী দুইজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির পরিবারের সংখ্যা দেশে ৭.৬৮ মিলিয়ন, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ৫.০৫ মিলিয়ন বা ৬৫.৭৬% (গ্রামে বসবাসরত মোট পরিবারের ১৭.৮৭%) এবং অবশিষ্ট ২.৬৩ মিলিয়ন (৩৪.২৪%) পরিবারের বসবাস শহরে। তিন বা ততোধিক উপার্জনক্ষম ব্যক্তির পরিবারের সংখ্যা সমগ্র দেশে ২.১৬ মিলিয়ন, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ১.৩৯ মিলিয়ন (৬৪.৩৫%) এবং শহরে ০.৭৭ মিলিয়ন (৩৫.৬৫%) পরিবার।

স্মারণী- ২.১(২) : উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ভিত্তিতে দেশে পরিবারের সংখ্যা :-

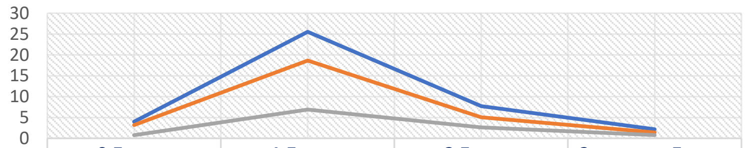

	0 Earner	1 Earner	2 Earner	3 or more Earner
National	3.96	25.53	7.68	2.16
Rural	3.18	18.64	5.05	1.39
Urban	0.78	6.89	2.63	0.77

Source: HIES 2016

গ) বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ গ্রামে প্রায় নিত্যসঙ্গী :

বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় নিত্যসঙ্গী :

নদী মাতৃক এদেশের রয়েছে ছোট বড় প্রায় ৭০০ নদী যাদের সন্মিলিত দৈর্ঘ প্রায় ২৪,১৪০ কিলোমিটার। বন্যা, জলাবদ্বতা, নদী ভাঙ্গন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের গ্রামীণ মানুষের নিত্য সঙ্গী। গড়ে প্রতিবছর সারাদেশে বন্যায় প্লাবিত হয় প্রায় ২০%-৩০% এলাকা, যাতে ঐ সমস্ত এলাকায় প্রতিবছর ব্যাপক শস্য হানির পাশাপাশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৭ থেকে ৮ লক্ষ পরিবারের, গড়ে প্রতিবছর মারা যায় ৫০০০ এর অধিক মানুষ, গবাদি পশু মারা যায় গড়ে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০, নষ্ট হয় অগনিত মাছের খামার, রাস্তাঘাট, বেড়ি বাধ, ব্রীজ, কালবার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো। নিন্মে ২০০০-২০১৮ সময়কালে দেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমান তুলে ধরা হলো।

স্মারনী-২.১(৩) : ২০০০-২০১৮ সময়কালে দেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ :-

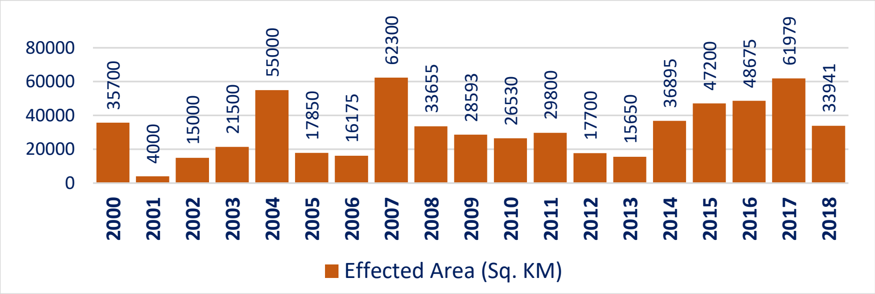

Source : BWDB Flood Report 2018

ঘ) বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র :

BBS সার্ভে ২০১৫ এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ২০০৯-২০১৪ (ছয় বছর) সময়কালে বন্যা, জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৪৩,৬১,২৬১ টি, গড়ে প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৭২৬,৮৭৭ টি এবং ঐ ছয় বছর সময়কালে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সন্মিলিতভাবে টাঃ ১৮৪,২৪৭ মিলিয়ন। স্মারণী-২.১(৪)

বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র :

উল্ল্যেখ্য, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহের উন্নয়নে এবং বন্যা প্রতিরোধে সরকার যথেষ্ঠ উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি এযাবত বাস্তবায়ন করেছেন এবং করছেন, ফলে দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহের রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক ভালো, যদিও এসমস্ত উন্নয়ন অনেকটা গতানুগতিক ও বিক্ষিপ্ত। যদি **"গ্রামীণ অর্থনীতি"** আলাদা মূল্যায়ন পূর্বক গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়নে আলাদা বাজেট বরাদ্ধের মাধ্যমে এ সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়, সেক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা যেমন রক্ষা হয়, তেমনি প্রতিটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়নের নিশ্চয়তা থাকে।

স্মারণী-২.১(৪): ২০০৯-২০১৪ সময়কালে সংঘটিত বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ক্ষতির চিত্র (মিলিয়ন টাকা) :-

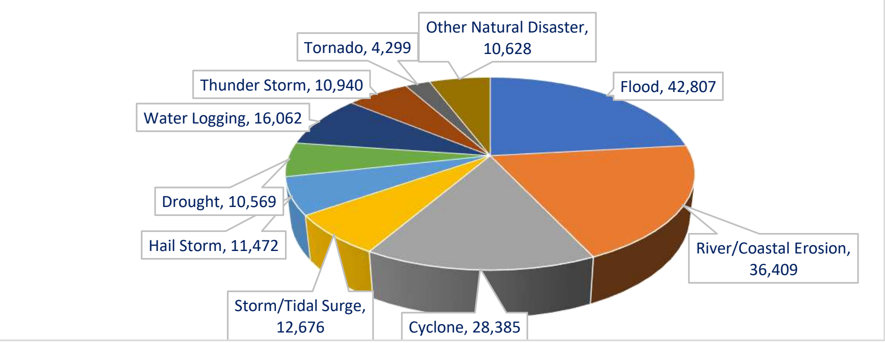

Source : BBS

ঙ) গ্রামাঞ্চলে বসত বাড়ীর সিংহভাগই নিম্নমানের :

কোনো দেশের বাসস্থান কাঠামো ঐ দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান এবং দেশের সার্বিক অর্থনীতির পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল গুলোতে এখনও সিংহভাগ ঘরবাড়ি টিন, কাঠ, খড় অথবা বাঁশের ছাউনি। গ্রামাঞ্চলের মোট ২৮.২৬ মিলয়ন পরিবারের মধ্যে ১.৪৭ মিলিয়ন ঘরবাড়ি এখনও কাঠ, খড় অথবা বাঁশের ছাউনি, একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য যা সত্যিই বেমানান।

HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট ৩৯.৩৩ মিলিয়ন পরিবারের ১১.০৬% (৪.৩৫ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি ইট/মিমেন্টের তৈরি, ৮৪.২৯% (৩৩.১৫ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি টিন/কাঠের ছাউনি এবং

গ্রামাঞ্চলে বসত বাড়ীর সিংহভাগই নিন্মমানের :

৪.৬৫% (১.৮৩ মিলিয়ন) কুড়েঘর। গ্রামে মোট ২৮.২৬ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫.৩২% (১.৫০ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি ইট/সিমেন্টের ছাদ, ৮৯.৪১% (২৫.২৭ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি টিন/কাঠের ছাউনি এবং ৫.২৭% (১.৪৯ মিলিয়ন) কুড়েঘর। শহরে মোট ১১.৭০ মিলিয়ন পরিবারের ২৮.৭১% (৩.৩৬ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি ইট/সিমেন্টের ছাদ, ৬৮.২৮% (৭.৯৯ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি টিন/কাঠের ছাউনি এবং ৩.০৫% (০.৩৬ মিলিয়ন) কুড়েঘর স্মারণী- ২.১(৫) ।

স্মারণী- ২.১(৫) : ২০১৬ সাল নাগাদ দেশে চাউনির ভিত্তিতে বসত বাড়ির অবকাঠামো :-

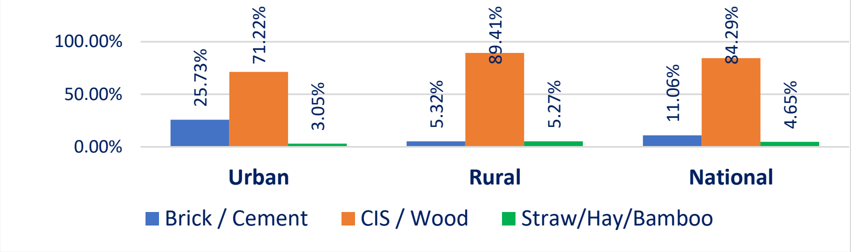

Source: BBS

চ) কৃষিই গ্রামীণ জনগোষ্ঠির প্রধান পেশা :

কৃষিই গ্রামীণ জনগোষ্ঠির প্রধান পেশা :

ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার বিচারে কৃষিই একমাত্র খাত, যে খাতের পরিচয়ে এদেশ অতীতে পরিচিত ছিল, এখনো পরিচিতি পাচ্ছে এবং আগামীতেও পরিচিতি পাবে। এটা এমন এক খাত, যে খাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি কাংক্ষিত পর্যায়ে শক্তিশালি করার এবং এদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার গোপন তত্ত্বটি লুকিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, এটিই একমাত্র খাত, ভবিষ্যতে যে খাতের হোছড় খাওয়ার কিংবা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, যে ভয় অন্যান্য খাতের ক্ষেত্রে রয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৭.৮০% (গ্রামে বসবাসকারি জনসংখ্যার ৪৯.০১% এবং শহরে বসবাসকারি জনসংখ্যার ১০.৩০%) কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত। এদিক থেকে বিচার করলেও কৃষি এদেশের সর্ববৃহৎ খাত, যে খাতের সাথে দেশের সিংহ ভাগ মানুষের জীবন জীবিকা জড়িত । বি.বি.এস এর তথ্যমতে ২০১৬-১৭ নাগাদ গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত শ্রমসংখ্যার ৫১.৭% কৃষি সেক্টরে, ১৭% শিল্প সেক্টরে এবং ৩১.৩% সেবাখাতে কর্মরত।

স্মারণী- ২.১(৬) : অর্থবছর ২০১৬-১৭ নাগাদ তিনটি প্রধান সেক্টরে কর্মরত শ্রমসংখ্যার হার :-

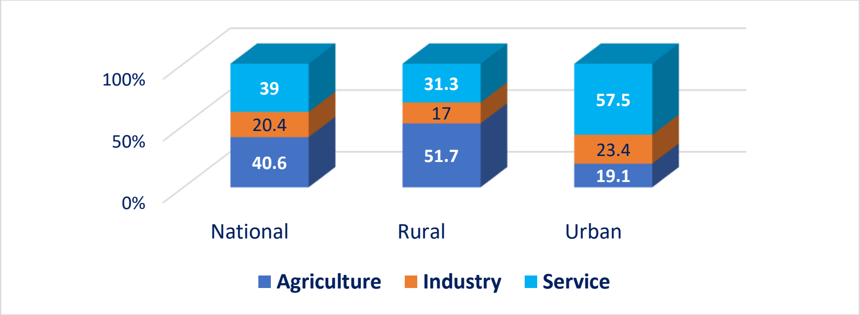

Source: LFS 2016-17

ছ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠির ৪৬.৭০% এখনো দারিদ্র :

দেশে দারিদ্রতার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে বাস্তবে তা লক্ষ্যনীয়, যেমন- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, পাশপাশি বেড়েছে ক্রয়ক্ষমতা, মানুষ উন্নত বাসস্থানের দিকে ঝুকছে, সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দিচ্ছে, চিকিৎসার জন্য ভাল ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে, উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে, পাশাপাশি বেড়েছে আত্মমর্যাদা ও রুচিবোধ। নিম্নআয়ের মানুষের জীবনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। প্রতিটি রিক্সা চালক দৈনিক হাজার টাকার বেশি আয় করছে, দৈনিক মজুরি গড়ে ৭০০ টাকার উপরে। ফলে প্রাত্যহিক জীবনে মৌলিক চাহিদা মিটাতে তাদের আর আগের মত বেগ পেতে হয়না, অভাবের শঙ্কায় দিন কাটাতে হয়না আর। প্রতিটি নিম্ন আয়ের মানুষ এখন কম বেশি সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে, তাদেরকে স্কুলে পাঠায়, কম বেশি ভাল খাদ্য খায়, দিন কাটে সুন্দর অগামীর প্রত্যাশায়।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির ৪৬.৭০% এখনো দারিদ্র :

HIES – 2016 এর তথ্যমতে দেশে দারিদ্রতার হার ২৪.৩%, গ্রামে ২৬.৪% এবং শহরে ১৮.৯% HIES – 2005 সময়কালে দারিদ্রতার এ হার ছিল জাতিয়ভাবে ৪০%, গ্রামে ৪৩.৮% এবং শহরে ২৮.৪%। ২০০৫ সালে দেশে দারিদ্রতার গ্যাপ ছিল ১২.৮%, গ্রামে ১৩.৭% এবং শহরে ৯.১%। ২০১৬ সালে তা নেমে এসেছে সমগ্র দেশে ৫%, গ্রামে ৫.৪% এবং শহরে ৩.৯%। হত দরিদ্রের ক্ষেত্রেও একই অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, যেমন - ২০০৫ সালে দেশে হত দরিদ্রের হার ছিল ২৫.১%,

গ্রামে ২৮.৬% এবং শহরে ১৪.৬%, ২০১৬ সালে তা নেমে এসেছে সমগ্র দেশে ১২.৯%, গ্রামে ১৪.৯% এবং শহরে ৭.৬%। অর্থাৎ ২০০৫-২০১৬ এ এক দশকের ব্যবধানে দেশে দারিদ্রতার হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে, যাকে দারিদ্রতা নিরসনে অভাবনীয় অগ্রগতি বা অনবদ্য বলা চলে। কিন্তু তাই বলে এ সন্তুষ্টি নিয়ে ত আর থেমে থাকা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যের দিকে, দারিদ্রতার মাত্রা শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা এখন এ জাতির স্বপ্ন, যেখানে প্রতিটি মানুষ পাবে উন্নত জীবনের স্বাধ।

দরিদ্র, দারিদ্রতার গ্যাপ এবং হত দরিদ্র এ তিন শ্রেণির মানুষই দারিদ্রের আওতাভুক্ত, সে হিসাবে ২০১৬ নাগাদ দেশে চলমান দারিদ্রতার হার ৪২.২%, যার মধ্যে রয়েছে গ্রামে ৪৬.৭% এবং শহরে ৩০.৪%। ২০১৮ সালের হিসাবে দেশের আনুমানিক জনসংখ্যা ১৬৩.৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ১১৯.০৯ মিলিয়ন (৭২.৭৫%) এবং শহরে বসবাসরত ৪৪.৬১ মিলিয়ন (২৭.২৫%)। সে হিসাবে দেশে এখনও (১৬৩.৭ x ৪২.২%) = ৬৯.০৮ মিলিয়ন জনসংখ্যা দারিদ্রতার বেড়াজালে আবদ্ধ, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসরত (১১৯.০৯ x ৪৬.৭%) = ৫৫.৬১ মিলিয়ন এবং শহরে বসবাসরত (৪৪.৬১ x ৩০.৪%) = ১৩.৫৬ মিলিয়ন স্মারণী- ২.১(৭)।

স্মারণী- ২.১(৭): অর্থবছর ২০১৬-১৭ নাগাদ দেশে দরিদ্র, দারিদ্রতার গ্যাপ ও হতদরিদ্রের হার :-

INDEX	HIES 2016			HIES 2005		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
Incidence of Poverty : (Head Count %)						
➢ Upper Poverty Line	24.3	26.4	18.9	40.0	43.8	28.4
➢ Poverty Gap	5.0	5.4	3.9	12.8	13.7	9.1
➢ Lower Poverty Line	12.9	14.9	7.6	25.1	28.6	14.6

Source: **HIES 2016**

জ) গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার হার অস্বাভাবিক কম :

যদিও পূর্বের তুলনায় দেশে পাবলিক ও প্রইভেট উভয় ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রী নিবন্ধনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এখনও যথেষ্ঠ পিছিয়ে রয়েছে। UNESCO রিপোর্ট ২০১৮ অনুযায়ী টার্সিয়ারি শিক্ষায়

গ্রাম পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার হার অস্বাভাবিক কম :

নিবন্ধনের হার বাংলাদেশে ২০.৫৭%, যেখানে ভারতে এ হার ২৮.০৬%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৬.৩১%, মালয়েশিয়ায় ৪৫.১৩%, চীনে ৫০.৬০%, কম্বোডিয়ায় ৫৫.৩৩% এবং দ. কোরিয়ায় ৯৪.৩৫%। অন্যদিকে টার্সিয়ারি শিক্ষা সমাপ্তকারি ছাত্রছাত্রীর হার শহরের তুলনায় গ্রামে এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। LFS- 2016-17 অনুযায়ী ঐ সময়ে দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষা সমাপ্তকারির হার ৪.২০%, যারমধ্যে গ্রামে ২.৩% এবং শহরে ৮.৬%।

স্মারণী-২.১(৮): LFS 2016-17 অনুযায়ী দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষা সমাপ্তকারি ছাত্রছাত্রীর হার :-

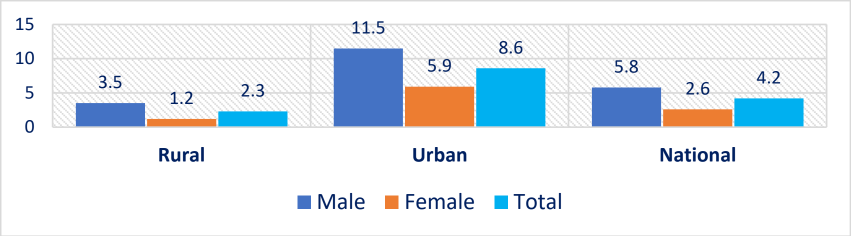

Source : **LFS 2016-17**

ঝ) টপ ও বটম ৫% পরিবারের মাসিক গড় আয় :

টপ ও বটম ৫% পরিবারের মাসিক গড় আয় :

অর্থবছর ২০১৬-১৭ নাগাদ দেশে বটম ৫% পরিবারের মাসিক গড় আয় জাতিয়ভাবে ৪,৬১০ টাকা, গ্রামে ৪,৬৬৫ টাকা এবং শহরে ৪,২১৩ টাকা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ ৫% পরিবার মানে সারা দেশে (৩৯.৩৩ X ৫%) = ২.০ মিলিয়ন পরিবার, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসকারি পরিবারের সংখ্যা ১.৪৩ মিলিয়ন । প্রতি পরিবারে গড়ে ৪.০৬ সদস্য হিসাবে সারা দেশে প্রায় ৮.১২ মিলিয়ন, তম্মধ্যে গ্রামে বসবাসকারি (১.৪৩ X ৪.১১) = ৫.৮৮ মিলিয়ন মানুষের জীবন মান এর সঙ্গে জড়িত। কাজেই, বটম ৫% পরিবার সেটা গ্রাম কিংবা শহর যেখানেই হউক না কেন, ঐ শ্রেণির মানুষের আয়ের পরিমমান দ্রুত বৃদ্ধি করে স্বচ্ছল জীবন যাপন উপযোগী করে তোলা জরুরি। আমরা জানি এ কাজ রীতিমত চ্যালেঞ্জ, কিন্তু তাই বলে অসম্ভব নয়।

এ সমস্যার সমাধানে আমাদেরকে সমস্যার গভীরে গিয়ে কাজ করতে হবে। এ শ্রেণির মানুষের জীবন মান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করে ঐ সমস্যা সমূহ সমাধানের উপর আলাদা গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ রেখে তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। অন্যথায় এর নেতিবাচক প্রভাবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতিধারা যেমন ব্যাহত হবে, অন্যদিকে জাতি হিসাবে বিশ্বে আমাদের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করবে তার চেয়েও বেশি।

স্মারণী- ২.১(৯): বিগত ২০০৫-২০১৬ সময়ের ব্যবধানে দেশে টপ ও বটম ৫% পরিবারের মাসিক গড় আয়ের পরিবর্তনের চিত্র :-

INDEX	HIES 2016			HIES 2005		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
Income Accruing to : (TK. Per household per month)						
➢ Top 5% Households	45,172	32,561	56,439	33,471	25,044	47,447
➢ Bottom 5% Households	4,610	4,665	4,213	1,605	1,485	2,113

Source: BBS

SIFBD

ঞ) গ্রাম ও নগর ভেদে পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয়ের তারতম্য :

গ্রাম ও নগর ভেদে মাসিক গড় আয়ের তারতম্য :

গ্রামের তুলনায় নগরগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকায় গ্রাম ও নগরভেদে পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয়ের পার্থক্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রাম পর্যায়ের মানুষ অতিমাত্রায় নগরমুখী হয়ে পড়ছে এবং গ্রামে শ্রমিক সংকট দেখা দিচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে যা গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য হুমকির কারণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। HIES 2005 সময়কালে পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয় ছিল জাতিয়ভাবে ৭,২০৩ টাকা, গ্রামে ৬,০৯৫ টাকা এবং শহরে ১০,৪৬৩ টাকা। সে সময়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পরিবারপ্রতি মাসিক আয়ের তারতম্য ছিল ৪,৩৬৮ টাকা। সর্বশেষ HIES 2016 সময়কালে পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয় দাঁড়িয়েছে জাতিয়ভাবে ১৫,৯৮৮ টাকা, গ্রামে ১৩,৯৯৮ টাকা এবং শহরে ২২,৬০০ টাকা। এই সময়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পরিবারপ্রতি মাসিক আয়ের তারতম্য দাঁড়িয়েছে ৮,৬০২ টাকা।

স্মারণী- ২.১(১০) : ২০০৫-২০১৬ সময়ের ব্যবধানে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয়ে তারতম্যের চিত্র :-

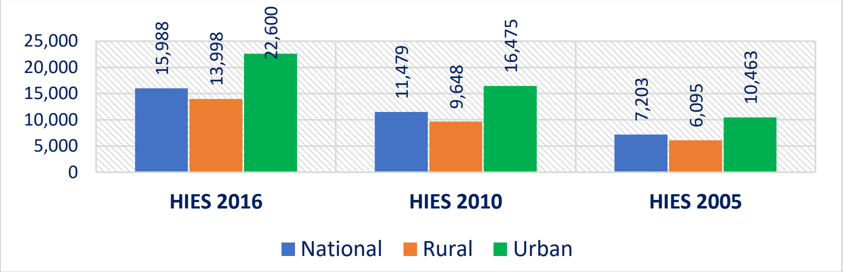

Source: BBS

ত) গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন :

২০১৮ সাল নাগাদ সারাদেশে ৯০% জনগোষ্ঠি বিদ্যুতায়নের আওতায় এসেছে এবং ঐ সময়ে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬৪ কিলোওয়াট/ঘণ্টায় (সিপিডি ষ্টাডি)। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের গ্রামাঞ্চলসমূহ শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার পরিকল্পণা সরকারের রয়েছে। এ

গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন :

পরিকল্পণা বাস্তবায়িত হলে গ্রাম পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রান্ত হবে এবং গ্রাম পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে আশা করা যায়।

স্মারণী- ২.১(১১) : বিগত এক দশক ময়কালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্র :-

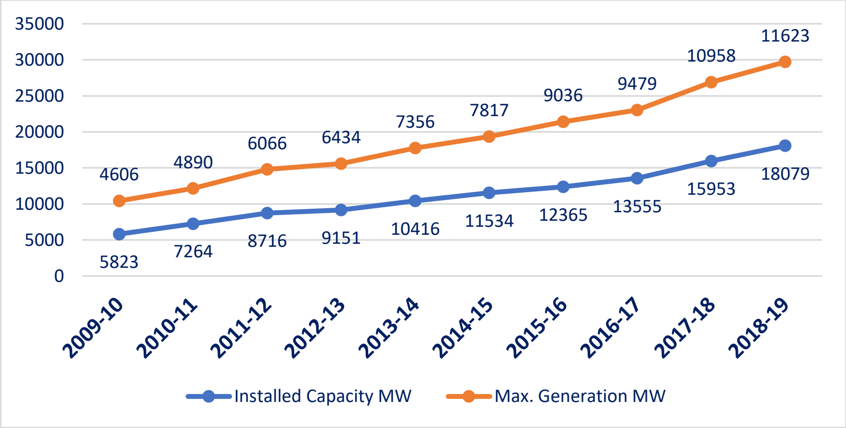

Source: Power Division, *up to February 2019.

থ) গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

উপরের পর্যালোচনা ও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে বিগত দশকে এদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক সূচকের দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যুগ যুগ ধরে দারিদ্রের অতল গর্ভে ডুবে থাকা বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জয়যাত্রায় সামিল হয়েছে এবং এরিমধ্যে দেশবাসি এই সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে বিগত দশকে সাধিত হওয়া অগ্রগতি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের প্রথম ধাপ মাত্র। অর্জিত সকল অগ্রগতির ধারা আরো বেগবান করা না গেলে, সম্ভাব্য অগ্রগতির সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করে যথাযথ অগ্রগতির জন্য ত্বরিৎ পদক্ষেপ না নিলে, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে এমন কি অর্জিত

অগ্রগতিগুলোও সেক্ষেত্রে বিফলতার দিকে ধাবিত হতে পারে, এমন বাস্তবতা মাথায় রেখে আমাদের কাজ করা উচিৎ।

গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

নদী মাতৃক ও গ্রাম ভিত্তিক এ দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে হলে সর্বাগ্রে গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন তথা গ্রামে বসবাসরত বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন মান কাঙ্কিত পর্যায়ে উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং এজন্য গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনশীকার্য। গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামীন জনগনের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় সমূহ সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় বাজেটের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্ধের মাধ্যমে ঐ পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি প্রয়োজন :-

১. গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন।
২. দেশে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, বহুমূখীকরন ও বানিজ্যিক কৃষির প্রসার।
৩. গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় কারিগরি ও প্রযুক্তি, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিবন্ধনের হার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।
৪. উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসন্মত স্বাস্থ্য সেবার প্রসার।
৫. দেশব্যাপি উপজেলা পর্যায়ে **"উপজেলা শিল্প পার্ক"** গঠণ পূর্বক সেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকেন্দ্রিকরনের মাধ্যমে SME খাতের প্রসার।
৬. গ্রাম পর্যায়ে কুঠির শিল্প ও অন্যান্য আয় বর্ধক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পূর্বক গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনা।
৭. দেশে দারিদ্রের মাত্রা শূণ্যের কৌটায় নামিয়ে আনতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি প্রভিডেন্ড ফান্ড সুবিধায় **"গ্রামীণ সঞ্চয় প্রকল্প"** এবং তাদের খাদ্য নিরাপত্তায় **"রেশন কাড"** প্রথা চালু করা।
৮. গ্রামীণ জীবন মান উন্নয়ন ও দ্রুত হ্রাস পাওয়া কৃষি জমি রক্ষার্থে পরিকল্পিত "গ্রামীণ আবাসন " ব্যবস্থা চালু করা :
৯. গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু পচিালনা ও দ্রুত উন্নয়নে আলাদা "গ্রামীণ মন্ত্রণালয়" চালু করা এবং জাতিয় বাজেটে এখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ রাখা ।
১০. গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে উচ্চ জন্মহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার ছোট রাখতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপের পাশাপাশি দেশে বাল্য বিবাহ রোধে কঠোর ও বাস্তব সন্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১১. স্থানীয় সরকার ও জাতিয় নির্বাচনে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা এবং তা বাস্তবায়নের সক্ষমতা আছে এমন পরিক্ষিত জনপ্রতিনিধিদের মনোনয়ন দেওয়া।

****

SJFBD

তৃতীয় অংশ :

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ।

অধ্যায় : ৩.১

গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন।

গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন কেন জরুরি ?

১) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ।
২) গ্রাম পর্যায়ে কঠোরভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
৩) গ্রাম পর্যায়ে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্থায়ী সমাধান।
৪) কৃষিখাতের আধুনিকায়ন।
৫) গ্রামীণ যুবশক্তির উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার।
৬) গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্রতা নির্মূল।
৭) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা।
৮) পরিকল্পিত "গ্রামীণ আবাসন" ব্যবস্থা চালু করা ।
৯) গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহনের হার বৃদ্ধি করা।
১০) গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন।

খ) গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে করনীয় সমূহ।

ক) গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন :

গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন :

৬৪ হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশ বাংলাদেশ, যার প্রায় ৮০ শতাংশই গ্রামাঞ্চল। HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬১.৩ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ১১৫.৫ মিলিয়ন (৭১.৬১%) এবং শহরে বসবাসরত ৪৫.৮ মিলিয়ন (২৮.৩৯%)। ঐ সময়ের হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৩৭.৮০ % কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসরত জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশই কৃষি নির্ভর এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বাৎসরিক জিডিপির ১৪.২৩ শতাংশ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতের অবদান।

দেশের সিংহ ভাগ আয়তন সমৃদ্ধ গ্রামের উন্নয়ন এবং গ্রামে বসবাসরত বিশাল এ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন এবং তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আগানো উচিত, কারণ গ্রামভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর এ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তই হলো গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন তথা গ্রামে বসবাসরত বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। গ্রামীন অর্থনীতি সুদৃঢ় হওয়ার অর্থই হচ্ছে গ্রামে বসবাসরত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান প্রসারিত হওয়া, কৃষি কাজের পাশাপাশি অন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকা, তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা, মাথাপিছু আয় ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়া, যাতে প্রতিটি পরিবারের কর্মক্ষম ব্যাক্তিবর্গ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োজিত হয়ে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মাঝে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, মানসন্মত বাসস্থান নির্মাণ, সুচিকিৎসা ও জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হবে, যা দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার হার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সহায়ক হবে যা একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাপকাঠি।

বিক্ষিপ্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যেভাবে সারাদেশে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অতীতের সরকারগুলো এমনকি বর্তমান সরকারও কাজ করছে, এতে আশানুরুপ উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছেনা, এটা বাস্তব। কেননা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে একদিকে যেমন সমস্যার গভীরে গিয়ে কাজ করতে হবে, অন্যদিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি, যারজন্য প্রয়োজন "গ্রামীণ অর্থনীতি" আলাদা মূল্যায়নের মাধ্যমে এর সমস্যা ও সম্ভাবনা সমূহ চিহ্নিত করনপূর্বক গ্রামীণ অর্থনীতির কাংক্ষিত উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্ধ ও বাস্তবায়ন।

SJBD

যে সমস্ত কারনে গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন প্রয়োজন, নিম্নে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো :-

১. **গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন :**

দেশের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের বেশি গ্রামে বসবাস করে, তন্মধ্যে ১২%-১৪% বসবাস করে প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে, যাদের সিংহভাগই হতদরিদ্র এবং নিম্নমানের জীবন যাপনে অভ্যস্ত। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বসবাসরত দেশের বৃহত্তর এ জনগোষ্ঠীর জীবনমানে দ্রুত পরিবর্তন আনা জরুরি, যারজন্য প্রয়োজন গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়নের মাধ্যমে এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২. **গ্রাম পর্যায়ে কঠোরভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :**

জনসংখ্যার অনাকাঙ্কিত উর্ধ্বগতি এ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের পরিবার সমূহ এরজন্য প্রধানত দায়ী। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মাঝে অশিক্ষা, অসচেতনতা, অভাব অনটন, ধর্মীয় কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে অনীহা ও অজ্ঞতা ইত্যাদি কারনে গ্রামীণ পরিবারগুলোতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ধারনা নেই বললেই চলে। গ্রাম পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রসার, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং পরিবার ছোট রাখতে কঠোর বাধ্যবাধকতা আরোপের মাধ্যমে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আগানো উচিত।

৩. **গ্রাম পর্যায়ে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্থায়ী সমাধান :**

দেশের বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলগুলোতে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে প্রতিবছর অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, সেতু, কালবার্ট নষ্ট এবং ব্যাপক শস্য হানি ও গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, যা গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটায়। ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, গ্রাম পর্যায়ে মানুষের আয় রোজগারে ভাটা পড়ে, সেখানে অভাব অনটন বৃদ্ধি পায়, যা দেশে দারিদ্রতার মাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারন।

SJIBD

গ্রাম পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীভাঙ্গন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা এবং এলক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৪. **কৃষিখাতের আধুনিকায়ন :**

এদেশের অর্থনীতি গ্রামভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর, কৃষিকে বাদ দিয়ে এদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির কোনো সুযোগ নেই। কৃষিখাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করে এখাতে জড়িত দেশের দুই তৃতীয়াংশের বেশি জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাতিত এ দেশের অর্থনীতির কাঙ্কিত বিকাশ অসম্ভব। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রসারের মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিপূর্বক সামগ্রীক অর্থনীতি গতিশীল করে তোলার অপূর্ব সুযোগ এদেশের রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশব্যাপি গ্রাম পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাত করন ব্যবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার বিকল্প নেই।

৫. গ্রামীণ যুবশক্তির উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার :

দেশের কর্মক্ষম যুবশক্তির প্রায় দুই তৃতীয়াংশের বেশি গ্রামে বসবাস করে, যারা মূলতঃ অশিক্ষিত, না হয় স্বল্প শিক্ষিত এবং অদক্ষ। গ্রাম পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসারের মাধ্যমে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত বিশাল এ যুব গোষ্ঠীকে দক্ষ যুব শক্তিতে পরিণত করে আগামির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

৬. গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্রতা নির্মূল :

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, আয় রোজগারসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠী অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যা এদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্রতা নির্মূলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মৌলিক ক্ষেত্র সমূহে দ্রুত অগ্রগতি আনার বিকল্প নেই, যার জন্য প্রয়োজন গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন।

৭. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা :

মানুষকে গ্রামমূখী করার মাধ্যমে শহরমূখী জনস্রোত ঠেকাতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নপূর্বক গ্রাম পর্যায়ে জীবনযাপনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা টেকসই সামগ্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন ব্যাতিত এ কাজ সহজ হবেনা।

৮. পরিকল্পিত "গ্রামীণ আবাসন" ব্যবস্থা চালু করা :

গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে প্রতিনিয়ত আবাদি জমি নষ্ট করে অপরিকল্পিত ঘরবাড়ি, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণের ফলে দেশে চাষযোগ্য জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, যা কৃষিসেক্টরের সংকোচন এবং আগামীতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি হিসাবে দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, বাংলাদেশে কার্যকর গ্রামীণ আবাসন নীতি চালু না থাকার ফলে গ্রাম পর্যায়ে আবাসন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং এলোমেলো আগোছালু, যা দেশের আবাসন ব্যবস্থার মানকে কুলুষিত করছে। গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়নের মাধ্যমে সারাদেশে গ্রামপর্যায়ে বসতবাড়ি নির্মাণে পরিকল্পিত আবাসন প্রক্রিয়া চালু করে কৃষি জমি রক্ষা করার পাশাপাশি গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি।

৯. গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহনের হার বৃদ্ধি করা :

উন্নত জাতি ও সমাজ গঠনে উচ্চশিক্ষার প্রভাব অপরিসীম। দেশ পরিচালনা, শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন ও অন্যান্য পেশা, গবেষণা ইত্যাদিক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য। উচ্চশিক্ষিত জাতি সারাবিশ্বে সন্মানিত ও সমাদৃত। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় আর্থিক স্বচ্ছলতা অপরিহার্য। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মাঝে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহনের হার শহরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। HIES 2016 অনুযায়ী ঐ সময়ে স্নাতক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার সারাদেশে ৫.৬৯%, গ্রামে ৪.৫৮% এবং শহরে ৯%। স্নাতকোত্তর নিবন্ধনের হার সারাদেশে ০.৯৭%, গ্রামে ০.৮৭% এবং শহরে ১.২৫%। উচ্চশিক্ষায় গ্রাম ও শহরের জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশাল এ ব্যবধানের ফলে উচ্চতর চাকরি ও অন্যান্য পেশায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন যথেষ্ঠ কম। ফলে, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকথেকে আজো অনেক পিছিয়ে রয়েছে, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির

SHBD

ক্ষেত্রে যা অনেক বড় সমস্যা। অতএব, গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়নপূর্বক গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে উচ্চশিক্ষায় সমতা আনয়ন অত্যন্ত জরুরি।

১০. **গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন :**

উন্নত দেশ গঠনের জন্য সুস্থ জাতি গঠন অপরিহার্য। দারিদ্রতা, অশিক্ষা ও অন্যান্য পরিপার্শ্বিক অবস্থার কারনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে এমনিতেই স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব রয়েছে, তারউপর দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা এবং মানসমন্নত চিকিৎসার অভাব গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক হুমকি। বাংলাদেশে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানসন্নত না হওয়ার কারনে বিভিন্ন রোগব্যাধি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গী, যা তাদের জীবনমানের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে দারিদ্রতার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার অনেক কারনের মধ্যে এটি একটি, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এ সমস্যার আশু সমাধানে গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ব্যাপক সমন্বয় ও যুগোপযোগি করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কাজেই, এদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় "গ্রামীণ অর্থনীতি" আলাদা মূল্যায়নের মাধ্যমে উপজেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন পূর্বক গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালি করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি করার বিকল্প নেই।

খ) গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে যা প্রয়োজন :

➢ **গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে যে সমস্তক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি :**

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির প্রায় ৮০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৩ শতাংশের বসবাস গ্রামে। শিল্প ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, অবকাঠামো উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহে পিছিয়ে থাকা ইত্যাদি বহুবিধ কারনে গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই জীবন জীবিকার জন্য কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে জড়িত। কাজেই, সংঙ্গত কারনেই এদেশের অর্থনীতি গ্রামভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর এবং এদেশের সামগ্রীক অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন সর্বাগ্রে

নিশ্চিত করা জরুরি। গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত হওয়ার অর্থ হচ্ছে গ্রামে বসবাসরত দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষেত্র সমূহের উন্নয়ন, যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক ক্ষেত্রসমূহের মানসন্মত উন্নয়নই গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন তথা সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব ও ব্যাপকতার তুলনায় এর উন্নয়ন ও প্রসার মোটেও ঘটেনি, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের মানসন্মত ও যুগোপযোগী উন্নয়ন না হওয়াতে বিগত সময়গুলোতে গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়েছে। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছর নাগাদ জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অবদান ১৩.৭৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, ২০০০-০১ সময়ে যা ছিল ২৫.০৩ শতাংশ । বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে ২০২০ সালে জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অবদান বাংলাদেশে ১২.৯%, ভিয়েতনামে ১৪.৯%, ভারতে ১৮.৩%, ভূটানে ১৯.২%, মিয়ানমারে ২২%, কম্বোডিয়ায় ২২.৪% এবং পাকিস্তানে ২৩.১%।

স্মারনী- ৩.১(১) : ২০২০ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অবদান।

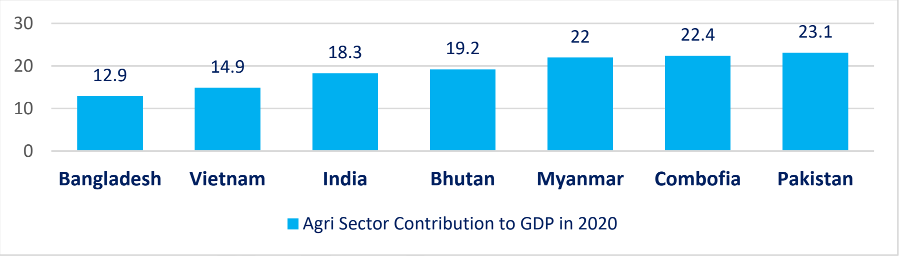

Source : World Bank Data

SJFD

যেহেতু বাংলাদেশ অদ্যাবধি শিল্প ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে ততটা অগ্রসর হতে পারেনি এবং আগামীতেও এ সম্ভাবনা যথেষ্ঠ সময় সাপেক্ষ, সেহেতু কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষি সেক্টরের প্রাধান্য থাকাটাই স্বাভাবিক, অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটছে উল্টোটাই। কাজেই, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামগ্রিক অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির মানসন্মত উন্নয়ন ও প্রসার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি, যারজন্য প্রয়োজন গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়নপূর্বক গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত ক্ষেত্র সমূহের দ্রুত ও মানসন্মত উন্নয়ন, যে ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে :

১) গ্রামীণ অর্থনীতির আলাদা মূল্যায়ন।
২) কৃষিখাতের আধুনিকায়ন।
৩) গ্রামপর্যায়ে কুঠির শিল্পের প্রসার।
৪) উপজেলা পর্যায়ে এস.এম.ই খাতের বিকেন্দ্রিকরন।
৫) গ্রামীণ আবাসন ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।
৬) উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিকরা।
৭) উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।
৮) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম চালুকরা।
৯) মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকরা।
১০) গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালনায় ”পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়” স্থাপন করা।

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি, ঐ সমস্তক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমূহ এবং পরিস্থিতি উন্নয়নে বিস্তারিত প্রস্তাবনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তুলেধরা হয়েছে।

****

অধ্যায় : ৩.২

কৃষিখাতের আধুনিকায়ন।

কৃষিখাতের আধুনিকায়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) এক নজরে দেশের কৃষি সেক্টর।

১) আবাদযোগ্য কৃষি জমি ও ইহার ব্যবহার।
২) কৃষি সেক্টরের আকার ও প্রসার।
৩) প্রধান দুটি খাদ্য শস্য উৎপাদন।
৪) পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন।
৫) মৎস উৎপাদন।
৬) মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন।
৭) কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা।
৮) কৃষি উৎপাদনশীলতা।
৯) জি.ডি.পি তে কৃষি খাতের অবদান।
১০) আবাদযোগ্য কৃষি জমি ও ইহার ব্যবহার।

খ) কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ।

গ) কৃষি খাতের উন্নয়ন ও প্রসারে করনীয় সমূহ।

১) কৃষি খাতের আধুনিকায়ন।
২) কৃষি উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা।
৩) দেশব্যাপি টেকসই কৃষি অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক এ খাতকে সম্ভাবনাময় করে তোলা।
৪) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচলন।
৫) কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধিকরন।
৬) কৃষিখাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা।
৭) দেশে অর্গানিক চাষাবাদের প্রসার ঘটানো।
৮) উচ্চ ফলনশীলতা নিশ্চিতকল্পে উন্নত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার।
৯) কৃষির বহুমূখী করন।
১০) খামার ব্যবস্থায় বানিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার।
১১) কৃষিজমি রক্ষা এবং দুই ও তিন ফসলি চাষের মাত্রা বৃদ্ধি করা।
১২) গ্রীণহাউজ পদ্বতিতে ভার্টিক্যাল ফার্মিং এর প্রসার ঘটানো
১৩) পশু খামার ও পোল্ট্রি শিল্প বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনা।

ঘ) কৃষিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবন।

কৃষিখাতের আধুনিকায়ন :

কৃষিখাতের আধুনিকায়ন :

কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী দেশে কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবার ৩৫.৫৩ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ২৯.৬২ মিলিয়ন (৮৩.৩৭%) এবং শহরে বসবাসরত ৫.৯১ মিলিয়ন (১৬.৬৩%) পরিবার। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করার মাধ্যমে গ্রামে বসবাসরত ও কৃষিখাতের সাথে সম্পৃক্ত দেশের দুই তৃতীয়াংশের বেশি জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত পূর্বক সামগ্রীক অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে এ বাস্তবতা মাথায় রেখে সামনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিৎ। কেননা, গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করার প্রথম শর্তই হলো কৃষি খাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে এখাতকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও লাভজনক খাতে পরিনত করা। এজন্য সারাদেশে শক্তিশালি কৃষি অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক চাষাবাদ ও বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দেশে "কৃষি বিপ্লবের" সূচনা করা, যাতে কৃষিখাতে যুক্ত দেশের বৃহত্তর এ জনগোষ্ঠীর জীবন মানে আমূল পরিবর্তন ও অগ্রগতির পথ প্রশারিত হয়, যা দেশের সার্বিক অর্থনীতি টেকসই ও মজবুত করার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি, কৃষির বানিজ্যিকীকরনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এদেশের কৃষি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টির জন্য সরকারি উদ্যোগ জরুরি। এদেশের উর্বর মাটি ও অনুকূল আবহাওয়া, স্বল্প পরিশ্রম ও কম খরছে অধিকতর উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করে, যা দেশের কৃষিখাতের উজ্জ্বল সম্ভবনার অন্যতম নিদর্শন। তাছাড়া এদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য স্বাদে ও গুণগতমানে অনন্য, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাল অবস্থান তৈরী করার ক্ষেত্রে অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে।

আশার কথা এই যে বর্তমান সরকার এ বাস্তবতা উপলব্দি করতে পেরেছেন এবং বিগত বছরগুলোতে কৃষিখাতের উন্নয়নে কিছু কিছু বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন, ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বহুমুখী চাষাবাদের সূচনা হয়েছে, শাক সবজি, মাছ মাংশ ইত্যাদি উৎপাদনে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অগ্রগতি অসাধারণ বলা চলে। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের ৩১তম বড় অর্থনীতির দেশ। ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, সব ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদনে ১১তম, ফল উৎপাদনে ২৮তম, আম উৎপাদনে সপ্তম, চা উৎপাদনে দশম, প্রাকৃতিক উৎসের মাছ উৎপাদনে তৃতীয় এবং ইলিশ উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে।

কৃষিখাতে বাংলাদেশের এ অভাবনীয় সাফল্য ধরে রাখতে এবং আগামী দিনগুলোতে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরনে এবং এখাতের সাথে সম্পৃক্ত দেশের দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল করে তুলতে কৃষিখাতের দ্রুত প্রসার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। **দেশের কৃষিখাতের বর্তমান অবস্থা, যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্য উৎপাদনের সামঞ্জস্যহীনতা, কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা, জি.ডি.পি তে কৃষিখাতের অবদান এবং কৃষিখাতের দ্রুত উন্নয়নে করনীয় সম্পর্কে নিন্মে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।**

SJHBD

ক) এক নজরে দেশের কৃষি সেক্টর (অর্থবছর ২০১৭-১৮) :

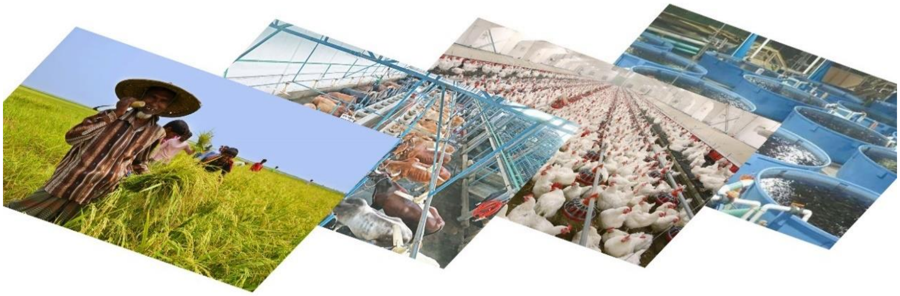

কৃষি জমি ও অন্যান্য তথ্য :

১) আবাদযোগ্য কৃষি জমি ও ইহার ব্যবহার :

ক) কৃষি পরিবার ও জমিসংক্রান্ত তথ্য :

SL	Particulars	Amount
1	No. of Agri. Households	16.56 Million
2	Total Cultivable Land	210,16,968
3	Total Cropped Area	385,36,000
4	Net Cropped Area	197,74,000
5	Single Cropped Area	55,14,000
6	Double Cropped Area	98,00,000
7	Triple Cropped Area	44,18,000
8	Total Irrigated Area	137,34,000
9	Cropping Intensity	190%
10	Agriculture Sector Contribution to GDP	14.23%

Source: BBS

খ) চাষাবাদে আবাদযোগ্য জমির ব্যবহার :

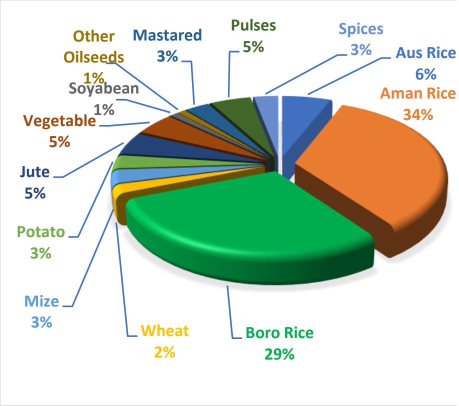

Source: GAIN Report 2019

কৃষি সেক্টরের আকার ও প্রসার :

২) কৃষি সেক্টরের আকার ও প্রসার :

বিগত এক দশকে দেশের কৃষিখাতের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যদিও জি.ডি.পিতে কৃষিখাতের অবদান ক্রমাগতভাবেই কমছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশের কৃষিখাতের সামগ্রিক আকার ছিল টাকা ১,২৫৪.৬৯ বিলিয়ন, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে টাকা ২,৬৫১.৮২ বিলিয়ন । এ সময়কালে কৃষিখাতের আকার বেড়েছে বছরে গড়ে টাকা ১৩৯.৭১ বিলিয়ন (১০%)। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে কৃষিখাতের অংশ ১৩.৩৫% স্মারণী- ৩.২(১)।

স্মারণী- ৩.২(১): বিগত এক দশকে দেশের কৃষি সেক্টরের আকার ও প্রসারের চিত্র :-

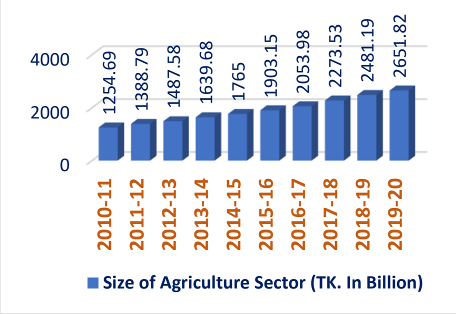

Source: MOF

(৩) প্রধান দুটি খাদ্য শস্য উৎপাদন :

দেশে পতিবছর গড়ে প্রায় ২ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেকটা একই অবস্থানে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমান বিশ্লেষণে দেখা যায় দীর্ঘ সময় ধরে দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় একই পর্যায়ে রয়ে গেছে, এতে বর্তমান খাদ্য চাহিদা পূরণ হলেও ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে বাড়তি খাদ্য উৎপাদন ব্যাতিত ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে এটা নিশ্চিত।

প্রধান দুটি খাদ্য শস্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা :

২০১০-১১ অর্থবছরে প্রধান দুটি খাদ্য শস্যের (ধান ও গম) উৎপাদন ৩৪৫.১৩ বিলিয়ন মে.টন, এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫৭.৩৪ বিলিয়ন মে.টন।

এ সময়কালে সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৭৪.৩২ বিলিয়ন মে.টন। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ এ নয় বছর সময়কালে তিনটি অর্থবছরে (২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৭-১৮) খাদ্য উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও অন্যান্য বছরগুলোতে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় কাছাকাছি ছিল। স্মারণী- ৩.২(২)

স্মারণী- ৩.২(২): ২০১০-২০১৮ সময়কালে প্রধান দুটি খাদ্য শস্য উৎপাদনের চিত্র (বিলিয়ন মে.টন) :-

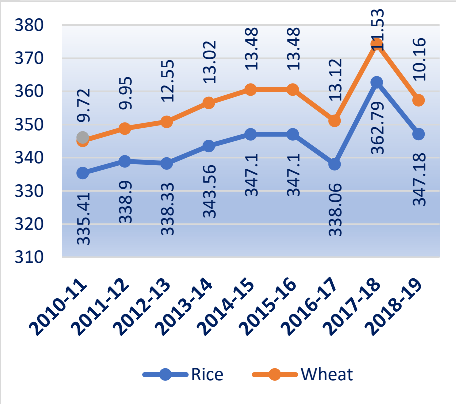

Source : BBS and MOF

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিখাতের প্রসার, উৎপাদনশীলতা এবং সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি, অন্যথায় আভ্যন্তরীন চাহিদা পূরনে দেশ আমদানি নির্ভর হয়ে পড়তে বাধ্য, যা দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে।

৪) পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন :

পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন :

প্রাণীজ প্রেটিন ঘাটতি পূরণে দেশে জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গবাদি পশু ও পোল্ট্রি উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে দেশে পোল্ট্রি ও গবাদি পশু উৎপাদনের মাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও জি.ডি.পিতে পশুপালন সাব-সেক্টরের অবদান এখনো যথেষ্ঠ রকম কম। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৭৮৮ লাখ ও ৫১৭ লাখ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩,৫৩২ লাখ ও ৫৫৮ লাখ। এ সময়কালে পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ২.৭০% এবং গবাদি পশু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ০.৯৭%। পোল্ট্রির তুলনায়

স্মারণী- ৩.২(৩): অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে পোল্ট্রি ও গবাদি পশু উৎপাদনের চিত্র :-

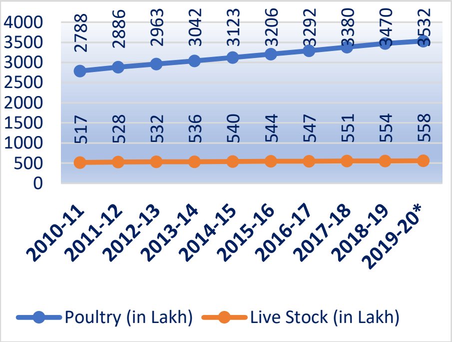

Source: BD Economic review *Projected

মৎস উৎপাদন :

গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম স্মারণী- ৩.২(৩)। ফলে মাংশের দাম ক্রমেই সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, যা দেশে প্রাণীজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থার উত্তোরণে দেশে গবাদিপশু উৎপাদন পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

৫) মৎস উৎপাদন :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০১৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় এবং জলজ উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০.৬২ লাখ মে.টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৪৪.৮৫ লাখ মে.টন। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ১.৪২ লাখ মে.টন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত বিষয় হলো দেশে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস আহরণ বৃদ্ধি পেলেও সামুদ্রিক মৎস আহরণ মোটেও বৃদ্ধি পায়নি, যেদিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মারণী- ৩.২(৪)

স্মারণী- ৩.২(৪) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে সবধরনের মৎস উৎপাদনের চিত্র (লাখ মে.টন) :-

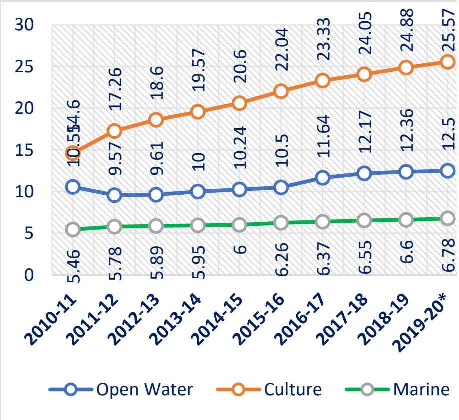

Source: BD Economic review *Projected

মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন :

৬) মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন :

বিগত বছরগুলোতে দেশে প্রাণীজ প্রোটিন, যেমন-মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ দেশে মাথাপিছু মাংশ, দুধ ও ডিম গ্রহনের মাত্রা দাঁড়িয়েছে মাংশ দিনে ১২৪.৯৯ গ্রাম, দুধ দিনে ১৬৫.০৭ গ্রাম এবং ডিম বছরে ১০৩.৮৯টি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাংশ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২.৬৪ লক্ষ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ যা দাঁড়িয়েছে ৭৫.১৪ লক্ষ মে.টন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দুধ ও ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩.৬৫ লক্ষ মে.টন এবং ৫৭,৪০৪ লাখ, ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৯.২৩ লক্ষ মে.টন এবং ১৭১,১০০ লাখে স্মারণী- ৩.২(৫)। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা পূরনে উৎপাদনের এ ধারা ভবিষ্যতে আরোও বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

স্মারণী- ৩.২(৫): অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদনের চিত্র :-

Items	Financial Year								
	2009-10	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Meat (Lakh M.Tons)	12.64	23.32	36.20	45.20	58.62	61.52	71.54	72.60	75.14
Milk (Lakh M.Tons)	23.65	34.63	50.67	60.90	69.69	72.75	92.83	94.06	99.23
Eggs (Lakh)	57,424	73,038	76,173	101,680	109,952	119,124	149,331	155,200	171,100

Source: BD Economic Review

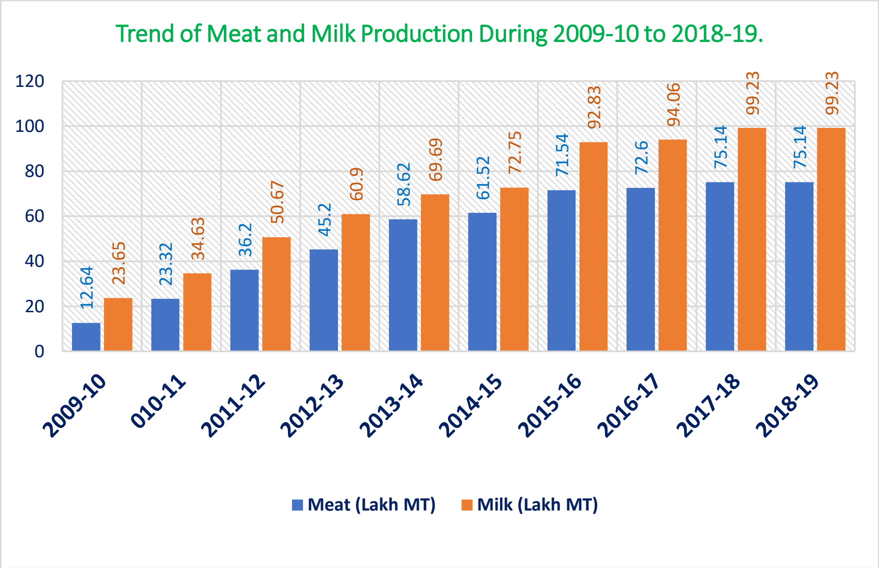

কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা :

(৭) কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা :

দেশের কৃষিখাতের প্রসার বিগত চার যুগ ধরে প্রায় একই অবস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে, ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারনে উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও সামগ্রিক কৃষিখাত প্রসারিত না হওয়ার কারনে দেশের জি.ডি.পি তে কৃষিখাতের অবদান বরাবরই একই অবস্থানে রয়ে গেছে। ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৩১% এবং সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এসে এখাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৫১%। স্মারণী- ৩.২(৬)

কৃষিখাতের ব্যাপক আধুনিকায়ন ও বহুমূখী কৃষি ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে কৃষিখাতের পর্যাপ্ত প্রসার এবং এখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা ব্যতিত এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের উপায় আছে বলে মনে হয়না।

স্মারণী- ৩.২(৬) : ১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির চিত্র (%) :-

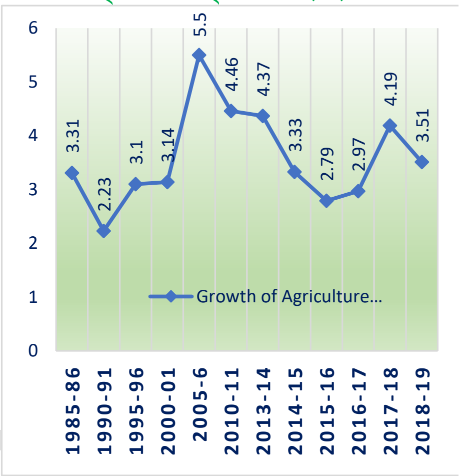

Source : Ministry of Finance, 2019

SJBD

কৃষি উৎপাদনশীলতা :

(৮) কৃষি উৎপাদনশীলতা :

১৯৯০-৯১ অর্থ বছরের পরথেকে দেশের কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের পর থেকে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা যথেষ্ঠ উৎকর্ষতা পেয়েছে, যা এখাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ১৯৮০-৮১ সময়ে দেশে কৃষি উৎপাদশীলতার (Cropping Intensity) হার ছিল ১৫৩.৭৪%, ২০১৫-১৬ সময়কালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ১৯০% স্মারণী- ৩.২(৭)।

সামনের দিনগুলোতে কৃষিখাতে উৎপানশীলতার এ ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কৃষিখাতের প্রসার ও আধুনিকানের মাধ্যমে দেশে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

স্মারণী- ৩.২(৭): ১৯৮০-৮১ থেকে ২০১৫-১৬ সময়কালে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতার চিত্র :-

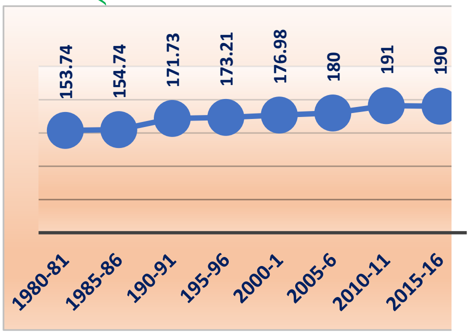

Source : BBS 2016

জি.ডি.পি তে কৃষি খাতের অবদান :

(৯) জি.ডি.পি তে কৃষি খাতের অবদান :

একটি কৃষি প্রধান দেশের জি.ডি.পি তে কৃষিখাতের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন ঐ খাতের আকার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঐ সেক্টরে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ, যে দেশের ৭৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী কৃষি ও কৃষি সংশিষ্ট খাতে জড়িত এবং কৃষিই এদেশের প্রধান খাত হওয়া সত্বেও দেশের জি.ডি.পি তে এখাতের অবদান মোটেও উল্ল্যেখযোগ্য নয় এবং উদ্বেগের বিষয় হলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জি.ডি.পিতে কৃষিখাতের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। অর্থবছর ২০০০-০১ সময়কালে জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অবদান ছিল ২৫.০৩%, অর্থবছর ২০১৮-১৯ সময়কালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ১৩.৬০%। স্মারণী- ৩.২(৮) এই আঠারো বছরের ব্যবধানে জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অবদান প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে, যা খুবই উদ্বেগজনক।

স্মারণী- ৩.২(৮) : ২০০০-২০১৮ সময়কালে জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অবদান (%) :-

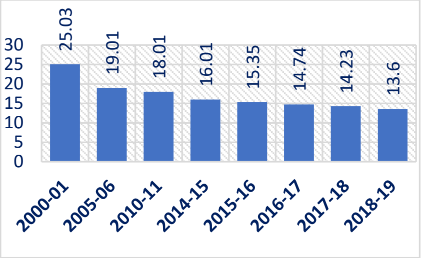

Source: BD Economic Review

SSBD

স্মারণী- ৩.২(৯): অর্থবছর ২০০০-০১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পিতে প্রধান তিনটি সেক্টরের অবদানের চিত্র (%) :-

Sector	Financial Year								
	2000-01	2005-06	2010-11	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Agriculture	25.03	19.01	18.01	16.50	16.01	15.35	14.74	14.23	13.60
Industry	26.20	25.40	27.38	29.55	30.42	31.54	32.42	33.66	35.14
Service	48.77	55.59	54.61	53.15	53.58	53.12	52.85	52.11	51.26

Source : Bangladesh Economic Review 2019 (MOF)

জি.ডি.পিতে কৃষির অবদানের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

১০) জি.ডি.পিতে কৃষির অবদানের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বিগত সময়গুলোতে দেশের কৃষি সেক্টর পর্যাপ্ত প্রসারিত ও আধুনিকীকরণ না হওয়ার কারনে এখাতে উৎপাদনশীলতা ও উৎকর্ষতা কোনোটাই পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পায়নি। ফলে বিগত বছরগুলোতে জি.ডি.পিতে কৃষিখাতের অবদান ক্রমাগতভাবে কমে আসছে। জি,ডি.পিতে কৃষিখাতের অবদানের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলায় যথেষ্ঠ পিছিয়ে পড়েছে। ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী জি.ডি.পিতে কৃষিসেক্টরের অবদান বাংলাদেশে ১৩%, ভারতে ১৪%, ভূটানে ১৭%, কম্বোডিয়ায় ২২%, পাকিস্তানে ২৩%, নেপালে ২৫% এবং মিয়ানমারে ২৫%। স্মারণী- ৩.২(১০)

স্মারণী- ৩.২(১০) : ২০১৮ সালে দক্ষিন এশিয়ার কয়েকটি দেশের জি.ডি.পি তে কৃষিখাতের অংশ :-

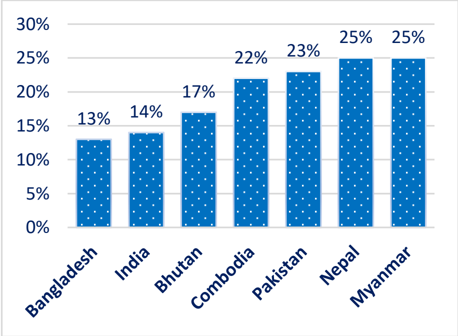

Source : World Bank

খ) কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

বাংলাদেশের কৃষিখাত যথেষ্ঠ সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে দেশের কৃষিখাতের আকার ও প্রসার মোটেও সন্তোষজনক ছিলনা, ফলে জি.ডি.পিতে কৃষি সেক্টরের অবদান ক্রমাগতভাবেই কমছে। কৃষিনির্ভর এদেশের দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা যেখানে কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট খাতের উপর নির্ভরশীল, কৃষিসেক্টরের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এ সেক্টরে নিয়োজিত বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নপূর্বক দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কৌশল অবলম্বন করা ব্যাতিত অন্য কোনো পন্থায় এদেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে হয়না। কেননা, কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি পূরণ এবং শিল্পোন্নয়ন এই তিনটি বিষয় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। কাজেই, দেশের কৃষি সেক্টরে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করনপূর্বক ঐ সমস্ত সমস্যার বাস্তবসন্মত সমাধানের মাধ্যমে এখাতকে টেকসই ও লাভজনক শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাই আগামী দিনগুলোতে সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। দেশের কৃষিসেক্টরের কাঙ্খিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্ল্যেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা সমূহের কয়েকটি নিন্মে তুলেধরা হলো :-

কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

১) **কৃষি জমি হ্রাস পাওয়া :** এমনিতেই ছোট দেশ, তারউপর সারাদেশে প্রতিনিয়ত অপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে উঠা ঘরবাড়ী, শিল্প কারখানা স্থাপন ও নদী ভাঙ্গনের ফলে আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমাগতভাবেই কমছে, যা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পক্ষে বড় ধরনের হুমকি হিসাবে দেখা দেবে।

২) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বন্যা, জলাবদ্ধতা, সাইক্লোন, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে প্রতিবছর ব্যাপক ফসলহানি, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো নষ্ট হওয়ার ফলে গ্রাম পর্যায়ে কৃষকদের জীবনমানে বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা এদেশের কৃষি সেক্টর উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

৩) **অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ :** অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে জমির উর্বরাশক্তি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, যা এখাতে উৎপাদনশীলতার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৪) **শিক্ষার অভাব :** কৃষকদের মাঝে শিক্ষার অভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ রপ্ত করতে না পারার ফলে বহুমূখী উৎপাদন ও ফলনশীলতার দিকথেকে এদেশের কৃষি সেক্টর অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

৫) **আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কম হওয়া :** কৃষিকাজে অন্যান্য দেশের মত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না হওয়ার ফলে কৃষিকাজ কঠিন ও কৃষি অলাভজনক সেক্টরে পরিণত হয়েছে।

৬) **উন্নত বীজের অপর্যাপ্ততা :** সরকারি, বেসরকারি ও কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন ও বণ্টন অপর্যাপ্ত হওয়ার কারনে চাষাবাদ মৌসুমে বীজ সংকট এদেশের নৈমত্তিক ঘটনা, যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিরক্ষেত্রে বড় আকারের বাধা।

৭) **কৃষিপণ্য সংরক্ষনের সমস্যা :** গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কৃষিপণ্য সংরক্ষনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলে কৃষকেরা উৎপাদিত ফসল ভরা মৌসুমে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং অনেকক্ষেত্রে প্রচুর মৌসুমী সব্জি ও ফলমুল ক্রেতার অভাবে পঁচে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হন।

৮) **কৃষিখাতে শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস :** কৃষি শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্পকারখানায় নিয়োজিত ও বিদেশ গামীতার ফলে কৃষিখাতে শ্রমিক সংকট এবং মজুরি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা কৃষিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

৯) **কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে অপর্যাপ্ত বরাদ্ধ :** কৃষিখাতের উন্নয়নে টেকসই কৃষি অবকাঠামো, যেমন- আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, গ্রাম পর্যায়ে হাট বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, গ্রামীণ রাস্তাঘাট ইত্যাদিক্ষেত্রে মানসন্মত উন্নয়ন অপরিহার্য, যা এদেশে আজো অনুপস্থিত। কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করা জরুরি।

১০) **অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সমূহ :**

- মধ্যস্বত্বভোগিদের দৌরাত্বের কারনে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া।
- গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পর্যাপ্ত হাটবাজারের ব্যবস্থা না থাকা।
- গ্রাম পর্যায়ে রাস্তাঘাট অনুন্নত হওয়ার ফলে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করনে অসুবিধা।
- কৃষকদের মাঝে পর্যাপ্ত কৃষিবিষয়ক জ্ঞানের অভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পাওয়া।
- খামার ব্যবস্থা প্রসার লাভ না করার ফলে ব্যাক্তি পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে চাষাবাদের ফলে কৃষি লাভজনক না হওয়া।
- কৃষি ঋণের উচ্চ সুদ এবং কৃষিঋণ সহজলভ্য না হওয়া।
- কৃষিসেক্টরে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়া।
- কৃষিকে লাভজনক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে অপর্যাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠপোশকতা।
- কৃষিখাতের উন্নয়নে জাতিয় বাজেটে অপর্যাপ্ত বরাদ্ধ রাখা ; এবং
- শিল্পায়নের দিকে অতিমাত্রায় ঝুকে পড়ার কারনে কৃষিখাতের উন্নয়নে যথেষ্ঠ মনোনিবেশ না করা।

SIFBD

গ) কৃষিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে করনীয় সমূহ :-

(১) কৃষি খাতের আধুনিকায়ন :

সীমিত চাষাবাদযোগ্য জমিতে ক্রমবর্ধমান বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরনের জন্য কৃষিখাতের প্রসার ও উৎপানশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য শস্য, তরিতরকারি, ফলমূল, মাছ, মাংশ, দুধ, ডিম এবং মসলা জাতিয় পণ্য, যেমন-পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিছ, হলুদ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন অপরিহার্য, অন্যথায় আমদানির মাধ্যমে এ চাহিদা পূরন করা ব্যাতিত বিকল্প নেই। একটি কৃষিপ্রধান দেশে কাড়ি কাড়ি বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে কৃষিপণ্য আমদানি কতটুকু বেমানান, তা ভাববার সময় হয়েছে বৈকি।

দেশে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে সীমিত সম্পদে স্বল্প খরচে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে পরিত্রানের একমাত্র বিকল্প। অবশ্য সরকার ইতিমধ্যে এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করতে পেরেছেন এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক চাষাবাদের সূচনা হয়েছে এবং কৃষিখাতের অগ্রগতি এরিমধ্যে জনসন্মুখে আসতে শুরু করেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে "কৃষির আধুনিকায়ন বলতে কি বুঝায়" ? Modernization of agriculture is a process of transforming agriculture from traditional labour-based agriculture to technology-based agriculture. It is one of the fundamental issues in agricultural policies, particularly in countries, where agriculture is less developed. On the other hand, Modern farming refers to the industrialized production of livestock, poultry, fish, and crops, which are grown without pesticides or fertilizers, ensuring that the consumer will not suffer adverse health effects from them. (সংকলিত)

এক কথায় গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থা থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে রুপান্তই হচ্ছে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকিকরন, যা কৃষিখাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প খরছে নিদিষ্ট জমিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলন নিশ্চিত করে। অন্যদিকে আধুনিক চাষাবাদ হচ্ছে শস্যোৎপাদন, হাঁস মুরগি, গরু, ছাগল, মাছ, মাংশ ইত্যাদির স্বাস্থ্যসন্মত ও শিল্পভিত্তিক উৎপাদন।

কৃষি খাতের আধুনিকায়ন :

SIPBD

আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ পদ্ধতির অন্যতম সুবিধাবলি :-

১. আধুনিক চাষাবাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষনার কারণে কৃষিখাতে বিশ্বমানের অগ্রগতি সাধিত হয়।
২. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে কৃষিখাত একটি আকর্ষনীয় ও লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়।
৩. আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।
৪. কৃষিখাতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা, কর্মসম্পাদন ক্ষমতা এবং কৃষকপ্রতি সম্পাদিত কর্মের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।
৫. জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, ফলে ইউনিট প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
৬. এ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ বহুলাংশে হ্রাস পায়, ফলে ফসল উৎপাদন লাভজনক হয়।
৭. আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের ক্ষেত্রে জমি চাষ, সেচ ও কৃষি পণ্য পরিবহনে গবাদি পশুর পরিবর্তে উন্নত মেকানিজম ব্যবহৃত হয়, ফলে এসমস্ত ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে বেশি কার্য সম্পাদিত হয়।
৮. আধুনিক চাষাবদের ফলে কৃষক সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।
৯. আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা কৃষি বানিজ্যিকীকরনের ক্ষেত্র ত্বরান্বিত করে।
১০. এর ফলে শ্রমিক স্বল্পতার সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি কৃষিখাতের অতিরিক্ত শ্রমিক অন্য সেক্টরে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ থাকে।
১১. এ পদ্ধতিতে জমির যথাযথ ব্যবহারের ফলে স্বল্প জমিতে অধিক ও একাধিকবার ফসল উৎপাদন সম্ভবপর হয়।
১২. এ পদ্ধতির ফলে কৃষি খামারগুলো অধিকতর লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে।

কৃষি আধুনিকায়নের উপরোক্ত সুবিধাবলি ছাড়াও দেশে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন, জৈবসার উৎপাদন, বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসা বানিজ্যের বহুবিধ সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, পাশাপাশি কৃষির বানিজ্যিকীকরননের মাধ্যমে কৃষিপণ্য রপ্তানির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। উদাহরনস্বরুপ, নেদারল্যান্ডস্ ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষিখাতে উচ্চপ্রবৃদ্ধির ফলনের ফলে (High Volume Production) সেদেশের বাৎসরিক কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৭৯ বিলিয়ন ইউ. এস. ডলার। আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রাজিল এবং বিশ্বের আরোও অনেক দেশ আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে কৃষিখাতে উচ্চপ্রবৃদ্ধির ফলনের মাধ্যমে প্রচুর কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

SIFBD

২) কৃষি উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা :

দেশে কৃষি খাতের দ্রুত প্রসার, মানসন্মত উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করন, ফসলের রোগ বালাই প্রতিরোধ এবং আবহাওয়া উপযোগি ফসলের চাষ বৃদ্ধি করতে কৃষিখাতের উন্নয়নে গবেষণালব্দ ফলাফল কাজে লাগিয়ে এখাতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন, যা আধুনিক চাষাবাদের কার্যকারিতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। তাছাড়া কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষি সমৃদ্ধ দেশ সমূহের সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এবিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় এ খাতের সম্ভাবনা আরোও অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলবে।

কৃষি উনয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা :

যদিও বর্তমান সরকারের আমলে কৃষি গবেষণায় যথেষ্ঠ অগ্রগতি লক্ষ্যনীয়, তথাপি কৃষিখাতের ব্যাপক প্রসার ও কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে এখাতকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে এখাতে গবেষণা কার্যক্রম বহুগুণ জোরদার করতে হবে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষনের সুযোগ নেই। বর্তমানে জাতীয় বাজেটে গবেষণাখাতে উল্ল্যেখযোগ্য বরাদ্ধ থাকেনা বললেই চলে। কৃষিখাতের প্রসার ও দ্রুত উন্নয়নে এখাতে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে জাতিয় বাজেটে উল্ল্যেখযোগ্য বরাদ্ধ রাখা প্রয়োজন, যা অন্যান্য দেশের রয়েছে। উদাহরনস্বরুপ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে গবেষণা ব্যয় ভারতে ০.৮৫%, মালয়েশিয়ায় ১.৩%, চীনে ২.১৯%, সিংগাপুরে ২.১৯%, তাইওয়ানে ৩.১%, জাপানে ৩.১৫% এবং দ. কোরিয়ায় ৪.২৯%। স্মারণী-৩.২(১১)

SJHBD

কৃষিখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা জরুরি : -

- কৃষিখাতের আকার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন।
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য উৎপাদনে অর্গানিক চাষাবাদের দ্রুত বিস্তারে স্বল্প খরচে প্রাকৃতিক ও জৈব সার উৎপাদন পদ্ধতি আবিস্কার।
- প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষি রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিস্কার।
- দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় টিকে থেকে উচ্চ ফলন দিতে সক্ষম এমন ফসল উদ্ভাবন।
- কৃষিখাতের বহুমূখী করন, বানিজ্যিক কৃষির প্রসার ও উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষিকে লাভজনক শিল্পে পরিণত করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন।
- উচ্চ খাদ্যগুণ সম্পন্ন ফষল উদ্ভাবন।

স্মারণী-৩.২(১১) : ২০১৬ - ২০১৭ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের গবেষণা খাতে ব্যয়ের পরিমান :-

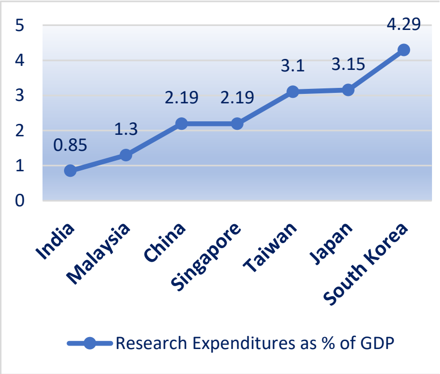

Source : Wikipidia

৩) দেশব্যাপি টেকসই কৃষি অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক এ খাতকে সম্ভাবনাময় করে তোলা :

কৃষিখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে সারাদেশে উন্নত কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ অন্যতম পূর্বশর্ত। যেমন- সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি নিষ্কাসনে খাল ও নদী খনন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত হাট বাজার ও বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন, মৌসুমি ফসল সংরক্ষনের জন্য উপজেলা পর্যায়ে হিমাগার স্থাপন এবং কৃষি ব্যবস্থা সহজিকরনের সাথে সম্পৃক্ত আর যা কিছু সবই কৃষি অবকাঠামোর মধ্যে পড়ে।

মজবুত কৃষি অবকাঠামো নির্মাণে যে সমস্তক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন :-

- বড় বিল গুলোতে পর্যাপ্ত সেচ প্রকল্প স্থাপনের পাশাপাশি সারাদেশে আধুনিক সেচ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত হাট বাজার স্থাপন।
- পানি নিষ্কাসনে খাল ও নদী খনন।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ সংরক্ষণ এবং মৌসুমে সুষ্ঠু বিতরনের জন্য প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন।
- পঁচনশীল শস্য ও ফলমূল দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষনের জন্য প্রতি উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চাহিদামত হিমাগার স্থাপন।
- কৃষি অবকাঠামো নির্মাণে জাতিয় বাজেটে বরাদ্ধ পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা।

দেশব্যাপি টেকসই কৃষি অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক এ খাতকে সম্ভাবনাময় করে তোলা :

SJFBD

ক) সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন :

শুস্ক মৌসুমে দেশের চাষাবাদ পুরোপুরি সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। যত বেশি পরিমান জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা যাবে, শুষ্ক মৌসুমে তত বেশি জমি চাষাবাদ হবে, দেশে খাদ্য উৎপাদন তত বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এযাবত যে পরিমান জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে তার প্রায় অর্ধেকাংশের বেশি স্যালো টিউবওয়েলের আওতায় এবং অবশিষ্টাংশ এল. এল.পি ও ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচের আওতায় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক চাষাবাদে আধুনিক ও উন্নত সেচ ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান শর্ত। বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থা অনেকটা গতানুগতিক, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রচলন এখানে একেবারেই সীমিত।

সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন :

অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই দশ বছর সময়কালে সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ খুব সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে নীট চাষযোগ্য ৭৮.৩৮ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমান ছিল ৫২.৬৩ লক্ষ হেক্টর, যার মধ্যে এল. এল. পি ও ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে ১৭.৫৮ লক্ষ হেক্টর এবং স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে ৩৫.০৫ লক্ষ হেক্টর।

কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা :

২০১৯-২০ অর্থ বছরে নীট চাষযোগ্য ৮০.০৫ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমান ছিল ৫৫.৯৮ লক্ষ হেক্টর, যারমধ্যে এল. এল. পি ১২.৫০ লক্ষ হেক্টর, ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে ১০.৮০ লক্ষ হেক্টর এবং স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে ৩২.৬৮ লক্ষ হেক্টর। এ দশ বছর সময়কালে দেশে সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৩৫ লক্ষ হেক্টর মাত্র স্মারণী-৩.২(১২)।

কৃষিখাতের প্রসার ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করতে দেশব্যাপি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন বৃদ্ধিকল্পে সারাদেশে মজবুত সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চাষযোগ্য সকল জমি আধুনিক সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা প্রয়োজন। অন্যথায় এখাতের উন্নয়নে মাঝপথে হোছট খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

স্মারণী-৩.২(১২): অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে আবাদি ও সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর) :-

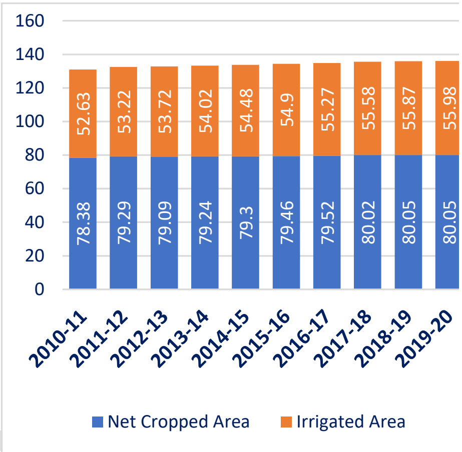

স্মারণী-৩.২(১৩): অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে আবাদি জমি ও সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ :-

(Area in Lakh Hectare)

Irrigation Method	Financial Year									
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Net Cropped Area	**78.38**	**79.29**	**79.09**	**79.24**	**79.30**	**79.46**	**79.52**	**80.02**	**80.05**	**80.05**
Area under Irrigation	**52.63**	**53.22**	**53.72**	**54.02**	**54.48**	**54.90**	**55.27**	**55.58**	**55.87**	**55.98**
a) LLP & Others	10.39	11.45	11.96	12.46	12.51	13.42	13.85	15.13	12.48	12.50
b) Deep Tube well	7.19	7.59	9.34	8.78	9.62	11.94	10.63	10.73	10.76	10.80
c) Shallow Tube well	35.05	34.18	32.48	32.79	32.35	29.54	30.79	29.82	32.63	32.68

Source: BD Economic Review

খ) কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা :

সারাদেশে উন্নত কৃষি অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজন কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে এ খাতের উন্নয়নে জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ রাখা। প্রয়োজনে অনুৎপাদনশীল খাতে আপাতত বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ কমিয়ে বা বন্ধ রেখে কৃষিখাতের উন্নয়নে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধ দিয়ে এখাতের আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত করা জরুরি, কেননা কৃষিখাতে বর্তমান বরাদ্ধ বিশাল এখাতের আধুনিকায়নের পক্ষে মোটেও পর্যাপ্ত নয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে কৃষিখাতে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় ছিল টাকা ১,৬২৭.৭৪ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে টাকা ৬,৫৩৮.২০ কোটি। এ সময়কালে কৃষিখাতে

স্মারণী-৩.২(১৪): বিগত এক দশকে কৃষিখাতে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের চিত্র :-

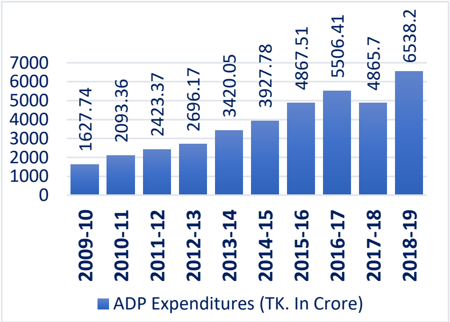

Source: BD Economic Review

বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে বছরে ১৮.৮৯%। স্মারণী-৩.২(১৪)

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচলন :

৪) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচলন :

এ যুগের সেরা আকর্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্বতিতে চাষাবাদ। গবেষণালব্দ ফলাফল কাজে লাগিয়ে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে শস্য, ফলমূল ও শাকশব্জি চাষ, হাঁস মুরগি ও গবাদিপশু চাষ, মাছ চাষ এবং বনায়ন ইত্যাদিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন দেশ কৃষিখাতে অসাধারন সাফল্য অর্জন করেছে এবং করছে। গবেষনায় পরিক্ষিত ফলাফলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ হয় বিধায় এ পদ্ধতির চাষাবাদে রোগ বালাইয়ে ফসল হানির শংকা কম থাকে, উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম এবং উচ্চ ফলনের নিশ্চয়তা থাকে বিধায় বিশ্বব্যাপি বৈজ্ঞানিক পদ্বতির চাষাবাদ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আশার বিষয় হচ্ছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশেও ব্যাক্তি উদ্যোগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের উদাহরন এরিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। পরিক্ষিত এ চাষাবাদ পদ্ধতি সারাদেশে দ্রুত প্রসার ও জনপ্রিয় করে তুলতে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

- গবেষণালব্দ ফলাফলের ভিত্তিতে দেশে কৃষি আবাদ, মৎস ও জলজ প্রাণীর চাষ এবং হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশু পালন প্রবণতা বৃদ্ধি করন।
- বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরজ্ঞাম আমদানি ও উৎপাদনের উপর বিশেষ ছাড়।
- বৈজ্ঞানিক পদ্বতিতে কৃষি রোগ বালাই প্রতিরোধ।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে মাঠ পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দান এবং তদারকি করন।
- এলক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে কৃষিঋণ ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করা।

৫) কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধিকরন :

কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষি কাজকে যেমন অনেক সহজ করে তোলে, তেমনি স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে যে কোনো বড় পরিসরে বড় ভলিয়মের কাজ সম্পাদনের জন্য এ যন্ত্রপাতির ব্যবহার অধিক লাভজনক হিসাবে স্বীকৃত এবং কৃষিখাতে বৈচিত্রতা আনার ক্ষেত্রেও এর জুড়ি নেই। উন্নত দেশগুলোতে জমি চাষ, ছারা রোপন, জমি নিংড়ানো, ফসল কাটা, হাঁস মুরগি ও প্রাণী খামার পরিচর্যা এবং মাছ চাষের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং এর ফলও তারা ভোগ করে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে। বিশেষ করে খামার ব্যবস্থায় ও বানিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপক লাভজনক হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে, তাইতো বিশ্বব্যাপি কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্বিকরন :

তবে এটাও সত্যি যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় মোটামুটি ব্যয়সাপেক্ষ এবং বাংলাদেশের মত স্বল্প আয়ের দেশে প্রাথমিক অবস্থায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মূলধন যোগান দেওয়া নতুন উদ্যোক্তার পক্ষ্যে একরকম চ্যালেঞ্জ বটে। কিন্তু এটাও সত্যি যে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিখাতের অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা বানিজ্যের প্রবাহ অনেক বেড়ে যাবে এবং এখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়বে যথেষ্ঠ।

কৃষিখাতের আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত করতে কৃষির সকল স্তরে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কৃষক সমাজকে উদ্ভুদ্ধ করা, কৃষি যন্ত্রপাতির আমদানি ও উৎপাদন সহজ করার পাশাপাশি ভূর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রয় এবং স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে পর্যাপ্ত কৃষিঋণ বিতরন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্বিকল্পে করনীয় সমূহ :-

- বিনাশুল্কে কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানির সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি ঐসমস্ত যন্ত্রপাতি বানিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- কৃষি যন্ত্রপাতির দাম কৃষকদের নাগালে রাখতে ভূর্তুকি মূল্যে বিক্রয় করা।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে মাঠপর্যায়ে কৃষিঋণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করন।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যহারে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভুদ্ধ করন ও প্রশিক্ষণ দান।

SIFBD

কৃষিখাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা :

৬) কৃষিখাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা :

কৃষি শুমারি ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী সে সময়ে দেশে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১৬.৫৬ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ১৫.৯৫ মিলিয়ন এবং শহরে বসবাসরত ০.৬১ মিলিয়ন পরিবার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিতরনকৃত কৃষি ঋণের পরিমান টাকা ২৩৬.১৬ বিলিয়ন, সে হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিবারপ্রতি বিতরনকৃত কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪,২৬১/= টাকা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে যা একেবারেই অপ্রতুল। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ টাকা ১১৭.১৭ বিলিয়ন, অর্থবছর ২০১৯-২০ সময়কালে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল টাকা ২৩৬.১৬ বিলিয়ন। এ সময়কালে কৃষিঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে টাকা ১১.৯০ বিলিয়ন। স্মারণী-৩.২(১৫)

কৃষিখাতের আধুনিয়ানের মধ্যদিয়ে এখাতের প্রসার ঘটাতে হলে কৃষির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত পরিবারগুলোর জন্যে, বিশেষ করে খামার ব্যবস্থায় চাষাবাদের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পর্যাপ্ত কৃষিঋণের প্রয়োজন, অন্যথায় এখাতে দ্রুত অগ্রগতি কঠিন হবে। অবশ্য কৃষকদের নিকট কৃষি ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নীতিমালায় বেশ কিছু পরিবর্তপূর্বক সংশোধিত নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে, যা নিম্নরুপ :-

- ব্যাংকগুলোর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০ শতাংশ মৎস্য সম্পদ খাতে বিতরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ।
- ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ প্রদান, সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থায় ঋণ প্রদান এবং টার্কি পাখি পালনে ঋণ প্রদান।
- পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান, শস্য/ফসল খাতে ঋণ বিতরণের জন্য একর প্রতি ঋণ সীমা যৌক্তিক পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ এবং বেসরকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ প্রদান লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে অনর্জিত লক্ষ্যমাত্রার সমপরিমাণ অথবা বিকল্পভাবে অনর্জিত লক্ষ্যমাত্রার ৩% হারে হিসাবায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখা।

স্মারণী-৩.২(১৫): অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে কৃষিঋণ বিতরন ও আদায়ের চিত্র :-

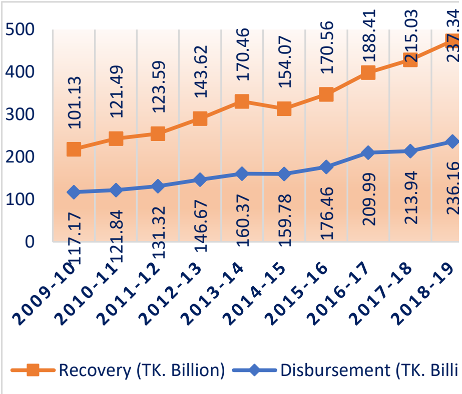

Source: BD Economic Review

SJIBD

- অনর্জিত লক্ষ্যমাত্রার ৩% হারে অর্থ জমা রাখলে পরবর্তী ২ অর্থবছরের মধ্যে বিগত অর্থবছর/অর্থবছরসমূহের অনর্জিত অর্থ সম্পূর্ণ/আংশিক বিতরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ/আনপুাতিক হারে ফেরত প্রদান করা হবে, অন্যথায় উক্ত অর্থ ফেরতযোগ্য হবে না।

৭) দেশে অর্গানিক চাষাবাদের প্রসার ঘটানো :

দেশে অর্গানিক চাষাবাদের প্রসার ঘটানো :

অর্গানিক চাষাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রাকৃতিক ও জৈব সারের ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণপূর্বক স্বাস্থ্য সন্মত ফসল ফলানো। কেননা, জৈবসার জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ফসলের গুণগত মান ও উচ্চ ফলনে অধিক কার্যকারি। জৈবসার উৎপাদন খরছ কম, তাই আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী, ফলে বিশ্বব্যাপি জৈবসারের কদর ও ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

কৃত্তিম সারের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহিত করনপূর্বক কৃষি উৎপাদনে জৈব সার ব্যবহারের মাত্রা বাড়াতে কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি দেশে বানিজ্যিক ভিত্তিতে পর্যাপ্ত জৈবসার উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি এখাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত পূর্বক দেশে সুলভ মূল্যে জৈব সারের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এরফলে দেশে জৈর সার উৎপাদনের অবকাঠামো সৃষ্টির পাশাপাশি অর্গানিক চাষাবাদে ব্যাপক সাফল্য অবশ্যম্ভাবি, কেননা, অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য স্বাস্থ্যসন্মত হওয়ার কারনে আন্তর্জাতিক বাজারে অর্গানিক কৃষি পণ্যের চাহিদা ব্যাপক এটা সবার জানা।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপি অর্গানিক চাষাবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটায় সারা বিশ্বে কৃত্তিম সার ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন কমে আসছে। কৃত্তিম সার ব্যবহারে ২০১৬ সালে ১৬১ টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ২৫ তম, এমনকি এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও বেশি সার ব্যবহারকারি দেশের তালিকায় অর্ন্তভূক্ত। স্মারণী-৩.২(১৬)

অর্গানিক চাষাবাদের প্রসারে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

- অর্গানিক চাষাবাদ ও জৈবসার ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের উৎসাহিত করন।
- দেশে বানিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ও জৈবসার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

- বানিজ্যিক ভিত্তিতে জৈবসার উৎপাদনে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করন।
- জৈবসার উৎপাদনকে এস.এম.ই খাতের অন্তর্ভুক্তি করণপূর্বক এখাতে ঋণ প্রবাহ পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা।
- উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে অর্গানিক চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাত করনের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করন।

স্মারণী-৩.২(১৬): ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের হেক্টর প্রতি সার ব্যবহারের চিত্র :-

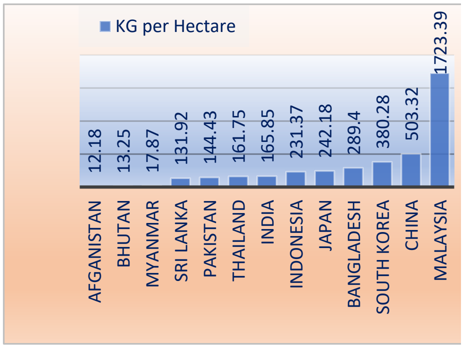

Source : indexmodi

৮) উচ্চ ফলনশীলতা নিশ্চিতকল্পে উন্নত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার :

উচ্চ ফলনশীলতা নিশ্চিতকল্পে উন্নত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার :

ফলন বৃদ্ধির জন্য উন্নত বীজ প্রথম শর্ত। সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উন্নত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও মৌসুমে পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থা থাকা কৃষি উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। দেশে পর্যাপ্ত সরকারি বীজ সংরক্ষণাগার না থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষকেরা নিজেরাই বীজ উৎপান করে এবং গতানুগতিক নিয়মে নিজেদের মত করে সংরক্ষণ করে, যা মোটেও মানসন্মত বীজ সংরক্ষনের পর্যায়ে পড়েনা। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশিরভাগ বীজ মানসন্মত হয়না, ফলশ্রুতিতে ফলন হয় কম। বিভিন্ন সংস্থার তথ্যানুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে গড়ে বছরে প্রায় ১২.৫০ লক্ষ মে.টন বীজ প্রয়োজন, যার বিপরীতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বণ্টনকৃত বীজের পরিমাণ ১২%-১৫%, অবশিষ্ট বীজ কৃষকেরা নিজেরাই উৎপাদন করে। অর্থবছর ২০১৫-১৬ সময়কালে দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনের পরিমাণ ছিল ১২৯,৫৬৮ মে.টন, যার বিপরীতে বিলি হয়েছিল ১২৪,৪৪০ মে.টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের পরিমাণ ১৪০,৯৮১ মে.টন, যার বিপরীতে বিলি হয়েছেল ১৪০,৪৮৩ মে.টন। স্মারণী-৩.২(১৭)

কৃষিখাতে উচ্চ ফলনশীলতা নিশ্চিত করতে :-

- সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা।

- কৃষকদের উৎপাদিত বীজ যথাযথ সংরক্ষন নিশ্চিতকল্পে প্রত্যেক উপজেলা সদরে সরকারি বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন, যাতে স্থানীয় কৃষকেরা নিজেদের উৎপাদিত বীজ উপজেলা বীজ সংরক্ষণাগারে রেখে মৌসুমে ভাল বীজ ব্যহারের সুযোগ পায়।
- উন্নত বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও তদারকি।

স্মারণী-৩.২(১৭): ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে বীজ উৎপাদন ও বন্টনের চিত্র :-

(In metric ton)

Name of the Seed	2015-16		2016-17		2017-18	
	Production	Distribution	Production	Distribution	Production	Distribution
Rice	80546	74558	83386	82038	85361	87668
Wheat	16532	20667	18116	16575	17956	18177
Maize	5	7	13	5	21	5
Potato	26453	25134	32901	25352	33044	31321
Pulses	1699	1323	2315	1699	2476	1888
Oil Seed	3266	1300	775	1567	1245	1023
Jute	880	724	834	722	723	223
Vegetables	83	83	87	80	45	73
Spices	104	80	117	105	110	105
Total	**129,568**	**124,440**	**141,296**	**128,143**	**140,981**	**140,483**

Source: Economic Review 2018 by MOF

৯) কৃষির বহুমূখী করন :

দেশের কৃষিখাতের বহুমূখী করনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এখন সময়ের দাবি, কেননা এখনও দেশে প্রতি বছর বিশাল পরিমাণ কৃষিপণ্য আমদানির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও শিল্পের কাঁচামাল জোগান নিশ্চিত করতে হয়। আমদানিকৃত কৃষি পণ্যের মধ্যে চাউল, গম, ভুট্টা, ফ্রেস ফুড, বিভিন্ন ধরনের ডাল, পেঁয়াজ, রসুন আদা ও অন্যান্য মসলা, কাঠ এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে তৈলবীজ ও কাঁচা তুলা উল্ল্যেখযোগ্য। সবচেয়ে বেশি আমদানিকৃত পণ্যের তালিকায় রয়েছে তৈলবীজ, গম ও কাঁচাতুলা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এই তিনটি পণ্য আমদানি বাবত ব্যয় ছিল ইউ.এস.ডলার ২,৯৪৩ মিলিয়ন, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৫,৩০০ ডলার স্মারণী-৩.২(১৮)।

যদিও সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনে ব্যাক্তি উদ্যোগে বৈচিত্রতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন দেশে মাছ ও বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদন যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটাতে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, মসল্লা

জাতিয় পণ্য ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল দেশে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

কৃষির বহুমূখীকরন :

দেশের কৃষিখাতের প্রসারে এখাতে বহুমূখী উৎপাদনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন এবং কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে দেশে বহুমূখী চাষাবাদের দ্রুত প্রসার প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে আমদানিকৃত বিশাল পরিমাণ কাঁচা তুলা দেশে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ। দেশের পাহাড়ি অঞ্চল অথবা উঁচু জমিগুলো একাজে লাগানো যায় কিনা দেখা যেতে পারে।
২. তৈল বীজ আমদানি কমানোর লক্ষ্যে দেশে সরিষা ও সূর্যমূখী ফুল চাষের মাত্রা বৃদ্ধি করে সরিষা ও সূর্যমুখী তেল উৎপাদন ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩. প্রধান খাদ্য হিসাবে দেশে গমের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই চাহিদানুযায়ী গমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা।
৪. জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত দুধ, ডিম, মাছ, মাংশ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ।
৫. পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও অন্যান্য মসলা জাতিয় পণ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা।
৬. দেশে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করণ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্প যেমন, গুড়ো দুধ ও শিশুখাদ্য উৎপাদন এবং অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্প দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে ঐ সমস্ত শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করা।
৭. আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরন নিশ্চিতকল্পে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল পণ্য পর্যাপ্ত উৎপাদনে কঠোর নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করন।

স্মারণী-৩.২(১৮) : ২০১২-১৩ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর সময়কালে দেশে কৃষিপণ্য আমদানির চিত্র :-

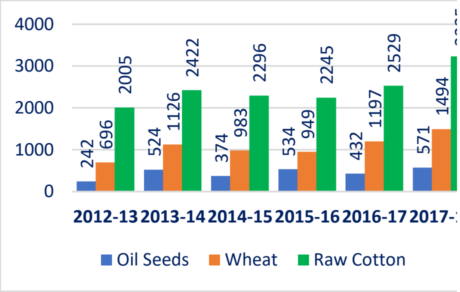

Source: MOF 2019

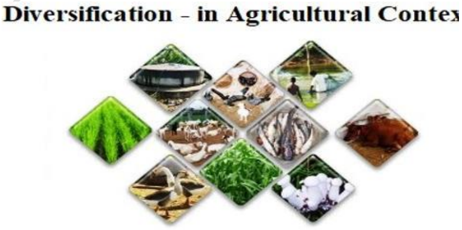

SIFBL

১০) খামার ব্যবস্থায় বানিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার :

খামার ব্যবস্থায় বানিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার :

খামার ব্যবস্থায় অধিক জমি নিয়ে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য দেশে অথবা বিদেশে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাষাবাদ করাটাই বানিজ্যিক চাষাবাদ। সাধারণত যে সমস্ত কৃষিপণ্য গতানুগতিক চাষাবাদে কম উৎপাদন হয় কিন্তু দেশে অথবা বিদেশের বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এমন সব পণ্যই বানিজ্যিক চাষাবাদে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। যেমন- বিভিন্ন প্রকারের অনিয়মিত সব্জি (ক্যাপসিক্যাম, ব্রকলি ও অন্যান্য সব্জি) ইত্যাদি চাষ, বিভিন্ন প্রকার ফুল চাষ, ফলের চাষ, মাছ ও অন্যান্য জলজ পাণীর চাষ, হাঁস, মুরগি, গরু ছাগল ইত্যাদি বানিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ।

বানিজ্যিক খামার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন :-

ক) মিশ্র খামার - একই খামারে শস্য, ফল, ফুল ইত্যাদি চাষের পাশাপাশি হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশু পালন। খ) ডেয়ারি ফার্ম। গ) শস্য খামার। ঘ) ফলের বাগান ; ইত্যাদি।

বানিজ্যিক চাষাবাদে সাধারণত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, ফলে উচ্চ ফলনশীলতা ও স্বাস্থ্যসন্মত পণ্য উৎপাদনের দিকথেকে বিশ্বব্যাপি বানিজ্যিক চাষাবাদ সবসময় এগিয়ে রয়েছে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে বানিজ্যিক চাষাবাদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

স্মারণী-৩.২(১৯): ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ সময়কালে বাংলাদেশর কৃষিপণ্য রপ্তানির চিত্র :-

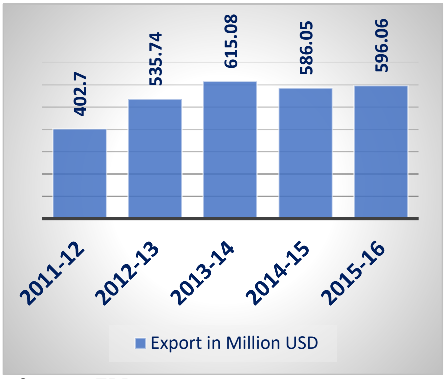

Source : EPB

ফলে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে খামার ভিত্তিতে বহুমূখী বানিজ্যিক চাষাবাদের ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং প্রতিটি উন্নত দেশই কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রতিবছর বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও ব্যাক্তি উদ্যোগে বানিজ্যিক চাষাবাদের সূচনা হয়েছে এবং দেশে কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থবছর ২০১১-১২ সময়ে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৪০২.৭ মিলিয়ন, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৫৯৬.০৬ মিলিয়ন। এ সময়কালে কৃষিপণ্য রপ্তানি ছিল বছরে গড়ে ইউ.এস.ডলার ৫৪৭.১৩ মিলিয়ন। স্মারণী-৩.২(১৯)

বিশ্বের শক্তিশালি অর্থনীতির দেশ সমূহ ব্যাপক ভিত্তিতে বানিজ্যিক চাষাবাদের মাধ্যমে দেশজ কৃষি উৎপাদনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি আয়ে উল্ল্যেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে, যারমধ্যে রয়েছে আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস্, জার্মানি, ব্রাজিল, ফ্রান্স, চীন, স্পেন, কানাড়া, বেলজিয়াম, ইটালি ও আর্জেন্টিনা অন্যতম। স্মারণী-৩.২(২০)

স্মারণী-৩.২(২০): ২০১৮ সালে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ দেশের অবস্থান :-

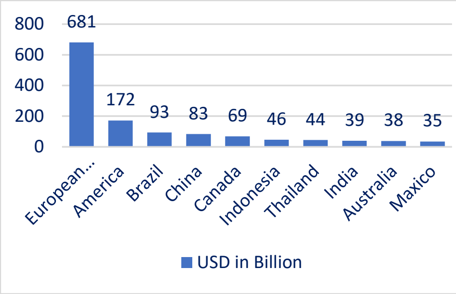

Source : WTO

১০(ক) দেশে বানিজ্যিক চাষাবাদ বিস্তারে সরকারের করনীয় :

বানিজ্যিক চাষাবাদ অনেক জমি নিয়ে খামার ভিত্তিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে হয় তাই এ চাষাবাদে বিনিয়োগ বেশি, ফলে ইচ্ছে থাকা সত্বেও অনেক অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে বানিজ্যিক চাষাবাদে আত্মনিয়োগ করতে পারেনা। তাছাড়া বানিজ্যিক চাষাবাদে উৎপাদিত পণ্য দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও মোড়কজাত করার বিষয় জড়িত, তাই প্রশিক্ষনের প্রয়োজন।

দেশে বানিজ্যিক চাষাবাদের বিস্তারে সরকারের করনীয় :

দেশে বানিজ্যিক চাষাবাদের দ্রুত প্রসারে নিন্মোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

- এখাতের উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন।
- বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ঐসমস্ত দেশে বাংলাদেশি কৃষি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ও ট্যারিফ বেরিয়ার কমিয়ে আনতে সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি পণ্য রপ্তানির পরিমাণ এবং এখাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করার যথেষ্ঠ সুযোগ বাংলাদেশের রয়েছে।
- লাভজনকভাবে বানিজ্যিক চাষাব্যাদ পরিচালনা, মানসন্মত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি পণ্য মোড়কজাত করন, রপ্তানি বাজার খোঁজা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকা।

SJFBD

১১) কৃষিজমি রক্ষা এবং দুই ও তিন ফসলি চাষের মাত্রা বৃদ্ধি করা :

স্বল্প আয়তনের এ দেশে ক্রমবর্ধমান বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য যোগানের পক্ষে আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল, তার উপর গ্রামাঞ্চলে প্রতিনিয়ত অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা ঘর বাড়ি, শিল্পকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে দেশে কৃষি জমির পরিমাণ প্রতিনিয়তই হ্রাস পাচ্ছে। আবাদযোগ্য জমি নষ্ট হওয়া রোধকল্পে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি চাষাবাদে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সীমিত চাষাবাদযোগ্য জমি দু-ফসলি ও তিন ফসলি চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে এ সমস্যার সমাধান করা ব্যতিত অন্য কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয়না।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে নীট আবাদযোগ্য অনেক জমি অতিমাত্রায় উচু অথবা নিচু হওয়ার কারণে সব জমিতে সহজভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না এবং ঐসমস্ত নিচু জমির বেশিরভাগ ফসল বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় প্রতি বছর।

কৃষিজমি রক্ষা এবং দুই ও তিন ফসলি চাষের মাত্রা বৃদ্ধি করা :

তাছাড়া, প্রতিবছর প্রাকৃতিক ও সরকারিভাবে যে পরিমাণ আবাদ যোগ্য জমি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন কারনে সে পরিমাণ জমি নীট আবাদযোগ্য জমিতে যুক্ত হচ্ছে না। কাজেই আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের চাষাবাদযোগ্য জমি রক্ষা করতে এবং সমস্ত জমি দু-ফসলি ও তিন ফসলি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে কৃষি খাতের আকার ও উৎপাদন বৃদ্ধির বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরি, যারজন্য প্রয়োজন :-

১. পল্লী অঞ্চল সমূহে মান সন্মত ঘরবাড়ি নির্মাণকল্পে **"পল্লী আবাসন নীতি"** প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।
২. পল্লী অঞ্চল সমূহে আবাদযোগ্য জমিতে বসত বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিসের ছাড়পত্রের বিধান চালু করা।
৩. নদী উপদ্রুত এলাকা সমূহে ভাঙ্গন রোধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণ।
৪. আবাদি জমিতে ইটভাটা ও অন্যান্য শিল্পকারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া।
৫. আবাদি জমি নষ্ট হয় এমন সব কর্মকাণ্ড দমনে কঠোর হওয়া।

স্মারণী-৩.২(২১):চাষযোগ্য জমি ব্যবহারের তথ্য :-

SL	Items	2015-16	2016-17	2017-18
Land Utilization (Area in '000' Acre)				
1	Total cropped area	38,148	38,256	38,536
2	Net Cropped area	19,636	19,650	19,774
3	Single Cropped area	5,566	5,492	5,514
4	Double Cropped area	9,671	9,711	9,800
5	Triple Cropped area	4,356	4,380	4,418
Production of Major agricultural crops (in '000' MT)				
1	Rice	34,710	34,710	33,803
2	Wheat	1,347	1,348	1,311
3	Maize	2,271	2,446	3,026
4	Jute	1,399	1,371	8,247
5	Tea	66	65	82
6	Fruits	4,635	4,765	5,019
Annual Fish production (in '000' MT)		3,684	3,878	4,134
Agriculture Sector Contribution to GDP		14.5%	13.41 %	13.07%

Source: BBS

১২) গ্রীণহাউজ পদ্ধতিতে ভার্টিক্যাল ফার্মিং এর প্রসার ঘটানো :

Vertical farming first invented in 1915 by American geologist Gilbert Ellis Bailey, the initial concept of vertical farming was rather understood as a sort of rooftop farming.

Definition : Vertical farming often falls in line with 'indoor farming', 'urban agriculture' and 'controlled-environment agriculture' (which also encompasses greenhouse cultivation), but the concept remains unique. With vertical farming, the growing takes place where factors such as temperature, nutrients, lighting, irrigation, and air circulation are constantly monitored and adjusted.

গ্রীণহাউজ পদ্বতিতে ভার্টিক্যাল ফার্মিং এর প্রসার ঘটানো :

সংক্ষেপে গ্রীণ হাউজের মাধ্যমে সীমিত জমিতে সুবিন্যস্ত চাষাবাদই ভার্টিক্যাল ফার্মিং। এ চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বল্প জমি সুবিন্যস্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সারাবছর উচ্চহারে স্বাস্থ্য সন্মত ফসল ফলানো সম্ভব, ফলে বিশ্বব্যাপি গ্রীণ হাউজ চাষাবাদ দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।

ভার্টিক্যাল ফার্মিংয়ের সুবিধা সমূহ :

ক) ভার্টিক্যাল ফার্মিংয়ের সুবিধা সমূহ :

এ পদ্বতির চাষাবাদে বহুবিধ সুবিধার কারনে বাংলাদেশের মত স্বল্প আয়তন, প্রাকৃতিক দূর্যোগময় ও জনবহুল দেশে ভার্টিক্যাল চাষাবাদ প্রসারের প্রয়োজন ও গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি এর ভবিষ্যৎ অনায়াসে উজ্জ্বল। জমিস্বল্পতার সমস্যা গোছাতে, স্বল্প উৎপাদন খরছ , স্বাস্থ্য সন্মত ও বছরব্যাপি উচ্চ ফলন ফলানো ইত্যাদি বহুবিধ কারনে এদেশে ভার্টিক্যাল চাষাবাদের দ্রুত বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজন। নিন্মে ভার্টিক্যাল চাষাবাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুবিধা তুলে ধরা হলো।

- স্বল্প জমিতে ইনডোর পদ্ধতিতে এ চাষাবাদ হয়, ফলে জমি স্বল্পতার সমস্যা গুছাতে এ চাষাবাদের জুড়ি নেই।
- ইনডোরে রুফটপ অথবা উচু অবস্থানে এ চাষাবাদ করার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।
- এ চাষাবাদে পানি সেচ ও উৎপাদন খরচ কম হওয়ার কারনে লাভবান হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি।
- বৈজ্ঞানিক পদ্বতিতে চাষাবাদের ফলে বছরব্যাপি স্বাস্থ্যসন্মত ও উচ্চ হারে ফলনের নিশ্চয়তা থাকে, ফলে বানিজ্যিক ভিত্তিতে ভার্টিক্যাল চাষাবাদ অনেক বেশি উপযোগী।
- যে সমস্ত এলাকায় জমির লবণাক্ততা ও অন্যান্য অনুপযোগিতার কারনে চাষবাদ কঠিন, ঐ সমস্ত এলাকায় ভার্টিক্যাল পদ্ধতির চাষাবাদ বিস্তারের মাধ্যমে ঐ সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।
- স্বল্প পরিসরে ইনডোরে এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে শহর পর্যায়ে এ পদ্ধতির চাষাবাদের ব্যাপক বিস্তার সম্ভব।
- শিক্ষিত যুব সমাজকে এ পদ্ধতির চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনে বিল্পব ঘটানোর সমূহ সম্ভাবনা এদেশে রয়েছে।
- পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে এ পদ্ধতির চাষাবাদ অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

খ) ভার্টিক্যাল ফার্মিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

ইউ.কে ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান " Reportbuyer.com" এর জরিপ অনুসারে ২০১৮ সালে বিশ্বজুড়ে ভার্টিক্যাল ফার্মিংয়ের আকার ছিল ইউ.এস. ডলার ২.২৩ বিলিয়ন, যা ২০২৬ সাল নাগাদ

বেড়ে দাঁড়াবে ইউ.এস. ডলার ১২.৭৭ বিলিয়ন। এশিয়া ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান " Graphical Research " এর মতে আগামী সময়গুলোতে এশিয়ায় ভার্টিক্যাল ফার্মিং গ্রোথের ক্রমাগত উচ্চহার বজায় থাকবে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ এশিয়া প্যাসিফিক জোনে ভার্টিক্যাল ফার্মিং মার্কেট গ্রোথ দাঁড়াবে CAGR ৩১.৫০% । স্মারণী-৩.২(২২)

ভার্টিক্যাল ফার্মিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

আশার কথা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গায় ব্যক্তি উদ্যোগে স্বল্প পরিসরে বানিজ্যিক ভিত্তিতে গ্রীণ হাউজে ভার্টিক্যাল চাষাবাদ শুরু হয়েছে এবং পত্র পত্রিকার রিপোর্টে এক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতিও যথেষ্ঠ ভাল, যদিও এদেশের স্বল্প জমি কাজে লাগিয়ে উচ্চমাত্রায় কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করার পক্ষে তা মোটেও যথেষ্ঠ নয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দেশে বানিজ্যিক ভিত্তিতে গ্রীণ হাউজে ভার্টিক্যাল চাষাবাদ বৃদ্ধিতে সরকারের বাড়তি পদক্ষেপ প্রয়োজন।

স্মারণী-৩.২(২২): ২০২৬ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপি ভার্টিক্যাল ফার্মিং এর গ্রোথ প্রক্কলন :-

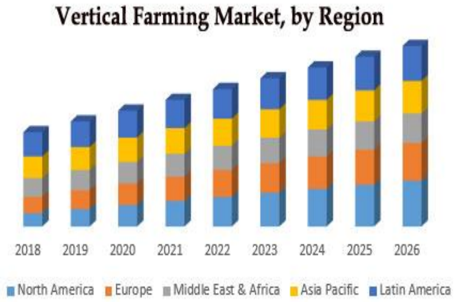

Source : Graphical Research

গ) দেশে ভার্টিক্যাল চাষাবাদের দ্রুত প্রসারে সরকারের করনীয় :

দেশে ভার্টিক্যাল চাষাবাদের দ্রুত প্রসারে সরকারের করনীয় :

যদিও গ্রীণ হাউজ চাষাবাদে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, তবে গ্রীণ হাউজ অবকাঠামো ও ভার্টিক্যাল নির্মাণে প্রাথমিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন পড়ে, যা অনেক নতুন উদ্যোক্তার পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এ পদ্ধতির চাষাবাদে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। দেশে গ্রীণ হাউজে ভার্টিক্যাল চাষাবাদের দ্রুত প্রসারে বানিজ্যিক চাষাবাদের নীতি প্রণালী অনুস্মরনের পাশাপাশি নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ কার্যকর করা যেতে পারে :-

- শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত যুব সমাজের মাধ্যমে দেশে **"গ্রীণ হাউজ"** চাষাবাদের বিস্তার ঘটানো।
- কৃষিমন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে এ পদ্ধতির চাষাবাদ, উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করন ব্যবস্থার উপর বিস্তারিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকা।
- প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক মূলধন যোগানে স্বল্প সুদে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা; এবং
- কৃষিমন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে কৃষি কারিগরি সহায়তা সেল স্থাপন।

১৩) পশু খামার ও পোল্ট্রি শিল্প বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনা :

পশু খামার ও পোলট্রি শিল্প বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনা :

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাণীজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে দেশে মাছ, মাংশ ও ডিমের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের খামার ও পোল্ট্রিগুলো ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরনের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ অপ্রতুল। খামার ও পোল্ট্রি সেক্টরে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ এ শিল্পে প্রতিনিয়ত মোড়ক ও পুঁজি হারানোর ভয়। প্রতিবছর মোড়কের কারণে খামারগুলোতে অসংখ্য হাঁসমুরগি মারা যায়। ফলে খামার মালিকেরা মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতির সন্মুখীন হয়ে পুঁজি হারা হয়ে পড়ে এবং এ অনিশ্চয়তার কারণে নতুন উদ্যোক্তা এ পেশায় আসতে ভয় পায়।

এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের জন্য দেশের সকল খামার ও পোল্ট্রি ফার্মসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে বীমার আওতায় আনার মাধ্যমে এ সেক্টরকে ভীতিমুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে মোড়কের ফলে খামার ও পোল্ট্রি মালিকেরা পুঁজিহারা হয়ে না পড়ে এবং এখাতে বিনিয়োগে উদ্যোক্তাদের ভীতির পরিবর্তে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

গ) কৃষিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

কৃষিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখন প্রয়োজন কৃষিখাতের শতভাগ আধুনিকায়নের মাধ্যমে এখাতের টেকসই উন্নয়ন ও প্রসার নিশ্চিত করার কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে দেশে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি কৃষির বানিজ্যীকিকরনের দিকে অগ্রসর হওয়া সহজতর হয়। কেননা, কৃষিপ্রধান এ দেশে কৃষিখাতের টেকসই উন্নয়ন এবং এখাতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ব্যাতিত দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি কৃষি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত না করে কিংবা এখাতের পাশ কাটিয়ে এদেশে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিন্তা বাস্তবতা বিবর্জিত এই সত্য মাথায় রেখে আগানো উচিৎ। কৃষিখাতের প্রসার মানে শিল্পায়নকে নিরুৎসাহিত করা নয়, বরং শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে কৃষিখাতের ব্যবহার দেশে শিল্পায়ন প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

দেশের কৃষিখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে :-

১. কৃষি খাতের আধুনিকায়ন।
২. কৃষি উনয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা।
৩. দেশে মজবুত ও টেকসই কৃষি অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক এ খাতকে সম্ভাবনাময় করে তোলা।
৪. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করন।
৫. কৃষি সহজ ও সাশ্রয়ী করে তুলতে "কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধিকরন।"
৬. কৃষিখাতে স্বল্প সুদে ও শহজ শর্তে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করা।
৭. স্বাস্থ্য সন্মত খাদ্য উৎপাদনে দেশে "অর্গানিক চাষাবাদের প্রসার ঘটানো।"
৮. উচ্চ ফলনশীলতা নিশ্চিতকল্পে উন্নত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৯. কৃষির বহুমুখী করনের মাধ্যমে কৃষিখাতে স্বনির্ভরতা অর্জন।
১০. রপ্তানিমূখী কৃষি সেক্টর গড়ে তুলতে খামার ব্যবস্থায় বানিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার ঘটানো।
১১. কৃষি জমি রক্ষা করা এবং দুই ও তিন ফসলি চাষের মাত্রা বৃদ্ধি করা।"
১২. শিক্ষিত যুব সমাজের মাধ্যমে "গ্রীণহাউজ পদ্বতিতে ভার্টিক্যাল ফার্মিং" চাষাবাদের প্রসার।
১৩. আবাদি জমি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নতুন গজিয়ে উঠা চর সমূহে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কৃষি আবাদ ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসা।
১৪. আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরনে সকল কৃষিপণ্য (ধান, গম ও মসলা জাতিয় পণ্য, যেমন- মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও অন্যান্য মসল্লা এবং দুধ, ডিম, মাছ, মাংস) ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত করতে কঠোর নীতি অবলম্বন করা।

SJFBD

১৫. পোল্ট্রি ও খামার শিল্পে বিনিয়োগ ঝুকিমুক্ত করতে এই শিল্পকে বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় নিয়ে আসা।

১৬. কৃষকদের সুবিধার্থে সারাদেশে গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ব্যাংকের "ঋণ পরামর্শ বুথ" স্থাপন।

১৭. প্রত্যেক উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে বীজ সংরক্ষণাগার, ফলমূল সংরক্ষনের জন্য হিমাগার, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ডিলারশিপ, কৃষি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কৃষি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা।

১৮. কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে উপজেলা কৃষি অফিস ও এন.জি.ও সমূহের সমন্বয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে নিন্মোক্ত বিষয় সমূহের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা চালু করন :-

- মাটির ধরণ ও জমির অবস্থান অনুযায়ী উপযোগী ফসলের চাষ করা।
- একই জমিতে একসাথে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন ফসল ফলানো এবং জমিতে বছরব্যাপি ফসল উৎপাদন।
- খামার ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বানিজ্যিক চাষাবাদের উপর বিস্তারিত প্রশিক্ষণ।
- গ্রীণহাউজ চাষাবাদের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে ব্যাংক ও NGO গুলোর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।
- দীর্ঘ সময় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকা উচু / নিচু ও পতিত জমি, ডোবা, নালা, ছোট বড় পুকুর ইত্যাদি চাষাবাদের কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উপর প্রশিক্ষণ।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের কলা কৌশল, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার, প্রাকৃতিক সার উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক উপায়ে ফসলের রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ ফলনশীল ফসল ও শাকসব্জি চাষ এবং কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে সরকার কতৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সমূহ ভোগ করার উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন।
- বাংলাদেশের সর্বত্রই খেজুর ও তালগাছ ভাল জন্মে। রাস্তার পাশ্বে বা যে কোনো স্থানে সহজে খেজুর ও তালগাছ লাগানো যায়, এতে খরচ নেই বললেই চলে। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলোতে বানিজ্যিকভাবে খেজুরের গুড় ও তালের রস উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- উপকুলীয় ও চরাঞ্চল গুলোতে নারিকেলের ব্যাপক ফলন হয়। বাড়ির আঙ্গিনায় বা যেকোনো স্থানে সহজে নারিকেল গাছ লাগানো যায়, এতে খরচ নেই বললেই চলে। এসমস্ত এলাকায় বানিজ্যিকভাবে নারিকেল চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত প্রশিক্ষনের ফলে প্রত্যেক উপজেলার কৃষির অগ্রগতির চিত্র বৎসরান্তে উপজেলার বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ করার মাধ্যমে এ বিষয়ে উপজেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জবাব দিহিতার বিধান চালু করা আবশ্যক।

****

SJBD

অধ্যায় : ৩.৩

গ্রামপর্যায়ে কুঠির শিল্পের প্রসার।

গ্রামপর্যায়ে কুঠির শিল্পের প্রসার।

্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) গ্রাম পর্যায়ে আয় রোজগার পরিস্থিতি।

খ) গ্রাম পর্যায়ে বেকারত্ব ও দারিদ্রতা।

১) গ্রামপর্যায়ে বেকারত্বের হার।
২) গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্রতার প্রকোপ।
৩) শহর ও গ্রামভেদে মাসিক গড় আয়।
৪) গ্রাম পর্যায়ে বসতবাড়ীর অবকাঠামো।
৫) গ্রামপর্যায়ে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা।

গ) গ্রামীন কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কুঠির শিল্পের প্রসার।

১) দেশের ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আকার ও প্রসার।
২) জি.ডি.পি তে কুঠির শিল্পখাতের অবদান।
৩) কুঠির শিল্পের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা।

ঘ) গ্রাম পর্যায়ে কুঠির শিল্প প্রসারে প্রস্তাবনা।

গ্রামপর্যায়ে আয় রোজগার পরিস্থিতি :

গ্রামপর্যায়ে আয় রোজগার পরিস্থিতি :

একটি শক্তিশালি অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দেশে প্রতিটি পরিবারের কর্মক্ষম নারী পুরুষ সবাই কর্মে নিয়োজিত থেকে আয় রোজগারের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করবে, যার ইতিবাচক প্রভাবে দেশের অর্থনীতি থাকবে সচল ও বেগবান। নারী পুরষ নির্বিশেষে পরিবারের কর্মক্ষম লোকজন সবাই যদি কর্মে নিয়োজিত থাকে তাহলে সেই পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা অবধারিত। আর আর্থিক স্বচ্ছল যে কোনো পরিবার নিজস্ব চিন্তা চেতনায় জীবনমান উন্নয়নে সক্রিয়। সন্তানের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও জীবনযাপনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়সমূহ তখন নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম। আর্থিক স্বচ্ছল কোনো পরিবার কখনও সরকারের বা দেশের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়না। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যাক্তি কিংবা পরিবারই কেবল সন্তানদের যোগ্য করে তোলা, মানসন্মত জীবনযাপন ও নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে বাস্তবসন্মত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে সক্ষম, যা তাদের নিজেদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৩% গ্রামে বসবাস করে। দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বসবাসরত পরিবারগুলোর একটি বড় অংশ একজন মাত্র উপার্জনকারি ব্যাক্তির উপর নির্ভরশীল, পরিবারের নারীরা হয় শুধুমাত্র ঘর গ্রেহস্থালিতে ন্যাস্ত অথবা কিছুই করেনা। আবার এমন অসংখ্য পরিবার রয়েছে যে সমস্ত পরিবারে আয় রোজগারের কোনো উৎসই নেই। ফলে ঐসমস্ত পরিবারে সারা বছর অভাব অনটন লেগেই থাকে, পরিবারের সদস্যদের ভরন পোষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কোনো কিছুই তাদের পক্ষ্যে যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না থাকার ফলে পরিবারে এবং সমাজে তাদের মর্যাদা নেই বললেই চলে, ফলে গ্রামীণ সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য ভীষণ প্রকট যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট ৩৯.৩৩ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে ৩.৯৬ মিলিয়ন পরিবারে কোনো উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি নেই, যাদের মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ৩.১৮ মিলিয়ন (৮০%) পরিবার এবং অবশিষ্ট .৭৮ মিলিয়ন (২০%) পরিবারের বসবাস শহরে। অর্থাৎ দেশে এখনও (৩.৯৬ X ৪.০৬) = ১৬.০৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় দিন কাটে যার ৮০% এর বসবাস গ্রামে।

অন্যদিকে একজন মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির উপর নির্ভরশীল এমন পরিবারের সংখ্যা সমগ্র দেশে ২৫.৫৩ মিলিয়ন, যার মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ১৮.৬৪ মিলিয়ন (৭৩%) এবং শহরে ৬.৮৯ মিলিয়ন (২৭%)। অর্থাৎ গ্রামে বসবাসকারি প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পরিবার এখনও একজন মাত্র উপার্জনকারি ব্যাক্তির উপর নির্ভরশীল। স্মারণী- ৩.৩(১)

স্মারণী- ৩.৩(১) : উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির ভিত্তিতে দেশে পরিবারের সংখ্যা :-

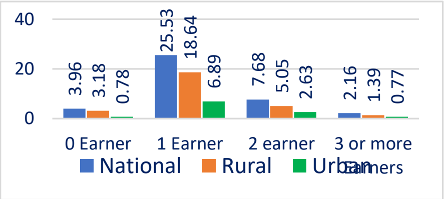

Source : HIES 2016

দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে প্রতিটি পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যরা যাতে কর্মে নিয়োজিত থেকে আয়রোজগারের মাধ্যমে স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে, সে সুযোগ ও পরিবেশ থাকা বাঞ্চনীয়। শহর পর্যায়ে নারীরা পোশাক শিল্প বা অন্যান্যক্ষেত্রে কাজ করার সুবিধা পেলেও, গ্রামে তা একদমই নেই। ফলে গাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত নারীরা মারাত্মক অর্থনৈতিক টানাপোড়নের কারনে অত্যন্ত নিন্মমানের জীবনযাপনে বাধ্য হয়, যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেরক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত প্রত্যেক কর্মক্ষম নারী পুরুষ যাতে আয়রোজগারের মাধ্যমে স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে, জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরনের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের

সুযোগ পায়, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে। এজন্য প্রয়োজন গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা, যারজন্য প্রয়োজন সুদুরপ্রসারি পরিকল্পনা এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন।

গ্রামপর্যায়ে বেকারত্ব ও দারিদ্রতা :

ক) গ্রামপর্যায়ে বেকারত্ব ও দারিদ্রতা :

১) গ্রামপর্যায়ে বেকারত্বের হার :

দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বেকারত্বের হার শহরের তুলনায় অনেক বেশি। লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-১৭ এর রিপোর্ট অনুযায়ী সে সময়ে দেশে ১৫ বছরের অধিক কর্মক্ষম জনসংখ্যা ১০৯,০৫৪ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে ৭৭,০৯১ মিলিয়ন (৭০.৬৯%) এবং শহরে ৩১,৯৬৩ মিলিয়ন (২৯.৩১%)। গ্রামের ১৫ বছরের অধিক কর্মক্ষম পুরুষদের ৮০.৩% লেবার ফোর্সে জড়িত, কর্মক্ষম পুরুষদের অবশিষ্ট ১৯.৭% লেবার ফোর্স বহির্ভূত, যারা হয় বেকার, না হয় অর্ধবেকার অথবা ছদ্মবেকার হিসাবে কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটায়। তাছাড়া লেবার ফোর্সে জড়িত জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আবার কর্মহীন। অন্যদিকে গ্রামের ১৫ বছরের অধিক নারীদের ৩৮.৬% লেবার ফোর্সে জড়িত, কর্মক্ষম নারিদের অবশিষ্ট ৬১.৪% লেবার ফোর্স বহির্ভূত, যাদের সিংহভাগ গৃহবধু এবং ঘর গৃহস্থালি কাজে ন্যাস্ত। স্মারণী- ৩.৩(২)

ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫ বছরের অধিক লেবার ফোর্স বহির্ভূত কর্মক্ষম গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩১,৩৯৫ মিলিয়ন , যা সে সময়ে গ্রামের মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ৪০.৭২% এবং সে সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যার ১৯.৩০%, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ছে। তাছাড়া কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ বছরের বেশিরভাগ সময়েই হয় অর্ধবেকার অথবা ছদ্মবেকার হিসাবে কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটায়। কৃষিকাজের পাশাপাশি অন্য আয় রোজগারের সুযোগ না থাকায় বছরের পর বছর তাদের আর্থিক সঙ্গতির কোনো পরিবর্তন আসেনা।

স্মারণী- ৩.৩(২) : ২০১৬-১৭ সময়কালে দেশে ১৫ বছরের অধিক বয়সী কর্মক্ষম মহিলাদের লেবার ফোর্স এবং লেবার ফোর্স বহির্ভূত থাকার হার :

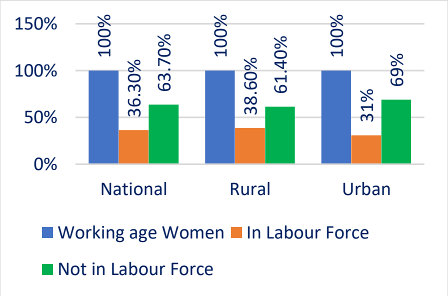

Source : LFS 2016-17

স্মারণী- ৩.৩(৩) : ২০১৬-১৭ নাগাদ গ্রাম ও শহরভেদে ১৫ বচরের অধিক বয়সী কর্মক্ষম জনসংখ্যা :

(in '000')

Labour Force Status	Rural			Urban			Bangladesh		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Labour Force	30,939	14,957	45,696	12,790	5,018	17,808	43,528	19,976	63,505
Not in Labour Force	7,556	23,839	31,395	2,995	11,160	14,155	10,551	34,998	45,549
Total :	38,795	38,796	77,091	15,785	16,178	31,963	54,080	54,974	109,054
Column %									
Labour Force	80.3	38.6	59.3	81.0	31.0	55.7	80.5	36.3	58.2
Not in Labour Force	19.7	61.4	40.7	19.0	69.0	44.3	19.5	63.7	41.8
Total :	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% of Working age population									
Labour Force	28.2	13.7	41.9	11.7	4.6	16.3	39.9	18.3	58.2
Not in Labour Force	6.9	21.9	28.8	2.7	10.2	13.0	9.7	32.1	41.8
Total :	35.1	35.6	70.7	14.5	14.8	29.3	49.6	50.4	100

Source : LFS 2016-17 by BBS

২) গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্রতার প্রকোপ :

দেশে দারিদ্রতার হার সামগ্রিকভাবে পূর্বের তুলনায় কমে আসলেও এখনো গ্রামাঞ্চলগুলোতে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের হার শহরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। ১৯৯৫-৯৬ সময়কালে দেশে দারিদ্রতার হার ছিল জাতিয়ভাবে ৫০.১%, গ্রামে ৫৪.৫% এবং শহরে ২৭.৮%। ঐ সময়ে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারি অর্থাৎ হতদরিদ্রের হার ছিল জাতিয়ভাবে ৩৫.২%, গ্রামে ৩৯.৫% এবং শহরে ১৩.৭%। ঐ সময়ে দারিদ্রতার হার শহরের তুলনায় গ্রামে ২৬.৭% বেশি এবং হতদরিদ্রের হার ২৫.৮% বেশি। সর্বশেষ বি.বি.এস সার্ভে ২০১৬ অনুযায়ী দারিদ্রতার হার দাঁড়িয়েছে জাতিয়ভাবে ২৪.৩%, গ্রামে ২৬.৪% এবং শহরে ১৮.৯%। হতদরিদ্রের হার জাতিয়ভাবে ১২.৯%, গ্রামে ১৪.৯% এবং শহরে ৭.৬%। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দারিদ্রতার হার শহরের তুলনায় গ্রামে প্রায় ৭.৫% বেশি এবং হতদরিদ্রের হার গ্রামে ৭.৩% বেশি।

SITBD

গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্রতার প্রকোপ :

সামগ্রিকভাবে হিসাব করলে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মিলিয়ে দেশে এখনো দারিদ্রতার হার জাতিয়ভাবে ৩৭.২%, গ্রামে ৪১.৩% এবং শহরে ২৬.৫%। অর্থাৎ শহরের তুলনায় দাদ্রিতার হার গ্রামে এখনো ১৪.৮% বেশি। ২০১৬ সময়কালে গ্রামে বসবাসকারি জনসংখ্যা ছিল ১১৬.০৯ মিলিয়ন, সে হিসাবে ঐ সময়ে গ্রামে বসবাসকারি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (১১৬.০৯ X ৪১.৩%) = ৪৭.৯৫ মিলিয়ন, যা ঐ সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০%। স্মারণী- ৩.৩(৪)

স্মারণী- ৩.৩(৪) : ১৯৯৫-২০১৬ সময়কালে গ্রাম ও শহরভেদে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের হার :

Year	Upper Poverty Line			Lower Poverty Line		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
2016	24.3	26.4	18.9	12.9	14.9	7.6
2010	31.5	35.2	21.3	17.6	21.1	7.7
2005	40.0	43.8	28.4	25.1	28.6	14.6
2000	48.9	52.3	35.2	34.3	39.5	13.7
1995	50.1	54.5	27.8	35.2	39.5	13.7

Source: BBS

৩) শহর ও গ্রামভেদে মাসিক গড় আয় :

শহর ও গ্রামভেদে মাসিক গড় আয় :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে দেশে পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয় ছিল জাতিয়ভাবে ৫,৮৪২ টাকা, গ্রামে ৪,৮১৬ টাকা এবং শহরে ৯,৮৭৮ টাকা। ২০১৬ সালে পরিবারপ্রতি মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জাতিয়ভাবে ১৫,৯৮৮ টাকা, গ্রামে ১৩,৩৯৮ টাকা এবং শহরে ২২,৬০০ টাকা। ২০০০ থেকে ২০১৬ সময়কালের ব্যবধানে পরিবারপ্রতি মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে জাতিয়ভাবে ১০,১৪৬ টাকা, গ্রামে ৮,৫৮২ টাকা এবং শহরে ১২,৭২২ টাকা। ঐ সময়ে মাসিক আয় গ্রামের তুলনায় শহরে প্রায় ৪৮% বেশি। স্মারণী- ৩.৩(৫)

স্মারণী- ৩.৩(৫) : ২০০০-২০১৬ সময়ে গ্রাম ও শহরভেদে পরিবারপ্রতি মাসিক আয়ের চিত্র :-

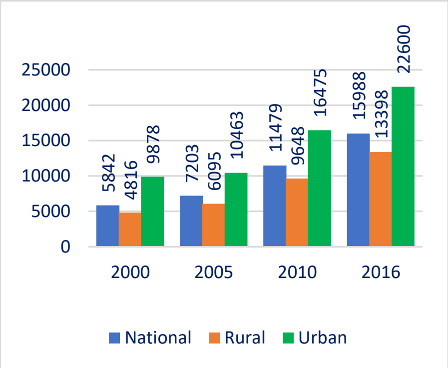

Source: BBS

৪) গ্রাম পর্যায়ে বসতবাড়ীর অবকাঠামো :

দেশের গ্রামাঞ্চলগুলোতে বেশিরভাগ পরিবারের আর্থিক দৈন্যদশার কারনে বসতবাড়ীর অবকাঠামো যথেষ্ঠ নিন্মমানের। ফলে প্রতিবছর ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন ও বন্যায় অসংখ্য ঘরবাড়ী নষ্ট হয়ে দরিদ্র মানষদের গৃহহীন করে তোলে, যা দেশের অর্থনীতিতে বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

গ্রাম পর্যায়ে বসতবাড়ীর অবকাঠামো:

HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট ৩৯.৩৩ মিলিয়ন পরিবারের ১১.০৬% (৪.৩৫ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি ইট/সিমেন্টের তৈরি, ৮৪.২৯% (৩৩.১৫ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি টিন/কাঠের ছাউনি এবং ৪.৬৫% (১.৮৩ মিলিয়ন) কুড়েঘর। গ্রামে মোট ২৮.২৬ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫.৩২% (১.৫০ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি ইট/সিমেন্টের ছাদ, ৮৯.৪১% (২৫.২৭ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি টিন/কাঠের ছাউনি এবং ৫.২৭% (১.৪৯ মিলিয়ন) কুড়েঘর স্মারণী- ৩.৩(৬)

স্মারণী- ৩.৩(৬) : ২০১৬ সাল নাগাদ গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ঘরবাড়ীর অবকাঠামো :-

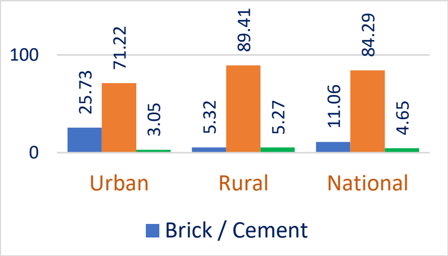

Source: BBS

৫) গ্রামপর্যায়ে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা :

গ্রামপর্যায়ে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা :

কৃষি সুমারি ২০১৯ অনুযায়ী দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত পরিবারসমূহের প্রায় ৭.৮৪% ভূমিহীন, যার পরিমাণ ২.৩২ মিলিয়ন, যারমধ্যে বরিশাল বিভাগে ০.০৯ মিলিয়ন, চট্রগ্রামে ০.২৭ মিলিয়ন, ঢাকায় ০.৬৫ মিলিয়ন, খুলনায় ০.২৭ মিলিয়ন, ময়মনসিংহে ০.১৬ মিলিয়ন, রাজশাহীতে ০.৩৪ মিলিয়ন, রংপুরে ০.৩২ মিলিয়ন এবং সিলেট বিভাগে ০.২২ মিলিয়ন। স্মারণী- ৩.৩(৭)

২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩.২৬ মিলিয়ন (১২.৮৪%)। ২০০৮ থেকে ২০১৯ এই এক যুগের ব্যবধানে দেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে প্রায় ০.৯৪ মিলিয়ন, নিসন্দেহে যা অগ্রগতির লক্ষণ। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন এসমস্ত পরিবারের বৃহদাংশই হয় কৃষি শ্রমিক, না হয় দিনমজুর, বছরের বেশিরভাগ সময় যারা কর্মের অভাবে বেকার দিন কাটায়। ফলে এ সমস্ত মানুষ জীবনে কখনোই আর্থিক স্বচ্ছলতার ছোঁয়া পায় না। গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে ভূমিহীন এ জনগোষ্ঠী সারাবছর কার্যে নিয়োজিত থেকে নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ পেত, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যা বিশেষভাবে অপরিহার্য।

স্মারণী- ৩.৩(৭) : বিভাগ অনুযায়ী ২০১৯ সালে দেশে ভূমিহীন কৃষি পরিবারের সংখ্যা :

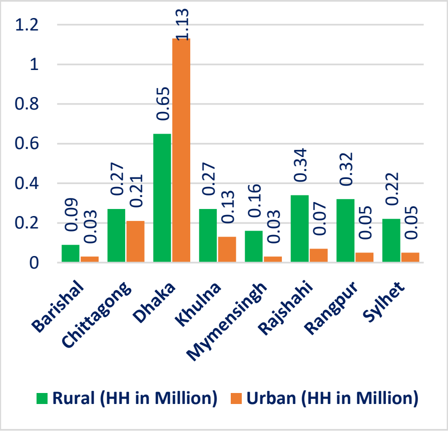

Agriculture Census 2019

SJIBD

অর্থনীতিতে কুঠির শিল্প প্রসারের গুরুত্ব :

খ) গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কুঠিরশিল্পের প্রসার :

ঘরোয়াভাবে নিজ কুঠিরে বিভিন্ন ধরনের লাভজনক কার্যক্রম পরিচালনা ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্যসামগ্রী উৎপাদন পূর্বক আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার রীতি দীর্ঘ দিনের, যা কুঠিরশিল্প হিসাবে পরিচিত। পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিবর্গের বেকার সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এ শিল্পের জুড়ি নেই। আকারে ছোট হলেও স্বল্প পুঁজি, স্বল্প পরিসরে ও নিজ কুঠিরে এ শিল্পের কার্য সম্পাদন সম্ভব হয় বলে উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে কুঠির শিল্পের আকার এবং এ শিল্পে কর্মসংস্থান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

SJFBD

অর্থনীতিতে কুঠির শিল্প প্রসারের গুরুত্ব :-

- কুঠির শিল্প শ্রম নির্ভর এবং দেশে কুঠির শিল্প প্রসারের মাধ্যমে শিল্পখাতে মোট কর্ম সংস্থানের দুই তৃতীয়াংশের বেশি কর্মসংস্থান এখাতে সম্ভব, যা বেকারত্ব হ্রাস এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।
- গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা সাধারণত পর্দানশীল, ঘরের বাহিরে কাজ করতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। স্বল্প পুঁজি, স্বল্প পরিসরে ও নিজ কুঠিরে এ শিল্পের কার্য সম্পাদন সম্ভব হয় বলে গ্রামীণ নারীদের জন্য এ কাজ বিশেষভাবে উপযোগী, যা নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবে নিঃসন্দেহে।
- এ শিল্প প্রসারের মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্থানীয় চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির উদ্যোগ নিয়ে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান।
- উৎপাদনশীল খাতের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে কুঠির শিল্প ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, তাই কুঠির শিল্পের প্রসার দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির জন্য অন্যতম সহায়ক।
- দেশে কুঠির শিল্পের প্রসার গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলোতে আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করবে, যা মানুষকে শহরমূখী থেকে গ্রাম মূখি করে তুলতে ব্যাপক ভূকিকা রাখবে।
- গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী করে তুলতে গ্রাম পর্যায়ে কুঠির শিল্পের প্রসার অন্যতম সহজ মাধ্যম।

১) দেশের ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আকার ও প্রসার :

উৎপাদনশীল খাত সমৃদ্ধ করনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি গতিশীল করতে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের ভুমিকা অনেক। বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বেকার সমস্যা গুছানোর মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলোতে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নে কুঠির শিল্পের বিকল্প নেই। এ শিল্পের প্রসারে যদি সরকারের সঠিক দিক নির্দেশনা, প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা, উৎপাদিত পণ্য বিপননের যথাযথ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে এ খাতে মোট উৎপাদন দেশের বৃহৎ শিল্পখাতে উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বিগত বছরগুলোতে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আকার ও আয়তন যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প দেশের অর্থনীতিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করবে এটা আশা করা যায়।

দেশের ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আকার ও প্রসার :

অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশের ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আকার ও প্রসারের হার পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থবছর ২০১১-১২ সময়ে এখাতের আকার ছিল টাঃ ২২,৫৬৯.১০ কোটি, যা অর্থবছর ২০১৮-১৯ সময়কালে এসে দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪০,৮৫১.৯০ কোটি। অর্থাৎ এই আট বছর সময়কালে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আকার বেড়েছে টাঃ ১৮,২৮২.৮০ কোটি, গড়ে প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়েছে টাঃ ২,২৮৫.৩৫ কোটি বা ১০.১৩%। স্মারণী-৩.৩(৯)

স্মারণী-৩.৩(৮) : অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প প্রসারের চিত্র :

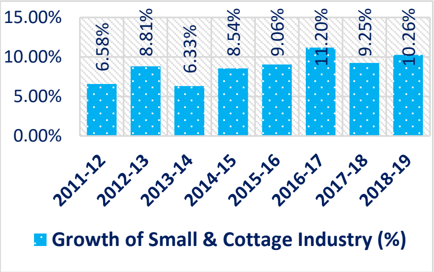

Source : Bangladesh Economic Review 2019

২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পে প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৫৮%, ২০১৮-১৯ সময়কালে তা দাঁড়িয়েছে ১০.২৬%। এ সময়কালে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে বছরে ৮.৭৫%। স্মারণী-৩.৩(৮)

স্মারণী-৩.৩(৯) : অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আকার ও প্রসারের চিত্র :

(in Crore Tk.)

Sector	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Small & Cottage	22,569.1	24,557.9	26,113.1	28,342.6	30,909.4	33,945.8	37,086.4	40,851.9
Growth %	(6.58)	(8.81)	(6.33)	(8.54)	(9.06)	(11.20)	(9.25)	(10.26)

Source : Bangladesh Economic Review 2019

জি.ডি.পি তে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পখাতের অবদান :

২) জি.ডি.পি তে কুঠির শিল্পখাতের অবদান :

দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পখাতের আকার ও প্রসারের সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিতে এখাতের অবদান বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিগত দশকে এখাতে প্রবৃদ্ধির হার যেহেতু অনেকটা একই রকম ছিল, সেহেতু দীর্ঘসময় ধরে জি.ডি.পিতে এখাতের অংশগ্রহণ অনেকটা অপরিবর্তীতই রয়ে গেছে। অর্থবছর ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের দেশের জি.ডি.পিতে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পখাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩.৫১%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩.৫১%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.৫৮%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩.৬৪%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.৭৩%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩.৭৮% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩.৮৫%। স্মারণী-৩.৩(১০)

স্মারণী-৩.৩(১০) : অর্থবছর ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পিতে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পখাতের অবদানের চিত্র :

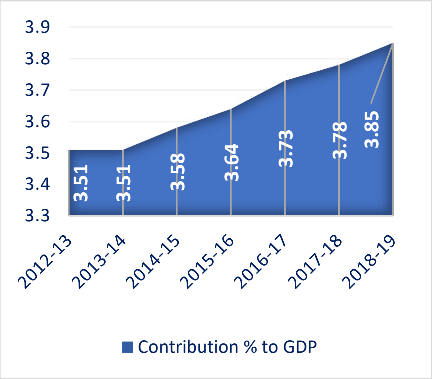

Source : MOF

পরিশেষে বলা যায়, দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের সম্ভাবনার তুলনায় এখনো পর্যন্ত এ শিল্পখাতের আকার ও বৃদ্ধির হার তুলনামূলক অনেক কম। অথচ ক্ষুদ্র ও কুঠিরশিল্প প্রতিষ্ঠা তুলনামূলক সহজ, যে কেহ স্বল্প পুঁজিতে ও স্বল্প সময়ে যে কোনো ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করে নিজের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে এ শিল্পের মাধ্যমে। কাজেই গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বেকারত্ব হ্রাস করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তনপূর্বক দেশের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ও টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলার মাধ্যমে এ শিল্পখাতের বিকাশ ঘটানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

কুঠির শিল্পের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা :

৩) কুঠির শিল্পের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা :

বাংলাদেশে কুঠির শিল্পের ইতিহাস দীর্ঘ সময়ের। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর নারী পুরুষ কুঠির শিল্পে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি দেশে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির প্রসারে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে। এ শিল্পের প্রসারে সরকারের নানামূখী পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত দশকে দেশে এ শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে কুঠির শিল্পের সংখ্যা ৮৫২,৫৬৮ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ১২৪,১০৫ এবং এ দুখাতে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৩.৭২ মিলিয়ন।

গ) গ্রাম পর্যায়ে কুঠিরশিল্প প্রসারে প্রস্তাবনা :

দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বসবাসরত লেবার ফোর্স বহির্ভুত কর্মক্ষম বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করনের মাধ্যমে তাদের জীবন মানে উন্নয়ন নিশ্চিত করা ব্যাতিত এদেশে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবেনা। এ সমস্যা বহু পুরানো, দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা সবসময় প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অতীতের সরকারগুলো এমনকি বর্তমান সরকারও পুরানো এ মহাসমস্যার যুগোপযোগী সমাধানে সর্বশক্তি দিয়ে লড়ছেন। কাজেই সময় এসেছে প্রকট এ মহা সমস্যার সময়োপযোগী সমাধান খুজে বের করার।

SJFBD

লেবার ফোর্স বহির্ভূত কর্মক্ষম গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশাল এ অংশকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের জীবন মানে উন্নয়ন আনতে বিসিক, সরকার কতৃক বাছাইকৃত নির্দিষ্ট কিছু এন.জি.ও এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে :-

১. গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে কুঠির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে এখাতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরোও গতিশীল করার কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহন করা, যাতে নিন্মোক্ত বিষয়সমূম অন্তর্ভূক্ত থাকবে :-

- বিসিক, নির্দিষ্ট কিছু এন.জি.ও এবং কৃষি মন্ত্রণলয়ের সমন্বয়ে **"কুঠিরশিল্প উন্নয়ন"** নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও আন্তর্জাতিক বাজার যাছাইপূর্বক এ খাতে উৎপাদনযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন এবং ঐ তালিকার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে কুঠির শিল্পখাতে উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

ক) দেশিয়ভাবে বারজাত পণ্যের তালিকা :

- সেলাই প্রকল্প, শাড়ী, থ্রি পিছ, পাঞ্জাবি ইত্যাদিতে পাথর বসানো ও কারুকাজ প্রকল্প।
- গ্রামে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যাপক ব্যব্হৃত বেতের জিনিষপত্র, যেমন- গ্রামাঞ্চলে বহুল ব্যব্হৃত শীতল পাটি, তাল পাতার নকশী পাখা, বসার মোড়া এবং বাঁশ ও কাঠের আসবাবপত্র, বিভিন্ন আকর্ষনীয় হস্তশিল্প ও দৈনন্দিন গৃহকাজে ব্যব্হৃত জিনিষপত্র।

গ্রাম পর্যায়ে কুঠিরশিল্প প্রসারে প্রস্তাবনা :

- কাথা ও কম্বল সেলাই , কৃত্তিম ফুল তৈরি, বুটিক ও কাপড় ছাপার কাজ, স্ক্রীণ প্রিন্টিং ইত্যাদি।
- মৌ চাষ, মাশরুম চাষ, মোমবাতি তৈরি, খেজুর গুড় উৎপাদন, সরিষার তৈল উৎপাদন, নকশা করা মাটির জিনিষপত্র তৈরি এবং এ জাতীয় বহু কাজ আছে যা গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা অনায়াসে করতে পারে।
- ঘরোয়াভাবে দুগ্ধজাত পণ্য, যেমন-ঘি, পনির, চীজ ও মাখন উৎপাদন।

খ) রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা :

- বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন শো-পিচ, খেলনা, পুতুল, নকশী কাথা, কৃত্তিম ফুল, বাঁশ ও বেতের শো-পিচ এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প।

২. কুঠিরশিল্পে নিয়োজিত নারীদের সঞ্চয় প্রকল্পের বিপরীতে সরকারি প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুবিধা প্রদান করা।

৩. বিসিকের মাধ্যমে সমগ্র দেশে উপজেলা পর্যায়ে **"উপজেলা কুঠির শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র"** স্থাপনপূর্বক ঐ সংস্থার মাধ্যমে নিন্মোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন :-

- কুঠিরশিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত পণ্য সমূহ উৎপাদনের উপর গ্রাম পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিতদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান পূর্বক স্ব-স্ব প্রশিক্ষিত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত হওয়া নিশ্চিত করা এবং মাঠপর্যায়ে নিয়মিত তদারকির করা, যাতে প্রশিক্ষিত কোনো ব্যাক্তি উৎপাদন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে না পারে।
- এ খাতে উৎপাদিত পণ্য সমূহ **"উপজেলা কুঠির শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র"** সমূহের মাধ্যমে সরকার কতৃক নির্ধরিত দামে ক্রয়ের ব্যবস্থা।
- ক্রয়কৃত পণ্য সমূহ সরকারি উদ্যোগে দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত মূনাফা দেশে কুঠিরশিল্প উন্নয়নে ব্যয় করা।
- এ খাতে অর্থায়নের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাংক ও এ.জি.ও সমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সুদে মাঠপর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- উপজেলা ভিত্তিক **"কুঠিরশিল্প উন্নয়ন তথ্য"** সংরক্ষনের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা, যাতে সংশিষ্ট বছরে প্রশিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গের সংখ্যা, ঐ বছরে নতুন চালু হওয়া শিল্পের সংখ্যাসহ মোট শিল্পসংখ্যা, বার্ষিক উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও টার্ণওভার এবং উপজেলা ভিত্তিক এ খাতের বাৎসরিক লাভক্ষতির হিসাব প্রকাশ করা।
- মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের জবাব দিহিতা নিশ্চিত এবং দক্ষতার সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টিকরা।

৪. **উপজেলা কৃষি অফিস সমূহের মাধ্যমে নিন্মোক্ত বিষয় সমূহের উপর গ্রাম পর্যায়ে নারীদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ :**

- আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস চাষ, বাড়ির আশপাশে শাক সবজি চাষ।
- মৌ চাষ, মাশরুম চাষ, খেজুর গুড় উৎপাদন, সরিষার তৈল উৎপাদন, দুগ্ধজাত পণ্য, যেমন-ঘি, পনির, চিজ ও মাখন উৎপাদন।
- প্রশিক্ষিতদেরকে প্রশিক্ষিত কর্মে নিয়োজিত হতে প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

SJBD

নোট : বিসিক ও উপজেলা কৃষি অফিস সমূহের পাশাপাশি পর্যাপ্ত জবাবদিহিতার বিধান রেখে নির্দিষ্ট কিছু এন.জি.ও সমূহকে **এ** কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

৫. প্রত্যেক গ্রামে উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে **"ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প উন্নয়ন সমিতি"** চালুকরা, যাতে সেখানে পর্যাপ্ত প্রচারনার পাশাপাশি গ্রামপর্যায়ে এ শিল্পের ভীত মজবুত হয়।

৬) **NGO সমূহের নিজস্ব বিনিয়োগ ও তত্বাবধানে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী প্রকল্প চালুকরা :** বেসরকারি সংস্থা বা NGO গুলো মাইক্রো ক্রেডিটের নামে শুধুমাত্র খণ প্রদানে সীমাবদ্ধ না থেকে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে কুঠির শিল্প প্রসারে কার্যক্রম পরিচালনা পূর্বক কুঠির শিল্পের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের সাথে এক সংগে কাজ করতে হবে।

৭) **বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিতদের প্রয়োজনীয় অর্থায়ন পূর্বক কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বার্থে কিছু লিখিত শর্ত আরোপ করা যেতে পারে, যেমন :-**

- এ সুবিধার আওতায় কর্মরত নারীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থা অবলম্বন করবেন এবং পরিবার দুই সন্তানের মধ্যে সীমিত রাখার অঙ্গিকার।
- প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে কমপক্ষে এস.এস.সি এবং দুই বছরের ভোকেশনাল কোর্স সমাপ্ত করাবেন।
- ছেলেমেয়েদের বাল্য বিবাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।
- যৌতুক দেয়া নেয়া থেকে বিরত থাকবেন।
- নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য সকলক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম কানুন মেনে চলবেন।
- প্রত্যেকে তাদের মাসিক আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ (সরকার কর্তক নির্ধারিত) সরকারি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা করবেন। মেয়াদ শেষে যা সরকারি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নিয়ম অনুযায়ী পেনশন আকারে প্রদত্ত হবে, যাতেকরে এখাতে কর্মরত প্রত্যেক কর্মী ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে পুরোপুরি রক্ষা পেতে পারেন।

SJFBD

৮) কুঠির শিল্পের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক উন্নয়নের অফুরন্ত সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে যে কয়টি বিষয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে পুরোপুরি বাস্তবায়ন প্রয়োজন, সেগুলো হলো :-

- মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, তদারকি, জবাব দিহিতা ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
- এখাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, কারিগরি ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা।
- এখাতে উৎপাদিত পণ্য সরকারিভাবে উপজেলা পর্যায়ে ন্যায্য দামে ক্রয়/ বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকা।
- উপজেলা ও জাতিয় পর্যায়ে এখাতের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও বৎসরান্তে প্রকাশ করা।

****

অধ্যায় : ৩.৪

উপজেলা পর্যায়ে SME খাতের বিকেন্দ্রিকরন।

উপজেলা পর্যায়ে SME খাতের বিকেন্দ্রিকরন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) উপজেলা পর্যায়ে SME খাতের বিকেন্দ্রিকরন।

১) বাংলাদেশে SME খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।
২) বিশ্বব্যাপি SME খাতের প্রসার।

খ) বাংলাদেশের SME খাতের বর্তমান পরিস্থিতি।

১) উৎপাদনশীল খাতের আকার।
২) উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধি।
৩) জি.ডি.পিতে উৎপাদনশীল খাতের অংশ।
৪) SME খাতে অর্থায়ন।

গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ।

ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

ক) উপজেলা পর্যায়ে SME খাতের বিকেন্দ্রিকরন :

উপজেলা পর্যায়ে SME খাতের বিকেন্দ্রিকরন :

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি বানিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল খাত সকল দেশেই মূখ্য ভূমিকা পালন করে এটা কম বেশি সবার জানা । দেশের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ও টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করতে উন্নয়নগামী দেশসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণত উৎপাদনশীল খাতের আওতাভূক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে বিশ্বব্যাপি এ খাতের দ্রুত বিস্তার ঘটছে, বিশেষ করে বিগত দশকে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই SME খাতের অগ্রগতি যথেষ্ঠ গতিশীলতা পেয়েছে। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে SME খাতের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ৮০%, ভারতে ৯৭.৬০%, চীনে ৯৯%, জাপানে ৯৯.৭০% এবং পাকিস্তানে ৬০%।

বাংলাদেশের মত জনবহুল ও স্বল্পআয়ের দেশে এস.এম.ই খাত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় আকারের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। বিশেষকরে উপজেলা পর্যায়ে এস.এম.ই খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে সমগ্র দেশকে এস.এম.ই নেটওয়ার্কের আওতায় এনে এখাতে প্রচুর কর্মসংস্থান ঘটিয়ে দেশে দারিদ্রের কৌটা শূন্যে নামিয়ে আনা মোটেও অসম্ভব নয়। ২০১৯ সালের তথ্যানুযায়ী দেশে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৩০% এস.এম.ই খাতে, যারমধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পে ২৭% এবং অবশিষ্ট ৩% মাঝারি শিল্পখাতে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে এস.এম.ই খাতের অংশগ্রহণ বাংলাদেশে মাত্র ২০.২৫%, যেখানে ভারতে ৮০%, চীনে ৬০% এবং জাপানে ৬৯.৫০%।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সম্ভাবনার তুলনায় বাংলাদেশে এস.এম.ই খাত মোটেও প্রসারিত হয়নি, যদিও বিগত দুই দশক ধরে এস.এম.ই খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড হিসাবে কাজ করছে।

১) বাংলাদেশে SME খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

বাংলাদেশের মত উন্নয়নগামী ও জনবহুল দেশে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রপ্তানিখাত প্রসারিত করনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। কেননা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ কম এবং শহর অথবা গ্রাম সর্বত্রই সকল শ্রেণির উদ্যোক্তা এখাতে বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। এদেশের অর্থনীতি গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত এবং শ্রম ও জমি তুলনামূলক সস্তা। এ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য দেশের আলোকে SME খাতকে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সোপান হিসাবে চিহ্নিত করে

SIPBD

এখাতে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মানসন্মত পণ্য উৎপাদন এবং নতুন বাজার খোঁজার মাধ্যমে SME খাতকে সারাদেশে আকর্ষনীয় বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে দেশের উৎপাদনশীল খাতের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে SME খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

যে সমস্ত কারনে বাংলাদেশে এস.এম.ই খাতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, নিম্নে তার কয়েকটি তুলেধরা হলো :-

- স্বল্প পুঁজি ও তুলনামূলক কম শ্রমিক লাগে।
- এখানে জমি ও শ্রম তুলনামূলক সস্তা।
- গ্রাম ও শহরভেদে সর্বত্র এ শিল্পের প্রসার সম্ভব।
- উৎপাদিত পণ্য দেশে বিক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির সুযোগ।
- এস.এম.ই খাতের উন্নয়নে সরকারের আগ্রহের ফলে ব্যাংক ঋণের সুবিধা।
- দেশে এস.এম.ই খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে উঠছে দ্রুত।
- এস.এম.ই খাত প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে দ্রুত, যা দেশে দারিদত্র্য নির্মূলে বড় ভূমিকা রাখবে।

২) বিশ্বব্যাপি SME খাতের প্রসার :

বিশ্বব্যাপি SME খাতের প্রসার :

বিশ্বব্যাপি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্ববানিজ্য সংস্থার মতে সারাবিশ্বে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৫% এস.এম.ই খাতের আওতাভূক্ত এবং বিশ্বের মোট কর্মসংস্থানের ৬৫% এখাতে সংঘটিত হয়। বিশ্বায়নের এ যুগে অনেক দেশই SME খাতের প্রসার ঘটিয়ে এখাতে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিশ্ব বাজারে স্থান করে নেওয়ার ব্যাপক সুযোগ কাজে লাগিয়ে রপ্তানিখাত প্রসারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালি করে তোলায় ব্যাস্ত। তবে এজন্য দরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, SME খাতে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মানসন্মত পণ্য উৎপাদন এবং নতুন বাজার অন্বেষণ। বিগত দশকে এশিয়ার অনেক দেশই এ পলিসি কাজে লাগিয়ে SME খাতকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সোপান হিসাবে ব্যবহার করে যথেষ্ঠ সফলতা পেয়েছে। ঐ সমস্ত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের উৎপাদিত পণ্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিঠানোর পাশাপাশি সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করে থাকে, যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত দশকে এশিয়ার কয়েকটি দেশের রপ্তানিতে SME খাতের অবদানের চিত্র স্মারণী-৩.৪(১) এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :-

স্মারণী-৩.৪(১) : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের এস.এম.ই খাতের সরাসরি রপ্তানি এবং মোট রপ্তানিতে অংশগ্রহনের চিত্র :

Country	Share of Firms Exporting Directly (%)			Share of Total Sales that are Exporting Directly (%)		
	Small	Medium	Large	Small	Medium	Large
Combodia	6.9	19.1	26.9	6.8	16.7	26.3
Indonesia	5.3	7.9	25.2	2.9	5.0	11.7
Malaysia	4.3	19.2	69.0	2.2	7.6	30.3
Viet Nam	4.0	11.5	36.1	2.2	6.6	21.6
Philippine	3.9	9.0	23.6	1.8	6.1	16.6
Thailand	2.2	3.4	28.1	0.8	2.0	18.9
Myanmar	1.2	10.7	39.6	1.2	5.3	38.2

Source : WTO

বাংলাদেশের এস.এম.ই খাতের বর্তমান পরিস্থিতি :

খ) বাংলাদেশের এস.এম.ই খাতের বর্তমান পরিস্থিতি :

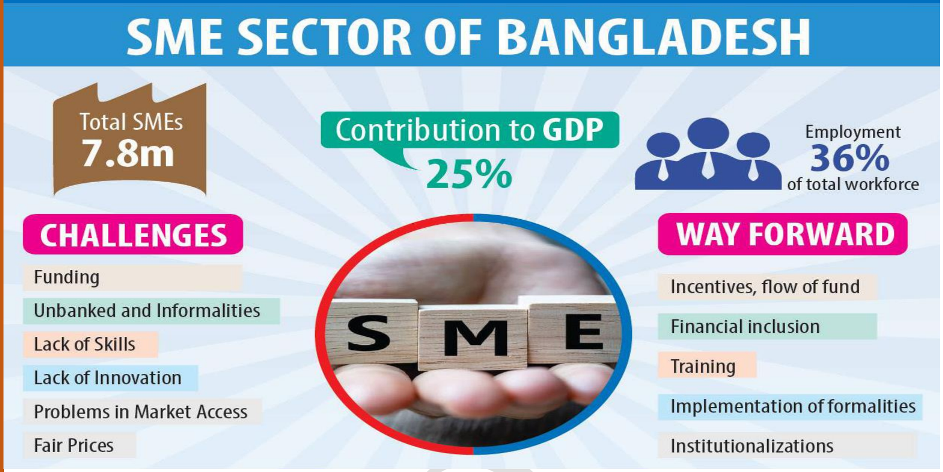

বর্তমান সরকার SME খাতকে সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং বাংলাদেশ SME ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এখাতকে এগিয়ে নেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। SME উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৫ এ ১১টি শিল্পখাতকে বুস্টার খাত হিসাবে চিহ্নিত করে আকার অনুযায়ী এ খাতকে চার ভাগে (মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুঠির) বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সম্ভবনাময় SME খাতের উন্নয়নে এ খাতকে কয়েকটি উপখাতে বিভক্ত করে ঋণ সহায়তা বৃদ্ধি, রপ্তানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনাসহ বিভিন্নমূখী সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এ খাতের প্রসারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

Economic Census 2013 এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে সব ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৫,১৪,০৯১ টি, যারমধ্যে কুঠিরশিল্প ৩৬,৫১,২৫৩ টি (৮০.৮৯%), মাইক্রো শিল্প ৮০,৪২৩ টি (১.৭৮%), ক্ষুদ্রশিল্প ৭৭০,০৬৩ টি (১৭.০৫%), মাঝারি শিল্প ৭,১০৯ টি (০.১৬%) এবং বৃহৎ শিল্প ৫,২৪৭ টি (০.১২%)। ঐ সময়ে শিল্পখাতে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১৯০,৬২,৯৭৮, যারমধ্যে কুঠিরশিল্পে ৪২.০৩%, মাইক্রো শিল্পে ২.৫৫%, ক্ষদ্রশিল্পে ৩৩.৫২%, মাঝারি শিল্পে ৩.৭০% এবং বৃহৎ শিল্পে ১৮.২০%।

সারণী-৩.৪(২) : ২০১২-১৩ সময়কালে দেশে সব ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এখাতে কর্মরত লোক সংখ্যার চিত্র :-

Category of Establishments	No. of Establishments	Total Persons Engaged	Employment As % of Total	Average Employment per Establishment
Cottage	36,51,253	80,12,684	42.03 %	2.19 Persons
Micro	80,423	486 ,765	2.55 %	6.05 Persons
Small	770,063	63,90,577	33.52 %	8.30 Persons
Medium	7,109	706,111	3.70 %	99 Persons
Large	5,247	34,66,841	18.20 %	661 Persons
Total :	45,14,091	190,62,978	100 %	4.22 Persons

Source: BBS

Figure-3.4(3): No. of Permanent Establishments and Employments in Industrial Sector by 2012-13 :

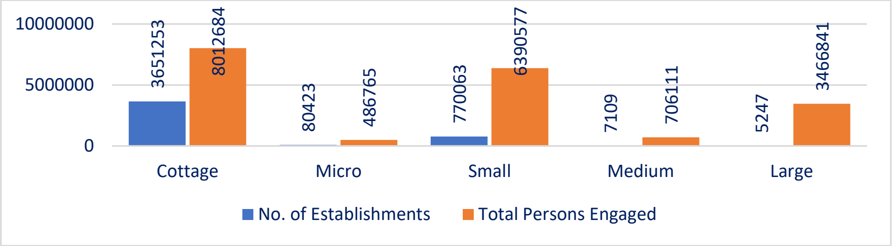

Source: BBS

১) উৎপাদনশীল খাতের আকার :

উৎপাদনশীল খাতের আকার :

কোনো দেশের অর্থনীতির মাপকাঠি বিচারে ঐ দেশের উৎপাদনশীল খাতের আকার ও প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির ভীত মজবুত করতে উৎপাদনশীল খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বর্তমান সরকার উৎপাদনশীল খাতের প্রসারে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এখাতে অর্থায়ন ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাত প্রসারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু অবাক করার মত বিষয় হচ্ছে বিগত বছরগুলোতে দেশে উৎপাদনশীল খাতে শিল্প সংখ্যা আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিগত দশকে দেশের উৎপাদনশীল খাতের আকার বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৮ (সাত বছর) সময়ের ব্যবধানে দেশে উৎপাদনশীল খাতে মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা কমেছে ৬৯৫ টি, এ সময়কালে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা বেড়েছে ৭,৮৯১ টি, মাঝারি শিল্পের সংখ্যা কমেছে ৩০৮৯ টি এবং বৃহৎ শিল্পের সংখ্য কমেছে ৬০৮ টি। অর্থাৎ বিগত দশকে দেশে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও , মাইক্রো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

স্মারণী-৩.৪(৪) : অর্থবছর ২০১২ - ২০১৮ সময়কালে দেশে উৎপাদনশীল খাতের আকার হ্রাস / বৃদ্ধির চিত্র :-

Class of Industry	Industrial Survey 2019				Industrial Survey 2012			
	No. of Estab lisments	People Engaged	Net Fixed Asset (In Crore TK.)	Value of products (In Crore TK.)	No. of Estab lishmen ts	People Engaged	Net Fixed Asset (In Crore TK.)	Value of products (In Crore TK.)
Micro (TPE 0-24)	16,689	263,720	8,365.7	31,215.2	17,384	271,644	4,652.8	27,581.8
Small (TPE 25-99)	23,557	11,27,841	65,123.2	195,448.7	15,666	738,801	28,333.6	120,326.7
Medium (TPE 100-250)	3,014	461,142	28,963.4	33,007.2	6,103	10,41,220	28,690.1	140,834.2
Large (TPE 250+)	3,031	40,27,141	222,255.9	586,735.1	3,639	29,64,272	57,134.2	250,747.8
Total :	**46,291**	**58,79,844**	**324,708.2**	**846,406.2**	**42,792**	**50,15,937**	**118,810.8**	**539,490.5**

Source: BBS

Figure-3.4(4) : Size and Growth of Manufacturing Sector during F.Y 2012-2019 :-

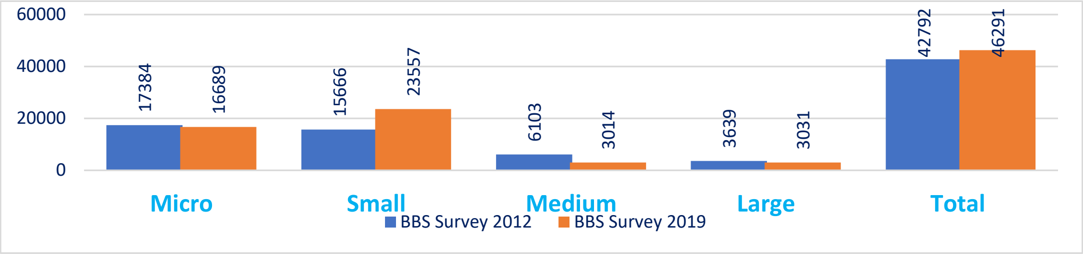

Source: BBS

উৎপাদনশীল খাতের প্রবৃদ্ধি :

২) উৎপাদনশীল খাতের প্রবৃদ্ধি :

উৎপাদনশীলখাতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প মিলিয়ে প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৬.৬৫%, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.২০%। এ সময়কালে উৎপাদনশীলখাতে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল বছরে ১০.৬৩%।

বিগত প্রায় দুই যুগ ধরে দেশের উৎপাদনশীলখাতে প্রবৃদ্ধি ৭% থেকে ১০.৫০% এর মধ্যে উঠানামা করেছে। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে উৎপাদনশীলখাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি, কেননা, উৎপাদনই উন্নতি। স্মারণী-৩.৪(৫)

স্মারণী-৩.৪(৫): অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

Source: MOF

জি.ডি.পিতে উৎপাদনশীল খাতের অংশ :

৩) জি.ডি.পিতে উৎপাদনশীল খাতের অংশ :

অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প মিলিয়ে জি.ডি.পিতে উৎপাদনশীল খাতের অংশ ১৭% - ২৪% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে উৎপাদনশীল খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে ২৪.০৮%, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ১৭.২% স্মারণী-৩.৪(৬)। অথচ বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহে শুধুমাত্র এস.এম.ই খাতের অংশ জি.ডি.পিতে গড়ে ৪০% এর উপরে। ২০১৯ সালে জিডিপিতে এস.এম.ই খাতের অংশ বাংলাদেশে ২৫%, মালয়েশিয়ায় ৩৮.৯%, ভারতে ৪৫%, সিঙ্গাপুরে ৫০% এবং দ. কোরিয়ায় ৫১%। (Researchgate)

স্মারণী-৩.৪(৬): অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পিতে উৎপাদনশীল খাতের অংশ :-

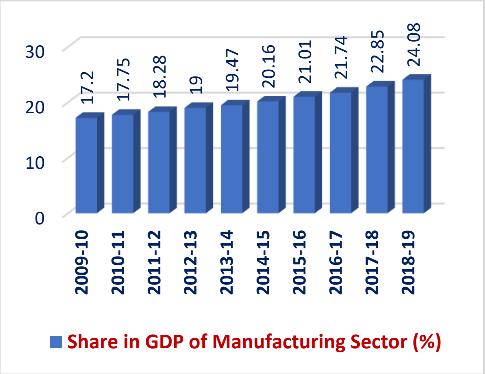

Source: MOF

SME খাতে অর্থায়ন :

৪) SME খাতে অর্থায়ন :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এস.এম.ই খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচাইতে সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এখাতের দ্রুত উন্নয়ন অগ্রাধিকার বিবেচনায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার এখাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি করেছেন। অর্থবছর ২০১১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত (আট বছর) সময়কালে CMSME খাতে বিতরকৃত ঋণের পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১১ অর্থবছরে এখাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল টাঃ ৫৫,২৫৬ কোটি, যা ২০১৮ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে টাঃ ১৫৫,৮০৯ কোটি। এ আট বছর সময়কালে CMSME খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বার্ষিক প্রায় ১৫%।

তিনটি সাব-ক্যাটাগরিতে (সার্ভিস, ম্যানুফ্যাকচারিং ও ট্রেডিং) বিতরণকৃত ঋণ বণ্টনের হার যথাক্রমে, সার্ভিস খাতে : ৫% - ৭%, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে : ২৮% - ৩০% এবং ট্রেডিং খাতে : ৬২% - ৬৫%। অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিতরণকৃত ঋণের হার ট্রেডিং খাতে বিতরণকৃত ঋণের প্রায় অর্ধেক। বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যমতে বাংলাদেশে এস.এম.ই সেক্টরে অর্থায়নের হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় যথেষ্ঠ কম। নিন্মে অর্থ বছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত (আট বছর) সময়কালে CMSME খাতে বিতরকৃত ঋণের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো।

স্মারণী-৩.৪(৭) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে এস.এম.ই খাতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কতৃক বিতরণকৃত ঋণের চিত্র :

(Taka in Crore)

Period	Disbursement Sub-Categories			Total Taka	Increase (%)
	Service	Manufacturing	Trading		
F.Y 2010-11	3,237	15,436	36,583	55,256	3.20%
F.Y 2011-12	3,509	18,384	37,919	59,812	8.25%
F.Y 2012-13	4,202	23,304	51,841	79,346	32.66%
F.Y 2013-14	6,060	25,129	59,447	90,636	14.23%
F.Y 2014-15	9,894	32,350	68,043	110,287	21.68%
F.Y 2015-16	14,133	32,997	81,938	129,068	17.03%
F.Y 2016-17	18,444	37,378	99,963	155,785	20.70%
F.Y 2017-18	26,691	48,871	80,247	155,809	0.02%

Source : Bangladesh bank SME Dept.   CMSME : Cottage, Micro, Small and Medium Enterprise.

Figure-3.4(8) : Graphical presentation of the information shown in Figure-3.4(7) above :-

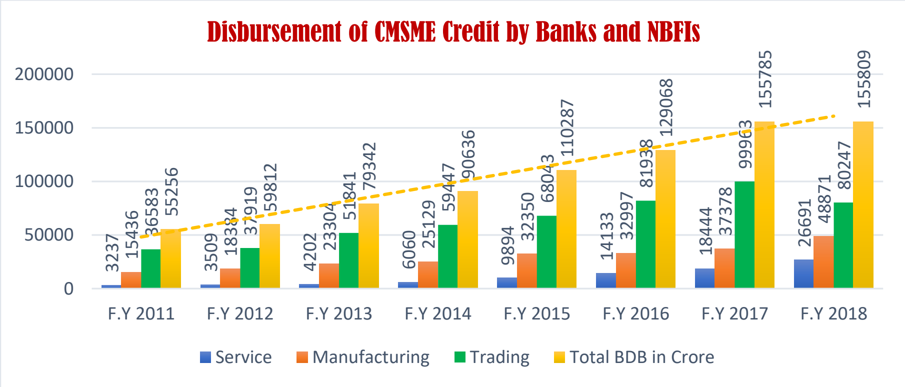

Source : Bangladesh bank

গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে এস.এম.ই খাতের টেকসই উন্নয়নপূর্বক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরনে অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করলেও, বাংলাদেশ সে তুলনায় এক্ষেত্রে অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এস.এম.ই খাতে গড়ে মোট কর্মসংস্থানের ৫০% এবং জি.ডি.পিতে গড়ে ৪০% অবদান রাখলেও বাংলাদেশে এ হার এখনো ৩০% এবং ২৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশে এস.এম.ই খাত উন্নয়নে পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ঐ সমস্ত সম্ভাবনা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারার কারনে এক্ষেত্রে কাঙ্কিত অগ্রগতি অর্জনে বিলম্বিত হচ্ছে। শহরকেন্দ্রিক এস.এম.ই খাত, অপর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং অর্থায়ন জটিলতা, ব্যবসায়িক ও প্রযুক্তিগত অদক্ষতা এবং আরোও বহুবিধ কারনে বাংলাদেশে এস.এম.ই খাত পিছিয়ে রয়েছে।

নিন্মে এস.এম.ই খাতের উন্নয়নে উল্ল্যেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা সমূহ তুলেধরা হলো :-

১) **শহরকেন্দ্রিক এস.এম.ই খাত :** বাংলাদেশে এস.এম.ই খাতের প্রসারে সরকার কতৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধসমূহ অনেকাংশে শহরকেন্দ্রিক, ফলে শুধুমাত্র শহর এলাকাতেই এখাতের প্রসার সীমিত রয়েছে।

২) **উপজেলা পর্যায়ে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার মত অবকাঠামো না থাকা :** উপজেলা পর্যায়ে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার মত অবকাঠামো বা শিল্প পার্ক না থাকার ফলে এস.এম.ই সেক্টরে শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক ব্যবসা ও শিল্প গড়ে উঠছে। ফলে গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষিত যুবশ্রেণী শহরে আসা ব্যাতিত ব্যবসা বানিজ্য শুরু করার সুযোগ নেই, যা এ সেক্টর প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা।

৩) **ব্যবসায়িক দক্ষতার অভাব :** সাধারণত স্বল্প ও মাঝারি পুঁজির উদ্যোক্তাগণ এস.এম.ই খাতে বিনিয়োগ করেন, যাদের বেশির ভাগই ব্যবসায়িকভাবে অদক্ষ।

৪) **প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব :** বর্তমান মুক্ত অর্থনীতির যুগে উন্নত প্রযুক্তির শিল্প ব্যাতিত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা মুশকিল। নিজ ব্যবসা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত ধারণা ও কারিগরি দক্ষতা ব্যাতিত উন্নত প্রযুক্তির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রায় অসম্ভব, যারজন্য প্রয়োজন সরকারিভাবে পৃষ্টপোশকতা ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা, যা এখনো এদেশে অপর্যাপ্ত।

৫) **দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** এস.এম.ই সেক্টরে দক্ষ শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, ফলে এ সেক্টরে কাঙ্কিত উৎপাদনশীলতা এখনো আসেনি।

৬) **অপর্যাপ্ত অর্থায়ন :** যেহেতু স্বল্প পুঁজির উদ্যোক্তাগণ এস.এম.ই খাতে বিনিয়োগ করেন, সেহেতু এ সেক্টরের দ্রুত প্রসারে পর্যাপ্ত অর্থায়ন প্রয়োজন। সরকার ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে এখাতে অর্থায়নের সুযোগ দিলেও চাহিদার তুলনায় এখনো তা যথেষ্ঠ অপ্রতুল।

৭) **অর্থায়ন জটিলতা :** যেহেতু এস.এম.ই খাতে অর্থায়নেরক্ষেত্রে কোলেটারিয়েল হিসাবে স্থায়ী সম্পত্তি রাখার বিধান নেই, সেহতু অর্থায়নকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এখাতে অর্থায়নে অনিশ্চয়তায় ভোগেন এবং অর্থায়নে অনাগ্রহী দেখান।

৮) **উদ্যোক্তা উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা :** এস.এম.ই খাতে উদ্যোক্তা উন্নয়নে দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ অপ্রতুল।

৯) **উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বাধ্যবাধকতা না থাকা :** খোলা বাজার অর্থনীতিতে পণ্যের গুণগত মান একটি বড় বিষয়। এস.এম.ই খাতে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে

সরকারিভাবে বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অনেক উদ্যোক্তা বাজার ধরতে ব্যার্থ হয়ে ব্যবসা গুটান।

১০) **উদ্যোক্তাদের মাঝে রপ্তানি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব :** রপ্তানি বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে এস.এম.ই উদ্যোক্তাগণ উৎপাদিত পণ্যের বাজার অন্বেষণ ও বিদেশে রপ্তানি করতে ব্যার্থ হয়, ফলে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং লোকসানের মুখোমুখি হন।

১১) **শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে ব্যবসায়িক মনোভাবের অভাব :** শিক্ষিত যুব সমাজে চাকরির প্রতি দুর্বলতা থাকার কারনে দেশে এস.এম.ই সেক্টরে নতুন উদ্যোক্তা কম সৃষ্টি হচ্ছে, যা এ সেক্টরের প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

১২) **দূরদর্শী ও বাস্তবসন্মত সরকারি পরিকল্পনার অভাব :** দেশে এস.এম.ই খাতের উন্নয়নে এস.এম.ই নীতিমালা ২০০৫ চলমান এবং এস.এম.ই পলিসি ২০১৯ (ড্রাফট) চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে দেশে এস.এম.ই খাতের টেকসই উন্নয়নে ঐ সমস্ত পলিসি অবশ্যই দুরদর্শী ও বাস্তবসন্মত হওয়া বাঞ্চনীয়, যাতে এস.এম.ই খাত দেশের অর্থনীতিতে উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়।

ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

শস্তা জমি, শস্তা শ্রম, স্বল্প পুঁজি ও অন্যান্য দিক বিবেচনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা শহরের তুলনায় মফঃস্বলে অধিকতর সহজ। মফঃস্বলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো এবং সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থারও যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছে এরিমধ্যে। তাছাড়া গ্রমাঞ্চলে মানুষদের আর্থিক স্চ্ছলতা এখন আগের চেয়ে বেড়েছে, গ্রমাঞ্চল গুলোতে অনেকেরই ব্যাংকে জমা টাকা রয়েছে, অথচ পর্যাপ্ত ব্যবসায়িক জ্ঞানের অভাবে এ সমস্ত লোকজন শিল্পখাতে বিনিয়োগ করতে ভয় পায়। সরকার যদি মফঃস্বল গুলোতে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ও বিনিয়োগ কারিদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা নেন, তাহলে গ্রামের আর্থিক স্বচ্ছল ব্যক্তিরা এ শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠবেন অনায়াসে এবং এ ক্ষেত্রে সফলতা এদেশের অর্থনীতিকে অনেক বেগবান ও টেকসই করে তুলবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উপজেলা পর্যায়ে উৎপাদনশীল খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সম্ভাব্য পদক্ষেপ সমূহ :-

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে প্রস্তাবনা সমূহ :

১) দেশব্যাপি এস.এম.ই খাতের টেকসই উন্নয়নে দূরদর্শী ও বাস্তবসন্মত নীতিমালা প্রণয়ন।

২) প্রত্যেক উপজেলা সদরে স্বয়ংসম্পূর্ণ " **উপজেলা শিল্প পার্ক"** স্থাপনপূর্বক সেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ, যেখানে নিন্মোক্ত সুবিধা সমূহ বর্তমান থাকবে :-

- শিল্প পার্ক স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।
- শিল্প পার্কে অবস্থিত শিল্প কারখানায় ভূর্তুকি মূল্যে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ ।
- ট্যাক্স হলিডে, এক্সপোর্ট বেনিফিট ও শিল্পসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- কাঁচামাল ও ক্যাপিট্যাল মেশিনারীজ আমদানির ক্ষেত্রে ডিউটি ফ্রি ও সর্বনিন্ম হারে ভ্যাট সুবিধা প্রদান।
- শিল্প স্থাপনে নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা।

৩) প্রত্যেক উপজেলা সদরে " **ওয়ান স্টপ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা সেল** " স্থাপন করা, যাতে শিল্প প্লট বরাদ্ধ, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও ছাড়পত্র এবং শিল্পস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও পরামর্শ এক জায়গায় পাওয়া যায়, পাশাপাশি নিন্মোক্ত বিষয় সমূহের উপর প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও তদারকি করন :-

- ক্ষুদ ও মাঝারি শিল্পের আওতায় শিল্প স্থাপনের জন্য গ্রাম পর্যায়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যাক্তিদের মাঝে পর্যাপ্ত প্রচার ও প্রচারণা চালানো।
- শিল্প পার্কে ক্ষুদ ও মাঝারি শিল্প এবং গ্রাম পর্যায়ে কুঠির শিল্প স্থাপনে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণ, রপ্তানি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের সুপারিশ পূর্বক উদ্যোগক্তাদেরকে এখাতে প্রবাহিত করন।
- এস.এম.ই সেক্টরে দক্ষ শ্রমিক বাহিনি গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা।
- রপ্তানিমূখী পণ্য উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়ভাবে সরকার কতৃক ন্যায্য দামে ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকা।

৪. এস.এম.ই খাতে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

৫. ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কতৃক এস.এম.ই খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতাসমূহ দূর করা, যাতে এখাতে অর্থায়ন সহজ ও স্বচ্ছ হয়।

৬. শিক্ষিত যুব শ্রেণীর মাঝে ব্যবসায়িক প্রবণতা সৃষ্টি করতে উপজেলা শিল্প ও কারিগরি সেলের উদ্যোগে নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করা।

৭. অন্যান্য দেশের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এস.এম.ই সেক্টরে উৎপাদিত পণের মানোন্নয়নের পাশাপাশি উন্নত ও আকর্ষনীয় মোড়কীকরন।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৩.৫

গ্রামীণ আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন।

গ্রামীণ আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বাংলাদেশে গ্রামীণ আবাসন পরিস্থিতি।

১) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারনে ঘরবাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

২) অপরিকল্পিত ঘরবাড়ী ও শিল্প কারখানা নির্মাণের ফলে আবাদি জমি নষ্টের চিত্র।

৩) দেশে বসতবাড়ীর বর্তমান কাঠামো।

খ) আবাদি জমি রক্ষা ও গ্রামীণ পরিবেশ উন্নয়ন।

গ) পরিকল্পিত গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থা চালুকরা।

ঘ) গ্রামীণ আবাসন নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল।

গ্রামীণ আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন ।

গ্রামীণ আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন :

গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থা গ্রামীণ জীবনমান এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বহিঃপ্রকাশ। কেননা, উন্নত আবাসন উন্নত পরিবেশের অন্যতম পূর্বশর্ত এবং উন্নত জাতি গঠনে উন্নত পরিবেশ অপরিহার্য। বাংলাদেশের মত জনবহুল ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশে যেখানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৩% গ্রামে বসবাস করে, সেখানে বৃহৎ এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থা হওয়া উচিত সুশৃঙ্খল ও উন্নত। বি.বি.এস সার্ভে ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে এখনো ৫.২৭% ঘরবাড়ি ঝুপড়ি/কুড়েঘর, একটি উন্নয়নগামী দেশের জন্য যা সত্যিই বেমানান। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বসত বাড়ীর অবকাঠামো নিন্মমানের হওয়াতে প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে অগণিত পরিবার নিঃস্ব হয়ে পথে নামে, যা দেশে দারিদ্রতার হার বৃদ্ধির আরেকটি অন্যতম কারন।

বাংলাদেশ যেহেতু অচিরেই স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে যাচ্ছে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, এলক্ষ্য পূরনে গ্রামে বসবাসরত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনমানে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনা অপরিহার্য, যারমধ্যে আবাসন অন্যতম। উন্নত আবাসন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করে এবং জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট করে তোলে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামপর্যায়ে উন্নত আবাসনের জন্য প্রয়োজন উন্নত অবকাঠামো, যারমধ্যে - রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, আধুনিক চাষাবাদ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও চিকিৎসা অন্যতম। বাংলাদেশে গ্রামপর্যায়ে এ সমস্ত অবকাঠামো ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে, ফলে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে গ্রামপর্যায়ে মানুষ জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হচ্ছে, উন্নত আবাসন, উন্নত চিকিৎসা, সন্তানদের লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে তারা এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক সচেতন।

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বাংলাদেশ সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, বন্দর ও অন্যান্য খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে বেশকিছু বড় প্রকল্প এরিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরোও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছড়া দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনীতির অনেক সূচকের ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশের এ সমস্ত অগ্রগতি বিশ্ববাসীর নজরে এসেছে এবং সম্ভবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এরিমধ্যে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন সময় হয়েছে উন্নত জাতি গঠনে মনযোগ দেওয়া, যারজন্য প্রয়োজন গ্রামপর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিপূর্বক গ্রামে বসবাসরত সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পিত উপায়ে উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে এগিয়ে যাওয়া।

ক) বাংলাদেশের গ্রামীণ আবাসন পরিস্থিতি :

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি :

১) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি :

দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, সাথে সাথে বাড়ছে বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান চাহিদা। ২০১০-২০১৯ (১০ বছর) সময়কালে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে গড়ে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় ২.০০ মিলিয়ন মানুষ, পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্ধিত এ জনসংখ্যার বাসস্থান চাহিদা স্মারণী- ৩.৫(১)। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে যেহেতু সিংহভাগ মানুষের বসবাস, সেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে সেখানে প্রতিনিয়ত বাড়ছে নতুন নতুন ঘরবাড়ি। ফলে প্রতিনিয়ত ব্যাপকহারে নষ্ট হচ্ছে চাষাবাদযোগ্য জমি, যা অদুর ভবিষ্যতে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এটা সন্দেহাতীত।

স্মারণী- ৩.৫(১) : ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র তুলে :-

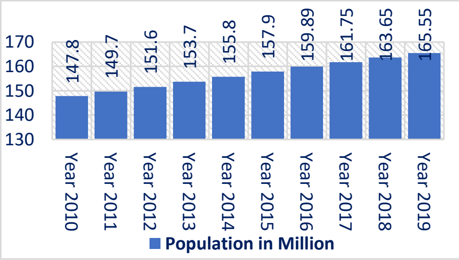

Source : CEIC Data

২) অপরিকল্পিত ঘরবাড়ী ও শিল্প কারখানা নির্মাণের ফলে আবাদি জমি নষ্টের চিত্র :

অপরিকল্পিত ঘরবাড়ী ও শিল্প কারখানা নির্মাণের ফলে আবাদি জমি নষ্টের চিত্র :

গ্রামাঞ্চল গুলোতে বেশির ভাগ পরিবারে ছেলে মেয়েদের বিয়ে শাদী দেওয়া হয় অনেকটা কম বয়সে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শহরের তুলনায় বেশী হওয়ায় প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৪-৫ জন কিংবা আরোও বেশী সন্তান সংখ্যা তাদের জন্য অতি সাধারণ বিষয়। ছেলেদের বিয়ে শাদীর পর প্রত্যেক পরিবারে বাড়তি ঘরের প্রয়োজন পড়ে এবং বাড়তি বাসস্থানের সংস্থান করতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে যে যার মত প্রতিনিয়ত চাষযোগ্য জমিতে অসংখ্য অপরিকল্পিত ঘরবাড়ী তৈরি করছে। এ অপরিকল্পিত ঘর বাড়ী একদিকে যেমন গ্রামের চিরাচরিত সৌন্দয্য নষ্ট করে গ্রামগুলোকে শ্রীহীন করে তুলছে, অন্যদিকে যত্রতত্র ঘরবাড়ী তৈরির ফলে প্রতিবছর প্রচুর আবাদি জমি নষ্ট হচ্ছে এবং সেখানে জলাবদ্ধতা ও পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাবে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান বিশাল এ জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খ্যাদ্য উৎপাদন এক পর্যায়ে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং অচিরেই দেশ খাদ্য সংকটের কবলে পড়তে বাধ্য।

অর্থবছর ২০০৪-৫ থেকে ২০১৭-১৮ (১৪ বছর) সময়কালে দেশে মোট ও নীট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৪-৫ অর্থবছরে দেশে মোট ও নীট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৬৬.৬৯ লক্ষ ও ১৯৭.০৩ লক্ষ একর। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এসে দেশে মোট ও নীট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮১.৪৮ লক্ষ ও ১৯৭.৭৪ লক্ষ একর। অর্থাৎ এ ১৪ বছর সময়কালে দেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৭৯ লক্ষ একর, সে হিসাবে ২০১৭-১৮ সালে দেশে নীট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হওয়া উচিত ২১১.৮২ লক্ষ একর। কিন্তু ২০১৭-১৮ সালে দেশে নীট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৭.৭৪ লক্ষ একর। অর্থাৎ এ ১৪ বছরের ব্যবধানে দেশে মোট আবাদযোগ্য জমি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও নীট আবাদযোগ্য জমি কমেছে (২১১.৮২- ১৯৭.৭৪) = ১৪.০৮ লক্ষ একর, প্রতি বছর গড়ে কমেছে ১.০০ লক্ষ একর (০.৫১%) স্মারণী-৩.৫(২) ।

স্মারণী-৩.৫(২) : ২০০৪-৫ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে মোট ও নীট আবাদযোগ্য জমি হ্রাস বৃদ্ধির চিত্র :

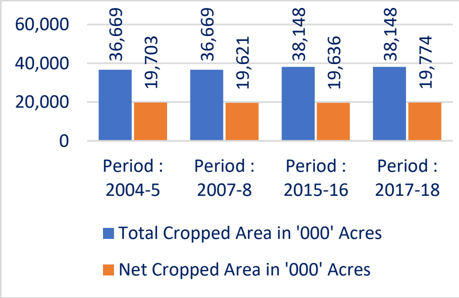

Source: BBS Agricultural Yearbook

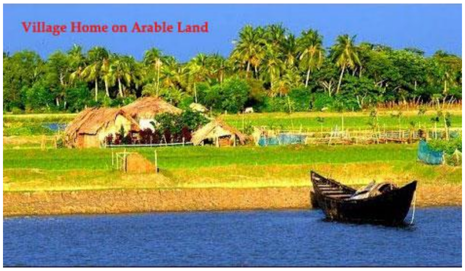

দেশে বসতবাড়ীর বর্তমান কাঠামো :

৩) দেশে বসতবাড়ীর বর্তমান কাঠামো :

বসতবাড়ীর কাঠামোর উপর একটি দেশের পারিবারিক, সামাজিক এবং সামগ্রিকভাবে গোটা দেশের সামগ্রিক পরিবেশের মানদন্ড ফুটে উঠে। উন্নত জাতি গঠনে উন্নত পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ অন্যতম প্রধান শর্ত। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সারাদেশে বসতবাড়ীর কাঠামো পরিকল্পিত ও আধুনিক হওয়া বাঞ্চনীয়, যা বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। শহর পর্যায়ে যদিও ক্রমান্বয়ে বসতবাড়ীর কাঠামো কিছুটা উন্নত হওয়ার দিকে ঝুকছে, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহের সিংহভাগ বসতবাড়ীর কাঠামো এখনও মান্দাতার আমলেরই রয়ে গেছে। ফলে প্রতিবছর গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য ঘরবাড়ী ধ্বংশ হয়ে হাজার হাজার পরিবার নিঃস্ব হয়ে পথে বসে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য বড় আকারের ধাক্কা। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও হস্তক্ষেপ ব্যাতিত গ্রাম পর্যায়ে বসতবাড়ীর কাঠামো সহসা উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আশা করা দুরুহ।

স্মারণী-৩.৫(৩) : ২০১৬ সাল নাগাদ দেশে বসতবাড়ির কাঠামোর চিত্র :

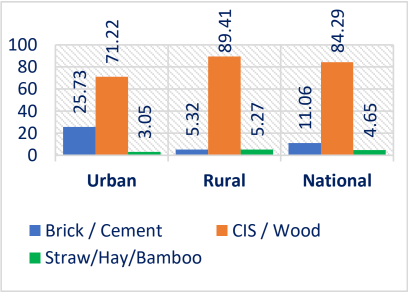

Source : BBS

HIES 2016 অনুযায়ী সারাদেশে বসতবাড়ীর ৮৪.২৯% টিন/কাঠের ছাউনি, ৪.৬৫% কুড়েঘর এবং ১১.০৬% ঘরবাড়ী ইট/সিমেন্টের তৈরি। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে ৮৯.৪১% ঘরবাড়ী টিন/কাঠের ছাউনি, ৫.২৭% কুড়েঘর এবং ৫.৩২% ঘরবাড়ী ইট/সিমেন্টের ছাদ। শহরে ৬৮.২৮% ঘরবাড়ী টিন/কাঠের ছাউনি, ৩.০৫% কুড়েঘর এবং ২৮.৭১% ঘরবাড়ী ইট/সিমেন্টের ছাদ। অর্থাৎ দেশের গ্রামাঞ্চলগুলোতে ২৮.২৬ মিলিয়ন ঘরবাড়ীর মধ্যে ১.৪৯ মিলিয়ন ঘরবাড়ি এখনও কুড়েঘর, একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য যা সত্যিই বেমানান।

খ) আবাদি জমি রক্ষা ও গ্রামীণ পরিবেশ উন্নয়ন :

আবাদি জমি রক্ষা ও গ্রামীণ পরিবেশ উন্নয়ন :

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবারের সংখ্যা এবং বাড়তি পরিবারের বাসস্থানের প্রয়োজন মিটাতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে অপরিকল্পিত ঘরবাড়ীর সংখ্যা, যাতে অহরহ নষ্ট হচ্ছে বিশাল পরিমাণে আবাদি জমি। সরকারি নীতিমালার আওতায় গ্রামাঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে ঘরবাড়ী নির্মাণ করা গেলে একদিকে যেমন প্রতিবছর অপরিকল্পিত ঘর বাড়ী নির্মানের ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়া বিশাল পরিমান ফসলী জমি রক্ষা করার মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চল গুলোতে সামাজিক পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে । ফলে গ্রাম পর্যায়ের মানুষ উন্নত আবাসন সুবিধায় বসবাসের সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি গ্রামের সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে যা মানুষকে গ্রামমূখী করে তুলতে সহায়ক হবে এবং এর ফলে বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে অনেক বেশি।

প্রতিবছর কৃষিজমি নষ্ট হওয়ার কারনে দেশে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার চিত্র :-

২০০৪-৫ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে আবাদযোগ্য জমি কমেছে - ১৪.০০ লক্ষ একর ।
২০১৭-১৮ সালের রেকর্ড অনুযায়ী প্রতি একরে খাদ্য উৎপাদন .... ১.৭১ মেট্রিক টন।
দুই ফসলি বিবেচনায় নিয়ে আবাদি জমি নষ্ট হওয়ার কারনে প্রতিবছর
খাদ্য কম উৎপাদন হচ্ছে (১৪.০০ X ১.৭১ X ২) .... ৪৭.৮৮ লক্ষ মে.টন।

২০০৫-২০১৬ (১২ বছর) সময়কালে দেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৫ সালে দেশে মোট পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৮.৬৪ মিলিয়ন, গ্রামে ২১.৩৮ মিলিয়ন এবং শহরে ৭.২৬ মিলিয়ন পরিবার। ২০১৬ সালে এসে দেশে মোট পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯.৩৩ মিলিয়ন, গ্রামে ২৮.২৬ মিলিয়ন এবং শহরে ১১.০৭ মিলিয়ন । অর্থাৎ এ ১২ বছরের ব্যবধানে সারাদেশে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৬৯ মিলিয়ন, গড়ে প্রতিবছর বেড়েছে ৮,৯০,৮৩৩ পরিবার। এই সময়কালে গ্রাম পর্যায়ে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮৮ মিলিয়ন এবং শহরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৮১ মিলিয়ন পরিবার স্মারণী-৩.৫(৪) ।

স্মারণী-৩.৫(৪): ২০০৫-২০১৬ সময়কালে গ্রাম ও শহর ভেদে দেশে পরিবার বৃদ্ধির চিত্র :-

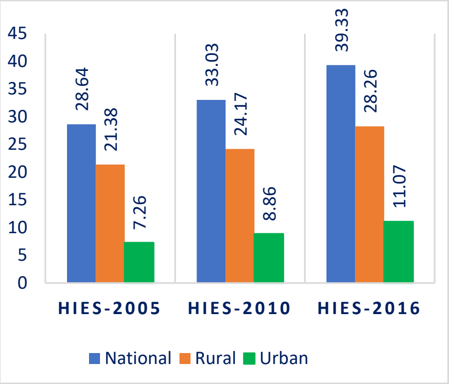

Source: BBS

গ) পরিকল্পিত গ্রামীন আবাসন ব্যবস্থা চালু করা :

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে **"গ্রামীণ আবাসন নীতিমালা"** প্রয়োজন, যে নীতিমালার আওতায় গ্রাম পর্যায়ে আবাসন ব্যবস্থার পূর্ণর্বিন্যাস এবং ভবিষ্যতে নতুন আবাসন তৈরি হবে। বাংলাদেশে জাতিয় গৃহায়ন নীতিমালা ২০১৬ চালু রয়েছে, যে নীতিমালার মূল লক্ষ্য হচ্ছে " সর্বস্তরের মানুষের জন্য উপযুক্ত গৃহায়ন ব্যবস্থা সহজ করা এবং বাড়ী ও বসতি সমূহের উন্নতি সাধন করা যাতে টেকসই উন্নয়ন ও সমতার ভিত্তিতে আবাসন ও কর্মস্থলের পরিবেশ উন্নত হয় এবং সকলেই স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও সাশ্রয়ীমূল্যে নূন্যতম সেবা ও সুযোগ সমূহ পায় এবং সকলের সমান অধিকার সংরক্ষিত হয়।"

চলমান আবাসন নীতির মূল লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রাম পর্যায়ে আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে **"গ্রামীণ আবাসন নীতিমালা"** প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন, যাতে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে :-

পরিকল্পিত গ্রামীন আবাসন ব্যবস্থা চালু করা :

Modern Village Structure – 1

Modern Village Structure – 2

Modern Village Structure – 3

Modern Village Structure – 4

১) **আধুনিক গ্রামীণ বসতবাড়ী প্রকল্পের ডিজাইন :** প্রকল্পের আওতাভুক্ত বাড়ীর ডিজাইন এবং এতদসংশিষ্ট যাবতীয় নিয়ম কানুন ।

২) **জায়গা চিহ্নিত করন :** উপজেলা ভূমি অফিসের মাধ্যমে প্রত্যেক গ্রামে নির্দিষ্ট এরিয়াতে নির্দিষ্ট সংখ্যক বাড়ি তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ধরা যাক প্রত্যেক গ্রামে সর্বোচ্ছ ২০ টি বাড়ি এবং প্রতিটি বাড়ির জন্য সর্বোচ্চ ২.৫০-৩.০০ কাঠা হিসাবে মোট জমির পরিমাণ নির্ধারন করে দেবেন।

৩) **নতুন বাড়ী নির্মাণ :** পরিবারের বাড়তি সদস্যদের জন্য নতুন ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ঘর নির্মাণের অনুমতি না দিয়ে ভূমি অফিস কতৃক নির্ধারিত জায়গায় প্রয়োজন অনুযায়ী ২/৩/৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

৪) **কাঁচা ঘর নির্মাণে অনুৎসাহিত করন :** বাঁশ, বেত ও কুড়ে ঘর নির্মাণে অনুৎসাহিত করতে হবে। কেননা কাঁচা ঘর নির্মাণের ফলে প্রতি বছর ঝড় তুফানে প্রচুর ঘর বাড়ি ধ্বংশ হয়ে অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে আর্থিক দুরাবস্থার স্বীকার হন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে এ ধকল কাটিয়ে উঠতে বহু সময় লেগে যায়।

৫) **ছাড়পত্রের বিধান :** নির্ধারিত এরিয়াতে নির্দিষ্ট ডিজাইনে বাড়ি নির্মাণে ইচ্ছুক ব্যাক্তি উপজেলার দাত্বিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করে বাড়ী নির্মাণের ছাড়পত্র নিতে হবে।

৬) **ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা :** ভূমি অফিস কতৃক নির্ধারিত জায়গায় ঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা থাকবে এবং ব্যাংক লোনের পরিমাণ নির্ধারনের ক্ষেত্রে ভূমি অফিস থেকে ঘর নির্মাণের জন্য প্রাপ্ত ছাড়পত্র মূখ্য দলিল হিসাবে বিবেচ্য হবে।

৭) **রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়ন :** ভূমি অফিস কর্তক বসতবাড়ী প্রকল্পের স্থান নির্ধারনের পর সরকারি উদ্যোগে প্রত্যেক গ্রামে প্রকল্প এরিয়ায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন।

৮) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় সমূহ।

ঘ) গ্রামীণ আবাসন নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল :

গ্রামীণ আবাসন নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল :

গ্রামীণ আবাসন নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে সারাদেশে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ একটি পরিকল্পিত, আধুনিক ও উন্নত বাসস্থানের আওতায় চলে আসবে এবং আগামী প্রজন্ম এ আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ পাবে। উন্নত পরিবেশে বেড়ে উঠা মানুষ উন্নত চিন্তা চেতনা ও উন্নত মতাদর্শের অধিকারি হয় এবং জীবন সম্পর্কে উন্নত ধারনা পোষন করে। এ দেশের পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মানে মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এ প্রকল্প তাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এতে সন্দেহ নেই।

গ্রামীণ আবাসন নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘমোদি ফলাফলের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

১) সমগ্র দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ পরিকল্পিত, আধুনিক ও উন্নত আবাসন প্রক্রিয়ার আওতায় চলে আসবে, যা একটি উন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২) গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ঘরবাড়ী পরিকল্পিত আবাসন প্রক্রিয়ার আওতায় আনার ফলে প্রত্যেক গ্রামে প্রচুর পরিমানে আবাদি জমি বের হবে, যা খাদ্য উৎপাদনে অনন্য অবদান রাখবে।

৩) দূর্বল অবকাঠামোর ঘর বাড়ী নির্মাণের ফলে গ্রামীণ জনগণ যে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুকিতে থাকে, গ্রামীণ আবাসন নীতি বাস্তবায়নের ফলে এ ঝুকি পুরোপুরি কেটে যাবে।

৪) এ প্রকল্পের আওতায় নতুন ঘরবাড়ী নির্মাণের ফলে প্রতিবছর গ্রাম অঞ্চল গুলোতে অপরিকল্পিতভাবে অসংখ্য ঘর বাড়ি নির্মাণের ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়া বিশাল পরিমাণ আবাদি জমি রক্ষা পাবে।

৫) আগামি প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন দেশ উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি হবে নিঃসন্দেহে একটি বড় পদক্ষেপ।

****

SJIBL

অধ্যায় : ৩.৬

উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
খ) জি.ডি.পিতে শিক্ষা খাতের অবদান।
গ) জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষা খাতে ব্যয়।
ঘ) অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যয়ের সাথে বাংলাদেশের তুলনা।
ঙ) শিক্ষাখাতে অপর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ।
চ) শিক্ষাখাতে প্রবৃদ্ধির হার।
ছ) দেশে স্বাক্ষরতার হার।
জ) এক নজরে শিক্ষা খাতের বর্তমান পরিস্থিতি।
ঝ) গ্রাম ও শহর ভেদে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নিবন্ধনের তারতম্য।
   ১) প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার ।
   ২) মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার।
   ৩) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার।
   ৪) টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের চিত্র।
   ৫) বিভিন্ন প্রফেশনাল বিষয়ে নিবন্ধনের চিত্র।
ঞ) মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ে নিবন্ধন কমে যাওয়ার কারণসমূহ।
ত) শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নে যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
   ১) প্রাইমারি থেকে ইংরেজি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া।
   ২) শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা।
   ৩) প্রত্যেক শিশুকে নির্দিষ্ট বয়সে স্কুলে পাঠানোর সরকারি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।
   ৪) দেশে একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।
থ) দেশে শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নে প্রস্তাবনা।

ক) উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা :

উপজেলা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা :

দারিদ্রতা ও অসাম্য দূরীকরনে এবং জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে ব্যক্তিপর্যায়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস, কর্মদক্ষতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জীবনমান উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট। প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ নিজস্ব শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত রাখতে সক্ষম হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মচঞ্চলতা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে তখন জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়, দেশে বেকারত্ব হ্রাস পায় যা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা অপরিহার্য। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী পৃথিবীর সকল দেশে একারণেই শিক্ষার হার প্রায় শতভাগ।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এদেশের অর্থনীতি দ্রুত সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথম গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা, শিক্ষিত জাতি গঠন ব্যাতিত ব্যক্তি পর্যায়ে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোনো ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষিত ও কর্মক্ষম হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ পেলে জীবন চলার পথে তারা তাদের শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে সক্ষম হবে। ফলে প্রতিটি পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

অতএব, আগামির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে মানসন্মত শিক্ষা ও পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি করা জরুরি, কেননা, ভবিষ্যতে তারাই দেশের হাল ধরবে। এ লক্ষ্য অর্জনে শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে যাতে উচ্চশিক্ষার হার পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি, কেননা, দেশের ৭৩ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রামে। গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়া এবং দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হওয়া, টেকসই অর্থনীতির উন্নয়নে যা অপরিহার্য।

খ) জি.ডি.পিতে শিক্ষা খাতের অবদান :

জি.ডি.পিতে শিক্ষা খাতের অবদান :

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষা সেক্টর সামগ্রিকভাবে ক্রমান্বয়ে কিছুটা প্রসারিত হলেও দেশের জি.ডি.পি ও অর্থনীতি সম্প্রসারনের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে শিক্ষা সেক্টরের সম্প্রসারণ ঘটেনি এটা ধ্রুব সত্য। ফলে দীর্ঘ সময় থেকে দেশের জি.ডি.পিতে শিক্ষাখাতের অংশ ২%-২.৫০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। অর্থবছর ১৯৯৪-৯৫ সময়ে জি.ডি.পিতে শিক্ষাখাতের অংশ ছিল ২.১১%, ১৯৯৯-০০ সময়ে ২.২০%, ২০০৪-০৫ সময়ে ২.৪৬%, ২০০৯-১০ সময়ে ২.২৩% এবং ২০১৯-২০ সময়ে ২.৪৬%। বিগত এক দশক (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০) সময়কালে জি.ডি.পিতে শিক্ষাখাতের অবদান ছিল গড়ে ২.৩৪%। স্মারণী-৩.৬(১)

স্মারণী- ৩.৬(১): অর্থবছর ১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জি.ডি.পিতে শিক্ষাখাতের অংশগ্রহনের চিত্র :

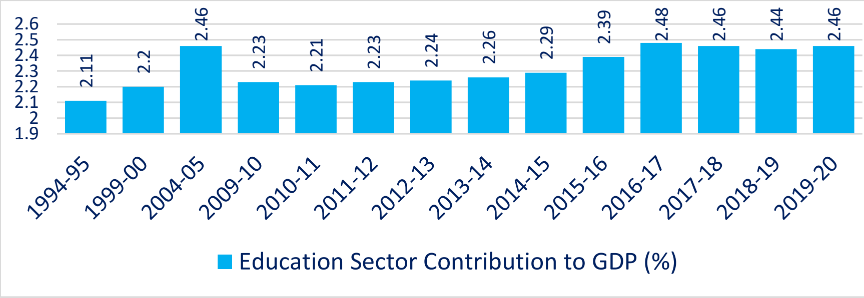

Source: BD Economic Review

গ) জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় :

জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় বাজেট ও জি.ডি.পির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েককগুণ, পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে সরকারি আয় ও ব্যয়ের পরিধি। সেই হিসাবে শিক্ষাসহ সকল সেক্টরে আনুপাতিক হারে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষা সেক্টরে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। ১৯৮০ থেকে ২০১৯ এ চার দশক সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষা ব্যয় সর্বনিম্ন ১.২৭% থেকে সর্বোচ্চ ২.৪৭% পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় ১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে ছিল ১.২৭%, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১.৩%। অর্থাৎ এ চার দশক সময়ের ব্যবধানে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় মোটেও বৃদ্ধি পায়নি। স্মারণী-৩.৬(২)

স্মারণী-৩.৬(২) : অর্থবছর ১৯৭৯-৮০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষা ব্যয় :-

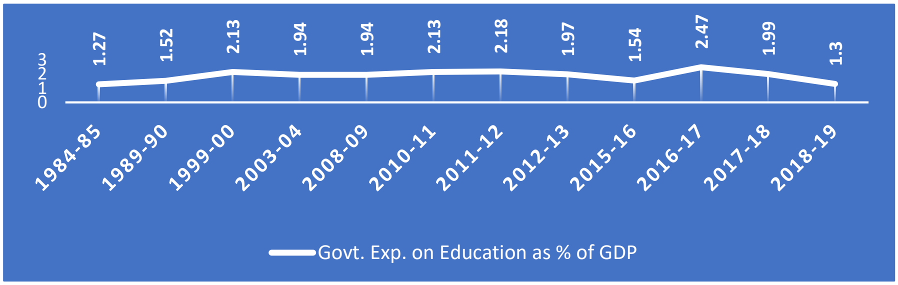

Source: BD Economic Review

ঘ) অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যয়ের সাথে বাংলাদেশের তুলনা :

অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যয়ের সাথে বাংলাদেশের তুলনা :

জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের দিকথেকে বাংলাদেশ এখনো বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৯ সালের তথ্যানুযায়ী জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাংলাদেশে ১.৩%, মিয়ানমারে ১.৯%, শ্রীলংকায় (২০১৮) ২.১%, কম্বোডিয়ায় (২০১৮) ২.২%, পাকিস্তানে (২০১৭) ২.৯%, হংকংয়ে (২০১৯) ৩.৮%, ভিয়েতনামে (২০১৮) ৪.২%, মালয়েশিয়ায় (২০১৯) ৪.২%, দ. কোরিয়ায় (২০১৬) ৪.৩%, নেপালে (২০১৮) ৫.১% এবং ভুটানে (২০১৮) ৬.৯%। স্মারণী-৩.৬(৩)

স্মারণী-৩.৬(৩) : ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের চিত্র :

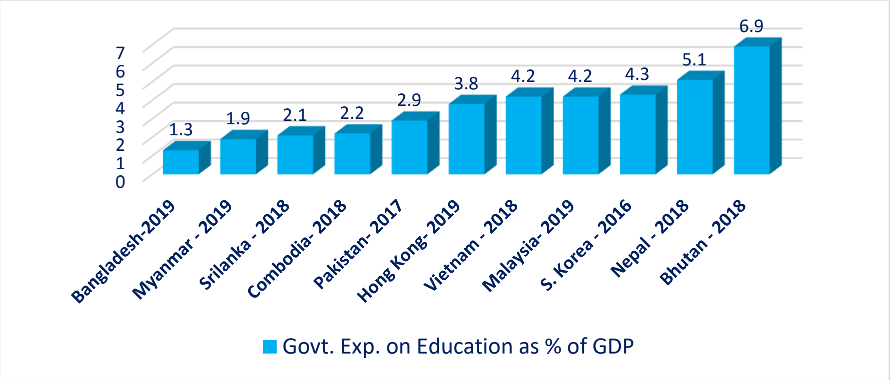

Source: World bank data

ঙ) শিক্ষাখাতে অপর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ :

উন্নত জাতি গঠনে দেশে শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি করা অপরিহার্য, যারজন্য প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা। এজন্য প্রয়োজন দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ, যেমন- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন, শিক্ষা ব্যয় কমানো, কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন এবং উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন বৃদ্ধি করাসহ সংশ্লিষ্ট সকলক্ষেত্রে মানসন্মত উন্নয়ন ও সম্প্রসারন, যারজন্য প্রয়োজন

শিক্ষা সেক্টরে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বিগত সময়গুলোতে দেশের শিক্ষা সেক্টরের আধুনিকায়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ সম্ভব হয়নি, ফলে এ সেক্টরের যুগোপযোগী উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। বলা বাহুল্য, শিক্ষা সেক্টরের যুগোপযোগী উন্নয়ন ব্যাতিত দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব।

শিক্ষাখাতে অপর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে একথা সত্যি। তবে তা শিক্ষাখাতের আকার ও প্রসার, সরকারি মোট ব্যয় এবং দেশের অর্থনীতি ও জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখার বিষয়। বিগত দশকে (২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯) দেশের শিক্ষা সেক্টরে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ২০০৯-১০ সময়ে শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় ছিল টাকা ৪৩.০৫ বিলিয়ন, যা ঐ অর্থবছরে মোট এ.ডি.বি বরাদ্ধের ১৫.১১% , ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় দাঁড়িয়েছে টাকা ১৪৯.৩৪ বিলিয়ন, যা ঐ অর্থবছরে মোট এ.ডি.পি বরাদ্ধের ৮.৬৩%। এ দশ বছর সময়কালে শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও এ সময়কালে জাতিয় বাজেট ও জি.ডি.পির আকার বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে যথেষ্ঠ। স্মারণী-৩.৬(৪)

স্মারণী-৩.৬(৪) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের চিত্র:

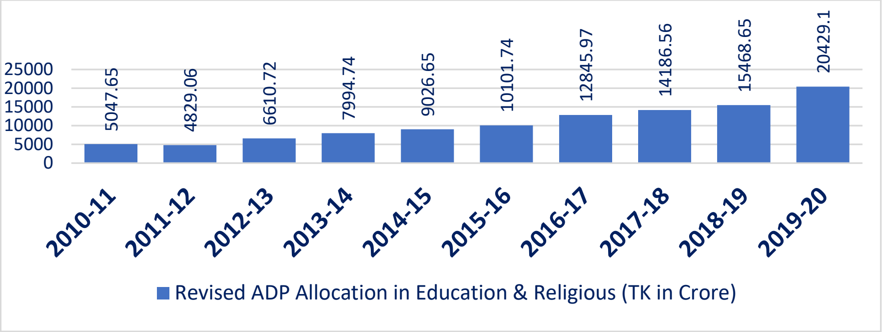

Source: BD Economic Review

চ) শিক্ষাখাতে প্রবৃদ্ধির হার :

শিক্ষাখাতে প্রবৃদ্ধির হার :

শিক্ষাখাতে অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালের প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ ব্যাতিত এ সময়ে অন্যান্য বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধি ৫%-৮% এর মধ্যে উঠানামা করেছে। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১১.৭১% ও ১১.৩৫% যা এ সময়কালে অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। বিগত দশকে (২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০) শিক্ষাখাতে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৬৪%। স্মারণী- ৩.৬(৫)

স্মারণী-৩.৬(৫): অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে শিক্ষাখাতে প্রবৃদ্ধির চিত্র :

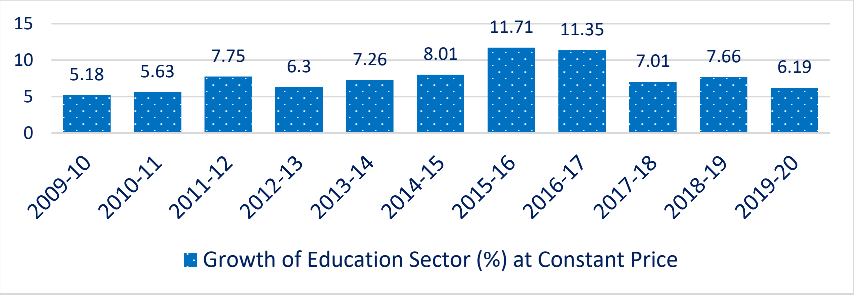

Source: BD Economic Review

ছ) দেশে স্বাক্ষরতার হার :

দেশে স্বাক্ষরতার হার :

বিগত দুই দশকে দেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাক্ষরতার হার উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে একথা সত্য। ২০০১ সালে ১৫ বছরের উর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার ছিল ৪৭.৪৯%, ২০১৯ সাল নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে ৭৪.৬৮%, নিসন্দেহে যা উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি। তবে এটা বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করে কোনো জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা যায় না। আমাদের প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা, যারা তাদের অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগিয়ে নিজের জীবন মান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন হচ্ছে কোন পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই একজন ব্যাক্তি তার অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগিয়ে জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হবে এবং তাকে এ দেশের মাপকাঠিতে শিক্ষিত বলা যাবে ? এ দেশে শিক্ষার হার হিসাব করার ক্ষেত্রে যেসমস্ত নীতি বর্তমানে অনুস্মরণ করা হয় সেগুলো হলো :-

১) শুধুমাত্র অক্ষর চিনে ও নাম লিখতে পারে এমন শ্রেণী।
২) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন শ্রেণী।
৩) মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন শ্রেণী।
৪) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন শ্রেণী।
৫) স্নাতক বা তদোর্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী।

বাস্তবতা হলো দেশের শিক্ষা ব্যাবস্থার মান অনুযায়ী নুন্যতম মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষা সমাপ্ত না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নিজগুণে কর্মক্ষেত্র জোগাড় করা এবং নিজেকে কর্মক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা রীতিমত কঠিন। বিশেষ করে এ তথ্য প্রযুক্তির যুগে সেটা আরোও কঠিন। তাছাড়া, কর্মক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার জন্য বাধ্যতামূলক সাধারন শিক্ষার পাশাপাশি কিছু কারিগরি শিক্ষাও প্রয়োজন। কাজেই **যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহনে অপারগ তাদের জন্য মাধ্যমিক বা সমমানের সার্টিফিকেট অর্জনের পাশাপাশি নুন্যতম দুই বছরের কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।**

স্মারণী-৩.৬(৬) : ২০০১ -২০১৯ সময়কালে দেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনসংখ্যার স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির হার :

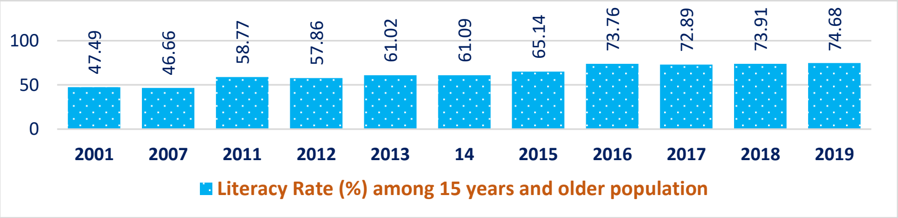

Source: Globaleconomy.com

জ) এক নজরে শিক্ষাখাতের বর্তমান পরিস্থিতি :

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ ধারানুসারে নাগরিকদের জীবন মানের সাথে সম্পৃক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ, যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদিক্ষেত্রে উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ। নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত এ সমস্ত ক্ষেত্রের মানসন্মত উন্নয়নে সরকার সবসময় দায়বদ্ধ।

বাংলাদেশে চলমান শিক্ষা ব্যবস্থা খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনাধীন থাকা অবস্থায় এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বৃটিশ নিয়ন্ত্রনাধীন। সে সময় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে শিক্ষা কারিকুলামের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা কারিকুলামে উর্দূ ও ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা এদেশে শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১৯৭১ এ স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা ভাষাকে প্রধান মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করে দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়, যা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। বর্তমানে শিক্ষানীতি ২০১০ এর অধীনে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চলমান রয়েছে, যার বিন্যাশ নিন্মরুপ :-

এক নজরে দেশের শিক্ষাখাতের বর্তমান পরিস্থিতি :

1	Elementary Education :	Up to Class VIII
2	Secondary & Higher Secondary :	Grade IX to XII
3	Higher Education :	Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees.

Notes :

1. Elementary এবং Secondary পর্যায়ে সাধারন শিক্ষার পাশাপাশি আলাদাভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাও চালু রয়েছে।
2. Secondary Education পরবর্তী টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল শিক্ষা চালু রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করানো হয়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাশ অনুযায়ী ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা স্মারণী-৩.৬(৭) এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো ।

স্মারণী-৩.৬(৭) : ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা :

Type of Education	Mgt.	Institutions, Teacher & Students			Indicators		
		No. of Institutions	No. of Teachers	No. of Students	TSR	SPI	TPI
(1) Primary Education							
Primary Education	**Public**	65,529	348,867	130,34,723	37	199	5
	Private	68,618	336,533	43,03,377	12	63	5
	Total :	**134,147**	**685,400**	**173,38,100**	**25**	**129**	**5**
(2) Secondary and Higher Secondary level Education							
Secondary Education	Public	663	13,006	660,844	51	997	20
	Private	19,802	221,159	98,14,256	44	496	11
	Total	**20,465**	**234,165**	**104,75,100**	**45**	**512**	**11**
College Education	Public	673	27,913	21,94,430	79	3,261	41
	Private	3,822	95,605	20,84,011	22	545	25
	Total	**4,495**	**123,518**	**42,78,441**	**35**	**952**	**27**
Madrasah Education	Public	3	60	6,714	112	2,238	20
	Private	9,291	109,858	24,71,248	22	266	12
	Total	**9,294**	**109,918**	**24,77,962**	**23**	**267**	**12**
Professional Education	Public	79	4,027	24,071	6	305	51
	Private	346	5,240	97,417	19	282	15
	Total	**425**	**9,267**	**121,488**	**13**	**286**	**22**
Teacher Education	Public	84	1,345	18,580	14	221	16
	Private	132	914	6,166	7	47	7
	Total	**216**	**2,259**	**24,746**	**11**	**115**	**10**
Technical Vocational	Public	866	11,423	329,005	29	380	13
	Private	5,999	39,508	738,479	19	123	7
	Total	**6,865**	**50,931**	**10,67,484**	**21**	**155**	**7**
Total (Secondary & Higher Secondary)	**Public**	**2,368**	**57,774**	**32,33,644**	**56**	**1,366**	**24**
	Private	**39,392**	**472,284**	**152,11,577**	**32**	**386**	**12**
	Total :	**41,760**	**530,058**	**184,45,221**	**35**	**442**	**13**
(3) University Education							
University	Public	**37**	**13,799**	**676,623**	**49**	**18,287**	**373**
	Private	**103**	**15,575**	**351,691**	**23**	**3,414**	**151**
	Total :	**140**	**29,374**	**10,28,314**	**35**	**7,345**	**210**

Source: BBS

ঝ) গ্রাম ও শহর ভেদে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নিবন্ধনের তারতম্য :

গ্রাম ও শহর ভেদে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নিবন্ধনের তারতম্য :

দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নিবন্ধনের হার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১ম - ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নিবন্ধনের হার ৫২% এর কাছাকাছি থাকলেও, কলেজ ও টার্সিয়ারি পর্যায়ে নিবন্ধনের হার উল্লেখযোগ্য হারে কম। তাছাড়া, ১ম - ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত নিবন্ধন শহরের তুলনায় গ্রাম পর্যায়ে কিছুটা বেশি থাকলেও, কলেজ ও টার্সিয়ারি পর্যায়ে বিন্ধনের হার শহরের তুলনায় গ্রাম পর্যায়ে আশংকাজনক হারে কম, প্রায় অর্ধেক।

২০১৬ সাল নাগাদ ১ম - ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নিবন্ধনের হার জাতিয়ভাবে ৫১.২৮%, গ্রামে ৫২.৯০% এবং শহরে ৪৬.৪৯%। ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত নিবন্ধনের হার জাতিয়ভাবে ২৬.৪৩%, গ্রামে ২৬.৬৬% এবং শহরে ২৫.৭৪%। ডিগ্রি/সমমানের নিবন্ধন জাতিয়ভাবে ৫.৬৯%, গ্রামে ৪.৫৮% এবং শহরে ৯.০% স্মারণী-৩.৬(৮)। পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে নিবন্ধনের ব্যাপক এ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এদেশের ৭৩ শতাংশ জনগণের বসবাস গ্রামে, অতএব গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার নিবন্ধনের হার যতক্ষন না বাড়ছে, ততক্ষন জাতিয়ভাবে উচ্চশিক্ষার হার কিছতেই বাড়ানো সম্ভব নয়।

স্মারণী-৩.৬(৮): ২০১৬ সাল নাগাদ গ্রাম ও শহর ভেদে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নিবন্ধনের হার :-

INDEX	HIES 2016			HIES 2010		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
Class : I – V	51.28	52.90	46.49	42.70	44.87	37.48
Class : VI – IX	26.43	26.66	25.74	39.03	40.05	36.57
SSC / HSC / Equivalent	13.16	12.66	14.67	15.44	13.03	21.27
Graduate / Equivalent	5.69	4.58	9.00	1.33	0.96	2.23
Post Graduate	0.97	0.87	1.25	0.66	0.34	1.43
Doctor	0.03	0.01	0.09	0.01	0.00	0.04
Engineer	0.22	0.17	0.39	0.12	0.06	0.27
Diploma / Vocational	0.98	0.89	1.25			
Others	1.22	1.26	1.12	0.70	0.70	0.72
Total :	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Source: BBS

১) প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার :

প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার :

দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, মাঝপথে ঝরেপরা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত এক দশকের ব্যবধানে প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হারে ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি মাঝপথে ঝরেপরা শিক্ষার্থীর হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে, ফলে এ সময়ে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারির হার বেড়েছে উল্ল্যেখযোগ্য হারে। ২০১০ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে নীট নিবন্ধনের হার ছিল ৯৪.৬০%, মাঝপথে ঝরে পড়ার হার ৩৯.৮০% এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারির হার ৬০.২০%। ২০১৯ সালে এসে প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার দাঁড়িয়েছে ৯৭.৩৪%, মাঝপথে ঝরে পরার হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৭.৯০% এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারির হার দাঁড়িয়েছে ৮২.১০%। এ দশ বছরের ব্যবধানে প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ২.৫৪%, মাঝ পথে ঝরে পরা হ্রাস পেয়েছে ২১.৯০% এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারির হার বৃদ্ধি পেয়েছে আনুপাতিক হারে, যা দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ইতিবাচক লক্ষণ। স্মারণী- ৩.৬(৯)

তবে এক্ষেত্রে হতাশার বিষয় হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী দারিদ্র, শিশুশ্রম ও ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার কারনে দেশে এখনো ২.২৬% শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এখনো নিরক্ষর থেকেই যাচ্ছে।

স্মারণী-৩.৬(৯) : বিগত দশকে দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি, ঝরেপড়া এবং সমাপ্তকারির হার :-

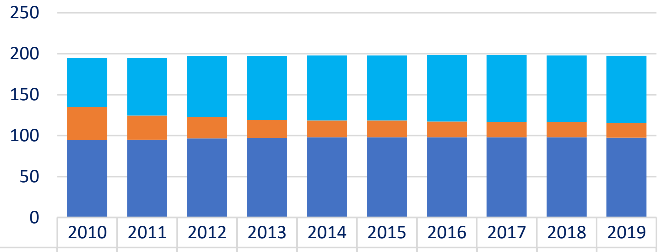

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Completion Rate	60.2	70.3	73.8	78.6	79.1	79.6	80.8	81.2	81.4	82.1
Dropout Rate	39.8	29.7	26.2	21.4	20.9	20.4	19.2	18.8	18.6	17.9
Net Enrolment Rate	94.8	94.9	96.7	97.3	97.7	97.94	97.96	97.97	97.85	97.37

Source: Primary School Census 2019

২) মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার :

বিগত দশকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় নিবন্ধনের হারে ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি মাঝ পথে ঝরে পরা শিক্ষার্থীর হার হ্রাস এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারির হার বৃদ্ধি পেলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাঝ পথে ঝরে পরার হার এখনো প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বিগুণ। ২০০৮ সালে দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে নীট নিবন্ধনের হার ছিল ৪৫.৫১%, মাঝ পথে ঝরে পরার হার ৬১.৩৮% (পুরুষ ৫৬.৬১% ও নারী ৬৫.৬৯%) এবং ঐ সময়ে মাধ্যমিক সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার ৩৮.৬২% (পুরুষ ৪৩.৩৯% ও নারী ৩৪.৩১%)। ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে নীট নিবন্ধনের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩.৭৪%, মাঝ পথে ঝরে যাওয়ার হার ৩৭.৮১% (পুরুষ ৩৩.৪৩% ও নারী ৪১.৫২%) এবং মাধ্যমিক সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার ৬২.১৯% (পুরুষ ৬৬.৫৭% ও নারী ৫৮.৪৮%)। এ দশ বছরের ব্যবধানে মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ১৮.৩৩%, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৮৩%। এ সময়ে মাঝ পথে ঝরে পরা হ্রাস পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ২৩.৫৭%, বছরে গড়ে হ্রাস পেয়েছে ২.৩৬% এবং আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে মাধ্যমিক সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার। স্মারণী-৩.৬(১০)

মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার :

লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে যাওয়ার হার পুরুষ শিক্ষার্থীর তুলনায় নারী শিক্ষার্থীর হার অনেক বেশি। ২০০৮ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে মাঝ পথে ঝরে পরার হার সামগ্রিকভাবে ৬১.৩৮% (পুরুষ ৫৬.৬১% ও নারী ৬৫.৬৯%), এ সময়ে মাধ্যমিকে ঝরে পরার হার পুরুষের তুলনায় নারী ৯.০৮% বেশি। ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে মাঝ পথে ঝরে যাওয়ার হার সামগ্রিকভাবে ৩৭.৮১% (পুরুষ ৩৩.৪৩% ও নারী ৪১.৫২%), এ সময়ে মাধ্যমিকে ঝরে পরার হার পুরুষের তুলনায় নারী ৮.০৯% বেশি।

স্মারণী-৩.৬(১০) : ২০০৮-২০১৭ সময়কালে মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরেপরা এবং মাধ্যমিক সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার :

Year	NER	Dropout (%)			Completion (%)		
		Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls
2008	45.41	61.38	56.61	65.69	38.62	43.39	34.31
2009	46.34	55.31	42.15	64.93	44.69	57.85	35.07
2010	47.65	55.26	57.29	53.57	44.74	42.71	46.43
2011	47.29	53.28	46.73	56.43	46.72	53.27	43.57
2012	49.67	44.65	34.9	52.36	55.35	65.10	47.64
2013	54.27	43.18	34.18	48.89	56.82	65.82	51.11
2014	-	41.59	34.52	47.67	58.41	65.48	52.33
2015	59.14	40.29	33.72	45.92	59.71	66.28	54.08
2016	65.22	38.30	33.80	42.19	61.70	66.12	57.81
2017	63.74	37.81	33.43	41.52	62.19	66.57	58.48

Source: BBS Note : NER (Net Enrolment Rate)

৩) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারির হার :

দেশে এখনো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় অর্ধেক, যদিও এ পর্যায়ে ঝরে পরার হার মাধ্যমিকের চেয়ে কিছুটা কম। আশার কথা হলো বিগত এক দশক (২০০৮-২০১৭) সময়কালে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি এ পর্যায়ে ঝরে পরার হার পূর্বের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ফলে দেশে উচ্চমাধ্যমিক সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরেপরা এবং সমাপ্তকারির হার :

বিগত ২০০৮-২০১৭ সময়কালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, এ পর্যায়ে ঝরে পরা এবং সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার ছিল ২৫%, এ পর্যায়ে ঝরে পরার হার ৪৬.৮৬% এবং সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার ৫৩.১৪%। ২০১৭ সালে এসে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭.২৪%, এ পর্যায়ে ঝরে পরার হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.৮৯% এবং সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০.১১%। এ দশ বছরের ব্যবধানে দেশে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ১২.২৪%, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১.২২%। এ সময়কালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ২৬.৯৭%, বছরে গড়ে হ্রাস পেয়েছে ২.৭০% এবং আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার। ২০০৮ সালে দেশে উচ্চমাধ্যমিক সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার ছিল ৫৩.১৪%, ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৮০.১১%। **স্মারণী-৩.৬(১১)**

স্মারণী-৩.৬(১১) : ২০০৮-২০১৭ সময়কালে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধন, ঝরেপরা এবং সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার :

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Completion (%)	53.14	57.89	62.64	62.87	78.2	78.4	78.63	79.3	79.92	80.11
Dropout (%)	46.86	42.11	37.36	37.13	21.8	21.6	21.37	20.7	20.08	19.89
NER (%)	25	26.36	27.72	29.08	30.44	31.8	26.35	28.25	36.51	37.24

NER (%) Dropout (%) Completion (%)

Source: BBS

দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের চিত্র :

৪) টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের চিত্র :

২০০০ সালের আগ পর্যন্ত দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার ৫% এরও কম ছিল, ২০১০ সাল নাগাদ এ হার ১০% এ ২০১৯ সাল নাগাদ ২৪% এ পৌচেছে, দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে যা খুবই নগণ্য স্মারণী-৩.৬(১২)। দেশে টার্সিয়ারি সমাপ্তকারি জনসংখ্যার হার শহরের তুলনায় গ্রামে মাত্র এক চতুর্থাংশ এবং এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ এক তৃতীয়াংশেরও কম। LFS 2016-17 এর রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময়ে দেশে Tertiary Level সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার জাতিয়ভাবে ৪.২%, তন্মধ্যে পুরুষ ৫.৮% ও নারী ২.৬%। গ্রামে এ হার ২.৩%, তন্মধ্যে পুরুষ ৩.৫% ও নারী ১.২% এবং শহরে ৮.৬%, তন্মধ্যে পুরুষ ১১.৫% ও নারী ৫.৯%। ॥

টার্সিয়ারি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশসমূহের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার বাংলাদেশে ২৪% মাত্র। অথচ এ সময়ে ভারতে এ হার ২৯%, মালদ্বীপে ৩১%, ফিলিপাইনে ৩৫%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৬%, মালয়েশিয়ায় ৪৩%, থাইল্যান্ডে ৪৯%, চীনে ৫৪%, হংকং এ ৮১%, সিঙ্গাপুরে ৮৯%, আর্জেন্টিনায় ৯০% এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ১০৮%। ২০১৯ সাল নাগাদ টার্সিয়ারি পর্যায়ে নিবন্ধনের হার গড়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ২৫%, ইউরোপে ৭৫% এবং সারাবিশ্বে ৩৯%।

স্মারণী-৩.৬(১২) : স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনে অগ্রগতির চিত্র :

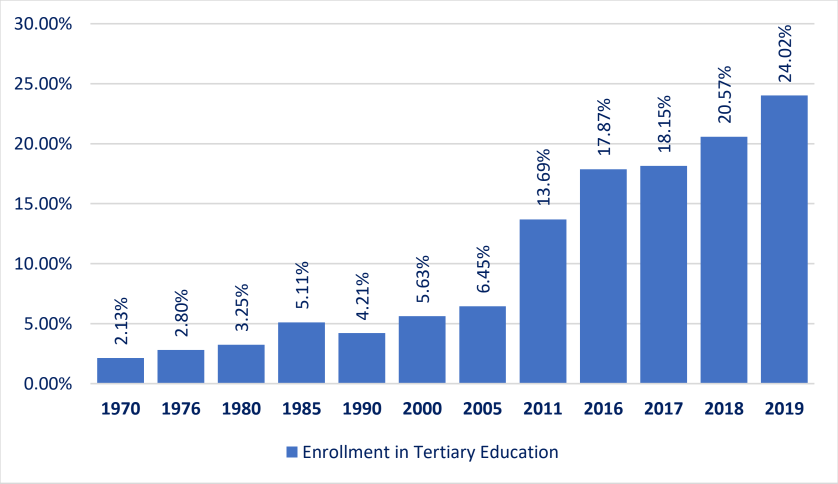

Source: World bank Data

বিভিন্ন প্রফেশনাল বিষয়ে নিবন্ধনের চিত্র :

৫) বিভিন্ন প্রফেশনাল বিষয়ে নিবন্ধনের চিত্র :

সাধারণ টার্সিয়ারি শিক্ষা ছাড়াও টার্সিয়ারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রফেশনাল বিষয়ে ২০১৮ সালে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৪২৫টি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১২১,৪৮৮ জন। দেশে প্রফেশনাল বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১০ সালে ছিল ৬৯,৯৪৩ জন এবং ২০১৫ সালে ১২২,৮২৯ জন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১০-২০১৫ সময়ের ব্যবধানে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও ২০১৫ সালের পর শিক্ষার্থীর সংখ্যা আর বাড়েনি। তাছাড়া, দেশে প্রফেশনাল পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এক চতুর্থাংশেরও কম, যা দেশে প্রফেশনাল শিক্ষা বিস্তারকে বাধাগ্রস্থ করছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে মানসন্মত সেবা বৃদ্ধি করতে দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে প্রফেশনাল দক্ষ জনবল তৈরি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানসন্মত প্রফেশনাল প্রতিষ্ঠান এবং অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ কম এবং এক্ষেত্রে নতুন জনবলও তৈরি হচ্ছে কম, প্রফশনাল সেবার ক্ষেত্রে যা বড় আকারের ঘাটতি তৈরি করছে। স্মারণী-৩.৬(১৩)

স্মারণী-৩.৬(১৩) : ২০১৮ সালে বিভিন্ন প্রফেশনাল বিষয়ে ছাত্র / ছাত্রী নিবন্ধনের চিত্র :

S.L	Type of Institution	No. of Institutions	Enrolment of Students		
			Public	Private	Total
1	Medical College	111	17,967	27,421	45,388
2	Dental College	35	2,382	4,472	6,853
3	Nursing College	71	1,475	2,951	4,426
4	Homeopathic College	62	221	27,043	27,264
5	Unani / Ayurvedic College	16	754	2,842	3,596
6	Textile Technology College	11	832	364	1,196
7	Leather Technology College	1	440	-	440
8	Law College	80	-	23,395	23,395
9	Art College	8	-	1,555	1,555
10	Agriculture College	5	-	2,345	2,345
11	Library Science	12	-	2,575	2,575
12	Others	13	-	2,455	2,455
	Total :	**425**	**24,071**	**97,417**	**121,488**

Source: BBS

ঞ) মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ে নিবন্ধন কমে যাওয়ার কারণসমূহ :

বর্তমানে দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার অনেকটা সন্তোষজনক হলেও, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং টার্সিয়ারি পর্যায়ে নিবন্ধন হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটেও সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া, মাধ্যমিক থেকে পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্তের ক্ষেত্রে পুরষ শিক্ষার্থীর চেয়ে নারী শিক্ষার্থীর হার আশংকাজনক হারে কম। ফলে দেশে উচ্চশিক্ষার হার অনেক ধীর গতিতে বাড়ছে, যা আগামীতে দেশে উৎপাদন, প্রশাসন এবং অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে সন্দেহ নেই। কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন সর্বাগ্রে বিবেচ্য, আর উচ্চশিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। মানব সম্পদের মানসন্মত উন্নয়ন ব্যাতিত দেশের কাঙ্কিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব বলা চলে।

দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারের প্রধান অন্তরায় মাধ্যমিক ও তদোর্ধ্ব শ্রেণীগুলোতে নিবন্ধনের হার কম হওয়া, যার অনেকগুলো কারনের মধ্যে রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, পারিবারিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং দেশে মানসন্মত শিক্ষার অভাবসহ আরোও অনেক কারন। উপরের ক্লাসগুলোতে নিবন্ধন কম হওয়ার আরোও একটি উল্ল্যেখযোগ্য কারন হলো গ্রামের স্কুলগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার মান একদমই ভালো না। সাধারন জ্ঞান ও নৈতিকতার চর্চা এখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। ইংরেজি ভাল না জানার কারনে উপরের ক্লাস গুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের প্রচুর অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয় এবং পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করে, যা তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার আশংকাজনক হারে কম, নারীদের ক্ষেত্রে এ হার পুরুষদের তুলনায় অর্ধেকের চেয়েও কম, যা দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধিরক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

SJHBD

মাধ্যমিক থেকে পরবর্তী পর্যায়ে নিবন্ধন কমে যাওয়ার প্রধান প্রধান কারণসমূহ :-

১) **দারিদ্রতা :** গ্রাম ও শহরের অনুন্নত এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহের বেশির ভাগই দারিদ্রতার কারনে সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করাতে অক্ষম। ফলে ঐ সমস্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা কোনোমতে প্রাথমিকের গন্ডি পার হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি না হয়ে আয় রোজগারের সন্ধানে নেমে পড়ে।

২) **পরিবারে শিক্ষার অভাব :** গ্রাম ও শহরের অনুন্নত এলাকায় বসবাসকারি বেশিরভাগ পরিবারে মা বাবা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত হওয়ার কারনে তাদের সন্তানদেরকে মাধ্যমিক বা তদোর্ধ্ব শ্রেণীতে পড়ানোর ব্যাপারে মা বাবার তেমন আগ্রহ থাকেনা।

৩) **উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে ধারনা না থাকা :** অনগ্রসর পরিবারগুলোর বশিরভাগই খেটে খাওয়া মানুষ, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে তাদের ধারনা বা আগ্রহ কোনোটাই নেই, ফলে ঐ সমস্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের মাঝে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের প্রবণতা খুবই কম।

৪) **ইংরেজি ভাষায় অদক্ষতা :** গ্রামের স্কুলগুলোতে ভালোমানের ইংরেজি শিক্ষক না থাকায় এবং সেখানে ইংরেজি ভাষা চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ার গ্রাম পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণ ইংরেজিতে মাত্রাতিরিক্ত দুর্বল থাকে, যা তাদেরকে উচ্চশিক্ষায় আগাতে ভীত ও অনাগ্রহী করে তোলে।

৫) **শিশু শ্রম বন্ধ না হওয়া :** দেশে আজো শিশু শ্রম পুরোপুরি বন্ধ না হওয়ার কারনে আর্থিক সংকটে থাকা পরিবার সমূহ সন্তানদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির সাথে সাথে আয়ের উদ্দেশ্যে কোনো না কোনো কাজে লাগায়, যে প্রবণতা দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ে নিবন্ধন কমে যাওয়ার কারণসমূহ :

৬) **বাল্য বিবাহ :** গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পরিবার সমূহে বাল্য বিবাহ একটি প্রচলিত রীতি, যেখানে শিক্ষার চেয়ে ছেলে মেয়েদের বিয়ের বিষয়কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা দেশে শিক্ষার হার হ্রাস এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বড় প্রভাব ফেলছে।

৭) **ধর্মীয় কুসংস্কার :** অশিক্ষিত ও অনগ্রসর পরিবারগুলো সাধারণত ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকার কারনে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করে, যাদের আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন, বিশেষ করে মেয়ে সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া পাপ মনে করে, যা দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৮) **অনুন্নত সামাজিক পরিবেশ :** অনুন্নত পরিবেশে বসবাসকারি মানুষদের কাছে উচ্চশিক্ষা শব্দটিই অপরিচিত, কেননা, পরিবেশের প্রভাবে ঐ সমস্ত মানুষ সবাই কম/বেশি একই ধাচে জীবন যাপন করে, যেখানে জীবনের অর্থ শুধুই খাওয়া আর বেঁচে থাকা। অনুন্নত পরিবেশ তাই দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি।

৯) **সরকারি বাধ্যবাধকতা না থাকা :** দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়াতে অনগ্রসর পরিবারের ছেলে মেয়েরা সাধারনত প্রাথমিকের গন্ডি পার হওয়ার পর মাধ্যমিক পর্যায়ে আগাতে চায় না, দেশে উচ্চশিক্ষার হার নিন্মমূখী হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারন এটি।

১০) **শিক্ষা শেষে যথাযথ কর্মসংস্থান না হওয়া :** শিক্ষা শেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান একজন শিক্ষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার। বাংলাদেশে আজো সে অবস্থান তৈরি না হওয়াতে শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে মানুষের মাঝে সংশয় অনেক বেশি, ফলে অনেকেই উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারায়, যা দেশে উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধিরক্ষেত্রে বড় আকারের নেকিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ত) শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নে যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া জরুরি :

১) প্রাইমারি থেকে ইংরেজি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া :

বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির এযুগে বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলতে হলে প্রাইমারি থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার শেষ ধাপ পর্যন্ত মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার উপর ব্যাপক জোর দিতে হবে। কেননা ইংরেজি ভাষায় আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জন ব্যাতিত এযুগে বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব। ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাবে আমাদের শিক্ষার মানকে বিশ্বে

খাটো করে দেখা হয় একথা সবার জানা। আমাদের দেশে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে কিছু ভালমানের ইংরেজি শিক্ষক থাকলেও, গ্রাম ও মফঃস্বলের স্কুলগুলোতে মানসন্মত ইংরেজি শিক্ষকের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। ফলে গ্রাম ও মফঃস্বলে অবস্থিত স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষায় বরাবরই অনেক পেছনে পড়ে থাকে, যা পরবর্তীতে তাদের উচ্চশিক্ষা এবং চাকরি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রচুর মেধা ও প্রতিভা থাকা সত্বেও শুধুমাত্র ইংরেজি ভাল না জানার কারণে এসব শিক্ষার্থী কর্মজীবনে অনেক পেছনে পড়ে যায়, যা ঐ সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ব্যাক্তিগত জীবনে এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতিয় জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

শিক্ষার হার ও মান উন্নয়নে যে সমস্ত বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি :

দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ধাপ থেকেই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার উপর ব্যাপক জোর দিতে হবে। এলক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন মানসন্মত ইংরেজি শিক্ষক (শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাস্টার ডিগ্রি এবং ইংরেজিতে পারদর্শী) নিয়োগ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়োগকৃত ঐসমস্ত শিক্ষককে সরকারি উদ্যোগে বিশেষ ট্রেনিং প্রদান পূর্বক কর্মস্থলে পাঠাতে হবে, যাতে করে নিয়োগপ্রাপ্ত ঐসমস্থ শিক্ষকগণ দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে সরকারের লক্ষ্য পূরনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী এবং উপরের ক্লাশ সমূহের পরীক্ষায় যেসমস্ত স্কুল ইংরেজি বিষয়ে মানসন্মত রেজাল্ট করতে ব্যার্থ হবে, ঐসমস্ত স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক ও স্কুলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

২) শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা :

আমাদের দেশে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা কোনো ক্ষেত্রেই নৈতিকতার চর্চা নেই বললেই চলে। সততা, সত্যবাদিতা, আত্মবিশ্বাস, দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও দেশাত্ববোধ, মানবাধিকার এবং আর যাকিছু একজন মানুষকে জীবনে ত্রুটিহীন হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে তার সবকিছুই নৈতিক শিক্ষার আওতায় পড়ে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শিক্ষার চেয়ে নৈতিকতার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি। নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি, যা একটি উন্নত ও সভ্য জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। নৈতিক শিক্ষার অভাবে দেশে উঠতি বয়সের অনেক ছেলেমেয়ে অহরহ মাদকাশক্তি, হিংসা হানাহানি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে এবং দেশের সকল ক্ষেত্রে নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত দূর্ণীতি, স্বজনপ্রীতি, খুন খারাবি ও মানবাধিকার লঙ্গনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। দূর্নীতিগ্রস্ত জাতি হিসাবে বাংলাদেশ এরিমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ কয়েকবার শীর্ষ সনদ অর্জন করেছে একথা সবার জানা।

যে সমাজে বা দেশে নৈতিকতার প্রচলন থাকবে, সেখানে হিংসা বিদ্ধেষ, হানাহানি, দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের পতন হতে বাধ্য, যা একটি আদর্শ ও বাসযোগ্য সমাজের নিদর্শন। যেকোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নৈতিকতা অন্যতম পূর্বশর্ত। সমাজের প্রতিটি মানুষ নৈতিকভাবে শক্তিশালি হয়ে গড়ে উঠার মাধ্যমেই একটি উন্নত ও সভ্য জাতির আবির্ভাব ঘটে, যা নির্ভর করে তিনটি প্রধান ক্ষেত্র, যেমন - পরিবার, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সামাজিক পরিবেশের উপর। শিক্ষার প্রথম ধাপ থেকেই প্রতিটি শিশুকে নৈতিক শিক্ষার আওতায় আনা গেলে পরবর্তীতে কর্মজীবনে তাদের উপর নৈতিকতার প্রভাব পড়বে অনেক বেশি, যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি একটা সুস্থ ও সভ্য জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

কাজেই, নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে **Extra Curriculum** এর অওতায় অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের মাধ্যমে **" নৈতিক শিক্ষা ক্লাস"** চালুকরা অত্যন্ত জরুরি।

SJFBD

৩) প্রত্যেক শিশুকে নির্দিষ্ট বয়সে স্কুলে পাঠানোর সরকারি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা :

কোনো পরিবারে মা বাবা অশিক্ষিত হলে, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলে অথবা পরিবারে শিক্ষা সচেতনতার অভাব থাকলে, সে সমস্ত পরিবারের শিশুরা নির্দিষ্ট বয়সে স্কুলে যায় না এবং গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাঝ পথে ঝরে পরে এবং এজাতীয় ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধন ও সমাপ্তির হার শতভাগ করতে প্রতিটি পরিবারের সন্তানদেরকে নির্দিষ্ট বয়সে স্কুলে পাঠানোর সরকারি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরি, তবে এক্ষেত্রে সরকার কতৃক ঐ সমস্ত পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা / পরিবারের আয়ের উৎস নিশ্চিত করা জরুরি, অন্যথায় এ পদক্ষেপ ভেস্তে যাবে এটা সন্দেহাতীত।

৪) একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন :

এমনিতেই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন রয়েছে, ফলে শিক্ষাশেষে চাকরি ও অন্যান্য কর্মসংস্থান প্রতিযোগিতায় এদেশের শিক্ষিত সমাজকে বহু বাধা বিপত্তির সন্মুখীন হতে হয়। তারউপর এক দেশে দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা (সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা) দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভীতকে আরোও নড়বড়ে করে তোলার পাশাপাশি এদেশের শিক্ষিত সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছে। এদেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে, যেমন- শিল্প, সেবা ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ে শুধুমাত্র সাধারন শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরই চাহিদা রয়েছে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী শিক্ষাশেষে কর্মসংস্থান জোগাড় করতে ব্যাপক বিড়ম্বনার শিকার হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মসংস্থান জোগাড়ে ব্যার্থ হয়, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত করে। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় থাকা কোনো মানুষ জীবন মান উন্নয়নে পুরোপুরি অক্ষম।

মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা এদেশেরই নাগরিক। শিক্ষাশেষে যথাযথ কর্মসংস্থান তাদের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এদেশের সামগ্রিক কর্মকাঠামো ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বড় অংশ প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রীতিমত হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, একপর্যায়ে যা অনেক বড় আকার ধারণ করবে। কাজেই, দেশে শিক্ষার হার ও মান উন্নয়নপূর্বক উন্নত জাতি গড়ার মাধ্যমে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে দেশে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে কর্মক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি।

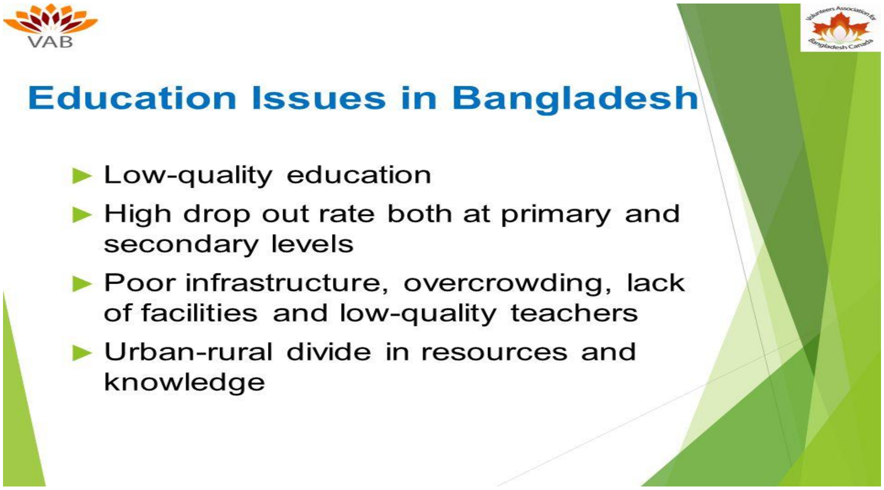

SIFBD

থ) দেশে শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নে প্রস্তাবনা :

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে টেকসই অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মানসন্মত ও কর্মমূখী শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। কেননা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মৌলিক বিষয় হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ব্যাতিত কোনো দেশের পক্ষেই টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজেকে এবং বিশ্বকে জানার ও বুঝার ক্ষমতা অর্জন করে। শিক্ষা ব্যাক্তি পর্যায়ে জীবন মান উন্নয়নের পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ প্রশস্ত করে। শিক্ষা মানুষের মাঝে উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং উদ্যোক্তা তৈরী ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে। তাছাড়া, এটি মানুষের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজে আয়ের সুষম বণ্টনে বড় ভূমিকা রাখে। (Ilhan Ozturk)

দেশে শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নে প্রস্তাবনা সমূহ :

শিক্ষা ও উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, দারিদ্র ও অসাম্য দূরীকরনে যার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে তাই দেশে শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধিপূর্বক শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। দেশে শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধিকল্পে যে সমস্তক্ষেত্রে গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, নিন্মে তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো :-

১) প্রতিটি পরিবারের সন্তানদেরকে নির্দিষ্ট বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো এবং মাধ্যমিক বা সমমানের সার্টিফিকেট অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মাঝপথে যাতে পড়ালেখা বন্ধ করে না দেয় সে বিষয়ে আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

২) দরিদ্র পরিবার সমূহে সন্তানদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে এবং মাধ্যমিক পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে মাসোহারার ব্যবস্থা করা।

৩) মাধ্যমিক বা সমমানের সর্টিফিকেট অর্জন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি যারা উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে অপারগ তাদের জন্য দুই বছরের কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

৪) শিক্ষার সকল স্তরে বৃত্তি ও উপবৃত্তির পরিমাণ বাস্তবতার নিরিখে পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা।

৫) বিয়ের নূন্যতম বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৫ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০ নির্ধারণ পূর্বক বিয়ের জন্য উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপ্তের সর্টিফিকেট প্রদর্শনপূর্বক **"বিবাহ ছাড়পত্র"** গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা।

৬) দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ধাপ থেকেই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশব্যাপি প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন মানসন্মত ও প্রশিক্ষিত ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া।

৭) নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে **Extra Curriculum** এর অওতায় অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের মাধ্যমে **" নৈতিক শিক্ষা ক্লাস"** চালুকরা।

৮) শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে দেশে একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।

৯) উপজেলায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে উপজেলা শিক্ষা অফিস সমূহের তদারকি আরোও প্রসারিত ও জোরদার করা।

১০) শিক্ষা কারিকুলাম যথাযথ বাস্তবায়নকল্পে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে উপজেলা শিক্ষা অফিস সমূহের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।

১১) শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মূল্যায়ন বৃদ্ধি করা, উদাহরনস্বরুপ- যানবাহনে কনসেশন ভাড়ার সুবিধা প্রদান করা, চারিত্রিক ও অন্যান্য সনদ এবং প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি।

১২) দেশব্যাপি নিয়মিতভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রত্যেক উপজেলার আওতাভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যথেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং শ্রেষ্ঠ অবিভাবক নির্বাচন ও সম্মাননা প্রদানের পাশাপাশি খারাপ ফলাফল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৩.৭

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ও মানোন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ও মানোন্নয়ন।

ক) উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে জনসংখ্যার বণ্টন।
খ) উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান পরিধি।
  ১) উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা।
  ২) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা।
গ) ওয়ার্ড /গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার পরিসর।
  ১) প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার ধরণ।
  ২) কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে প্রদত্ত সেবা।
  ৩) চিকিৎসা সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ততা।
  ৪) প্রদত্ত সেবার মান।
ঘ) গ্রাম ও শহর পর্যায়ে রোগ ভেদে মৃত্যুর হার।
ঙ) গ্রাম ও শহরভেদে স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের অগ্রগতি।
চ) চলমান গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল্যায়ন।
ছ) উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে প্রস্তাবনা।

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন :

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন :

স্বাস্থ্যখাত দেশের সামগ্রিক অথনীতির একটি বড় অংশ। কেননা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত সুস্থ জাতি গঠন, আর সুস্থ জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা। সুস্থ জাতিগঠন ব্যাতিত টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলা অসম্ভব। উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধিপূর্বক স্বল্প ব্যয়ে সবার জন্য মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান এবং স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সুযোগ পর্যাপ্ত মাত্রায় নিশ্চিত করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, দেশে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যাক্তিপর্যায়ে মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া জরুরি।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের বেশি বসবাস গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে, যাদের সিংহভাগই সীমিত আয়ের মানুষ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতায় যারা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই যাদের নিত্যসঙ্গী। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বসবাসরত দেশের বৃহত্তর এ জনগোষ্ঠীর সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য ন্যায্য খরচে, ক্ষেত্র বিশেষে বিনা খরচে মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুস্থ জাতি গঠনে আগাতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজন দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপক প্রসার। স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, অনুচ্ছেদ (ঝ) অনুযায়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালি করার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকল্পে কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহকে স্বাস্থ্য সেবার প্রাথমিক স্তর হিসাবে চিহ্নিত করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন পূর্বক উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

অতীতের সরকারগুলো আর্থিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারনে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে অনেক বেশি পিছিয়ে থাকলেও বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে দেশব্যাপি উপজেলা স্বাস্থ্য কপ্লেক্সসমূহে সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান চালু করেছেন। অর্থবছর ২০১২-১৩ এর পর থেকে গ্রামীন স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি বরাদ্ধের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে গ্রামীণ স্বাস্থ্যখাতে (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) বরাদ্ধের পরিমাণ ছিল টাকা ৩,৯১৭.৮০ মিলিয়ন এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে টাকা ৭,৬৮৭.১০ মিলিয়ন।

তবে হতাশার বিষয় হচ্ছে, বিগত এক দশকের ব্যবধানে জাতিয় বাজেটের আকার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলেও, সে অনুপাতে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধের পরিমাণ ছিল গড়ে জাতিয় বাজেটের ৪.৯৭%, জি.ডি.পি অনুপাতে যা ১% এর চেয়েও কম, দক্ষিন এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। স্বাস্থ্যখাতে এত কম বরাদ্ধ রেখে দেশে স্বাস্থ্যসেবার পরিসর বৃদ্ধি ও মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সত্যিকার অর্থে অসম্ভব। তাছাড়া, বিভিন্ন মহলের মতে দেশের স্বাস্থ্যখাত পিছিয়ে থাকার একটি বড় কারণ এখাতে অপ্রতিরোধ্য দুর্ণীতি।

ক) উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে জনসংখ্যার বণ্টন :

উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে জনসংখ্যার বণ্টন :

HVRS-2018 অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৪.৬ মিলিয়ন , তন্মধ্যে গ্রামে ১১৯.৭৫ মিলিয়ন (৭২.৭৫%) এবং শহরে ৪৪.৮৫ মিলিয়ন (২৭.২৫%) জনগোষ্ঠীর বসবাস। (Distribution ratio based on HIES-2016) | সে সময়ের তথ্যানুযায়ী উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ (স্মারণী-৩.৭(১) এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো ।

স্মারণী-৩.৭(১) : ২০১৮ সাল নাগাদ প্রতি উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রামে বসবাসরত জনসংখ্যা :

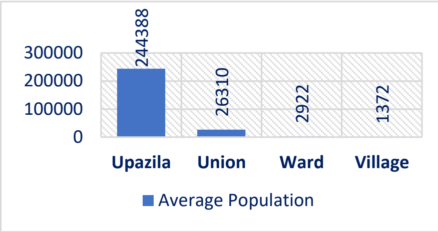

Source: BBS

স্মারণী-৩.৭(২) : HVRS-2018 অনুযায়ী উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ :

Area	Particulars	Population
Rural :	Total Population	11,97,50,000
Upazila - 490	Average Population per Upazila	244,388
Union - 4,553	Average Population per Union	26,310
Ward - 40,977	Average Population per Ward	2,922
Village - 87,310	Average Population per Village	1,372

Source: HVRS-2018

খ) উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান পরিধি :

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পরিধি উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত রয়েছে বটে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় আজো যথেষ্ঠ অপ্রতুল এবং নিম্নমানের। উপজেলা পর্যায়ে **"উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স"**, ইউনিয়ন পর্যায়ে **"ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র"** এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে **"কমিউনিটি ক্লিনিক"** এর মাধ্যমে সমগ্র দেশে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সবার জন্য সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে দেশব্যাপি জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যে মানসন্মত স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা সব্রাগ্রে বিবেচ্য। এলক্ষ্য মাথায় রেখে বর্তমান সরকার গ্রাম ও

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান পরিধি :

প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে **"কমিউনিটি ক্লিনিক"** এর মাধ্যমে ভিন্নমাত্রার স্বাস্থ্যসেবা শুরু করেছেন, যা এরিমধ্যে বেশ পরিচিতি পেয়েছে।

২০১৭ সাল নাগাদ সারাদেশে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাসপাতাল ৪৭৭ টি (উপজেলা পর্যায়ে ৪২৬ টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫১টি) যেখানে সর্বমোট বেড সংখ্যা ১৯,৪৪১, ওপিডি ক্লিনিক ১,৪৬৩টি (উপজেলা পর্যায়ে ৬৪ টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,৩৯৯টি) এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক ১৩,৪৪২টি। স্মারণী-৩.৭(৩)

স্মারণী-৩.৭(৩) : ২০১৭ সাল নাগাদ উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার পরিধি :

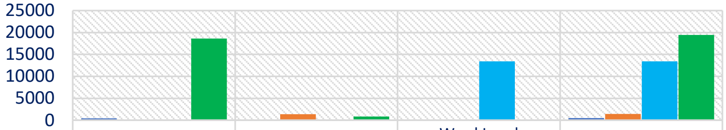

	Upazila Level	Union Level	Ward Level (Community Clinics)	Total Facilities
Hospital	426	51	0	477
OPD Clinic & UHFWC	64	1399	0	1,463
Community Clinics	0	0	13,442	13,442
No. of Beds	18,611	830	0	19,441

Source : DGHS

১) উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা :

দেশে মোট উপজেলার সংখ্যা ৪৯০টি এবং ২০১৭ সাল নাগাদ প্রত্যেক উপজেলায় গড়ে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ ২৪৪,৩৮৮ জন। ঐ সময়ে দেশে মোট উপজেলা হেল্থকমপ্লেক্স এর সংখ্যা ৪২৬টি যাতে সর্বমোট বেড সংখ্যা ১৮,৬১১টি, গড়ে প্রত্যেকটিতে বেড সংখ্যা রয়েছে ৪৪ এবং ডাক্তারের সংখ্যা ৬ জন। অর্থাৎ ৪২৬ উপজেলায় গড়ে ৪০,৭৩১ জন লোকের বিপরীতে ১ (এক) জন ডাক্তার এবং ৫,৫৫৪ জনসংখ্যার বিপরীতে একটি করে বেড় রয়েছে। অবশিষ্ট ৬৪ উপজেলায় OPD Clinic এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স (৪২৬টি)

২) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা :

দেশে মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ৪,৫৫৩ এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে গড়ে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ ২৬,৩১০ জন। ২০১৯ সাল নাগাদ সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপিত ৫,১২৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে প্রতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিপরীতে লোকসংখ্যার পরিমাণ কমবেশি ২৩,৩৭০ জন।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (৫,১২৪ টি)

SFBD

গ) ওয়ার্ড /গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার পরিসর :

ওয়ার্ড/গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে একজন স্বাস্থ্য সহকারী, একজন ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এসিষ্ট্যান্ট এবং একজন সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শক কাজ করছেন। দেশে মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ৪০,৯৭৭ এবং প্রতি ওয়ার্ডে গড়ে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ ২,৯২২ জন। ২০১৮ সাল নাগাদ সারাদেশে ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থাপিত ১৩,৪৪২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট ২০১৮ অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবহারকারিদের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী ১৮%, দরিদ্র শ্রেণী ৩০% এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৫২%।

১) প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার ধরণ :

কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রত্যেক ক্লিনিকে কমপক্ষে একজন পূর্ণাঙ্গ ডাক্তার/সনদধারী পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, অনেকক্ষেত্রে তা আজো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। CBHC রিপোর্ট ২০১৮ অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে সেবাপ্রদান কারিদের মধ্যে ৮৫.৭% সনদধারি পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী, ৬.৫% স্বাস্থ্য সহকারি, ২.৬% পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং ৫.২% কমিউনিটি স্কিলড্ বার্থ এটেনডেন্স রয়েছে। স্মারণী-৩.৭(৪)

স্মারণী-৩.৭(৪) : কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্বাস্থ্যকর্মী কতৃক সেবা প্রদানের হার :

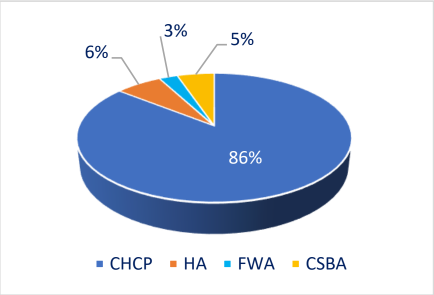

Source: CBHC Report 2018

ওয়ার্ড /গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার পরিসর :

২) কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে প্রদত্ত সেবা :

কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে প্রদত্ত সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে সীমিত আকারে রোগ নিরাময় সেবা, এ.এন.সি, নরমাল সন্তান ডেলিভারি, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্চা এবং ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।। স্মারণী-৩.৭(৫)

স্মারণী-৩.৭(৫) : কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে প্রদত্ত সেবা সমূহের তালিকা :-

S.L	Type of Services	Service Providing
1	Limited Curative Care	100%
2	ANC	100%
3	Normal Child birth/ delivery	Partially
4	Family Planning	100%
5	Child health services :	
	a) Curative care for sick children.	100%
	b) Growth monitoring	100%
	c) Vaccination	100%
6	Vitamin A capsule distribution	mostly

Source: Who Report 2019

৩) চিকিৎসা সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ততা :

বাংলাদেশ হেলথ্ ফ্যাসিলিটি সার্ভে রিপোর্টের তালিকা অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে যথাযথভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদির মধ্যে রয়েছে- এডাল্ট স্কেল, চাইল্ড স্কেল, ইনফ্যান্ট স্কেল, থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ, ব্লাড প্রেশার মেশিন এবং লাইট সোর্স। ২০১৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার জরিপে দেখা যায়, ক্লিনিক সমূহে এ সাতটি সরঞ্জামের মধ্যে মাত্র দুটি সরঞ্জাম (স্টেথোস্কোপ ও ব্লাড প্রেশার মেশিন) ব্যাতিত বেশিরভাগ ক্লিনিকে অন্যান্য সরঞ্জাম অপর্যাপ্ত রয়েছে স্মারণী- ৩.৭(৬)।

স্মারণী-৩.৭(৬) : ২০১৮ সালের সার্ভে অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে কার্যক্ষম বেসিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ততা :

Basic Equipment	Available in functional condition
Adult Scale	75%
Child Scale	75%
Infant Scale	62.5%
Thermometer	87.5%
Stethoscope	100%
Bloof Preasure Apparatus	100%
Light Source	25%
Glucometer	75%
Acute respiratory inspection timer	12.5%
Stadiometer	50%
Growth monitoring chart	87.5%

Source: CBHC Report 2018

৪) প্রদত্ত সেবার মান :

কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে ধারণক্ষমতা, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও সনদধারি ডাক্তারের অপর্যাপ্ততা থাকলেও সেখানে সেবা প্রদানকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের আচরন এবং সেবার মান নিয়ে বেশিরভাগ সেবা গ্রহীতা সন্তুষ্ট রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ ২০১৮ অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে ৬৬% সন্তুষ্ট এবং ২৬% খুব সন্তুষ্ট। অবশিষ্ট ৭% মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং মাত্র ১% অসন্তুষ্ট থাকার প্রমাণ মিলেছে। স্মারণী-৩.৭(৭)

স্মারণী-৩.৭(৭) : কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে প্রদত্ত সেবার মান নিয়ে ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টির চিত্র :-

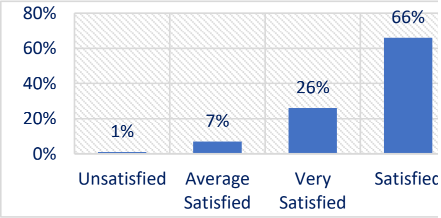

Source: WHO Report 2018

ঘ) গ্রাম ও শহর পর্যায়ে রোগ ভেদে মৃত্যুর হার :

গ্রাম ও শহর পর্যায়ে রোগ ভেদে মৃত্যুর হার :

স্থান ও পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন রোগের ধরণ ও প্রাদুর্ভাবের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়, চিকিৎসা ব্যবস্থার যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে তা মোকাবেলা করা হয়, এটাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রীতি। দেশে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে জীবনঘাতী বিভিন্ন রোগের মাত্রা সবসময় কমবেশি হয়ে থাকে, যা মৃত্যুর হারে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। হৃদরোগ, হার্ট এটাক, উচ্চ রক্তচাপ, ব্রেইন স্ট্রোক, বার্ধক্যজনিত রোগ, কিডনি ও ডায়বেটিক এ মৃত্যুর হার গ্রামের তুলনায় শহরে যথেষ্ঠ বেশি। অন্যদিকে ক্যান্সার, এ্যাজমা, সংক্রমন ব্যাধি, পেনোমনিয়া, জন্ডিস ও যক্ষা রোগে মৃত্যুর হার শহরের তূলনায় গ্রাম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। SVRS- 2018 অনুযায়ী শহর ও গ্রাম পর্যায়ে টপ ১৫ টি জীবনঘাতী রোগে মৃত্যুর হার নিন্মে প্রদত্ত হলো :-

স্মারণী-৩.৭(৮) : শহর ও গ্রাম পর্যায়ে টপ ১৫ টি জীবনঘাতি রোগে মৃত্যুর হার :

Diseases	Death Rate (%)		
	Rural	Urban	National
Heart Disease	12.2	17.4	14.2
Heart Attack	9.7	11.4	10.4
Cancer	8.3	6.8	7.7
Asthma	6.2	4.5	5.5
High Blood Pressure	5.0	5.8	5.3
Brain Stroke	4.6	6.1	5.2
Respiratory Disease	5.2	2.8	4.3
Pneumonia	4.7	3.4	4.2
Geriatric	3.0	4.8	3.7
Jaundice	3.3	2.9	3.2
Other Accident	2.6	2.3	2.5
Kidney	1.9	3.2	2.4
Diabetes	2.3	2.6	2.4
Tuberculosis	2.5	1.5	2.1
Dysentery	1.2	1.3	1.3
Others	27.5	23.3	25.8

Source : SVRS 2018

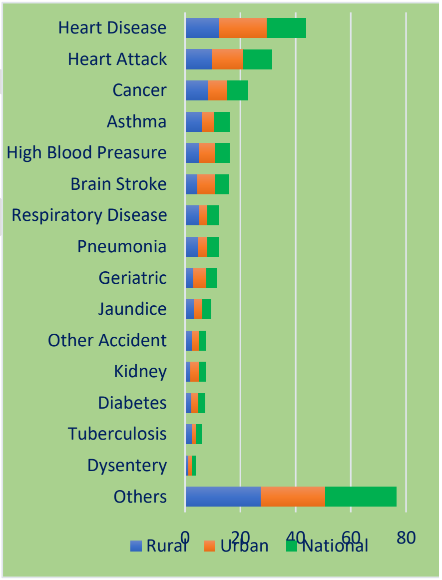

Source : SVRS 2018

ঙ) গ্রাম ও শহরভেদে স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের অগ্রগতি :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সূচকের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, অন্তত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, আই. এম.এফ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট তাই ইঙ্গিত করে। তবে একথাও সত্য যে স্বাস্থ্যখাতে SDG 2030 লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ এখনো যেমন পিছিয়ে আছে, তেমনি গ্রাম ও শহর পর্যায়ে সামঞ্জস্যতা রেখে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করাও সম্ভবপর হচ্ছে না। উদাহরনস্বরুপ, স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ সূচক সমূহের মধ্যে ক্রুড বার্থ রেট, ক্রুড ডেথ রেট, মা ও শিশু মৃত্যুর হার, গর্ভনিরোধ প্রবণতার হার, ফার্টিলিটি রেট এবং গড় আয়ু ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় গ্রামে অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। স্বাস্থ্যখাতের টেকসই উন্নয়নে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে স্বাস্থ্য সেবার মান এবং স্বাস্থ্যখাতে অগ্রগতির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় গ্রামপর্যায়ে

গ্রাম ও শহরভেদে স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের অগ্রগতি :

বসবাসরত দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অসম্ভব, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নিম্নে ২০১৮ সাল নাগাদ গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সূচকের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরা হলো।

স্মারণী- ৩.৭(৯) : ২০১৮ সাল নাগাদ গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র :

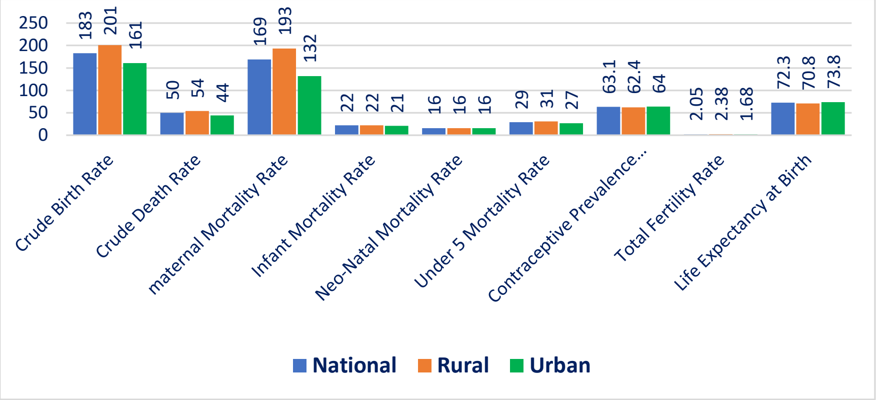

Source : BBS, DG Health

চ) চলমান গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল্যায়ন :

চলমান গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল্যায়ন :

গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপিত **"ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র"** এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থাপিত **"কমিউনিটি ক্লিনিক"** গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে নিসন্দেহে একটি চমৎকার উদ্দ্যোগ। তবে এক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে জনসংখ্যার তুলনায় ক্লিনিক সমূহে পুর্ণাঙ্গ ডাক্তারের সংখ্যা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং সেবার মাত্রা ও মান এখনো যথেষ্ঠ অপ্রতুল। যেহেতু দেশের দুই তৃতীয়াংশের বেশি জনগোষ্ঠীর বসবাস্ গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে, যাদের সিংহভাগই আর্থিক অসচ্ছল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতায় যারা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে, সেহেতু দেশে টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার আওতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন পূর্বক দেশের বৃহত্তর এ জনগোষ্ঠির মাঝে স্বল্প খরচে, ক্ষেত্র বিশেষে বিনা খরচে মানসন্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও উন্নয়ন যেমন অপরিহার্য, তেমনি ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশের জন্য সমান অপরিহার্য। এ দুটি লক্ষ্য সামনে রেখেই স্বাস্থ্যখাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

ছ) উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে প্রস্তাবনা :

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে প্রস্তাবনা :

দেশে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে স্বাস্থ্যনীতি- ২০১১ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ক) সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা খ) মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা ; এবং গ) রোগ প্রতিরোধে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। উল্লেখ্য সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে অদ্যাবধি শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে, উপজেলার আওতাভূক্ত জনগণকে জরুরি চিকিৎসার জন্য জেলা শহরের হাসপাতালে যেতে হয়, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পক্ষে যা অনেক ভোগান্তি ও ব্যয়বহুল এবং দেশে স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে যা রীতিমত বিপরীত চিত্র। কাজেই দেশে স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে উপজেলা পর্যায়ে মানসন্মত জরুরি স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মাঝে মানসন্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি।

SIPBD

উপজেলা পর্যায়ে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহ :

ক) উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স সমূহকে সেকেন্ডারি লেভেল এ উন্নীত করা, এ জন্য প্রয়োজন :-

- উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স সমূহে সেবার সংখ্যা ও মান, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ এর সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- প্রত্যেক হেলথ্ কমপ্লেক্স এ নূন্যতম ১৫-২০ টি খাতে সেবা দেয়ার লক্ষ্যে নুন্যতম ১০ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ২০ জন নার্স এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক হেলথ্ টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য কর্মী নিয়োগ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সর্বরাহ পূর্বক উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার পরিসর ও মান বৃদ্ধির মাধ্যমে SDG Goal-3.c.1 অর্জন ত্বরান্বিত করা।
- হেলথ্ কমপ্লেক্স সমূহে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বরাদ্দের ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে প্রাদুর্ভাব বেশি এমন রোগ সমূহের বিশেষজ্ঞগণ প্রধান্য পাওয়া জরুরি।

খ) প্রত্যেক উপজেলা সদরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ”উপজেলা হেলথ্ কন্ট্রোল অফিস” স্থাপন পূর্বক নিন্মোক্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা :-

- **উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তদারকি :** সংশ্লিষ্ঠ উপজেলায় সেবাদানরত হেলথ্ কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের কার্যাবলি তদারকি ও ঐসব প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সচল রাখতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- **উপজেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য ইউনিট পরিচালনা :** প্রত্যেক উপজেলায় কমপক্ষ্যে ৪ টি ” উপজেলা ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য ইউনিট” গঠণ পূর্বক স্ব-স্ব উপজেলার আওতাভূক্ত সমস্ত গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে অস্তায়ী ক্যাম্পের মাধ্যমে পালাক্রমে সপ্তাহে অন্তত এক বেলা বিনা মূল্যে রোগি দেখার ব্যবস্থা থাকবে। (প্রত্যেক ইউনিটে কমপক্ষে মা ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ১ জন, মেডিসিনের ডাক্তার ১ জন, নার্স ১ জন, সহকারি ১ জন= মোট ৪ জন সুনির্দ্দিষ্ট থাকবে)।
- **চিকিৎসা বিষয়ক ড্যাটাবেজ তৈরি :** সংশ্লিষ্ঠ উপজেলার স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ ও ড্যাটাবেজ তৈরি করা।
- **মনিটরিং ও প্রশিক্ষণ :** মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং, স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত সকল কার্যাবলি তদারকি করন।

গ) **ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে মানসন্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি করা:**

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে দৈনিক ৮ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৬ দিন সেবাদান চালু রাখা।
- প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নূন্যতম ১ জন পূর্ণাঙ্গ ডাক্তার, প্রশিক্ষিত নার্স ১ জন, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী ১ জন ও একজন প্রশিক্ষিত আয়া নিয়োগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি SDG Goal-3.c.1 অর্জন ত্বরান্বিত করা।
- ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সেবাদানরত স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত পরিমান ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষনের মেয়াদ নুন্যতম ৬ মাসে উন্নীত করা।
- গ্রাম পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং জন্মনিয়ন্ত্যণ ব্যবস্থার কার্যকর উন্নয়নে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের কর্মকর্তা কর্মচারিদের জাতিয় বেতন স্কেল নিশ্চিত পূর্বক জবাব দিহিতার আওতায় নিয়ে আসা।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালানো।

****

SIFBD

অধ্যায় : ৩.৮

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনসন স্কীম চালুকরা।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনসন স্কীম চালুকরা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনসন স্কীম চালুকরা।

ক) দেশে দারিদ্রতার বর্তমান চিত্র।
- ১) দরিদ্র, দারিদ্রতার গ্যাপ ও হতদরিদ্রের হার।
- ২) হত দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা।

খ) গ্রামীণ দারিদ্রতার কারনে যেভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।
- ১) দারিদ্রতার কারনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে।
- ২) দারিদ্রতা ও অজ্ঞতার কারনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য ঝুকিতে রয়েছে।
- ৩) দারিদ্রতার কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ নিন্মমানের আবাসনে বসবাস করেন।
- ৪) জনসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ দারিদ্রতা প্রধান অন্তরায়।
- ৫) গ্রাম পর্যায়ে তীব্র দারিদ্রতা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

গ) গ্রামীণ দারিদ্রতা নিরসনে " **সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম**" চালু করা।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম চালু করা :

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম চালু করা :

কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমাজে সম্পদের সুসম বন্টন অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় দেশের সম্পদ কোনো বিশেষ শ্রেণী/গোষ্ঠীর নিকট কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হয়, যা দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির মূলধারাকে মারাত্মক ব্যাহত করে এবং দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসাবে কাজ করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের অর্থনীতির আকার পূর্বের তুলনায় যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে জাতিয় বাজেটের আকার বেড়েছে কয়েকগুণ, জি.ডি.পি, মাথাপিছু আয়, জাতিয় সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকলক্ষেত্রে কমবেশি দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফলে দেশে দারিদ্রতার হার আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে নিঃসন্দেহে। আনন্দ সংবাদ হচ্ছে, এ সমস্ত অগ্রগতির স্বীকৃতি স্বরুপ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘ স্বীকৃতি লাভ করেছে, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে যা অনেক বড় পাওয়া।

কিন্তু অর্থনীতির এ অগ্রযাত্রার পাশাপাশি যে বিষয়টি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাহলো দেশের সম্পদ, ব্যবসা বানিজ্য ও সামাজিক আধিপত্য ক্রমান্বয়ে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে, ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান এখন অনেকটা দৃশ্যমান। সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে সকলক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতা বিরাজ করছে, ফলে ধনী ব্যাক্তি আরোও ধনী এবং দরিদ্র গোষ্ঠি একই অবস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। মুষ্টিমেয় এ সমস্ত সম্পদশালিদের অগাধ আয় ও অঢেল সম্পদের কারনে দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও, বাস্তবে দেশে এখনো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। HIES 2016 অনুযায়ী দেশে দারিদ্রতার হার (দরিদ্র, হতদরিদ্র ও দারিদ্রতার গ্যাপ মিলিয়ে) ৪২.২%, গ্রামে ৪৬.৭% এবং শহরে ৩০.৪%।

দেশের বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র রেখে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উন্নত দেশের কাতারে পৌছার চেষ্টা হবে সত্যিকার অর্থে বাস্তবতা বিবর্জিত। বাংলাদেশকে উন্নত অর্থনীতির কাতারে পৌছাতে হলে প্রয়োজন সম্পদ অনুপাতে বিনিয়োগ নীতি চালু করে দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিপূর্বক দ্রুতগতিতে দারিদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরকারিভাবে বিশেষ প্রণোদনা ও আর্থিক

সহায়তার মাধ্যমে ঐ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সক্ষম ও সক্রিয় করে তোলা, যাতে কোনো অবস্থাতেই দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবনমান উন্নয়নে পিছিয়ে না পড়ে। **এলক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনসন স্কীম চালুকরার মাধ্যমে ঐ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।**

ক) দেশে দারিদ্রতার বর্তমান চিত্র :

১) দরিদ্র, হতদরিদ্র ও দারিদ্রতার গ্যাপ :

দরিদ্র, হতদরিদ্র ও দারিদ্রতার গ্যাপ :

HIES 2016 অনুযায়ী দেশে দারিদ্রতার হার (দরিদ্র, হতদরিদ্র ও দারিদ্রতার গ্যাপ মিলিয়ে) ৪২.২%, গ্রামে ৪৬.৭% এবং শহরে ৩০.৪%। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে মোট জনসংখ্যার ২৪.৩% দারিদ্র সীমার উপরে, দারিদ্রতার গ্যাপ ৫.০% এবং ১২.৯% জনসংখ্যা দারিদ্র সীমার নিচে রয়েছে। যারমধ্যে, গ্রামে দারিদ্র সীমার উপরে ২৬.৪%, দারিদ্রতার গ্যাপ ৫.৪% এবং দারিদ্র সীমার নিচে ১৪.৯% এবং শহরে দারিদ্র সীমার উপরে ১৮.৯%, দারিদ্রতার গ্যাপ ৩.৯% এবং দারিদ্র সীমার নিচে ৭.৬%। অর্থাৎ শহরের তুলনায় গ্রামে দারিদ্রতার হার প্রায় দ্বিগুণ। HIES 2016 অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫৯.৫৮ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসকারি জনসংখ্যা ১১৬.০৯ মিলিয়ন (৭২.৭৫%), যারমধ্যে (১১৬.০৯ মিলিয়ন X ৪৬.৭%) = ৫৪.২১ মিলিয়ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দারিদ্রতার বেড়াজালে আবদ্ধ। স্মারণী-৩.৮(১)

স্মারণী-৩.৮(১): HIES-2016 অনুযায়ী দেশে দরিদ্র, দারিদ্রতার গ্যাপ ও হতদরিদ্রের হার :

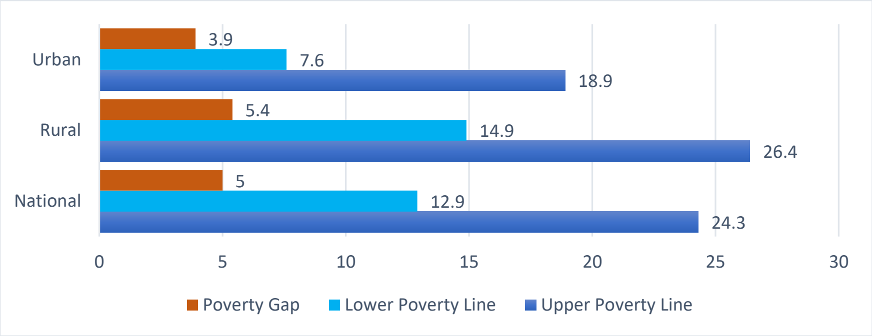

Source: BBS

SJFB

দেশে হত দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা :

২) হত দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা :

পরিবারে আয় রোজগার করার মত উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি নেই, জমি জমা নেই, এমনকি থাকার ভিটে মাটিও নেই এমন হতদরিদ্র পরিবার গুলোর সিংহ ভাগই গ্রামে বসবাস করে। সহায় সম্বলহীন এসমস্ত পরিবারের দিন কাটে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায়, ভবিষ্যৎ বলতে যাদের কিছুই নেই। HIES-2016 অনুযায়ী সারাদেশে এ শেণীর পরিবারের সংখ্যা ৩.৯৬ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ৩.১৮ মিলিয়ন এবং শহরে বসবাসরত ০.৭৮ মিলিয়ন পরিবার। আয় রোজগারহীন পরিবার সমূহের মোট জনসংখ্যা সারাদেশে ১৬.০৮ মিলিয়ন (৩.৯৬ x ৪.০৬), তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ১৩.০৭ মিলিয়ন (৩.১৮x ৪.১১) [স্মারণী-৩.৮(২)]।

স্মারণী-৩.৮(২) : HIES-2016 অনুযায়ী উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির ভিত্তিতে দেশে পরিবারের সংখ্যা:-

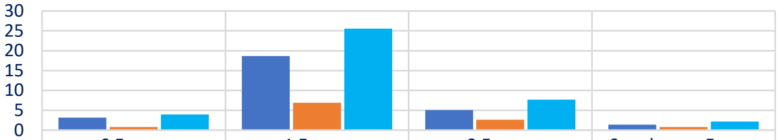

	0 Earner	1 Earner	2 Earner	3 and more Earner
Rural	3.18	18.64	5.05	1.39
Urban	0.78	6.89	2.63	0.77
National	3.96	25.53	7.68	2.16

Source: BBS

খ) গ্রামীণ দারিদ্রতার কারনে যেভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে :

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় দারিদ্রতা বাংলাদেশেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। নদীমাতৃক ও গ্রাম নির্ভর এদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে, যেখানে যোগাযোগ অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি প্রায় সকলক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বড় অংশই ভূমিহীন দিনমজুর এবং সহায় সম্বলহীন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে

দারিদ্রতার হার ৮০% এর উপরে থাকলেও, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে ক্রমান্বয়ে তা কমে ২০২০ সাল নাগাদ দেশে দারিদ্রতার হার দাঁড়িয়েছে ৪২.২%, গ্রামে ৪৬.৭% এবং শহরে ৩০.৪%।

গ্রামীণ দারিদ্রতার কারনে যেভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে :

২০১০ সাল পরবর্তী সময়ে দেশে অর্থনৈতিক ট্রান্সফরমেশন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জি.ডি.পি, কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে দেশে দারিদ্রতার মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যদিও বিভিন্ন সংস্থার হিসাবে এ হ্রাস পাওয়ার হার বছরে গড়ে ২% এর চেয়েও কম। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সাল নাগাদ দাঁড়িয়েছে ২,০৬৮ ইউ.এস.ডলার, ২০১০ সাল নাগাদ যা ছিল ৭০০ ইউ.এস.ডলার। কিন্তু, সমাজে সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে মুষ্টিমেয় সম্পদশালিদের অগাধ আয় ও অঢেল সম্পদের কারনে দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও, ব্যাক্তি পর্যায়ে এর প্রভাব খুব কমই পরেছে এবং পরছে। ফলে বিগত সময়গুলোতে গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক অগ্রগতি হয়নি বলা চলে। ২০১৬ সাল নাগাদ গ্রামপর্যায়ে বসবাসরত ১১৬.০৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৫৪.২১ মিলিয়ন জনসংখ্যাই দারিদ্রের বেড়াজালে আবদ্ধ, যা সে সময়ে গ্রামে বসবাসরত জনসংখ্যার ৪৬.৬৯% এবং দেশের মোট জনসংখ্যা অনুপাতে প্রায় ৩৪%।

আর্থিক অনটন ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারনে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত দরিদ্র এ জনগোষ্ঠী জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। মানসন্মত জীবন যাপনের সাথে সংশিষ্ট বিষয় সমূহ, যেমন- উচ্চশিক্ষা, মানসন্মত চিকিৎসা, উন্নত আবাসন ইত্যাদিক্ষেত্রে দরিদ্র এ জনগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে পড়ছে, যা দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। নিন্মে সংক্ষেপে তা তুলেধরা হলো :-

১) দারিদ্রতার কারনে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে :

দারিদ্রতার কারনে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে :

বি.বি.এস তথ্যমতে ২০১৮ সাল নাগাদ স্বাক্ষরতার হার জাতিয়ভাবে ৭৩.২%, গ্রামে ৬৭.৬% এবং শহরে ৮০.১%। ঐ একই কারনে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক পিছিয়ে রয়েছে। HIES 2016 অনুযায়ী ডিগ্রি/সমমানের নিবন্ধন জাতিয়ভাবে ৫.৬৯%, গ্রামে ৪.৫৮% এবং শহরে ৯.০%। পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইত্যাদি সকল পর্যায়ে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। টার্সিয়ারি শিক্ষা সমাপ্তকারি ছাত্রছাত্রীর হার শহরের তুলনায় গ্রামে এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। LFS- 2016-17 অনুযায়ী ঐ সময়ে দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষা সমাপ্তকারির হার ৪.২০%, যারমধ্যে গ্রামে ২.৩% এবং শহরে ৮.৬%। আর্থিক সক্ষমতা না থাকার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহনের হার অস্বাভাবিক হারে কম, যা দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধিরক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে পড়ছে, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

২) দারিদ্রতা ও অজ্ঞতার কারনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য ঝুকিতে রয়েছে :

আর্থিক অনটনের কারনে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী রোগ বালাইয়ে হয় চিকিৎসাকে এড়িয়ে চলে, অথবা গ্রাম্য চিকিৎসকের দ্বারস্ত হয়ে রোগ বালাইকে আরোও কঠিন করে তুলে, একটি সুস্থ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ২০১০ সালে BMC International Health & Human Rights পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর ৫১% রোগী বিভিন্ন কারনে চিকিৎসা নিতে যায় না। তাদের মধ্যে ৪৫% রোগী চিকিৎসার প্রয়োজনই মনে করেনা, ৪০% রোগী অর্থাভাবে ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়না, ৫% রোগী পূর্বের যেকোনো প্রেশকিপশনের আলোকে চিকিৎসা নেন, ৩% রোগী রোগ আরোও জটিল হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, ২% রোগী নিজের ডাক্তারি নিজে করে, ২% রোগীর ডাক্তারি চিকিৎসার উপর কোনো ভরসা নেই, ১.৫% রোগী আশেপাশে ডাক্তার না থাকার কারনে চিকিৎসা নেয়না এবং অবশিষ্ট ১.৫% রোগী বিনা চিকিৎসায় সুস্থ হন। স্মারণী- ৩.৮(৩)

দারিদ্রতা ও অজ্ঞতার কারনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠি স্বাস্থ্য ঝুকিতে রয়েছে :

অন্যদিকে যে ৪৯% রোগী চিকিসা নেন তাদের মধ্যে ৬৭% রোগী গ্রাম্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, ১২% রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নেন, ৯% রোগী এম.বি.বি.এস ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়, ৬% রোগী বিভিন্ন হোম রিমেডির উপর নির্ভর করে, ২% রোগী ট্রেডিশনাল হেলথকেয়ার এর উপর নির্ভর করে এবং অবশিষ্ট ৪% অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে সুস্থ হন। স্মারণী-৩.৮(৪)

স্মারণী-৩.৮(৩) : গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী যে সমস্ত কারনে চিকিৎসা নিতে যায় না :-

SL	Reasons of household do not seek care for their illness.	% of Patient
1	They do not feel that the disease require any treatment	45 %
2	They do not have enough money to go to doctor.	40 %
3	Self medicating based on the prescription provided by any health care earlier for similar health problem.	5 %
4	Wait for the disease to get serious enough to consult with doctor.	3 %
5	Depend on self medication with out prescription.	2 %
6	Do not seek treatment as they do not have believe on treatment.	2 %
7	Do not go to doctor as there is no health care providers nearby.	1.5 %
8	Got cure without any treatment	1.5 %
	Total :	**100%**

Source: BMC International Health & Human Rights Report, 2010

SJFBD

স্মারণী- ৩.৮(৪) : গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মাঝে রোগ বালাইয়ে চিকিৎসা নেওয়ার ধরন :-

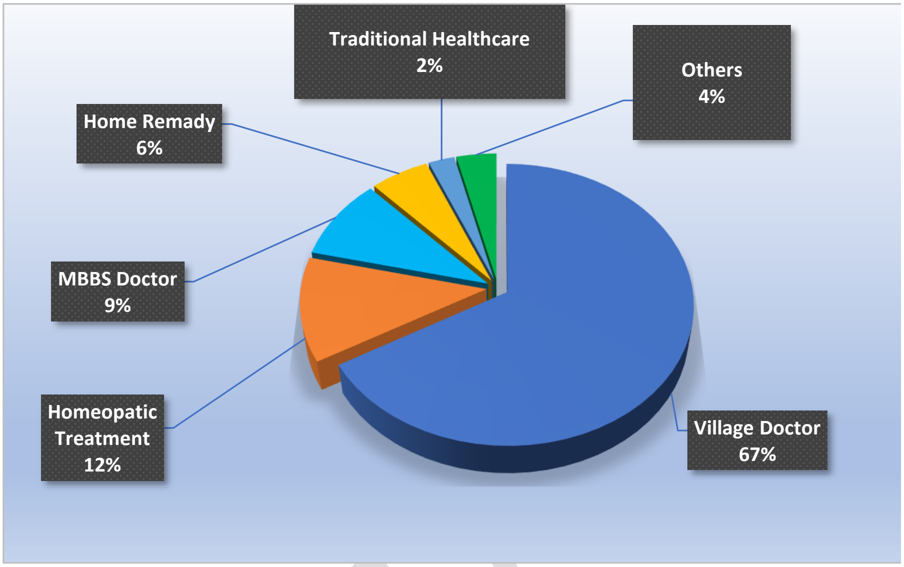

Source: **Source:** BMC International Health & Human Rights Report, 2010

৩) দারিদ্রতার কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ নিম্নমানের আবাসনে বসবাস করেন :

দারিদ্রতার কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ নিম্নমানের আবাসনে বসবাস করেন :

HIES 2016 সময়কালে দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘরবাড়ির সংখ্যা ২৮.২৬ মিলিয়ন, তন্মধ্যে মাত্র ৫.৩২% (১.৫০ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি ইট/সিমেন্টের ছাদ, ৮৯.৪১% (২৫.২৭ মিলিয়ন) ঘরবাড়ি টিন/কাঠের ছাউনি এবং ৫.২৭% (১.৪৯ মিলিয়ন) কুড়েঘর। আর্থিক অনটনের কারনে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিম্নমানের আবাসন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন, উন্নত জাতি গঠনের পক্ষে যা অন্যতম প্রধান অন্তরায় [স্মারণী-৩.৮(৫)]।

স্মারণী-৩.৮(৫) : ২০১৬ সাল নাগাদ গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসতবাড়ীর ধরন :

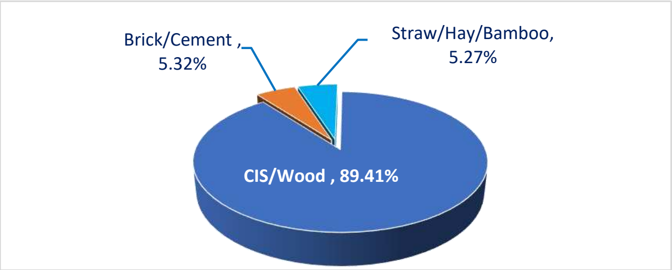

Source: BBS

৪) জনসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ দারিদ্রতা প্রধান অন্তরায় :

জনসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ দারিদ্রতা প্রধান অন্তরায় :

কোনো দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার ঐ দেশের কর্মক্ষম যুবশক্তি, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সকল সম্পদের তুলনায় যা অনেক বেশি মূল্যবান। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাবে ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ১৫ বছরের অধিক কর্মক্ষম জনসংখ্যার হার মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬১%, ২০০৯ সালে যা ছিল ৬২.৮৩%, যার বড় অংশই গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বসবাস। কর্মক্ষম জনসংখ্যার হার দেশে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। কর্মক্ষম এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রুপান্তরের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও দক্ষতা। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে তীব্র দারিদ্রতার কারনে কর্মক্ষম এ যুবশক্তি প্রয়োজনীয় শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও দক্ষতা নিয়ে গড়ে উঠতে পারছেনা। ফলে দেশে পর্যাপ্ত জনসম্পদ তৈরী হচ্ছেনা, টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে যা অপরিহার্য। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ২০২০ অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়নে ১৮৯ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে যা সর্বনিম্ন। এ তালিকায় ভারতের অবস্থান ১৩১, ভুটান ১২৯, ভিয়েতনাম ১১৭, ফিলিপাইন ১০৭, ইন্দোনেশিয়া ১০৭, মালদ্বীপ ৯৫, চীন ৮৫, থাইল্যান্ড ৭৯, শ্রীলংকা ৭২, দ. কোরিয়া ২৩, জাপান ১৯ এবং সিঙ্গাপুর ১১ তম স্থানে অবস্থান করছে। স্মারণী-৩.৮(৬)

স্মারণী-৩.৮(৬) : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :

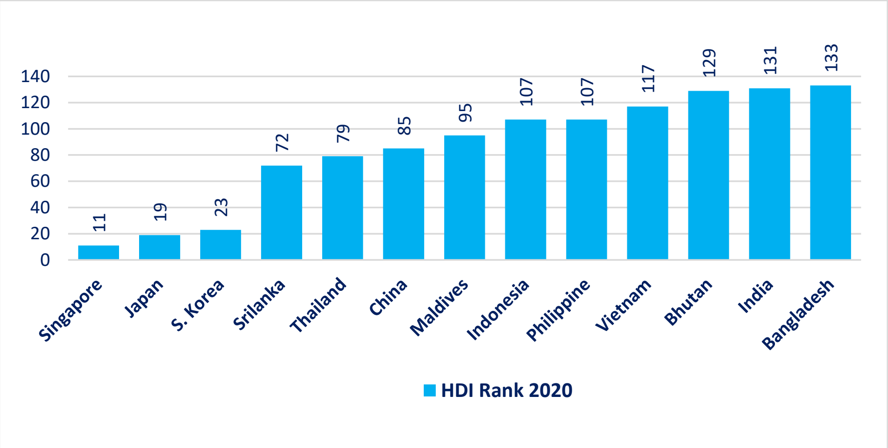

Source: UNDP   Note: Higher rank indicates lower position.

৫) গ্রাম পর্যায়ে তীব্র দারিদ্রতা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে :

গ্রাম পর্যায়ে তীব্র দারিদ্রতা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে :

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে দারিদ্রতার হার সামগ্রিকভাবে কিছুটা হ্রাস পেলেও, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের হার এখনো শহরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। World Bank Survey 2019 এর রিপোর্ট অনুসারে ২০১৬ সাল নাগাদ গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের হার যথাক্রমে ২৬.৭% ও ১৫% এবং শহর পর্যায়ে ১৯.৩% ও ৮% (স্মারণী-৩.৮(৭)। গ্রাম ও শহর পর্যায়ে দারিদ্রতার বিশাল এ ব্যবধান একদিকে যেমন দেশে বিদেশে অবহেলিত গ্রামীন অর্থনীতির ভঙ্গুর দশা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে কুলুষিত করে তুলছে, অন্যদিকে গ্রামের কর্মক্ষম অদক্ষ জনগোষ্টি কাজের খোঁজে বাধ্য হয়ে শহরমূখী হয়ে পড়ছে , যা দেশের শ্রমবাজারকে ক্রমান্বয়ে ভারসাম্যহীন ও বিপদগ্রস্থ করে তুলছে। অথছ, বাস্তবসন্মত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্রতা নিরসনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নকে জাতিয় উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা খুব কঠিন কিছু নয়।

স্মারণী-৩.৮(৭) : ২০০০-২০১৬ সময়কালে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে দাদ্রিতার তারতম্য :

Year	Rural		Urvan	
	Poverty	Extreme Poverty	Poverty	Extreme Poverty
2000	52.3%	37.9%	35.1%	19.9%
2005	43.8%	28.6%	28.4%	14.6%
2010	35.2%	21.1%	21.3%	7.7%
2016	26.7%	15.0%	19.3%	8.0%

Source: World Bank Survey 2019

গ) গ্রামীণ দারিদ্রতা নিরসনে ” সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম” চালু করা :

গ্রামীণ দারিদ্রতা নিরসনে ” সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম” চালু করা :

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে গ্রাম পর্যায়ে তীব্র দারিদ্রতা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ পরিস্থিতির উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারের আমলে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে, পাশাপাশি বিভিন্ন এন.জি.ও এবং দাতা সংস্থাসমূহের প্রচেষ্টাও কম ছিল না। তবে ২০১০ পরবর্তী সময়ে দারিদ্রতা নিরসনে বর্তমান সরকারের গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপের ফলে দেশে দারিদ্রতার হার অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে এসেছে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌছানোর লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যেই দেশে দারিদ্রের কৌটা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগুচ্ছে। বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে সরকারের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। দারিদ্রের কৌটা শূণ্যে নামিয়ে আনার অর্থ হচ্ছে দারিদ্র সীমার উপরে ও নীচে বসবাসকারি জনসংখ্যার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ, যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যার জন্য প্রয়োজন প্রতিবছর দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়া কর্মক্ষম জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে পর্যাপ্ত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য যা রীতিমত চ্যালেঞ্জ এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সুবিধা নিশ্চিত করা এবং পরিণত বয়সে পেনশনের নিশ্চয়তা না থাকলে ঐ সমাজ ব্যবস্থা কখনো টেকসই হওয়া সম্ভব নয়। উন্নত দেশসমূহে তাই বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেকার ভাতা ও বয়ষ্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তাদের মাঝে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্রতা নির্মূলের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। যাতে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে পিছিয়ে না থাকে এবং জরুরি প্রয়োজনে যাতে নুন্যতম অর্থের যোগান দিতে সমর্থ হয়।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয়ের আওতায় পেনশন স্কীম :

দেশে দারিদ্রের কোটা শূণ্যে নামিয়ে আনতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধায় ” **সঞ্চয় ভিত্তিক পেনশন প্রকল্প** ” চালু করা, যাতে গ্রামে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক পরিবারের জন্য সরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ১৫/২০ বছর মেয়াদি ১:২ হারে (হিসাব দাতার জমা ১ টাকার বিপরীতে সরকারি কন্ট্রিবিউশন ২ টাকা) মাসিক জমার ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা চালু করা, যা মেয়াদান্তে সরকারি প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের নিয়ম অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদে পেনশন ভিত্ততে ভোগ

করার সুযোগ থাকবে। এ সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রয়োজনে সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বসতবাড়ি নির্মাণ এবং অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে ঋণ নেওয়ার যাবে। এর ফলে দেশে দরিদ্র পরিবার গুলোতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ঝুকি ব্যাপকভাবে কমে যাবে, যা দেশে দারিদ্রের কোটা শূণ্যে নামিয়ে আনতে অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করবে। তাছাড়া, এ সঞ্চয় প্রকল্প চালু হলে দরিদ্র পরিবার গুলোতে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকিং সেক্টরে বিশাল আকারের সঞ্চিতি গড়ে উঠবে, যা দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির ভীতকে করে তুলবে মজবুত ও শক্তিশালী।

১) এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করার নিয়মাবলি :-

- পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি না থাকলে অথবা নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকলে।
- দুইয়ের অধিক সদস্যভূক্ত পরিবারের মাসিক গড় আয় ৫,০০০/= টাকার কম হলে।
- পরিবারের স্থায়ি সম্পত্তি না থাকলে অথবা সম্পত্তির পরিমান খুব সামান্য হলে।

২) এ প্রকল্পের প্রধান নিয়মাবলী সমূহ :

- দরিদ্র পরিবারসমূহ স্ব-স্ব উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন পূর্বক সঞ্চয় হিসাব খোলার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করবেন এবং উক্ত অনুমতিপত্রের ভিত্তিতে সরকার নির্ধারিত ব্যাংকে "সঞ্চয়ী হিসাব" খুলবেন।
- সঞ্চয়ী হিসাবের মেয়াদ সরকার কর্তক নির্ধরিত হবে, যা কোনো অবস্থাতেই ১৫ বছর কম নয়।
- উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে ঐ ব্যাক্তি প্রতিমাসে সরকার নির্ধারিত (উদাহরনস্বরুপ ৫০০/=) টাকা জমা করবেন এবং বৎসরান্তে উক্ত জমার বিপরীতে সরকার কতৃক মাসিক ১০০০/= টাকা হারে বছরে ১২,০০০/= টাকা জমা হবে।
- সঞ্চয়ী হিসাবের মেয়াদ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজস্ব হিসাবের উদ্বৃত্ত অংকের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিনা সুদে, এক বছরে ফেরৎযোগ্য ঋণ হিসাবে নেওয়া যাবে।
- কিস্তি প্রদানে বরখেলাপ, বন্ধ হিসাব চালুকরা, উত্তরাধিকার বিহীন হিসাবের উদ্বৃত্ত টাকা, হিসাবধারির অবর্তমানে বা মৃত্যুতে ঐ ব্যাক্তির কিস্তি চালিয়ে যাওয়া, মেয়াদান্তে হিসাবের উদ্বৃত্ত টাকা উত্তরাধিকারিদের মধ্যে বণ্টন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সমাধান ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে অথবা এতদসংক্রান্ত আলাদা নিয়মে করা যেতে পারে।
- মেয়াদান্তে সরকারি পেনসন স্কীমের আওতায় এ টাকা মাসিক পেনসন ভিত্তিতে উত্তোলনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩) এ প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবার সমূহ নিন্মোক্ত বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন :-

- এ প্রকল্পের নিয়ম নীতি কঠোরভাবে পালন করবেন।
- প্রকল্পের আওতাভূক্ত কোনো পরিবার দুইয়ের অধিক সন্তান গ্রহন করতে পারবে না।
- সন্তানদের নির্দিষ্ট বয়সে স্কুলে পাঠাবেন এবং স্কুলগামী সন্তানদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবেন না।
- সন্তানদের বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রদানে বিরত থাকবেন।

বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় শর্তাবলীর কারনে প্রান্তিক পরিবার গুলোতে দীর্ঘ মেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও বাল্য বিবাহ রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৩.৯

মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকরা।

মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকরা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) মৎস উৎপাদন ও আহরন।

১.০ মৎস উৎপাদন :

১.১ মৎস চাষ ও উৎপাদন।

১.২ দেশে মৎস চাষের ক্রমবিস্তার।

২.০ মৎস আহরণ :

২.১ সামুদ্রিক মৎস আহরণ।

২.২ সামুদ্রিক মৎস আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান।

৩.০ মৎস রপ্তানি।

৩.১ হিমায়িত মৎস রপ্তানি।

৩.২ হিমায়িত মৎস রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান।

খ) পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন।

গ) মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন।

ঘ) দেশে মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা।

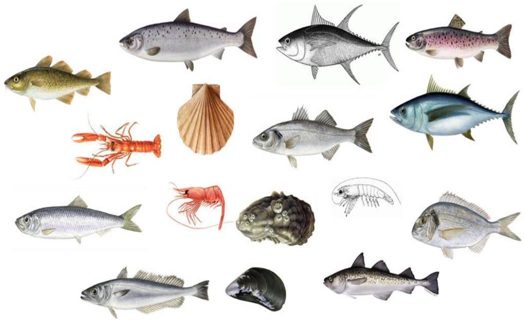

ক) মৎস উৎপাদন ও আহরণ :

মৎস উৎপাদন ও আহরণ :

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে নিচু প্রকৃতির ভূমি, অসংখ্য ছোট বড় নদ নদী, খাল, বিল, ঝিল, প্রাকৃতিক জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অবস্থিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ প্রকৃতিগতভাবে মৎস সম্পদে সমৃদ্ধ। আদিকাল থেকে এদেশের কৃষকেরা **"মাছে ভাতে বাঙ্গালি"** হিসাবে পরিচিত। দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী আদিকাল থেকে মৎস চাষ ও আহরনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। অধিক লাভজনক হওয়ার কারণে দেশে ধীরে ধীরে এ পেশার বিস্তার ঘটেছে এবং বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২% এর বেশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবন জীবিকার জন্য মৎস চাষ ও আহরনের উপর নির্ভরশীল।

২০০০ সালের পর থেকে দেশে মৎস উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিগত এক দশকে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে মৎসখাত বাংলাদেশে একটি সমৃদ্ধশালী খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থবছর ২০১৮-১৯ নাগাদ দেশের মোট জি.ডি.পির ৩.৫০% এবং মোট কৃষি জি.ডি.পির ২৫.৭২% মৎসখাতের অবদান। বিগত ১৩ বছর (২০০৭-৮ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালে এ সেক্টরে গড় প্রবৃদ্ধি ৫.০১%, যারমধ্যে অভ্যন্তরীণ খোলা পানিতে মাছ আহরণ (Inland Open Water Capture) বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ১.৮৭%, আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ চাষ (Fish farming in inland water bodies) বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ৮.৫৯% এবং সামুদ্রিক মৎস আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ২.৪৯%।

মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বি.বি.এস এর তথ্যানুসারে ২০১৬ সালে দেশে মাথাপিছু মাছের ব্যবহার দিনে ৬২.৫৮ গ্রাম। FAO report *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018* অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ জলাবদ্ধতায় মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং বিশ্ব জলজ উৎপাদনে ৫ম অবস্থানে রয়েছে। তাছাড়া, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং Geographical Indication (GI) সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। অর্থবছর ২০১৯-২০ সময়ে দেশে সবধরনের মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৪.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন (যেখানে আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ৫৬.৭৬%)। (Fisheries Yearbook 2018-19)

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। যার কারনে উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ছে এবং মাছের গুণগত মানও কম। ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছে দেশের চাহিদা মিটলেও, বিদেশের বাজারে বালাদেশি মাছের চাহিদা এখনো যথেষ্ঠ রকম কম। তাছাড়া সামুদ্রিক মৎস আহরনের ক্ষেত্রে আশপাশের দেশ সমূহের তুলনায় বাংলাদেশ অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরের নতুন আয়ত্বকৃত জলসীমার গভীর সমুদ্র থেকে পর্যাপ্ত মৎস আহরন সম্ভব হচ্ছেনা।

নিন্মে বাংলাদেশের মৎসখাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলেধরা হলো :-

১) মৎস উৎপাদন :

মৎস উৎপাদন :

১.১) মৎস চাষ ও উৎপাদন :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০১৮ অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় এবং জলজ উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০.৬২ লাখ মে.টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৪৪.৮৫ লাখ মে.টন, যারমধ্যে আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ উৎপাদন ও আহরন ৮৪.৮৮% এবং সামুদ্রিক মৎস আহরন ১৫.১২%। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে গড়ে বছরে ১.৪২ লাখ মে.টন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত বিষয় হলো সাম্প্রতিক সময়ে দেশে আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধি পেলেও সামুদ্রিক মৎস আহরণ মোটেও বৃদ্ধি পায়নি, যেদিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ [স্মারণী- ৩.৯(১)]।

স্মারণী- ৩.৯(১) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে সবধরনের মৎস উৎপাদনের চিত্র :-

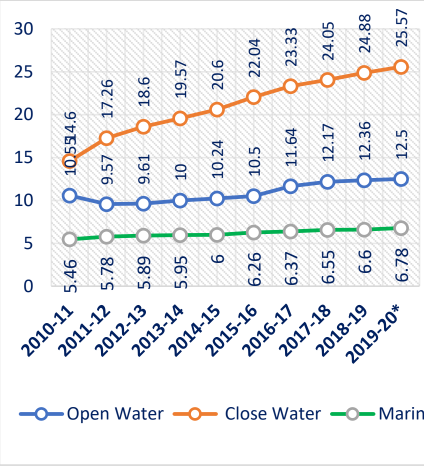

Source: BD Economic review *Projected

১.২) দেশে মৎস চাষের ক্রমবিস্তার :

মৎস আহরণ এবং পুকর জলাশয়ে মাছ চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার রীতি বাংলাদেশে বহু মানুষের জন্য পুরানো। কিন্তু, সে সময়ে খাল বিল ও সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ ব্যাপকভাবে হলেও, পুকুর জলাশয়ে বানিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের চাষ ছিল অনেকটা সীমিত। ২০০০ সালের পরথেকে দেশে খাল বিল ও সমুদ্র থেকে মৎস আহরনের পাশাপাশি পুকুর ও জলাশয়ে মাছ চাষ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অর্থবছর ২০০৬-৭ থেকে এ প্রবণতা ব্যাপকরুপ লাভ করে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে দেশে

দেশে মৎস চাষের ক্রমবিস্তার :

সব ধরনের মৎস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬.৬১ লক্ষ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৮৪ লক্ষ মে.টন। ১৯৯৯-০০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে মৎস আহরণের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬৪% (গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৩৪%), তন্মধ্যে খোলা মিঠাপানির মাছ সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ৮৪.৪৮% (গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৪৩%), চাষাবাদের মাধ্যমে মাছ সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ২৭৮.৮৪% (গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৬৩%) এবং সামুদ্রিক মৎস আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ৯৭.৬০% (গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৯৮%)।

২০০৭-৮ সালের পর থেকে দেশে মূলত বানিজ্যিকভিত্তিতে পুকুর জলাশয়ে মাছ চাষ প্রবণতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ১৯৯৯-০০ থেকে ২০০৬-৭ সময়কালে দেশে বানিজ্যিকভিত্তিতে মাছ চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ৫.৫০% এবং ২০০৭-৮ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে মাছ চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ১২.২৯%।

স্মারণী- ৩.৯(২) : বিগত ২০ বছর (অর্থবছর ১৯৯৯-০০ থেখে ২০১৮-১৯) সময়কালে দেশের প্রধান তিনটি সেক্টরে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিক চিত্র :-

Fiscal Year	Sector wise Fish Production Trend (in Lakh M.Ton)							
	Inland Open Water (Capture)		Inland Close Water (Capture)		Marine Fisheries		Total	
	Lakh M.Ton	Growth %	Lakh M.Ton	Growth %	Lakh M.Ton	Growth %	Lakh M.Ton	Growth %
1999-00	6.70	3.24	6.57	11.36	3.34	7.19	16.61	7.02
2000-01	6.89	2.84	7.13	8.52	3.79	11.87	17.81	7.22
2001-02	6.88	-0.15	7.87	10.38	4.15	8.67	18.90	6.12
2002-03	7.09	3.05	8.57	8.89	4.32	3.94	19.98	5.71
2003-04	7.32	3.24	9.15	6.77	4.55	5.05	21.02	5.21
2004-05	8.59	17.35	8.82	-3.61	4.75	4.21	22.16	5.42
2005-06	9.57	11.41	8.92	1.13	4.80	1.04	23.29	5.10
2006-07	10.07	5.22	9.46	6.05	4.87	1.44	24.40	4.77
2007-08	10.60	5.26	10.06	6.34	4.98	2.21	25.63	5.04
2008-09	11.24	6.04	10.63	5.67	5.15	3.30	27.01	5.38
2009-10	10.30	-8.36	13.52	27.19	5.17	0.39	28.99	7.33
2010-11	10.55	2.43	14.61	8.06	5.46	5.31	30.62	5.62
2011-12	9.57	-9.29	17.26	18.14	5.79	5.70	32.62	6.53
2012-13	9.61	0.42	18.60	7.76	5.89	1.70	34.10	4.54
2013-14	9.96	3.64	19.57	5.22	5.95	1.01	35.48	4.05
2014-15	10.24	2.81	20.60	5.26	6.00	0.83	36.84	3.83
2015-16	10.48	2.34	22.04	6.99	6.26	4.15	38.76	5.21
2016-17	11.64	11.07	23.33	5.85	6.37	1.73	41.34	6.66
2017-18	12.17	4.55	24.05	3.09	6.55	2.75	42.77	3.46
2018-19	12.36	1.56	24.89	3.49	6.60	7.19	43.84	2.50

Source: Fisheries Year book 2018-19

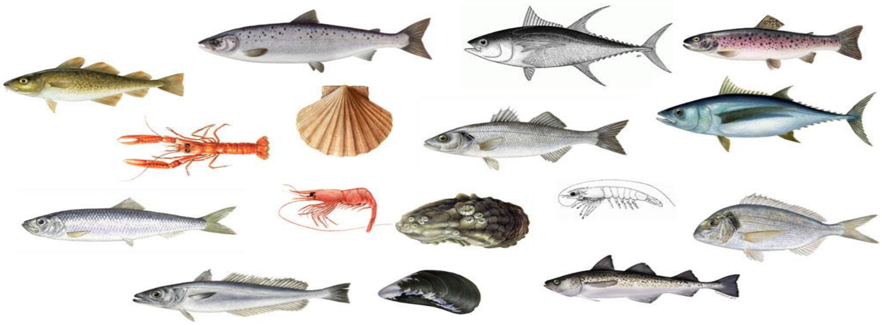

১.৩) মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশর অবস্থান :

মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশর অবস্থান :

আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাবদ্ধতায় মাছ উৎপাদন ও আহরনে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ২৫টি সর্বোচ্চ মাছ উৎপাদনকারি দেশের একটি। FAO report "State of the World Fisheries and Aquaculture 2018" অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাবদ্ধতায় মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এ তালিকায় চীন ১ম, ভারত ২য়, মিয়ানমার ৪র্থ, কম্বোডিয়া ৫ম, ইন্দোনেশিয়া ৬ষ্ঠ, থাইল্যান্ড ৭ম, ফিলিপাইন ৮ম, ভিয়েতনাম ৯ম এবং পাকিস্তান ১০ম স্থানে রয়েছে। এ রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের সর্বোচ্চ মাছ উৎপাদনকারি ২৫ দেশের সন্নিলিত মোট উৎপাদনের মধ্যে চীন ১৬%, ভারত ১৪%, বাংলাদেশ ১০%, মিয়ানমার ৭%, কম্বোড়িয়া ৪%, ইন্দোনেশিয়া ৪%, থাইল্যান্ড ২% এবং ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও পাকিস্তান ১% করে মাছ উৎপাদন করেছে [স্মারণী- ৩.১০(৩)]।

স্মারণী- ৩.৯(৩) : FAO report 2018 অনুযায়ী উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

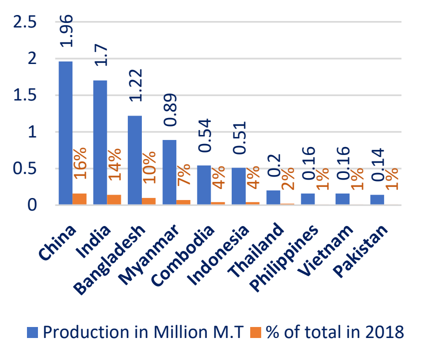

Source: FAP Report

মাছ উৎপাদনে ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র :

১.৪) মাছ উৎপাদনে ধারাবাহিকতা :

১৯৯৫-২০১৮ সময়কালে জলজ উৎপাদনে বিশ্বে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে চীন, তারপরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী জলজ মাছ উৎপাদনের পরিমাণ চীনে ৪৭.৫৬ মিলিয়ন মে.টন, যা ঐ বছর বিশ্বে উৎপাদিত মোট জলজ উৎপাদনের ৫৭.৯৩%, ভারতে ৭.০৭ মিলিয়ন মে.টন (৮.৬১%), ইন্দোনেশিয়ায় ৫.৪৩ মিলিয়ন মে.টন (৬.৬১%), ভিয়েতনামে ৪.১৩ মিলিয়ন মে.টন (৫.০৪%) এবং বাংলাদেশে ২.৪১ মিলিয়ন মে.টন (২.৯৩%) স্মারণী- ৩.৯(৪)। এ ২৪ বছর সময়কালে জলজ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে চীনে ৮.৩৩%, ভারতে ১৩.৫৮%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩১.১৮%, ভিয়েতনামে ৪১.১২%, বাংলাদেশে ২৭.২১% এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশে ৫.০২% স্মারণী- ৩.৯(৫)।

স্মারণী- ৩.৯(৪) : ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের মাছ উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বের মোট মাছ উৎপাদনের শতাংশ হারে প্রকাশ :-

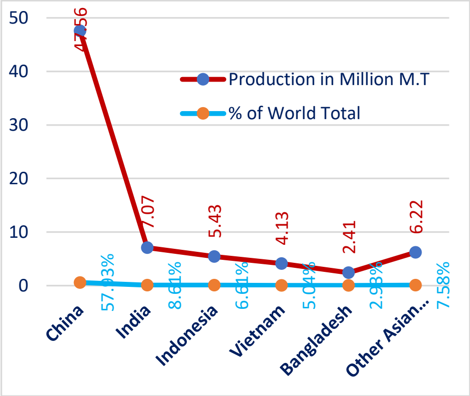

Source: FAO Report 2020

স্মারণী- ৩.৯(৫) : ১৯৯৫ থেকে ২০১৮ সময়কালে জলজ উৎপাদনে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের অগ্রগতির চিত্র :-

Country		Y E A R					
		1995	2000	2005	2010	2015	2018
	a) Million Tones	15.86	21.52	28.12	35.51	43.75	47.56

China	*b) % of World Total*	*65.03%*	*66.39%*	*63.48%*	*61.50%*	*60.12%*	*57.93%*
	c) Average growth rate (%) during this period						8.33%
India	a) Million Tones	1.66	1.94	2.97	3.79	5.26	7.07
	b) % of World Total	*6.80%*	*5.99%*	*6.70%*	*6.56%*	*7.23%*	*8.61%*
	c) Average growth rate (%) during this period						13.58%
Indonesia	a) Million Tones	0.64	0.79	1.20	2.30	4.34	5.43
	b) % of World Total	*2.63%*	*2.43%*	*2.70%*	*3.99%*	*5.97%*	*6.61%*
	c) Average growth rate (%) during this period						*31.18%*
Vietnam	a) Million Tones	0.37	0.50	1.44	2.68	3.46	4.16
	b) % of World Total	*1.56%*	*1.54%*	*3.24%*	*4.65%*	*4.76%*	*5.04%*
	c) Average growth rate (%) during this period						41.12%
Bangladesh	a) Million Tones	0.32	0.66	0.88	1.31	2.06	2.41
	b) % of World Total	*1.30%*	*2.03%*	*1.99%*	*2.27%*	*2.83%*	*2.93%*
	c) Average growth rate (%) during this period						27.21%
Other Asian Countries	a) Million Tones	2.82	3.01	4.58	5.63	5.72	6.22
	b) % of World Total	*11.58%*	*9.29%*	*10.34%*	*9.76%*	*7.86%*	*7.58%*
	c) Average growth rate (%) during this period						5.02%

Source: FAO Report 2020

২) মৎস আহরণ :

২.১) সামুদ্রিক মৎস আহরণ :

সামুদ্রিক মৎস ও মৎসজাতিয় অন্যান্য প্রাণী, যেমন- কাকড়া, ঝিনুক, অক্টোপাস ইত্যাদি বিশ্বব্যাপি বহু দেশের খাদ্য তালিকায় বহুল সমাদৃত খাদ্য। ফলে বিশ্বের বহুদেশ সামুদ্রিক মৎসের পাশাপাশি অন্যান্য মৎসজাতিয় প্রাণী আহরণপূর্বক নিজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে তুলছে। সামুদ্রিক মৎস আহরণে বাংলাদেশের ব্যাপক সুযোগ সুবিধা ও জলসীমা থাকলেও, অদ্যাবধি বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিগত ২০ বছর (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালে সামুদ্রিক মৎস আহরনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়কালে দেশে সামুদ্রিক মৎস আহরনের হার গড়ে বছরে ৫.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৩.৯০%, যা মৎস আহরনকারি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহের তুলনায় এবং এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় অনেক অনেক কম [স্মারণী- ৩.৯(৬)]।

সামুদ্রিক মৎস আহরণ

স্মারণী- ৩.৯(৬) : বিগত এক দশক (২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালে বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস আহরনের চিত্র :-

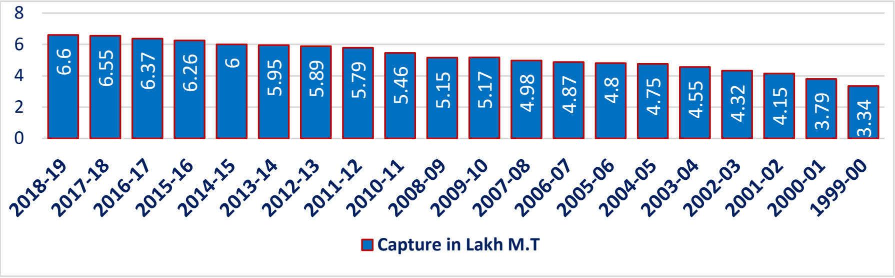

Source: Fisheries Yearbook 2018-19

সামুদ্রিক মৎস আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

স্মারণী-৫.৯(৭) : ২০১৪-২০১৮ সময়কালে গড়ে বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের সামুদ্রিক মৎস আহরনের চিত্র :-

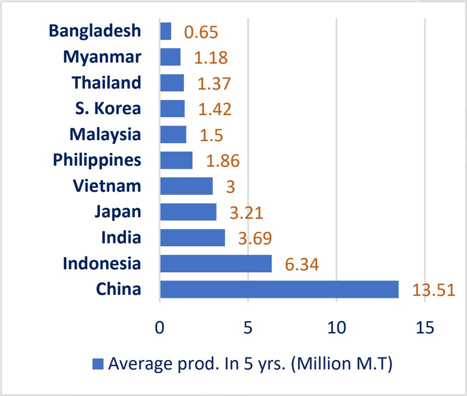

Source: FAO Report 2020

২.২) সামুদ্রিক মৎস আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

সামুদ্রিক মৎস আহরণে বাংলাদেশ অদ্যাবধি মৎস আহরনকারি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহের তুলনায় এবং এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৪-২০১৮ সময়কালে গড়ে বার্ষিক সামুদ্রিক মৎস আহরণ বাংলাদেশে ০.৬৫ মিলিয়ন মে.টন, মিয়ানমারে যা ১.১৮ মিলিয়ন মে.টন, থাইল্যান্ডে ১.৩৭, দ. কোরিয়ায় ১.৪২, মালয়েশিয়ায় ১.৫০, ফিলিপাইনে ১.৮৬, ভিয়েতনামে ৩.০০, জাপানে ৩.২১, ভারতে ৩.৬৯, ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৩৪ এবং চীনে ১৩.৫১ মিলিয়ন মে.টন [স্মারণী-৩.৯(৭)]।

২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী ঐ বছর সামুদ্রিক মৎস আহরণ চীনে ১২.৬৮ মিলয়ন মে.টন যা ঐ বছর বিশ্বে মোট উৎপাদিত সামুদ্রিক মৎসের ১৫%। ঐ বছর ইন্দোনেশিয়ায় উৎপাদন ৬.৭১ মিলিয়ন মে.টন (৮%), ভারতে ৩.৬২ মিলিয়ন মে.টন (৪%), জাপানে ৩.১০ মিলিয়ন মে.টন (৪%), ভিয়েতনামে ৩.১৯ মিলিয়ন মে.টন (৪%), ফিলিপাইনে ১.৮৯ মিলিয়ন মে.টন (২%), মালয়েশিয়ায় ১.৪৫ মিলিয়ন মে.টন (২%), দ. কোরিয়ায় ১.৩৩ মিলিয়ন মে.টন (২%), থাইল্যান্ডে ১.৫১ মিলিয়ন মে.টন (১%), মিয়ানমারে ১.১৪ মিলিয়ন মে.টন (১%) এবং বাংলাদেশে ০.৬৬ মিলিয়ন মে.টন (০.৫৮%) [স্মারণী-৩.৯(৮)]।

স্মারণী- ৩.৯(৮) : ২০১৪-২০১৮ সময়কালে সামুদ্রিক মৎস আহরণে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের চিত্র :-

Country	Yearly Production (Million Tones)					% of World total in 2018	5 yrs Average in Million M.T
	2014	2015	2016	2017	2018		
China	14.81	14.39	13.78	13.19	12.68	15%	13.77
Indonesia	6.02	6.22	6.11	6.31	6.71	8%	6.27
India	3.42	3.50	3.71	3.94	3.62	4%	3.64

Japan	3.63	3.37	3.17	3.18	3.10	4%	3.29
Vietnam	2.71	2.71	2.93	3.15	3.19	4%	2.94
Philippines	2.14	1.95	1.87	1.72	1.89	2%	1.91
Malaysia	1.46	1.49	1.57	1.47	1.45	2%	1.49
S. Korea	1.72	1.64	1.35	1.35	1.33	2%	1.48
Thailand	1.56	1.32	1.34	1.31	1.51	2%	1.41
Myanmar	2.70	1.11	1.19	1.27	1.14	1%	1.48
Bangladesh	0.60	0.63	0.64	0.66	0.66	0.58%	0.64

Source: FAO Report 2020 and Fisheries Yearbook 2018-19

৩) মৎস রপ্তানি :

৩.১) হিমায়িত মৎস রপ্তানি :

হিমায়িত মৎস রপ্তানি :

বাংলাদেশ দীর্ঘ সময়থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও যৎসামান্য অন্যান্য হিমায়িত মৎস রপ্তানি করে আসছে, যদিও বছরের পর বছর রপ্তানির পরিমাণ অনেকটা একই পর্যায়ে রয়ে গেছে। বিগত এক দশক (২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালে দেশের হিমায়িত মৎস রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ৪৪৫ মিলিয়ন, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬২৫ মিলিয়ন, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫৯৮ মিলিয়ন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৪৪ মিলিয়ন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬৩৮ মিলিয়ন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫৬৮ মিলিয়ন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫৩৬ মিলিয়ন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫২৬ মিলিয়ন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫০৮ মিলিয়ন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইউ.এস.ডলার ৫০০ মিলিয়ন । এ সময়ে হিমায়িত মৎস রপ্তানি হয়েছে বছরে গড়ে ইউ.এস.ডলার ৫৪৮.৮০ মিলিয়ন এবং বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গড়ে ১.৮৭%। এ দশ বছর সময়ব্যাপি হিমায়িত মৎস রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৪৪৫ মিলিয়ন থেকে ৬৩৮ মিলিয়নের মধ্যে উঠানামা করেছে স্মারণী- ৩.৯(৯) ।

স্মারণী- ৩.৯(৯) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস সরপ্তানির চিত্র :-

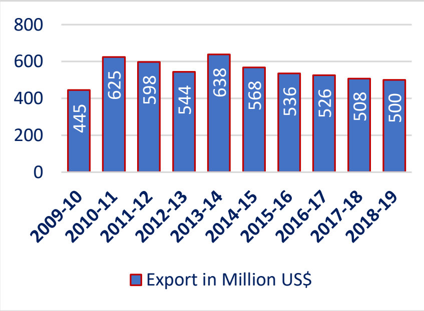

Source: BD Economic Review

৩.২) হিমায়িত মৎস রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

হিমায়িত মৎস রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

সামুদ্রিক ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকলেও হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের কিছুটা অংশগ্রহণ রয়েছে। ২০১৯ সালে বিশ্বের প্রধান প্রধান হিমায়িত মৎস রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে চীন প্রথম অবস্থানে রয়েছে। ঐ বছর হিমায়িত মৎস রপ্তানি (ইউ.এস.ডলার) চীনের ২.৯ বিলিয়ন, যা ঐ বছর বিশ্বের মোট হিমায়িত মৎস রপ্তানির ১১.৬%, রাশিয়া ২.৫ বিলিয়ন (১০.২০%), আমেরিকা ১.৯ বিলিয়ন (৭.৬%), চিলি ১.৮ বিলিয়ন (৭.৩%), নরওয়ে ১.৫ বিলিয়ন (৬.০%), তাইওয়ান ১.২ বিলিয়ন (৪.৯%), নেদারল্যান্ডস্ ১.১ বিলিয়ন (৪.৫%), স্পেন ০.৮৪ বিলিয়ন (৩.৫%), দ. কোরিয়া ০.৭০ বিলিয়ন (২.৯%), ভারত ০.৫৪ বিলিয়ন (২.২%), গ্রীণল্যান্ড ০.৫৪ বিলিয়ন (২.২%), জাপান ০.৫২ বিলিয়ন (২.১%), ডেনমার্ক ০.৫০ বিলিয়ন (২.০%), বাংলাদেশ ০.৫০ বিলিয়ন (২.০%), ইন্দোনেশিয়া ০.৩৯ বিলিয়ন (১.৬%) এবং আইচল্যান্ড ০.৩৭ বিলিয়ন (১.৫%)।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশ আরোও উদ্যোগী হলে হিমায়িত মৎস রপ্তানিতে যথেষ্ট অগ্রগতি আসবে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই।

স্মারণী- ৩.৯(১০) : ২০১৯ সালে বিশ্বের প্রধান সরপ্তানিকারক দেশসমূহের হিমায়িত মৎস রপ্তানির চিত্র :-

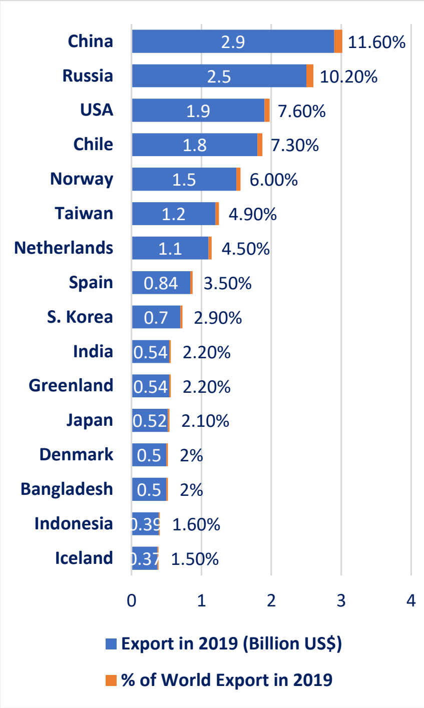

Source: Worldstopexports and other source

খ) পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন :

প্রাণীজ প্রেটিন ঘাটতি পূরণে দেশে জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গবাদি পশু ও পোল্ট্রি উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে দেশে পোল্ট্রি ও গবাদি পশু উৎপাদনের মাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে জি.ডি.পিতে পশুপালন সাব-সেক্টরের অবদান এখনো যথেষ্ট রকম কম।

পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন :

২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৭৮৮ লাখ ও ৫১৭ লাখ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩,৫৩২ লাখ ও ৫৫৮ লাখ। এ সময়কালে পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ২.৭০% এবং গবাদি পশু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ০.৯৭%। পোল্ট্রির তুলনায় গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম [স্মারণী- ৩.৯(১১)] । ফলে মাংশের দাম ক্রমেই সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, যা দেশে প্রাণীজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থার উত্তোরণে দেশে গবাদিপশু উৎপাদন পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

স্মারণী- ৩.৯(১১): অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে পোল্ট্রি ও গবাদি পশু উৎপাদনের চিত্র :-

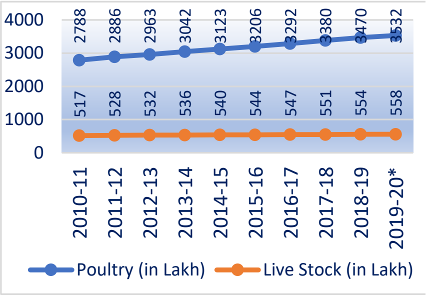

Source: BD Economic review *Projected

গ) মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন :

মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন :

বিগত বছরগুলোতে দেশে প্রাণীজ প্রোটিন, যেমন-মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ দেশে মাথাপিছু মাংশ, দুধ ও ডিম গ্রহনের মাত্রা দাঁড়িয়েছে মাংশ দিনে ১২৪.৯৯ গ্রাম, দুধ দিনে ১৬৫.০৭ গ্রাম এবং ডিম বছরে ১০৩.৮৯টি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে মাংশ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২.৬৪ লক্ষ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ যা দাঁড়িয়েছে ৭৫.১৪ লক্ষ মে.টন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দুধ ও ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩.৬৫ লক্ষ মে.টন এবং ৫৭,৪০৪ লাখ, ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৯.২৩ লক্ষ মে.টন এবং ১৭১,১০০ লাখে [স্মারণী- ৩.৯(১২)]। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা পূরনে উৎপাদনের এ ধারা ভবিষ্যতে আরোও বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

স্মারণী- ৩.৯(১২) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে মাংশ, দুধ ও ডিম উৎপাদনের চিত্র :-

Items	Financial Year									
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Meat (Lakh M.Tons)	12.64	19.86	23.32	36.20	45.20	58.62	61.52	71.54	72.60	75.14
Milk (Lakh M.Tons)	23.65	29.47	34.63	50.67	60.90	69.69	72.75	92.83	94.06	99.23
Eggs (Lakh)	57,424	60,785	73,038	76,173	101,680	109,952	119,124	149,331	155,200	171,100

Source: BD Economic Review

ঘ) দেশে মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

দেশে মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদীনালা, খালবিল, ঝিল ও প্রাকৃতিক জলাশয়মন্ডিত পরিবেশ মাছ চাষ ও আহরনের জন্য উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবকাঠামো হিসাবে কাজ করছে। ফলে মাছ চাষ ও আহরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ ও উপযুক্ত স্থান নিঃসন্দেহে, বিগত বছরগুলোতে মাছ চাষ ও আহরণে বাংলাদেশের ঈর্শনীয় সাফল্য এ সত্যতার প্রমান দেয়।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলাদেশে মাছ চাষ পদ্ধতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনো গতানুগতিক ও সেকেলে। মাছ চাষেরক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার একদমই কম হওয়ার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বেশি হয়, অন্যদিকে উৎপদনের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম, যা মাছ চাষীদেরকে ক্ষতির সন্মুখীন করে তুলছে। তাছাড়া উৎপাদিত মাছের স্বাদ ও জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিও এখনো অনেকাংশে উপেক্ষিত হওয়ার কারনে বিদেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছের চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছেনা এবং বাংলাদেশ থেকে মাছ রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, নগরায়ন, কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ, অনিয়ন্ত্রিত কিটনাশকের ব্যবহার, প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট ইত্যাদি বহুবিধ কারনে প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে দুষিত ও বিনষ্ট হচ্ছে, যা আভ্যন্তরীণ খোলা পানির মাছ আহরণের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও সামুদ্রিক মাছ ও মৎস জাতিয় প্রাণী আহরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো বিশ্বে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিগত পাঁচ বছর (২০১৪-২০১৮) সময়কালে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস আহরনের পরিমাণ গড়ে ০.৬৪ মিলিয়ন মে.টন এবং ২০১৮ সালে বাংলাদেশে আহরিত সামুদ্রিক মৎস বিশ্বের মোট আহরনের ০.৫৮% মাত্র। সামুদ্রিক মৎস আহরণে প্রযুক্তির ব্যবহার কম হওয়া, প্রশিক্ষনের অভাব, মৎস আহরনের আধুনিক সরঞ্জামাদি, নৌকা ও ট্রলার ইত্যাদির অপর্যাপ্ততা এবং সর্বোপরি এতদসংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা ও পৃষ্টপোশকতার অভাব এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ।

SJHBD

অন্যদিকে, বিগত বছরগুলোতে দেশে পোল্ট্রি ও গবাদি পশু উৎপাদনের মাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় তা যথেষ্ট অপ্রতুল, ফলে জি.ডি.পিতে পশুপালন সাব-সেক্টরের অবদান এখনো যথেষ্ঠ রকম কম। **যত সমস্যাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন যেকোনো মূল্যে বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা, এটি এমন একটি খাত, যার মাধ্যমে কর্মসংস্থান, বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রোটিনের চাহিদা মিটানো এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার অপার সম্ভাবনা লুকায়িত। কাজেই, আগামী দিনগুলোতে যাতে দেশে উৎপাদিত মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ব্যাপকভাবে রপ্তানি করা যায় সেলক্ষ্যে দুরদর্শী নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।**

দেশে মৎস, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা সমূহ নিন্মে উপস্থাপিত হলো :-

ক) মৎস উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধিকল্পে :

১. মৎস সেক্টরের প্রসার এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে মৎস রপ্তানিকল্পে দীর্ঘমেয়াদি সরকারি পরিকল্পণা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২. আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলে মাছের অবাধ বিচরণ নিশ্চিতকল্পে নগরায়ন, চাষাবাদে কীটনাশকের ব্যবহার এবং নদী, খাল বিল ও প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট রোধকল্পে কঠোর নীতি অবলম্বন।
৩. মৎস চাষে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও জনপ্রিয় করে তোলার মাধ্যমে এ সেক্টরকে আধুনিক, লাভজনক ও আকর্ষণীয় শিল্পে পরিণত করে তুলতে সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৪. আধুনিক, স্বাস্থ্যসন্মত ও প্রযুক্তিনির্ভর মৎস চাষের উপর সরকারি প্রশিক্ষণ জোরদার করা।

৫. মৎস চাষে ঔষধ ও হরমোনের প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণপূর্বক উৎপাদিত মাছের খাদ্যগুণ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া।

৬. সারাদেশে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের মজ্জা পুকুর, ডোবানালা ইত্যাদি অবহেলিতভাবে ফেলে না রেখে মৎস চাষের আওতায় নিয়ে আসার জন্য উপজেলা মৎস অফিসারদের মাধ্যমে তদারকি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৭. মৎস ও অন্যান্য কৃষিফসল বাজারজাত করার সুবিধার্থে এবং গ্রামীন জীবনমান উন্নয়নে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের রাস্তাঘাট ও হাটবাজার উন্নয়ন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমাতে স্বরাদেশে হাট বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৮. সারাদেশে উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে মৎস চাষ তদারকি, প্রশিক্ষণ এবং অস্বচ্ছল চাষিদের মাঝে স্বল্পসুদে ঋণ বিতরণ।

৯. সামুদ্রিক মৎস আহরণে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের জেলেদের মাঝে প্রযুক্তিনির্ভর মৎস আহরনের উপর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা।

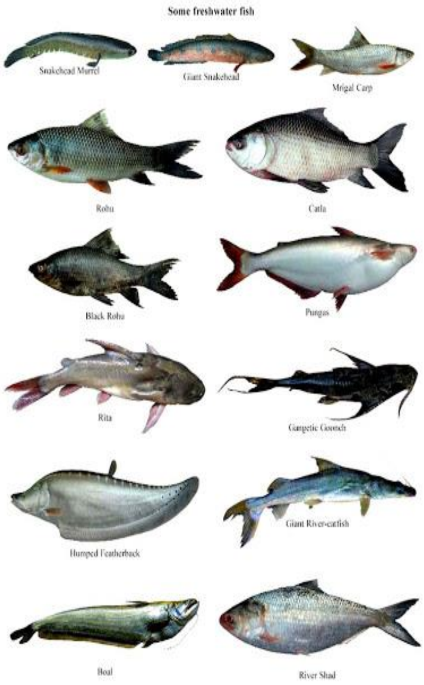

১০. মৎস আহরণের আধুনিক সরঞ্জামাদি, নৌকা ও ট্রলার ক্রয়ে জেলেদের মাঝে সরকারি পৃষ্টপোশকতা ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান বৃদ্ধি করা।

১১. গভীর সমূদ্রে মৎস আহরণ ও সংরক্ষনের উপর এবং সামুদ্রিক ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির উপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও সরকারি সহায়তা জোরদার করা।

১২. সরকারি উদ্যোগে গভীর সমুদ্র থেকে মৎস আহরন ও রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহন করা।

খ) পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে :

১. দেশে পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২. পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খামারে বিনিয়োগের অনিশ্চয়তা দূর করতে এ শিল্পকে বাধ্যতামূলকভাবে বীমার আওতায় নিয়ে আসা।

৩. আধুনিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খামার পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা।

৪. পাশ্ববর্তী দেশ থেকে ডিম, মাংশ এবং গরু ও মহিষ আমদানি সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করা।

৫. পোল্ট্রি ও পশু খাদ্যের দাম সহনীয় রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. দেশে দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে পর্যাপ্ত সরকারি সহযোগিতা প্রদান করা।

৭. পশুর চামড়া ও লোম সংরক্ষণ, প্রসেসিং, ব্যবহার ও রপ্তানির উপর দেশব্যাপি প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

৮. এ শিল্পে প্রাথমিক মূলধন যোগাতে উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।

৯. উপজেলা পশুপালন কর্মকর্তা ও পশু চিকিৎসকদেরকে এ উদেশ্যে পুরোপুরি কাজে লাগানো।

১০. বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নত জাতের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি এদেশে আনয়ন এবং দেশে ঐ সমস্ত পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর উৎপাদন প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১. পোল্ট্রি ও গবাদি পশুর খামার শিল্পের উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করা।

****

অধ্যায় : ৩.১০

" পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়" স্থাপন।

” পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়” স্থাপন ।”

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালনায় ” পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়” স্থাপন ।
খ) আলাদা মন্ত্রণালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ।
গ) এল.জি. আর.ডি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি ।
ঘ) গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে কেন আলাদা মন্ত্রণালয় প্রয়োজন ?
ঙ) গ্রাম উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ রাখার যৌক্তিকতা ।
চ) প্রস্তাবিত ” পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ” এর কার্য পরিসর ।

ক) গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালনায় " পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়" স্থাপন :

গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালনায় "পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়" স্থাপন :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১০ সালের আগ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতির আকার ও আয়তন সীমিত থাকার ফলে গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল অনেকটা সীমিত। সে সময়ে একই মন্ত্রণালয়ের দ্বারা স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন দুটোই নিয়ন্ত্রণ করা খুব একটা কঠিন ছিলনা। কিন্তু, ২০১০ সালের পর থেকে দেশের অর্থনীতির আকার ও আয়তন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রাম পর্যায়ে অর্থনীতির গতিপ্রবাহ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। গ্রামপর্যায়ে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি চাষাবাদের উন্নয়ন, হাঁস মুরগি পালন, মৎস ও পশু খামার ইত্যাদি প্রায় সকলক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আগামীতে গ্রাম পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরো বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি টেকসই ও শক্তিশালি করে তুলতে এবং গ্রাম পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে - বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে। গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থা এরিমধ্যে পাল্টাতে শুরু করেছে, অদূর ভবিষ্যতে যা নগর সমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় মত্ত হবে সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, **ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকারের বহুবিধ কার্যাবলী সামাল দেওয়ার পাশাপাশি একই মন্ত্রণালয়ের দ্বারা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা সত্যিকার অর্থে কঠিন হবে বৈকি। তাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালনায় আলাদাভাবে " পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়" স্থাপন করা বর্তমানে অনেকটা অবধারিত হয়ে পড়েছে।**

খ) আলাদা মন্ত্রণালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা :

আলাদা মন্ত্রণালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা :

নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কোনো সেক্টরে কর্মপ্রবাহ যখন পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ সেক্টরের যথাযথ নিয়ন্ত্রণে আলাদা মন্ত্রণালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত এক দশকে দেশের অর্থনীতির আকার ও আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ, দেশের অর্থনীতি এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় যথেষ্ট পরিণত এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এদেশের অর্থনীতি অনন্য মাত্রায় পৌঁছাবে নিঃসন্দেহে। অর্থনীতির এ সাফল্য টেকসই করে তুলতে প্রয়োজন কার্যকর পরিকল্পনা এবং সকল সেক্টরে যথাযথ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির আধিপত্য এবং দেশের প্রায় ৭৩% জনগোষ্ঠী গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। কৃষি, মৎস ও বনজ সেক্টর গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ। খাদ্য উৎপাদন, তরিতরকারি, মাছ, মাংশ, ডিম, ফলমূল এবং অনেকক্ষেত্রে শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এটা এখন পরিক্ষিত সত্য যে গ্রামীণ অর্থনীতির বিস্তার ব্যাতিত বাংলাদেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলা অসম্ভব। গ্রামীণ অর্থনীতির যথাযথ সমন্বয় ও দ্রুত বিস্তারে তাই প্রয়োজন স্বাধীন ও আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনপূর্বক গ্রাম পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরোও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে তোলা। কেননা, আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা ব্যাতিত ভবিষ্যতে সঠিক পন্থায় গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন অসম্ভব।

গ) এল.জি. আর.ডি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি :

এল.জি. আর.ডি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি :

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটিকর্পোরেশন) প্রশাসন, অর্থায়ন ও নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাছাড়া, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডি.পি.এইচ.ই), পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) এবং জাতিয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট (এন.আই.এল.জি) এর প্রশাসন এবং উপরোক্ত সংস্থা সমূহের দ্বারা পরিচালিত সকল কার্যক্রম তত্বাবধান ও পরিচালনা করা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এল.জি. আর.ডি মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে বিভক্ত, যেমন :-

১) স্থানীয় সরকার ডিভিশন।
২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডিভিশন।

নিম্নে এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহের তালিকা তুলেধরা হলো :-

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়গুলি ।
২. স্থানীয় সরকার ও গ্রাম প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন
৩. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর প্রশাসন এবং উপরোক্ত সংস্থার দ্বারা পরিচালিত সমস্ত প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান ।
৪. বি.এস.এস. (পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং) এর প্রশাসন ।
৫. সুপেয় পানি সংক্রান্ত বিষয় ।
৬. গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ।
৭. (ক) সময়মতো সরকার কর্তৃক বরাদ্ধকৃত সেতু এবং কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামের সড়কসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা ।
(খ) উন্নয়ন কেন্দ্র এবং উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক দ্বারা সংযুক্ত অন্যান্য বাজারের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ।
(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল সম্পদ প্রকল্পগুলির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ।
৮. গ্রামীণ পুলিশ ।
৯. দাফন কার্যক্রম ও কবরস্থান, শবদাহ কার্যক্রম ও শ্মশান ঘাট ।
১০. গবাদি পশুর পাউন্ড এবং প্রতিরোধ ।
১১. ডাক বাংলো এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির রেষ্ট হাউস ।
১২. স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে পাবলিক পার্ক ও বৃক্ষগুল্মাদি ।
১৩. আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন ।
১৪. এই বিভাগের অধীন অফিস ও সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ।
১৫. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ এবং এই বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয় সম্পর্কিত দেশ ও বিশ্ব সংস্থাগুলির সাথে সংবিধান ও চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি ।
১৬. এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের সমস্ত আইন।
১৭. এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনও বিষয়ের উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান।

(সুত্র : এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট)

SJFBD

ঘ) গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে কেন আলাদা মন্ত্রণালয় প্রয়োজন ?

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে কেন আলাদা মন্ত্রণালয় প্রয়োজন ?

বর্তমানে গ্রামোন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রম সমূহ এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রশাসন পরিচালনার পাশাপাশি এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। কিন্তু,এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষনে এটা স্পষ্ট যে " পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডিভিশন " এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হলেও এ মন্ত্রণালয়ের সিংহভাগ কার্যাবলী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রশাশন, অর্থায়ন ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। প্রকৃত অর্থে টেকসই গ্রাম উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আগামীর প্রয়োজনে যে পরিমাণ জনবল, প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন, তার কোনোটাই এ মন্ত্রণালয়ের নেই। ফলে বিগত সময়গুলোতে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পল্লী উন্নয়নে কার্যকরি তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলা চলে। বিগত কয়েক বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনায় এর প্রমান মিলে। অর্থবছর ২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ সময়কালে জাতিয় বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়কালে এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ ছিল গড়ে মোট বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের ১৫.৯০% (টাকা ২৭,৬৪৯ কোটি), যারমধ্যে গড়ে ৯১.৬২% স্থানীয় সরকার ডিভিশনে, ৫.৩৯% পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডিভিশনে এবং ২.৯৯% পার্বত্য চট্টগ্রাম এফেয়ার্সের জন্য। স্মারণী-৩.১০(১) অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডিভিশনে নাম মাত্র উন্নয়ন বরাদ্ধের মাধ্যমে এ সেক্টরকে কোনোমতে চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। **কাজেই টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে আলাদাভাবে " পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়" চালু করা পূর্বক গ্রাম উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।**

স্মারণী -৩.১০(১) : অর্থবছর ২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ সময়কালে এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সাবডিভিশনে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধের চিত্র :-

(Taka In Crore)

Ministry / Division	Financial Year				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Local Govt. Division	18,547	21,526	25,469	29,920	31,221
Rural dev. & cooperative division	914	1,414	1,695	1,865	1,588
Ministry of Ctg. Hill Tracts Affairs	544	849	989	841	865
Total LGRD Sector	20,005	23,789	28,153	32,626	33,674
Total development budget	112,526	159,013	179,669	211,683	215,043
LGRD Sector (% of total dev. Exp.)	17.78	14.96	15.67	15.41	15.66
As % of Total LGRD Sector					
Local Govt. Division	92.71	90.49	90.47	91.71	92.72
Rural dev. & cooperative division	4.57	5.94	6.02	5.72	4.72
Ministry of Ctg. Hill Tracts Affairs	2.72	3.57	3.51	2.57	2.56
Total :	100	100	100	100	100

Source: Economic division, Ministry of Finance.

ঙ) গ্রাম উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার যৌক্তিকতা :

গ্রাম উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার যৌক্তিকতা :

কোনো সেক্টরে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিয় বাজেটে ঐ সেক্টরের জন্য পর্যাপ্ত উন্নয়ন বরাদ্দ থাকা অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় ঐ সেক্টরে কাঙ্খিত উন্নয়ন অসম্ভব। বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা ব্যাপক। দেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত প্রসার অত্যন্ত জরুরি এবং এজন্য প্রয়োজন জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত উন্নয়ন বরাদ্দ নিশ্চিত করা। কিন্তু বিগত এক দশকের (২০১১-১২ থেকে ২০২০-২১) জাতিয় বাজেটে পল্লী উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের ৭৩% জনগোষ্ঠীর ঠিকানা যে পল্লী অঞ্চল, সে পল্লী উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ অন্যান্য সকল সেক্টরের তুলনায় একদমই নগণ্য। এ সময়কালে পল্লী উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ টাকা ৫৭৭ কোটি থেকে টাকা ১,৮৬৫ কোটির মধ্যে উঠানামা করেছে, গড়ে যা ছিল বছরে ১,১৯৫.২০ কোটি টাকা। **স্মারণী -৩.১০(২)**

কাজেই, গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে জাতিয় বাজেটে পল্লী উন্নয়নে পর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্মারণী-৩.১০(২) : অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০২০-২১ সময়কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডিভিশনে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের চিত্র :

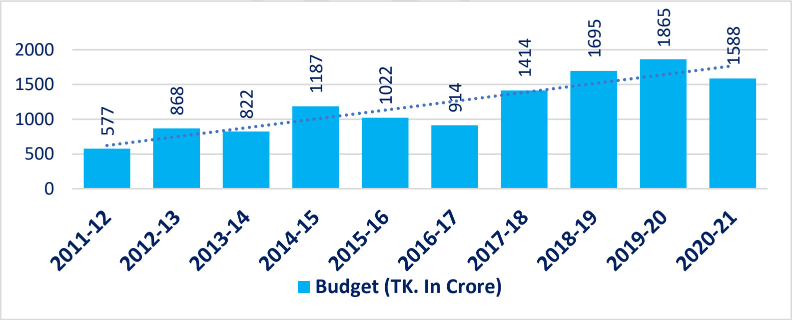

Source: Ministry of Finance

চ) প্রস্তাবিত " পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয় " এর কার্য পরিসর :

প্রস্তাবিত " পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়" হবে একটি পৃথক ও স্বাধীন মন্ত্রণালয়, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনা করাই হবে এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন, গ্রামীণ আবাসন উন্নয়ন, হাট বাজার সম্প্রসারণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা সহ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া, গ্রামপর্যায়ে কর্মরত অন্যান্য সংস্থার কাজ যেমন- বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় সাধনপূর্বক গ্রাম পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তোলাই হবে এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব। নিম্নে প্রস্তাবিত পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলির পরিধি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :-

প্রস্তাবিত ” পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ” এর কার্য পরিসর :

১. গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনা করা।
২. গ্রামীণ আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৩. উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা।
৪. উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে হাট বাজার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ।
৫. গ্রামপর্যায়ে কর্মরত অন্যান্য সংস্থার কাজ যেমন-বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন।
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে সহযোগিতা করা সহ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করা।
৭. গ্রামীণ পুলিশ এবং গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে আইন শৃক্ষলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ।
৮. দাফন কার্যক্রম ও কবরস্থান, শবদাহ কার্যক্রম ও শ্মশান ঘাট ।
৯. গবাদি পশুর পাউন্ড এবং প্রতিরোধ ।
১০. স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে পাবলিক পার্ক ও বৃক্ষগুল্মাদি ।
১১. আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন ।
১২. এ মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিস ও সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ।
১৩. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ এবং এই মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয় সম্পর্কিত দেশ ও বিশ্ব সংস্থাগুলির সাথে সংবিধান ও চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি ।
১৪. এই মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের সমস্ত আইন।
১৫. এই মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনও বিষয়ের উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান।
১৬. অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সমূহ।

****

SJFBD

চতুর্থ অংশ :

নগর অর্থনীতির উন্নয়ন :

অধ্যায় : ৪.১

নগরায়ন ও নগর সম্প্রসারণ।

নগরায়ন ও নগর সম্প্রসারণ।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) নগরায়ন ও নগর সম্প্রসারণ।
খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব।
গ) বাংলাদেশে নগরায়ন প্রবণতা।
ঘ) নগরায়নের দিকথেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান।
ঙ) নগরায়নের চ্যালেঞ্জ সমূহ।
চ) ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব নগরায়ন পরিস্থিতির প্রাক্কলন।
ছ) নগরায়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় সমূহ।

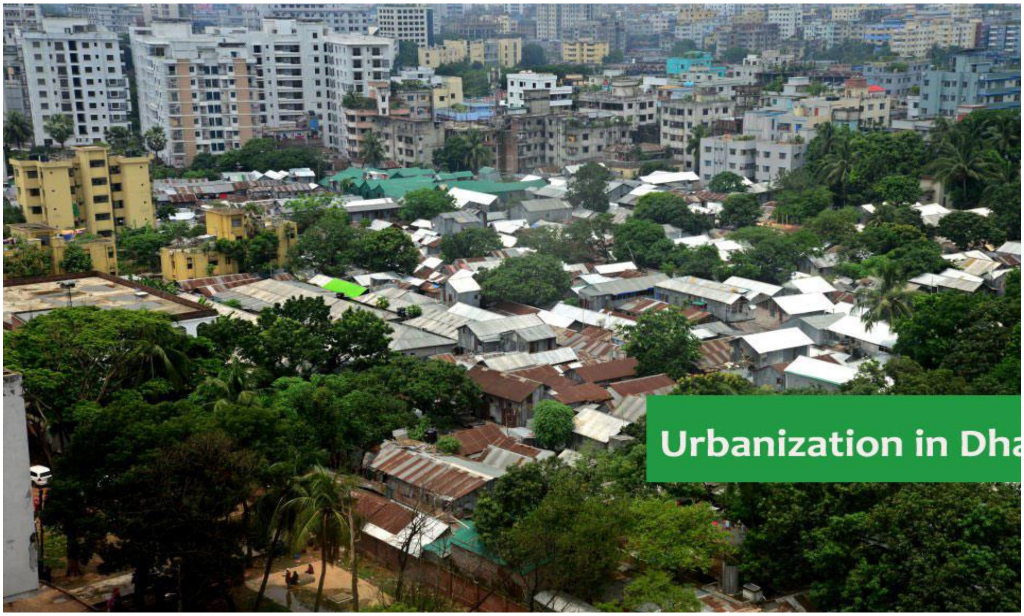

ক) নগরায়ন ও নগর সম্প্রসারণ :

নগরায়ন ও নগর সম্প্রসারণ :

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে দেশে নগর কেন্দ্রের সংখ্যা সর্বমোট ৫৩২টি। ২০২০ সাল নাগাদ ১.০০ লাখ জনসংখ্যার বেশি বসবাস এমন শহরের সংখ্যা ৪২টি, যারমধ্যে ৫.০০ লাখ জনসংখ্যার বেশি বসবাস এমন বড় শহরের সংখ্যা ৬টি, যেগুলো হচ্ছে- ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বগুড়া। ২০২০ সাল নাগাদ দেশে মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২২টি পৌরসভা রয়েছে।

নগরায়ন বলতে কি বুঝায় ?

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ যখন ব্যাপকভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, শহরকে তখন অধিকতর বাসসংকুলান ও বাসযোগ্য করে তুলতে শহরের আকার, আয়তন ও মৌলিক অবকাঠামো বৃদ্ধি করাটাই নগরায়ন। UN Department of Economic and Social Affairs এর সংজ্ঞায় নগরায়ন হচ্ছে " Urbanization is a complex socio-economic process that transforms the built environment, converting formerly rural into urban settlements, while also shifting the spatial distribution of a population from rural to urban areas. It includes changes in dominant occupations, lifestyle, culture and behavior, and thus alters the demographic and social structure of both urban and rural areas ". The degree or level of urbanization is typically expressed as the percentage of population residing in urban areas, defined according to criteria used by national governments for distinguishing between urban and rural areas. In practice, urbanization refers both to the increase in the percentage of population residing in urban areas and to the associated growth in the number of urban dwellers, in the size of cities and in the total area occupied by urban settlements.

SJHBD

জাতিসংঘের হিসাবে ২০১৮ সাল নাগাদ সারাবিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫% (৪.২ বিলিয়ন) লোক শহরে বসবাস করছে, ২০৫০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ৭০% ছাড়িয়ে যেতে পারে। ২০২০ সাল নাগাদ ৫ লাখ লোকের অধিক বসবাস করে এমন শহরের সংখ্যা বিশ্বে ১,০৫৫টি, যেখানে বিশ্বের ৫১.৪% (২.২৫) বিলিয়ন জনসংখ্যার বসবাস। ৫.০০ লক্ষের বেশি জনগোষ্ঠীর বসবাস এমন শহরের সংখ্যা বাংলাদেশে ৬টি, ২০১৮ সাল নাগাদ যেখানে প্রায় ২.৩৫ কোটি লোক বাস করে।

কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনযাপনের মৌলিক সুযোগ সুবিধা সমূহ বর্তমান থাকায় এবং স্বল্প পরিসরে মানসন্মত জীবন যাপন সম্ভবপর হওয়ার কারনে বিশ্বব্যাপি নগর জীবনের প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং নগরের পরিধি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করছে। জাতিসংঘের হিসাবে বিশ্বব্যাপি প্রতিবছর গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাসের জন্য আসা জনসংখ্যার হার গড়ে প্রায় ০.৪৭%। বাংলাদেশের মত জনবহুল ও অনুন্নত গ্রামভিত্তিক দেশে তাই কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবন যাপনের সমাধানে নগরায়ন আলাদা গুরুত্ব বহন করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব :

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব :

নগরায়ন যে কোনো দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার অন্যতম পরিচালিকা শক্তি হিসাবে বিশ্বব্যাপি স্বীকৃতি লাভ করেছে, বিশেষকরে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে এ তত্ব অনেক জোরালোভাবে প্রযোজ্য। নগরায়নের ফলে জীবনযাপনের মৌলিক সুবিধা সমূহ মানুষের হাতের নাগালে আনার পাশাপাশি - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ব্যবসা বানিজ্য ও উৎপাদনশীল খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটায়, যা দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে এবং অর্থনীতিকে টেকসই করে গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বিশ্বব্যাপি উন্নয়নশীল দেশসমূহে তাই নগর সম্প্রসারণ ও নগর উন্নয়ন প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। UN Department of Economic and Social Affairs এর বিশ্লেষণে নগরায়নের অন্যতম সুবিধাগুলো হচ্ছে :-

- নগরায়ন তিনটি টেকসই উন্নয়নের (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত) সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে নগরায়নের শক্তিশালি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।
- টেকসই নগর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের গৃহীত বাস্তবসন্মত নীতিমালা নগরায়নের সুবিধা সমূহের সমবণ্টন নিশ্চিত করে।

স্মারণী-৪.১(১): ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১২-১৩ সময়কালে বাংলাদেশের জি.ডি.পিতে গ্রাম ও নগর সেক্টরের অবদানের চিত্র :-

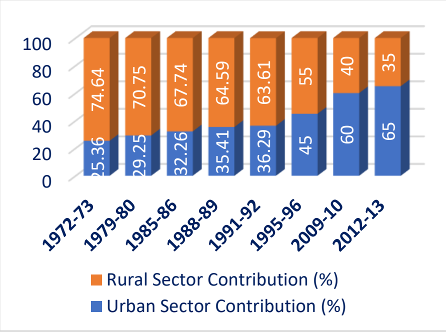

Source: Journal on Urbanization and Economic Dev. of Bangladesh by Sardar Syed Ahmed and Montasir Ahmed.

১৯৯০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে নগর উন্নয়নের গতি পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বাংলাদেশের জি.ডি.পিতে নগরখাতের অবদান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সময়কালে জি.ডি.পিতে নগর খাতের অবদান ছিল ২৫.৩৬%, ২০১২-১৩ সময়কালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৬৫% স্মারণী-৪.১(১)।

বাংলাদেশের শিল্প ও বানিজ্যের বৃহদাংশ অদ্যাবধি চারটি প্রধান শহরকে (ঢাকা, চট্রগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী) কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে। দেশের অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণ এবং সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের স্বার্থে দ্রুত গতিতে আরোও অনেকগুলো শহরকে টেকসই নগর উন্নয়নের আওতায় আনার মাধ্যমে নগর সম্প্রসারণপূর্বক ঐ সমস্ত শহরগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিকরা জরুরি।

SJFBD

গ) বাংলাদেশে নগরায়ন প্রবণতা :

বাংলাদেশে নগরায়ন প্রবণতা :

জনবহুল দেশ ও গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান কম হওয়ার কারনে জীবন জীবিকার তাগিদে ইদানিংকালে বাংলাদেশে নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে শহরমূখী প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ১৯৮০ সালের পর থেকে এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮১-৮২ সময়কালে দেশে নগর জনসংখ্যার হার ছিল মোট জনসংখ্যার ১৫.১৮%, ২০১৯-২০ সময়কালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩৭.৪১%। ১৯৮১-৮২ থেকে ২০১৯-২০ এ চার দশক সময়কালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ০.৫৭% হারে।

SJFBD

উল্ল্যেখ করার মত বিষয় হচ্ছে, জীবিকার খোঁজে প্রতিবছর বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী শহরে ছুটে আসলেও, এদের বেশির ভাগই শিক্ষা দীক্ষায় নিম্নমানের হওয়াতে নাগরিক সুবিধার কোনো কিছুই এরা ভোগ করতে পারেনা। রিক্সা চালিয়ে বা গতর খেটে এদের দিনাতিপাত করতে হয়, জীবন মান উন্নয়নের প্রভাব এ জনগোষ্ঠীর উপর খুব কমই পড়ে।

স্মারণী-৪.১(২): বিগত দুই দশক (২০০০-২০১৯) সময়কালে দেশে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র (Level of Urbanization) :-

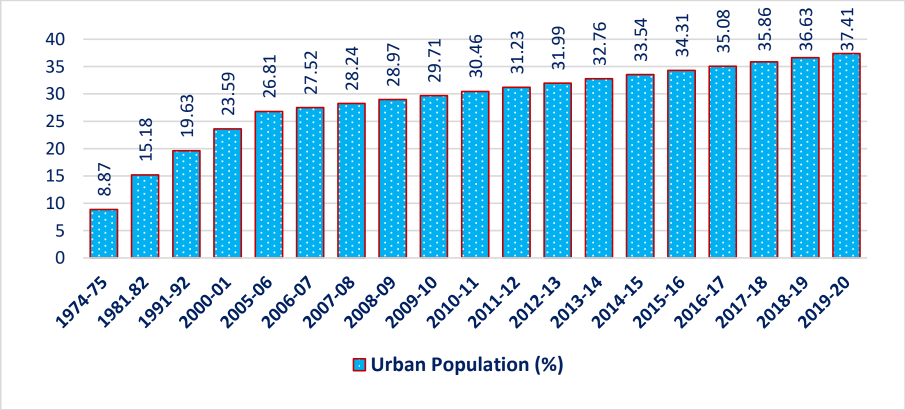

Source: World Bank Report

ঘ) নগরায়নের দিকথেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

নগরায়নের দিকথেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকথেকে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও নগর সম্প্রসারণ ও নগর উন্নয়নের দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং অনুযায়ী নগর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের দিকথেকে ১৯৪ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫০তম স্মারণী-৪.১(৪)। ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে সিঙ্গাপুর ১ম, জাপান ১৫, মালয়েশিয়া ৫৪, চীন ৯৬, ইন্দোনেশিয়া ১১০, থাইল্যান্ড ১২৮, ফিলিপাইন ১৩৩, ভূটান ১৪৪ এবং মালদ্বীপ ১৪৮তম স্থানে রয়েছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন- ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার ও শ্রীলংকার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বিগত দশকে বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ৩.৪২% স্মারণী-৪.১(৩)। ২০১৫-২০ সময়কালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশে ৩.১৭%। দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন- সিঙ্গাপুরে তা ১.৩৯%, জাপানে -০.১৪%, মালয়েশিয়ায় ২.১৩%, চীনে ২.৪২%, ইন্দোনেশিয়ায় ২.২৭%, থাইল্যান্ডে ১.৭৩%, ফিলিপাইনে ১.৯৯%, ভূটানে ২.৯৮%, মালদ্বীপে ২.৯৩%, ভিয়েতনামে ২.৯৮%, পাকিস্তানে ২.৫৩%, ভারতে ২.৩৭%, মিয়ানমারে ১.৭৪% এবং শ্রীলংকায় ০.৮০%। (চার্ট)

স্মারণী-৪.১(৩): বিগত দশকে বাংলাদেশে নগর জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির হার :-

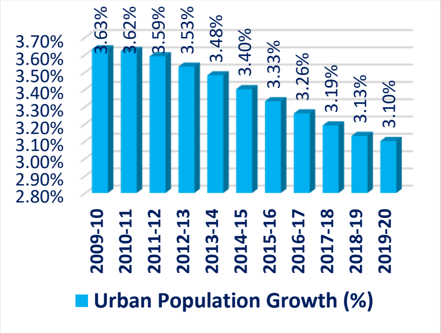

Source: World Bank Report

স্মারণী-৪.১(৪): আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০২০ অনুযায়ী নগরায়ন ও নগর জনগোষ্ঠীর হার (%) বিবেচনায় ১৯৪ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

Country	Rank	Urban Population (%) (2015-2020)	Urbanization Rate (%) during (2015-2020)
Singapore	1	100	1.39
Japan	15	91.8	-0.14
Malaysia	54	77.2	2.13
China	96	61.4	2.42
Indonesia	110	56.6	2.27
Thailand	128	51.4	1.73
Philippines	133	47.4	1.99
Bhutan	144	42.3	2.98
Maldives	148	40.7	2.93
Bangladesh	150	38.2	3.17
Vietnam	151	37.3	2.98
Pakistan	152	37.2	2.53
India	161	34.9	2.37
Myanmar	165	31.1	1.74
Sri Lanka	187	18.7	0.80

Source: CIA World Factbook

ঙ) নগরায়নের চ্যালেঞ্জ সমূহ :

SFBD

নগরায়ন যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি, কিন্তু নগরায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা নগরায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ, অন্যথায় নগরায়ন হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য। নগরায়নের সুফল পেতে তাই নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মিল রেখে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধার সমন্বয়ে নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অপরিহার্য। বিশ্বব্যাপি নগরায়নকে উন্নয়নের সোপান হিসাবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন দেশে নগর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে তুলছে। বলতে দ্বিধা নেই যে বর্তমানে বাংলাদেশের জি.ডি.পিতে নগরখাতের অবদান প্রায় ৬৫% হলেও, দেশের নগরখাত এখনও যথেষ্ট অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্ত এবং বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

নগরায়নের চ্যালেঞ্জ সমূহ :

গ্রামপর্যায়ে মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, কর্মসংস্থান সংকট এবং শহরকেন্দ্রিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠার কারনে বিগত কয়েক দশক ব্যাপি বাংলাদেশে নগরমুখী জনসংখ্যার চাপ (নগরায়নের হার) যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । CIA World Factbook এর তথ্যমতে ২০১৫-২০২০ সময়কালে বাংলাদেশে নগরায়নের হার ৩.১৭%, দক্ষিণ এশিয়ায় যা সর্বোচ্চ। কিন্তু সে তুলনায় নগরগুলোতে আবাসন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়নি। ফলে দেশের নগর সমূহে নাগরিক সুবিধার অপ্রতুলতার পাশাপাশি আবাসন সংকট মারাত্মক আকার ধারন করেছে। Urban Development Directorate Report 2016 অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ দেশে নগর আবাসন ঘাটতি দাঁড়াবে প্রায় ৮.৫ মিলিয়ন ইউনিট, দ্রুত নগরায়নের ক্ষেত্রে যা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশে নগরায়নের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ সমূহের মধ্যে রয়েছে :-

১. নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
২. নগর সমূহে আবাসন সংকট মোকাবেলায় বাস্তবসন্মত ও কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ।
৩. নাগরিকদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা।
৪. নগর অর্থনীতির গতিশীলতা রক্ষার্থে নগর উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

৫. নগরসমূহে যোগাযোগ, পানি, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন ও অন্যান্য অবকাঠামো পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা।
৬. পর্যাপ্ত ও মানসম্মত নগর পরিসেবা নিশ্চিত করা।
৭. নগর সমূহে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিকদের যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান।
৮. জাতিসংঘের নির্দেশনা অনুযায়ী নগরীর পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা।
৯. নগর সম্পদের যথাযথ তত্ত্বাবধান।
১০. আগামীর চাহিদার ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন ; এবং
১১. সঠিক ও মানসম্মত উপায়ে নগর প্রশাসন।

স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের আমলে নগর উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং কম বেশি বাস্তবায়নও হয়েছে। সর্বশেষ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) নগর উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং SDG 11 (নগর এজেন্ডা) বাস্তবায়নে National Urban Policy 2015 (আপগ্রেডেড) অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাছাড়া, নগর উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন-২০২১-২০৪১ পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ দেশের নগর সেক্টর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

চ) ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব নগরায়ন পরিস্থিতির প্রাক্কলন :

২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব নগরায়ন পরিস্থিতির প্রাক্কলন:

World Urbanization Prospect 2018 এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৮-২০৫০ সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি জনগোষ্ঠী নগরমূখী হবে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশে। ২০১৮ সালে ভিয়েতনামে নগর জনগোষ্ঠীর হার ৩৪%, ২০৫০ সাল নাগাদ তা দাঁড়াবে ৫৭%। এ সময়কালে ভিয়েতনামে নগর জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাবে ২৩% (বছরে গড়ে ০.৭২%)। অন্যদিকে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার হার ৩৭%, ২০৫০ সাল নাগাদ তা দাঁড়াবে ৫৮%। এ সময়কালে বাংলাদেশে নগর জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাবে ২১% (বছরে গড়ে ০.৬৬%) স্মারণী-৪.১(৫)।

ঐ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে নগর জনসংখ্যার হার দাঁড়াবে মিয়ানমারে ৪৭%, পাকিস্তানে ৫২%, ভারতে ৫৩%, ভিয়েতনামে ৫৭%, ভূটানে ৫৮%, বাংলাদেশে ৫৮%, ফিলিপাইনে ৬২%, থাইল্যান্ডে ৬৯%, ইন্দোনেশিয়ায় ৭৩%, দ. কোরিয়ায় ৮৬% এবং মালয়েশিয়ায় ৮৭% স্মারণী-৪.১(৬)।

স্মারণী-৪.১(৫): ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের নগরায়ন পরিস্থিতির প্রাক্কলন :-

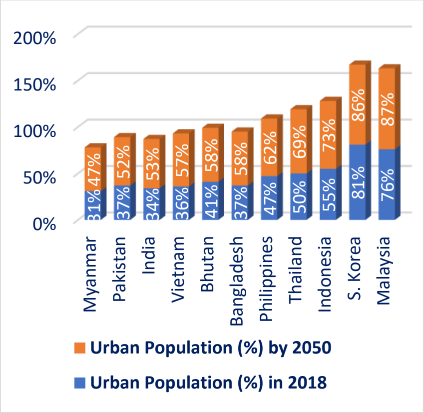

Source: World Urbanization Prospect 2018

স্মারণী-৪.১(৬): ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাক্কলন :-

Country	Urban Population in '000'				Proportion Urban (%)			
	1990	2018	2030	2050	1990	2018	2030	2050
Myanmar	10,255	16,468	20,615	29,392	25	31	35	47
Pakistan	32,924	73,630	99,360	160,228	31	37	41	52
India	222,297	460,780	607,342	876,613	26	34	40	53
Vietnam	13,817	34,659	47,248	65,711	20	36	44	57
Bhutan	88	324	444	573	16	41	49	58
Bangladesh	21,037	60,944	84,689	117,837	20	37	46	58
Philippines	29,106	49,962	63,844	93,465	47	47	51	62
Thailand	16,649	34,556	40,676	45,410	29	50	58	69
Indonesia	55,491	147,603	185,755	234,105	31	55	63	73
S. Korea	31,696	41,678	43,241	43,616	74	81	82	86
Malaysia	8,982	24,364	30,109	36,440	50	76	82	87

Source: World Urbanization Prospect 2018

ছ) নগরায়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় সমূহ :

বিগত তিন দশকের নগর প্রবণতার বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে জীবন জীবিকার খোঁজে নগরমূখি মানুষের স্রোত আগামী দিনগুলিতে আরোও বৃদ্ধি পাবে, যা নগরীর আবাসন, কর্মসংস্থান, আইনশৃঙ্খলা ও পরিবেশ ইত্যাদিক্ষেত্রে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। World Urbanization Prospect 2018 এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে নগরে বসবাসকারি জনসংখ্যা দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৮%। কৃষি সেক্টরে বাড়তি জনসংখ্যার কর্মসংকুলান না হওয়াতে এবং দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারনে আগামী দিনগুলোতে সকল শ্রেণী পেশার লোকের মাঝে কমসংস্থান, ব্যবসা বানিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অন্বেষনে মানুষের মাঝে নগরমূখীতা আরোও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশে পৌছানোর লক্ষ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল করতে নগরায়ন বৃদ্ধি করা এমনিতেই জরুরি হয়ে পড়েছে।

নগরায়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় সমূহ :

দেশে নগর প্রবণতার উর্ধ্বগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যাপ্ত নগর উন্নয়ন ও নগর প্রসার, নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি নগর উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এখন সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ, যারজন্য প্রয়োজন সুদুর প্রসারি পরিকল্পনা ও কার্যকরি উদ্যোগ। অন্যথায় নগরসমূহে দারিদ্রতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা ও প্রশাসনিকক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, যা দেশের অর্থনীতিতে সুদুর প্রসারি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে।

আগামী দিনগুলিতে নগরায়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরাপুরি কাজে লাগাতে নগরায়নের সাথে মিল রেখে নগর আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা উন্নয়নে বাস্তসন্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অথ্যন্ত জরুরি। নগর উন্নয়নে চলমান নীতি ও পদক্ষেপসমূহ পর্যাপ্ত নয় বলেই যুগ যুগ ধরে নগর আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা পর্যাপ্ত পরিমাণে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা, যা নগরায়নের জন্য অন্যতম বৃহৎ চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে সমস্তক্ষেত্রে আরোও জোর দেওয়া উচিৎ সেগুলো হচ্ছে :-

১. নগর উন্নয়ন ও নগর প্রসারে বাস্তবসন্মত পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন।
২. নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।
৩. অন্যান্য দেশের আলোকে নগর আবাসন সমস্যার স্থায়ী সমাধান।
৪. প্রত্যেক জেলা শহরকে ক্রমান্বয়ে ও দ্রুততার সাথে নগর বর্ধনের আওতায় এনে ঐ সমস্ত নগরসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যবহ করে তোলা এবং ঐ সমস্ত শহরে আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা পর্যাপ্ত বৃদ্ধিকরা, যাতে কোনো নির্দিষ্ট শহরের উপর নগরায়নের চাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি না পায়।
৫. প্রত্যেক নগরের লোকসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধসমূহের মানসন্মত উন্নয়ন, যাতে সকল অধিবাসী পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে সমর্থ হন।
৬. নগর সমূহে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি জাতিয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে তোলা।
৭. নগরসমূহে পানি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, পয়ঃনিষ্কাশন ও অন্যান্য অবকাঠামো পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা, যাতে মানসন্মত নগরীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।
৮. নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষা ও আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত জাতিসংঘের দিক নির্দেশনা মেনে চলা।
৯. নগরসমূহে নাগরিক পরিসেবার সমবন্টন নিশ্চিত করা।
১০. ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে অনুকুল বিনিয়োগ পরিবেশ, সহজ অর্থায়ন এবং ব্যবসা বানিজ্যের সাথে সংশিষ্ট সূচকসমূহের মানসন্মত উন্নয়ন।
১১. নাগরিকদের সামাজিক ও ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নগরসমূহে আইন শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানসন্মত উন্নয়ন।
১২. আধুনিক ও মানসন্মত উপায়ে নগর পরিচালনা।

****

অধ্যায় : ৪.২

নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন।

নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা।
   ১) দেশের নগর সমূহে আবাসনের ধরন/প্রকৃতি।
   ২) পেশার ভিত্তিতে শহরাঞ্চলের পরিবারগুলোর শ্রেণীবিভাগ।
   ৩) শহরাঞ্চলে মাথাপিছু জীবনযাত্রার ব্যয়।

খ) নগর আবাসন সংকটের অন্যতম কারণসমূহ।
   ১) কার্যকর ও বাস্তবসন্মত নগর আবাসন নীতির অনুপস্থিতি।
   ২) জমির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া।
   ৩) ফ্ল্যাটের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া।

গ) ফ্লাটের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ সমূহ।
   ১) নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি।
   ২) অপর্যাপ্ত হাউজিং লোন ফ্যাসিলিটিজ।
   ৩) বকেয়া হাউজিং লোন এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বন্ধকী ঋণ।
   ৪) মোট ঋণের তুলনায় হাউজিং লোন অস্বাভাবিক হারে কম।

ঘ) নগর আবাসন ও নাগরিক সেবার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ।

ঙ) নাগরিক সুবিধা ও নিরাপত্তা।

চ) নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা উন্নয়নে প্রস্তাবনা

ক) নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা :

নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা :

নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধাসমূহ, যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয়ে নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি, যাতে সকল স্তরের নাগরিগদের জন্য মানসন্মত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা থাকে। কারন, নগর অধিবাসিরাই নগর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এবং নাগরিক জীবন মানের উপরই দেশের অর্থনীতির গতি ও মান নির্ভর করে। এ কারনে উন্নত দেশসমূহে সবার জন্য মানসন্মত আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা সম্বলিত নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর এত জোর দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে একদিকে যেমন সীমিত সংখ্যক নগরী, তারউপর গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান সীমিত, নদী ভাঙ্গন এবং প্রতিবছর বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে শহরমূখী মানুষের প্রবল স্রোত, কিন্তু সে তুলনায় পরিকল্পিত উপায়ে নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ না হওয়াতে নগরসমূহে আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা যথেষ্ট অপ্রতুল। ফলে দেশের বড় শহরগুলোতে একটি বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী নাগরিক সুবিধা বিহীন নিন্মমানের জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তি শুমারি ২০১৪ অনুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ সময়কালে দেশের শহরগুলোতে বস্তির সংখ্যা ২,৯৯১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,৯৯৫ তে দাঁড়িয়েছে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোতে বসবাসরত জনসংখ্যার অনুপাতে বস্তিবাসীর সংখ্যা বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি (বি.বি.এস সার্ভে ২০১৫), যা ঐ জনগোষ্ঠীর জীবন মানের উপর বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং দেশের অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিধারা বিঘ্নিত করার পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনীতির মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে।

নগরসমূহ নাগরিক সুবিধার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া সত্বেও অপরিকল্পিত নগর বর্ধন ও নগর উন্নয়ন দেশে নগর ব্যবস্থা ও নগর সেবা কার্যক্রমের উপর অতিমাত্রায় চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে দেশের শহরগুলোতে আবাসন সংকটের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সমস্যা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে যানজট সমস্যা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়নে বাংলাদেশের শহরগুলো মানসন্মত ও নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য একদমই অনুপযুক্ত। দেশের শহরগুলোতে নিন্মআয়ের মানুষের জন্য আবাসন ব্যবস্থা এবং নাগরিক সুবিধার ছিটেফোঁটাও নেই বললেই চলে। শহরগুলোতে আবাসন সংকট আগেথেকেই প্রকট, যা ক্রমান্বয়ে প্রকটতর হচ্ছে। Urban Directorate Report 2016 অনুযায়ী ১৯৯১ সালে দেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যা ছিল ২০.৮৭ মিলিয়ন এবং আবাসন ঘাটতি ছিল ০.৯৫ মিলিয়ন ইউনিট, ২০১০ সাল নাগাদ শহরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৪৩ মিলিয়ন এবং আবাসন ঘাটতি ৪.৬ মিলিয়ন ইউনিট। ঐ সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ দেশে নগর জনসংখ্যা পৌঁছাবে ৬০ মিলিয়নে এবং আবাসন ঘাটতি দাঁড়াবে ৮.৫ মিলিয়ন ইউনিট (১৪.১৭%) স্মারণী-৪.২(১)।

স্মারণী-৪.২(১) : ১৯৯০-২০২১ সময়কালে দেশের নগর সমূহে বসবাসরত জনসংখ্যা এবং আবাসন ঘাটতির চিত্র :-

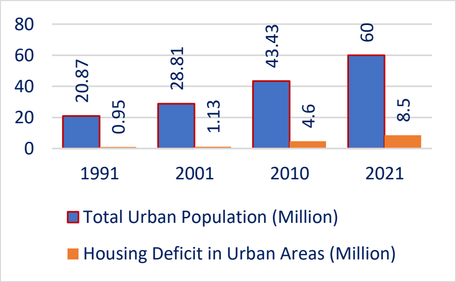

Source: Urban Development Directorate Report 2016

দেশের শহরাঞ্চল গুলোতে আবাসনের ধরন/প্রকৃতি :

১) দেশের নগর সমূহে আবাসনের ধরন/প্রকৃতি :

ঢাকা ও চট্রগ্রাম এ দুটি বড় শহর ব্যাতিত দেশের অন্যান্য শহরগুলোতে নাগরিক সুবিধা যেমন অপ্রতুল, তেমনি ঐ সমস্ত শহরে ভালোমানের আবাসন ব্যবস্থা আজো গড়ে উঠেনি। ঢাকা ও চট্রগ্রামে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি কিছু কিছু উন্নত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও ঐ সমস্ত শহরে বসবাসরত জনসংখ্যার তুলনায় তা আজো যথেষ্ট অপ্রতুল। বি.বি.এস সার্ভে ২০১৯ অনুযায়ী দেশের শহরগুলোতে মোট আবাসনের ৫৩.২৬% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ৫৯.৭০% এবং অন্যান্য শহরে ২৯.৩৬%) ইট/সিমেন্টের চাউনি, ৪৫.৪৮% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ৩৯.১৪% এবং অন্যান্য শহরে ৬৯.০২%) টিন/সি.আই সিটের এবং ১.২৬% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ১.১৬% এবং অন্যান্য শহরে ১.৬২%) কাঠ/খড়ের চাউনি। উল্লেখ্য, শহরাঞ্চলে টিন/সি.আই সিটের ঘর বেশিরভাগই বস্তি এলাকায় অবস্থিত, যেখানে নাগরিক সুবিধা খুবই অপ্রতুল। সে হিসাবে দেশের শহরগুলোতে এখনো (৪৫.৪৮ + ১.২৬)= ৪৬.৭৪% আবাসন অত্যন্ত নিম্নমানের এবং নাগরিক সুবিধা বহির্ভূত স্মারণী-৪.২(২)।

স্মারণী-৪.২(২): ছাদের গঠন অনুযায়ী ২০১৯ সাল নাগাদ দেশের শহরগুলোতে আবাসনের ধরণ/প্রকৃতি :-

Roof materials	Dhaka and Ctg. (%)	Other big Cities (%)	All Urban Areas (%)
Brick/Cement	59.70	29.36	53.26
Tin / CI Sheet	39.14	69.02	45.48
Wood/Straw	1.16	1.62	1.26
Total	100 %	100 %	100 %

Source: Urban Socioeconomic Survey 2019

SJIBD

পেশার ভিত্তিতে শহরাঞ্চলের পরিবারগুলোর শ্রেণীবিভাগ :

২) পেশার ভিত্তিতে শহরাঞ্চলের পরিবারগুলোর শ্রেণীবিভাগ :

দেশের শহরগুলোতে বসবাসকৃত জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজো আয় রোজগারহীন অবস্থায় রয়েছে, যাদের সিংহভাগই বস্তি এলাকায় নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত জীবন যাপন করছে। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী শহরাঞ্চলে বসবাসরত পরিবারসমূহের মধ্যে পরিবার প্রধানের পেশায় দিনমজুর ১৪.৭৩% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ১৪.৭৭% এবং অন্যান্য শহরে ১৪.৫৭%), বেতনভুক্ত ২৫.১৮% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ২৬.৩২% এবং অন্যান্য শহরে ২০.৯৫%), আত্মকর্মসংস্থান ১৭.৭৩% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ১৭.১১% এবং অন্যান্য শহরে ২০.০৬%), ব্যবসা ২০.৫৯% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ২০.৩৬% এবং অন্যান্য শহরে ২১.৪৩%, ফার্মিং ৫.৭৬% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ৫.৮৮% এবং অন্যান্য শহরে ৫.২৮%) এবং সুনির্দিষ্ট কোনো আয় নেই এমন পরিবারের সংখ্যা ১৬.০২% (ঢাকা ও চট্রগ্রামে ১৫.৫৭% এবং অন্যান্য শহরে ১৭.৭০%) স্মারণী-৪.২(৩)।

HIES 2016 অনুযায়ী দেশের শহরগুলোতে বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা ১১.০৭ মিলিয়ন। সে হিসাবে কোনো আয়ের উৎস নেই এমন পরিবারের সংখ্যা দেশের শহরগুলোতে (১১.০৭ x ১৬.০২%) = ১.৭৭ মিলিয়ন।

স্মারণী-৪.২(৩): ২০১৯ সাল নাগাদ পরিবার প্রধানের পেশার ভিত্তিতে শহরাঞ্চলে বসবাসরত পরিবারসমূহের শ্রেণীবিভাগ :-

Occupation	Dhaka and Ctg. (%)	Other big Cities (%)	All Urban Areas (%)
Wage Labour	14.77	14.57	14.73
Salaried	26.32	20.95	25.18
Self Employed	17.11	20.06	17.73
Business/Trade	20.36	21.43	20.59
Farming & Others	5.88	5.28	5.76
Non-Earnings	15.57	17.70	16.02

Source: Urban Socioeconomic Survey 2019

৩) শহরাঞ্চলে মাথাপিছু জীবনযাত্রার ব্যয় :

মাথাপিছু জীবনযাত্রার ব্যয়ের দিকথেকে ঢাকা-চট্রগ্রাম এবং দেশের অন্যান্য শহরের মধ্যে বিভিন্ন দিকথেকে পার্থক্য রয়েছে।

স্মারণী-৪.২(৪): শহরাঞ্চলে খাদ্য ও অন্যান্য বাবদ মাসিক মাথাপিছ ব্যয়ের চিত্র :-

(BDT)

শহরাঞ্চলে মাথাপিছু জীবনযাপন ব্যয় :

উদাহরনস্বরুপ, ঢাকা-চট্রগ্রামে মাথাপিছু বাড়ীভাড়া ব্যয় খাদ্য খরচের প্রায় অর্ধেক। অন্যদিকে দেশের অন্যান্য শহরগুলোতে শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ ঢাকা-চট্রগ্রামের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। Urban Socioeconomic Survey অনুযায়ী, ২০১৯ সাল নাগাদ শহরাঞ্চলে মাথাপিছু সামগ্রিক জীবনযাপন ব্যয় ৩,৯৬৬ টাকা (ঢাকা-চট্রগ্রামে ৪,০৪২ টাকা এবং অন্যান্য শহরে ৩,৬৮৩ টাকা), যারমধ্যে খাদ্যব্যয় ৫০.৭৫%, বাড়ীভাড়া ২০.৮১%, চিকিৎসা ব্যয় ৪.৭২%, পরিধান ৩.২২%, শিক্ষা ২.৭৪%, যাতায়াত ৪.৭৫%, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি ৬.৩৯% এবং অন্যান্য ব্যয় ৬.৬২% স্মারণী-৪.২(৪)।

Expenditures	Dhaka and Ctg. (%)	Other big Cities (%)	All Urban Areas (%)
Food Exp.	2,035	2,001	2,027
Non-Food Exp	2,007	1,682	1,939
Monthly Exp.	4,042	3,683	3,966
Share (%) of Expenditures			
Food	49.66	54.80	50.75
House Rent	24.67	6.46	20.81
Medical	3.61	8.83	4.72
Clothing	3.29	2.96	3.22
Education	2.25	4.58	2.74
Transport	4.36	6.18	4.75
Elec., Water	6.49	6.03	6.39
Other Exp.	5.67	10.16	6.62
Total :	**100**	**100**	**100**

Source: Urban Socioeconomic Survey 2019

খ) নগর আবাসন সংকটের অন্যতম কারণসমূহ :

দেশের শহরগুলোতে কাজের সন্ধানে সারাদেশ থেকে নিন্মআয়ের মানুষদের আগমন ঘটছে প্রতিনিয়ত। শহরগুলোতে আগত জনসংখ্যার তুলনায় একদিকে যেমন কাজের অভাব, অন্যদিকে স্বল্পআয়ের মানুষের আবাসন সংকটের কারনে চড়াদামের ঘরভাড়া এবং প্রাত্যহিক অন্যান্য ব্যয়, সবমিলিয়ে এ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাপন হয়ে উঠে রীতিমত কঠিন। ফলে বাধ্য হয়ে এ শ্রেণীর জনগোষ্ঠী ঝুপরি/ বস্তিতে নিন্মমানের জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাবে ২০২১ সাল নাগাদ দেশের শহরগুলোতে এ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৪.১৭%।

নগর আবাসন সংকটের অন্যতম কারণসমূহ :

দেশের শহরগুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত আবাসন গড়ে না উঠার কারনে আবাসন সংকট ক্রমান্নয়ে প্রকটতর হয়ে উঠছে। বিশেষকরে ঢাকা ও চট্রগ্রামের মত বড় শহরগুলোতে স্বল্পআয়ের মানুষদের জন্য নিজস্ব আবাসন ক্রমেই সোনার হরিণে পরিণত হচ্ছে এবং ক্রমাগতভাবে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে ঐ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসন্মত আবাসনে বসবাস প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। দেশে নগর আবাসন শিল্পের পর্যাপ্ত প্রসার না ঘটার অন্যতম কারণগুলির মধ্যে রয়েছে :-

১. কার্যকর ও বাস্তবসন্মত নগর আবাসন নীতির অুপস্থিতি।

২. নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে নগর বর্ধন না হওয়া।
৩. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জমি ও ফ্ল্যাটের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া।
৪. নির্মাণ সামগ্রির ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি পাওয়া।
৫. চড়া সুদে অপর্যাপ্ত হাউজিং লোন।

আবাসন সংকটের কারনে শহরগুলোতে লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে বাড়ী ভাড়া। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর আয়ের সিংহভাগই চলে যায় বাড়ী ভাড়ার পিছনে (মোট আয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ), যা তাদের সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পারিবারিক জীবনমানের উপর বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং অগণিত পরিবার নিম্নমানের আবাসনে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। নগরসমূহে আবাসন সঙ্কট বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ সমূহ নিম্নে তুলেধরা হলো :-

১) কার্যকর ও বাস্তবসন্মত নগর আবাসন নীতির অনুপস্থিতি :

বিগত দুই দশকে দেশে অস্বাভাবিক হারে নগরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষকরে ২০১৫-২০২০ সময়কালে বাংলাদেশে নগরায়ন বৃদ্ধির এ হার ৩.১৭%, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় যা সর্বোচ্চ। শহরগুলোতে প্রতিনিয়ত আগত জনসংখ্যার বেশিরভাগই স্বল্প আয়ের মানুষ, যারা কর্মের সন্ধানে শহরে আসে। কিন্তু সে তুলনায় শহরগুলোতে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নাগরিক সুবিধা ও আবাসন ব্যবস্থা মোটেও প্রসারিত হয়নি, ফলে বর্তমানে দেশের বড় শহরগুলোতে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর আবসন সংকট চরমে পৌঁচেছে।

কার্যকর ও বাস্তবসন্মত নগর আবাসন নীতির অনুপস্থিতি :

দেশে চলমান সরকারি আবাসন নীতির আওতায় আবাসন খাতের উন্নয়ন এবং আবাসনখাতে অর্থায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে বটে, তবে বাস্তবতার নিরিখে সেখানে আবাসন সংকট নিরসনের তুলনায় তা যথেষ্ট অপ্রতুল। প্রাইভেট সেক্টরেও আবাসন অর্থায়ন ও আবাসন উন্নয়ন হচ্ছে, তবে তা খুবই সামান্য। যে সমস্ত নীতিমালার আওতায় বর্তমানে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে আবাসন ও নাগরিক সুবিধা উন্নয়ন অব্যাহত আছে, সেগুলো হচ্ছে :-

SIJBD

- ন্যাশনাল ল্যান্ড ইউজ পলিসি, ২০০১
- ন্যাশনাল রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি, ২০০১
- ন্যাশনাল হাউজিং পলিসি, ২০০৮
- ন্যাশনাল আরবান সেক্টর পলিসি, ২০১০
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০

শহরগুলোতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নগরায়নের আসল উদ্দেশ্য তাৎপর্যবহ করে তুলতে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসন্মত আবাসন ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কেননা, তারাই নগর গতিশীলতার মূল চালিকাশক্তি। কাজেই, শহরাঞ্চলে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট নিরসনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত আবাসন উন্নয়ন এবং আবাসন অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে কার্যকর ও বাস্তবসন্মত আবাসন নীতি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের শহরগুলোতে আবাসনখাতের বিশৃঙ্খলাা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে সন্দেহ নেই।

২) জমির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া :

দেশের শহরগুলোতে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত আবাসন গড়ে না উঠার আরেকটি অন্যতম কারন বিগত সময়গুলোতে জমির মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া। ১৯৭৫ থেকে ২০১০ এই ৩৫ বছরের ব্যবধানে ঢাকা শহরের প্রাইম লোকেশন সমূহে জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকশ গুণ। এ সমস্ত প্রাইম লোকেশনসমূহে ১৯৭৫ সালে গড়ে কাঠাপ্রতি মূল্য ছিল ২২,৬৬৭ টাকা, ২০০০ সালে এসে গড়ে কাঠাপ্রতি মূল্য দাঁড়িয়েছে ২,০৭৭,৭৭৮ টাকা। এ ২৫ বছরের ব্যবধানে কাঠাপ্রতি মূল্য

জমির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি :

বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ৭৩৩%। আবার ২০০০ সালে এ সমস্ত প্রাইম লোকেশনে যে জমির মূল্য ছিল গড়ে কাঠাপ্রতি ২,০৭৭,৭৭৮ টাকা, ২০১০ সালে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে কাটাপ্রতি ১৬,০৫৫,৫৫৬ টাকা। অর্থাৎ ২০০০-২০১০ এ দশ বছরের ব্যবধানে ঢাকা শহরে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ৬৩৯% স্মারণী-৪.২(৫)।

স্মারণী-৪.২(৫): ১৯৭৫ থেকে ২০১০ সালের ব্যবধানে ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য লোকেশন সমূহে জমির মূল্যবৃদ্ধির চিত্র :-

Area	Periods		(Taka / Khata)		Value Increased (%)	
	1975	1990	2000	2010	1975-2000	2000-2010
Baridhara	25,000	600,000	5,000,000	40,000,000	733 %	700 %
Gulshan	25,000	600,000	2,200,000	25,000,000	267 %	1036 %
Banani	25,000	600,000	2,000,000	15,000,000	233 %	650 %
Dhanmondi	25,000	600,000	2,200,000	20,000,000	267 %	809 %
Uttara	20,000	300,000	1,000,000	7,500,000	233 %	650 %
Motijheel	50,000	1,200,000	3,500,000	20,000,000	192 %	471 %
Shantinagar	20,000	500,000	1,500,000	10,000,000	200 %	567 %
Mirpur	10,000	200,000	700,000	4,000,000	250 %	471 %
Badda	4,000	200,000	600,000	3,000,000	200 %	400 %
Average	**22,667**	**533,333**	**2,077,778**	**16,055,556**	**286 %**	**639 %**

Source: REHAB

৩) ফ্ল্যাটের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া :

ফ্ল্যাটের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া :

শহরগুলোতে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত আবাসন গড়ে না উঠার আরেকটি অন্যতম কারন হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ফ্ল্যাটের দাম লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। ১৯৯০ থেকে ২০১০ এ ২০ বছরের ব্যবধানে ঢাকা শহরের প্রাইম লোকেশন সমূহে ফ্ল্যাটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকশ গুণ। এ সমস্ত প্রাইম লোকেশনসমূহে ১৯৯০ সালে প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের মূল্য ছিল গড়ে ১,৭৭৭ টাকা, ২০০০ সালে এসে প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের মূল্য দাঁড়িয়েছে গড়ে ২,১৩৮ টাকা। এ ১০ বছরের ব্যবধানে প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ২১%। আবার ২০০০ সালে এ সমস্ত প্রাইম লোকেশনে প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের দাম ছিল ২,১৩৮ টাকা, ২০১০ সালে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে প্রতি বর্গফুট গড়ে ১০,৫০০ টাকা। অর্থাৎ ২০০০-২০১০ এ দশ বছরের ব্যবধানে ঢাকা শহরে ফ্ল্যাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ৩৮১% স্মারণী-৪.২(৬)।

স্মারণী-৪.২(৬): ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালের ব্যবধানে ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য লোকেশন সমূহে ফ্ল্যাটের মূল্যবৃদ্ধির চিত্র :-

Area	Periods (BDT per Sq. feet)				Value Increased (%)	
	1990	1995	2000	2010	1990-2000	2000-2010
Dhanmondi	2,150	2,200	2,400	14,000	12 %	483 %
Gulshan	2,115	2,080	2,450	14,000	16 %	471 %
Banani	1,750	1,950	2,200	12,500	26 %	468 %
Baridhara	1,850	1,950	2,150	20,000	16 %	830 %
Lalmatia	1,800	1,950	2,400	8,500	33 %	254 %
Mirpur	1,250	1,300	1,500	5,500	20 %	267 %
Shantinagar	1,850	1,900	2,200	5,000	19 %	127 %
Mohammadpur	1,450	1,600	1,800	4,500	24 %	150 %
Average	**1,777**	**1,866**	**2,138**	**10,500**	**21 %**	**381 %**

Source: REHAB

গ) ফ্ল্যাটের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ সমূহ :

নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি :

১) নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি :

নির্মাণ সামগ্রির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারনে ফ্ল্যাট নির্মাণ ব্যয় আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দুই দশকের নির্মাণ সামগ্রির বিভিন্ন মূল্যসূচক বিশ্লেষণে দেখা যায় এ সময়কালে শ্রমিকদের মজুরি, পরিবহন এবং নির্মাণ সামগ্রির মূল্যসূচক কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ফ্ল্যাটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারন। অর্থবছর ২০০২-০৩ সময়কালে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সাধারণ মূল্যসূচক ছিল ১১৪.২৭, অর্থবছর ২০১৮-১৯ সময়কালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৫৭২.৫৮। এ ১৭ বছরের ব্যবধানে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সাধারণ মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০১.০৮%, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৫৯% স্মারণী-৪.২(৭)।

স্মারণী-৪.২(৭): অর্থবছর ২০০২-০৩ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সাধারণ মূল্যসূচক বৃদ্ধির চিত্র :-

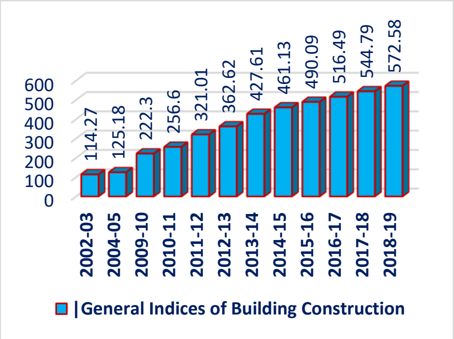

Source: BBS Report

IFBL

স্মারণী-৪.২(৮): Indices of Cost of Building Construction in Bangladesh (Base: 1998-99 = 100) :-

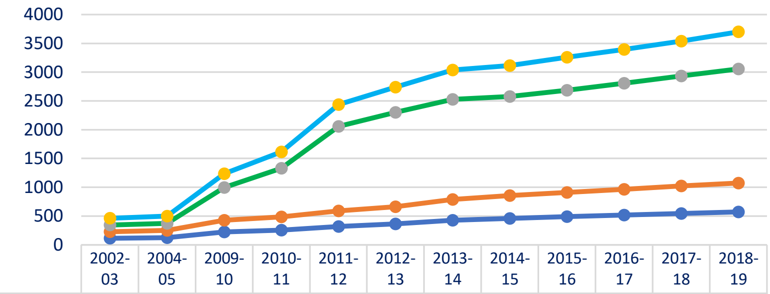

	2002-03	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Labour	116.94	127.25	241.61	282.59	378.69	439.67	512.85	538.33	569.2	586.48	609.13	643.88
Transport	116.94	123.95	566.89	843.83	1468.7	1639.04	1737.52	1720.25	1776.3	1840.93	1909.77	1981.59
Bldg. Materials	113.36	124.6	207.11	230.46	268.46	299.03	360.87	396.65	421.02	448.62	476.91	501.25
General Indices	114.27	125.18	222.3	256.6	321.01	362.62	427.61	461.13	490.09	516.49	544.79	572.58

Source: BBS Report

২) অপর্যাপ্ত হাউজিং লোন ফ্যাসিলিটিজ :

দেশে হাউজিং সংকট নিরসনে হাউজিং লোন একটি বড় বিষয়, কেননা হাউজিং লোন ব্যাতিত স্বল্পআয়ের মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে আবাসন নির্মাণ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। বর্তমানে চলমান সরকারি হাউজিং ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম গ্রাম ও শহর উভয়ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন চাহিদা পূরনে মোটেও পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া বেসরকারি আবাসন উন্নয়ন ও হাউজিং ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্রমবর্ধমান আবাসন চাহিদা পূরনে উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যার্থ হচ্ছে। ফলে দেশের বড় শহরগুলোতে আবাসন সংকট বর্তমানে চরম আকার ধারন করেছে।

অপর্যাপ্ত হাউজিং লোন প্রবণতা :

অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে হাউজিং ফাইন্যান্স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৫-৬ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে হাউজিং ফাইন্যান্স ৮,৬৮০ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৫৬,২৯০ কোটি টাকা। এ সময়কালে দেশে হাউজিং ফাইন্যান্সের পরিমান বছরে গড়ে ২৮,১৩১.৫৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থবছরের পর থেকে হাউজিং সেক্টরে অর্থায়নের মাত্রা পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে হাউজিং ফাইন্যান্স ছিল গড়ে বছরে ৩৯,৪২১.৭১ কোটি টাকা। এ সময়কালে হাউজিংখাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে ২২.৮৫% স্মারণী-৪.২(৯)।

স্মারণী-৪.২(৯): অর্থবছর ২০০৫-২০১৬ সময়কালে দেশে হোম লোন প্রবণতার চিত্র :-

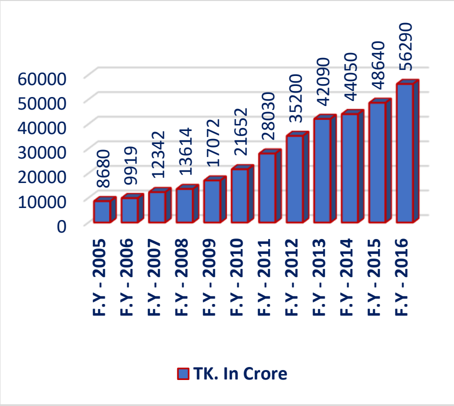

Source: BB/Dhakatribune

২০১৬-১৭ অর্থবছরের তথ্যানুযায়ী ঐ বছরে মোট হাউজিং ফাইন্যান্সের ৫৫% প্রাইভেট ব্যাংক, ২১% রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক, ১২% স্পেসালাইজড হাউজিং ফাইন্যান্স, ৪% ফরেন ব্যাংক এবং ৮% অন্যান্য অর্থ লগ্নিকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের অংশ স্মারণী-৪.২(১০)।

স্মারণী-৪.২(১০): ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান কতৃক হোমলোন প্রদানের হার :-

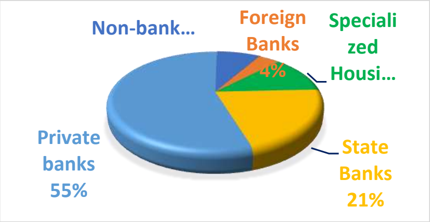

Source: BB/Dhakatribune

৩) বকেয়া হাউজিং লোন এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বন্ধকী ঋণ :

বকেয়া হাউজিং লোনের স্থিতি দেশের হাউজিং সেক্টরে অর্থায়নকৃত ঋণের মাত্রা নির্দেশ করে। বাংলাদেশে হাউজিং সেক্টর উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে অর্থায়নের মাত্রা প্রকৃত চাহিদার তুলনায় খুবই সীমিত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপ অনুযায়ী দেশে হাউজিং লোনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে বছরে গড়ে প্রায় ২০০ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্যমতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে হাউজিং লোনের চাহিদা ১,৪৯৬ বিলিয়ন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে তা দাঁড়াবে ১,৫৪৪ বিলিয়ন টাকা। অথচ অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বকেয়া হাউজিং লোনের স্থিতি ছিল যথাক্রমে জুন-২০১০ সময়ে ২১৬.৭ বিলিয়ন, জুন-২০১১ সময়ে ২৮০.৩

স্মারণী-৪.২(১১): ২০১০-২০১৫ সময়কালে বৎসরান্তে হাউজিং লোনের বকেয়া স্থিতি :-

বকেয়া হাউজিং লোন এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বন্ধকী ঋণ :

বিলিয়ন, জুন-২০১২ সময়ে ৩৫৮ বিলিয়ন, জুন-২০১৩ সময়ে ৪২০.৯ বিলিয়ন, জুন-২০১৪ সময়ে ৪৪০.৬ বিলিয়ন, জুন-২০১৫ সময়ে ৪৮৯.৯ বিলিয়ন এবং জুন-২০১৮ সময়ে ৮১৫.২ বিলিয়ন টাকা স্মারণী-৪.২(১১)।

এ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে বন্ধকী ঋণের হার ছিল ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২.৭২%, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩.০৬%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩.৩৯%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩.৫১%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩.২৮% এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.২৩% স্মারণী-৪.২(১২)।

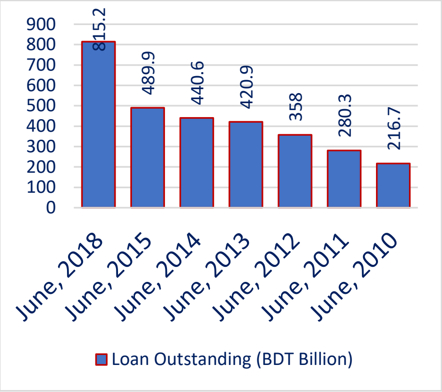

Source: IFC Report/ Other Source

স্মারণী-৪.২(১২): ২০১০-২০১৫ সময়কালে দেশে বকেয়া হাউজিং লোন এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বন্ধকী ঋণের হার :-

Lenders Category	Total Housing Loan Outstanding (BDT Billion)					
	June - 15	June - 14	June - 13	June - 12	June - 11	June – 10
A. Special Housing Finance Providers -	**63.6**	**59.4**	**55.2**	**51.9**	**48.3**	**44.9**
i) House Buinding Finance Corp.	30.3	29.7	28.0	25.8	25.1	25.1
ii) Delta Brack Housing	28.7	26.4	24.4	23.6	20.7	17.4
iii) National Housing Finance	4.6	3.3	2.8	2.5	2.5	2.4
B. Banks -	**395.5**	**358.0**	**349.0**	**286.8**	**220.6**	**162.4**
i) Private Commercial Banks	266.0	231.8	229.8	191.8	147.6	99.0
ii) State Owned Comm. Banks.	108.5	95.6	73.1	63.4	53.0	48.1
iii) Other Specialized Banks	210.0	30.6	46.1	31.6	20.0	15.3
C) Other Non-banking Institutions -	**30.8**	**23.2**	**16.7**	**19.2**	**11.3**	**9.2**
Total Housing Loan Outstanding :	**489.9**	**440.6**	**420.9**	**358.0**	**280.3**	**216.7**
Mortgage Debt to GDP	3.23%	3.28%	3.51%	3.39%	3.06 %	2.72%

Source: IFC Report

মোট ঋণের তুলনায় হাউজিং লোন অস্বাভাবিক হারে কম :

৪) মোট ঋণের তুলনায় হাউজিং লোন অস্বাভাবিক হারে কম :

বাংলাদেশে গৃহ ঋণের হার মোট ঋণের তুলনায় অস্বাভাবিকহারে কম, যা সামগ্রিক গৃহঋণ চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল। সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে গৃহঋণ প্রদানের দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অদ্যাবধি যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ঋণের তুলনায় গৃহঋণ ফিলিপাইনে ৭.১০%, বাংলাদেশে ৯.১০%, ভারতে ১২.৪৬%, থাইল্যান্ডে ১৯.৯০%, ভূটানে ২২.৭০% এবং ইন্দোনেশিয়ায় ২৯.১৭% স্মারণী-৪.২(১৩)।

স্মারণী-৪.২(১৩) : ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের মোট প্রদত্ত ঋণের তুলনায় হাউজিং লোনের হার (%) :-

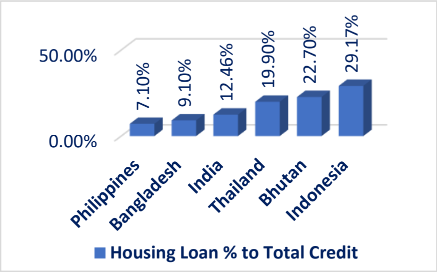

Source: IDLC Business Report 2017

দেশে ক্রমবর্ধমান আবাসিক সংকট মোকাবেলায় গৃহঋণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শহর ও গ্রাম পর্যায়ে আবাসন সংকটের কার্যকর নিরসনে সরকারি অর্থায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাইভেট সেক্টরের ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে এক্ষেত্রে আরোও উদ্যোগী ও তৎপর হওয়া বাঞ্চনীয়।

ঘ) নগর আবাসন ও নাগরিক সেবার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ :

নগর আবাসন ও নাগরিক সেবার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ :

আবাসন একটি জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান, যা জীবনযাপনের মৌলিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। নগর আবাসন ব্যবস্থা দেশের অথনৈতিক মানদন্ডের বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে যে গতিতে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার আবাসন সংকট নিরসনে শিল্প, ব্যবসা, বানিজ্য ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাই নগর আবাসন সমস্যার মানসন্মত সমাধানে বাস্তবসন্মত পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের নগরগুলিতে আবাসন সংকট প্রকট, যা ক্রমান্বয়ে আরোও প্রকটতর হচ্ছে। উচ্চ আবাসন মূল্যের কারনে দেশের নগরগুলিতে নিম্নআয়ের বিশাল জনগোষ্ঠী, যারা নগর অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত নিম্নমানের আবাসনে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে, যা নগর অর্থনীতি তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির দূর্বলতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ।

শহরগুলোতে ব্যাপক আবাসন সংকটের কারনে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ব্যাক্তিমালিকানাধীন বাড়িঘরের ভাড়াও লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শহরগুলোতে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্বি পেয়েছে, যা ঐ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর জীনমানের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ এ ৮ (আট) বছর সময়কালে ঢাকা শহরে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে প্রায় ৮.৫০% এর বেশি স্মারণী-৪.২(১৪)।

স্মারণী-৪.২(১৪) : ২০১১ থেকে ২০১৮ সালের ব্যবধানে ঢাকা শহরে গড়ে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধির চিত্র :-

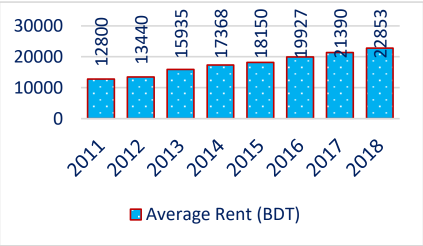

Source: MTB Journal

বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আবাসন সমস্যার সমাধানে দিক নির্দেশনার পাশাপাশি জাতিয় আবাসন নীতি ২০১৭ গ্রহণ করার মাধ্যমে এ প্রকট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, নাগরিক সেবার উন্নয়নে ২০২০ সাল নাগাদ দেশের বড় শহরগুলোতে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরোও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যারমধ্যে ঢাকা শহরে যাতায়াত ব্যবস্থার আধুনিকীকরনে নির্মিতব্য মেট্রোরেল প্রকল্প বেশ সময়োপযোগি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

স্মারণী-৪.২(১৫): Rent Indices for Private Residential Houses in Urban Centers for the period from 2000-01 to 2017-18:

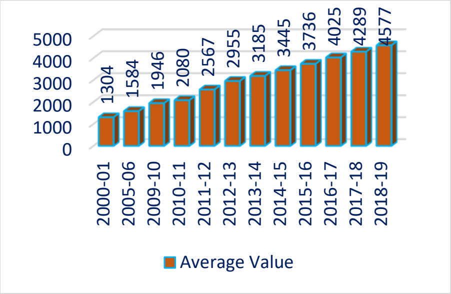

Source: BBS Report

ঙ) নাগরিক সুবিধা ও নিরাপত্তা :

বিশ্বের নগরসমূহে বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশি বসবাস। যে নগরগুলোকে কেন্দ্রকরে প্রতিটি দেশের ব্যবসা বানিজ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতির মূল গতিপ্রবাহ পরিচালিত হয়, সে সব নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের নিরাপত্তা বিধান তাই বিশ্বব্যাপি এত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৫ সালের তথ্যানুযায়ী বিশ্ব জি.ডি.পির প্রায় ৮৫% নগর সমূহের অবদান। বাসযোগ্য নগরী বলতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নগর অবকাঠামো এবং নাগরিকদের সামাজিক ও ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা বিধানে প্রশাসনিক তৎপরতা ও ব্যবস্থপনাকেই বুঝায়, যাতে শহরের অধিবাসিগণ শ্রেণী ও পেশা নির্বিশেষে সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে সক্ষম হয়।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে নগর অবকাঠামো, যেমন-বিদ্যুৎ, পনি, পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসন্মত পরিবেশ এবং সামাজিক ও ব্যাক্তিগত নিরাপত্তার দিকথেকে বাংলাদেশের শহরগুলো অদ্যাবধি যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং দেশের বৃহত্তম শহর, ২০২০ সাল নাগাদ যেখানে প্রায় ২.০০ কোটি লোকের বসবাস। Safe Cities Index 2019 অনুযায়ী বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বের ৬০ টি ব্যাস্ততম শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ৫৬তম। ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে টোকিও ১ম, সিঙ্গাপুর ২য়, সিউল ৮তম, হংকং ২০, বেইজিং ৩১, কুয়ালালামপুর ৩৫, ম্যানিলা ৪৩, নয়াদিল্লী ৫২, জাকার্তা ৫৩ এবং পাকিস্তান ৫৭তম স্থানে রয়েছে স্মারণী-৪.২(১৬)। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে নগর উন্নয়ন ও নগর

স্মারণী-৪.২(১৬) : ২০১৯ সালের র‌্যাংকিং অনুযায়ী বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাস্ততম ৬০ টি শহরের মধ্যে ঢাকা ও এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি শহরের অবস্থান :-

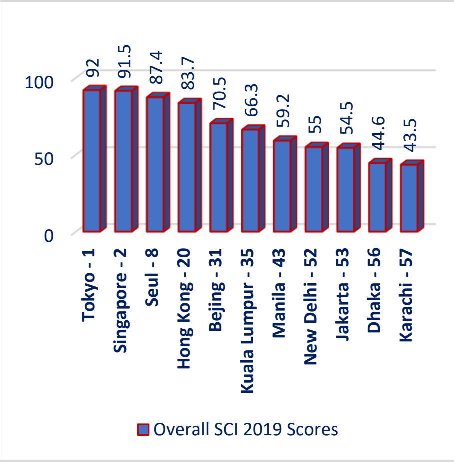

Source: Safe Cities Index 2019

সম্প্রসারণ যেমন জরুরি, তেমনি নগর সমূহে পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং নগরে বসবাসরত সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে আরোও সক্রিয় হওয়া উচিৎ।

স্মারণী-৪.২(১৭) : ২০১৯ সালের র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাস্ততম ৬০ টি শহরের মধ্যে ঢাকা ও এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি শহরের সামগ্রিক ও সেক্টরভিত্তিক অবস্থান :-

Overall Rank			Scores in different type of security			
Rank	City / Country	Scores	Digital Security	Health Security	Infrastructure security	Personal security
1	Tokyo, Japan	92.0	94.4	87.5	94.3	91.7
2	Singapore	91.5	93.1	80.9	96.9	95.3
8	Seul, S. Korea	87.4	84.7	85.2	92.4	87.5
20	Hong Kong	83.7	78.8	73.2	91.1	91.9
31	Bejing, China	70.5	58.1	68.0	72.1	83.9
35	Kualalampur, Malaysia	66.3	54.4	64.4	64.7	81.8
43	Manila, Philippines	59.2	52.1	56.6	53.6	74.7
52	New Delhi, India	55.0	51.0	54.6	40.7	73.6
53	Jakarta, Indonesia	54.5	42.3	51.7	52.3	71.7
56	Dhaka, Bangladesh	44.6	41.9	45.1	34.2	57.4
57	Karachi, Pakistan	43.5	43.1	39.0	46.1	45.9

Source: Safe Cities Index 2019 by Economic Intelligence Unit

চ) নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

বাংলাদেশে নগরায়ন এবং নগরায়নের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বড় শহরগুলোতে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য, দেশের শহরগুলোতে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট নিরসনে সরকারের তেমন কার্যকর ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বেসরকারি আবাসন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো কতৃক নির্মিত আবাসন উচ্চমূল্যের কারনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে।

দেশে চলমান গৃহঋণ ব্যবস্থা স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর অনুকুলে নয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরাই কেবল এই ঋণ ভোগ করতে পারেন। তাছাড়া, প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত

নগর আবাসন ও নাগরিক সুবিধা উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

গৃহঋণের মাত্রা খুবই সীমিত, স্বল্পকালিন এবং চড়া সুদের। ২০১৬ সালের তথ্যানুযায়ী মোট ঋণের তুলনায় গৃহঋণ বাংলাদেশে ৯.১০%, ভারতে যা ১২.৪৬%, থাইল্যান্ডে ১৯.৯০%, ভূটানে ২২.৭০% এবং ইন্দোনেশিয়ায় ২৯.১৭%। দেশে গৃহঋণের পরিসর স্বল্প হওয়ার কারনে সীমিত আয়ের মানুষ নিজস্ব আবাসন ক্রয়ে আগ্রহ হারাচ্ছেন, যা দেশের আবাসন সেক্টর প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। নগরগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক আবাসন গড়ে না উঠার কারণে বেশিরভাগ মানুষ ভাড়া বাড়ির উপর নির্ভরশীল, যা নগরগুলোতে লাগামহীনভাবে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধির অন্যতম কারন।

শহরগুলোতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকের বেশি স্বল্প আয়ের মানুষ, দৈনন্দিন অর্জিত আয় দ্বারা যাদের পক্ষে কখনো নিজস্ব আবাসন ক্রয় সম্ভব নয়, যদিও স্বল্পআয়ের বিশাল সংখ্যক এ জনগোষ্ঠীই নগর অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। নগর অর্থনীতির মানোন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে নিম্নআয়ের বিশাল সংখ্যক এ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসন্মত আবাসন ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জীবনমানে উন্নয়ন আনা এখন সময়ের দাবি। কেননা, উন্নত দেশ ও জাতি গঠতে হলে মানসন্মত আবাসন সর্বাগ্রে বিবেচ্য। বৃহত্তর এ সমস্যার সমাধান একদিনে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এ সমস্যা সমাধানে সরকারের বাস্তব ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাহসী পদক্ষেপ ব্যাতিত এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও অসম্ভব।

নগর আবাসন সংকট সমাধান ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে সরকারের চলমান নীতিসমূহের পাশাপাশি নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

১. সর্বাগ্রে আগামী দশ বছরের মধ্যে নগরসমূহে বসবাসরত নিন্মআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট নিরসনে বাস্তবধর্মী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২. নগর আবাসন উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরকে আরও সম্পৃক্ত করনের মাধ্যমে এখাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. আবাসনখাতে অর্থায়ন প্রক্রিয়া আরোও সহজ করার পাশাপাশি অর্থায়নের মাত্রা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা।
৪. আবাসনখাতে অর্থায়নের সময়সীমা বৃদ্ধি ও সুদের হার ৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
৫. স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ফ্ল্যাট মূল্যের কমপক্ষে ৯০% অর্থায়ন প্রক্রিয়া চালু করা।
৬. নগর আবাসন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশের আলোকে সরকারি উদ্যোগে বানিজ্যিক ভিত্তিতে আবাসন নির্মাণ করা, যাতে নাগরিকগণ ন্যায্য দামে আবাসন ক্রয় করতে পারেন। উদাহরনস্বরুপ, ১৯৬৫ সালে হাউজিং ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য স্বল্প খরচে বাড়ী বণ্টনের মাধ্যমে মাত্র ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালে সিঙ্গাপুর আবাসন সমস্যার সমাধান করেছিলেন। ২০২০ সাল নাগাদ সিঙ্গাপুরের ৯১.৭% অধিবাসী নিজ আবাসনে বসবাস করছেন।
৭. নগরায়নের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে শহরের পরিধি বর্ধনের পাশাপাশি প্রত্যেক জেলা শহরে আবাসন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যবহ করে তোলা।
৮. নগরের বিশেষ বিশেষ স্থানে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা সম্বলিত ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং ঐ শ্রেণীর মাঝে সহজ শর্তে বণ্টন করা।

****

SIFBD

অধ্যায় : ৪.৩

নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

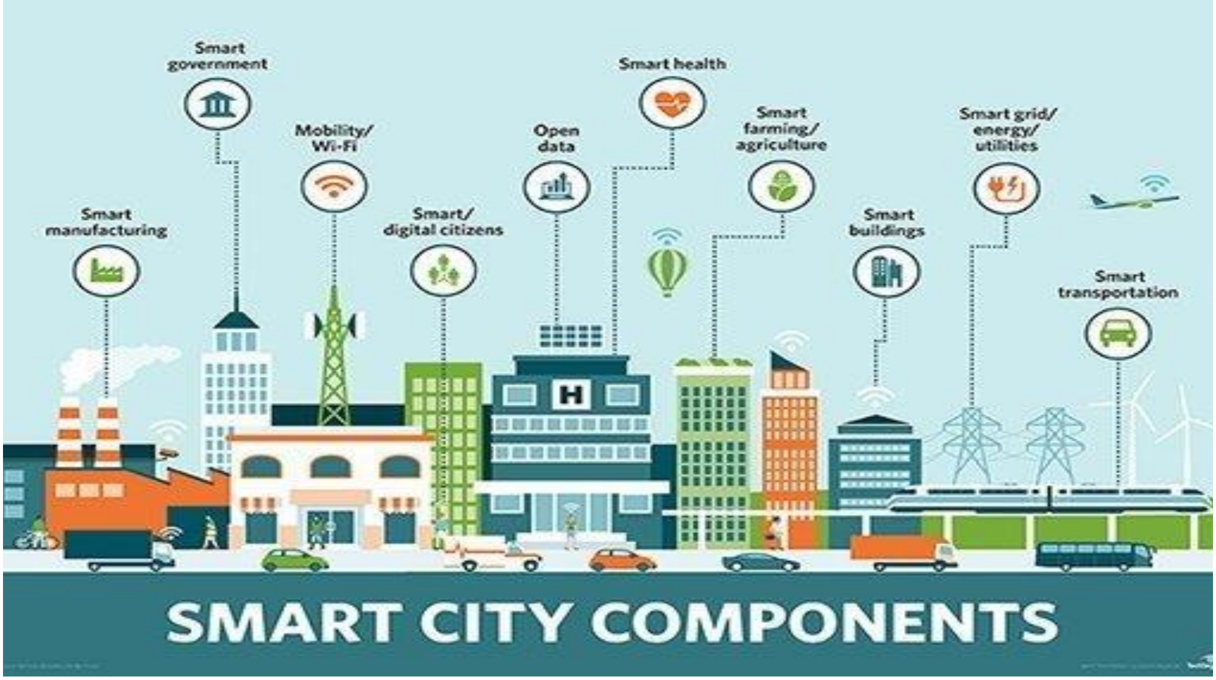

নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
খ) নগর উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব।
গ) নগর উৎপাদনশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ।
ঘ) নগর উৎপাদনশীলতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব।

ক) নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা :

নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা :

নগর অর্থনীতি মূলত নগরের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা, ব্যবসা, বানিজ্য, উৎপাদন এবং বণ্টণ ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রক্রিয়া, যা গ্রামীণ অর্থনীতির যোগসাজসে উৎকর্ষতা পায় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃহদার্থে, নগর অর্থনীতি ব্যষ্টিক অর্থনীতির শাখা, যা নগরের সামগ্রিক কাঠামো এবং নগরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সাথে সংশিষ্ট বিষয়সমূহের মূল্যায়ন করে।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করারক্ষেত্রে নগরায়ন স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন হিসাবে কাজ করে। দেশের গ্রামাঞ্চলসমূহ থেকে লোকজন পণ্য ও সেবা বিনিময়ের উদ্যেশ্যে এবং অনেকক্ষেত্রে উন্নত জীবনযাপনের আশায় স্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে শহরে আসে। শহরগুলোতে তখন বিভিন্ন পটভূমির লোকজনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সমাগম ঘটার পাশাপাশি বহুমাত্রিক পণ্য ও সেবার আদান প্রদান বৃদ্ধি পায়। পণ্য ও সেবার বহুমাত্রিকতা এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠীর সমাগমের ফলে বিভিন্ন সেক্টরে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়, ফলে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও নগর সমূহে বহুমূখি শিল্পের প্রসার ঘটে, যা নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। একটি দেশের উৎপাদনশীলতার বড় অংশ ঐ দেশের বড় শহরগুলোর উৎপাদনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সাধারণত বৃহত্তর নগরসমূহে অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রমের ব্যবহার, দক্ষতার সাথে কাজের সমন্বয়, উৎপাদনেরক্ষেত্রে শ্রমিকদের পছন্দ এবং উৎপাদনকারির আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হয়, সে কারনে বৃহত্তর নগরসমূহ অধিকতর উৎপাদনশীল হয়। এ উৎপাদনশীলতা ততক্ষণ পর্যন্ত সমৃদ্ধ হতে থাকে যতক্ষণ না শহরের জমি, শ্রম, আবাসন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রির ব্যয় এ উৎপাদনশীলতাকে ছাড়িয়ে না যায়।

খ) নগর উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব :

নগর উৎপাদন-শীলতার গুরুত্ব :

কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঐ দেশের গ্রামীণ ও নগর উৎপাদনশীলতার যৌথ সমন্বয়ে গঠিত। একটি দেশের উৎপাদনশীলতার বড় অংশ ঐ দেশের বড় শহরগুলোর উৎপাদনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত হয়, কারণ, নগর উৎপাদনশীলতা দেশের জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরাসরি অবদান রাখে এবং অর্থনীতির দ্রুত ট্রান্সফরমেশন নিশ্চিত করে। সেকারনে নগর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে শত বাধাবিপত্তি থাকা সত্বেও বিশ্বব্যাপি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্যনীয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দ্রুত নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিপূর্বক গ্রামীণ উৎপাদনশীলতার সাথে নগর উৎপাদনশীলতার সমন্বয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির দ্রুত ট্রান্সফরমেশন অত্যন্ত জরুরি।

যদিও নগরায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে আধুনিক অর্থনীতিতে রুপান্তরিত হওয়া বাংলাদেশের পক্ষে রীতিমত চ্যালেঞ্জ, তথাপি বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে নগরায়ন এবং জি.ডি.পিতে নগরখাতের অবদান দুটোই উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতীক। ১৯৭২-৭৩ সময়কালে জি.ডি.পিতে নগরখাতের অবদান ছিল ২৫.৩৬%, যা ২০১২-১৩ সময়কালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৫%। এ সময়কালে নগরখাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ০.৯৭% স্মারণী-৪.৩(১)।

বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মূলত চারটি কৌশলের উপর নির্ভর করে, যেমন-

১. বিনিয়োগের স্তর উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নগর পর্যায়ে অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
২. বাজার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নগর আবাসন ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে নগরব্যাপি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উন্নত করা।
৩. কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সম্পদ ও দায়িত্বের আরোও কার্যকর বিভাজনের মাধ্যমে পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
৪. নগর উন্নয়নে আর্থিক পরিসেবা জোরদার করা।

স্মারণী-৪.৩(১) : ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১২-১৩ সময়কালে বাংলাদেশের জি.ডি.পিতে নগর সেক্টরের অবদান :-

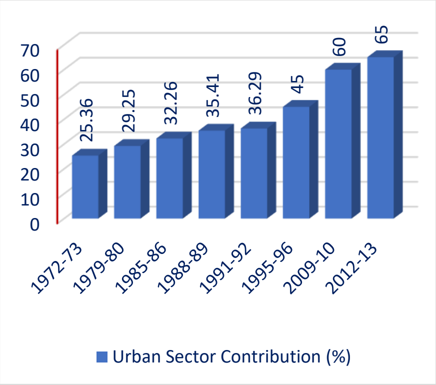

Source: Journal on Urbanization and Economic Development of Bangladesh by Sardar Syed Ahmed and Montasir Ahmed.

গ) নগর উৎপাদনশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ :

নগর উৎপাদনশীলতা হচ্ছে নগর প্রশাসন, নগর পরিকল্পণা ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যা নগর অর্থনীতির গতিপ্রবাহ বৃদ্ধি করে তোলার মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতিকে বেগবান করে। নগরের সামগ্রিক সুবিধা, যেমন- আবাসন, যাতায়াত ব্যবস্থা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা এবং নগর পরিচালনায় প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরাপত্তার যথাযথ সমন্বয়ের উপর নগর উৎপাদনশীলতা নির্ভরশীল, যার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পণা এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন।

নগর উৎপাদনশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ :

নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে নগরকে মূলত আধুনিক / স্মার্ট সিটিতে রুপান্তরের প্রয়োজন রয়েছে, কেননা স্মার্ট সিটির সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের কার্যকর উন্নয়নই নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্মার্ট সিটির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে আজো কার্যকর অগ্রগতি সাধিত হয়নি, ফলে নগর উৎপাদনশীলতার দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

নগরায়নের সুফল ভোগ করতে এবং নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রীক অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে স্মার্ট সিটি কনসেপ্ট পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিৎ। কেননা, স্মার্ট সিটি কনসেপ্ট বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে শুধু আধুনিক নগরায়নের সূচনাই হবেনা, এর ফলে গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতির অপূর্ব সমন্বয়ের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার সুযোগ প্রসারিত হবে বহুলাংশে। UN Habitat III অবলম্বনে স্মার্ট সিটি নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১. **আধুনিক নগর প্যাটার্ণ এবং নগরায়ন প্রক্রিয়া :** এ প্রক্রিয়া অনুস্মরনের ফলে নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহ, যেমন- অবকাঠামো, পরিসেবা ও নগর আবাসন উন্নয়নে বাস্তবসন্মত ও কার্যকরি উপায় অবলম্বনের পাশাপাশি নগর সমূহে জনসংখ্যার সুসম বণ্টন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে।

SJFBD

২. **উন্নত নগর প্রশাসন :** নগরে আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নত নগর প্রশাসন নিশ্চিত করতে যে সমস্ত নীতি ও কৌশলের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার ও দায়িত্ব বিকেন্দ্রিকরন, নগর প্রশাসনের নীতিমালা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে সুশীল সমাজ ও সর্বস্তরের জনসাধারনের অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা উন্নয়ন, ইত্যাদিক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন।

৩. **নগর অর্থনীতির মানসন্মত উন্নয়ন :** গ্লোবাল অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির মানসন্মত উন্নয়ন অপরিহার্য, যারজন্য প্রয়োজন নগর পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিপূর্বক নগরসমূহে দারিদ্রতা বিমোচনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করা।

৪. **কার্যকর ও দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা :** এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনীমূলক ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে নগর উন্নয়ন ও নগর সম্প্রসারণে ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। বলা বাহুল্য, দেশের মহানগর ও অন্যান্য শহরগুলোতে উন্নয়নের জন্য কার্যকর নগর পরিকল্পণা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এখনো যথেষ্ট সুসংহত নয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নগরায়ন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার উদ্যোগী হয়েছেন এবং নগর সমূহের সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫. **পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানসন্মত পরিসেবা :** পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মানসন্মত নাগরিক পরিসেবা নিশ্চিত করা আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উল্ল্যেখযোগ্য নাগরিক পরিসেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে নিরাপদ জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ও যোগাযোগ, এনার্জি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং নাগরিক জীবনমান উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জরুরি পরিসেবা সমূহ। পর্যাপ্ত নগর পরিসেবা নিশ্চিতকল্পে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন স্মার্ট সিটি বিনির্মাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

৬. **আধুনিক বর্জ ব্যবস্থাপনা :** নগর সমূহের পরিস্কার পরিচ্নন্নতা ও নগরীর পরিবেশ রক্ষায় আধুনিক বর্জ ব্যবস্থাপনা দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৭. **উন্নত নগর পরিবহন ব্যবস্থা :** সুসংহত ও সুসম নগর পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনার আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। নগর পর্যায়ে সহজ ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নগর জনসংখ্যা ও আয়তন অনুপাতে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন, ব্যাক্তিগত যানবাহন এবং গণপরিবহনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে নগরজুড়ে একটি সমন্বিত ও সুসংহত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই নীতির মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে নগরের গুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ, কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিপনিবিতান এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের ভূমিকা অগ্রাধিকার বিবেচনায় নেওয়া উচিৎ।

৮. **আধুনিক নগর আবাসন ব্যবস্থা :** দ্রুত নগরায়নের ফলে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের নগরসমূহে বর্তমানে আবাসন সংকট চরমাকার ধারণ করেছে । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জমি ও নির্মাণ সামগ্রির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এসমস্যাকে আরোও প্রকট করে তুলেছে। ফলে বর্তমানে নগরসমূহে নিজস্ব আবাসন স্বল্পআয়ের মানুষের নাগালের বাহিরে বলা চলে। নগর আবাসন সংকটের কার্যকর সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি ও বাস্তবসন্মত নগর আবাসন নীতি গ্রহনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ সেক্টরে বিনিয়োগ কয়েকগুণ বৃদ্ধিকরা প্রয়োজন। তাছাড়া, দেশে দ্রুত নগর আবাসন সংকট নিরসনে সরকারি উদ্যোগে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বানিজ্যিক ভিত্তিতে আবাসন নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

SJBD

৯. **নগর দারিদ্রতা নির্মূল :** নগর সমূহে প্রতিনিয়ত কর্মের সন্ধানে ছুটে আসা জনগোষ্ঠীর বড় অংশই স্বল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত খেটে খাওয়া স্বল্প আয়ের মানুষ। দেশের বড় শহরগুলোতে বসবাসরত মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় এক চতুথাংশ এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত, যারা নাগরিক সুবিধাবিহীন নিন্মমানের আবাসনে জীবিকা নির্বাহ করে। নগর দারিদ্রতা নিরসনে, নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং অন্যান্য পরিসেবারক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি এবং নারী ও শিশুদের প্রয়োজন ও অধিকারগুলো এক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া উচিৎ।

১০. **নগর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন :** স্বল্প পরিসরে অধিক জনসংখ্যার বসবাস, অতিমাত্রায় যানবাহন, নগরসমূহে শিল্পকারখানার বিকেন্দ্রীকরণ এবং নগর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বহুবিধ কারনে বিশ্বব্যাপি নগরসমূহে পরিবেশ দুষণ রোধ করা কঠিন হয়ে উঠেছে, যা জনস্বাস্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। নগর সমূহে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করনপূর্বক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে ভবিষ্যতে পরিবেশ অবক্ষয়ের বিকাশ ঘটাতে পারে এমন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ সমূহের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিৎ।

১১. **নগর - গ্রাম পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধিকরা :** দেশের নগর ও গ্রামাঞ্চলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ উভয়ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এটি এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কেননা, গ্রাম পর্যায়ে বসবাসরত পরিবারসমূহের একটি উল্ল্যেখযোগ্য অংশ নগর সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বানিজ্য এবং শহরে কর্মরত পরিবারের সদস্যদের আয়ের উপর নির্ভরশীল। গ্রাম পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর একটি বড় অংশ শহরে আসে, কৃষি সেক্টর প্রসারের ক্ষেত্রে যা অনন্য ভূমিকা পালন করে। শহরের দৈনন্দিন শ্রম চাহিদার বড় অংশই আসে গ্রাম থেকে, আবার শহরে উৎপাদিত অনেক পণ্যের বাজার গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত। কাজেই নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান প্রদান সমুন্নত রাখার মাধ্যমে উভয়ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

CIHRD

ঘ) নগর উৎপাদনশীলতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব :

নগর উৎপাদনশীলতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব :

নগর অর্থনীতিকে সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঞ্জিন হিসাবে চিহ্নিত করে নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিৎ। কেননা, নগর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় যুগোপযোগী নীতি ও কৌশল অবলম্বন দেশের চলমান নগরায়ন প্রক্রিয়াকে আরোও কার্যকর করে তুলতে এবং আমাদের শহরগুলোকে উন্নয়নের ইঞ্জিন হিসাবে পুরোপুরি ব্যবহারে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টেকসই নগরায়নের ফলে নগর ও গ্রামাঞ্চলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, পণ্য আদান প্রদান, শ্রমিক সরবরাহ ও ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি নগর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতি বিকশিত করার সুযোগ প্রসারিত করে। একারণে, গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতিকে সামগ্রিক অর্থনীতির দুটি স্তম্ব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এবং এ দুটি স্তম্বের যথাযথ মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহার দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করবে।

****

পঞ্চম অংশ :

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ।

অধ্যায় : ৫.১

কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
খ) বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন।
গ) জনসংখ্যার ঘণত্বে দক্ষিন এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
ঘ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম।

১) দেশে পরিবার পরিকল্পণা কার্যক্রম বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
২) বাংলাদেশে চলমান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম।
৩) জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় সি.আই.পি (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়ন।
৪) বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ক্রমবিস্তার।

ঙ) চলমান পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার কার্যকারিতা।
চ) জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান।
ছ) গ্রাম ও শহরভেদে প্রজনন হারের তারতম্য।
জ) কার্যকর জনসংখ্যা রোধে ব্যার্থতার কারণ সমূহ।
ঝ) কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য করনীয়।

ক) কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

দেশের আকার, আয়তন ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অতিমাত্রার জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্বক হুমকি। দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে বিশাল এ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান কোনো কিছুই তখন আর ঠিকমত নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনা, দেশের বেশিরভাগ মানুষ তখন অশিক্ষিত, অদক্ষ ও নিয়তি নির্ভর হয়ে বেড়ে উঠে। অশিক্ষিত ও অদক্ষ বিশাল এ জনগোষ্ঠী কর্মক্ষেত্রে যেমন অযোগ্য ও ব্যার্থ, তেমনি নিজেদের জীবনমান উন্নয়নেও তারা উদাসীন। ফলে দেশ তখন অভাব অনটন, দারিদ্রতা, হিংসা হানাহানি আর নৈতিক অবক্ষয়ের নরকে পরিণত হয়। বিশ্বের সকল ঘণবসতিপূর্ণ দেশে কমবেশি একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়, এটা সবার জানা। কাজেই কোনো দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিমিত জনসংখ্যা ঐ দেশের উন্নয়নের জন্য প্রথম শর্ত।

আয়তন, ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি অতিমাত্রার জনবহুল দেশ তা আর নতুন করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। ১৯৯১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১১১.৪৬ মিলিয়ন এবং সে সময়ে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘণত্ব ছিল ৭৫৫ জন, ২০১৮ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৪.৬০ মিলিয়ন এবং প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘণত্ব দাঁড়িয়েছে ১,১১৬ জন । এ ২৭ বছরে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ৫৩.১৪ মিলিয়ন, গড়ে বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৯৭ মিলিয়ন। ১৯৯১ সালে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%, ২০১৮ সাল নাগাদ তা কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ১.৩৩%। ২০০০ সালের পর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের নিচে নামলেও, দেশের মোট জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে, দেশের আকার, আয়তন ও সম্পদের তুলনায় যা রীতিমত ভয়াবহ স্মারণী-৫.১(১)।

অতিমাত্রার জনসংখ্যা এদেশের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য অন্যতম হুমকি, এদেশের সরকার ও জনগণ বহু আগে এ বাস্তবতা উপলব্দি করতে পেরেছে এবং দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় এযাবত পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ খাতে অগণিত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, খরছ করা হয়েছে শত শত কোটি টাকা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে দেশে এযাবত গৃহীত সরকারি, বেসরকারি ও দাতাগোষ্ঠীর পদক্ষেপ সমূহের ফলে এক্ষেত্রে কি পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, নিম্মে তা তুলে ধরা হলো।

SIFBD

স্মারণী-৫.১(১) : ১৯৯১ থেকে ২০১৮ সময়কালে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্বির ছিত্র :

সাল	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘণত্ব	গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার	দেশে জনসংখ্যা বৃদ্বির হার	গ্লোবাল পজিশন
১৯৯১	১১১.৪৬	৭৫৫	৭৬.৬৬	২.১৭	৯
২০০১	১৩০.৫২	৮৮৪	৭২.৮৬	১.৫৯	৮
২০১১	১৪৯.৭৭	১০১৫	৭৩.৭৩	১.৩৮	৮
২০১৬	১৫৯.৫৮	১০৯০	৭২.৭৫	১.৩৭	৮
২০১৮	১৬৪.৬০	১১১৬	৭২.৭৫	১.৩৩	৮

Source : BBS

স্মারণী-৫.১(২) : Graphycal presentation of Population Growth during 1991-2018 :

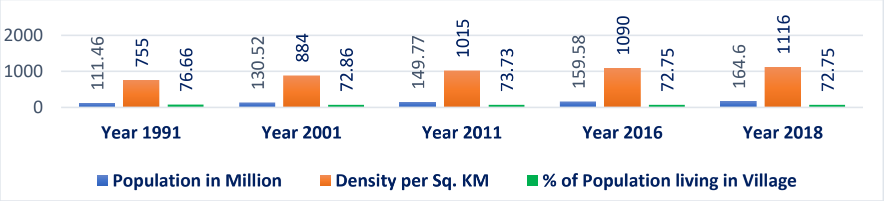

খ) বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন :

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন :

আকার ও আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ যেহেতু খুবই ছোট, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে অতিমাত্রার জনসংখ্যার কারনে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসন্ন। কেননা, প্রকৃতির রাজ্যে সবকিছুই নিয়মতান্ত্রিকভাবেই ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, কোনোক্ষেত্রে ব্যাত্যয় ঘটা মাত্রই প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে তা সমন্বয় করেন। **El-Saharty et. Al (2014) till 2051** অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়ানোর কথা ১৭৪.৮ মিলিয়ন, ২০২৬ সালে ১৮৪.৫ মিলিয়ন, ২০৩১ সালে ১৯৩.৫ মিলিয়ন, ২০৩৬ সালে ২০১.৩ মিলিয়ন, ২০৪১ সালে ২০৮ মিলিয়ন, ২০৪৬ সালে ২১৩.৫ মিলিয়ন এবং ২০৫১ সালে ২১৮.৪ মিলিয়ন, যা দেশের আকার, আয়তন, অর্থনীতি ও খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

স্মারণী-৫.১(২) : **El-Saharty et. Al (2014)** অনুযায়ী ২০৫১ সাল নাগাদ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাক্কলন :

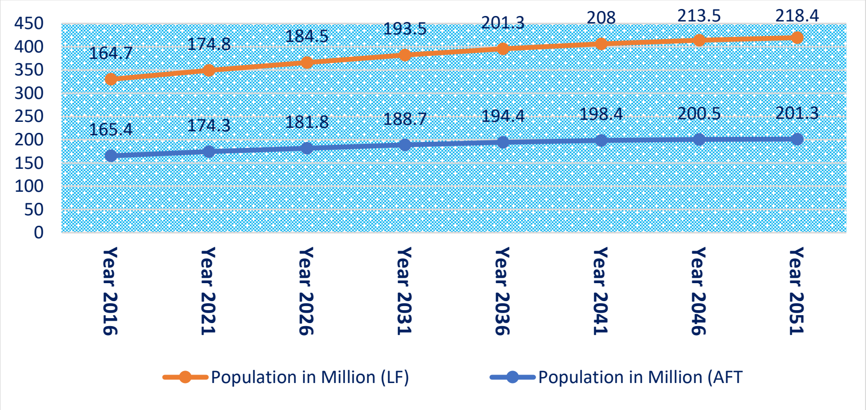

Source: BBS (Note : LF = Laissez Faire, AFT= Accelerated Fertility Transition)

গ) জনসংখ্যার ঘণত্বে দক্ষিন এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

২০১৮ সাল নাগাদ জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ায় তৃতীয় এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। এ সময়ে দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘণত্ব দাড়িয়েছে ১১১৫ জন, ঐ একই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে জনসংখ্যার ঘণত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ভারতে ৪১১, পাকিস্তানে ২৬৭, ভূটানে ২০, মিয়ানমারে ৭৯, থাইল্যাণ্ডে ১৩৫, মালয়েশিয়ায় ৯৫ এবং শ্রীলংকায় ৩৩০ জন। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি

জনসংখ্যার ঘণত্বে দক্ষিন এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘণত্ব ভারতের চেয়ে ২.৭১ গুণ, পাকিস্তানের চেয়ে ৪.১৮ গুণ, ভূটানের চেয়ে ৫৫.৭৫ গুণ, মিয়ানমমারের চেয়ে ১৪.১১ গুণ, থাইল্যাণ্ডের চেয়ে ৮.২৩ গুণ, মালয়েশিয়ার চেয়ে ১১.৭৪ গুণ এবং শ্রীলংকার চেয়ে ৩.৩৮ গুণ বেশী। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশই দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ঘণবসতিপূর্ণ দেশ স্মারণী-৫.১(৩)।

দেশের আকার, আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার বয়াবহতার দিকথেকে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং খুব দ্রুত এ বিপর্যয় ঠেকানো না গেলে আগামীতে এ দেশের পরিণতি কি হতে পারে, দেশের সচেতন জনগোষ্ঠী তা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা উচিৎ। কাজেই ভবিষ্যৎ অগ্রগতির দিকে পা বাড়াতে এবং ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণের জন্য সর্বাগ্রে কঠোরভাবে এদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন, এ বিষয়ে সবার একমত হওয়া জরুরি।

স্মারণী-৫.১(৩): ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিন এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার চিত্র :-

	Srilanka	Malaysia	Myanmar	Thailand	Bhutan	Bangladesh	Pakistan	India
Population in Million	21.67	31.53	53.71	69.43	75	164.6	212.22	1352.62
Density per Sq. KM	330	95	79	135	20	1,115	267	411
Population Growth Rate	1	1.4	0.6	0.3	1.2	1.1	2.1	1

Population in Million   Density per Sq. KM   Population Growth Rate

Source : World Bank

ঘ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম :

১) দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে বিকশিত হয়েছে, যা ১৯৫০ এর দশকে স্বেচ্ছাসেবী এবং আধা-সরকারি পর্যায়ে একদল সামাজিক ও চিকিৎসা কর্মীদের দ্বারা শুরু হয়েছিল। সরকার সম্প্রসারিত ক্লিনিক ও মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল মূলতঃ ১৯৬০ এর দশকে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে জনসংখ্যার কার্যকর নিয়ন্ত্রণে ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে MCH ভিত্তিক FP পরিসেবা কার্যক্রম চালু করা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম :

হয়। ১৯৯০ এর দশকের শেষদিকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টরের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি সেক্টর ভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (SWAp) চালু করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল সর্বস্তরের জনগণের জন্য বিশেষ করে মহিলা, শিশু, প্রবীণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রতি জবাবদিহিতা মূলক এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি পরিসেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে HPNSDP (2011-2016) তৃতীয় SWAp ডিজাইন করা হয়, যে প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি পরিসেবাদির অ্যাক্সেস এবং ব্যবহারের অগ্রগতির মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য মানসন্মত ও ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্য পরিসেবা নিশ্চিত করা।

২) বাংলাদেশে চলমান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম :

দেশব্যাপি গর্ভনিরোধক পদ্ধতিগুলো সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি সেক্টর মূখ্য ভূমিকা পালন করছে এবং এক্ষেত্রে সরকারী সেক্টর কতৃক সরবরাহের পরিমাণ মোট ব্যবহারের প্রায় ৪৯ শতাংশ, যারমধ্যে সরকারী মাঠকর্মীদের দ্বারা সরবরাহ হয় ২০%, বেসরকারি পর্যায়ে সরবরাহের পরিমাণ ৪৭ শতাংশ এবং বিভিন্ন এন.জি.ও সমূহ কতৃক সরবরাহ মোট ব্যবহারের ৪ শতাংশ। যদিও গর্ভনিরোধক পদ্ধতিগুলোর প্রধান সরবরাহকারী সরকারি সেক্টর, তবে এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ২০০৪ সালে ৩৬ শতাংশ থেকে ২০১৪ সাল নাগাদ ৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (BDHS 2014)। প্রতি পাঁচ জন পিল ব্যবহারকারীর মধ্যে দুই জন (৩৮%) এবং প্রতি পাঁচজন কনডম ব্যবহারকারীর মধ্যে তিনজন (৬০%) সামাজিকভাবে বিপণিত ব্রান্ড ব্যবহার করেন (BDHS 2011) । সোস্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এস.এম.সি), একটি অলাভজনক সামাজিক বিপনন সংস্থা, বেসরকারি আউটলেট গুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের নিজস্ব ব্রান্ডের বড়ি, কনডম, ইনজেকশন ইত্যাদি ভূর্তুকি মূল্যে বিক্রয় করে আসছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে অনেক এন.জি.ও মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে দেশব্যাপি পরিবার পরিকল্পনা পরিসেবা সরবরাহে জড়িত রয়েছে।

৩) জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় সি.আই.পি (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়ন :

কষ্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান (সি.আই.পি) নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে গঠিত যা ব্যয়সংকোচন উপায়ে জাতিয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন। জুলাই ২০১২ সালে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত লন্ডন সন্মেলনে (FP 2020) বাংলাদেশ সকল যোগ্য দম্পতির (ELCO) বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য মানসন্মত ও ন্যায্য পরিবার পরিকল্পনা পরিসেবাগুলির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করনের সামগ্রিক লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লন্ডন শীর্ষ সন্মেলনের প্রতিশ্রুতি এবং ঐ সন্মেলনের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে :-

- বাংলাদেশে শহর ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে LAPMs এর ব্যবহার এবং পরবর্তী সেবা সমূহ এবং গর্ভপাত পরবর্তী পরিসেবাদিতে অ্যাক্সেস ও ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
- যুবক শ্রেণী, বিশেষ করে তরুন দম্পতিদের চাহিদা মিটাতে সরকার বেসরকারি খাত এবং এন.জি.ওদের সমন্বয়ে কাজ করবে। বাল্য বিবাহ রোধ ও দেরিতে সন্তান নিতে নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি ও সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।
- মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য ((MNCH) কেন্দ্রের এক তৃতীয়াংশ কিশোর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) পরিসেবা সরবরাহ করবে।
- পরিসেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সন্মতি এবং পছন্দের বিষয়গুলোর তদারকি করার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনার ব্যবহার অব্যাহত রাখতে মহিলাদেরকে সহায়তা দেওয়া।

এফ.পি-২০২০ শীর্ষ সন্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত

পদ্ধতি সমূহের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সি.আই.পি (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা নির্দিষ্ট কার্যক্রমের উপর FP- 2020 এর লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

৪) বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ক্রমবিস্তার :

১৯৫০ এর দশকে স্বেচ্ছাসেবী ও আধা-সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে শুরু হওয়া পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জনসংখ্যার পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমগুলি বেশ কয়েকটি কার্যকর প্রোগ্রাম সহ সারা দেশে বিস্তৃত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিগত দশকগুলিতে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে, বিশেষ করে ২০১০-২০২০ সময়কালে এক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মোট প্রজনন হার ১৯৭৫ সালে যেখানে প্রতি নারীর বিপরীতে ছিল ৬.৩ জন, ২০১৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি নারীর বিপরীতে ২.০৫ জনে, যা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারনের সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলে ধরা হলো :-

Period	Activities
1953-1959	**: Voluntary and semi-government efforts.**
1960-1964	**: Government sponsored clinic-based Family Planning Program.**
1965-1970	**: Field-based Government Family Planning Program**
1972-1974	**: Integrated Health & Family Planning Program.**
1975-1980	**: Maternal and Child Health (MCH)-based Multi-sectoral Program.**
1980-1985	**: Functionally Integrated Program.** Delivery of MCH-FP services were functionally integrated with Health at Upazila level and below.
1985-1990	**: Intensive Family Planning Program.** A broad-based multi-dimensional intensive MCH-based family planning program was launched.
1990-1995	**: Reduction of rapid growth of population through intensive service delivery and community participation with the following objectives :-** • Expansion of MCH-FP service delivery with enhanced quality of care. • Increased resource allocation for program implementation. • Promoting family planning as an integral part of development activities through inter-sectoral collaboration. • Mobilizing community support and participation. • Increased involvement of NGOs and private sectors for supplementing and complementing government efforts. • Enhancing women's status through education and participation in social, economic and political life.
1998-2003	**: Health and Population Sector Program (HPSP)**
2003-2011	**: Health, Nutrition and Population Sector Program (HNPSP)**
2011-2016	**Health, Nutrition and Population Sector Development Program (HNPSDP) with the following** key components :- (i) Improving health services, which is divided into two sub-components: a. Improving health services b. Improving service provisions **(ii)** Strengthening the health system
2016-2020	**CIP Implementation.**

Source : DG of Family Planning

ঙ) চলমান পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার কার্যকারিতা :

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চলমান জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা :

জনসংখ্যা রোধকল্পে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহু আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে, যদিও এ বিষয়ে প্রচার প্রচারনা বেশিরভাগই শহরভিত্তিক। গ্রামের পরিবার গুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের প্রচলন এখনও শহরের পরিবারগুলোর তুলনায় অনেক কম।

২০০৫-২০১৮ সময়কালে দেশে বিবাহিত নারী পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের হার বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০০৫ সালে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের হার ছিল সমগ্র দেশে ৫৭.৮%, গ্রামে ৫৫.২% এবং শহরে ৬০.৪%। ২০১৮ সাল নাগাদ জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের হার দাঁড়িয়েছে সমগ্র দেশে ৬৩.১%, গ্রামে ৬২.৪% এবং শহরে ৬৪%। ২০০৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৩ বছরের ব্যবধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে সমগ্র দেশে ৫.৩%, গ্রামে ৭.২% এবং শহরে ৩.৬%, বাংলাদেশের মত একটি অতিমাত্রার জনবহুল দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যা মোটেও যথেষ্ট নয়। বলা বাহুল্য, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের এ হার সাধারণত ৭৫% - ৮৫%। বাংলাদেশে জনসংখ্যার উর্ধ্বগতির কার্যকর রোধে জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থা অবলম্বনের হার ৮৫% - ৯০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যান্তর নেই স্মারণী-৫.১(৪)।

SJBD

স্মারণী-৫.১(৪) : ২০০৫ থেকে ২০১৮ সময়কালে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের চিত্র :

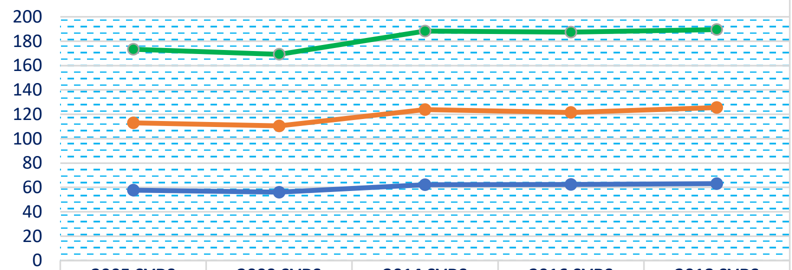

	2005 SVRS	2009 SVRS	2014 SVRS	2016 SVRS	2018 SVRS
Urban	60.4	58.7	64.5	65.9	64
Rural	55.2	54.4	61.6	59.3	62.4
National	57.8	56.1	62.2	62.3	63.1

Source: BBS

চ) জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

মহিলাদের আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের দিকথেকে বাংলাদেশ এখনো বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৯ সালের র‍্যাংকিং অনুযায়ী মহিলাদের আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে ১৮২ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭০ তম। ঐ তালিকায় সিঙ্গাপুর ৬৫, ইন্দোনেশিয়া ৫৩, ভিয়েতনাম ৪০, ভূটান ৩৯, দ. কোরিয়া ৩৪, থাইল্যান্ড ১৩, কম্বোড়িয়া ১২ এবং চীন ৪র্থ স্থানে রয়েছে। (Indexmundi)

তাছাড়া, সবধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৫-১৬ সময়কালের তথ্যানুযায়ী সবধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের হার বাংলাদেশে ৬২.৩% মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, যেমন- স্পেনে এ হার ৭০.৯%, ভিয়েতনামে ৭৫.৭%, আমেরিকায় ৭৫.৯%, থাইল্যান্ডে ৭৮.৪%, দ. কোরিয়ায় ৭৯.৬%, চীনে ৮৪.৫% এবং ফিনল্যান্ডে ৮৫.৫% স্মারণী-৫.১(৫)।

স্মারণী-৫.১(৫) : ২০১৫-১৬ সময়কালে বাংলাদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহনের হার :-

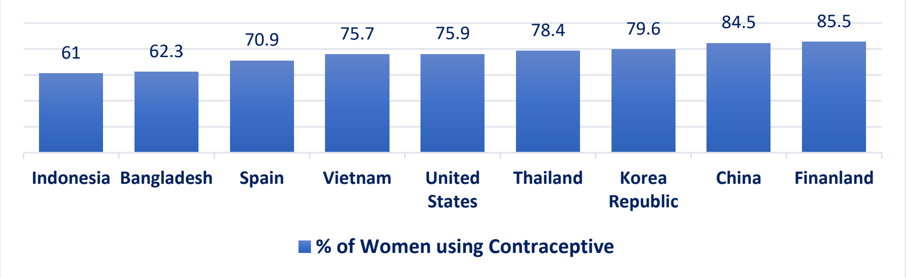

Source : World Bank Report

ছ) গ্রাম ও শহরভেদে প্রজনন হারের তারতম্য :

বাংলাদেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা শহরাঞ্চলের মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি। একেতো দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৩% এর বসবাস গ্রামে, তারউপর গ্রামের মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় শহরের তুলনায় গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও পরিমাণ দুটোই যথেষ্ট বেশি, যা দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। ২০১০ থেকে ২০১৮ সময়কালের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১০ সালে সারাদেশে মহিলাদের মোট প্রজনন

গ্রাম ও শহরভেদে প্রজনন হারের তারতম্য :

হার ২.১২%, গ্রামে ২.২৬% এবং শহরে ১.৭২%। এ সময়ে প্রজনন হার শহরের তুলনায় গ্রামে ০.৫৪% বেশি। ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী প্রজনন হার সারাদেশে ২.০৫%, গ্রামে ২.৩৮% এবং শহরে ১.৬৮%। এ সময়ে প্রজনন হার শহরের তুলনায় গ্রামে ০.৭০% বেশি। এ ৮ বছরের ব্যবধানে প্রজনন হার জাতিয় ও শহর পর্যায়ে কিছুটা হ্রাস পেলেও গ্রাম পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.১২%।

স্মারণী-৫.১(৬) : ২০১৪ থেকে ২০১৮ সময়কালে দেশে মোট প্রজনন হার (%) হ্রাস বৃদ্ধির চিত্র :

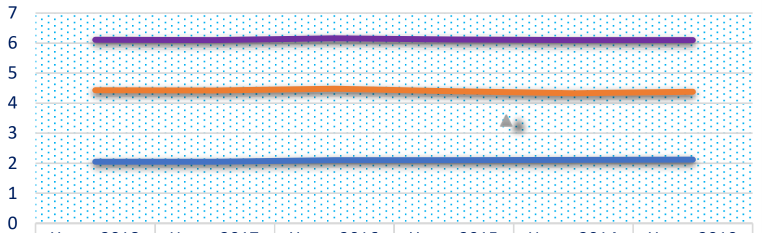

	Year : 2018	Year : 2017	Year : 2016	Year : 2015	Year : 2014	Year : 2010
Urban	1.68	1.68	1.68	1.72	1.77	1.72
Rural	2.38	2.37	2.38	2.3	2.22	2.26
National	2.05	2.05	2.1	2.1	2.11	2.12

Source: BBS

জ) কার্যকর জনসংখ্যা রোধে ব্যার্থতার কারণ সমূহ :

কোনো দেশের জনসংখ্যা তখনই আশির্বাদ হিসাবে কাজ করে যখন দেশের আকার, আয়তন ও সম্পদের সাথে জনসংখ্যার সামঞ্জস্যতা থাকে এবং ঐ জনসংখ্যাকে শিক্ষায় ও দক্ষতায় জনসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়। সামগ্রিক সামর্থের বিচারে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও পরিমাণ দুটোই অস্বাভাবিক রকম বেশি, যাদের একটি বড় অংশই মানসন্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভরনপোষণের দিকথেকে পিছিয়ে পড়ছে, যারা জনসম্পদের পরিবর্তে প্রতিনিয়ত জনসমস্যায় পরিণত হচ্ছে এবং দেশে দারিদ্রতার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

এ সমস্যার কার্যকর সমাধানে বিগত সরকারসমূহ এমনকি বর্তমান সরকারও বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং করছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে আজোও আশানুরুপ ফল অর্জিত হয়নি। ফলে ক্রমবর্ধমান এ জনসংখ্যার যথাযথ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতপূর্বক একটি মানসন্মত জাতি হিসাবে গড়ে তোলা ভবিষ্যতে এদেশের জন্য একটি অমিমাংশিত চ্যালেঞ্জ এ বিষয়ে দ্বিমতের সুযোগ নেই।

কার্যকর জনসংখ্যা রোধে ব্যার্থতার কারণ সমূহ :

দেশে কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিগত ও বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা আশানুরুপ না হওয়ার অন্যতম কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে :-

১. জনসংখ্যা রোধে দেশে প্রচলিত ব্যবস্থা মূলত হালকা প্রচার প্রচারণা ভিত্তিক, শহরেই শুধুমাত্র যার আধিক্য চোখে পড়ে। মফঃস্বলে কিংবা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই প্রচারণা অত্যন্ত সীমিত। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বেশিরভাগ পরিবারগুলো পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

২. বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির যথাযথ ব্যাবহার সম্পর্কে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ আজো যথেষ্ট অবগত নয়। ব্যবহারের অজ্ঞতার কারণে বেশিরভাগ পরিবার গুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে হয় তারা ভয় পায় অথবা এড়িয়ে চলে। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর উচ্চ মূল্যের কারনেও অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

৩. গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রির অপ্রতুলতা।

৪. পরিবোরে সদস্যসংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে সীমিত রাখার আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত এবং দরিদ্র অথবা হতদরিদ্র পরিবারগুলো পরিবার সীমিত রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, যা দেশে অস্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৫. অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতার কারনেও বহু পরিবার জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

ঝ) কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য করনীয় :

ছেলে কিংবা মেয়ে দুই সন্তানই যথেষ্ট।

২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। ১৯৬৫ সাল নাগাদ এ অবস্থান ছিল ১২ তম এবং ১৯৬৬-২০০০ সময়কালে ৯ তম। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ দ্রুত বিশ্বে অতিমাত্রার জনবহুল দেশে পরিণত হচ্ছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২% এর উপরে, ২০২০ সাল নাগাদ তা কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ১.০৪%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশে এখনো দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। ২০১৫-২০২০ সময়কালে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.০৪%, এ সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে থাইল্যান্ডে ০.২২%, তাইওয়ানে ০.২৮%, শ্রীলংকায় ০.৩৫%, দ. কোরিয়ায় ০.৩৬% এবং চীনে ০.৩৯% (উইকিপিডিয়া)।

জনসংখ্যার দিকথেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ হলেও, সম্পদ, সামর্থ ও অন্যান্য পরিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় অযাচিত এ জনসংখ্যা বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ অস্বাভাবিক গতি যে কোনো মূল্যে নিয়ন্ত্রণ করা অবধারিত হয়ে পড়েছে। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে

কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য করনীয় :

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ঝুকি, সামাজিক স্থিতিশীলতা সহ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় ধরনের বিপর্যয় রোধ করা কঠিন হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সামগ্রিক বিবেচনায় দেশে কার্যকর জনসংখ্যা রোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

১) বিয়ের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে ছেলের বয়স ২৫ এবং মেয়ের বয়স ২০ নির্ধারণ পূর্বক জন্ম নিবন্ধন ও শিক্ষা সনদ প্রদর্শনপূর্বক সিটি কর্পোরেশন / উপজেলা অফিস থেকে বিয়ের অনুমতিপত্র সংগ্রহের বিধান চালু করা।

২) প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সরকার নির্ধারিত বাধ্যতামূলক একাডেমিক ও কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করার উপর কড়াকড়ি আরোপের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপ্তের পূর্বে যাতে কোনো নাগরিক বিয়ের ছাড়পত্র না পায় সে ব্যবস্থা চালু করা।

৩) প্রজনন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, সন্তান লালন পালন ও অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিষয় সমূহ শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ পায়।

৪) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে আইনগত শাস্তির পাশাপাশি সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার বিধান চালু করা।

৫) শহরের বস্তি এলাকা এবং গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

৬) গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট ও NGO সমূহের সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর যথাযথ ব্যাবহার, সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, পরিবার সীমিত রাখার সুবিধা সমূহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ আইনের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৭) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা।

৮) পরিবারে সন্তান সংখ্যা ২ (দুই) জনে সীমাবদ্ধ রাখার আইনগত বাধ্যবাদকতা আরোপ করে টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো, যাতে মানুষ প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত হয়ে পরিবার ছোট রাখাতে সচেষ্ট হয়।

৯) গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের মাঝে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ ও প্রচার প্রচারণা চালানো।

১০) সরকারি আইন অমান্য করে দুইয়ের অধিক সন্তান নেয়া পরিবার সমূহকে শাস্তি স্বরুপ সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ করার পাশাপাশি অতিরিক্ত সন্তানের উপর করারোপ সহ অন্যান্য শাস্তির বিধান চালু করা যেতে পারে।

১১) উপজেলা তথ্যভান্ডার চালু করার মাধ্যমে উপজেলার আওতাভূক্ত প্রতিটি পরিবারের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবছর হালনাগাদ করা, যাতে প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যা, উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি, মাসিক আয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

****

SIHBD

অধ্যায় : ৫.২

কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা।

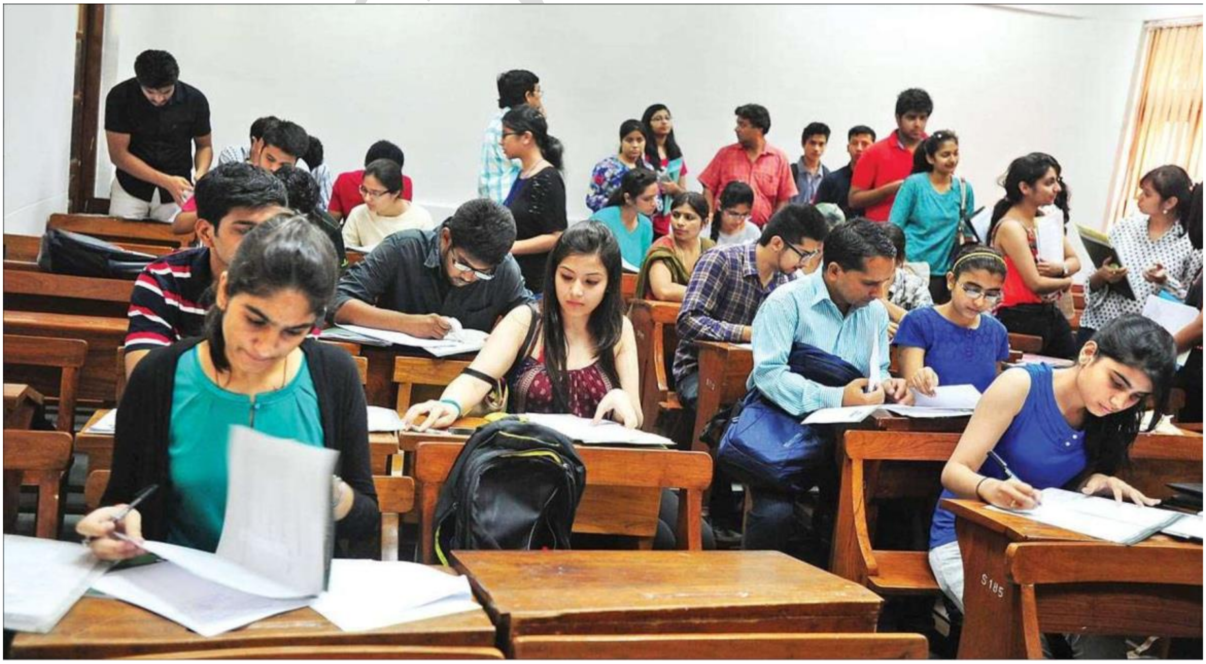

কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা।
খ) দেশে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি।
গ) টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার।
ঘ) টার্সিয়ারি নিবন্ধনে বিশ্বে বাংলাদেশর অবস্থান।
ঙ) টার্সিয়ারি শিক্ষায় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহনের তুলনামূলক হার।
চ) উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার।
ছ) টার্সিয়ারি পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম।
    ১) দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গবেষণা কার্যক্রম।
    ২) বাংলাদেশে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের মানদন্ড।
    ৩) সীমিত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম।
    ৪) গবেষণা ফলাফল বানিজ্যিকীকরনে পিছিয়ে থাকা।
জ) শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান জটিলতা।
ঝ) টার্সিয়ারি শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়।
ঞ) দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সমূহ।
চ) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যববস্থা প্রচলনে প্রস্তাবনা।

ক) কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা :

কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা :

দারিদ্র ও অসাম্য দূরীকরন এবং জীবন মান উন্নয়নে শিক্ষা অন্যতম শক্তিশালি মাধ্যম হিসাবে বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। কোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি অনশীকার্য, কেননা, উন্নত দেশ গঠতে উন্নত জাতি এবং উন্নত জাতি গঠতে মানসন্মত শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ এখনো মানসন্মত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। মানসন্মত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে অন্যান্য দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে এগিয়ে চলা, যে ক্ষেত্রগুলি মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। সম্প্রতি UNDP প্রকাশিত Global Knowledge Index (GKL) 2020 অনুযায়ী ১৩৮ দেশের তালিকায় বাংলাদেশর অবস্থান ১১২ তম, যে তালিকায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সাতটি ক্ষেত্রে, যেমন- pre-university education, technical and vocational education and training, higher education, research, development and innovation, information and communications technology, economy and the general enabling environment মূল্যায়নের সকলক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের পিছনে অবস্থান করছে স্মারণী-৫.২(১)।

SJIBD

সাপ্রতিক সময়গুলোতে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ এখন দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে সারাবিশ্বে আলোচিত। আরোও আশার খবর হচ্ছে সহসাই বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের দেশের কাতার ছেড়ে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে স্থান পেতে যাচ্ছে। ফলে তখন দেশি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকগুণ বাড়বে, পাশাপাশি বাড়বে উৎপাদনশীল খাতে শিল্প কারখানার সংখ্যা এবং সার্ভিস সেক্টরের আকার ও আয়তন। দেশে তখন বিজ্ঞান, গবেষনা ও শিল্পায়নের প্রয়োজনে প্রচুর উচ্চ কারিগরি দক্ষতার লোকজন এবং ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে প্রচুর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত জনবলের প্রয়োজন পড়বে।

কাজেই, দেশে বিজ্ঞান, কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসন্মত ও কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, গবেষণা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষিত জনবল তৈরি হয়, ভবিষ্যতে যারা দেশের প্রয়োজন মেটাবে, অন্যথায় কাঙ্কিত অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। তাছাড়া, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কর্মমূখী শিক্ষার বিকল্প নেই এটাই বাস্তব।

সারণী-৫.২(১) : Global Knowledge Index 2020 অনুযায়ী মূল্যায়নকৃত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সাতটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের অবস্থান :-

Rank	Country	Global Knowledge Index	Pre-university education	Technical & Vocational Education and Training	Higher Education	Research, Development & Innovation	Information & Communication Technology	Economy	General Enabling Environment
7	Singapore	69.2	75.2	60.2	56.0	53.3	85.9	76.6	81.3
12	Japan	66.2	75.5	61.0	50.5	63.2	83.2	56.2	77.5
19	S. Korea	64.4	72.7	57.7	45.3	63.3	83.4	60.6	69.5
31	China	57.4	76.9	65.2	38.9	44.4	61.4	57.7	57.6
33	Malaysia	55.6	65.8	53.9	45.6	33.1	70.3	57.3	66.7
53	Thailand	48.3	59.3	44.9	37.3	25.7	59.6	53.8	61.8
60	Philippines	46.6	60.0	54.9	38.7	22.8	53.8	43.2	56.3
66	Vietnam	45.6	63.1	49.3	30.9	23.1	49.2	48.4	60.5
75	India	44.4	49.9	55.7	38.9	27.3	52.1	40.6	47.5
81	Indonesia	43.3	53.9	44.7	35.6	15.4	55.7	45.5	57.1
82	Sri Lanka	42.1	69.8	43.7	30.8	17.3	46.1	33.0	60.2
94	Bhutan	40.9	60.3	46.1	33.6	14.9	45.1	33.6	58.3
110	Nepal	36.2	69.6	28.3	31.4	12.4	34.1	32.3	49.5
111	Pakistan	35.9	46.9	42.7	38.7	16.0	37.4	32.0	38.5
112	Bangladesh	35.9	43.9	49.0	24.1	16.4	43.1	31.5	46.4

Source : UNDP Report 2020

খ) দেশে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি :

দেশে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি :

বর্তমান সরকার দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুতারোপ করেছেন এবং ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ” National Skills Development Policy 2011” এবং “Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh 2018–2030” প্রনয়ন করেছেন এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল পর্যায়ে এ পরিকল্পণার আওতায় উন্নয়নের জোর চেষ্টা চলছে। টার্সিয়ারি লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১৮ সাল নাগাদ সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৫টি, যারমধ্যে ১০৩টি বেসরকারি এবং ৪২টি সরকারি, যেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বমোট ১.০৩ মিলিয়ন। ঐ সময়ে দেশে ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্স লেভেল কলেজের সংখ্যা ১,৮৯২টি, যারমধ্যে বেসরকারি ১,৪৩০টি এবং সরকারি ৪৬২টি, যেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বমোট ৩.৫৪ মিলিয়ন। ঐ একই সময়ে সারাদেশে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের সংখ্যা ৪৩৯টি, যারমধ্যে ৩৮৭টি বেসরকারি এবং ৫২টি সরকারি, যেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ০.২৫ মিলিয়ন।

২০১০-২০১৮ এ ৯ বছরের ব্যবধানে দেশে টার্সিয়ারি লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুটোই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,৬৭৫টি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১.৫৭ মিলিয়ন, ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৪৭৬টি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪.৮২ মিলিয়ন। এ ৯ বছরের ব্যবধানে টার্সিয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮০১টি, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৯টি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ৩.২৫ মিলিয়ন (২০৭%), বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬১,১১১ জন।

স্মারণী-৫.২(২) : ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে টার্সিয়ারি লেভেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা :-

Category	2018			2010		
	Institutions	% of Private	Students (Million)	Institutions	% of Private	Students (Million)
University	145	71	1.03	82	39	0.46
College : Degree (Pass) – 1,121 Degree (Honors) 596 Masters College 175	1,892	75.56	3.54	1,388	45	1.01
Polytechnic Institute	439	88.15	0.25	205	57	0.10
Total :	**2,476**		**4.82**	**1,675**		**1.57**

Source : Banbeis

গ) টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার :

টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার :

উন্নত জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশে উচ্চশিক্ষার হার সর্বাধিক, আর উচ্চশিক্ষিত জাতিই উন্নত দেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, প্রশাসন, অর্থনীতি ও গবেষণা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন উচ্চশিক্ষা। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উদীয়মান অর্থনীতির দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সকল পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার হার উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে উচ্চশিক্ষার ধরন হওয়া উচিৎ কর্মমূখী এবং উচ্চশিক্ষা সমাপ্তকারি জনসংখ্যার সাথে মিল রেখে দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা অপরিহার্য, অন্যথায় দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা মানুষকে উচ্চশিক্ষা বিমূখ করে তুলবে।

স্বাধীনতার পর থেকে ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একদমই পিছিয়ে পড়ে। তবে ২০০০ সালের পর থেকে দেশে ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার বাড়তে থাকে এবং ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালে দেশে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার ছিল ২.১৩%, ২০০০ সাল নাগাদ তা ছিল ৫.৬৩% এবং ২০১৯ সাল নাগাদ যা দাঁড়িয়েছে ২৪.০২%। স্মারণী-৫.২(৩).

স্মারণী-৫.২(৩) : ১৯৭০-২০১৯ সময়কালে দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনে অগ্রগতির চিত্র :

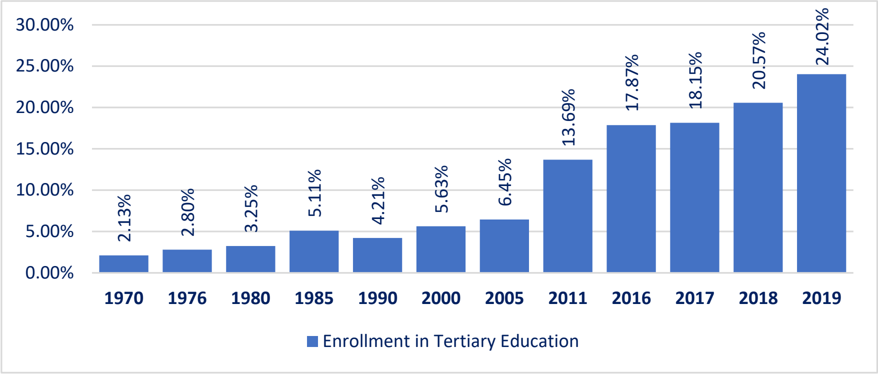

Source: World bank Data

ঘ) টার্সিয়ারি পর্যায়ে নিবন্ধনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অদ্যাবধি অনেক কম। UNESCO র‍্যাংকিং ২০১৮ অনুসারে টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার বাংলাদেশে ২০.৫৭%, ভারতে ২৮.০৬%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৬.৩১%, মালয়েশিয়ায় ৪৫.১৩%, চীনে ৫০.৬০%, কম্বোডিয়ায় ৫৫.৩৩%, হংকং এ ৭৬.৯২%, সিঙ্গাপুরে ৮৪.৮৯% এবং দ. কোরিয়ায় ৯৪.৩৫%। ঐ র‍্যাংকিং অনুযায়ী টার্সিয়ারি শিক্ষায় বিশ্বে ১৮২ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১১ তম। এ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে ভারত ৯৬, ইন্দোনেশিয়া ৮৪, মালয়েশিয়া ৭৩, চীন ৬৫, কম্বোডিয়া ৫৬, হংকং ২৭, সিঙ্গাপুর ১৭ এবং দক্ষিণ কোরিয়া ৫ম স্থানে অবস্থান করছে।

স্মারণী-৫.২(৪) : ২০১৮ সালের UNESCO র‍্যাংকিং অনুযায়ী টার্সিয়ারি শিক্ষায় বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান এবং এক্ষেত্রে মোট নিবন্ধনের হার :-

টার্সিয়ারি পর্যায়ে নিবন্ধনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

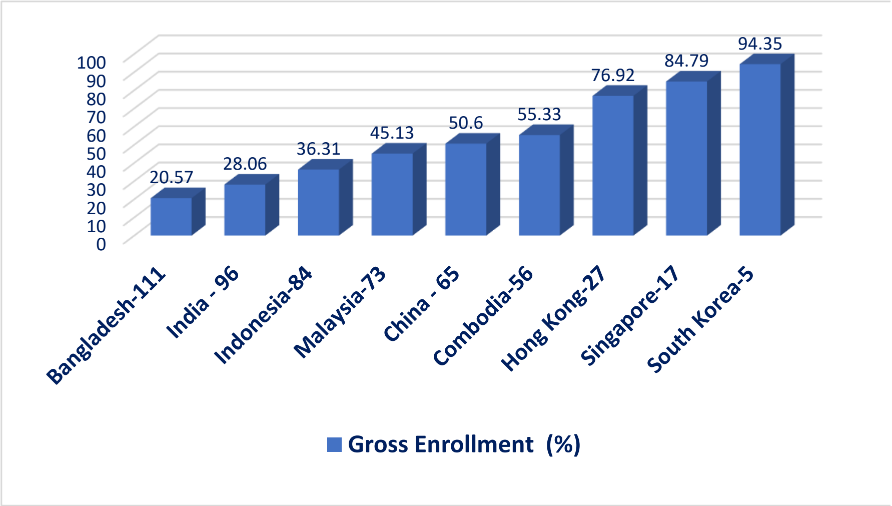

Source: UNESCO Report

টার্সিয়ারি শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর তুলনামূলক অংশগ্রহণ :

ঙ) টার্সিয়ারি শিক্ষায় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের তুলনামূলক হার :

যদিও বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি টার্সিয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী নিবন্ধনের হার পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের এ হার এখনও যথেষ্ট কম। তাছাড়া Tertiary Level সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর হার প্রায় অর্ধেক। LFS 2016-17 এর রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময়ে দেশে Tertiary Level সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার জাতিয়ভাবে ৪.২%, তন্মধ্যে পুরুষ ৫.৮% ও নারি ২.৬%। গ্রামে এ হার ২.৩%, তন্মধ্যে পুরুষ ৩.৫% ও নারি ১.২% এবং শহরে ৮.৬%, তন্মধ্যে পুরুষ ১১.৫% ও নারি ৫.৯%। তাছাড়া, Tertiary Level সমাপ্তকারি জনসংখ্যার হার শহরের তুলনায় গ্রামে এক তৃতীয়াংশেরও কম এবং গ্রামে Tertiary Level সমাপ্তকারি পুরুষের তুলনায় নারী মাত্র এক তৃতীয়াংশ।

স্মারণী-৫.২(৫) : ২০১৬-১৭ সময়কালে দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষা সমাপ্তকারি শিক্ষার্থীর হার :

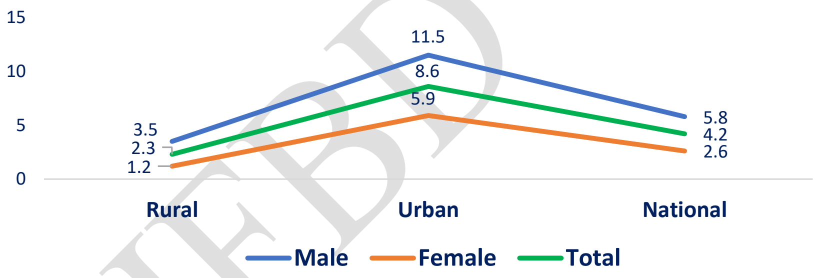

Source : **LFS 2016-17**

CIFBD

চ) উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার :

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি আরোও বেগবান ও শক্তিশালি করতে এবং উন্মুক্ত অর্থনীতির এ যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দেশে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি খাতে প্রচুর দক্ষ জনবল তৈরী করা জরুরি। ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরনে এ প্রয়োজন ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকতর হবে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে অদ্যাবধি ছাত্রছাত্রী নিবন্ধনের হার অপ্রত্যাশিতভাবে কম, বিশেষ করে পাবলিক বিশ্বদ্যিালয় সমূহ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

২০১৬-২০১৮ সময়কালে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার পর্যালোচনায় দেখা যায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এ হার ২০১৬ সালে ১০.৯১%, ২০১৭ সালে ১১.২৮% এবং ২০১৮ সালে ১০.৩৯%, গড়ে যা ছিল ১০.৮৬%। ঐ একই সময়কালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার ২০১৬ সালে ৩২.৬২%, ২০১৭ সালে ৩৪.৫০% এবং ২০১৮ সালে ৩৮.৪৫%, গড়ে যা ছিল ৩৫.১৯%। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে এবং প্রতিবছর অগ্রগতি হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার :

স্মারণী-৫.২(৬) : ২০১৬-২০১৮ সময়কালে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার :-

Particulars	2016	2017	2018
Public Universities :			
No. of University	37	37	40
No. of Students enrolled	28,97,688	32,18,184	36,06,724
Enrolled in Science, Engr. and technology	316,114	363,036	374,659
% of students in Science and technology	10.91	11.28	10.39
Private Universities :			
No. of University	95	95	103
No. of Students enrolled	337,157	354,333	361,792
Enrolled in Science and technology	109,979	122,256	139,093
% of students in Science and technology	32.62	34.50	38.45

Source : UGC annual report .

ছ) টার্সিয়ারি পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম :

১) দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গবেষণা কার্যক্রম :

দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বব্যাপি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গবেষণা কার্যক্রম শিক্ষার মান ও পরিধি প্রসারের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বড় আকারের ভূমিকা রেখে আসছে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার মাত্রা পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় এখনো অনেক সীমিত পর্যায়ে রয়ে গেছে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের হার গড়ে বছরে ১৬৫টি। অবশ্য ২০০০ সালের পর থেকে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং ২০১৫ সাল নাগাদ দেশে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে গড়ে বছরে প্রায় ৩০০৪টি (স্মারণী-৫.২(৭)।

এ অগ্রগতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা অনুপাতে গবেষণা ফলাফল প্রকাশের হার বাংলাদেশে এখনো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। ২০১৫ সালে বাংলাদেশে প্রতি ১ মিলিয়ন জনসংখ্যার বিপরীতে গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হয় ২০টি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে, যেমন নেপালে এ সংখ্যা ৩১, পাকিস্তানে ৫৬, মালদ্বীপে ৬১, শ্রীলংকায় ৬২, ভূটানে ৭৭ এবং ভারতে ৭৯টি।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গবেষণা কার্যক্রম :

তাছাড়া, বাংলাদেশে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সিংহভাগই নির্দিষ্ট কয়েকটি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত। দেশের প্রায় ৪০% বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় না বললেই চলে। অবশিষ্ট ৬০% বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক প্রতিষ্ঠানে সীমিত আকারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও, ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাদের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেনা। এর অন্যতম কারন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত ব্যয় না করা। UGC Report অনুযায়ী ২০১৯ সালে দেশের ১২৫টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গবেষণা খাতে সন্মিলিত ব্যয়ের পরিমাণ টাকা ১৫৩ কোটি, গড়ে প্রত্যেকটিতে মাত্র ১.২২ কোটি, যা ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মোট ব্যয়ের ১% মাত্র। সিংহভাগ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত দেশের টপ টেন বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবলিক ও প্রাইভেট) ২০১৯ সালের গবেষণা বজেট এবং ঐ বছর প্রকাশিত প্রতিবেদনের সংখ্যা স্মারণী-৫.২(৮)এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো।

স্মারণী-৫.২(৭): ১৯৯০-২০১৫ সময়কালে দেশে বছরে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের সংখ্যা :

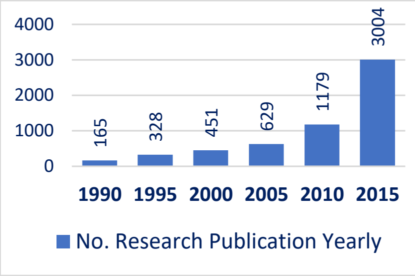

Source: World bank Report

স্মারণী-৫.২(৮) : ২০১৯ সালে টপ টেন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে ব্যয় এবং প্রকাশনার পরিমাণ :-

Public Universities			SL	Private Universities		
University	Spending	Publications		University	Spending	Publication
BSMAU	TK. 7.00 Cr	304	**1**	**Brac U**	TK. 37.9 Cr	179
BAU	TK .7.00 Cr	106	**2**	**ULAB**	TK.12.48 Cr	158
DU	TK. 5.20 Cr	472	**3**	**AIUB**	TK. 8.97 Cr	233
RU	TK. 4.40 Cr	183	**4**	**DIU**	TK. 7.53 Cr	-
SUST	TK. 2.90 Cr	-	**5**	**NSU**	TK. 6.53 Cr	1,135
CU	TK. 2.75 Cr	518	**6**	**IUB**	TK. 4.39 Cr	190
SAU	TK. 2.70 Cr	106	**7**	**Sonargaon**	TK. 2.70 Cr	35
BUET	TK. 2.30 Cr	136	**8**	**EUB**	TK. 2.15 Cr	7
JU	TK. 2.27 Cr	309	**9**	**UIU**	TK. 1.95 Cr	98
KU	TK. 1.77 Cr	-	**10**	**IIUC**	TK. 1.49 Cr	195

Source: tbsnews

২) বাংলাদেশে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের মানদন্ড :

বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রায় ৪০% প্রতিষ্ঠানে কোনো গবেষণা কার্যক্রম নেই বললেই চলে। বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করে তাদের প্রায় অর্ধেক প্রতিষ্ঠানে প্রকাশনার সংখ্যা প্রতি ১০০ ফ্যাকাল্টি মেম্বারের বিপরীতে ৪০ টিরও কম। তাছাড়া, গুটি কয়েক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যারা নিয়মিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষায় ঐ সমস্ত গবেষণা রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মানদন্ডে যথেষ্ট নিম্ন মানের। জানুয়ারি, ২০২১ এ প্রকাশিত H-index অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্টের মানদন্ড ১৩৪। এ মানদন্ডে অন্যান্য দেশের প্রকাশনার মান, যেমন-সিঙ্গাপুর ১৯২, ইন্দোনেশিয়া ৩১৫, মালয়েশিয়া ৩২৭, দ. কোরিয়া ৩৪৬, পাকিস্তান

৪৫৮, ভারত ৯৮৭, জাপান ১১২৭, চীন ১১৬৫, অষ্ট্রেলিয়া ১,৪৯০, জার্মানি ৩,৪৩৪ এবং ইউ. কে ৩,৭০১ স্মারণী-৫.২(৯)।

বাংলাদেশে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের মানদন্ড :

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম দেশে শিক্ষার মান ও পরিসর প্রসারের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বড় আকারের ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে টার্সিয়ারি পর্যায়ে তাই গবেষণার মাত্রা পর্যাপ্ত বৃদ্ধির পাশাপাশি গবেষণার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা জরুরি।

স্মারণী-৫.২(৯) : H-index, 2021 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের গবেষণা রিপের্টের মানদন্ড :-

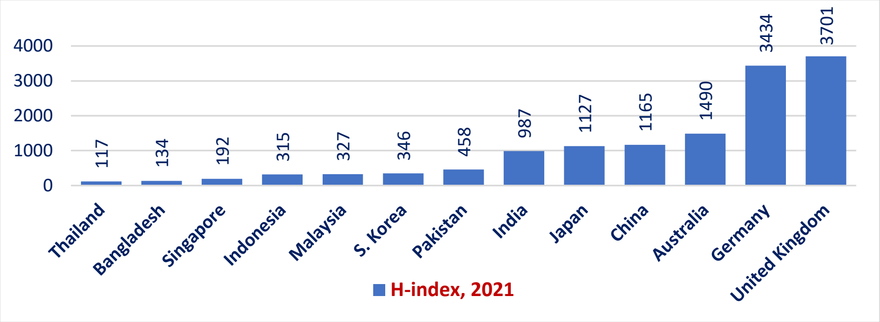

Source: ideas.repec.org

৩) সীমিত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম :

সীমিত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম :

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কতৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সিংহভাগই প্রকৌশল ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় সমূহের উপর পরিচালিত হয়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক উন্নয়নে গবেষণার পাশাপাশি অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে, যেমন- উৎপাদন, বিপনন এবং সেবাখাতের উন্নয়নে পর্যাপ্ত গবেষণার প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের গবেষণা কার্যক্রম আজো নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে Global Knowledge Index (GKL) 2020 অনুযায়ী ১৩৮ দেশের তালিকায় বাংলাদেশর অবস্থান ১১২ তম, যে তালিকায় সাতটি ক্ষেত্রে মূল্যায়নের সকলক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের পিছনে অবস্থান করছে স্মারণী-৫.২(১)।

বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্ট ২০১৯ এর তথ্যানুসারে প্রকৌশল ও বিজ্ঞান বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরো যে সমস্ত বিষয়ে কম বেশি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে রয়েছে Computer Science, Telecommunications, Science and Technology, Physics, Environmental Science Ecology, Chemistry, Public Environmental Occupational Health, Plant Sciences and Agriculture etc.

৪) গবেষণা ফলাফল বানিজ্যিকীকরনে পিছিয়ে থাকা :

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের সংখ্যা মাত্রিরিক্ত কম হওয়ার পাশাপাশি গবেষকরা গবেষণালব্দ ফলাফল বানিজ্যিকীকরনের ক্ষেত্রে রীতিমত উদাসীন। গবেষণালব্দ ফলাফল বানিজ্যিকীকরনের মাধ্যমে এর দীর্ঘমেয়াদি সূফল ভোগ করতে বিশ্বব্যাপি গবেষকরা যখন পেটেন্ট রাইট অর্জনে রীতিমত প্রতিযোগিতায় মত্ত, সেখানে বাংলাদেশের গবেষকরা এক্ষেত্রে এখনও একদমই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। World Intellectual Property Indicators 2020 এর তথ্যানুযায়ী ২০১৯ সালে পেটেন্ট এপ্লিকেশনের সংখ্যা বাংলাদেশে মাত্র ৪১৩ টি। ঐ বছর দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে এ সংখ্যা

গবেষণা ফলাফল বানিজ্যিকীকরনে পিছিয়ে থাকা :

শ্রীলংকায় ৬১১, ফিলিপাইনে ৪,৩৮০, মালয়েশিয়ায় ৭,৫৫১, থাইল্যান্ডে ৮,১৭২, ইন্দোনেশিয়ায় ১১,৪৮১, সিঙ্গাপুরে ১৪,১৩৬, হংকং এ ১৬,৫৩২, ভারতে ৫৩,৬২৭, দ. কোরিয়ায় ২১৮,৯৭৫ এবং জাপানে ৩০৭,৯৬৯টি স্মারণী-৫.২(১০)।

দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করনে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নে মানসন্মত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষায় গবেষণা কার্যক্রম শিক্ষা সেক্টরে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম, যা দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশিয় শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কাজেই দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে গবেষণার মাত্রা ও পরিসর পর্যাপ্ত বৃদ্ধিপূর্বক দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে শিক্ষার অবদান বৃদ্ধি করা জরুরি।

স্মারণী-৫.২(১০) : ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের পেটেন্ট এপ্লিকেশন এর চিত্র :-

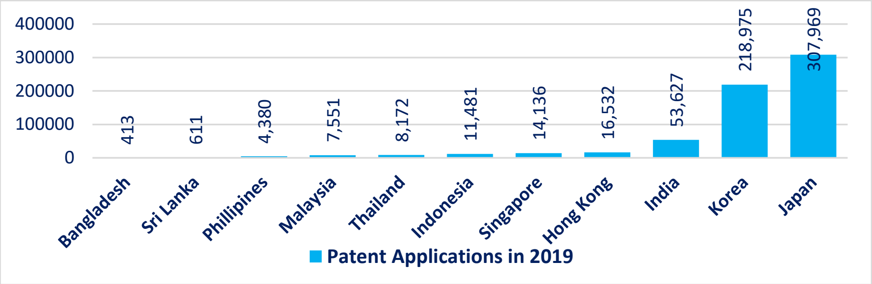

Source: World Intellectual Property Indicators 2020

জ) শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান জটিলতা :

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা মানসন্মত ও কর্মমূখী না হলে, শিক্ষাশেষে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা খুব কমক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে এবং দক্ষতার অভাবে চাকরি জোগারের ক্ষেত্রেও তারা প্রচুর বিড়ম্বনার শিকার হয়। শিক্ষা শেষে চাকরির সংস্থান না হলে তাদের মাঝে হতাশা নেমে আসে, দিশেহারা হয়ে অনেকে তখন বিদেশে পাড়ি জমায়, যা দেশের জন্য মোটেও ভাল লক্ষণ নয়। কেননা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশের সম্পদ, দেশ গঠনে তাদের অংশগ্রহন জরুরি, উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার অর্থ হলো দেশে তৈরী মেধা নিজ দেশের উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে অন্যের উন্নয়নে কাজে লাগানো এবং দেশ মেধাশূণ্য হয়ে পড়া। বলার অপেক্ষা রাখেনা, দেশে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না হলে, মানুষের মাঝে উচ্চশিক্ষার আগ্রহে ভাটা পড়বে এবং দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি করা কঠিন হবে।

শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান জটিলতা :

LFS: 2016–2017 এর রিপোর্টের ভিত্তিতে দেশে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের ১-২ বছর পর কর্মসংস্থানের হার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৯%, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেছে ১৫% এবং অবশিষ্ট ৩৯% কর্মহীন। টার্সিয়ারি লেভেল সমাপ্তকারিদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৯%, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেছে ৩৪% এবং অবশিষ্ট ৪৬% কর্মহীন। পলিটেকনিক সমাপ্তকারিদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৯%, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেছে ১৮% এবং অবশিষ্ট ৩২% কর্মহীন। স্মারণী-৫.২(১১)।

স্মারণী-৫.২(১১) : স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের ১-২ বছর পর কর্মসংস্থানের হার :

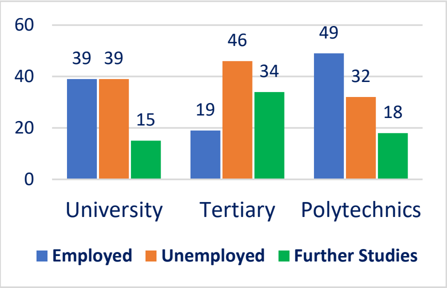

Source: LFS: 2016–2017

২০১৬-১৭ সাল নাগাদ দেশে টার্সিয়ারি সমাপ্তকারি জনসংখ্যার মধ্যে বেকারত্বের হার জাতীয়ভাবে ১১.২% (পুরুষ ৮.৩% ও নারী ২১.৮%) এবং সামগ্রিক বেকারত্ব ৪.২%,গ্রামে ১৪.২% (পুরুষ ১১.১% ও নারী ২৬.১%) এবং সামগ্রিক বেকারত্ব ৪.৯% এবং শহরে ৯.০% (পুরুষ ৬.২% ও নারী ১৮.৩%) এবং সামগ্রিক বেকারত্ব ৪.৯% স্মারণী-৫.২(১২)।

স্মারণী-৫.২(১২): ২০১৬-১৭ নাগাদ দেশে টার্সিয়ারি সমাপ্তকারি জনসংখ্যার বেকারত্বের হার :

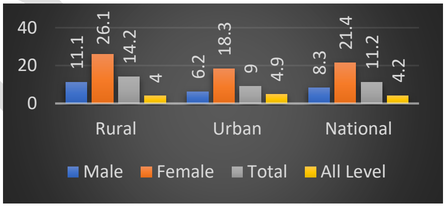

Source: BBS

ঝ) টার্সিয়ারি শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় :

বিগত দুই দশকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দেশে জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় ২% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ২০১৯ সালে জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাংলাদেশে ১.৩%, যা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সবদেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। বিগত এক দশকেরও বেশি সময়কালে টার্সিয়ারি শিক্ষা সেক্টরে সরকারী ব্যয় দেশের মোট শিক্ষা ব্যয়ের ১০% - ১৪% এর মধ্যে উঠা নামা করেছে, ২০১৬ সালে যা ২০% এ দাঁড়িয়েছে। একেতো বাংলাদেশে জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন, তারউপর টার্সিয়ারি শিক্ষাখাতে ব্যয় মোট শিক্ষাখতে ব্যয়ের মাত্র ১০% - ১৪%, দেশের পিছিয়ে থাকা টার্সিয়ারি শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যা রীতিমত অপ্রতুল।

টার্সিয়ারি শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় :

স্মারণী-৫.২(১৩) : ২০০০-২০১৮ সময়কালে দেশে (১) জি.ডি.পি অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয়; এবং (২) টার্সিয়ারি শিক্ষাখাতে মোট শিক্ষা ব্যয়ের অংশ :-

SL	Particulars	Years						
		2000	2004	2009	2013	2016	2017	2018
1	Govt. Exp. on Education as % of GDP	2.13	1.94	1.94	1.97	1.54	2.47	1.99
2	Exp. on **Tertiary** as % of total education exp.	10.1	11.5	13.5	14.7	20.0	-	-

Source: World Bank, Indexmundi and other Sources.

ঞ) দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

দেশে টার্সিয়ারি শিক্ষার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

টার্সিয়ারি শিক্ষায় নিবন্ধনের হার বাংলাদেশে এত কম হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে গ্রাম পর্যায়ে এ হার শহরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। যেহেতু দেশের ৭৩% জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রামে, সেহেতু গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের মাত্রা বৃদ্ধি করা ব্যাতিত দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি করা অসম্ভব। গ্রাম পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার এত কম হওয়ার অনেকগুলো কারনের মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য কয়েকটি নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১. **আর্থিক অসঙ্গতি :** উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি ধৈর্যের প্রয়োজন, কেননা উচ্চশিক্ষা সময়সাপেক্ষ। গ্রামের পরিবারগুলোতে আর্থিক অসঙ্গতির কারনে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় না গিয়ে দ্রুত আয় রোজগারের দিকে ঝুকে যায়।

২. **অপর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :** জনসংখ্যার তুলনায় দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম এবং বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভাগীয় শহর গুলোতে অবস্থিত, যেখানে অধ্যয়ন করা গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারের সদস্যদের পক্ষে রীতিমত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল।

৩. **কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি :** দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানসন্মত ও কর্মমূখী না হওয়ার কারনে শিক্ষাজীবন শেষে এদেশের শিক্ষার্থীরা খুব কমক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাকরির জন্য দীর্ঘ সময় হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। দেশে যেহেতু পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে, সেহেতু শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাশেষে বেকার থাকার ভয়ভীতি সবসময় কাজ করে।

৪. **শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান না হওয়া :** প্রতি বছর উচ্চশিক্ষা সমাপ্তের হার অনুযায়ী দেশে উচ্চশিক্ষিত ব্যাক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযোগি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছেনা, ফলে দেশে প্রতিনিয়ত উচ্চশিক্ষিত বেকার শ্রেণীর আধিক্য মানুষের মাঝে উচ্চশিক্ষার প্রতি অনিহার জন্ম দিচ্ছে।

৫. **উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকা :** উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি, উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনায় কম হওয়ায় গ্রামের সাধারণ পরিবার গুলোতে নিজ গরজে সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করানোর প্রবণতা অনেকটা কম।

৬. **উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা মানসন্মত না হওয়া :** এদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন না হওয়াতে শিক্ষা শেষে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এদেশের শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, যা উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এদেশের পিছিয়ে থাকার আরেকটি প্রধান কারণ।

৭. **গ্রাম পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রবণতা :** গ্রামপর্যায়ে বেশিরভাগক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিকের গন্ডি পার হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে দেওয়ার তোড় জোড় শুরু হয়, ফলে এ পর্যায়ে ঐ সব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের অবসান হয়, দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধিরক্ষেত্রে যা আরেকটি বড় অন্তরায়।

৮. **পরিবারে উচ্চশিক্ষা প্রবণতার অভাব :** উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং পরিবারে উচ্চশিক্ষা প্রবণতা না থাকার ফলে গ্রামপর্যায়ে অনেক আর্থিকভাবে সামর্থবান পরিবারের ছেলে মেয়েরাও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হয়না।

৯. **ধর্মীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতা :** গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত পরিবার সমূহের মাঝে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে বেশিরভাগ পরিবারে নারীদের উচ্চশিক্ষা প্রদানে আগ্রহী হয়না, যা এদেশের নারী সমাজকে উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য অনেকক্ষেত্রে অনেক পিছনে ফেলে রেখেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যববস্থা প্রচলনে প্রস্তাবনা :

ত) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যববস্থা প্রচলনে প্রস্তাবনা :

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং ২০৪১ সালের লক্ষ্যমাত্রা পুরনে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার ও মান বৃদ্ধির পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ নেওয়া দরকার, যাতে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও টেকসই করার জন্য অবশ্যম্ভাবী, অন্যথায় যুগ যুগ ধরে আমাদের বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে থাকা ছাড়া বিকল্প নেই।

দেশে শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সম্ভাব্য করনীয় সমূহ :-

ক) উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে করনীয় :

বলার অপেক্ষা রাখেনা, যেহেতু দেশের ৭৩ শতাংশ জনগণের বসবাস গ্রামে, সেহেতু দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সহজ ও সাশ্রয়ী হতে হবে, যাতে গ্রামের সাধারণ পরিবারের সদস্যরা সহজে উচ্চশিক্ষায় অংশ নিতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে :-

১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পাবলিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, যেমন :-

ক	প্রত্যেক উপজেলায় :	
	পাবলিক ডিগ্রি (অনার্স) মাষ্টার্স কলেজ	১ টি
	পাবলিক টেকনিক্যাল কলেজ	১ টি
	পাবলিক ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট	১ টি
নোট : ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন বিষয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং, আই.টি ট্রেনিং, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে।		
খ	প্রত্যেক জেলা পর্যায়ে :	
	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি
	পাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১ টি
	পাবলিক মেডিক্যাল কলেজ	১ টি

SJFBD

	পাবলিক কৃষি কলেজ	১ টি
	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১ টি
	অন্যান্য প্রফেশনাল ট্রেনিং কলেজ	১ টি
নোট : অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় অন্তত ১ টি করে জেলা পর্যায়ে থকতে হবে।		
গ	**প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে :**	
	পাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি
	পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি
	ভেটেনারি কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি
	মেরিন কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি
	এরোনটিক্যাল কলেজ	১ টি

২) মাধ্যমিক পর্যায়ের রেজাল্টের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা পছন্দমত কলেজে এবং উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের ভিত্তিতে পছন্দমত বিশ্ববিদ্যালয়/ মেডিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে।

৩) ভর্তি ও টিউশন ফি সাধারণ শিক্ষার্থীদের নাগালে থকতে হবে, যাতে স্বল্প আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার খরচ বহনে বেগ পেতে না হয়।

৪) দেশে সুদ বিহীন উচ্চশিক্ষা ঋণ ব্যবস্থা চালু করা, যাতে যে কেউ প্রয়োজনে শিক্ষা ঋণ নিয়ে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে, যা কর্ম জীবনে সুবিধা জনকভাবে পরিশোধ করা যাবে।

৫) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা বীমার প্রচলন।

৬) দেশি বিদেশী সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করা, যাতে **নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান উপজেলায় অবস্থিত হলে,** সংশ্লিষ্ট উপজেলার আবেদন কারিদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া এবং **নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান জেলা শহরে অবস্থিত হলে,** সংশ্লিষ্ট জেলার আবেদন কারিদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া।

৭) আর্থিক অস্বচ্ছল পরিবারের উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত সদস্যদের জন্য গ্রেড অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে মাসোহারার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে শিক্ষাজীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভরন পোষন, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহ শিক্ষা চালিয়ে যেতে অসুবিধায় পরতে না হয়। পাশাপাশি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট অর্জনকারি শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি স্বরুপ **"মেরিট স্কলারশীপ"** ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

খ) উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে করনীয় :

দেশে উচ্চশিক্ষিত জনবল তৈরির জন্য উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি করা যেমন জরুরি, তেমনি শিক্ষাশেষে নিজ উদ্যোগে কর্ম ক্ষেত্র তৈরি করাসহ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে মান সন্মত শিক্ষা অপরিহার্য।

দেশে মানসন্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন :-

ক) অভিজ্ঞ ও ভালো মানের শিক্ষক।
খ) ডিজিটাল ক্লাশরুম ।
গ) ডিজিটাল পরীক্ষা পদ্বতি ।

SJHBD

ঘ) উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা কারিকুলাম ; **এবং**

ঙ) স্বনামধন্য বিদেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

গ) কর্মমূখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে করনীয় :

শিক্ষা কারিকুলামের পাশাপাশি স্ব-স্ব বিষয়ের আওতায় কর্মক্ষেত্রের উপর বিস্তারিত ধারনা দেওয়া সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শিল্প ও কারিগরি সহায়তা, অর্থায়ন, রিস্ক এসেসম্যান্ট, উৎপাদন, বাজারজাতকরন, মাননিয়ন্ত্রণ সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কলা কৌশল প্রয়োগ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেওয়া কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। যাতে শিক্ষা জীবন শেষে যে কোনো শিক্ষার্থী চাকরির পেছনে না ঘুরে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাঙ্কিত উন্নতি সাধনপূর্বক নিজের ও দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ঘ) উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার বৃদ্ধিকরন :

ডিজিটাইজেশনের এ যুগে অথনৈতি উন্নয়ন ত্বরাম্বিত করতে শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বিশ্বে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় নিজ দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বিপ্লব আনা অপরিহার্য। এজন্য প্রয়োজন উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল তৈরি করা, যারা ভবিষ্যতের হাল ধরবে। এ লক্ষ্য অর্জনে উচ্চশিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি এবং কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের পাশাপাশি নিম্নোক্ত অতিরিক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে :-

১) দেশীয় ও বিদেশী অর্থায়নকৃত সকল ধরনের প্রকল্পে দেশীয় এক্সপার্ট নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা, যাতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাক্তিদের সহজ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকে, যা দেশে উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার বাড়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

২) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে "রিচার্স ও উদ্ভাবনী" কার্যক্রম বৃদ্ধি করা এবং এখাতে সরকারী বরাদ্ধ পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা, যাতে সকল শিক্ষার্থী "রিচার্স ও উদ্ভাবনী" কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৩) "রিচার্স ও উদ্ভাবনী" দ্বারা আবিষ্কৃত সকল তত্ব ও ফর্মূলার যথাযথ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দ্রুত বানিজ্যিকী করনের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আলাদা সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা।

৪) রিচার্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম জোরদার ও ব্যাপকতর করতে বিদেশী স্বনামধন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে রিচার্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং আবিস্কৃত ফর্মূলা বানিজ্যিকীকরনের ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি খাতের সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার সুযোগ উন্মুক্ত করা।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৫.৩

বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা।

বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা।
খ) দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব।
গ) বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এত জরুরি কেন ?
ঘ) দেশে কারিগরি শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি।

১) টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (TVET) পরিস্থিতি।
২) ধীরগতিতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার।
৩) কারিগরি শিক্ষায় নারীদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ।
৪) কারিগরি শিক্ষাখাতে অপর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ।
৫) কারিগরি প্রশিক্ষিত ব্যাক্তির কর্মসংস্থান জটিলতা।

ঙ) দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ।
চ) কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

ক) বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা :

বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা :

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের অধিকার। ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু দেশের সকল নাগরিকের পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহন করা সম্ভব নয়, জরুরিও নয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সামর্থ ও মেধা দুটোই প্রয়োজন, যা প্রত্যেকের থাকেনা। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিল্প, সাহিত্য, চিকিৎসা, দেশ পরিচালনায় নীতি নির্ধারণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য। **অন্যান্য সকলক্ষেত্রে যে কোনো নাগরিকের জন্য নুন্যতম একাডেমিক শিক্ষাই যথেষ্ঠ। প্রশ্ন হচ্ছে এ নুন্যতম একাডেমিক শিক্ষার গন্ডি কোন পর্যন্ত হওয়া উচিৎ যা একজন নাগরিক দ্রুততম সময়ে শেষ করে কর্ম জীবনে পা বাড়াতে পারবে ?**

একজন নাগরিক তার জীবন সুচারুভাবে পরিচালনা করতে নুন্যতম যে একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন, সেটাই সে দেশের নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক একাডেমিক শিক্ষার গণ্ডি হওয়া উচিৎ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে শুধুমাত্র নূন্যতম একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নাগরিক কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই সামান্য, বিশেষ করে আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নুন্যতম একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কিছু কারিগরি শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষাজ্ঞান দেশে বিদেশে কর্মক্ষেত্রে যে কোনো সাধারণ নাগরিকের আর্থিক মূল্যায়ন বহুগুন বাড়িয়ে দেয় একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিশেষ করে শিল্পায়ন ও শ্রম রপ্তানিতে এর প্রভাব সুদুর প্রসারি। উদাহরনস্বরুপ, বিগত দুই দশকের অধিক কাল থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস তৈরী পোশাক ও বিভিন্ন দেশে শ্রমিক রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয়, যা দেশের রপ্তানী আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে তুলছে।

বিদেশে কর্মরত এবং কর্মের আশায় প্রতিনিয়ত বিদেশে যাওয়া বিশাল সংখ্যক শ্রমিকদের বেশির ভাগেরই নুন্যতম একাডেমিক শিক্ষা নেই, কারিগরি শিক্ষা ও ভাষাজ্ঞান তো দুরের কথা। ফলে বিদেশের মাটিতে তারা বহু হয়রানি ও প্রতারনার শিকার হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়। ফলে বিদেশে কর্মরত শ্রম সংখ্যার অনুপাতে তাদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ তুলনামূণকভাবে অনেক কম। **বাধ্যতামূলক একাডেমিক শিক্ষা শেষে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহনে অপারগ তাদের জন্য ২ বছর মেয়াদি কারিগরি শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষা জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক করা গেলে, দেশের শিল্পসেক্টরে দক্ষ শ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বিদেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকের চাহিদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেত।** সেক্ষেত্রে বিদেশে কর্মরত ঐ সমস্ত শ্রমিকরা আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হতো এবং রিমিট্যান্স আসতো আরোও অনেক অনেক গুণ বেশি, যা দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেত খুব দ্রুত এবং দেশের অর্থনীতিতে আসতো অনেক গতিশীলতা। তাছাড়া, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ঐ দেশের শিল্প ও প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনি শক্তি বৃদ্ধি করতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য।

কাজেই, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে সবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহনে অপারগ তাদের জন্য মাধ্যমিক শেষে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা জরুরি। তাহলেই কেবল ঐ সমস্ত স্বল্প শিক্ষিত নাগরিকেরা দেশে বিদেশে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে, তাদের আর্থিক মূল্যায়ন হবে যথাযথ, পাশাপাশি বৃদ্ধি পাবে আত্মকর্মসংস্থান এবং দেশে হ্রাস পাবে বেকারত্ব। অথচ ২০১৯ সালের তথ্যানুযায়ী দেশে এস.এস.সি পর্যায়ে নিবন্ধিত ছাত্র/ছাত্রীর তুলনায় এস.এস.সি (ভোকেশনাল) পর্যায়ে নিবন্ধিত ছাত্র/ছাত্রীর হার গড়ে ২% এরও কম।

SJBD

স্মারণী-৫.৩(১): ২০১২-২০১৯ সময়কালে দেশে এস.এস.সি জেনারেল ও এস.এস.সি ভোকেশনাল পর্যায়ে নিবন্ধিত ছাত্র/ছাত্রীর তুলনামূলক চিত্র :

	Year					(Students in Million)		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
S.S.C General	7.51	8.14	8.79	9.29	9.72	9.80	9.94	9.80
Vocational (S.S.C)	.14	.15	.15	.14	.11	.12	.17	.18
Vocational (%)	1.86	1.84	1.71	1.51	1.13	1.22	1.71	1.84

Source: BTEB Annual Report

খ) দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব :

দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব :

টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (TVET) একটি হাতে কলমে শিক্ষা ব্যবস্থা, যা শ্রমবাজারের জন্য কর্মী তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন সেক্টরের পেশা সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান, প্রযুক্তিগত ধারণা এবং ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তকারি যুব সম্প্রদায় যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অপারগ, তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মজীবনে উন্নতির জন্য তৈরি করা, যাতে প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উন্নতি করার সুযোগ পায়।

শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারনে দেশে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, পাশাপাশি শিল্প, বানিজ্য ও সেবাখাতে রয়েছে প্রচুর দক্ষ জনবলের অভাব। ২০২৪ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের তালিকায় পৌঁছানোর যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শিল্প ও বানিজ্যের প্রতিটি সেক্টরে গতিশীলতা আনয়ন, যার জন্য প্রয়োজন সকল সেক্টরে প্রচুর দক্ষ জনবল। কাজেই, দেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটিয়ে ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল তৈরি করা ব্যাতিত এক্ষেত্রে অন্য কোনো বিকল্প নেই বললেই চলে। তাছাড়া, কারিগরি প্রশিক্ষিত ব্যক্তি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে অগ্রাধিকার পায় এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়ে আয় রোজগারের সুযোগ পায়।

গ) বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এত জরুরি কেন ?

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এত জরুরি কেন ?

বাংলাদেশ জনবহুল দেশ এবং ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে দারিদ্রতার হার গড়ে ৪২% এর উপরে। দারিদ্রতার কারনে দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট অনগ্রসর, যাদের সিংহভাগই শ্রমজীবি ও অদক্ষ। সরকারি হিসাবে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২.৫০ মিলিয়ন অদক্ষ শ্রমিক দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু দেশের শ্রমবাজার তত প্রসারিত না হওয়ার কারনে এবং নতুন শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা না থাকার কারণে, প্রতিনিয়ত শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়া ঐ সমস্ত অদক্ষ শ্রমিকদের একটি বড় অংশেরই নিয়মিত কর্মসংস্থান হয়না। কর্মদক্ষতার অভাবে ঐ সমস্ত শ্রমিকদের নিজে থেকে কিছু করার সক্ষমতা নেই বললেই চলে, ফলে এ সমস্ত শ্রমিকদের বেশির ভাগেরই বেকার ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় দিন কাটে, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে যা অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। দেশে কর্মসংস্থানে ব্যার্থ হয়ে ঐ সমস্ত শ্রমিকদের কিছু অংশ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ভিটে মাটি বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি জমায়, কিন্তু কর্মদক্ষতা ও ভাষাজ্ঞানের অভাবে সেখানেও তাদের ভোগান্তির শেষ নেই।

যারা উচ্চশিক্ষায় যেতে অপারগ তাদের জন্য মাধ্যমিক স্তর শেষে যদি দুই বছরের কারিগরি শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক করা হতো, তাহলে প্রতিবছর শ্রমবাজারে নতুনভাবে যুক্ত হওয়া ঐ সমস্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তত বেগ পেতে হতোনা। কেননা, বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা হয় চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারতো অথবা নিজেরাই প্রশিক্ষিত বিষয়ে কর্মে নিয়োজিত হয়ে বেকারত্ব গোছানোর সুযোগ পেত এবং অবশিষ্ট শ্রমিকেরা উচ্চ বেতনে বিদেশে কাজ করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হতো। তাছাড়া, আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের শিল্প ও বানিজ্যের উন্নয়নে দক্ষ শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি করতে এবং প্রযুক্তিক্ষেত্রে উৎকর্ষতা আনয়নে দেশে কারিগরি শিক্ষার হার ও মান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার বিকল্প নেই।

যে সমস্ত কারনে দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১) **আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা :** দেশের শ্রমবাজারে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে অজস্র পরিমাণ নতুন ও অদক্ষ শ্রমশক্তি, সরকারি হিসাবে এর পরিমাণ বছরে প্রায় ২.৫০ মিলিয়ন, অথচ দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মাত্র ০.৯%। শ্রমসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শ্রমবাজার প্রসারিত না হওয়ার কারণে শ্রমবাজারে প্রতিনিয়ত যুক্ত হওয়া এসমস্ত অদক্ষ শ্রমিকদের বেশিরভাগই কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তায় পড়তে হয়। নতুন এ শ্রমশক্তি যদি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে শ্রমবাজারে আসতো, তাহলে তারা চাকরিক্ষেত্রে যেমন প্রাধান্য পেত, তেমনি চাকরির সংস্থান না হলে যার যার প্রশিক্ষন অনুযায়ী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেত, যা দেশে বেকারত্ব মোছনের পাশাপাশি যুব কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতো।

২) **শিল্প, বানিজ্য ও সেবাখাতে দক্ষ শ্রমসংখ্যা বৃদ্ধি করা :** দক্ষ শ্রমশক্তিই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলমন্ত্র। দেশের শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে দক্ষ শ্রমশক্তির যথেষ্ট অভাব রয়েছে, ফলে এদেশের শিল্প, বানিজ্য ও সেবাখাতে গতিশীলতার দিকথেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী জি.ডি.পিতে শিল্প সেক্টরের অংশ বাংলাদেশে ২৮.৫%, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় যা সর্বনিন্ম। কাজেই, আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমশক্তি বৃদ্ধিকরা অত্যন্ত জরুরি, যারজন্য দরকার দেশে কারিগরি শিক্ষার হার ও মান পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা।

৩) **শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা :** আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করতে শিল্পসেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য, আর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশে কর্মক্ষম শ্রমসংখ্যা অফুরন্ত আছে বটে, তবে সকল সেক্টরে দক্ষ শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির মাধ্যমেই কেবল শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে দক্ষ শ্রম সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৪) **শ্রম রপ্তানি বৃদ্ধিপূর্বক বৈদেশিক আয় বৃদ্ধিকরা :** কর্মক্ষম জনসংখ্যার তুলনায় যেহেতু দেশের শ্রমবাজার সীমিত, সেহেতু অতিরিক্ত কর্মক্ষম জনশক্তি বিদেশে রপ্তানিপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সহজ পন্থা বাংলাদেশের হাতে রয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও শ্রমিকদের কর্ম দক্ষতা ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কেননা, অদক্ষ ও ইংরেজী ভাষা না জানা শ্রমিকদের চাহিদা ও বেতন বিদেশের বাজারে খুবই সীমিত বলা চলে। কাজেই, শ্রম রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করতে বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৫) **দারিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যাক্তি দেশে ও বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া ছাড়াও অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম, যা দেশে দারিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিরক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে।

৬) **আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি করা :** ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প, বানিজ্য ও সেবাখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে প্রচুর দক্ষ জনবল তৈরি করা প্রয়োজন। দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ব্যাতিত এ লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব বলা চলে।

ঘ) দেশে কারিগরি শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি :

দক্ষতাই শক্তি এবং দক্ষ জনবলই দেশের মূলধন। দেশে শিল্প, বানিজ্য ও সেবা খাতের দ্রুত উন্নয়নে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং একটি অপরিহার্য বিষয়। কেননা, দক্ষ জনবল ব্যাতিত শিল্প, বানিজ্য ও সেবাখাতের কোনো ক্ষেত্রেই কাঙ্কিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে কারণেই বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে দক্ষ জনবল তৈরির প্রবণতা বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে।

১) টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (TVET) পরিস্থিতি :

Technical and Vocational Education & Training (TVET) বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে সজ্জায়িত হয়ে আসছে। এটা মূলত ট্রেনিং বা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষ করে তোলা, যাতে প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা সরাসরি প্রশিক্ষিত পেশায় প্রবেশ করে কার্যক্ষেত্রে

দেশে কারিগরি শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি :

দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে, সেলক্ষ্যে TVET প্রোগ্রাম ডিজাইন ও পরিচালনা করা হয়। In the current human capital discourse, the terms 'TVET' and 'Skills Development' are defined in different ways. According to UNESCO, TVET comprises formal, non-formal, and informal learning for the world of work. Young people, women, and men acquire knowledge and skills from basic to advanced levels across a wide range of institutional and work settings and in diverse socio-economic contexts. (ILO)

দেশের শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমশক্তি যোগান দেওয়ার মাধ্যমে শিল্প, বানিজ্য ও সেবা সেক্টরে দক্ষতা আনয়নে কারিগরি শিক্ষা ও ট্রেনিং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বিদেশে দক্ষ শ্রমিক রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার ক্ষেত্রেও কারিগরি শিক্ষা ও ট্রেনিং অপরিহার্য। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে ফরমাল, ইনফরমাল এবং নন-ফরমাল ক্যাটাগরিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ০৩/ ০৬ মাস থেকে ৪ বছর মেয়াদি মোট ৩৩ (তেত্রিশ) টি কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। ৩০ জুন ২০১৯ সাল নাগাদ দেশে কারিকুলাম ভিত্তিক অ্যাফিলিয়েটেড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০,৪৫২টি, যেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০,১৭,৭৯৯ জন। নিম্নে ২০১৭ সাল নাগাদ দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলেধরা হলো।

স্মারণী-৫.৩(২): ২০১৭ সাল নাগাদ দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা :

Type of Institutions	Mgt.	Institutions, Teachers and Students			Indicators		
		No. of Institutions	No. of Teachers	No. of Students	TSR	SPI	TPI
Polytechnic Institute	Public	52	1,498	103,077	69	1,982	29
	Private	387	4,768	112,574	24	291	12
	Total :	439	6,266	215,651	34	491	14
Technical School & College	Public	64	1,145	36,512	32	571	18
	Private	108	1,172	28,712	24	266	11
	Total	172	2,317	65,224	28	379	13
Technical Training Centers	Public	68	1,127	25,415	23	374	17
	Private	96	186	12,772	69	133	2
	Total	164	1,313	38,187	29	233	8
Agriculture Training Institutes	Public	13	148	11,384	77	876	11
	Private	170	822	18,742	23	110	5
	Total	183	970	30,126	31	165	5
S.S.C Vocational (Independent)	Public	11	272	2,972	11	270	25
	Private	158	1,716	21,482	13	136	11
	Total	169	1,988	24,454	12	145	12
S.S.C Vocational (Attached)	Public	-	-	-	-	-	-
	Private	2,556	7,673	199,844	26	78	3
	Total	2,556	7,673	199,844	26	78	3
H.S.C Voc/B Mgt. (Independent)	Public	10	148	3,128	21	313	15
	Private	665	5,822	131,158	23	197	9
	Total	675	5,970	134,286	22	199	9
H.S.C Voc/B Mgt. (Attached)	Public	15	71	1,319	19	88	5
	Private	1,078	6,129	138,152	23	128	6
	Total :	1,093	6,200	139,471	22	128	6
Medical Technology	Public	-	-	-	-	-	-
	Private	356	986	24,734	25	69	3
	Total :	356	986	24,734	25	69	3
Other Institutes	Public	55	590	11,727	20	213	11
	Private	35	443	8,260	19	236	13
	Total :	90	1,033	19,987	19	221	11
TOTAL : Technical Education	Public	288	4,999	195,534	39	679	17
	Private	5,609	29,717	696,430	23	124	5
	Total :	5,897	34,716	891,964	26	151	6

Source: Banbeis

ধীরগতিতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার :

২) ধীরগতিতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার :

যদিও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের দিক থেকে বাংলাদেশ এখনো যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েচে, তথাপি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র/ছাত্রী নিবন্ধনের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে কারিগরি শিক্ষায় সামগ্রিকভাবে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৯৪,২৭৮ জন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে নিবন্ধনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২১,০৭৯ জন। এ আট বছরের ব্যবধানে কারিগরি শিক্ষায় নিবন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে ৪০,৮৫০ জন বা ১০.৩৬%। স্মারণী-৫.৩(৪)।

যেখানে দেশের শ্রম বাজারে প্রতিবছর নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছে ২.৫০ মিলিয়ন কর্মক্ষম জনশক্তি, অথছ কারিগরি শিক্ষায় নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ৪০,৮৫০ জন, অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় কারিগরি শিক্ষায় নিবন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে খুবই সামান্য।

২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন লেভেলএ শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে, ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ১৬.২৯%, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ৬.৫৭%, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ৩.৬০%, ২০১৫-১৬ শিকাষাবর্ষে ২৩.৩৯%, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ২.৫৭%, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ৭.৪৪% এবং ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ৪.৭৬%। স্মারণী-৫.৩(৩)। এ সময়কালে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্নক্ষেত্রে নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে SSC ভোকেশনাল ৪.১৯%, HSC ভোকেশনাল ৮.৪৬%, ডিপ্লোমা ৮.২৬%, ৩/৬ মাসের ট্রেনিং ৩০.২৩% এবং অন্যান্যক্ষেত্রে ১৪.২৯%।

স্মারণী-৫.৩(৩) : ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে কারিগরি শিক্ষায় বার্ষিক শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার বৃদ্ধির চিত্র :

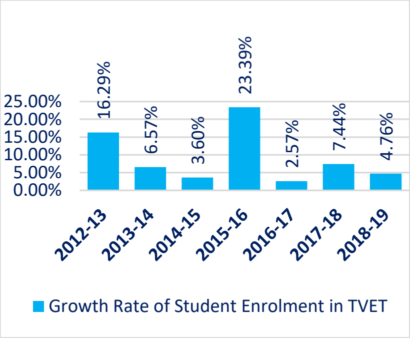

Source: BTEB

স্মারণী-৫.৩(৪) : ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বিভিন্ন লেভেল এ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী নিবন্ধনের চিত্র :

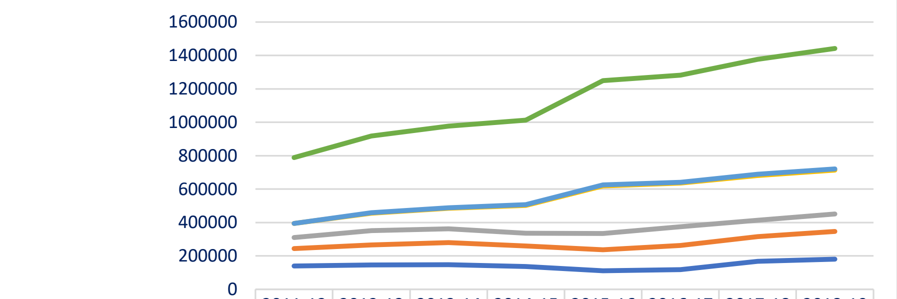

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Total	394278	458520	488623	506226	624626	640654	688318	721079
Others	0	3617	3898	4358	5493	4973	6769	7196
3/6 Months Training	84303	104332	123034	166316	285216	261864	267783	262677
Diploma Level	66200	84809	82066	75832	97274	111120	98110	104467
H.S.C Level	104262	120425	132684	123520	125773	144230	147336	166001
S.S.C Level	139513	145337	146941	136200	110910	118467	168320	180438

Source: BTEB Annual Report

৩) কারিগরি শিক্ষায় নারীদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ :

কারিগরি শিক্ষায় নারীদের সীমিত অংশগ্রহন :

লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শ্রমবাজারে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহনে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকা জরুরি। অনুরুপভাবে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক, অন্যথায় নারীরা দক্ষতা উন্নয়নে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে, ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীরা অসম প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হবে এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীর অনুপাতে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকলেও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় গড়ে এক তৃতীয়াংশেরও কম। এ প্রবণতা কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। বি.বি.এস তথ্যানুযায়ী ২০১৬-১৭ সময়ে লেবার ফের্সে অংশগ্রহনের হার জাতিয়ভাবে ৫৮.২%, তন্মধ্যে পুরুষ ৮০.৫% এবং নারী ৩৬.৩%। বিগত (২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে কারিগরি শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থী নিবন্ধনের তুলনায় নারী শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ২৬.৮২%, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ ২৯.৭২% এ পৌঁছেছে। এ সময়কালে মোট শিক্ষার্থী নিবন্ধনের অনুপাতে নারী শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার গড়ে ২৮.৬৫%। স্মারণী-৫.৩(৫)।

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যুব সম্প্রদায়কে মাধ্যমিক শিক্ষা পরবর্তী বিভিন্ন সেক্টরে বাস্তব জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। যে সমস্ত নারীরা উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে অপারগ, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান প্রতিযোগিতার দক্ষতা অর্জনে মাধ্যমিক শিক্ষা পরবর্তী কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। অবশ্য সরকার দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারী শ্রমিকদের অবদান গুরুত্বের সাথে উপলব্দি করছেন এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কারিগরি ও টার্সিয়ারি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছেন।

স্মারণী-৫.৩(৫) : ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে কারিগরি শিক্ষায় মোট নিবন্ধন অনুপাতে নারী শিক্ষার্থী নিবন্ধনের হার :

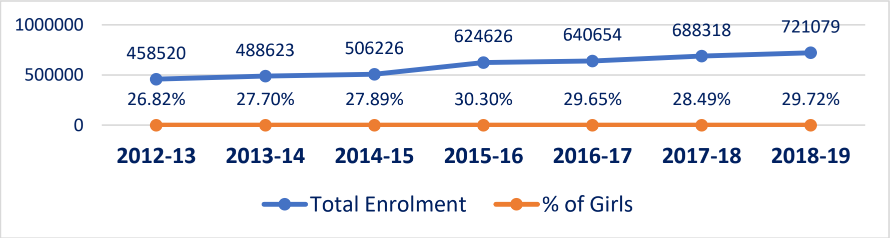

Source: BTEB Annual Report

SJHBD

কারিগরি শিক্ষাখাতে অপর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ :

৪) কারিগরি শিক্ষাখাতে অপর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ মোট জাতিয় বাজেটের ৩%-৩.৫% এর মধ্যে রয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে বাজেট অনুপাতে ৪.১৩%। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত শিক্ষাখাতে বরাদ্ধকৃত এডিপির মাত্র ৩%-৩.৫০% কারিগরি ও মাদ্রাসা সেক্টরে ব্যয় করা হতো। তবে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে কারিগরি ও মাদ্রাসা সেক্টরে বণ্টনকৃত এডিপির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এখাতে বণ্টনকৃত এডিপি শিক্ষাখাতে বরাদ্ধকৃত এডিপির ৩.২৭%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫.০৬%, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৯৭%, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬.৬৩% এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮.৫০%। স্মারণী-৫.৩(৭)।

শিক্ষাখাতে বরাদ্ধকৃত এডিপি অর্থ অন্যান্য শিক্ষা সাবসেক্টরে বণ্টনের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা সেক্টরে বণ্টনের হার অস্বাভাবিক হারে কম। ২০২০-২১ অর্থবছরের শিক্ষাখাতে মোট এডিপি বরাদ্ধের পরিমাণ ২৩,২৪৫ কোটি টাকা, যা বণ্টিত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায় ৪০.৪৬%, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ৫১.০৪% এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ৮.৫০% (স্মারণী-৫.৩(৬)।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশে এমনিতেই শিক্ষা সেক্টরে বরাদ্ধকৃত এডিপির পরিমাণ এ সেক্টর প্রসারের পক্ষে রীতিমত অপর্যাপ্ত, দ্বিতীয়ত, কারিগরি শিক্ষাখাতে বণ্টণকৃত এডিপি অর্থ এখাতের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশে মাধ্যমিক পরবর্তী কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে এখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উল্ল্যেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্মারণী-৫.৩(৬): ২০২০-২১ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্ধকৃত এ.ডি.পি শিক্ষা সাবসেক্টরে বণ্টনের হার:

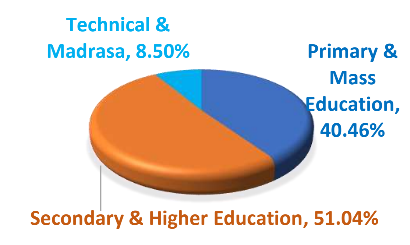

Source: Economic Division, Ministry of Finance

স্মারণী-৫.৩(৭) : অর্থবছর ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জাতীয় বাজেট অনুপাতে শিক্ষাখাতে এবং শিক্ষাখাতের অনুপাতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সেক্টরে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধের চিত্র :-

F.Y	National Budget (TK. In Crore)	Education & Religious Affairs		Technical & Madrasa Education	
		Total allocation (TK. In Crore)	As % of National Budget	Total allocation (TK. In Crore)	As % of Technical & Madrasa Edu.
2016-17	340,605	12,845.97	3.77 %	420	3.27 %
2017-18	400,266	14,186.56	3.54 %	718	5.06 %
2018-19	464,573	15,468.65	3.33 %	923	5.97 %
2019-20	523,190	20,429.10	3.90 %	1,355	6.63 %
2020-21(B)	568,000	23,245.00	4.13 %	1,976	8.50 %

Source: Economic Division, Ministry of Finance

৫) কারিগরি প্রশিক্ষিত ব্যাক্তির কর্মসংস্থান জটিলতা :

একথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশ এবং মাধ্যমিক পরবর্তী নুন্যতম দুই বছরের কারিগরি প্রশিক্ষণ যে কোনো ব্যক্তির বাস্তব দক্ষতায় ব্যাপক পার্থক্য এনে দেয়। এসব সঙ্গত কারণে কারিগরি প্রশিক্ষিত কোনো ব্যাক্তি কর্মক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে সবসময় অগ্রাধিকার ভোগ করে থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে কারিগরি প্রশিক্ষণের মান নিয়ে। যেহেতু বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা এখনো ততবেশি প্রসার লাভ করেনি, সেহতু দেশের শ্রমবাজারের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় বাস্তব দক্ষতার

SJFBD

সাথে মিল রেখে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষিতরা এখনো যথেষ্ট প্রতিকুলতার সন্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি অনেকক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ফিল্ডের বাইরে কাজ করতে হচ্ছে, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেকারত্বের নজিরও রয়েছে। BTEB সার্ভে ২০১৮ অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাক্তিদের ৯৪.৪% চাকরি ও অন্যান্য আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারলেও ৫.৬% কারিগরি শিক্ষিত ব্যাক্তি দেশে / বিদেশে তাদের প্রশিক্ষিত ফিল্ডের বাইরে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন (স্মারণী-৫.৩(৮)।

কারিগরি প্রশিক্ষিত ব্যাক্তির কর্মসংস্থান জটিলতা :

LFS: 2016–2017 অনুযায়ী দেশে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের ১-২ বছর পর কর্মসংস্থানের হার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৯%, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেছে ১৫% এবং অবশিষ্ট ৩৯% কর্মহীন। টার্সিয়ারি লেভেল সমাপ্তকারিদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৯%, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেছে ৩৪% এবং অবশিষ্ট ৪৬% কর্মহীন। পলিটেকনিক সমাপ্তকারিদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৯%, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেছে ১৮% এবং অবশিষ্ট ৩২% কর্মহীন (স্মারণী-৫.২(১১)। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতরা এগিয়ে রয়েছে।

স্মারণী-৫.৩(৮) : ২০১৮ সাল নাগাদ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের হার :

Employment Status	RPL Stream	Graduates of RTOs	Industry Assessors	Teachers/ Trainers	Average
Employed by Govt./ Private Sector.	54.8 %	73.0 %	80.6 %	100 %	77.1 %
Self Employed	39.8 %	11.7 %	17.5 %	0.0 %	17.3%
Total gainfully Engaged	94.6 %	84.7 %	98.1 %	100 %	94.4 %
Not Employed	5.4 %	15.3 %	1.9 %	0.0 %	5.6 %

Source: BETB, September 2018

ঙ) দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমশক্তির যোগান দিতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার আলাদা গুরুত্ব বহন করে। উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে অপারগ এমন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিতে কারিগরি শিক্ষা অনায়াসে একটি সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থান যোগাড় করতে অথবা প্রশিক্ষিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করার সুযোগ পায়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য এ সুযোগ

সমানভাবে কার্যকর। অন্যদিকে, দেশের শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমশক্তি যোগান দেওয়ার মাধ্যমে শিল্প, বানিজ্য ও সেবা সেক্টরে গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং দক্ষ শ্রমিক বিদেশে রপ্তানিপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি করতে দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

কিন্তু সে তুলনায় দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত ধীরগতিতে এগুচ্ছে, বিশেষ করে দেশব্যাপি নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে আশাতীতভাবে কম। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে কারিগরি শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৮৯১,৯৬৪ জন। অর্থবছর ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে কারিগরি শিক্ষায় নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে বছরে গড়ে ৯.২৩%, মাধ্যমিক স্তরে গড়ে ৫.০৭%, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৭.১৬% এবং ডিপ্লোমা পর্যায়ে ৭.৭৯%। এ সময়কালে কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ১৩,০৪৭ জন মাত্র স্মারণী-৫.৩(৫) ।

বিগত সময়গুলোতে দেশে কারিগরি শিক্ষার পর্যাপ্ত প্রসার না ঘটার বহুবিধ কারন বিদ্যমান, যারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলেধরা হলো :-

১) শ্রমবাজারের প্রকৃত চাহিদার সাথে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সমন্ময়হীনতা।
২) এদেশের কারিগরি শিক্ষার মান আজো দেশে ও বিদেশে পর্যাপ্ত স্বীকৃতি না পাওয়া।
৩) দেশের শিল্পসেক্টর পর্যাপ্ত প্রসারিত না হওয়ার ফলে সংকুচিত শ্রমবাজার।
৪) শিল্পসেক্টরে নিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ সনদের বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে শিল্পসেক্টরে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ পাওয়া।
৫) আয়রোজগারে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে এদেশের নারীরা পিছিয়ে থাকার ফলে এবং দেশে বাল্য বিবাহ কার্যকরভাবে বন্ধ করতে না পারার ফলে কারিগরি শিক্ষায় নারীদের অনাকাংকিত কম অংশগ্রহণ।
৬) স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে শ্রমবাজারে পাঠানোর ব্যাপারে জাতিয়ভাবে পরিকল্পিত নীতি না থাকা।
৭) সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সিংহভাগই শহরাঞ্চলে অবস্থিত, ফলে গ্রাম ও মফঃস্বলের শিক্ষার্থীরা সহজে কারিগরি শিক্ষায় অংশ নিতে পারে না।
৮) দেশের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাত্র ৫% সরকারি, অবশিষ্ট ৯৫% বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেখানে খরচের কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই। ফলে অস্বচ্ছল পরিবার সমূহের জন্য এ খরচ বহন করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে।
৯) চাকরি ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা দৃশ্যতঃ অগ্রাধিকার না পাওয়া।
১০) দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে তুলতে সরকারের বাস্তবমূখী ও সুদূরপ্রসারি নীতিমালা না থাকা।

দেশে শিল্প, বানিজ্য ও সেবাখাতে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিকের আধিক্য অপরিহার্য। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করার মাধ্যমই কেবল সকল সেক্টরে পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব। যারজন্য প্রয়োজন দেশে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দ্রুত প্রসার। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমূহ দূরীকরনে সরকারের স্বদিচ্ছা এবং কার্যকর ও সুদূরপ্রসারি পদক্ষেপ দেশে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে সন্দেহ নেই।

চ) কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-১৭ অনুযায়ী দেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১০৯.০৫ মিলিয়ন, যা ঐ সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৮.২৮%। সরকারি হিসাবে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২.৫০ মিলিয়ন অদক্ষ শ্রমশক্তি দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে, যাদের সিংহভাগই মাধ্যমিক শিক্ষার গন্ডি পার হতে পারেনা। দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাবে কর্মক্ষম এ জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে প্রচুর বিড়ম্বনার শিকার হওয়ার পাশাপাশি দেশে বেকারত্বের হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। শ্রমবাজারে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কর্মক্ষম অদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে শ্রমবাজারে যুক্ত করার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করাই এখন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি বৃদ্ধির ফলে শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে বাড়তি দক্ষ শ্রমশক্তি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বড় আকারের ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বলা বাহুল্য, স্বল্পশিক্ষিত এ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার একমাত্র পথ দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানসন্মত কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা। যদিও দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রচলন আগে থেকেই রয়েছে, কিন্তু বর্তমান ও আগামীর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তা মোটেও যথেষ্ট নয়। শীঘ্রই বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌছানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশের অর্থনীতির গতিপ্রবাহ ও পরিসর বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ ক্রমান্নয়ে রপ্তানিমূখী অর্থনীতির দিকে ঝুকছে এবং এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এরিমধ্যে সারাদেশে ১০০টির মত অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে গড়ে উঠবে দেশি বিদেশি অসংখ্য বৃহৎ শিল্প কারখানা। এ সমস্ত শিল্প কারখানায় উৎপাদন, বিপনন ও পরিচালন পর্যায়ে প্রয়োজন হবে প্রচুর দক্ষ শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যা এমূহূর্ত্বে বাংলাদেশের নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের অর্থনীতির ভীত মজবুত করে তোলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করে তুলছে । অর্থবছর ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ বছরে গড়ে ইউ.এস.ডলার ১৫.১৬ বিলিয়ন। অতিরিক্ত কর্মক্ষম শ্রমিক বিদেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ

আরও সুগম করতে বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলা জরুরি। এক কথায় দেশের কর্মক্ষম স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ করে দেশী ও বিদেশী শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলাপূর্বক এ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের পথ প্রসারিত করার একমাত্র সমাধান।

দেশে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে নিন্মোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১) সবার জন্য মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অর্জন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অপারগ তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি অবৈতনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

২) বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা সমাপ্তির সনদ প্রদর্শনপূর্বক উপজেলা অফিস থেকে বিয়ের ছাড়পত্র সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করা।

৩) গ্রাম পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার দ্রুত প্রসারকল্পে প্রত্যেক উপজেলা সদরে সরকারিভাবে কমপক্ষে একটি **"কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট"** স্থাপন করা।

৪) কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান সমূহে মানসন্মত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি ঐ সমস্ত প্রতিঠানে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৫) কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট সমূহের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা।

৬) দেশের ও বিদেশের শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে কারিগরি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পূণর্বিন্যাশ করা এবং সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

৭) কারিগরি প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে কারিগরি প্রশিক্ষণের সমগুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করা।

৮) দেশীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে এবং বিদেশের জন্য শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারিদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার বিধান চালু করা।

৯) কারিগরি প্রশিক্ষিতদের কেউ স্বকর্মে নিয়োজিত হতে চাইলে সেক্ষেত্রে উপজেলায় কর্মরত **"শিল্প ও কারিগরি সহায়তা সেল"** তাদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নে নিয়োজিত ব্যাংকের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

১০) কারিগরি প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারিদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে নুন্যতম প্রাথমিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করে দেওয়া।

১১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কর্মপরিধি ও কর্মক্ষমতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা।

১২) কারিগরি শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও মানসন্মত উন্নয়নে জাতিয় বাজেটে কারিগারি শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ নিশ্চিত করা।

উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশে কারিগরি শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও মানসন্মত উন্নয়নের পাশাপাশি অদুর ভবিষ্যতে এদেশে একটি বিশাল দক্ষ যুব শক্তির পাহাড় গড়ে উঠবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অভাবনীয় অবদান রাখার পাশাপাশি বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিকের সুনাম ও গুরুত্ব অর্জন করবে এবং দক্ষ শ্রমিক রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ ব্যাপকভাবে সুগম করবে এব্যাপারে দ্বিমত পোষনের অবকাশ নেই।

****

SIFBD

অধ্যায় : ৫.৪

স্বাস্থ্যখাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।

স্বাস্থ্যখাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার ।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও আধুনিকায়ন।
খ) দেশে চলমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল্যায়ন।
   ১) দেশে চলমান স্বাস্থ্য সেবার পরিসর ও বৈশিষ্ট্য।
   ২) DGHS এর আওতায় চলমান স্বাস্থ্যসেবার ধরন।
   ৩) ২০১৭ সাল নাগাদ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার আকার ও পরিসর।
   ৪) জাতীয় স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনা (অর্গানোগ্রাম)।
গ) উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ ও পরিধি।
ঘ) স্বাস্থ্যখাতে ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র।
ঙ) গ্রাম ও শহর পর্যায়ে রোগ ভেদে মৃত্যুর হার।
চ) স্বাস্থ্যখাতে SDG অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি।
ছ) স্বাস্থ্যখাতে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধরণ।
জ) জি.ডি.পিতে স্বাস্থ্যখাতের অবদান এবং স্বাস্থ্যখাতে প্রবৃদ্ধি।
ঝ) স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয়।
ঞ) স্বাস্থ্য সেবার মানদন্ডে দ. এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
ত) দেশের চিকিৎসা সেবার মান এবং স্বাস্থ্যখাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।
   ১) দেশের চিকিৎসা সেবার মান এবং চলমান স্বাস্থ্য সেবার প্রতি মানুষের আস্থা।
   ২) সাধারনত যে সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশী রোগীরা বিদেশে যায়।
   ৩) বিদেশে চিকিৎসা বাবত ব্যয়।
থ) বাংলাদেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা উন্নয়নের সম্ভাবনা ও করনীয়।
দ) স্বাস্থ্যখাতে বিরাজমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সমূহ।
ধ) দেশে স্বাস্থ্যঝুকি বৃদ্ধির অন্যতম কারন সমূহ।
ন) স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও আধুনিকায়নে প্রস্তাবনা।

ক) স্বাস্থ্যখাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার :

স্বাস্থ্যখাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার :

উন্নত দেশ গঠনের ক্ষেত্রে যেমন উন্নত জাতি গঠন অপরিহার্য, তেমনি উন্নত জাতি গঠনের জন্য সুস্থ জাতি এবং সুস্থ জাতি গঠতে দেশে উন্নত ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে একটি সুস্থ ও উন্নতজাতি গঠন এখন সময়ের দাবি, যার জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যার ঘণত্ব অনসারে দেশব্যাপি স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বৃদ্ধি ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে গোটা জাতিকে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পিত ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবার আওতায় নিয়ে আসা, স্বাস্থ্যখাতে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যা অবধারিত।

দেশে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি- ২০১১ প্রণীত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে " স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানষিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা, যা শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার, যা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। মানবউন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে স্বাস্থ্য সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত "। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুযায়ী চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুযায়ী জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি- ২০১১ এর আওতায় দেশে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :-

- সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতা কেন্দ্রিক মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা।
- রোগ প্রতিরোধ ও রোগব্যাধি সীমিত করনের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

SJFBD

ভৌগলিক সীমার ভিত্তিতে জনসংখ্যার বণ্টন :

HVRS-2018 অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৪.৬ মিলিয়ন , তন্মধ্যে গ্রামে ১১৯.৭৫ মিলিয়ন (৭২.৭৫%) এবং শহরে ৪৪.৮৫ মিলিয়ন (২৭.২৫%) জনগোষ্ঠীর বসবাস। (Distribution ratio based on HIES-2016) :-

Area	Number	Average Population	Population
Bangladesh		**Total Population (Million)**	**164.60**
Division	8	Per Division (Million)	20.58
Districts	64	Per District (Million)	2.57
Rural Population		**(72.75%) Million**	**119.75**
Upazila	492	Population per Upazila	243,394
Union	4,553	Population per Union	26,310
Ward	40,997	Population per Ward	2,922
Village	87,310	Population per Village	1,372

Source: BBS

Health Care delivery in rural areas

খ) দেশে চলমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল্যায়ন :

দেশে চলমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল্যায়ন :

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত তুলনামূলক ধীরগতিতে এগিয়েছে বলা চলে। ১৯৭১ থেকে ২০২০, দীর্ঘ এ ৫ দশক সময়কালে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ, আগের চেয়ে মানুষের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যক্তিপর্যায়ে ক্রয় ক্ষমতা। স্বাস্থ্য উন্নয়নে মানুষ এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন, অনেক বেশি অগ্রগামী, ফলে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে আরোও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দেশের দুই তৃতীয়াংশের বেশি জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে, যাদের সিংহ ভাগই কৃষিজীবি এবং নিম্ন আয়ের মানুষ। স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যন্নোয়নে ব্যয়ের সামর্থ দুটোই তাদের সীমিত। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সকলের জন্য সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে স্বাস্থ্য সেবার আওতা ও পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশব্যাপি সাশ্রয়ীমূল্যে মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে বাংলাদেশের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে , যার মধ্যে **"দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতের আওতা বৃদ্ধি ও মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে সকলের জন্য সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা"** অন্যতম ।

১) দেশে চলমান স্বাস্থ্য সেবার পরিসর ও বৈশিষ্ট্য :

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য সেবার ধাপ সমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি / জরুরি স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম। ২০১৭ সাল নাগাদ দেশে স্বাস্থ্যখাতে সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে :-

- **স্বাস্থ্যখাতে সারাদেশে কর্মরত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়গনিষ্টিক সেন্টার এর সংখ্যা সর্বমোট ৩৪,৯৪২ টি, তন্মধ্যে :-**
  - ➢ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এর সংখ্যা ৫,৬২৭ টি এবং হাসপাতল বেড সংখ্যা মোট ১৩৭,০২৪ টি।
  - ➢ উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে OPD & Community Clinics ১৮,৬৪০ টি ; এবং
  - ➢ প্রাইভেট ডায়গনিষ্টিক সেন্টার ১০,৬৭৫ টি।
- **স্বাস্থ্যখাতে কর্মরত রেজিষ্টার্ড স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা সর্বমোট ১০৪,৮০৬ জন, তন্মধ্যে :-**

- ➢ DGHS এর অধীনে অনুমোদিত ১১৩,৮৯১ পদের বিপরীতে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা ৮৬,৬২৬ জন ; এবং
- ➢ UNFWC এর অধীনে কর্মরত ১৮,১৮০ জন।

- **প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে জনসংখ্যা ও কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীর অনুপাত :-**
  - ➢ ডাক্তার-৬.৩৩ জন (SDG লক্ষ্যমাত্রায় যা ৪৪.৫ জন)
  - ➢ মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট ০.৩২ জন (SDG লক্ষ্যমাত্রায় যা ৩ জন)
  - ➢ কমিউনিটি ও ডমিসিলারি স্বাস্থ্যকর্মী ২.১৩ জন
  - ➢ সরকারি হাসপাতালের বেড - ৩.২৪ টি ; এবং
  - ➢ বেসরকারি হাসপাতালের বেড-৫.৫৭ টি।
- স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান ডাক্তার, নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট এর অনুপাত ১ : ০.৫৬ : ০.৪০ (SDG লক্ষ্যমাত্রায় যা প্রয়োজন ১ : ৩ : ৫)
- DGHS এর অধীনে অনুমোদিত ১১৩,৮৯১ টি পদের বিপরীতে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা ৮৬,৬২৬ জন এবং ঐ সময়ে স্বাস্থ্য কর্মীর শূণ্য পদের সংখ্যা ২৭,২৬৫ টি (২৩.৯৪%)।

২) DGHS এর আওতায় চলমান স্বাস্থ্যসেবার ধরন :

National	Divisional	District	Upazila	Union	Ward
• Public Health Institute • Post Graduate Medical Institute & Hospital with Nursing Institute. • Specialized Health Center.	• Medical College & Hospital with Nursing Institute. • General Hospital with Nursing Institute. • Infectious Disease Hospital. • Institute of Health Technology.	• District Hospital with Nursing Institute. • General Hospital with Nursing Institute. • Medical College & Hospital with Nursing Institute. • Chest Disease Clinic. • Leprosy Hospital. • Medical assistant's Training School.	• Upazila Health Complex. • T.B Clinic (in some).	• Rural Health Center. • Union Sub-Center. • UHFWC (in some).	Community Clinic

৩) ২০১৭ সাল নাগাদ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার আকার ও পরিসর :-

Indicators of Health and Family Planning under MOHFW

A) Maternal Mortality Ratio in last 10 years :

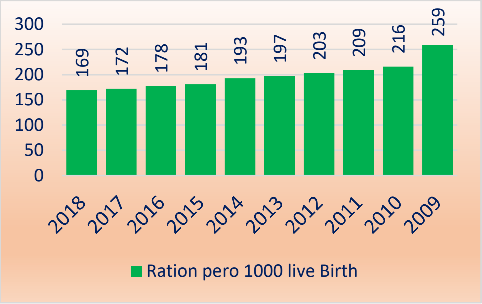

B) Neo-Natal Mortality Rate in last 10 years:

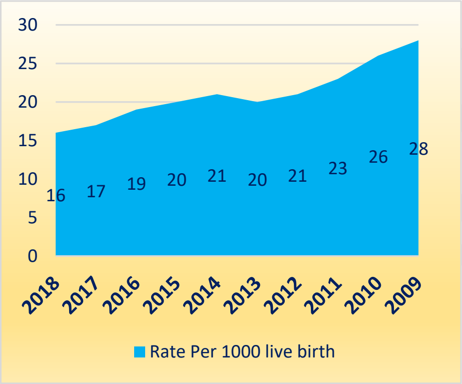

C) Crude Birth rate :

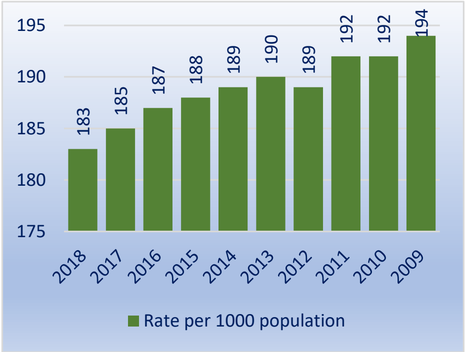

Health Service Facilities in the Country :

A) Total Facilities in Health Sector :

Health Service Facilities	No. of Hospitals	No. of Beds
a) Govt. Hospitals under DGHS		
• Tertiary hospitals	127	29,973
• Upazila Health Complex	426	18,611
• Union Level Hospitals	51	830
b) Govt. Clinics under UHFWC		
• OPD Clinics at Upazila Level	94	-
• OPD Clinics at Union Level	5,124	-
• Community Clinics at Ward level	13,422	-
c) Private Org.(Regd. Under DGHS)		
• Hospitals & Clinics	5,023	87,610
• Diagnostic Centers	10,675	-
Total facilities in Health Service	**34,942**	**137,024**

B) Primary Healthcare Facilities at Upazila and village level :-

Type of Facilities	No. of Hospitals	No. of Beds
Upazila Health complex	426	18,611
Union Level Hospitals	51	830
OPD Clinics & UHFWC at Upazila Level	64	-
OPD Clinics & UHFWC at Union Level	5,124	-
Community Clinics at Ward Level	13,442	-
Total Primary Healthcare Facilities:	**19,107**	**19,441**

C) Secondary and tertiary level facilities :

Type of Hospitals	No. of Hospitals	No. of Beds
100-bed hospital	1	100
Chest diseases hospitals	13	816
Dental college hospital	1	200
District and general hospitals	64	10,450
Hospital of alternative medicine	2	200
Infectious disease hospitals	5	180
Leprosy hospitals	3	130
Medical college hospitals	17	13,713
Specialized hospital	5	1,050
Specialty postgraduate institute and hospital	11	3,034
Trauma center	5	100
Total :	**127**	**29,973**

D) Life Expectancy at Birth :

Source : BBS

D) Health Workforce under DGHS and UHFWC :

Registered Workforce	Working	Sanctioned
Registered under DGHS :		
• Doctors	20,602	24,900
• Medical Technologists	5,254	7,817
• SACNO	3,886	5,368
• Nurses and Junior Midwives	56,884	75,806
Workforce under DGHS	86,626	113,891
Registered under UHFWC :		
• Junior Midwives	2,429	
• Family Welfare Visitors	6,699	-
• Community S. Birth Attendants	9,052	-
Workforce under UHFWC	18,180	
Total Workforce in Health Sector	**104,806**	

E) Population - Health Workforce Ratio :

Total population (Million)	162.7
Population per registered physician	1,581
No. of registered physicians per 10,000 populations	6.33
No. of doctors under DGHS per 10,000 populations	1.28
No. of medical technologists per 10,000 populations	0.32
No. of community and domiciliary health workers per 10,000 people	2.13
No. of beds in public hospitals per 10,000 populations	3.24
No. of beds in private hospitals (registered by DGHS) per 10,000 populations	5.57

Source : DGHB-2017 & 18, BBS Statistics 2017 & 18.

৪) : জাতীয় স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনা (অর্গানোগ্রাম) :

Government of the People's Republic of Bangladesh
DGHS
Directorate General of Health Services
Ministry of Health and Family Welfare

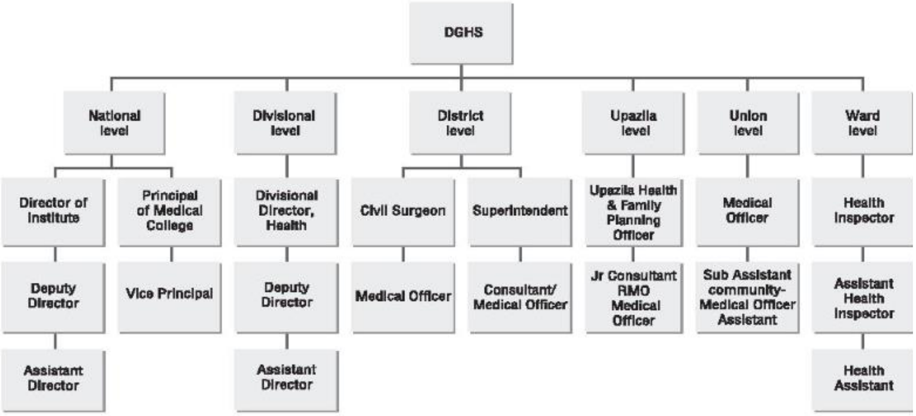

গ) উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ ও পরিধি :

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ধরন ও পরিধি :

১. উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা :

২০১৭ সাল সাল নাগাদ দেশে মোট ৪৯২ উপজেলার মধ্যে ৪২৬ উপজেলায় **"উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্স"** এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে সর্বমোট বেড সংখ্যা ১৮,৬১১টি, গড়ে প্রত্যেকটিতে বেড সংখ্যা ৪৪ এবং ডাক্তারের সংখ্যা ৬ জন। অর্থাৎ দেশের ৪২৬ উপজেলায় প্রত্যেকটিতে গড়ে ২৪৩,৩৯৪ জনসংখ্যার বিপরীতে ৬ (ছয়) জন ডাক্তার এবং ৪৪ টি হাসপাতাল বেডের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশিষ্ট ৬৪ উপজেলায় OPD Clinic এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। (উল্লেখ্য, SDG টার্গেট অনুযায়ী প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে নির্ধারিত স্বাস্থ্য কর্মীর ঘণত্ব ৪৪.৫, সে হিসাবে প্রতি উপজেলায় স্বাস্থ্যকর্মী প্রয়োজন ১,০৮৩ জন)।

২) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা :

দেশে মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ৪,৫৫৩ এবং ২০১৭ সাল নাগাদ প্রত্যেক ইউনিয়নে গড়ে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ ২৬,৩১০ জন। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপিত ৫,১২৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে প্রতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিপরীতে লোকসংখ্যার পরিমাণ কমবেশি ২৩,৩৭০ জন।

৩) গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা :

সারাদেশে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৪০,৯৭৭ এবং প্রতি ওয়ার্ডে গড়ে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ ২,৯২২ জন। ২০১৭ সাল নাগাদ ১৩,৪২২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশিষ্ট ২৭,৫৫৫ ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার বিস্তৃতি তখনো ঘটেনি।

স্মারণী-৫.৪(১) : ২০১৭ সাল নাগাদ উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার চিত্র :-

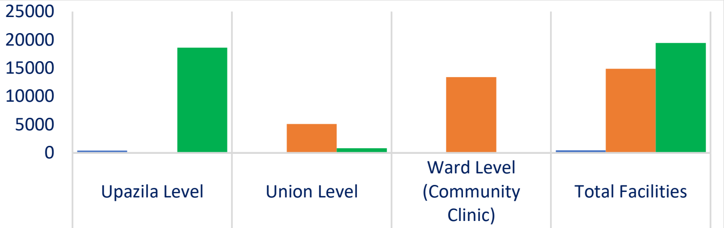

	Upazila Level	Union Level	Ward Level (Community Clinic)	Total Facilities
Hospital	426	51	0	477
OPD Clinic & UHFWC	64	5124	13,422	14,885
No. of Beds	18,611	830	0	19,441

Source : BBS, DGHS

ঘ) স্বাস্থ্যখাতে ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র :

স্বাস্থ্যখাতে ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূচকের অগ্রগতি যথেষ্ট সাফল্যজনক এটা মানতেই হবে, অন্তত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক ও আই. এম.এফ এর রিপোর্ট এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট তাই প্রমাণ করে। তবে একথাও সত্য যে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে সামঞ্জস্যতা রেখে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন যেমন সম্ভব হচ্ছেনা, তেমনি মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের আওতা শহরের তুলনায় গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট সীমাবদ্ধ, ফলে স্বাস্থ্যখাতে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ এখনো অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

বিগত ২০০৯-২০১৮ সময়কালে স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ ১০ টি সূচকের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রত্যেকটি সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক, তবে একটিমাত্র সূচক ব্যাতিত বেশিরভাগ সূচকেই শহরের তুলনায় গ্রাম পর্যায়ে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। যেমন, সর্বশেষ ২০১৮ সালের বিশ্লেষণে দেখা যায় :-

- **Maternal Mortality** (per 1000 live births) : জাতিয়ভাবে ১.৬৯, গ্রামে ১.৯৩ এবং শহরে ১.৩২।
- **Infant Mortality Rate** (Per 1000 Live Birth) : জাতিয়ভাবে ২২ গ্রামে ২২ এবং শহরে ২১।
- **Under 5 Mortality Rate** (Per 1000 Live Birth) : জাতিয়ভাবে ২৯, গ্রামে ৩১ এবং শহরে ২৭।
- **Contraceptive use %** : জাতিয়ভাবে ৬৩.১%, গ্রামে ৬২.৪%, শহরে ৬৪%।
- **Total Fertility Rate** (Per Woman 15-49 age) : জাতিয়ভাবে ২.০৫, গ্রামে ২.৩৮, শহরে ১.৬৮।

স্মারণী-৫.৪(২) : ২০০৯- ২০১৮ সময়কালে স্বাস্থ্যখাতের ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র :

SL	Health Indicator	Periods									
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
1	**Maternal Mortality Rate (Per 1000 Live Birth)**										
	National	1.69	1.72	1.78	1.81	1.93	1.97	2.03	2.09	2.16	2.59
	Rural	1.93	1.82	1.90	1.91	1.96	2.11	2.10	2.15	2.30	2.85
	Urban	1.32	1.57	1.60	1.62	1.82	1.46	1.90	1.96	1.78	1.79
2	**Infant Mortality Rate (Per 1000 Live Birth)**										
	National	22	24	28	29	30	31	33	35	36	39

Rural	22	25	28	29	31	34	34	36	37	40
Urban	21	22	28	28	26	26	31	32	35	37
3 Neo-Natal Mortality Rate (Per 1000 Live Birth)										
National	16	17	19	20	21	20	21	23	26	28
Rural	16	17	19	20	21	23	22	24	26	29
Urban	16	17	20	20	19	16	21	22	25	28
4 Under 5 Mortality Rate (Per 1000 Live Birth)										
National	29	31	35	36	38	41	42	44	47	50
Rural	31	33	36	39	40	43	44	47	48	52
Urban	27	27	32	32	30	35	37	39	44	47
5 Contraceptive Prevalence Rate (%)										
National	63.1	62.5	62.3	62.1	62.2	62.4	62.2	58.3	56.7	56.1
Rural	62.4	59.4	59.3	60.4	61.6	61.8	59.8	56.0	55.3	54.4
Urban	64.0	66.3	65.9	64.5	64.5	64.1	66.1	62.2	60.9	58.7
6. TB case detection rate (%) Per 100,000 Population.										
National			61	57	54	53	48	44	45	48
Rural										
Urban										
7. Child Vaccination (all Vaccines) by 12 months of age.										
Vaccinated (%)	86	-	-	-	78	-	-	83	-	-
8. Total Fertility Rate (Per Woman 15-49 age)										
National	2.05	2.05	2.10	2.10	2.11	2.11	2.12	2.11	2.12	2.15
Rural	2.38	2.37	2.38	2.30	2.22	2.19	2.30	2.25	2.26	2.28
Urban	1.68	1.68	1.68	1.72	1.77	1.84	1.84	1.71	1.72	1.65
9. Life-expectancy at birth										
Total	72.3	72.0	71.6	70.9	70.7	70.4	69.4	69.0	67.7	67.2
Male	70.8	70.6	70.3	69.4	69.1	68.8	68.2	67.9	66.6	66.1
Female	73.8	73.5	72.9	72.0	71.6	71.2	70.7	70.3	68.8	68.7
10. Trends in Child Nutritional Status.										
Stunting	31	-	-	-	36	-	-	41	-	-
Underweight	22	-	-	-	33	-	-	36	-	-
Wasting	8	-	-	-	14	-	-	16	-	-

Source : BBS, DGHS

ঙ) গ্রাম ও শহর পর্যায়ে রোগ ভেদে মৃত্যুর হার :

স্থান ও পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন রোগের ধরণ ও প্রকোপ এর মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন, চিকিৎসা ব্যবস্থার যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে তা মোকাবেলা করা হয়, এটাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রীতি। দেশের গ্রাম ও শহর পর্যায়ে জীবনঘাতী বিভিন্ন রোগের মাত্রা সবসময় কমবেশি হয়ে থাকে, যা মৃত্যুর হারে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী হৃদরোগ, হার্ট এটাক, উচ্চ রক্তচাপ, ব্রেইন স্ট্রোক, বার্ধক্যজনিত রোগ, কিডনি ও ডায়বেটিকসে মৃত্যুর হার গ্রামের তুলনায় শহরে যথেষ্ট বেশি। অন্যদিকে ক্যানছার, এ্যাজমা, সংক্রমন ব্যাধি, পেনোমনিয়া, জন্ডিস ও যক্ষা রোগে মৃত্যুর হার শহরের তুলনায় গ্রাম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রাম ও শহর পর্যায়ে বিভিন্ন রোগের প্রভাব বিস্তারের মাত্রা প্রধান্য পাওয়া উচিত।

গ্রাম ও শহর পর্যায়ে রোগ ভেদে মৃত্যুর হার :

স্মারণী-৫.৪(৩) : SVRS- 2018 অনুযায়ী উল্ল্যেখযোগ্য ১৫ টি জীবনঘাতি রোগে মৃত্যুর চিত্র :

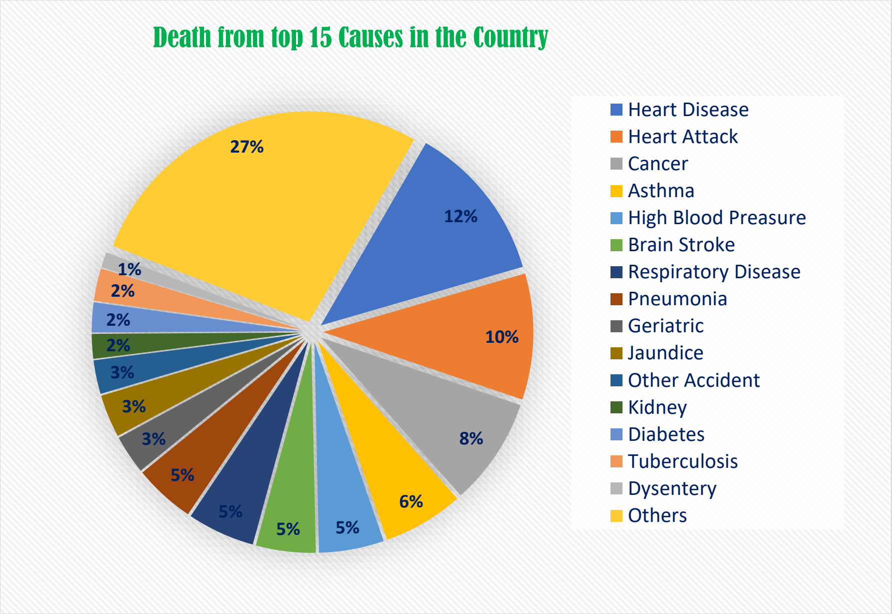

Source : SVRS-2018

চ) স্বাস্থ্যখাতে SDG অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি :

২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে ২০৩০ সাল নাগাদ স্বাস্থ্যখাতে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পূর্বক দেশে সবার জন্য সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য একটি বাধ্যতামূলক চ্যালেঞ্জ। SDG Goal- 3 "Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages" অর্জনে স্বাস্থ্যখাতের যে ৪ (চারটি) ক্ষেত্রের উন্নয়ন বিবেচনায় নেওয়া হয় (**HEALTH INDICATORS IN SDG)** , সেগুলো হলো :-

- Reproductive, maternal, Newborn and child health
- Infectious diseases
- Non communicable diseases
- Service capacity, access and health security

Note : 1. SDG comprises 17 goals, 169 targets including 230 indicators.

২০১৮ সাল নাগাদ স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিশ্লেষণে স্বাস্থ্যখাতের ২৫ টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৫ টি সূচকের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও অবশিষ্ট সব কয়টি সূচকের ক্ষেত্রে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এখনো যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। পিছিয়ে থাকা সূচকগুলোর মধ্যে - মাতৃ মৃত্যুর হার, ফ্যামিলি প্লানিং, এডোলসেন্ট বার্থ রেট, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার আওতা বৃদ্ধি, জাতীয়ভাবে শতভাগ জনসংখ্যার ভ্যাক্সিনেশন, মেডিকেল রিচার্চ ও মৌলিক স্বাস্থ্য সেবায় অফিসিয়াল অগ্রগতি, জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য কর্মীর ঘণত্ব এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার সক্ষমতা অর্জনে পিছিয়ে থাকা অন্যতম।

স্বাস্থ্যখাতে SDG অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি :

স্বাস্থ্যখাতের অতি গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি সূচকের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, সেগুলো হচ্ছে :-

১. **প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার পরিধি :** SDG অর্জনে প্রয়োজন শতভাগ, ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্জন মাত্র ৫০%।

2. **মেডিকেল রিচার্চ ও মৌলিক স্বাস্থ্য সেবায় অফিসিয়াল অগ্রগতি :** SDG অর্জনে প্রয়োজন 500 MUS$, ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্জন 177.4 MUS$.

৩. **জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য কর্মীর ঘণত্ব :**

- **স্বাস্থ্য কর্মী :** SDG অর্জনে পতি ১০,০০০ মানুষের বিপরীতে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজন ৪৪.৫ জন, ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে রয়েছে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে স্বাস্থ্য কর্মী ৮.৩ জন।.
- **ডাক্তার, নার্স ও হেলথ্ টেকনোলজিষ্ট অনুপাত :** SDG অর্জনে প্রয়োজন ১ : ৩ : ৫ জন, ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে রয়েছে ১ : ০.৫৬ : ০.৪০ ।

স্মারণী-৫.৪(৪) : ২০১৮ সাল নাগাদ স্বাস্থ্যখাতে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি :-

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDG Goal 3			Achievements of Bangladesh by 2018	Remarks
SDG Target	**Indicators**	**Target by 2030**		
3.1.1	Maternal Mortality ratio (per 100,000 live births)	70	169 (SVRS-2018)	Far behind
3.1.2	Birth attended by skilled Health personnel.	70	69.1 (SVRS-2018)	Good
3.2.1	Under-five mortality rate (Per 1000 Live Birth)	25	29 (SVRS-2018)	Good
3.2.2	Neonatal mortality rate	12	16 (SVRS-2018)	Good
3.3.1	New HIV infections per 1,000 population	0.16	0.01 (WHO Report 2018)	
3.3.2	Tuberculosis incidence per 100,000 population	150	221 (Global TB report 2018)	Far behind
3.3.3	Malaria incidence per 1,000 population	0	0.69 (Who Report 2018)	Far behind
3.3.4	Hepatitis B incidence per 100,000 population	-	5.46 (From OP)	Far behind
3.3.5	People requiring interventions against neglected tropical diseases	35,000,000	47,484,224 (Health SDG Profile: Bangladesh,2018, WHO)	Far behind
3.4.1	Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease.	6%	14.4% (SVRS-2018) a) Cancer - 7.7 % b) Respiratory dis. - 4.3% c) Diabetics - 2.4%	Far behind
3.4.2	Suicide mortality rate	2.4	7.8	Far behind
3.5.1	Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders	-	22.212(2016) 16.386(2015) 16.852(2014)	Far behind
3.6.1	Death rate due to road traffic injuries	1.2	15.56 (WHO, 2017	Far behind
3.7.1	Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their	100%	73.8%(BDHS, 2017-18)	Far behind

	need for family planning satisfied with modern methods			
3.7.2	Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group	50	75 (SVRS,2017)	Far behind
3.8.1	Coverage of essential health services	100	50 (SDG Profile: Bangladesh,2018, WHO)	Far behind
3.8.2	Proportion of population with large household expenditures on health as a share of total household expenditure or income	10%	13.9%(SDG Profile: Bangladesh 2018, WHO)	Far behind
3.9.1	Mortality rate attributed to household and ambient air pollution	55	68.2 (WHO, 2012)	Far behind
3.9.2	Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services)	4.5	5.96 (WHO 2016)	Good
3.9.3	Mortality rate attributed to unintentional poisoning	4	5.72 (WHO 2016)	Good
3.a.1	Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 15 years and older			
3.b.1	Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national	100%	85.6% (BDHS, 2018)	Far behind
3.b.2	Total net official development assistance to medical research and basic health sectors	500 MUS$	252.5 MUS$ (ERD, FY17)	Far behind
3.c.1	Health worker density (per 10,000 population) a) % of Health Worker Density b) Ration – Physician :Nurse: Health Technologist	(a) 44.5 (b) 1: 3: 5	a) 8.3 (HRH Country profile, 2017, MOHFW b) 1 : 0.56 : 0.40	Far behind
3.d.1	International Health Regulations (IHR) capacity and health emergency preparedness	100	87.5 (WHO, 2016)	Far behind

Source : DGHS Health Report and SVRS-2018

ছ) স্বাস্থ্যখাতে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধরণ :

বিগত ১০ বছরে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের হার বাজেট অনুপাতে ৪.৫০% - ৫.৫০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, গড়ে যা ৪.৯৭%, সংশ্লিষ্ট বছরের জি.ডি.পি অনুপাতে যা ১% এর নীচে। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধকৃত এ অর্থের আনুমনিক ৩৮%-৪০% ব্যয় হয় এখাতের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন , ২২%-২৪% মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের পেছনে এবং অবশিষ্ট ৩৮%-৪০% (গড়ে জাতিয় বাজেটের

স্বাস্থ্যখাতে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধরণ :

১.৭৫%) ব্যয় হয় স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে স্মারণী-৫.৪(৫), একটি উন্নয়নশীল দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে যা কোনো মতেই পর্যাপ্ত নয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধ বাংলাদেশে ০.৮৯%। ঐ একই অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধের হার পাকিস্তানে ০.৯%, ভারতে ১.৪%, শ্রীলংকায় ২%, নেপালে ২.৩%, আফগানিস্তানে ২.৯% এবং মালদ্বীপে ১০.৯% স্মারণী-৫.৪(৬) ।

স্মারণী-৫.৪(৫) : বিগত দশকে বাংলাদেশে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বার্ষিক বরাদ্ধের চিত্র :-

National Budget		Health Sector Allocation	
Financial Year	Budget (In Billion TK.)	Alloc-ation (%)	Amount (in Crore TK.)
2010-11	1,321.70	6.2	8,195
2011-12	1,635.89	5.4	8,834
2012-13	1,917.38	4.9	9,395
2013-14	2,224.91	4.3	9,567
2014-15	2,505.06	4.4	11,022
2015-16	2,951.00	4.3	12,689
2016-17	3,406.05	5.1	17,371
2017-18	4,002.66	5.2	20,814
2018-19	4,645.73	5.0	23,229
2019-20	5,231.90	4.9	25,636

Break-up of Allocated amount :-

- Operating Expenditure - 38% - 40%
- Medical Education & F.Welfare - 22% - 24%
- Development Expenditure - 38% - 40%

Source : Ministry of Health & Family Welfare.

স্মারণী-৫.৪(৬) : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের স্বাস্থ্যখাতে বাৎসরিক বরাদ্ধের চিত্র :-

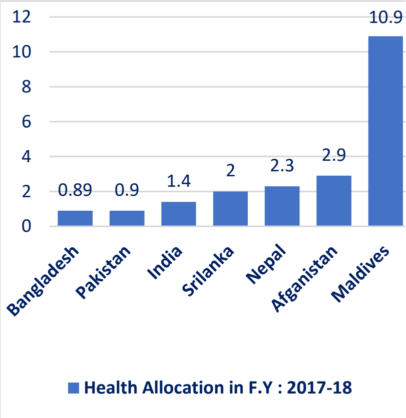

Source : South Asian Journal

জ)জি.ডি.পিতে স্বাস্থ্যখাতের অবদান এবং স্বাস্থ্যখাতে প্রবৃদ্ধি :

জি.ডি.তে স্বাস্থ্যখাতের অবদান এবং স্বাস্থ্যখাতে প্রবৃদ্ধির চিত্র :

দেশের জি.ডি.পি তে স্বাস্থ্যখাতের অবদান খুবই সামান্য, দীর্ঘ সময় ধরে যা অনেকটা একই পর্যায়ে রয়ে গেছে। জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখ্যাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অনেকটা একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়, যদিও বিগত দশকে স্বাস্থ্যখাতে প্রবৃদ্ধি কিছুটা উঠানামা করেছে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালের বাৎসরিক জি.ডি.পি তে স্বাস্থ্যখাতের অবদান, জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় এবং স্বাস্থ্যখাতে প্রবৃদ্ধির হার নিন্মে প্রদত্ত হলো :-

- **জি.ডি.পি তে স্বাস্থ্যখাতের অবদান :** ২০১০-১১ অর্থবছরে ১.৯৫%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১.৯০%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১.৮৮%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১.৮৬%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১.৮৩%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১.৮৪%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.৮৫%, এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৮৩%।
- **জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে চলতি ব্যয় :** ২০১০-১১ অর্থবছরে ২.৫%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২.৫৭%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২.৫৭%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২.৫%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৫%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৪৬%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.৩১%, এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২.২৭%।

- **স্বাস্থ্যখাতে প্রবৃদ্ধির হার :** ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৩৪%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩.৮১%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪.৭৬%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫.০৬%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫.১৮%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৫৪%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.৬৩%, এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.০২%।

স্মারণী-৫.৪(৭) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে জি.ডি.পি তে স্বাস্থ্যখাতের অবদান, জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে চলতি ব্যয় এবং স্বাস্থ্যখাতে প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

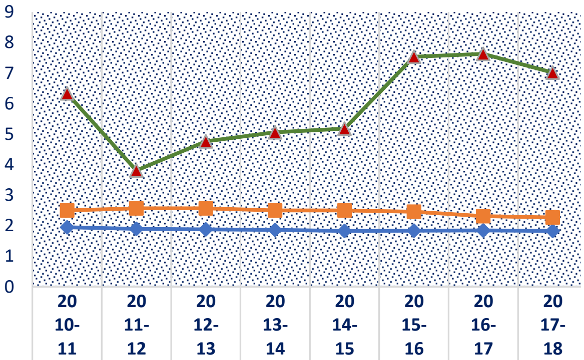

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Share of Health Sector to GDP	1.95	1.9	1.88	1.86	1.83	1.84	1.85	1.83
Health Exp. As % of GDP	2.5	2.57	2.57	2.5	2.5	2.46	2.31	2.27
Growth Rate of Health Sector	6.34	3.81	4.76	5.06	5.18	7.54	7.63	7.02

Source : World Bank Data

ঝ) স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয় :

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয় :

১) স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় :

স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও সবচেয়ে পিছনের সারিতে অবস্থান করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় (ইউ.এস.ডলার) - ২০১০ সালে ২০.১৮, ২০১১ সালে ২২.১৬, ২০১২ সালে ২২.৭৫, ২০১৩ সালে ২৫.৮৬, ২০১৪ সালে ২৮.৮৩, ২০১৫ সালে ৩১.৮৪, ২০১৬ সালে ৩৩.৫৩ এবং ২০১৭ সালে ৩৬.২৮ স্মারণী-৫.৪(৮)। এ সময়কালে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে ইউ.এস.ডলার ২.০১।

২) স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যাক্তিগত ব্যয় :

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যাক্তিগত ব্যয় এখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়ের চেয়ে গড়ে প্রায় ৩ গুণ বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যক্তিগত খরচ

স্মারণী-৫.৪(৮) : জ.ডি.পি অনুপাতে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয় (ইউ.এস.ডলার) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮।

(ইউ.এস.ডলার) - ২০১০ সালে ৬৭.২১, ২০১১ সালে ৬৭.৩৭, ২০১২ সালে ৬৭.৪৭, ২০১৩ সালে ৬৮.৫২, ২০১৪ সালে ৬৯.৯৩, ২০১৫ সালে ৭১.৮২, ২০১৬ সালে ৭৩.১৩ এবং ২০১৭ সালে ৭৩.৮৯ **স্মারণী-৫.৪(৯)**। স্বাস্থ্যখাতে ব্যাক্তিগত খরচ অস্বাভাবিক রকম বেশি হওয়ার কারনে জরুরি চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে এদেশের সীমিত আয়ের মানুষদের অনেক বেশি বেগ পেতে হয়, এমনকি জরুরি চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে সর্বশান্ত হওয়ার নজিরও এদেশে কম নয়, যা সীমিত আয়ের মানুষদের প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক জীবনে মারাত্মক বিরুপ প্রভাব ফেলছে।

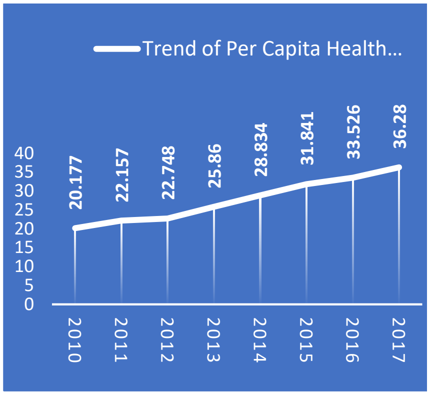

Source: WHO, 2016

৩) স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু মোট ব্যয় :

স্মারণী-৫.৪(৯) : ২০১০-২০১৭ সময়কালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু মোট ব্যয়ের চিত্র :

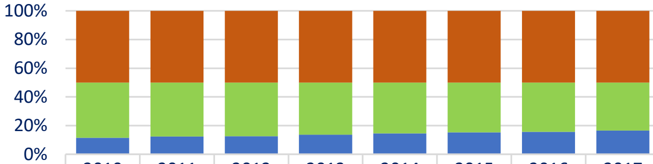

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total Per Capita Health Exp. (in US$)	87.39	89.53	90.22	94.38	98.76	103.66	106.66	110.17
Out of Pocket Exp. (Private)	67.21	67.37	67.47	68.52	69.93	71.82	73.13	73.89
Per Capita Health Exp. (Govt.)	20.18	22.16	22.75	25.86	28.83	31.84	33.53	36.28

Source: WHO Health Report.

ঞ) স্বাস্থ্য সেবার মানদন্ডে দ. এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

১) স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের দিক থেকে :

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় এবং এখাতে বিরাজমান সুযোগ সুবিধার পর্যাপ্ততার ভিত্তিতেই স্বাস্থ্যখাতের মান নির্ধারিত হয়। জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়, স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় এবং সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের দিকথেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও সবচেয়ে পেছনে অবস্থান করছে। স্বাস্থ্য সেবার অন্যতম মাপকাঠি সমূহ, যেমন-ডাক্তার, নার্স ও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী কতৃক সন্তান প্রসব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোতে বাংলাদেশ আরোও নাজুত অবস্থানে রয়েছে।

২০১৭ সালের তথ্যানুযায়ী জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়, স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় এবং সরকারি মোট ব্যয়ের অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের তথ্য নিন্মে তুলেধরা হলো :-

- **জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়** : বাংলাদেশে -২.২৭%, ইন্ডিয়ায়- ৩.৫৩%, ভূটানে- ৩.১৯%, ইন্দুনেশিয়ায়-২.৯৯%, শ্রীলংকায়-৩.৮১%, থাইল্যান্ডে-৩.৭৫%, মালয়েশিয়ায়- ৩.৮৬%, চায়না-৫.১৫%, দঃ কোরিয়া-৭.৬%, মালদ্বীপ-৯.০৩ এবং জাপানে-১০.৯৪%।

স্বাস্থ্য সেবার মানদন্ডে দ. এশিয়ায় বাংলাদে-শের অবস্থান :

- **স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় (ইউ.এস.ডলার) :** বাংলাদেশে -৩৬.২৮, ইন্ডিয়ায়-৬৯.২৯, ভূটানে-৯৬.৮০, ইন্দুনেশিয়ায়-১১৪.৯৭, শ্রীলংকায়-১৫৯.৪৮, থাইল্যান্ডে-২৪৭.০৪, মালয়েশিয়ায়-৩৮৪.০৭, চায়না-৪৪০.৮৩, দঃ কোরিয়া-২,২৮৩.০৭, মালদ্বীপ-১,০০৬.৯৪ এবং জাপানে-৪,১৬৮.৯৯।
- **সরকারি মোট ব্যয়ের অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় :** বাংলাদেশে -২.৯৯%, ইন্ডিয়ায়- ৩.৩৮%, ভূটানে-৭.৯০%, ইন্দুনেশিয়ায়-৮.৭৩%, শ্রীলংকায়-৮.৪৭%, থাইল্যান্ডে-১৫.০৩%, মালয়েশিয়ায়-৮.৯৩%, চায়না-৯.০৭%, দঃ কোরিয়া-১৩.৪২%, মালদ্বীপ-২১.৭৮% এবং জাপানে-২৩.৬৪%।

স্মারণী-৫.৪(১০) : ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র :-

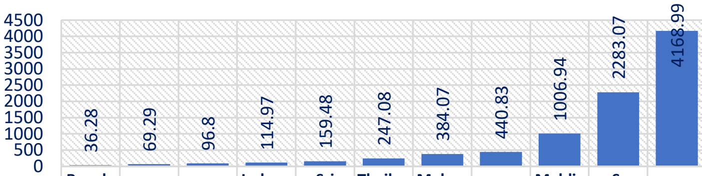

	Bangla desh	India	Bhutan	Indone sia	Sri Lanka	Thailan d	Malays ia	China	Maldiv es	S. Korea	Japan
Per Capita Health Exp. (USD)	36.28	69.29	96.8	114.97	159.48	247.08	384.07	440.83	1006.94	2283.07	4168.9
Health Exp. as % of GDP	2.27	3.53	3.19	2.99	3.81	3.75	3.86	5.15	9.03	7.6	10.94
Health Exp. as % of Govt. Exp.	2.99	3.38	7.9	8.73	8.47	15.03	8.93	9.07	21.78	13.42	23.64

Source : WHO Health Observatory Report

২) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধার দিক থেকে :

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধার পর্যাপ্ততার দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এর অন্যতম কারন স্বাস্থ্যখাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যয়, এখাতে দুর্বল পরিকল্পণা ও তদারকি ব্যবস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী ২০১৭ সাল নাগাদ জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে চলতি ব্যয় বাংলাদেশে ২.২৭%, ভারতে যা ৩.৫৩%, ভূটানে ৩.১৯%, ইন্দোনেশিয়ায় ২.৯৯%, শ্রীলংকায় ৩.৮১%, থাইল্যান্ডে ৩.৭৫%, মালয়েশিয়ায় ৩.৮৬%, চীনে ৫.১৫%, দ. কোরিয়ায় ৭.৬০%, মালদ্বীপে এবং জাপানে ১০.৯৪%। স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় এবং সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের দিকথেকেও বাংলাদেশের অবস্থান একদমই নিচের সারিতে স্মারণী-৫.৪(১১)।

তাছাড়া, স্বাস্থ্যখাতে জনবল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার দিকথেকেও বাংলাদেশের অবস্থা একই রকম নাজুক অবস্থানে রয়েছে, যা নিন্মে তুলেধরা হলো :- ।

- **প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে ডাক্তার :** বাংলাদেশে -৫.৮১, ইন্ডিয়ায়- ৮.৫৭, ভূটানে-৪.২৪, ইন্দুনেশিয়ায়-৪.২৭, শ্রীলংকায়-১০.০৪, থাইল্যান্ডে-৮.৫৭, মালয়েশিয়ায়-১৫.৩৬, চায়না-১৯.৮০, দঃ কোরিয়া-২৩.৬১, মালদ্বীপ-৪৫.৬৩ এবং জাপানে-২৪.১২।
- **প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে নার্স :** বাংলাদেশে -৪.১২, ইন্ডিয়ায়- ১৭.২৭, ভূটানে-১৮.৫২, ইন্দুনেশিয়ায়-২৪.১৫, শ্রীলংকায়-২১.৮০, থাইল্যান্ডে-২৭.৫৯, মালয়েশিয়ায়-৩৪.৬৮, চায়না-২৬.৬২, দঃ কোরিয়া-৭৩.০১, মালদ্বীপ-৬৪.২৮ এবং জাপানে-১২১.৫০।
- **দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে সন্তান প্রসব (%) :** বাংলাদেশে -৬৭.৮, ইন্ডিয়ায়- ৮১.৪, ভূটানে-৯৬.৪, ইন্দুনেশিয়ায়-৯৩.৬, শ্রীলংকায়-৯৮.৬, থাইল্যান্ডে-৮১.৪, মালয়েশিয়ায়-৯৯.৫, চায়নায়-৯৯.৯, দঃ কোরিয়ায়-১০০, মালদ্বীপে-৯৫.৬ এবং জাপানে-৯৯.৮।

স্মারণী-৫.৪(১১) : ২০১৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধার তুলনামূলক চিত্র :-

Country	Health systems			Health Facilities		
	Current Health Exp. % of GDP	Per Capita Health Exp. ($)	Govt. health exp. (% of govt. exp.)	Doctor per 10,000 population	Nurse per 10,000 population	Birth attended by skilled health workers ((%)
Bangladesh	2.27	36.28	2.99	5.81	4.12	67.8
India	3.53	69.29	3.38	8.57	17.27	81.4
Bhutan	3.19	96.80	7.90	4.24	18.52	96.4
Indonesia	2.99	114.97	8.73	4.27	24.15	93.6
Sri Lanka	3.81	159.48	8.47	10.04	21.80	98.6
Thailand	3.75	247.04	15.03	8.57	27.59	81.4
Malaysia	3.86	384.07	8.93	15.36	34.68	99.5
China	5.15	440.83	9.07	19.80	26.62	99.9
S. Korea	7.60	2,283.07	13.42	23.61	73.01	100.0
Maldives	9.03	1,006.94	21.78	45.63	64.28	95.6
Japan	10.94	4,168.99	23.64	24.12	121.50	99.8

Source : WHO Health Observatory Report

ত) দেশের চিকিৎসা সেবার মান এবং স্বাস্থ্যখাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

দেশের চিকিৎসা সেবার মান এবং স্বাস্থ্যখাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

১) দেশের চিকিৎসা সেবার মান এবং চলমান স্বাস্থ্য সেবার প্রতি মানুষের আস্থা :

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে অভিযোগ অনেক পুরানো। চিকিৎসাক্ষেত্রে নিন্মমানের স্বাস্থ্যসেবা, রোগীর সাথে স্বাস্থ্য কর্মীদের খারাপ আচরণ, দক্ষ ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানের ঘাটতি, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অপর্যাপ্ততা এবং অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে দেশের মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। তাছাড়া, ভুল ডায়গোনসিস, অপ্রয়োজনীয় ও ভুল ঔষধ প্রেশক্রাইভ করা, ভুল প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট এবং রোগীর প্রতি অবহেলা ইত্যাদি এদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে নৈমত্তিক ঘটনা। চিকিৎসা সেবার ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারত, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের সেবার মান নিয়ে ২০১৩ সালে Journal of IBA, DU প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ এই ১৬টি ক্ষেত্রের সন্মিলিত পারফর্মেন্স ভারতে ৬৯.৩%, থাইল্যান্ডে ৭২.১২%, সিঙ্গাপুরে ৭৪.৩৯% এবং বাংলাদেশে ৪২.৪৭% স্মারণী-৫.৪(১৩)। অর্থাৎ চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ সমূহের তুলনায় বাংলাদেশ অদ্যাবধি প্রয়োজনীয় দক্ষতার ৫০% অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে মাত্র, উন্নত ও মানসন্মত চিকিৎসার ক্ষেত্রে যা খুবই অপ্রতুল।

বলা বাহুল্য, এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন-ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের স্বাস্থ্য সেবার তুলনায় বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার মান অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে, ফলে দেশে ভালমানের বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সুত্রমতে প্রতিবছর প্রায় ১.২ মিলিয়ন বাংলাদেশি নাগরিক উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়, যাদের ৭০% - ইন্ডিয়া, ১৩% - সিঙ্গাপুর, ৪% - থাইল্যান্ড, ২% - মালয়েশিয়া এবং ৪% ইউরোপ ও আমেরিকায় চিকিৎসা নিয়ে থাকে স্মারণী-৫.৪(১২)।

স্মারণী-৫.৪(১২) : প্রতিবছর বাংলাদেশি রোগীদের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা নেওয়ার চিত্র :-

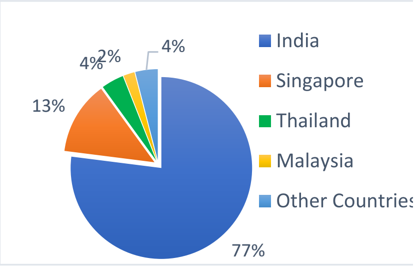

Source : Journal of Business Studies- 2013, DU

স্মারণী-৫.৪(১৩) : ২০১৩ সাল নাগাদ চিকিৎসা সেবার ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও দ. এশিয়ার অন্য তিনটি দেশের পারফর্মেন্স এর চিত্র :-

Country wise Comparison of Medical Service Parameters

SL	Original Variables	Performance (%) by Country			
		India	Thailand	Singapore	Bangladesh
1	Completeness of Services	4.42	4.58	4.69	2.61
2	Accuracy of diagnosis and treatment	4.43	4.50	4.75	2.61
3	Responsiveness of doctors	4.42	4.58	4.69	2.76
4	Knowledge and skills of doctors	4.57	4.58	4.81	3.06
5	Knowledge and skill of nurses and staff	4.19	4.27	4.50	2.26
6	Communication between doctor and patient	4.40	4.17	4.50	2.78
7	Communication between nurse and patient	4.09	3.93	4.31	2.29
8	Doctor courtesy and empathy	4.42	4.33	4.73	2.87
9	Nurse courtesy and empathy	4.22	4.25	4.67	2.35
10	Timely and orderly processing of reports, documents and hospital formalities	4.48	4.83	4.69	2.79
11	Timeliness of laboratory tests	4.45	4.73	4.75	2.89
12	Availability of doctors	4.25	4.50	4.75	2.67
13	Availability of nurses and other staff	4.23	4.67	4.69	2.84
14	Physical appearance of hospital staff	4.21	4.60	4.50	2.45
15	Physical appearance and cleanliness of hospital premises (aesthetics)	4.28	4.82	4.69	2.41
16	Proper performance of hospital equipment	4.24	4.78	4.67	2.83
	Level of overall Performance (%) :	**69.3**	**72.12**	**74.39**	**42.47**

Source : Journal of IBA, DU

২) সাধারণত যে সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশি রোগীরা বিদেশে যায় :

বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১.২ মিলিয়ন বাংলাদেশী উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়, যা প্রতিবছর প্রায় ১০% - ১২% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এখাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের মাত্রা। জার্নাল অব বিজনেস ষ্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০১৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী যে সমস্ত রোগের জন্য বাংলাদেশী রোগিরা বিদেশে চিকিৎসার জন্য যায়, তন্মধ্যে হার্ট ডিজিজ-১৭%, কিডনি রোগী-১৪.৫%, অর্থোপেডিকস্ - ১১.৫%, লিভার সমস্যা ১১%, ক্যানসার-১১% এবং অন্যান্য রোগী ৪৬% স্মারণী-৫.৪(১৪)।

স্মারণী-৫.৪(১৪): যে সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশি রোগীরা সাধারনত বিদেশে যায় :-

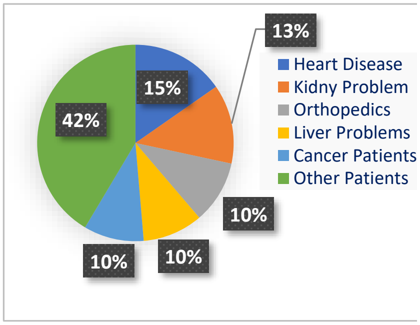

Source : Journal of Business Studies 2013,DU

৩) বিদেশে চিকিৎসা বাবত ব্যয় :

বিগত ২০/১০/২০১৯ তারিখে ডেইলি ফাইন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে প্রতিবছর বিদেশে চিকিৎসা বাবত বাংলাদেশী লোকজন খরচ করছেন আনুমানিক ৪ (চার) বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার (টাঃ ৩৩,৬০০ কোটি), যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধকৃত অর্থের চেয়ে ৬১.৪৩% বেশি এবং ঐ অর্থবছরে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের ২৬.৭০% এর সমান।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, স্বাস্থ্য সেবার মান এবং চলমান স্বাস্থ্য সেবার প্রতি দেশের মানুষের এ অনাস্থার কারণে একদিকে যেমন প্রতিবছর বিদেশে চিকিৎসা বাবত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে এ অনাস্থা দেশের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি দেশে চিকিৎসা খাতের উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে যে পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণ অনশীকার্য হয়ে পড়েছে।

থ) বাংলাদেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা উন্নয়নের সম্ভাবনা ও করনীয় :

বাংলাদেশে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা উন্নয়নের সম্ভাবনা ও করনীয় :

বর্তমান বিশ্বে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি একটি অন্যতম লাভজনক খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বিজনেস, ইন্ডিয়া ২০১৩ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১২ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপি স্বাস্থ্যখাতে অর্জিত আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার, যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ট্যুরিজম এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালে সারা পৃথিবীতে ১৪-১৬ মিলিয়ন লোক নিজ দেশের বাহিরে অন্য দেশে চিকিৎসা নিয়েছেন। ঐ বছরে শুধু ইন্ডিয়তে চিকিৎসা নিয়েছেন ৪৯৫,০৫৬ জন বিদেশি রোগী, যার মধ্যে ৮০% এর বেশি বাংলাদেশি। ২০১৫ সালে চিকিৎসা সেবাখাতে ভারতের আয় ছিল ৩ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার, ২০২০ সাল নাগাদ যা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার।

সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্বাস্থ্য সেবার পরিসর ও মান দুটোই উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া এক্ষেত্রে ঈর্শণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সাশ্রয়ী মূল্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে বিধায় এশিয়ান চিকিৎসা সেবার প্রতি বিশ্বব্যাপি মানুষের আস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ চিকিৎসাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একাধিক বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং অন্যান্য দেশের আলোকে চিকিৎসাসেবা উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে নিজ দেশের রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতপূর্বক প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের রোগীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে চিকিৎসাখাতে আর্থিকভাবে ব্যাপক লাভবান হওয়ার অপূর্ব সুযোগ বাংলাদেশের রয়েছে।

আগামী দিনগুলোতে বিশ্বব্যাপি চিকিৎসাখাতে ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে। ২০২০ থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ চিকিৎসাখাতে গ্লোবাল মার্কেট সাইজ প্রাক্কলনের চিত্র নিম্নে তুলেধরা হলো :-

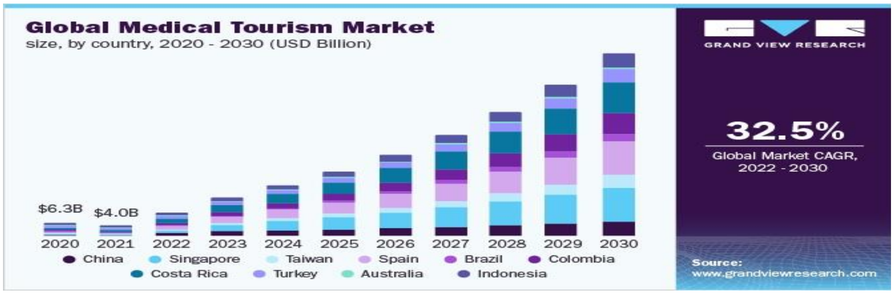

দেশে চিকিৎসাসেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এখাতের উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পণা, যাতে সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দ্রুত গড়ে উঠে। পাশাপাশি দেশে চিকিৎসা সেক্টরে যে সমস্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে , যেমন- নিম্নমানের স্বাস্থ্যসেবা, রোগীর সাথে স্বাস্থ্য কর্মীদের খারাপ আচরণ, দক্ষ ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানের ঘাটতি, হাসপাতালের পরিবেশ, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অপর্যাপ্ততা এবং অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয় ইত্যাদি নিরষনে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে ঐ সমস্ত সমস্যা দ্রুত নিরসন করা।

দেশে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা উন্নয়নে ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার আলোকে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

১. চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নে কার্যকরি পরিকল্পণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
২. সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী বিনিয়োগে দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দ্রুত গড়ে তোলা, যেমন- বিশেষায়িত হাসপাতাল, ডায়গোনষ্টিক সেন্টার, আন্তর্জাতিক মানের ডাক্তার ও নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরনঞ্জামাদি ও জীবনরক্ষাকারি ঔষধ উৎপাদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা।
৩. বিযেশায়িত হাসপাতাল সমূহের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. বিদেশী রোগীদের জন্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবীমা চালু করা।
৫. বিযেশায়িত হাসপাতাল সমূহে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হিসাবে স্পেশালাইজড্ বিদেশি ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া।
৬. বিদেশি রোগীদের মানসন্মত সেবা নিশ্চিত করতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীর বহর গড়ে তোলা।
৭. বিযেশায়িত হাসপাতাল সমূহে বিভিন্ন দেশের চাহিদানুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের খাদ্য মেন্যু সর্বরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৮. দেশে আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একাধিক পর্যটন কেন্দ্র, হোটেল, মোটেল, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি গড়ে তোলার মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা, যাতে অবসরকালিন ছুটি ও চিকিৎসা দুটোই এদেশে উপভোগ করা যায়।
৯. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আকর্ষণীয় সুবিধায় **"মেডিক্যাল ট্যুর ও ভ্রমণ প্যাকেজ"** ঘোষনা পূর্বক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গুলোতে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া, পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে মেডিক্যাল ট্যুর ও পর্যটন মেলার আয়োজন সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা নেওয়া।
১০. মেডিক্যাল ও পর্যটন ভিসা সহজীকরন।
১১. দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ কারিদের বিশেষ ছাড় ও বিনিয়োগ সুবিধায় স্বাস্থ্যসেবা ও পর্যটন খাতে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানানো।
১২. এ খাতের দ্রুত প্রসারে অন্যান্য দেশের আলোকে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।

দ) স্বাস্থ্যখাতে বিরাজমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সমূহ :

স্বাস্থ্যখাতে বিরাজমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সমূহ :

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার সমূহের এখাতের প্রতি উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা, দেশের সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবি ও নীতিনির্ধারক মহল স্বাস্থ্য খাতের পর্যাপ্ত প্রসার ও উন্নয়নে কম সোচ্ছার হওয়া এবং বিত্তশালীরা নিজ দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সরকারকে বাধ্য করার পরিবর্তে বিদেশে চিকিৎসা নিতে স্বাচ্ছদ্য বোধ করার ফলে দেশের স্বাস্থ্যখাত অদ্যাবধি মাত্রাতিরিক্ত পেছনে পড়ে আছে। COVID-19 সময়কালে স্বাস্থ্যখাতের নাজুক চিত্র এবং এখাতের রন্দ্রে রন্দ্রে যুগ যুগ ধরে ঢাল পালা গজানো দুর্ণীতির বয়াবহ চিত্র অনেকখানি জনসন্মুখে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে বর্তমান সরকার এখাতের প্রসার ও ঢেলে সাজানোর বিষয়ে অনেকটা নড়ে চড়ে বসেছেন এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের প্রসার ও উন্নয়নে বরাদ্ধ কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন। ২০২০ সালের শেষ নাগাদ দেশের স্বাস্থ্যখাতে বিরাজমান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১. **অপর্যাপ্ত ও শহর কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা পরিসর :** জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে মানসন্মত সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সেবাদানরত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়গনিষ্টিক সেন্টারের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল এবং সিংহভাগ সেকেন্ডারি ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত।

২. **উপজেলা পর্যায়ে শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা :** যেখানে প্রতি উপজেলায় গড়ে ২৪৩,৩৯৪ জনসংখ্যার বসবাস, সেখানে প্রত্যেক উপজেলা হাসপাতালে মাত্র ৬ জন ডাক্তার ও গুটিকয়েক নার্স নিয়ে শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. **গ্রাম পর্যায়ে অপর্যাপ্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা :** সারাদেশে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বসবাসরত আনুমনিক ১২০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৫,১২৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৩,৪২২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ডাক্তারের পরিবর্তে শুধুমাত্র ৩ (তিন) মাসের প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে, যা কোনোমতেই মান সন্মত স্বাস্থ্য সেবার মাপকাঠিতে পড়েনা।

SJFBD

৪. **জনসংখ্যার অনুপাতে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীর ঘণত্ব :** দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে কম, যেমন- ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে দেশে ডাক্তার রয়েছে ৫.৮১ জন (SDG লক্ষ্যমাত্রায় প্রয়োজন ৪৪.৫ জন), নার্স রয়েছে-৪.১২ জন (SDG লক্ষ্যমাত্রায় প্রয়োজন ১৩৩.৫ জন) এবং সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতি ৬৭.৮% (প্রয়োজন ১০০%), যা দেশে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মোটেও যথেষ্ট নয়।

৫. **অপর্যাপ্ত সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক :** দেশে সরকারী পর্যায়ে সেকেন্ডারি ও টার্সিয়ারী হাসপাতালের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অস্বাভাবিক হারে কম। ২০১৭ সাল নাগাদ সরকারি পর্যায়ে সেকেন্ডারি ও টার্সিয়ারী হাসপাতালের সংখ্যা ১২৭ টি, যার সিংহ ভাগই জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত এবং যেখানে প্রতি হাসপাতালের বিপরীতে জনসংখ্যা রয়েছে ১.৩০ মিলিয়ন।

৬. **বিশেষায়িত হাসপাতালের অভাব :** দেশে রোগের আধিক্য অনুযায়ী মানসন্মত বিশেষায়িত হাসপাতাল না থাকার ফলে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোক দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়, ফলে প্রতিবছর চিকিৎসা বাবত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাহিরে চলে যায়, ২০১৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ৪ বিলিয়ন।

৭. **স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্ধ ও মাথাপিছু ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত :**

জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধের হার উন্নয়নশীল দেশ সমূহ এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের তুলনায় সর্বনিম্ন, অর্থবছর ২০১৭-১৮ তে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধ জাতীয় বাজেটের ৫.২%, জি.ডি.পি অনুপাতে যা ০.৮৯%। ঐ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতে পাকিস্তানের বরাদ্ধ- .৯%, ভারতে -১.৪%, শ্রীলংকায়-২%, নেপালে-২.৩%, আফগানিস্তানে-২.৯% এবং মালদ্বীপে-১০.৯%।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছোট দেশ সমূহের চেয়েও অনেক কম। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় (ইউ.এস.ডলার) ৩৬.২৮, ভারতে ৪৪.৫৯, পাকিস্তানে ৪৭.৯২, নেপালে ১,০০৩.৯৪, মালদ্বীপে ১৫৯.৪৮, শ্রীলংকায় ৬৯.২৯, ভুটানে ৯৬.৮ এবং আফগানিস্থানে ৬৭.১২।

৮. **মানসন্মত চিকিৎসাসেবার অভাব :** হাসপাতাল সমূহে অপর্যাপ্ত আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, ত্রুটিপূর্ণ প্যাথলজিক্যাল টেষ্ট, প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সের ঘাটতি থাকায় মানসন্মত চিকিৎসা সেবা প্রদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৯. **স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সীমিত গবেষণা :** স্বাস্থ্যখাতে সীমিত বরাদ্ধের কারণে এখাতের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম উন্নত দেশ সমূহের তুলনায় বাংলাদেশে একদমই সীমিত, ফলে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশ অদ্যাবধি পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

১০. **হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ :** দেশের সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর, যা আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

১১. **ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মাঝে পেশাদার আচরনের অভাব :** এদেশে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মাঝে পেশাদার আচরনের অভাব রয়েছে, এটা অনেক পুরানো অভিযোগ, যা স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

১২. **কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনার ফলে মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘ সূত্রিতা :** উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে সরাসরি ব্যবস্থাপনার সুযোগ না থাকায় মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং, কন্ট্রোল, সমন্ময় সাধন ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র সমূহের সঠিক তদারকি এবং চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে বা ঔষধ পত্রের ঘাটতি হলে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের অভাবে সেখানকার চিকিৎসাসেবা মারাত্মক ব্যাহত হয়।

১৩. **উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রচার প্রচারনার অভাব :** সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র সমূহে প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রচার প্রচারনা না থাকায় বেশিরভাগ গ্রামীণ জনগণ এসমস্ত সেবাকেন্দ্রে না গিয়ে গ্রাম্য চিকিৎসক বা হাঁতুড়ে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়, যা গ্রাম পর্যায়ে সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার মান প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে।

SJFBD

ধ) দেশে স্বাস্থ্যঝুকি বৃদ্ধির অন্যতম কারন সমূহ :

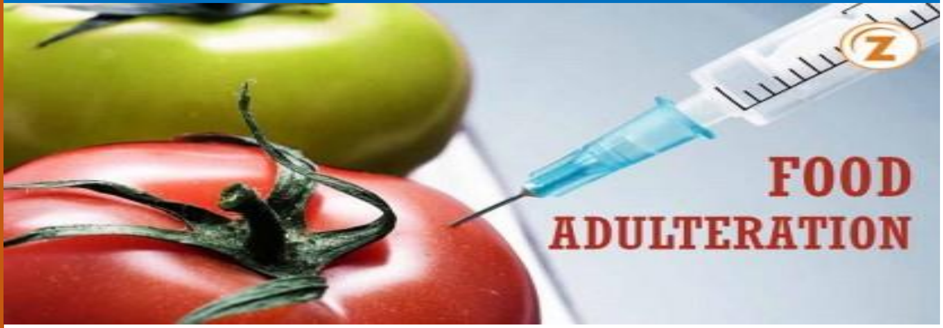

দেশে স্বাস্থ্যঝুকি বৃদ্ধির অন্যতম কারন সমূহ :

দেশে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুকির মাত্রা, উন্নত জাতি গঠনে যা অন্যতম প্রতিবন্ধক। দেশে স্বাস্থ্য ঝুকি চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর পূর্বেই তা নিয়ন্ত্রণে ত্বরিৎ ও কার্যকরি পদক্ষেপ না নিলে স্বাস্থ্য ঝুকির মাত্রা ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, যাতে সমগ্র জাতি হুমকির মুখে পড়বে, যা দেশের সকল ভবিষ্যৎ পরিকল্পণা নস্যাৎ করার পক্ষে যথেষ্ট এবং যে পরিস্থিতি সহসা কাটিয়ে উঠার সামর্থ আপাতত বাংলাদেশের নেই। তাই, দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বাস্থ্য ঝুকির সাথে সম্পৃক্ত বিষয় সমূহ আমলে নিয়ে দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ নিয়ে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে আগানো উচিত।

যে সমস্ত উল্ল্যেখযোগ্য কারণে দেশে প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ঝুকি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ তার কয়েকটি নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১. **বাল্য বিবাহ :** দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে বাল্য বিবাহ অন্যতম বড় সমস্যা। বাল্য বিবাহের ফলে দ্রুত ও অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম দেওয়ার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যহানি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি পারিবারিক কলহ, দারিদ্রতা, অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বাল্য বিবাহের মাত্রা শহরের তুলনায় গ্রামে প্রায় দ্বিগুণ। SVRS-২০১৮ অনুযায়ী ঐ বছর ১৫-১৯ বছর বয়সে বিয়ের হার প্রতি ১,০০০ জনসংখ্যায় জাতিয়ভাবে পুরুষ ১৭.২ ও নারী ১২০.৪। গ্রামে পুরুষ ২২ ও নারী ১৫৯.৭ এবং শহরে পুরুষ ১০.৭ ও নারী ৭৪.৭।

২. **অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিন্মমানের জীবনযাপন :** গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে এবং শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবার সমূহ (যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৭.২%, গ্রামে ৪১.৩% এবং শহরে ২৬.৫%) সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর ও নিন্মমানের পরিবেশে শতভাগ স্বাস্থ্য ঝুকিতে বসবাস করে, ফলে বিভিন্ন সংক্রামক ও পানিবাহিত রোগ সারা বছর তাদের নিত্যসঙ্গী, যা দেশের সামগ্রীক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৩. **ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল ঔষধ :** অতিমুনাফালোভী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে খাদ্য ও ঔষধে ভেজালের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে দেশে প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। SVRS-২০১৮ অনুযায়ী দেশে ক্যানছারে মৃত্যু ৯.৭%, এ্যজমায় মৃত্যু ৬%, কিডনি জটিলতায় মৃত্যু ২% এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মৃত্যু ৫%। কঠোর হস্তে এ মারাত্মক সমস্যার কার্যকরি সমাধান করা না গেলে দেশে প্রাণঘাতী রোগের প্রকোপ পুরো জাতিকে এক সময় বিপর্যস্ত করে তুলবে, সেদিন বেশি দূরে নয়।

৪. **খাদ্য ও খাদ্যজাত পণ্যের অপর্যাপ্ত মাণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :** মানসন্মত খাদ্যই সু-স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা, আর এ নিশ্চয়তা নির্ভর করে দেশে খাদ্য পণ্যের যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর। বাংলাদেশে খাদ্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে BSTI কাজ করলেও এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও তদারকি অনেকটা

SJFBD

শহর পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে। শহর পর্যায়েও BSTI এর মাননিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা যথেষ্ট অপ্রতুল ও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে ভ্রাম্যমান আদালত সমূহ শহরের বড় বড় দোকান, শপিংমল ও হাট বাজার থেকে অহরহ ভেজাল ও মেয়াদোর্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করছে, যা দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পক্ষে সব সময়ের জন্য বড় ধরনের হুমকি।

৫. **স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব :** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যাতিত সাধারণ শিক্ষা জীবন ও শিক্ষা জীবনের বাহিরে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রাথমিক বিষয় সমূহ, যেমন- নারীদের ঋতুস্রাব, গর্ভকালীন সতর্কতা, সন্তান লালন পালন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানাবিধ প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে জনার সুযোগ নেই বল্লেই চলে। ফলে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে অনুন্নত সমাজে, বিশেষকরে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসরত নারীদের মাঝে ঋতুস্রাব সমস্যা ও সংক্রমণ, অকালে গর্ভধারণ, অনিয়ন্ত্রিত গর্ভপাত, রক্তশূণ্যতাসহ নানাবিধ স্বাস্থ্য জটিলতা নিত্য জীবনের সঙ্গী, দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে যা অন্যতম প্রতিবন্ধক।

৬. **মা ও শিশু স্বাস্থের উন্নয়নে গ্রাম পর্যায়ে অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা :** একজন সুস্থ মা কেবল জন্ম দিতে পারে একটি সুস্থ শিশু, আর একটি সুস্থ শিশুর মাঝেই কেবল আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হওয়ার সম্ভাবনা লুকায়িত, যার জন্য প্রয়োজন মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে দেশে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে দেশের দুই তৃতীয়াংশের বেশি জনগোষ্ঠীর বসবাস হওয়া সত্বেও সারাদেশে ৫,১২৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং ১৩,৪২২ টি কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ডাক্তারের পরিবর্তে শুধুমাত্র ৩ মাসের প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা গড়ে প্রতিদিন ৩-৪ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪-৫ দিন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে, স্বাস্থ্য সেবার দিক থেকে যা রীতিমত অপ্রতুল ও নিন্মমানের। ফলে গ্রামাঞ্চল সমূহে আজো শহরের তুলনায় মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু, অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান জন্ম দেওয়া এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে যা অন্যতম প্রতিবন্ধক। SVRS 2018 অনুযায়ী :-

- ডাক্তার ও দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা সন্তান প্রসব : সারাদেশে ৬৯.১%, গ্রামে ৬১.৮% এবং শহরে ৮০%।
- মাতৃ মৃত্যু (প্রতি ১০০০ হাজারে) : সারাদেশে ১.৬৯, গ্রামে ১.৯৩ এবং শহরে ১.৩২।
- শিশু মৃত্যু (প্রতি ১০০০ হাজারে) : সারাদেশে ২২, গ্রামে ২২ এবং শহরে ২১।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু (প্রতি ১০০০ হাজারে) : সারাদেশে ২৯, গ্রামে ৩১ এবং শহরে ২৭।
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের সন্তান জন্মদানের হার :
  ১০-১৪ বছর বয়সী : সারাদেশে ১%, গ্রামে ১.২% এবং শহরে ০.৭%।
  ১৫-১৯ বছর বয়সী : সারাদেশে ৭৩.১%, গ্রামে ৮৭.৮% এবং শহরে ৫৬%।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্মতি ব্যবহারের হার : সারাদেশে ৬৩.১%, গ্রামে ৬২.৪% এবং শহরে ৬৪%।

৭. **দেশে জটিল রোগ সমূহের মানসন্মত চিকিৎসার অভাব :** জটিল রোগ সমূহ, যেমন- হৃদরোগ, ক্যানছার, কিডনি জটিলতা, শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য জটিল রোগ সমূহের মানসন্মত চিকিৎসা যেমন এখনো বাংলাদেশে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা, তেমনি এসব জটিল রোগের চিকিৎসা বাংলাদেশে এখনো যথেষ্ট ব্যয়বহুল, যা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তুলামূলক কম খরছে সম্ভব। ফলে দেশের অগণিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থাভাবে এসব জটিল রোগের চিৎিসা করাতে ব্যার্থ হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করছেন, আর মধ্যবিত্তরা এসব জটিল রোগের চিৎিসা করাতে গিয়ে সহায় সম্বল হারিয়ে প্রতিনিয়ত নিঃস্ব হয়ে পথে নামছে । বিগত ৪/৩/২০১৫ তারিখে ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যয়বহূল চিকিৎসা ব্যবস্থার কারনে দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার ৪% বা ৬.৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী দারিদ্রের কবলে পতিত হয়।

SJFBD

৮. **গ্রাম ও শহরের অনুন্নত এলাকা সমূহে বিভিন্ন সংক্রমক ও পানিবাহিত রোগের বিস্তার :** গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং শহরের বস্তি ও অনুন্নত এলাকায় বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, সংক্রমন ব্যাধি ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকগুণ বেশি, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য অন্যতম হুমকি, যারমধ্যে রয়েছে :-

- **সংক্রমন ব্যাধি সমূহ :** কলেরা, ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েড, যক্ষা, কুষ্ঠ, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হোপিং কাশি, হাম, জলাতংক ও যৌনব্যাধি ইত্যাদি।
- **প্যারাসিটিক ডিজিজ :** ম্যালেরিয়া, পাইলেরিয়া ইত্যাদি।
- শিশু ও গর্ভবতী মহিরাদের অপুষ্টি, ভিটামিন ও আয়রণ ঘাটতি সমস্যা।

২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী এ্যাজমায় মৃত্য : দেশে ৫.৫%, শহরে ৪.৫%, গ্রামে ৬.২%, সংক্রমন ব্যাধিতে মৃত্য : দেশে ৪.৩%, শহরে ২.৮%, গ্রামে ৫.২%, যক্ষায় মৃত্য : দেশে ২.১%, শহরে ১.৫%, গ্রামে ২.৫% এবং জন্ডিস রোগে মৃত্য : দেশে ৩.২%, শহরে ২.৯%, গ্রামে ৩.৩%।

৯. **নিন্মমানের ঔষধের সহজলভ্যতা ও ব্যবহারের আধিক্য :** প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে প্রচুর নিন্মমানের ঔষধ উৎপাদিত হয়, যার সিংহ ভাগই বিক্রি হয় গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং শহরের অনুন্নত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে। স্বল্পমূল্যের কারণে নিন্মমানের ঐসমস্ত ঔষধের প্রতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আগ্রহ বেশি, ফলে ঐ শ্রেণীর জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জটিল ও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশের স্বাস্থ্য খাতকে হুমকির মূখে ঠেলে দিচ্ছে।

১০. **রোগ বালাই নিরসনে অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মাঝে অজ্ঞতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব :** দেশের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মাঝে রোগ বালাই এর বয়াবহতা সম্পর্কে যেমন রয়েছে ব্যাপক অজ্ঞতা, তেমনি রোগ বালাই নিরসনে চিকিৎসাকেন্দ্রে যাওয়ার পরিবর্তে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে ঔষধ কিনে খাওয়ার এবং অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কারের আদলে রোগ বালাই সারাতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সর্বনাশ ডেকে আনে। BMC International Health and Human Rights এর সার্ভে অনুযায়ী গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় গড়ে ৪.৭% জনগণ, বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নেয় গড়ে ৬৮.৪%, ঔষধের দোকানে জিজ্ঞেস করে ঔষধ কিনে খায় ১৬.৪%, এন.জি.ও সুবিধা নেয় ১.৮% এবং বাড়ী গিয়ে ঔষধ বিক্রি করে এমন লোকজন থেকে ঔষধ কিনে খায় ৮.৭%।

১১. **ব্যয়বহুল চিকিৎসার কারণে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে হাতুড়ে চিকিৎসকের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া :** ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে দেশের গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নিন্মআয়ের মানুষদের মাঝে চিকিৎসা নিয়ে অবহেলা এবং খরচ বাঁচাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাশকরা ডাক্তারের পরিবর্তে গ্রাম্য চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়ার প্রবণতা কয়েকগুণ বেশি। BMC International Health and Human Rights এর সার্ভে অনুযায়ী গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ১১.৬% - ১৬.৯% রোগী এম.বি.বি.এস ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয় এবং ৬৭.৫%- ৬৯.৬% রোগী গ্রাম্য চিকিৎসকদের মাধ্যমে চিকিৎসা নেন। দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর মাঝে চিকিৎসার ব্যাপারে এমন অবহেলা ও প্রবণতা দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের জন্য নিঃসন্দেহে বড় হুমকি।

১২. **ব্যাক্তি পর্যায়ে গড়ে উঠা অসংখ্য ক্লিনিক ও ডায়গনিষ্টিক সেন্টার সমূহে নিন্মমানের স্বাস্থ্যসেবা :** দেশের মফঃস্বল সমূহে এবং শহরাঞ্চলের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন ব্যাতিত গড়ে উঠা অসংখ্য ক্লিনিক ও ডায়গনিষ্টিক সেন্টার সমূহ ভুঁয়া চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা ও প্যাথলজিক্যাল টেষ্টের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অসংখ্য নিরীহ ও দরিদ্র মানুষদের নিঃস্ব করার পাশাপাশি বিশাল সংখ্যক দরিদ্র মানুষদের জীবন বিপন্ন করে তুলছে, এদেশের স্বাস্থ্যখাতে যা একটি অতি পরিচিত সমস্যা ও বড় আকারের হুমকি।

১৩. **পরিবেশের বিরুপ প্রভাব :** পরিবেশ বিপর্যয়ের কারনে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য যা আরেকটি মারাত্মক হুমকি।

SJIBD

ন) স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও আধুনিকায়নে প্রস্তাবনা :

স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও উন্নয়ন পূর্বক গোটা জাতিকে পর্যায়ক্রমে আধুনিক ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবার আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে একটি সুস্থ ও উন্নতজাতি গঠণে আগানোর মধ্য দিয়ে ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন পূর্বক সবার জন্য সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা জরুরি , স্বাস্থ্যখাতে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যা অবধারিত। পাশাপাশি, দেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার আদলে সাশ্রয়ী মূল্যে কঠিন রোগসমূহের প্রথম সারির চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগাতে হবে, যাতে দেশীয় রোগিদের চিকিৎসার পাশাপাশি বিদেশী রোগীদের চিকিৎসার মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও আয় করা যায়, সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে যা অসাধারণ ভুমিকা রাখবে।

স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি- ২০১১ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ, যেমন- ক) সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা খ) সমতার ভিত্তিতে মানসন্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বিস্তৃত করা ; এবং গ) রোগ প্রতিরোধ ও সীমিত করনের জন্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

SJBD

দেশে স্বাস্থ্যখাতের প্রসার ও আধুনিকায়নে প্রস্তাবনা সমূহ :-

১. জেলা ও বিভাগীয় শহর পর্যায়ে সেকেন্ডারি / টার্সিয়ারি লেভেল স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ ও পরিসর বৃদ্ধি করা।

আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ও আগামী ২০ বছরের জনসংখ্যার আধিক্য বিচেনায় রেখে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আধুনিক সেকেন্ডারি / টার্সিয়ারি লেভেল হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনিস্টিক সেন্টারের সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা জরুরি, যা নিন্মের চকে প্রদত্ত হলো।

স্মারণী-৫.৪(১৫) : জেলা ও বিভাগীয় শহর পর্যায়ে সেকেন্ডারি/ টার্সিয়ারি লেভেল হাসপাতাল ও বেডের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাবনা :-

Secondary & tertiary Hospitals	No. of Existing Hospitals	Additional Required	Total required	No. of beds to be increased to
District and general hospitals	64	-	64	40,000
Medical college hospitals	17	47	64	64,000

Chest diseases hospitals	13	7	20	10,000
Specialty postgraduate institute and hospital	11	14	25	25,000
100-bed hospital	1	19	20	20,000
Dental college hospital	1	9	10	10,000
Hospital of alternative medicine	2	8	10	10,000
Infectious disease hospitals	5	10	15	15,000
Leprosy hospitals	3	2	5	2,000
Specialized hospital	5	10	15	15,000
Trauma center	5	5	10	5000
For Development and accreditation of Specialized Treatment :				
International Standard Specialized Hospital	-	10	10	10,000
Total :	**127**	**141**	**268**	**226,000**

২. **দেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার প্রসার ও উন্নয়ন :** দেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার প্রসার ও উন্নয়নে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারিদের বিশেষ সুবিধা ও প্রনোদনায় একক অথবা সরকারের সাথে যৌথভাবে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের সুযোগ দিয়ে বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি তৈরি ও জীবন রক্ষাকারি ঔষধ উৎপাদন বৃদ্ধি করার কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. **উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসা সেবার পরিসর ও মান বৃদ্ধি করা :** **অধ্যায় - ৩.৭ (চ), পৃষ্টা নং ১২৬ (উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসাসেবার পরিসর ও মান বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা সমূহে দ্রষ্টব্য।**

➢ **স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অন্যান্য প্রস্তাবনা সমূহ :**

৪. জটিল রোগের চিকিৎসা সবার জন্য সহজ করতে দেশে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যবীমা বাধ্যতামূলক করা।

৫. দেশের ৬৪ টি জেলা শহরে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৬. ডাক্তার ও নার্স প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি পূর্বক **SDG Goal-3** এর সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে সরকারিখাতে পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স ও মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট নিয়োগ দেওয়া।

৭. স্বাস্থ্যখাতে বাৎসরিক জাতীয় বাজেটের নুন্যতম ১০% বরাদ্ধ নিশ্চিত করা।

৮. চিকিৎসা সেবায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি (সার্জিক্যাল ইনষ্ট্রুমেন্ট, পি.পি.ই, মাক্স, হ্যান্ড গ্লভস্, ইনজেকশন সিলিন্ডার ও সুঁই, থার্ম মিটার, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, ব্লাড সুগার পরিমাপ যন্ত্র, প্যাথলজিক্যাল টেষ্টে ব্যবহৃত উপকরনাদি এবং চিকিৎসাখাতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি) সম্পূর্ণরুপে দেশে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহন করা।

৯. চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে এখাতে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

১০. দেশে উৎপাদিত ঔষধের গুণগত মান আরোও বৃদ্ধি করন পূর্বক ঔষধ শিল্পের পর্যাপ্ত প্রসার ঘটিয়ে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরনের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রপ্তানি খাতের প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১. শহর ও গ্রাম পর্যায়ে অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মাঝে সংক্রমক ব্যাধি ও পানিবাহিত রোগ সমূহের কার্যকর প্রতিরোধে আরোও সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসা সেবা আরো জোরালো করার মাধ্যমে সংক্রমণ ব্যাধিতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।

SJFBD

১২. দেশে নিম্ন মানের ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয়, অননুমোদিত প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়গনিষ্টিক সেন্টার সমূহ স্থায়ীভাবে বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩. গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং শহরের বস্তি ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মাঝে হাতুড়ি চিকিৎসকদের প্রভাব ও দাপট বন্ধ করতে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৪. মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে দেশে বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং ২২ বছরের পূর্বে সন্তান নেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা।

১৫. মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে পাঠ্য সূচীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় সমূহ, যেমন- মহিলাদের ঋতু বিষয়ক সমস্যা, সন্তান নেওয়ার পূর্বে প্রাথমিক প্রস্তুতি, গর্ভধারণ ও গর্ভাবস্থায় পালনীয় সতর্কতা সমূহ এবং সন্তান লালন পালন ইত্যাদি বিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

১৬. সকল স্তরের জনগণের পুষ্টির স্তর ও জনস্বাস্থ্যের মানসন্মত উন্নয়নে সরকারের চলমান কর্মসূচী সমূহ আরো জোরদার করা।

১৭. খাদ্যে ভেজাল রোধকল্পে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

১৮. স্বাস্থ্যখাতের মানসন্মত উন্নয়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং তা বাস্তবায়নে স্বদিচ্ছা নিশ্চিত করা।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৫.৫

টেকসই শিল্পায়ন।

টেকসই শিল্পায়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) টেকসই শিল্পায়ন।

খ) দেশের শিল্প সেক্টরের বর্তমান চিত্র।
   ১) ব্যাক্তিখাতে প্রসারিত শিল্প সেক্টরের আওতা।
   ২) শিল্প সেক্টরে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান।
   ৩) জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদান এবং এখাতের প্রবৃদ্ধি।

গ) শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীল খাত।
   ১) আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, রপ্তানী ও কর্মসংস্থানে উৎপাদনশীল খাতের ভূমিকা।
   ২) উৎপাদনশীল খাতের আকার ও প্রসার।
   ৩) জি.ডি.পি তে উৎপাদনশীল খাতের অবদান।
   ৪) উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধি

ঘ) উৎপাদনশীল খাতে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবাহ।

ঙ) আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে যা প্রয়োজন।

চ) শিল্প সেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ।
   ১. শিল্প সেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি।
   ২. বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ।

ছ) টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন।

জ) উৎপাদনশীলখাতে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করন।

ঝ) শিল্পকারখানার স্থায়িত্বতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঞ) শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবাহ।

ত) শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা।

থ) শিল্প সেক্টরের আওতাধীন রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিস্থিতি।

দ) দেশের চলমান শিল্প সেক্টরের মূল্যায়ন।

ধ) শিল্প সেক্টরে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ।

ন) শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

ক) টেকসই শিল্পায়ন :

টেকসই শিল্পায়ন :

Sustainable Industrialization is the primary source of income generation, allows for rapid and sustained increases in living standards for all people, and provides the technological solutions to environmentally sound industrialization. Technological progress is the foundation of efforts to achieve environmental objectives, such as increased resource and energy-efficiency. Without technology and innovation, industrialization will not happen, and without industrialization, development will not happen. **(UNIDO)**

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি সেক্টর (কৃষি, শিল্প ও সার্ভিস) তন্মধ্যে শিল্প সেক্টরের গুরুত্ব সব চাইতে বেশি। কেননা, দেশে শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো ও রপ্তানী বৃদ্ধিপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ সেক্টরের ভূমিকা অপরিসীম, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপরিহার্য। বিশ্বায়নের এ যুগে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা কাজে লাগিয়ে শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে মানসন্মত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক অভ্যান্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রপ্তানী খাতের প্রসার ঘটিয়ে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের অস্তিত্ব পাকাপোক্ত করতে দেশে শিল্পোন্নয়নের জুড়ি নেই। বলা বাহূল্য, বিশ্বের সিংহভাগ বড় অর্থনীতির দেশ সমূহ এ পলিসি অনুস্মরণ করে দেশে শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে এবং বিশ্ব অর্থনীতির নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশের জন্য অতিমাত্রায় সুখবর হচ্ছে, কৃষি, শিল্প ও সার্ভিস তিনটি সেক্টরের সমান তালে অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার অপূর্ব সুযোগ এদেশের রয়েছে, যে সুযোগ অনেক দেশের নেই। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, মেধা, ভৌগলিক পরিবেশ সবকিছুই এদেশে রয়েছে, প্রয়োজন শুধু যথাযথ উদ্যোগ এবং অনুকুল ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ পরিবেশ। ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কৃষি, শিল্প ও সার্ভিস এ তিনটি সেক্টরের সমান গুরুত্ব ও যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পণা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন জরুরি। কৃষিভিত্তিক এবং দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল ব্যবহারকারি শিল্প এক্ষেত্রে সর্বগ্রে বিবেনায় রাখা উচিৎ।

উল্লেখ্য, অনুকুল ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে, দেশে শিল্প ও বানিজ্য উন্নয়নে যা অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। Ease of doing business Index 2019 অনুযায়ী ১৯০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬তম। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন পাকিস্তানের অবস্থান ১৩৬, নেপাল ১১০, ভূটান ৮১, ভারত ৭৭, ইন্দোনেশিয়া ৭৩, চীন ৪৬, জাপান ৩৯, মালয়েশিয়া ১৫ এবং দ. কোরিয়া ৫ তম স্থানে অবস্থান করছে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো এক্ষেত্রে মিয়ানমার ও আফগানিস্তানের মত দেশও বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে স্মারণী-৫.৫(১)।

স্মারণী-৫.৫(১) : ২০১৯ সালের র‍্যাংকিং অনুযায়ী অনকুল ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ পরিবেশের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :-

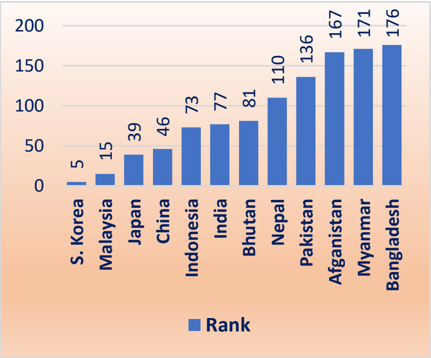

Note : Higher Rank indicates lower position.

SJBD

স্মারণী-৫.৫(২): Ease of doing business Index 2019 অনুযায়ী অনুকুল ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশের দিক থেকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের অবস্থান এবং বিস্তারিত স্কোর :-

Country	RANK - 2019							
	Ease of doing biz	Star-ting biz	Dealing with Construction permits	Getting Electricity Connection	Regist-ering property	Get ting Cre dit	Protecting Minority Investors	Paying Taxes
S. Korea	**5**	11	10	2	40	60	23	24
Malaysia	**15**	122	3	4	29	32	2	72
Japan	**39**	93	44	22	48	85	64	97
China	**46**	28	121	14	27	73	64	114
Indonesia	**73**	134	112	33	100	44	51	112
India	**77**	137	52	24	166	22	7	121
Bhutan	**81**	91	88	73	54	85	125	15
Nepal	**110**	107	148	137	88	99	72	158
Pakistan	**136**	130	166	167	161	112	26	173
Bangladesh	**176**	138	138	179	183	161	89	151

Source: Ease of doing business Index 2019

খ) দেশের শিল্প সেক্টরের বর্তমান চিত্র :

ব্যাক্তিখাতে প্রসারিত শিল্প সেক্টরের আওতা :

১) ব্যাক্তিখাতে প্রসারিত শিল্প সেক্টরের আওতা :

শিল্প ও রপ্তানি খাতের কার্যকর প্রসারের লক্ষ্যে সরকার এরিমধ্যে শিল্পনীতি ২০১৬ এবং রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ প্রণয়ন করেছেন এবং শিল্পখাতকে ১) উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প ২) অগ্রাধিকার শিল্প ৩) সেবা শিল্প ৪) সংরক্ষিত শিল্প ; **এবং** ৫) নিয়ন্ত্রিত শিল্প এ পাঁচভাগে বিভক্তির মাধ্যমে দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শিল্পনীতি ২০১৬ তে দেশে দ্রুত শিল্প বিকাশে **উচ্চ** অগ্রাকার ও অগ্রাধিকার শিল্প মিলিয়ে ৩১ টি শিল্পের উল্লেখ থাকলেও বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প সেক্টরে ব্যাক্তিখাতে গার্মেন্টস্সহ আনুমানিক ১৭ টি শিল্পের বিস্তার ঘঠেছে এবং সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আত্মবিকাশ ঘঠেছে।

বাংলাদেশের শিল্প সেক্টরে ব্যাক্তিখাতের আধিক্য অনেক জোরালো। ১৯৯০ সালের পর থেকে দেশে প্রাইভেট সেক্টরের বিকাশ শুরু হয়, বর্তমানে যা দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘ এ সময়কালে প্রাইভেট সেক্টরে যে ১৭ টি শিল্পখাতের প্রসার ঘটেছে, তন্মধ্যে রয়েছে :-

SL	Category of Industry	SL	Category of Industry
1	Garments & Textile	10	Ceramic
2	Food Processing	11	Renewable Energy
3	Shrimps & Fish	12	Pharmaceuticals
4	Plastic	13	Medical Equipment
5	Tourism	14	ICT and Outsourcing
6	Light Engineering	15	Health Care
7	Telecommunication	16	Automotive / Truck / Bus Assembly
8	Leather and Leather Goods	17	Ship Building
9	Cement		

Source :USAID Report

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এখাতে কর্মসংস্থান :

২) শিল্প সেক্টরে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান :

ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

Economic Census 2013 এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে সব ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৫,১৪,০৯১ টি এবং এখাতে মোট কর্ম সংস্থানের পরিমাণ ১৯০,৬২,৯৭৮। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেই সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং এখাতে কর্মরত শ্রম সংখ্যার চিত্র নিন্মে তুলে ধরা হলো :-

Category	No. of Establishments	Total Persons Engaged
Cottage	36,51,253	80,12,684
Micro	80,423	486,765
Small	770,063	63,90,577
Medium	7,109	706,111
Large	5,247	34,66,841
Total :	45,14,091	190,62,978

Source : Economic Census 2013

স্মারণী-৫.৫(৩.ক) : ২০১৩ সাল নাগাদ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও কর্মসংস্থান-নের চিত্র।

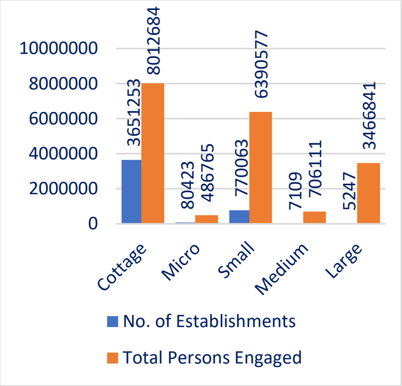

Source : BBS

SFBD

খ) শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থান :

শিল্প সেক্টরে কর্ম সংস্থান :

দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিবছর বাড়ছে শ্রমজীবি মানুষের সংখ্যা। LFS 2016-17 অনুয়ায়ী দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৬৩.৫০ মিলিয়ন, LFS 2013 অনুয়ায়ী যা ছিল ৬০.৬৬ মিলিয়ন, LFS 2010 অনুয়ায়ী ৫৬.৬৫ মিলিয়ন এবং LFS 2005-6 অনুয়ায়ী ৪৯.৪৬ মিলিয়ন। অর্থাৎ এ ১২ বছরের ব্যবধানে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.০৪ মিলিয়ন, গড়ে প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়েছে ১.১৭ মিলিয়ন ।

সরকারি হিসাবে প্রতিবছর আনুমানিক ২.৫০ মিলিয়ন অদক্ষ শ্রমশক্তি দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশাল এ শ্রমশক্তির জন্য বর্ধিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরনে শিল্পখাতের প্রসারই একমাত্র সমাধান। LFS 2010 সময়কালে দেশে শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের হার ছিল মোট কর্মসংস্থানের ১৩.৩২%, যা ২০১৩ সাল নাগাদ ২০.৮% এবং ২০১৬ সাল নাগাদ ২০.৪% এ পৌঁচেছে। অর্থাৎ এ ৭ বছরে শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৭.২১%, বছরে গড়ে যা ১.০৩%। এ ৭ বছরে দেশে শ্রম শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮৫ মিলিয়ন, যারমধ্যে শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থান হয়েছে বাড়তি ৫.২২ মিলিয়ন এবং অবশিষ্ট ১.৬৩ মিলিয়ন শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে অন্যান্য সেক্টরে স্মারণী-৫.৫(৪)।

স্মারণী-৫.৫(৩.খ): ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশের প্রধান তিনটি সেক্টরে কর্মসংস্থানের চিত্র :

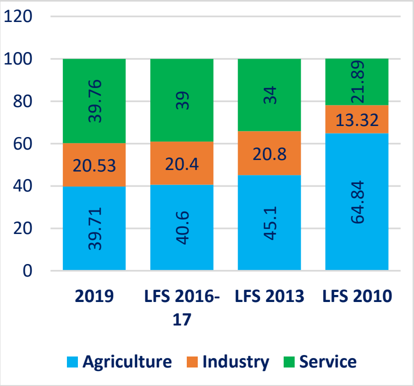

Source : BBS

স্মারণী-৫.৫(৪) : ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থানের চিত্র :-

LFS 2016-17		LFS 2013	LFS 2010
Labour Force (Million)	**63.50**	**60.66**	**56.65**
Employed (Million)	**60.83**	**58.07**	**54.08**
Agriculture- 40.6% : 24.69 M Industry - 20.4% : 12.42 M Service **- 39%** : 23.72 M **Total : 60.83 M**		Agriculture- 45.1% : 26.19 M Industry - 20.8% : 12.07 M Service **- 34.1%** : 19.81 M **Total : 58.07 M**	Agriculture- 64.84 : 35.07 M Industry - 13.32% : 7.20 M Service - 21.89% : 11.81 M **Total : 54.08 M**

Source : BBS

জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদান ও এখাতের প্রবৃদ্ধি :

৩) জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদান এবং এখাতের প্রবৃদ্ধি :

ক) জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদান : বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত দেশে শিল্প সেক্টরের আওতা ও পরিসর ছিল খুবই সীমিত, ফলে সে সময়কালে জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদানও ছিল সীমিত। ১৯৮০ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে শিল্প সেক্টরের প্রসার ঘটতে থাকে, পাশাপাশি বাড়তে থাকে জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অংশগ্রহণ। ১৯৮৫-২০১৮ সময়কালের জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদান বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০১০-১১ সময়কালে জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অংশগ্রহণ ১৯.১৩% থেকে ২৭.৩৮% এর মধ্যে উঠানামা করলেও অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অংশগ্রহণ ২৭.৩৭% থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.১৪% হয়েছে স্মারণী-৫.৫(৫), যা এদেশে শিল্প সেক্টরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ।

খ) শিল্প সেক্টরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি : শিল্প সেক্টরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অনেকটা একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়, যেমন- অর্থবছর ১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০১৪-১৫ সময়কালে শিল্প সেক্টরের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৪.৪৭% - ৯.৬৭% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে এ খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১০.২২% থেকে ১৩.০২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে স্মারণী-৫.৫(৫)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিল্প সেক্টরে প্রবৃদ্ধির হার যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

স্মারণী-৫.৫(৫) : ১৯৮৫-২০১৯ সময়কালে জি.ডি.পিতে শিল্প সেক্টরের অবদান এবং শিল্প সেক্টরে প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

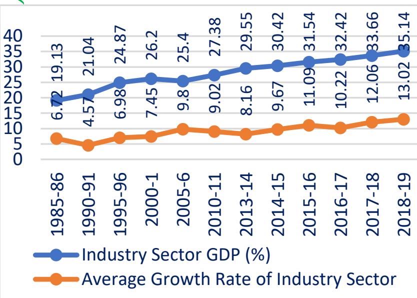

Source : MOF

গ) জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদানের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের তুলনামূলক অবস্থান :

দেশের জি.ডি.পিতে শিল্প সেক্টরের অবদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার দু একটি দেশ ব্যতিত অন্যান্য সব দেশের পিছনে অবস্থান করছে। ২০১৮ সালে জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদান বাংলাদেশে ২৮.৫%, ইন্ডিয়ায় ২৬.৭%, শ্রীলংকায় ২৭%, মায়ানমারে ৩২.৩%, ভিয়েতনামে ৩৪.২%, থাইল্যান্ডে ৩৫%, দ. কোরিয়ায় ৩৫.১%, ভুটানে ৩৮.৩%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৯.৭% এবং চীনে ৪০.৭% স্মারণী- ৫.৫(৬)।

স্মারণী-৫.৫(৬) : ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ও দ. এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের জি.ডি.পিতে শিল্প সেক্টরের অবদানের চিত্র :-

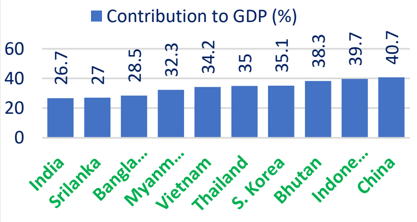

Source : World Bank

খ) শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীল খাত :

শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীল খাত :

দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে একদিকে যেমন প্রতিনিয়ত শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি প্রসারিত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ চাহিদার বাজার, যার যথাযথ সমাধান ব্যাতিত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা অসম্ভব। উৎপাদনশীল খাতের পর্যাপ্ত প্রসার ঘটিয়ে এখাতে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিপূর্বক আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে দেশের অর্থনীতি টেকসই ও গতিশীল করে তুলতে পারাটাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির অন্যতম চ্যালেঞ্জ। উৎপাদনশীল খাত প্রসারের পাশাপাশি দেশে শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প ব্যাপকভাবে গড়ে উঠবে, পাশাপাশি সার্ভিস সেক্টরে কর্মপ্রবাহ প্রচুর বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নে অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। এ কারনেই শিল্পোন্নত দেশ সমূহের উৎপাদনশীল খাত অনেক প্রসারিত এবং দেশের জি.ডি.পিতে উৎপাদনশীল খাতের অবদান তুলনামূলক বেশি।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে উৎপাদনশীল খাত অদ্যাবধি গুটিকয়েক শিল্পে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যাদের সিংহভাগ উৎপাদিত পণ্যই স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের উপযোগি, বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ খুবই সামান্য। শিল্পখাতে উৎপাদিত পণ্য আভ্যন্তরীণ চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করলেও, বিগত পাঁচ বছরে প্রতিবছর গড় আমদানির পরিমাণ প্রায় ইউ.এস.ডলার ৪৬ বিলিয়ন।

স্মারণী-৫.৫(৭) : ২০১৭ সাল নাগাদ দেশে উৎপাদনশীল খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক হিসাব (%) :-

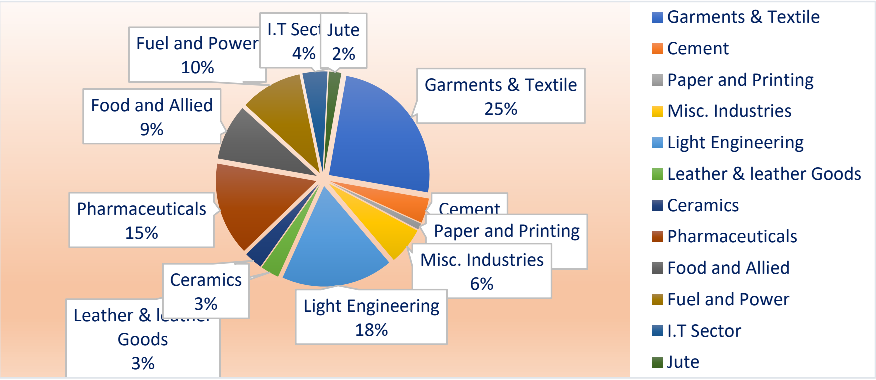

Source : Journal of Chemical Engineering, IEB Vol. 30

১) আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে উৎপাদনশীল খাতের ভূমিকা :

আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে উৎপাদনশীল খাতের অবদান :

বিগত দুই যুগেরও অধিক সময় ধরে শিল্প বানিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যক্তিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, কর মওকুফ ও কর অবকাশ সুবিধা প্রদান, বিশেষ প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছে, ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতে প্রসারিত উৎপাদনশীল খাতের অবদান অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে দেশে ব্যক্তিখাতে গার্মেন্টস্ শিল্পের পাশাপাশি আরও অন্তত ১৬ টি শিল্পের বিস্তার ঘটেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি মিলিয়ে যাদের সন্মিলিত বাজার মূল্য প্রায় ইউ.এস.ডলার ৫১.১২ বিলিয়ন, তন্মধ্যে আভ্যন্তরীণ লেনদেন ইউ.এস.ডলার ৪৬.৯১ বিলিয়ন (৯১.৭৬%) ও রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৪.২১ বিলিয়ন (৮.২৪%), যা ঐ অর্থবছরে শিল্পখাতে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ৮৯.১৯%। ২০১৭-১৮ সাল নাগাদ শিল্প সেক্টরে ব্যক্তিখাতে কর্মসংস্থান ৬.৪৭ মিলিয়ন, যা শিল্পখাতে মোট কর্মসংস্থানের ৫২% এর কিছু বেশি।

আশংকার বিষয় হচ্ছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭ শতাংশের উপরে হলেও দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মাত্র ০.৯%, অথচ প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২.০ মিলিয়ন জনশক্তি দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৩-২০১৭ সময়কালে উৎপাদনশীলখাতে কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৭০০,০০০, প্রতিবছর গড়ে হ্রাস পেয়েছে ১.৬%।

ব্যক্তিখাতে সার্ভিস সেক্টরে অটোমোবাইল, ট্যুরিজম ও হেল্থকেয়ার অন্যতম সম্ভাবনাময় বৃহৎ শিল্প, বিভিন্ন সূত্রমতে ২০১৭ সাল নাগাদ যাদের আভ্যন্তরীণ মার্কেট সাইজ যথাক্রমে ইউ.এস.ডলার ১৩.৮৯ বিলিয়ন, ৫.৩ বিলিয়ন ও ৫.৯২ বিলিয়ন এবং ২০২৩ সাল নাগাদ এ তিনটি খাতের মার্কেট সাইজ দাঁড়াবে আনুমানিক অটোমোবাইল ইউ.এস.ডলার ৩২ বিলিয়ন, ট্যুরিজম ৭.৫ বিলিয়ন এবং হেলথকেয়ার ১১.৭১ বিলিয়ন।

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ব্যক্তিখাতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অর্থবছর ২০১৭-১৮ নাগাদ এখাতের বাজার মূল্য (মার্কেট সাইজ) দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৪.১৮ বিলিয়ন , তন্মধ্যে আভ্যন্তরীণ লেনদেন ইউ.এস.ডলার ৩.৫৪ বিলিয়ন (৮৪.৭%) ও রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৬৩৫ মিলিয়ন (১৫.৩%) এবং এখাতে কর্মসংস্থান ৩ লাখ। Bangladesh Agro-Processors' Association (BAPA) এর হিসাবে ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে ছোট বড় মিলিয়ে ৪০০ টির অধিক কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও, তন্মধ্যে মাত্র ডজন খানেক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি সক্ষমতা রয়েছে। সস্তা শ্রম, পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও অনুকুল আবহাওয়ার কারনে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা পূরনের পাশাপাশি আরোও অধিক পরিমাণে রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ এদেশের রয়েছে, যা কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল করে তোলার কার্যকরি উদ্যোগ প্রয়োজন।

উৎপাদনশীল খাতের যে সমস্ত শিল্প আভ্যন্তরীণ চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করছে, তন্মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প মোট চাহিদার ৬০%, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০%, মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট ১৫%, সিরামিকস্ ৮৭% এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি ৯৯.৫% আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে সক্ষম। প্লাষ্টিক, শিপবিল্ডিং, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস এবং আই.সি.টি ও আউটসোর্সিং শিল্প গ্লোবাল মার্কেট সাইজের তুলনায় অদ্যাবধি খুবই সামান্য পরিমানে রপ্তানির সুযোগ পাচ্ছে স্মারণী-৫.৫(৮) ।

SJIBD

স্মারণী-৫.৫(৮) : ২০১৭-১৮ সাল নাগাদ দেশের প্রাইভেট সেক্টরে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের আভ্যন্তরীণ বাজার সাইজ এবং ২০২৩ সাল নাগাদ প্রক্কলিত বাজার সাইজ :-

SL	Type of Industry	Market Size BY 2017-18			Employment (Million)	Projected Market Size by 2023
		Domestic Market Size	Export In USD	Total Market Size in 2017-18 (Billion USD)		
1	Agri Industries	USD 3.54 B	635 M	4.18 B	0.3	USD 8.23 B
2	Automotive/Bus/Truck Assembly	USD 13.89 B	1.5 M	13.89 B	0.05	USD 32.00 B
3	Ceramic	USD 0.67 B	52 M	.72 B	0.048	USD 1.56 B
4	Leather & Leather Goods	USD 1.9 B	1.0 B	2.90 B	0.6	USD 4.80 B
5	Light Engineering	USD 3.12 B	356 M	3.48 B	0.8	USD12.06 B
6	Medical Equipment	USD 0.35 B	.44 M	.35 B	0.01	USD 0.74 B
7	Pharmaceuticals	USD 2.44 B	103.46 M	2.54 B	0.172	USD 7.6 B
8	Plastic	USD 1.8 B	1.0 B	2.80 B	1.2	USD 7.2 B
9	Ship Building	USD 2.2 B	30.35 M	2.23 B	0.15	USD 6.0 B
10	Shrimps & Fish	USD 0.37 B	431 M	.80 B	0.85	USD 1.3 B
11	ICT & Outsourcing	USD 1.1 B	600 M	1.70 B	0.94	USD 12.00 B
12	Telecommunication	USD 3.8 B	-	3.80 B	.245	USD 5.08 B
13	Tourism	USD 5.3 B	-	5.30 B	0.85	USD 7.50 B
14	Health Care	USD 5.92 B	-	5.92 B	0.25	USD 11.71 B
15	Renewable Energy	USD 0.51 B	-	.51 B	.0001	USD 3.7 B
	Total ;	**USD 46.91 B**	**USD 4.21 B**	**USD 51.12 B**	**6.47 M**	**USD 121.48 B**

Source : USAID Report

২) উৎপাদনশীল খাতের আকার ও প্রসার :

বর্তমান সরকার উৎপাদনশীল খাতের প্রসারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, বিশেষ করে এস.এম.ই খাতকে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করে এখাতে অর্থায়ন, পূণ অর্থায়ন ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে এখাতের প্রসারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয় হলো, বিগত দশকে দেশে উৎপাদনশীল খাতে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে, যা দেশে শিল্পোৎপাদন ও কর্মসংস্থান হ্রাসসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য নিঃসন্দেহে নেতিবাচক সংকেত।

উৎপাদনশীল খাতের আকার ও প্রসার :

উৎপাদনশীল খাতের বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৮ (সাত বছর) সময়ের ব্যবধানে দেশে উৎপাদনশীল খাতে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা বেড়েছে ৭,৮৯১ টি, যা গড়ে প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়েছে ১,১২৭ টি বা ৭.২০%। এ সময়কালে দেশে উৎপাদনশীল খাতে মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা কমেছে ৬৯৫ টি, গড়ে প্রতিবছর কমেছে ৯৯.২৯ টি বা (০.৫৭%), মাঝারি শিল্পের সংখ্যা কমেছে ৩,০৮৯ টি, গড়ে প্রতিবছর কমেছে ৪৪১ টি বা (৭.২৩%) এবং বৃহৎ শিল্পের সংখ্য কমেছে ৬০৮ টি, যা গড়ে প্রতিবছর কমেছে প্রায় ৮৭ টি বা (২.৩৯%) স্মারণী-৫.৫(৯)।

স্মারণী-৫.৫(৯) : ২০১২ - ২০১৮ সময়কালে দেশের উৎপাদনশীল খাতের আকার ও প্রসারের চিত্র :-

Category	Industrial Survey 2019				Industrial Survey 2012			
	No. of Establishments	People Engaged	Net Fixed Asset (In Crore TK.)	Value of products (In Crore TK.)	No. of Establishments	People Engaged	Net Fixed Asset (In Crore TK.)	Value of products (In Crore TK.)
Micro	16,689	263,720	8,365.7	31,215.2	17,384	271,644	4,652.8	27,581.8
Small	23,557	11,27,841	65,123.2	195,448.7	15,666	738,801	28,333.6	120,326.7
Medium	3,014	461,142	28,963.4	33,007.2	6,103	10,41,220	28,690.1	140,834.2
Large	3,031	40,27,141	222,255.9	586,735.1	3,639	29,64,272	57,134.2	250,747.8
Total :	**46,291**	**58,79,844**	**324,708.2**	**846,406.2**	**42,792**	**50,15,937**	**118,810.8**	**539,490.5**

Source : BBS

SIFBD

জি.ডি.পি তে উৎপাদনশীল খাতের অংশ :

৩) জি.ডি.পি তে উৎপাদনশীল খাতের অবদান :

জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসে উৎপাদনশীল খাত থেকে। বিগত দুই যুগের জি.ডি.পি বিশ্লেষণে দেখাযায়, অর্থবছর ২০০০-১ থেকে ২০০৯-১০ সময়কালে জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অংশগ্রহণ ছিল ২৫.৩% - ২৬.২% এর মধ্যে, তন্মধ্যে উৎপাদনশীল খাতের অবদান ছিল ১৫.৫৯% - ১৭.৮৬%। ২০১০ পরবর্তী সময়ে জি.ডি.পিতে শিল্প সেক্টরের অংশগ্রহণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অংশগ্রহণ ছিল ২৫.০৫% - ৩৫.১৪% এর মধ্যে, বছরে গড়ে ৩০.০৫%, তন্মধ্যে উৎপাদনশীল খাতের অবদান গড়ে ২০.৫০% স্মারণী-৫.৫(১০)।

স্মারণী-৫.৫(১০) : জি.ডি.পিতে শিল্প সেক্টরের অবদান এবং শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীল খাতের অংশ (%) :-

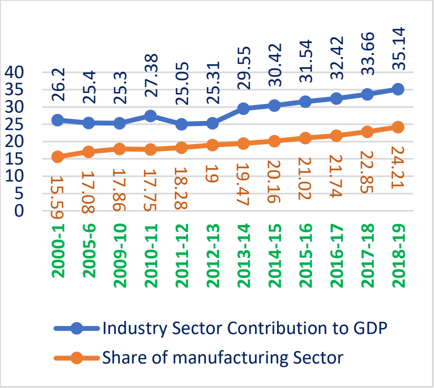

Source : MOF

উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধি :

৪) উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধি :

২০০০ সালের পর থেকে দেশের উৎপাদনশীল খাতের প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা গতি আসলেও ২০১০ সাল পর্যন্ত এ খাতের প্রবৃদ্ধি ৬.৬৮% - ১০.০১% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১০ পরবর্তী সময়ে এখাতের প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা উর্ধ্বমূখীতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে উৎপাদনশীল খাতের প্রবৃদ্ধি ৮.৭৭% - ১১.৬৯% এর মধ্যে উঠানামা করেছে এবং এ সময়কালে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.২৯%। অন্যদিকে, অর্থবছর ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সময়কালে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.০৭% স্মারণী-৫.৫(১১)।

- **বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের প্রবৃদ্ধি :** অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে উৎপাদনশীল খাতের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ৯.৩২% - ১২.২৬% এর মধ্যে উঠানামা করেছে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে এ খাতের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৮৬% এবং অর্থবছর ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সময়কালে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.৯৪%।

- **ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধি :** উৎপাদনশীল খাতের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধি অনেকটা ধীরগতি। অর্থবছর ২০০৫-৬ সময়ে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধি ৯.২১% থাকলেও, অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ সময়কালে এ শিল্পের প্রবৃদ্ধি ৫.৬৭% - ৮.৫৪% এর মধ্যে ঘুর পাক খেয়েছে এবং এ সময়কালে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.১৯%। অর্থবছর ২০১৫-১৬ এর পর থেকে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধি কিছুটা উর্ধ্ব গতি হয়েছে, ফলে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে ক্ষুদ্র শিল্পের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৬০%।

স্মারণী-৫.৫(১১) : ২০০০-০১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা :

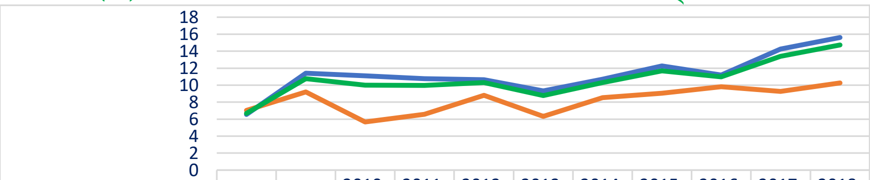

	2000-1	2005-6	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Large & Medium	6.55	11.41	11.11	10.76	10.65	9.32	10.7	12.26	11.2	14.26	15.61
Small Scale	7.02	9.21	5.67	6.58	8.81	6.33	8.54	9.06	9.82	9.25	10.26
Total Growth	6.68	10.77	10.01	9.96	10.31	8.77	10.31	11.69	10.97	13.4	14.73

Source : MOF

SJHBD

ঘ) উৎপাদনশীল খাতে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবাহ :

উৎপাদনশীল খাতে আভ্যন্তরীন বিনিয়োগ প্রবাহ :

২০২৪ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছাতে শিল্পখাতের পর্যাপ্ত প্রসার ঘটিয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিপূর্বক দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করা বাংলাদেশের জন্য একটি অবধারিত চ্যালেঞ্জ, যারজন্য প্রয়োজন শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার নিশ্চিতকল্পে দেশে অনুকুল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধিপূর্বক দেশের শিল্পখাতকে টেকসই করে গড়ে তোলা। বিগত দশকে শিল্প সেক্টরের বিনিয়োগ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত এক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরে জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ ৫% এর নিচে থাকলেও অর্থবছর ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সময়কালে বিনিয়োগ ৫.২৫% থেকে ৫.৭৬%, অর্থবছর ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬ সময়কালে ৬.৬৪% -৬.৬৬% এবং ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বিনিয়োগ ৭.৪১%-৮.১৭% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ প্রতিবছর যৎ সামান্য হলেও বেড়েছে। অন্যদিকে, প্রাইভেট সেক্টরে দীর্ঘ ১০ বছর সময়কাল জুড়ে জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ ২২% - ২৩% এর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, যার অর্থ দীর্ঘ এ দশ বছর সময়কালে দেশে প্রাইভেট সেক্টরে শিল্পখাতে কাঙ্খিত প্রসার ঘটেনি স্মারণী-৫.৫(১২)।

স্মারণী-৫.৫(১২) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে সরকারি ও ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির চিত্র :-

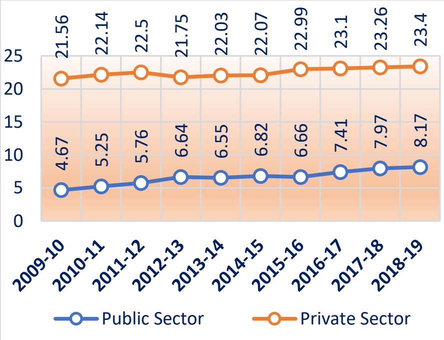

Source : MOF

ঙ) শিল্পসেক্টরে আভ্যন্তরীন বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে যা প্রয়োজন :

শিল্প সেক্টরে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির উপরই এখাতের প্রসার ও উন্নয়ন নির্ভরশীল। বিগত দশকে শিল্প সেক্টরে পাবলিক বিনিয়োগ প্রতিবছর যৎ সামান্য বাড়লেও এ সময়কালে প্রাইভেট বিনিয়োগ জি.ডি.পি অনুপাতে ২২% - ২৩% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যার অর্থ দীর্ঘ এ দশ বছর সময়কালে দেশে প্রাইভেট সেক্টরে শিল্পখাতে কাঙ্খিত প্রসার ঘটেনি। দেশে শিল্প সেক্টরের দ্রুত প্রসার ও টেকসই শিল্পায়ন গড়ে তুলতে শিল্প সেক্টরে পর্যাপ্ত পরিমাণ দেশী বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একটি অপরিহার্য বিষয়।

শিল্পসেক্টরে আভ্যন্তরীন বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে যা প্রয়োজন :

শিল্প সেক্টরে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন :-

ক) অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ : যেমন-পর্যাপ্ত অবকাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পর্যাপ্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদান, অফিশিয়াল ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঘুষ, দুর্ণীতি ও দীর্ঘসূত্রীতার অবসান, বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ার নিশ্চয়তা এবং দেশের সকল স্তরে আইনের শাসন সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়া ।

খ) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান :- যেমন-

- শিল্পপ্লট বরাদ্ধ সহ সংশ্লিষ্ঠ সকল সরকারি ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালুকরা।
- সীমিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত করা।
- কর মওকুফ সুবিধা, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে চলতি মূলধন ও টার্ম লোনের সুবিধা।
- নতুন বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস না খুঁজে বরং অধিক বিনিয়োগের উপর জোর দেওয়া ও পুণর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরা।
- কাঁচামাল আমদানির বিপরীতে সরাসরি রপ্তানিযোগ্য ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিযোগ্য সকল ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বন্ড সুবিধা প্রদান করা।
- উচ্চ পর্যায়ের বিনিয়োগকারিদের জন্য সি.আই.পি ও অন্যান্য সরকারি মর্যাদা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা।
- অর্থের উৎস অনুসন্ধান ব্যাতিত উৎপাদনশীলখাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া।
- শিল্পোদোক্তাদের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলনের পাশাপাশি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সব ধরনের উদ্যোক্তদের জন্য এ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।

চ) শিল্প সেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ :

শিল্প সেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ :

১) শিল্পসেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি :

২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা পূরনে বাংলাদেশে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ আসার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টরে গড়ে প্রতিবছর জি.ডি.পি অনুপাতে ৫%-৬% (ইউ.এস.ডলার ১২.৫ বিলিয়ন) বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন, যার একটি বড় অংশ আসবে বিদেশি বিনিয়োগ থেকে। অথচ, অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে বছরে গড়ে (ইউ.এস.ডলার) ২.২৫ বিলিয়ন মাত্র, যা এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও নেই।

দেশের শিল্প সেক্টরে বিগত ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের বিদেশী বিনিয়োগ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১২-১৩ এই ৮ (আট) বছর সময়কালে শিল্প সেক্টরে গড়ে বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে বছরে (ইউ.এস.ডলার) ১.০৩ বিলিয়ন, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ এই ৬ (ছয়) বছরে গড়ে বার্ষিক (ইউ.এস.ডলার) ২.৫১ বিলিয়ন স্মারণী-৫.৫(১৩)। অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে দেশের শিল্প সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ, যদিও তা এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথেষ্ট কম।

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ :

স্মারণী-৫.৫(১৩) : ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশের শিল্প সেক্টরে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের চিত্র :-

(US$ Billion)

Financial Year	Local Investment	Foreign Investments		Total Investments (Local + Foreign)
		Value	As % of GDP	
2005-6	2.730	0.81	1.17	3.54
2006-7	3.130	0.46	0.64	3.59
2007-8	1.294	0.65	0.82	1.94
2008-9	3.118	1.33	1.45	4.45
2009-10	2.588	0.91	0.88	3.49
2010-11	6.277	1.23	1.07	7.51
2011-12	7.137	1.26	0.98	8.40
2012-13	6.081	1.58	1.19	7.66
2013-14	5.446	2.60	1.74	8.05
2014-15	8.307	2.54	1.47	10.85
2015-16	11.561	2.83	1.45	14.39
2016-17	13.062	2.33	1.05	15.39
2017-18	16.663	1.81	0.73	18.47
2018-19	15.334	2.94	1.07	18.27

Source: World Bank and BIDA

২) বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ :

SIFBD

শিল্প সেক্টরের উন্নয়নে দেশী / বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে প্রয়োজন - উন্নত অবকাঠামো, বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ লাভজনক হওয়ার নিশ্চয়তা। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষনের ক্ষেত্রে এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা পুরোপুরি নিশ্চিতের পাশাপাশি বাড়তি আরোও যে সমস্ত উল্ল্যেখযোগ্য সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন, যেমন :-

- আকর্ষনীয় পর্যটন ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পর্যাপ্ত হোটেল, মোটেল ও ডিশ ব্যবস্থা।
- দেশে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদেশীদের জন্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বীমা সুবিধাসহ আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থা চালুকরা।
- বিদেশী বিনিয়োগকারি, কর্মরত বিদেশী টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বিদেশী বিনিয়োগকারিদের জন্য সহজ ভিসা ব্যবস্থার পাশাপাশি মাল্টিপল এন্ট্রি ও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ প্রদান।
- বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সমূহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালানো।
- বিদেশী বিনিয়োগ কারিদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা সংক্রান্ত বিধান চালু করা।
- দেশে কর্মরত বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বেতন ভাতা পুরোপুরি করমুক্ত করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে কঠোর তদারকি।
- অফিশিয়াল আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঘুষ, দুর্ণীতি ও দীর্ঘ সূত্রিতা সমূলে নির্মূলের পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষেত্রে হয়রানিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির নিশ্চয়তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা, যাতে বিশ্বে দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়।
- সকলক্ষেত্রে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা।

টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন :

ছ) টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন :

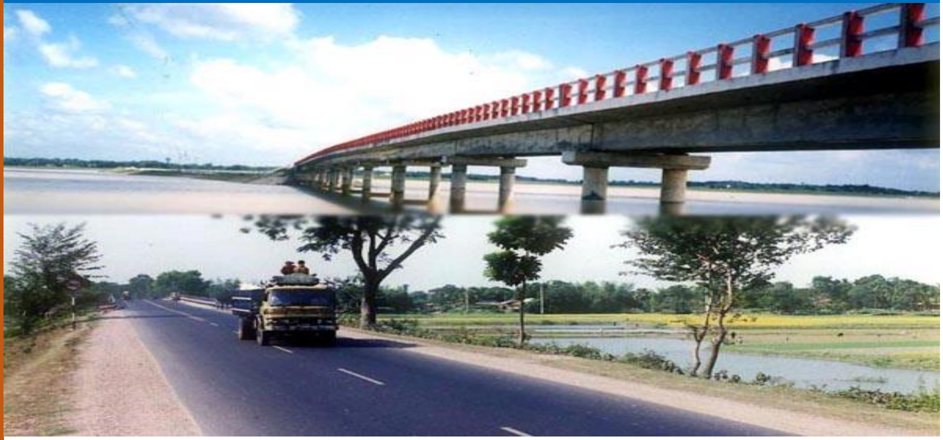

দ্রুত ও টেকসই শিল্পায়নের জন্য টেকসই অবকাঠামো অন্যতম পূর্বশর্ত, যারমধ্যে রয়েছে স্থলপথ, রেলপথ, বিমান বন্দর, নদী ও সমূদ্র বন্দর, বিদ্যুৎ, পানি. গ্যাস, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে, শিল্পায়নের জন্য যা অন্যতম বৃহৎ চ্যালেঞ্জ্য।

বিশ্বব্যাংক সার্ভে ২০১৮অনুযায়ী "Logistics Performance Index (LPI) on six dimensions of trade - including customs performance, infrastructure quality, and timeliness of shipment " ১৬০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম। ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে শ্রীলংকা ৯৪, মালদ্বীপ ৮৬, ইন্দোনেশিয়া ৪৬, ইন্ডিয়া ৪৪, মালয়েশিয়া ৪১, ভিয়েতনাম ৩৯, থাইল্যান্ড ৩২, তাইওয়ান ২৭, চীন ২৬, দ. কোরিয়া ২৫, হংকং ১২, সিঙ্গাপুর ৭ এবং জাপান ১২তম স্থানে রয়েছে । স্মারণী-৫.৫(১৪)

স্মারণী-৫.৫(১৪) : LPI Rank 2018 অনুযায়ী বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

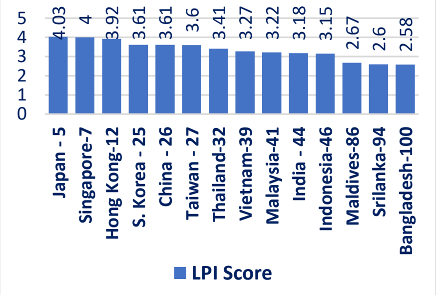

Source: World Bank LPI Ranks 2018

জ) উৎপাদনশীলখাতে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করন :

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে উৎপাদনশীলখাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিল্প কারখানা বৃদ্ধি না পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির অনুপাতে শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়নি। ফলে প্রতিবছর বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতে হয়, যার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি বানিজ্য ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে, বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা অন্যতম বড় অন্তরায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মোট ইউ.এস.ডলার ৩৬,২০৯ মিলিয়ন রপ্তানীর বিপরীতে আমদানি ছিল

SJFBD

ইউ.এস.ডলার ৫৪,৪৬৩ মিলিয়ন এবং ঐ অর্থবছরে বানিজ্য ঘাড়তির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ১৮,২৫৮মিলিয়ন যা ঐ অর্থবছরে সম্পাদিত মোট বৈদেশিক বানিজ্যের ২০.১৪%।

আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে দেশের রপ্তানিখাতের প্রসার ও বহুমূখী করনের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল খাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। চলমান শিল্পনীতি ২০১৬ তে শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়নে বিস্তারিত উল্ল্যেখ থাকলেও শিল্প সমৃদ্ধি অর্জনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন খাতে কি পরিমাণ শিল্প স্থাপিত হবে, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থায়নের উৎস ও প্রক্রিয়া, স্থাপিত শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে এবং শিল্পকে রুগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট রুপরেখা ও দিক নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে।

উৎপাদনশীলখাতে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করন :

কজেই ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বর্ধিত শ্রমশক্তির অনুপাতে উৎপাদনশীলখাতে সকল ধরনের শিল্পকারখানা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ব্যাতিত বিকল্প নেই। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক সকল প্রকার শিল্প গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পণা নিয়ে এগুতে পারলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর দেশে প্রচুর সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পাশাপাশি শিল্প সেক্টরে বড় আকারের বিনিয়োগ গড়ে উঠবে, দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির জন্য যা অপরিহার্য। উৎপাদনশীলখাতে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধিকল্পে আগামী ১০ বছরে (২০২১-২০৩০) নির্দিষ্ট সংখ্যক সকল প্রকার শিল্প কারখানা গড়ে তোলার বিষয়ে নিন্মে প্রদত্ত **"শিল্পায়ন মডিউল"** অনুস্মরণ করা যেতে পারে :-

Industrialization Module (Manufacturing)

Effective for 10 years (2021-2030)

Type of Industry	No. of Units to be Installed in each Years	Total no. of Units to be Installed in 10 Years	Average Project Cost per unit excluding Land & Building	Total Project Cost (in Crore Taka)
(1)	(2)	3 (2X10)	4 (TK. In Crore)	5 (4X3)
A) Large Scale	100 Units	1,000 units	100.00	100,000/=
B) Medium Scale	500 Units	5,000 units	50.00	250,000//=
C) Small Industry	10,000 Units	100,000 units	2.00	200,000/=
D) Micro & Cottage	20,000 Units	200,000 units	0.05	10,000/=
Total Increase:	**30,600 Units**	**306,000 Units**	-	**560,000/=**

Note : Above schedule is excluded from Readymade garments sector.

ঝ) শিল্পকারখানার স্থায়িত্বতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ :

শিল্প সেক্টরের দ্রত প্রসার ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে দেশে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধিকল্পে শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি এখাতের স্থায়িত্ব ও মানোন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, মানসন্মত পণ্য উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি, স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে লাভজনকভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারা এবং কোনো অবস্থাতেই যাতে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন না হয়ে পড়ে ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের বিস্তারিত ও সু-নির্দিষ্ট গাইড লাইন থাকা প্রয়োজন, যারমধ্যে রয়েছে :-

- **উৎপাদনে আধুনিক মেশিনারীজ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা :** উৎপাদনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার পাশাপাশি মানসন্মত পণ্য উৎপাদনের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা ঐ শিল্প পণ্যকে দেশে ও বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে

শিল্পকারখানা স্থায়িত্বতা ও মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ :

আধিকতর সক্ষম করে তোলে। কাজেই শিল্পসেক্টরে মানসন্মত পণ্য উৎপাদনে বাধ্যবাধকতা আরোপের পাশাপাশি এখাতে আধুনিক প্রযুক্তি এবং এ সেক্টরে মানসন্মত মেশিনারীজ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন।

- **উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্ঠি করা :** শিল্পখাতে উৎপাদিত পণ্য দেশে বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রয়ের ক্ষেত্র তৈরীতে সরকারের জোরালো ও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন, অন্যথায় শিল্প সেক্টর পিছিয়ে পড়বে এতে সন্দেহ নেই। শিল্পখাতে যে সব পণ্য উৎপাদিত হয়, ঐসমস্ত পণ্যের আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপের পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ঐ সমস্ত দেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ সৃষ্ঠি করা, আন্তর্জাতিক বানিজ্য বৃদ্ধিতে বৈদেশিক মিশন সমূহকে এলক্ষ্যে পুরোপুরি কাজে লাগানোর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্য প্রদর্শনী, বানিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিশ্বব্যাপি প্রচার প্রচারনায় বাংলাদেশকে ব্রান্ডিং করার মাধ্যমে এদেশের পণ্য বিশ্ব বাজারে সুপরিচিত করে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে।

- **শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে লাভজনক উৎপাদন অব্যাহত রাখা :** নতুন শিল্প স্থাপনের চেয়ে স্থাপিত শিল্প লাভজনকভাবে পরিচালিত করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, শিল্পকে লাভজনক করে তুলতে ব্যার্থ হলে ঐ শিল্প রুগ্ন হতে বাধ্য। লাভজনকভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পুরোপুরি দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল। এ দুটি বিষয়ের যথাযথ সমাধান নিশিচত করা গেলে শিল্প সেক্টরের দুর্দিন অনেকাংশে কেটে যাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। কাজেই, প্রত্যেক শিল্প প্রতিঠানের উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাবনায় জড়িত ব্যাক্তিবর্গের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকারি ব্যাংকের সংশিষ্টতা, নজরদারি ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে চলতি মূলধন সরবরাহ পূর্বক উৎপাদন সচল রাখার কার্যকরি উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

- **শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা :** শিল্পখাতে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সাথে ঋণদাতা ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা, নজরদারি ও জবাবদিহিতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পূর্বক ব্যাংকের নির্দিষ্ট কর্মকর্তা কতৃক ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের আফিস ও কারখানা স্ব-শ্বরীরে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মাসিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সর্বশেষ পরিস্থিতি উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট তুলে ধরবেন, যাতে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানে কোনো অনাকাঙ্কিত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকের পক্ষে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়, যা দেশে গণহারে শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হওয়ার ঝুকি বহুলাংশে হ্রাস করবে।

ঞ) শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবাহ :

Industrial loan
[Figures in billion BDT]

	FY'19	FY'18	Change in %
NPLs	572.01	384.99	48.58%
Disbursement	3998.57	3463.97	15.43%
Recovery	3197.63	2731.73	17.05%
Outstanding	5273.34	4326.44	21.89%

Source: BB

শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবাহ :

শিল্প সেক্টরের প্রসার ও চলমান শিল্পে উৎপাদন চালু রাখতে শিল্পখাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা শিল্পোন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। নতুন শিল্প স্থাপন ও চলতি শিল্পের আকার বর্ধিত করনের মাধ্যমে দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধি করতে যেমন দীর্ঘ মেয়াদি শিল্পঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি প্রয়োজন, তেমনি চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে উৎপাদন চালু রাখতে চলতি মূলধন সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া সমানভাবে প্রয়োজন। অন্যথায় বাংলাদেশের মত সীমিত আয় ও অপর্যাপ্ত মূলধনের দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধি করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তবে শিল্পখাতে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পূরোপূরি শিল্প মালিকদের উপর দায়ভার না চাপিয়ে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের তদারকিতে ঋণ দাতা ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা ও জবাব দিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকর করা প্রয়োজন, অন্যথায় ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ভোগান্তির পাশাপাশি ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা বরাবরের মত থেকেই যাবে।

অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবাহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিল্পখাতে প্রদত্ত ঋণ গড়ে ৭০%-৮০% চলতি মূলধনের বিপরীতে এবং ২০%-৩০% মাত্র দীর্ঘ মেয়াদি বা টার্ম লোন হিসাবে প্রদত্ত, দেশে শিল্পখাত প্রসারে যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। যেমন ২০০৮-৯ অর্থবছরে টার্ম লোনের পরিমাণ প্রদত্ত ঋণের ৩০.৭২%, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩০.৪৩%, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩১.০৯%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩১.৫১%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৯.১৯%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৫.১২%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৭.৭৪%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৪.৭২%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০.৬৭% এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০.৪৩%।

এ সময়কালে শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ২০০৯-১০ ও ২০১২-১৩ অর্থবছর ব্যাতিত অন্যান্য অর্থবছর গুলোতে ৮.১৩% থেকে সর্বোচ্চ ২৭.৯৮% এর মধ্যে উঠানামা করেছে। অর্থবছর ২০০৯-১০ ও ২০১২-১৩ সময়কালে শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩০.৮৪% ও ৩০.১৪% স্মারণী-৫.৫(১৫)।

স্মারণী-৫.৫(১৫) : অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবাহের চিত্র :-

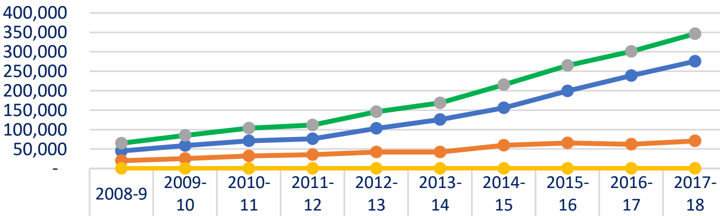

	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Working Capital (In Cr. TK.)	45,028	59,172	71,300	76,675	103,166	126,103	155,747	199,349	238,517	275,629
Term Loan (In Cr. TK.)	19,973	25,876	32,163	35,278	42,528	42,311	59,784	65,539	62,155	70,768
Total (In Crore TK.)	65,001	85,048	103,464	111,953	145,694	168,414	215,530	264,888	300,672	346,397
Growth Rate (%)	8.13	30.84	21.65	8.21	30.14	15.59	27.98	22.90	13.51	15.21

Source : MOF

SJBD

ত) শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করা :

শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা :

শিল্পখাতে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সাথে ঋণদাতা ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা ও দায়বদ্ধতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা পূর্বক পদত্ত ঋণ যথাযথ খাতে ব্যবহার এবং ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধের বিষয়ে সুক্ষ নজরদারি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এখাতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, যাতে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কোনোরকম আর্থিক অনিয়মের সুযোগ না পায় এবং কোনো অবস্থাতেই শিল্প রুগ্ন না হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ঋণদাতা ব্যাংকের বাড়তি দায়িত্ব ও করনীয় সম্পর্কে নিন্মে ধারনা দেওয়া হলো :-

১) নির্দিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তার দায়িত্বে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান :

প্রত্যেক ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংকের একজন নির্ধারিত কমকর্তা দায়িত্বে থাকবেন, যিনি সপ্তাহে অন্তত একবার ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের আফিস ও কারখানা স্ব-শ্বরীরে পর্যবেক্ষণ পূর্বক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম দেখা গেলে সাথে সাথে তা ব্যাংকের নজরে আনবেন এবং মাসিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সর্বশেষ পরিস্থিতি উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট তুলে ধরবেন, যাতে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানে কোনো অনাকাঙ্কিত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকের পক্ষে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়।

২) ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মাসিক উৎপাদন, বিপনন ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের হিসাব মাস শেষে নির্দিষ্ট চকে ব্যাংক কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন : প্রত্যেক ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান চলতি মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব, আমদানি ও রপ্তানীর হিসাব, ওয়ার্ক-ইন প্রগ্রেস, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের মওজুদ ইত্যাদি ব্যাংকের নির্ধারিত চকে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই নিয়মিতভাবে ঐ ব্যাংক কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন, যাতেকরে অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠু ও কঠোর নজরদারি পূর্বক ঐ প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকের অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পাশাপাশি অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের লাভজনক পরিচালনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

SJFBD

৩) প্রতিটি বিক্রয়/রপ্তানি মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলক কর্তনপূর্বক এফ.ডি.আর আকারে ব্যাংকের নিকট লিয়েন রাখা : অর্থায়নকৃত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকে (রপ্তানিমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্যের এবং স্থানীয় শিল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় বিক্রয় মূল্যের) কমপক্ষে ২% বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংক কর্তন করে রাখবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর্তনকৃত ঐ টাকা অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের নামে এফ.ডি.আর করে অর্থায়নকারী ব্যাংকের নিকট লিয়েন করার বিধান থাকতে হবে। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের জরুরি আর্থিক সংকট মোকাবেলায় ব্যাংক ও উদ্যোক্তাদের যৌথ সন্মতিতে উক্ত এফ.ডি.আর এর বিপরীতে ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদি খণ নেওয়া যাবে, অন্যথায় ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত এফ.ডি.আর ভাংগানো যাবেনা। এ নিয়মের ফলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে নিশ্চিতভাবে বড় অংকের সঞ্চয় গড়ে উঠবে, যা ঐ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

৪) লেনদেনে অনিয়ম অথবা পরিচালনায় বিশৃংখলা দেখাদিলে অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ব্যাংকের আয়ত্বে নেওয়া : অর্থায়নকৃত কোনো প্রতিষ্ঠানে তহবিল তছরূপ, নামে বেনামে অপ্রয়োজনীয় খণ নেওয়া, ব্যবহৃত ও পুরাতন মেশিনারীজ আমদানি, নিম্নমানের কাঁচমাল আমদানি ও নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন, উদ্যোক্তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল অথবা অন্য যে

কোনো কারণে প্রতিষ্ঠান লোকসানের হুমকির মুখে পড়লে অথবা প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে অর্থায়নকারি ব্যাংক ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন দখলে নিয়ে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবেন এবং এজাতিয় পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হওয়ার আগেই অর্থায়নকারি ব্যাংক কতৃক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে এবং প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে অর্থায়নের অনুপাতে লোকসানের অংশ অর্থায়নকারি ব্যাংক বহন করবে, এ মর্মে নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৫) **বৎসরান্তে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা করানোর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা :** দেশের প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন বাধ্যতামূলক যে কোনো চাটার্ড এ্যাকাউট্যোন্ট ফার্ম কতৃক অডিট করানোর নিয়ম চালু থাকতে হবে, যা ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিবেদন হিসাবে ব্যাংক ও অন্যান্য বিনিয়োগকারিদের নিকট সমানভাবে গ্রহনযোগ্য হবে। উল্লেখ্য, অডিট রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানের ভূল ও মিথ্যা তথ্য উপস্থাপিত হওয়ার কারনে কোনো ব্যাংক ও বিনিয়োগকারি ক্ষতিগ্রস্থ হলে ঐ রিপোর্ট প্রদানকারি ফার্মের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরনের মামলা দায়েরপূর্বক ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করার বিধান থাকতে হবে।

৬) **চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে ব্যাংক কতৃক চলতি মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্রে কোলেটারিয়েলের পরিবর্তে অডিট রিপোর্টকে প্রাধান্য দেওয়া :** চলমান শিল্পে ব্যাংক কর্তক চলতি মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্রে কোলেটারিয়েলের পরিবর্তে অডিট রিপোর্টকে প্রাধান্য দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম নীতির ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানে চলতি মূলধন সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন, যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে উৎপাদনে বাধাগ্রস্থ না হয়, যা দেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় ধরনের উল্ফলন ঘটাবে নিঃসন্দেহে।

৭) **ব্যাংক সমূহ কতৃক শিল্প ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কারচুপি এড়ানোর লক্ষ্যে নিয়ম নীতির সংস্কার :**

প্রাইভেট ব্যাংক সমূহের উদ্যোক্তাগণ যাতে নিজ ব্যাংক থেকে নামে বেনামে বড় অংকের ঋণ নিতে না পারে এবং শিল্পঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিজস্ব অথবা সু-পরিচিত উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিলি না করে ঋণ প্রার্থী সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমান আচরনের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণে বাধ্য হয় এমন বিধান থাকতে হবে।

৮) **নতুন ঋণ /পূণঃঅর্থায়ন/ রিসিডিউলের ক্ষেত্রে :** কোনো প্রতিষ্ঠানে নতুন ঋণ প্রদান অথবা পূণঃঅর্থায়ন অথবা ঋণ রিসিডিউল করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও পারফর্মেন্স এর ভিত্তিতেই ঋণের পরিমাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয় সমূহ নির্ধারিত হবে।

থ) উৎপাদনশীল খাতে রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিস্থিতি :

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন যে ৫ (পাঁচ) টি সংস্থা (BCIC, BJMC, BSFIC,BTMC and BSEC) উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত, তন্মধ্যে একমাত্র BSEC ব্যাতিত অন্য চারটি প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর যে হারে লোকসান দিয়ে আসছে, তা রীতিমত আতংকজনক। এ চার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে আছে BTMC , তারপরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে BSFIC, BJMC এবং BCIC. এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, যতই সময় গড়াচ্ছে, ততই এসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উৎপাদন ক্ষমতা ও বিক্রয় ক্রমাগতভাবে কমছে, ফলে এ সমস্ত সংস্থার সমন্বিত ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ পাঁচ সংস্থার সমন্বিত বিক্রয় টাঃ ৫ ,৮৬৯ কোটি,

SIFBD

শিল্প সেক্টরের আওতাধীন রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক পরিস্থিতি :

ক্রমান্বয়ে তা কমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪,৪৬৫ কোটি। অন্যদিকে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ পাঁচ সংস্থার সমন্বিত লোকসানের পরিমাণ টাঃ ৫৬৩ কোটি, ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২,৫৪৩ কোটি টাকা, এ ৭ বছরের ব্যবধানে এ পাঁচ সংস্থার সমন্বিত লোকসান বেড়েছে গড়ে ৪.৫২ গুণ বা বছরে ২২.১৮% স্মারণী-৫.৫(১৬)। অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে এ পাঁচ সংস্থার আর্থিক গড় পরিস্থিতির চিত্র ছিল নিন্মরুপ :-

- **BTMC :** এ পাঁচ বছর সময়কালে এ সংস্থার বার্ষিক বিক্রয় গড়ে টাঃ ৬.৪০ কোটি, লোসানের পরিমাণ বার্ষিক গড়ে টাঃ ২৩ কোটি (বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে গড়ে যা ৩৫৯.৩৮%) এবং সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ টাঃ ২৫ কোটি।

- **BSFIC :** বার্ষিক বিক্রয় গড়ে টাঃ ৬০২ কোটি, লোসানের পরিমাণ বার্ষিক গড়ে টাঃ ৭০১ কোটি (বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে গড়ে যা ১১৬.৪৫%) এবং সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ টাঃ ৯৮৭ কোটি।

- **BJMC :** বার্ষিক বিক্রয় গড়ে টাঃ ১,১৪৭ কোটি, লোসানের পরিমাণ বার্ষিক গড়ে টাঃ ৬১১ কোটি (বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে গড়ে যা ৫৩.২৭%) এবং সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ টাঃ ৬৯৫ কোটি।

- **BCIC :** বার্ষিক বিক্রয় গড়ে টাঃ ২,১৪৩ কোটি, লোসানের পরিমাণ বার্ষিক গড়ে টাঃ ৩৮৪ কোটি (বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে গড়ে যা ১৭.৯২%) এবং সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ টাঃ ৯১১ কোটি।

- **BSEC :** বার্ষিক বিক্রয় গড়ে টাঃ ৭৮০ কোটি, মূনাফার পরিমাণ বার্ষিক গড়ে টাঃ ৫৬ কোটি (বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে গড়ে যা ৭.১৮%) এবং সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের মোট মূনাফার পরিমাণ টাঃ ৭৫ কোটি।

স্মারণী-৫.৫(১৬) : ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে এক নজরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচ প্রতিষ্ঠানের লাভ / লোকসানের চিত্র :-

Corporation	FINANCIAL YEAR									
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
BCIC (In Crore TK.)										
Sales Revenue	1,672	1,437	2,312	2,501	2,197	2,127	2,279	2,315	1,988	2,008
Cost of Sales	1822	1,802	2047	2281	2239	2081	2398	2574	2342	2824
Operating Profit/Loss	(150)	(366)	125	219	(43)	46	(118)	(259)	(354)	(817)
Net Profit/Loss	(261)	(435)	(63)	89	(94)	103	(74)	(485)	(555)	(911)
% of Profit / Loss based on Sales	-15.61	-30.27	-2.72	3.56	-4.28	4.84	- 3.25	-20.95	-27.92	-45.3
BJMC (In Crore TK.)										
Sales Revenue	990	1,343	1,367	1,821	1,092	1,153	1,248	1,175	1,175	984
Cost of Sales	1118	1317	1407	2156	1527	1807	1829	1579	1596	1610
Operating Profit/Loss	(129)	16	(40)	(335)	(435)	(654)	(581)	(404)	(421)	(626)
Net Profit/Loss	(220)	15	(66)	(385)	(497)	(726)	(656)	(481)	(497)	(695)
% of Profit / Loss based on Sales	-22.22	1.12	-4.83	-21.14	-45.51	-62.97	-52.56	-40.94	-42.30	-70.63
BSEC (In Crore TK.)										
Sales Revenue	964	1,118	1,082	1,129	944	729	695	724	858	894
Cost of Sales	877	1031	991	1022	838	631	612	646	788	802
Operating Profit/Loss	86	87	91	107	106	98	83	78	70	92
Net Profit/Loss	57	58	51	66	69	57	60	46	43	75
% of Profit / Loss based on Sales	5.91	5.19	4.71	5.85	7.31	7.82	8.63	6.35	5.01	8.39
BSFIC (In Crore TK.)										

Sales Revenue	218	557	366	411	392	572	701	647	510	578
Cost of Sales	490	739	567	582	815	945	999	892	951	1112
Operating Profit/Loss	(272)	(182)	(201)	(172)	(423)	(373)	(298)	(244)	(442)	(534)
Net Profit/Loss	**(126)**	**(171)**	**(290)**	**(311)**	**(565)**	**(540)**	**(517)**	**(630)**	**(833)**	**(987)**
% of Profit / Loss based on Sales	**(58)**	**(31)**	**(79)**	**(76)**	**(144)**	**(94)**	**(74)**	**(97)**	**(163)**	**(171)**
					BTMC					**(In Crore TK.)**
Sales Revenue	3.28	8.56	3.24	6.97	8.49	8.85	9.64	9.57	3.11	0.80
Cost of Sales	8.50	14.07	9.89)	14.10	16.36	17.86	19.55	19.16	9.44	6.37
Operating Profit/Loss	(5.22)	(5.22)	(6.63	(7.13)	(7.87)	(9.01)	(9.91)	(9.59)	(6.33)	(5.57)
Net Profit/Loss	**(18)**	**(17)**	**(17)**	**(22)**	**(23)**	**(23)**	**(24)**	**(26)**	**(15)**	**(25)**
% of Profit / Loss based on Sales	**(549)**	**(199)**	**(525)**	**(316)**	**(271)**	**(260)**	**(249)**	**(272)**	**(482)**	**(3125)**

- **Consolidated Profit / Loss of state Owned Enterorises (Manufacturing)**

Corporation	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Total sales Revenue	3,847	4,464	5,130	5,869	4,633	4,590	4,933	4,871	4,534	4,465
Growth of sales Revenue (%)	-	16.04	14.92	14.41	(21.06)	(0 .93)	7.47	(1.26)	(6.92)	(1.52)
Total Profit/Loss	(568)	(550)	(385)	(563)	(1,110)	(1,129)	(1,211)	(1,576)	(1857)	(2543)
% of Profit / Loss based on Sales	-14.76	-12.32	-7.50	-9.59	-23.96	-24.60	-24.55	-32.36	-40.96	-56.96

Source : Bangladesh Economic Review 2019

স্মারণী-৫.৫(১৭) : ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বিত লাভ / ক্ষতির গ্রাফ :-

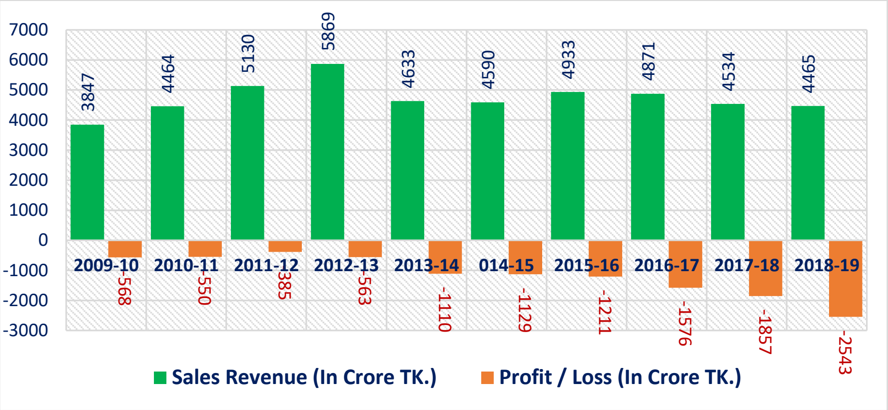

স্মারণী-৫.৫(১৮) : অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বার্ষিক গড় বিক্রয় এবং গড় লাভ ক্ষতির চিত্র :-

Corporation	**Average Sales Revenue (Crore TK.)**	**Average Profit / Loss (Crore TK.)**	**Average Profit / Loss based on Sales Revenue**	**Profit / Loss in F.Y 2018-19 (Crore TK.)**
BCIC	2,143	(384)	17.92 %	(911)
BJMC	1,147	(611)	53.27 %	(695)
BSFIC	602	(701)	116.45 %	(987)
BTMC	6.40	(23)	359.38 %	(25)
BSEC	780	56	7.18 %	75

Source : Bangladesh Economic Review 2019

দ) দেশের চলমান শিল্প সেক্টরের মূল্যায়ন :

দেশে চলমান শিল্প সেক্টরের মূল্যায়ন :

শিল্পনীতি ২০১৬ তে দেশে দ্রুত শিল্প বিকাশে উচ্চ-অগ্রাকিার ও অগ্রাধিকার শিল্প মিলিয়ে ৩১ টি শিল্পের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প সেক্টরে ব্যাক্তিখাতে গার্মেন্টস্‌সহ সর্বোচ্চ মূলত ১৭ টি শিল্পের বিস্তার ঘটেছে এবং সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আত্মবিকাশ ঘঠেছে, যারমধ্যে রয়েছে - গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইস্‌ ২৫%, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮%, ফার্মাসিউটিক্যালস্‌ ১৫%, জ্বালানি ১০%, খাদ্য ও খাদ্যজাত পণ্য ৯%, আই.টি ৪%, সিমেন্ট ৪%, লেদার এন্ড লেদার গুডস্‌ ৩%, সিরামিক ৩% এবং জুট ও অন্যান্য মিলিয়ে ৯%।

১. **জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অংশগ্রহণ :** দেশের জি.ডি.পি তে শিল্প সেক্টরের অবদান অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ সমূহের তুলনায় অনেক কম। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে ২০১৮ সালে জি.ডি.পি তে বাংলাদেশের শিল্পসেক্টরের অংশগ্রহণ ২৮.৫%। ঐ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে এ হার মিয়ানমারে ৩২.৩%, ভিয়েতনামে ৩৪.২%, থাইল্যান্ডে ৩৫%, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩৫.১%, ভুটানে ৩৮.৩%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৯.৭% এবং চীনে ৪০.৭%।

২. **শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থান :** ২০১২ সালের পর শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং হ্রাস পেয়েছে। LFS-2013 অনুযায়ী দেশে শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থানের হার ছিল ২০.৮% এবং LFS-2016-17 সময়কালে যা দাঁড়িয়েছে ২০.৪%। অর্থাৎ এ সময়ে শিল্প সেক্টরে কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে ০.৪%।

ক) উৎপাদনশীল খাত :

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে উৎপাদনশীল খাত অদ্যাবধি আনুমানিক সর্বোচ্চ ১৭ টি শিল্পে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যাদের সিংহভাগ উৎপাদনই স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের উপযোগি, বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ খুবই সামান্য। শিল্পখাতে উৎপাদিত পণ্য আভ্যন্তরীণ চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করলেও, বিগত পাঁচ বছর সময়কালে দেশে বার্ষিক আমদানির পরিমাণ গড়ে প্রায় ইউ.এস.ডলার ৪৬ বিলিয়ন।

১. **শিল্প সংখ্যা :** অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৮ (সাত বছর) সময়ের ব্যবধানে দেশে উৎপাদনশীল খাতে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা বেড়েছে ৭,৮৯১ টি, কিন্তু এ সময়কালে উৎপাদনশীল খাতে মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা কমেছে ৬৯৫ টি, মাঝারি শিল্পের সংখ্যা কমেছে ৩০৮৯ টি এবং বৃহৎ শিল্পের সংখ্য কমেছে ৬০৮ টি। স্মারণী-৫.৫(৯)

২. **উৎপাদনশীল খাতের প্রবৃদ্ধি :** ২০১০-২০১৮ সময়কালে দেশে উৎপাদনশীল খাতের গড় প্রবৃদ্ধি ১১.১৩%, তন্মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ১১.৭৬% এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধি ৮.২৬%। অর্থাৎ উৎপাদনশীল খাতে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম।

৩. **উৎপাদনশীল খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ :** বিগত দশকে পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ প্রতিবছর যৎ সামান্য বাড়লেও এ সময়কালে প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ জি.ডি.পি অনুপাতে ২২% - ২৩% এর মধ্যে উঠানামা করেছে, যার অর্থ দীর্ঘ এ দশ বছর সময়কালে দেশে প্রাইভেট সেক্টরে শিল্পখাতে কাঙ্কিত প্রসার ঘটেনি। **স্মারণী-৫.৫(১২)**

৪. **উৎপাদনশীল খাতে বিদেশি বিনিয়োগ :** ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশে পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টরে গড়ে প্রতিবছর জি.ডি.পি অনুপাতে ৫%-৬% (ইউ.এস.ডলার ১২.৫ বিলিয়ন) বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন, যার একটি বড় অংশ আসবে বিদেশী বিনিয়োগ থেকে। অথচ, অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে বছরে গড়ে (ইউ.এস.ডলার) ২.২৫ বিলিয়ন, এস.ডি.জি ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা পূরনে যা ধারে কাছেও নেই। **স্মারণী-৫.৫(১৩)**

৫. **শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবাহ :** পর্যাপ্ত নতুন শিল্প স্থাপন ও চলতি শিল্পের আকার বর্ধিত করনের মাধ্যমে দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধি করতে দীর্ঘ মেয়াদি শিল্পঋণ প্রবাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, অন্যথায় বাংলাদেশের মত সীমিত আয় ও অপর্যাপ্ত মূলধনের দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধি করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, শিল্পখাতে প্রদত্ত ঋণের মাত্র ২০%-৩০% দীর্ঘ মেয়াদি বা টার্ম লোন হিসাবে প্রদত্ত হয়, চলতি মূলধনের বিপরীতে প্রদত্ত হয় ৭০%-৮০%, দেশের শিল্পখাত প্রসারে যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। **স্মারণী-৫.৫(১৫)**

৬. **উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প :** রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন যে ৫ (পাঁচ) টি সংস্থা (BCIC, BJMC, BSFIC, BTMC and BSEC) উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত, তন্মধ্যে একমাত্র BSEC ব্যাতিত অন্য চারটি প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর যেভাবে লোকসান দিয়ে আসছে, তা রীতিমত আতংকজনক। যতই সময় গড়াচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উৎপাদন ক্ষমতা ও বিক্রয় ততই ক্রমাগতভাবে কমছে, অন্যদিকে সমন্বিত ক্ষতির পরিমাণ ততই বাড়ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ পাঁচ সংস্থার সমন্বিত বিক্রয় টাঃ ৫,৮৬৯ কোটি, ক্রমান্বয়ে তা কমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪,৪৬৫ কোটি। অন্যদিকে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ পাঁচ সংস্থার সমন্বিত লোকসানের পরিমাণ টাঃ ৫৬৩ কোটি, ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২,৫৪৩ কোটি টাকা, এ ৭ বছরের ব্যবধানে পাঁচ সংস্থার সমন্বিত লোকসান বেড়েছে গড়ে ৪.৫২ গুণ বা ২২.১৮%। **স্মারণী-৫.৫(১৬), ৫.৫(১৭) এবং ৫.৫(১৮)**

৭. **শিল্প সেক্টরে এস.ডি.জি ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন :** ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ SDG 9: Resilient Infrastructure, Sustainable Industrialization and Innovation অর্জনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেও টেকসই শিল্পায়ন এবং দেশে শ্রমসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিল্পসেক্টরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। **স্মারণী-৫.৫(৪)**

খ) তৈরী পোশাক খাত :

১. **রপ্তানিতে তৈরী পোশাকখাতের অংশ :** দেশের মোট রপ্তানিতে পোশাকখাতের অংশ ১৯৯১-২০০০ সময়কালে গড়ে ৬৭.৮৮%, ২০০১-২০১০ সময়কালে গড়ে ৭৬.১৭% এবং ২০১১-২০১৭ সময়কালে গড়ে ৮১.১০%। রপ্তানিখাতে একক পণ্যের আধিক্যের ক্ষেত্রে এশিয়ার সম্ভাবনাময় দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানিতে একক পণ্যের আধিক্য বাংলাদেশে ৮৩.৪৯%, ফিলিপাইনে ৪৪.৮%, ভিয়েতনামে ৩৮.১%, ইন্দোনেশিয়ায় ২১.৮%, পাকিস্তানে ১৮%, থাইল্যান্ডে **১৭%** এবং ভারতে ১৬.৪%। উল্লেখ্য, রপ্তানিতে একক পণ্যের অতিমাত্রায় আধিক্য বা একক পণ্য নির্ভর রপ্তানিখাত যে কোনো দেশের জন্য সবসময় মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ। স্মারণী-৫.৫(২০):

২. **জি.ডি.পি তে পোশাকখাতের অবদান :** বিগত বছরগুলোতে রপ্তানিতে তৈরী পোশাক খাতের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৫ সালের পর থেকে দেশের জি.ডি.পি তে এখাতের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে কমেছে, যেমন- ২০১০-২০১৩ এ চার বছর সময়কালে জি.ডি.পি তে পোশাক খাতের অবদান ছিল গড়ে বছরে ১৫.৭%, ২০১৪-২০১৫ সময়কালে ১৪.৫৭% এবং ২০১৬-২০১৭ সময়কালে ১২.৪৯%। স্মারণী-৫.৫(২০):

৩. **পোশাকখাতে কর্মসংস্থান :** ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে পোশাকখাতে প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থান কোনোটাই বাড়েনি। অর্থবছর ২০১৮-১৯ নাগাদ তৈরী পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা আনুমানিক ৩৬,১১,০৮২ জন (সি.পি.ডি স্টাডি, ২০১৮), যা এ সময়ে দেশে কর্মরত মোট শ্রমশক্তির ৫.৯৩ শতাংশ এবং শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমশক্তির ২৯.০৭ শতাংশ। স্মারণী-৫.৫(২১)

ধ) শিল্প সেক্টরে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

বাংলাদেশের শিল্পসেক্টর বিবিধ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত, যা এদেশের শিল্পখাত পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিপূর্বক টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে টেকসই শিল্পায়ন অপরিহার্য। তাছাড়া, ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য এস.ডি.জি ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে টেকসই শিল্পায়ন একটি অবধারিত এজেন্ডা। শিল্প সেক্টরের কাঙ্কিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে এ সেক্টরে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, কেননা, এসমস্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কারনে বাংলাদেশের শিল্পখাত যুগ যুগ ধরে জরাজীর্ণ হয়ে রয়েছে।

শিল্প সেক্টরে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

নিম্নে দেশের শিল্প সেক্টরে বিরাজমান উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহের সংক্ষিপ্তসার তুলেধরা হলো :-

১. **অপর্যাপ্ত অবকাঠামো :** দ্রুত ও টেকসই শিল্পায়নের জন্য টেকসই অবকাঠামো অন্যতম পূর্বশর্ত, যারমধ্যে রয়েছে স্থলপথ, রেলপথ, বিমান বন্দর, নদী ও সমুদ্র বন্দর, বিদ্যুৎ, পানি. গ্যাস, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি। বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ও গ্যাস শিল্প সেক্টরের বর্তমান চাহিদার অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম হলেও, ভবিষ্যতে দেশে শিল্পখাতের প্রসার ঘটলে এ চাহিদা অনেকগুণ বেড়ে যাবে, জ্বালানি খাতের প্রসার ব্যাতিত যা পূরণ করা অসম্ভব। কাজেই দেশে শিল্প সেক্টরের কাঙ্কিত প্রসার ঘটাতে হলে ভবিষ্যতের চাহিদা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতে পর্যাপ্ত দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

২. **আমদানি নির্ভর কাঁচামাল :** একমাত্র কৃষিভিত্তিক শিল্প ব্যাতিত দেশের অন্য সকল শিল্প আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। ফলে একদিকে যেমন শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা দেশের বাহিরে চলে যায়, অন্যদিকে আমদানিকৃত কাঁচামালে উৎপাদন খরচ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, যা ঐ শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতা এবং আর্থিক হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করায়।

৩. **অদক্ষ শ্রমশক্তি :** শিল্পোৎপাদনে গতিশীলতা আনতে দক্ষ শ্রমিকই একমাত্র বিকল্প। দেশে অদ্যাবধি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিল্প সেক্টরের উপযোগি দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার মত প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারনে শিল্প সেক্টরে পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমশক্তির অভাব রয়েছে, যা শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৪. **নিন্মমানের পণ্য উৎপাদন :** উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার কম হওয়ার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মানসন্মত পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়না, যা ঐ শিল্পকে প্রতিযোগিতায় পিছনে ঠেলে দেয় এবং শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলে।

৫. **উদার আমদানি নীতি :** উদার আমদানি নীতি অব্যাহত থাকার ফলে দেশে উৎপাদিত হয় এমন সব পণ্য বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন পন্থায় আমদানি হয়, অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আবার আন্ডার ইনভয়েজের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে পণ্য আমদানি করে। আমদানিকৃত ঐসমস্ত পণ্যের গুণগত মান দেশিয় পণ্যের চেয়ে তুলনামূলক ভালো এবং দামও কম হয়, যা দেশিয় শিল্পকে প্রতিনিয়ত মারাত্মক হুমকির মূখে ফেলছে, দেশে শিল্প সেক্টরের বিস্তারে যা অন্যতম প্রতিবন্ধক।

৬. **পদে পদে ঘুষ ও দুর্ণীতি :** দেশের চিরাচরিত রাহুগ্রাস ঘুষ ও দূর্ণীতির কারণে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি পর্যন্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্র সংগ্রহ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাড়তি অর্থ প্রদান করতে হয়, যা পণ্যের উৎপাদন খরছ অনেক বাড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন করে তুলছে।

৭. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা :** দেশে অতি পরিচিত আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে নতুন শিল্প স্থাপন ও চলমান শিল্পের সম্প্রসারণে বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্র সংগ্রহ, কাঁচামাল আমদানি, আমদানিকৃত পণ্যের মান যাছাই, তেজক্রিয়তার ছাড়পত্র, উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র প্রদানে দীর্ঘ সূত্রিতা এদেশে নৈমত্তিক ব্যাপার, যা দেশের শিল্প সেক্টরকে প্রতিনিয়ত পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।

SJEBD

৮. **দেশিয় পণ্য ব্যবহারে অনীহা :** দেশিয় বাজারে তুলনামূলক কম দামে পর্যাপ্ত বিদেশী পণ্য পাওয়ার কারনে দেশিয় পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ যথেষ্ঠ কম, দেশিয় শিল্প টিকে থাকার ক্ষেত্রে যা অন্যতম বড় হুমকি।

৯. **অপর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণ ও উচ্চ সুদের হার :** শিল্প স্থাপন এবং স্থাপিত শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের সহজলভ্যতা অন্যতম প্রধান শর্ত। দেশে শিল্প সেক্টরে ব্যাংক ঋণ যথেষ্ঠ অপর্যাপ্ত এবং প্রদত্ত ঋণের ৭০-৮০ শতাংশই চলতি মূলধনের বিপরীতে দেওয়া হয়, স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদে শিল্প ঋণ এক্ষেত্রে খুবই অপর্যাপ্ত। লবিং ও কোলেটারিয়েলের অভাবে মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে চলতি মূলধনের সুযোগ নিতেও ব্যার্থ হয়, ফলে আর্থিক অনটনে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে যথাসময়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন পরিশোধ করতে না পারা, উৎপাদন বন্ধ রাখা ও লে-অফ ঘোষণা করার মত ঘটনা শিল্প সেক্টরে প্রতিনিয়ত ঘটছে, দেশে শিল্পখাতের প্রসারে যা অন্যতম বড় সমস্যা।

১০. **ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা না থাকা :** দীর্ঘ মেয়াদে শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের তদারকিতে ঋণদাতা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ঠতা ও জবাবদিহিতা না থাকার ফলে প্রদত্ত ঋণের টাকা যথাযথভাবে শিল্প উৎপাদনে ব্যবহার না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে তছরুপ হয়ে যায়, যা দেশে ঋণ খেলাপি ও রুগ্ন শিল্পের জন্ম দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

১১. **মূলধনের অপর্যাপ্ততা :** স্বল্প আয়ের এ দেশে মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ সীমিত হওয়ার কারনে ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবসায়ে বড় আকারের মূলধন বিনিয়োগের ঝুকি নেওয়া সবক্ষেত্রেই কঠিন। ফলে নতুন শিল্প স্থাপন এবং স্থাপিত শিল্প পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই পঁজি স্বল্পতা এদেশের শিল্প সেক্টরে অন্যতম বড় সমস্যা, যা দেশে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে।

১২. **ব্যবসায়িক দক্ষতা ও মনমানষিকতার অভাব :** দেশে কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না থাকার ফলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক মন মানষিকতা সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করতে ব্যার্থ হচ্ছে বিধায় শিক্ষা জীবন শেষে সিংহ ভাগ নাগরিকই ব্যবসার পরিবর্তে চাকরির পিছনে ছুটে। নিজ উদ্যোগে মুষ্টিমেয় যারা শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসে তাদের বেশির ভাগই হয় অদক্ষ, অথবা তাদের মাঝে পুরোপুরি ব্যবসায়িক মন মানসিকতার অভাব থাকে, ফলে শিল্প সেক্টরে প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়া এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা অহরহ ঘটছে।

১৩. **ঝুকি মোকাবেলায় সরকারি প্রণোদনার অপর্যাপ্ততা :** শিল্প সেক্টরে উৎপাদিত পণ্য দেশে ও বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক দামে মানসন্মত পণ্য সর্বরাহ নিশ্চিত করা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নতুন স্থাপিত শিল্পের জন্য অনেক ক্ষেত্রে যা রীতিমত কঠিণ। দেশে বর্তমানে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানী মূল্যের উপর নগদ প্রনোদনার ব্যবস্থা রয়েছে, যা ঐ সমস্ত শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে যথেষ্ট সহায়ক হিসাবে কাজ করছে। অনুরুপভাবে, প্রত্যেক শিল্পে মানসন্মত পণ্য উৎপাদন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি সকল পণ্যের রপ্তানী মূল্যের উপর পর্যাপ্ত নগদ প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু করা গেলে শিল্পখাতে বিনিয়োগের ঝুকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে, যা দেশে নতুন শিল্প স্থাপনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুতই রপ্তানিখাতে বড় ধরনের প্রসার ঘটবে এটা নিশ্চিত।

১৪. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** এদেশের শিল্প সেক্টর আশানুরুপ প্রসারিত না হওয়ার পেছনে দীর্ঘ সময় ধরে চলা রাজনৈতিক অস্থিরতা আরেকটি অন্যতম কারন। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে শিল্পখাতে বিনিয়োগ যেমন হ্রাস পায়, তেমনি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির

SJFBD

কারনে শিল্পোৎপাদন ও বিপননের উপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, শিল্প সেক্টরের বিকাশে যা অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক।

১৫. **শিল্পখাতের প্রসারে সু-নির্দিষ্ট টার্গেট না থাকা :** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট টার্গেট না থাকার ফলে দেশে নতুন শিল্প স্থাপনের হার তুলনামূলক ভাবে অনেক কম।

১৬. **প্রযুক্তি উন্নয়নে পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়া :** প্রযুক্তিই শিল্পোন্নয়নের সোপান। দেশে প্রযুক্তি উন্নয়নে পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়ার কারনে শিল্প সেক্টরের উৎকর্ষতায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছেনা, ফলে বাংলাদেশের শিল্প সেক্টর অদ্যাবধি বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভর, যা অনেক ব্যয়বহুল এবং দেশে শিল্পখাতের প্রসার ও উন্নয়নে যা অন্যতম প্রতিবন্ধক।

১৭. **ব্যবসা শুরুর পরিবেশ অনুকুল না হওয়া :** শিল্প সেক্টরের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্র, সিদ্ধান্ত প্রদান, শিল্প প্লট বরাদ্ধ, পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করা সবচেয়ে জরুরি, বতমানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় যা পুরোপুরি অনুপস্থিত।

১৮. **অনুকুল বিনিয়োগ পরিবেশের অনুপস্থিতি :** শিল্পখাত সম্প্রসারণে দেশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে প্রয়োজন বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ, যা বিনিয়োগ কারিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের ন্যায্য লভ্যাংশের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শুল্ক সুবিধা, আর্থিক প্রনোদনা, কর মওকুফ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিতের পাশাপাশি দেশে আন্তর্জাতিক মানের পর্যাপ্ত হোটেল, মোটেল, ফুড মেন্যু, বিদেশীদের জন্য চিকিৎসা বীমার সুবিধা, উন্নত চিকিৎসা ও বিনোদন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি অনুকুল বিনিয়োগ পরিবেশের অর্ন্তগত, বাংলাদেশে যা আজও যথেষ্ট অপর্যাপ্ত। ফলে ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গড়ে প্রতিবছর জি.ডি.পি অনুপাতে ৫%-৬% (ইউ.এস.ডলার ১২.৫ বিলিয়ন প্রতি বছর) বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন থাকলেও, অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে বছরে গড়ে (ইউ.এস.ডলার) ২.২৫ বিলিয়ন, এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যা যথেষ্ট অপর্যাপ্ত। স্মারণী-৫.৫(১২)

১৯. **শ্রমিক আন্দোলন :** দেশের শিল্প সেক্টরে শ্রম আইনের পুরোপুরি প্রয়োগে বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে যখন তখন শ্রমিক ছাটাই, শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন পরিশোধে নিয়ম নীতির অনুপস্থিতি, মালিক শ্রমিক সম্পর্কের অবনতি, কারখানার অনিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও রাজনৈতিক মদদে শ্রমিক ক্ষেপানো ইত্যাদি বহুবিধ কারনে শিল্প সেক্টরে অহরহ শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলনের ঘটনা ঘটে, যা শিল্পখাতের প্রসারে অন্যতম অন্তরায়।

২০. **সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অভাব :** সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিতের পাশাপাশি বিনিয়োগ পরিবেশকে করে তোলে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য, যা দেশে শিল্প সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে এখনো পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের তুলনায়ও বহু পিছনে অবস্থান করছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক সংস্থা WJP এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের রিপোর্ট অনুযায়ী আইনের শাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় ৬ দেশের মধ্যে ৪র্থ, নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের ৩০ দেশের মধ্যে ২৪ তম এবং বিশ্বে ১১৩ দেশের মধ্যে ১০২ তম।

২১. **শিল্প সেক্টরের হাল নাগাদ ডাটাবেজ না থাকা :** টেকসই শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্প সেক্টরের হালনাগাদ ডাটবেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বাংলাদেশে আজোও সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়না। শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে শিল্প সেক্টরের ডাটাবেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

SJFBD

ন) শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে রপ্তানী খাতের প্রসার ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিপূর্বক দারিদ্র নির্মূল করতে শিল্প সেক্টরের পর্যাপ্ত বিকাশ ও টেকসই শিল্পায়ন অপরিহার্য। দেশে শিল্প বানিজ্যের দ্রুত প্রসার ও সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগোপযোগি বিপ্লব আনতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাক্তিখাতে সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পূর্বক দেশে শিল্পায়ন ও ব্যবসা বানিজ্য সহজিকরনের মাধ্যমে ব্যাক্তিখাতে পুরো মাত্রায় গতিশীলতা আনয়ন, যাতে সরকারের নেতৃত্বে শিল্প সেক্টরে ব্যাক্তিখাতের ব্যাপক অংশগ্রহনের মাধ্যমে এদেশে শিল্প বিপ্লবের পথ সুগম হয়।

দেশে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে **"জাতিয় শিল্পনীতি-২০১৬"** প্রণীত হয়েছে, যাতে শিল্পখাতের উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল, বিনিয়োগ প্রনোদনা, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিনিয়োগ নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্ল্যেখ রয়েছে এবং এ শিল্পনীতি বাস্তবায়নে **National Council for Industrial Development (NCID)** গঠিত হয়েছে। তাছাড়া শিল্পখাতের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে **"শিল্প উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী আইন্ ২০১২"** প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

জাতিয় শিল্পনীতি-২০১৬ এর মূল উদ্দেশ্য সমূহ :-

- শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যাক্তিখাত সৃষ্টি এবং দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা।
- দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি।
- ক্ষুদ্র, কুঠির ও মাঝারি শিল্পকে শিল্পায়নের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।
- রপ্তানীমূখী শিল্প স্থাপন ও রপ্তানী বহুমূখীকরণ।
- টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান।
- এলাকাভিত্তিক কৃষিজ, বনজ, প্রাণীজ, প্রাকৃতিক, সামুদ্রিক ইত্যাদি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষায়িত শিল্পের উন্নয়ন।
- শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগতমান উন্নয়ন ও বাজারজাত করনে সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও অঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে দেশের শিল্পখাতকে সক্ষমকরণ।
- শিল্পখাতে নারী উদোক্তাদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান।

শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

এদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে, জাতিয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর উদ্দেশ্য সমূহের আলোকে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের শিল্পসেক্টরের কাঙ্কিত বিস্তার ও প্রসারকল্পে নিন্মোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ উপস্থাপিত হলো :-

১) **অবকাঠামো উন্নয়ন :** টেকসই শিল্পায়নের জন্য টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন অন্যতম পূর্বশর্ত, যারমধ্যে রয়েছে স্থলপথ, রেলপথ, বিমান বন্দর, নদী ও সমূদ্র বন্দর, বিদ্যুৎ, পানি. গ্যাস, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি। ভবিষ্যতে শিল্পখাতে কাঙ্কিত প্রসার নিশ্চিত করতে এবং দেশে টেকসই শিল্পায়ন গড়ে তুলতে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একটি অবধারিত বিষয়।

২) **শিল্প সেক্টরে বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা :** শিল্প সেক্টরে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির উপরই এখাতের প্রসার ও উন্নয়ন নির্ভরশীল, যেমন :-

ক) **অনুকুল বিনিয়োগ পরিবেশ :** যেমন-পর্যাপ্ত অবকাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পর্যাপ্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদান, অফিশিয়াল ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঘুষ, দুর্ণীতি ও দীর্ঘসূত্রীতার অবসান, বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ার নিশ্চয়তা এবং দেশের সকল স্তরে আইনের শাসন সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়া ।

খ) **বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান :-** যেমন-

- শিল্পপ্লট বরাদ্ধ সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালুকরা, সীমিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগের নিশ্চয়তা, কর মওকুফ সুবিধা, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে চলতি মূলধন ও টার্ম লোনের সুবিধা, নতুন বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস না খুঁজে বরং অধিক বিনিয়োগে জোর দেওয়া ও পুণর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরা।
- কাঁচামাল আমদানির বিপরীতে সরাসরি রপ্তানিযোগ্য ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিযোগ্য সকল ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বন্ড সুবিধা প্রদান করা।
- উচ্চ পর্যায়ের বিনিয়োগকারিদের জন্য সি.আই.পি ও অন্যান্য সরকারি মর্যাদা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা।
- অর্থের উৎস অনুসন্ধান ব্যাতিত উৎপাদনশীলখাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া।
- শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলনের পাশাপাশি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সব ধরনের উদ্যোক্তদের জন্য এ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।

SJIBD

৩) **বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ :** বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষনের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি বাড়তি আরোও যে সমস্ত উল্ল্যেখযোগ্য সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন, সেগুলো হচ্ছে :-

- উন্নত পর্যটন ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পর্যাপ্ত হোটেল, মোটেল ও ডিশ ব্যবস্থা।
- দেশে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদেশীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্য বীমাসহ আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা।
- বিদেশী বিনিয়োগকারি, কর্মরত বিদেশী টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ ভিসা ব্যবস্থার পাশাপাশি মাল্টিপল এন্ট্রি ও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ প্রদান।
- বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সমূহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা।
- বিদেশী বিনিয়োগ কারিদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- দেশে কর্মরত বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বেতন ভাতা পুরোপুরি করমুক্ত করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে কঠোর তদারকি।
- অফিশিয়াল আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঘুষ, দুর্ণীতি ও দীর্ঘ সূত্রিতা সমূলে নির্মূলের পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষেত্রে হয়রানিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির নিশ্চয়তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা, যাতে বিশ্বে দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়।
- সকলক্ষেত্রে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা।

৪) **শিল্প সেক্টরে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করা :** শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও দীর্ঘমেয়াদি শিল্প ঋণ এ দুইখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া জরুরি, কেননা, শতভাগ নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্পায়ন অন্তত স্বল্পআয়ের এ দেশে আশা করা দুরুহ। দেশে শিল্প ঋণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিল্পখাতে প্রদত্ত ঋণের মাত্র ২০%-৩০% দীর্ঘ মেয়াদি বা টার্ম লোন হিসাবে প্রদত্ত হয়, চলতি মূলধনের বিপরীতে প্রদত্ত হয় ৭০%-৮০% ঋণ, দেশের শিল্পখাত প্রসারে যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়।

৫) **উৎপাদনশীলখাতে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করন :** আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করতে দেশের রপ্তানীখাতের প্রসার ও বহুমূখী করনের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল খাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। চলমান শিল্পনীতি ২০১৬ তে শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়নে বিস্তারিত উল্ল্যেখ থাকলেও শিল্প সমৃদ্ধি অর্জনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন খাতে কি পরিমাণ শিল্প স্থাপিত হবে, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থায়নের উৎস ও প্রক্রিয়া, স্থাপিত শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে এবং শিল্পকে রুগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট রুপরেখা ও দিক নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে। কজেই ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বর্ধিত শ্রমশক্তির অনুপাতে উৎপাদনশীলখাতে সকল ধরনের শিল্পকারখানা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ব্যাতিত বিকল্প নেই।

৬) **শিল্পকারখানা স্থায়িত্বতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ :** দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লাভজনক পরিচালনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থাপিত শিল্পের স্থায়িত্বতা বৃদ্ধি করা টেকসই শিল্পায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যারজন্য প্রয়োজন শিল্পসেক্টরে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, মানসন্মত পণ্য উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি, স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে লাভজনকভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারা এবং কোনো অবস্থাতেই যাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন না হয়ে পড়ে ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের বিস্তারিত ও সু-নির্দিষ্ট গাইড লাইন থাকা প্রয়োজন।

৭) **উৎপাদনশীলখাতে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনায় পুণর্গঠন ও উন্নয়ন :**

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ক্রমাগতভাবে লোকসান দিয়ে আসছে, ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় দ্রুত পূণর্গঠনের মাধ্যমে হয় লাভজনক করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে, অন্যথায়

SJFBD

ক্রমান্নয়ে ঐসব প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। জনগনের ট্যাক্সের টাকায় বছরের পর বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ভূর্তুকি দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার যৌক্তিকতা এখন রীতিমত প্রশ্নবিদ্ধ।

৮) সবধরনের শিল্পের কাঁচামাল ক্রমান্নয়ে দেশে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ : কৃষিভিত্তিক শিল্পের পাশাপাশি অন্য সব ধরনের শিল্পের কাঁচামাল পুরোপুরিভাবে দেশে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ পূর্বক শিল্পখাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা জরুরি, কেননা আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল কোনো শিল্প একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ার দরুণ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিণ হয়ে পড়ে, অন্যদিকে কাঁচামালের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয় বিধায় ঐ শিল্প শতভাগ ঝুকির মধ্যে থাকে, ফলে ঐ শিল্পের ভবিষ্যৎ সব সময় অনিশ্চিত হয়।

৯) রপ্তানী বহুমূখী করনের মাধ্যমে একক পণ্য নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা : বিগত দুই যুগেরও অধিক কাল ধরে দেশের রপ্তানী বানিজ্যের ৮০ শতাংশই তৈরি পোশাক শিল্পের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, দেশের অর্থনীতির জন্য যা মারাত্মক ঝুকিপূণ । বিগত দশকে (২০০৯-২০১৮) দেশে বার্ষিক মোট রপ্তানি মূল্যের গড়ে ৮১% তৈরি পোশাক, ১৪.৫% শিল্পজাত পণ্য এবং ৪.৫% কৃষিজাত পণ্য, একক পণ্যে নির্ভরশীলতার দিকথেকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের তুলনায় যা বহুগুণ বেশি।

রপ্তানিখাতে একক পণ্য নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার মাধ্যমে রপ্তানিখাতকে ঝুকিমুক্ত করে তুলতে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি কৃষি নির্ভর ও অন্যান্য শিল্পের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পূর্বক এসমস্ত শিল্পে মানসন্মত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া এখন অবধারিত হয়ে পড়েছে। কেননা হঠাৎ কোনো কারনে তৈরিপোশাক শিল্পে বিপর্যয় দেখা দিলে, দেশের রপ্তানীখাতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিবে, দেশের অর্থনীতির জন্য যা হবে অত্যন্ত বয়াবহ ।

১০)শিল্প সেক্টরের উপযোগি দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা : দক্ষ শ্রমিক ব্যাতিত দক্ষভাবে কলকারখানা চালু ও মানসন্মত উৎপাদন অসম্ভব এবং অপ্রিয় সত্য হলো এদেশের শিল্পসেক্টর যুগ যুগ ধরে দক্ষ শ্রমিক অপুষ্টিতে ভূগছে। আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের শিল্পসেক্টর ও বিদেশের শ্রমবাজার উপযোগি দক্ষ কর্মীবাহিনি গড়ে তুলতে **" সবার জন্য বিনামূল্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যামূলক করার পাশপাশি যারা উচ্চশিক্ষায় যেতে অপারগ তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনীর পর বিনামূল্যে দুই বছর মেয়াদি শিল্পকারিগরি শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য।"** বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ পদক্ষেপ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানসন্মত পর্যাপ্ত সংখ্যক **"কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট"** চালু করার প্রয়োজন রয়েছে।

১১) প্রযুক্তি উন্নয়ন ও কারিগরি উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ : ডিজিটালাইজেশনের এ যুগে অথনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ, যেমন- শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সকলক্ষেত্রে মানসন্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিশ্বে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় নিজ দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিল্পব আনা ব্যতিত বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে নিবন্ধনের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক উচ্চ দক্ষতার কারিগরি জনবল তৈরি করা, যারা ভবিষ্যতের হাল ধরবে। এ লক্ষ্য অর্জনে যে সমস্তক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিবর্তন প্রয়োজন, সেগুলো হচ্ছে :-

SJFBD

ক) **চাকরি ও ব্যবসাবানিজ্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষা সমাপ্তকারিদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা :** দেশিয় সকল শিল্প কারখানা ও প্রকল্পসমূহের শীর্ষ পর্যায়ে দেশিয় এক্সপার্ট নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপের পাশাপাশি বিদেশী অর্থায়নকৃত প্রকল্প সমূহে দেশিয় এক্সপার্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং কারিগরি শিক্ষা সমাপ্তকারি ব্যাক্তিবর্গ কতৃক উৎপাদনমূখী কোনো শিল্প স্থপনের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য সরকারি সুবিধায় অগ্রাধিকার দেয়া, যাতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাক্তিদের সহজ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকে, যা উচ্চশিক্ষায় নিবন্ধনের হার বাড়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

খ) **উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা :** উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে **"গবেষণা ও উদ্ভাবনী"** কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখাতে সরকারি বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে গবেষণা ও উদ্ভাবনিখাতে উৎকর্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

গ) **গবেষণার ফলাফল সংরক্ষণ এবং দ্রুত বানিজ্যীকি করন :** "গবেষণা ও উদ্ভাবনী" ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত সকল তত্ব ও ফর্মূলার যথাযথ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দ্রুত বানিজ্যিকি করনের লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় পর্যায়ে আলাদা সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করা।

ঘ) **যৌথ গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা :** বিদেশী স্বনামধন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং আবিষ্কৃত ফর্মূলা বানিজ্যিকিকরনের ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি খাতের সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করা।

ঙ) শিল্পোন্নত দেশ সমূহের সাথে " **Technical Know How**" বিনিময় বৃদ্ধি করা।

১২) **শিল্প সেক্টরের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** শিল্প সেক্টরের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি, কেননা শিল্প সেক্টরের আওতাভূক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিস্থিতি তাৎক্ষনিকভাবে সরকার, অর্থায়নকারি ব্যাংক, বিনিয়োগকারি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষদ্বয়ের জানার সুযোগ থাকলে, যে কোনো প্রতিষ্ঠান লোকসান অথবা অন্যকোনো অনিয়মের শিকার হয়ে রুগ্ন হওয়ার উপক্রম হলে তা সহজে সবার নজরে আসবে এবং তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় এবং দেশের শিল্প সেক্টরের আকার ও প্রসার পরিমাপের ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য অত্যন্ত জরুরি।

SJIBD

১৩) **ব্যবসায়িক দক্ষতা ও মনমানষিকতা সম্পন্ন উদ্যোক্তা গোষ্ঠী তৈরী করা :** দেশে কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না থাকার ফলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক মন মানষিকতা সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করতে ব্যার্থ হচ্ছে বিধায় শিক্ষা জীবন শেষে সিংহ ভাগ নাগরিকই ব্যবসার পরিবর্তে চাকরির পিছনে ছুটে। তাছাড়া, নিজ উদ্যোগে যারা শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসে তাদের বেশির ভাগই হয় অদক্ষ, অথবা তাদের মাঝে পুরোপুরি ব্যবসায়িক মন মানসিকতার অভাব থাকে, ফলে শিল্প সেক্টরে প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়া এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা অহরহ ঘটছে।

শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে এ দুরাবস্থা লাঘবে দেশে কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি মানসন্মত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ আরোও অনেকগুণ জোরদার করা জরুরি এবং নতুন উদ্যোক্তদের জন্য শিল্প স্থাপনের ছাড়পত্র প্রদান ও ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

১৪) **শিল্প সেক্টরে ঝুকি ও অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় সরকারি সুযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা :** শিল্প সেক্টরে উৎপাদিত পণ্য দেশে ও বিদেশের বাজারে টিকে থাকতে প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক দামে মানসন্মত পণ্য সর্বরাহ নিশ্চিত করা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নতুন স্থাপিত শিল্পের জন্য

অনেক ক্ষেত্রে যা রীতিমত কঠিণ। **প্রত্যেক রপ্তানিমূখী শিল্পে মানসন্মত পণ্য উৎপাদন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি সকল পণ্যের রপ্তানী মূল্যের উপর পর্যাপ্ত নগদ প্রণোদনার পাশাপাশি নতুন স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে ১০ বছরের ট্যাক্স হলিডে ব্যবস্থা চালু করা গেলে শিল্পখাতে বিনিয়োগের ঝুকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে**, যা দেশে রপ্তানিমূখী শিল্প স্থাপনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুতই রপ্তানিখাতে বড় ধরনের প্রসার ঘটবে এটা নিশ্চিত বলা যায়।

১৫) সকল রপ্তানিমূখী শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন বাধ্যতামূলক করা : রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে সকল রপ্তানিমূখী শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন সহজিকরনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৬) উদার আমদানীনীতি পরিহার করা : দেশীয় শিল্প বিকাশের স্বার্থে দেশে উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদন সম্ভব এমন সকল পণ্য আমদানিতে কঠোরতা আরোপের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ চাহিদার ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্প সেক্টরে পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি অর্থবছরের জন্য আভ্যন্তরীণ চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে আভ্যন্তরীণ বাজারে কোনো পণ্যের ঘাটতি না থাকে।

১৭) দেশিয় পণ্য ব্যবহারে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করা : দেশিয় বাজারে তুলনামূলক কম দামে পর্যাপ্ত বিদেশী পণ্য পাওয়ার ফলে দেশিয় পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ যথেষ্ট কম, দেশিয় শিল্প টিকে থাকার ক্ষেত্রে যা অন্যতম বড় হুমকি। এতে যে শুধু দেশিয় শিল্প পিছিয়ে পড়ছে তা নয়, এখাতে সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব হারানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সহ সামগ্রীক অর্থনীতিতে বড় আকারের নেতি বাচক প্রভাব ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশিয় শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের স্বার্থে দেশিয় পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করা পূর্বক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আভ্যন্তরীণ বাজারের আকার দুটোই দ্রুত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যার জন্য প্রয়োজন :-

ক) আভ্যন্তরীণ চাহিদার ভিত্তিতে দেশিয় সকল প্রকার শিল্পের পর্যাপ্ত সংখ্যক শিল্পকারখানা স্থাপনে সরকারের দ্রুত ও কার্যকরি পদক্ষেপ।

খ) দেশিয় শিল্পে আভ্যন্তরীণ চাহিদার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত ও মান সন্মত পণ্য উৎপাদনের উপর সরকারি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

গ) দেশিয় শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য করে তুলতে এবং উৎপাদন খরচ হ্রাস ও বাজারজাত করনে সমস্যা সমূহ দূরীকরনে সরকারের দ্রুত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

ঘ) দেশিয় পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে গণমাধ্যম সমূহে সরকারি উদ্যোগে নিয়মিত প্রচার প্রচারণা চালানো।

১৮) ব্যক্তিপর্যায়ে মূলধনের অপর্যাপ্ততা দূরীকরন : স্বল্প আয়ের এ দেশে মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ সীমিত হওয়ার কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবসায়ে বড় আকারের মূলধন বিনিয়োগের ঝুকি নেওয়া সবক্ষেত্রেই কঠিন। ফলে নতুন শিল্প স্থাপন এবং স্থাপিত শিল্প পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই পঁজি স্বল্পতা এদেশের শিল্প সেক্টরে অন্যতম বড় সমস্যা, যা দেশে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প বিকাশে) যুগ যুগ ধরে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। ব্যক্তি পর্যায়ে মূলধনের অপর্যাপ্ততা দূরীকরনে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

ক) ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প বিকাশে : স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে জাতীয় পেনশন স্কীমের আওতায় সরকারি অংশীদারিত্বে গ্রামীণ সঞ্চয় প্রকল্প [(৩.৮(গ) **পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য**] চালুকরা গেলে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য শক্তিশালী

SJIBD

সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি হওয়ার পাশাপাশি ব্যাক্তিপর্যায়ে বিনিয়োগ ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেত যা দেশে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প বিকাশে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

খ) **বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প বিকাশে :** ঋণদাতা ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এখাতে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা সহজ করা।

গ) অর্থের উৎস অনুসন্ধান ব্যাতিত উৎপাদনশীলখাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া।

১৯)বিনিয়োগ ও ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতা হ্রাস করা : দেশে শিল্প সেক্টরের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগ ও ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্র, সিদ্ধান্ত প্রদান, শিল্প প্লট বরাদ্ধ, পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা অত্যন্ত জরুরি, বতমানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা অনুপস্থিত। এ সমস্যা নিরসনে বাস্তব সন্মত উদ্যোগ দেশে শিল্প ও বানিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে বহু পুরানো সমস্যা দূরীভূত হওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে যথেষ্ট গতিশীলতা আসবে এটা নিশ্চিত বলা যায়।

২০) দুর্ণীতির ক্ষেত্রে জিরো ট্রলারেন্স নীতি অবলম্বন : সর্বস্তরে অপ্রতিরোধ্য ঘুষ ও দুর্ণীতির কারণে দেশের শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা দূরুহ করে তোলার পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন খাত থেকে প্রতিবছর হাজার হাজর কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছেন এবং তথাকথিত এ ঘুষ ও দুর্ণীতির কারেণে দেশের সকল সেক্টরে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। টি.আই.বি রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী ঐ বছর দেশের সার্ভিস সেক্টরে সংঘটিত হওয়া ঘুষ ও দুর্ণীতির প্রাক্কলিত পরিমাণ ১০,৬৮৮.৯ কোটি টাকা, যারমধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ঘুষ ও দুর্ণীতি সংঘঠিত হয়েছে ভূমি সেবা খাতে, টাকা ২,৫১৩ কোটি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইন শৃংখলা রক্ষাকারি সংস্থা টাঃ ২,১৬৭ কোটি ও বিচারিক সেবা টাঃ ১,২৪২ কোটি । কাজেই, দেশে শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে সরকারি সেক্টরে ঘুষ, দুর্ণীতি ও অনিয়ম বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে জিরো ট্রলারেন্স নীতি অবলম্বন করা অবধারিত হয়ে পড়েছে।

২১) শ্রম আইনের পুরোপুরি প্রয়োগ নিশ্চিত করা : দেশে শ্রম আইনের পুরোপুরি প্রয়োগে বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে যখন তখন শ্রমিক ছাটাই, শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন পরিশোধে নিয়ম নীতির অনুপস্থিতি, মালিক শ্রমিক সম্পর্কের অবনতি, কারখানার অনিরাপদ পরিবেশ ও রাজনৈতিক মদদে শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি বহুবিধ কারনে শিল্প সেক্টরে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, দেশের শিল্পখাত প্রসারে যা অন্যতম অন্তরায়। দেশে দ্রুত শিল্প বিকাশের স্বার্থে শ্রম আইন পুরোপুরি প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরি।

২২) সর্বস্তরে আইনের শাসন ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিতের পাশাপাশি বিনিয়োগ পরিবেশকে করে তোলে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য, যা দেশে শিল্প সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে এখনো পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের তুলনায়ও বহু পিছনে অবস্থান করছে। দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকল্পে সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র সু-সংহত করার ইচ্ছা ও সক্ষমতা দুটোই সরকারের মতাদর্শের উপর নির্ভরশীল।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৫.৬

তৈরী পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।

তৈরী পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বাংলাদেশে তৈরী পোশাক খাতের ক্রমবিকাশ।

খ) রপ্তানি, কর্মসংস্থান ও জি.ডি.পিতে তৈরী পোশাক খাতের অবদান।

১. তৈরী পোশাক রপ্তানি এবং মোট রপ্তানিতে তৈরী পোশাকের অংশ।

২. জি.ডি.পিতে তৈরী পোশাক খাতের অবদান।

৩. তৈরী পোশাক খাতে কর্মসংস্থান।

গ) পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান।

ঘ) পোশাক খাতে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ।

ঙ) বাংলাদেশের পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

চ) পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও প্রসারে প্রস্তাবনা।

ক) বাংলাদেশে তৈরী পোশাক খাতের ক্রমবিকাশ :

বাংলাদেশে তৈরী পোশাক খাতের ক্রমবিকাশ :

বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে, যদিও সেটা ছিল অত্যন্ত সীমিত পরিসরে। মূলত ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশে তৈরী পোশাক শিল্পের বিকাশ শুরু হয় এবং ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়কালে এ সেক্টরের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। এ সময়কালে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ও দারিদ্র দূরীকরনে বৃহৎ পরিসরে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করে নেয় এবং ২০২০ সাল নাগাদ দেশের মোট রপ্তানি বানিজ্যের ৮০ শতাংশের বেশি এ খাতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শুরুতে ৮-৯ টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে তৈরী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হলেও, ২০১৮ সাল নাগাদ এ খাতে রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দঁড়িয়েছে প্রায় ৬,৮২১ টি, যার মধ্যে ঐ সময় নাগাদ সচল রয়েছে ৩,৮৫৬ টি প্রতিষ্ঠান এবং এখাতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা আনুমানিক ৩.৬ মিলিয়ন (সি.পি.ডি স্টাডি রিপোর্ট ২০১৮), যা দেশে ঐ সময়ে কর্মরত মোট শ্রমশক্তির ৫.৯৩ শতাংশ এবং শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমশক্তির ২৯.০৭ শতাংশ।

স্মারণী-৫.৬(১) : ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে তৈরী পোশাক খাতে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :-

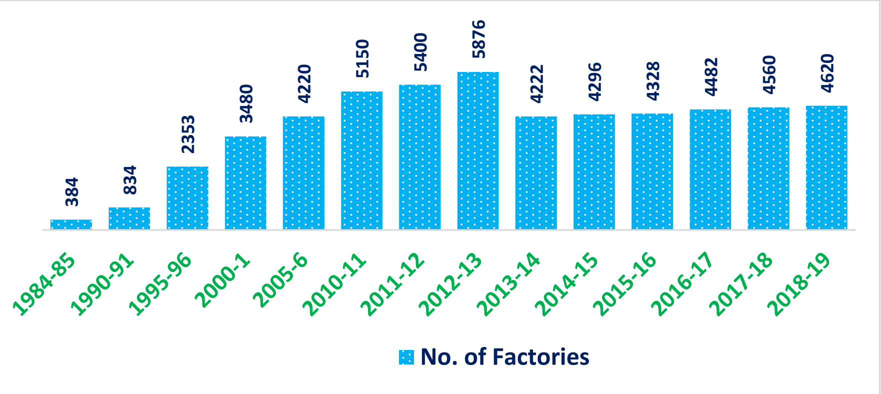

Source : BGMEA and Researchgate.net

খ) রপ্তানি, কর্মসংস্থান ও জি.ডি.পিতে তৈরী পোশাক খাতের অবদান :

১) রপ্তানি এবং মোট রপ্তানিতে তৈরী পোশাক খাতের অংশ :

১৯৮৫ সাল থেকে তৈরী পোশাক খাত দেশের রপ্তানিতে উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে শুরু করে, ১৯৯০ এর শুরু থেকে যা রপ্তানি খাতের নেতৃত্বে অবস্থান নেয় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ দেশের মোট রপ্তানিতে তৈরী পোশাক খাতের অংশ ৮৪.২১% এ দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ যাত্রার এ সময়কালে দেশের রপ্তানিতে তৈরী পোশাক খাতের অংশ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, যেমন-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দেশের রপ্তানিতে তৈরী পোশাকের অংশ ছিল গড়ে বার্ষিক ৮.১৭%, ১৯৮৫-১৯৯০ সময়কালে গড়ে ৩৩.০৭%, ১৯৯১-২০০০ সময়কালে গড়ে ৬৭.৮৮%, ২০০১-২০১০ সময়কালে গড়ে ৭৬.১৭% এবং ২০১১-২০১৮ সময়কালে গড়ে বছরে ৮১.৪৯% স্মারণী-৫.৬(২)।

স্মারণী-৫.৬(২) : ১৯৮৩ থেকে ২০১৯ সময়কালে তৈরী পোশাক খাতে রপ্তানি এবং মোট রপ্তানিতে তৈরী পোশাকখাতের অংশ :

রপ্তানি এবং মোট রপ্তানিতে তৈরী পোশাক খাতের অংশ :

Financial Year	Export in RMG Sector (USD Million)	Total Export of Bangladesh (USD Million)	% of RMG to Total Export
1983-84	31.57	811.00	3.89
1985-86	131.48	819.21	16.05
1990-91	866.82	1,717.55	50.47
1995-96	2,547.13	3,882.42	65.61
2000-01	4,859.83	6,467.30	75.14
2005-06	7,900.80	10,526.16	75.06
2010-11	17,914.46	22,924.38	78.15
2015-16	28,094.16	34,257.18	82.01
2016-17	28,149	34,655.90	81.23
2017-18	30,614.76	36,668.17	83.49
2018-19	34,133.27	40,535.04	84.21

Source : BGMEA

২)জি.ডি.পি তে তৈরী পোশাক খাতের অবদান :

জি.ডি.পি তে তৈরী পোশাক খাতের অবদান :

তৈরী পোশাক খাত প্রসারের পাশাপাশি দেশের জি.ডি.পি তে এখাতের অংশগ্রণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন- ১৯৯০-৯১ সময়কালে জি.ডি.পি তে পোশাক খাতের অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ২.৭৪%, ১৯৯২-২০০০ সময়কালে গড়ে বার্ষিক ৬.৬৩%, ২০০১-২০১০ সময়কালে গড়ে বার্ষিক ১১.৫৬% এবং ২০১১-২০১৭ সময়কালে গড়ে বার্ষিক ১৪.৪৯%।

এক্ষেত্রে উল্ল্যেখ করার মত বিষয় হলো, রপ্তানিতে তৈরী পোশাক খাতের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৫ সালের পর থেকে জি.ডি.পি তে এখাতের অংশগ্রহণ কমতে থাকে, যেমন- ২০১০-২০১৩ এ চার বছর সময়কালে জি.ডি.পি তে পোশাক খাতের অবদান ছিল গড়ে বছরে ১৫.৭%, ২০১৪-২০১৫ সময়কালে ছিল গড়ে ১৪.৫৭% এবং ২০১৬-২০১৭ সময়কালে গড়ে ১২.৪৯%। অর্থাৎ অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে জি.ডি.পি তে পোশাক খাতের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে কমেছে। স্মারণী-৫.৬(৩)

স্মারণী-৫.৬(৩): ১৯৮৪-৮৫ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশের মোট রপ্তানি ও জি.ডি.পি তে তৈরী পোশাক খাতের অংশ :-

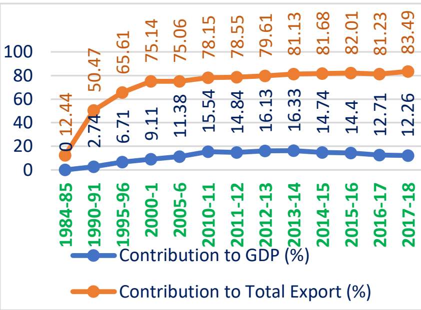

Source : BGMEA and MOF

তৈরীপোশাক খাতে কর্মসংস্থান :

৩) তৈরীপোশাক খাতে কর্মসংস্থান :

দেশে তৈরী পোশাক শিল্প প্রসারের পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে এখাতে কর্মসংস্থান। অর্থবছর ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত পোশাক খাতে কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩৪ টি এবং সে সময়ে এখাতে কর্মরত ছিল আনুমানিক ৪.০০ লক্ষ শ্রমিক। ১৯৯০ সালের পর থেকে তৈরী পোশাক খাতে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, পাশাপাশি বাড়তে থাকে এখাতে কর্মসংস্থান। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর নাগাদ এখাতে কর্মসংস্থান দাঁড়ায় ১২.৯০ লক্ষ, ২০০০-০১ অর্থবছর নাগাদ ১৮.০০ লক্ষ, ২০০৫-৬ অর্থবছর নাগাদ ২২.০০ লক্ষ, ২০১০-১১ অর্থবছর নাগাদ ৩৬.০০ লক্ষ এবং ২০১১-১২ অর্থবছর নাগাদ ৪০.০০ লক্ষ। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে পোশাকখাতে প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থান কোনোটাই বাড়েনি। অর্থবছর ২০১৮-১৯ নাগাদ তৈরী পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা আনুমানিক ৩৬,১১,০৮২ জন (সি.পি.ডি স্টাডি, ২০১৮), যা ঐ সময়ে দেশে কর্মরত মোট শ্রমশক্তির ৫.৯৩ শতাংশ এবং শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমশক্তির ২৯.০৭ শতাংশ। স্মারণী-৫.৬(৪)

স্মারণী-৫.৬(৪): ১৯৮৪ থেকে ২০১৭ সময়কালে তৈরী পোশাক খাতে কর্মসংস্থানের চিত্র :-

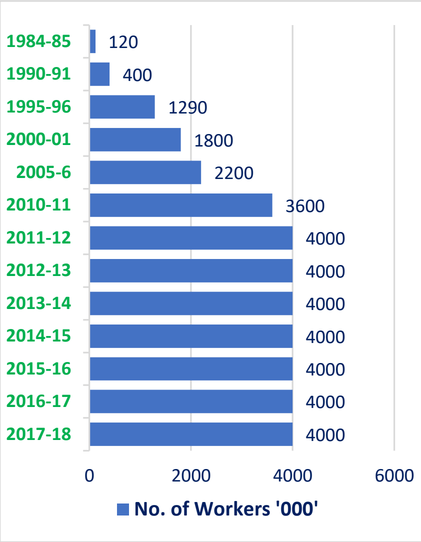

Source: BGMEA

গ) পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

বাংলাদেশে তৈরী পোশাক খাতের যাত্রা ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে শুরু হলেও মূলত ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে তৈরী পোশাক খাতে রপ্তানির পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ছিল খুবই সামান্য, ২০০০ সালের পর থেকে যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০১০-২০১৯ সময়কালে বিশ্ব পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ শক্ত অবস্থান তৈরী করতে সমর্থ হয়। ২০০০ সালে বিশ্ব পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহন ছিল ২.৬০% মাত্র, ২০১৯ সাল নাগাদ যা ৬.৮০% এ পৌঁছেছে [স্মারণী-৫.৬(৫)]। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী ২০১৯ সাল নাগাদ বিশ্বে ১০টি প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে চীনের স্থান প্রথম, বাংলাদেশ-দ্বিতীয়, ভিয়েতনাম-তৃতীয়, ভারত-চতুর্থ, টার্কি-পঞ্চম, হংকং-ষষ্ঠ, ইউ.কে-সপ্তম, ইন্দোনেশিয়া-অষ্টম এবং কম্বোডিয়া-নবম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.৬(৬)]।

স্মারণী-৫.৬(৫) : বিগত দুই দশক সময়কালে বিশ্ব পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহন বৃদ্ধির চিত্র :-

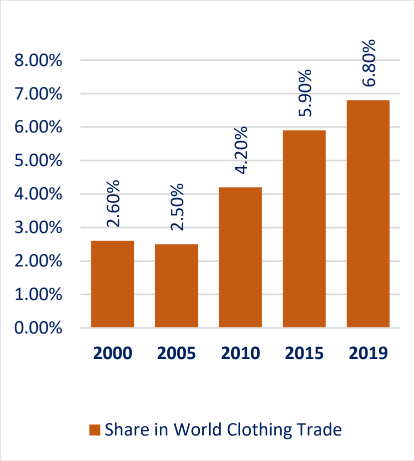

Source: WTO Report 2020

স্মারণী-৫.৬(৬) : ২০১৯ সালে বিশ্বে প্রধান দশটি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের অবস্থান এবং বিশ্ব পোশাক রপ্তানিতে ঐ সমস্ত দেশের অংশ :-

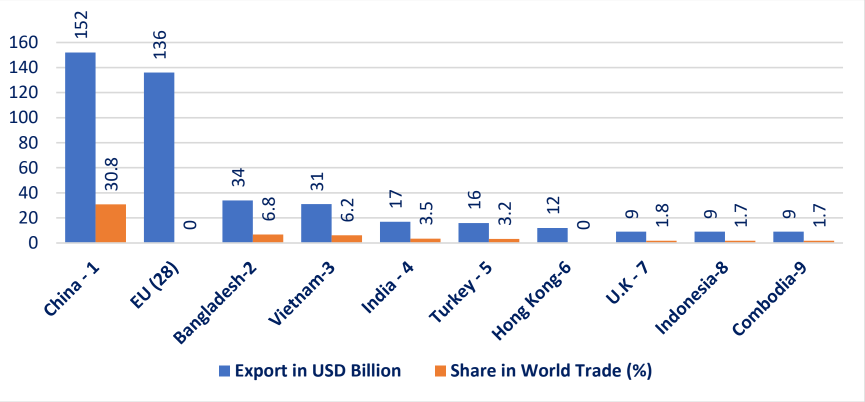

Source: WTO Report 2020

ঘ) পোশাক খাতে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

বিগত প্রায় তিন দশক ধরে তৈরী পোশাক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে আসছে। অর্থবছর ১৯৯৫-৯৬ সময়ে এখাতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ২.৫৫ বিলিয়ন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৩৪.১৩ বিলিয়ন। অর্থবছর ২০১৮-১৯ নাগাদ দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৪.২১% পোশাক খাতের দখলে রয়েছে এবং ঐ সময় নাগাদ এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমসংখ্যা আনুমানিক ৪.০০ মিলিয়ন, যার প্রায় ৮৫ শতাংশই নারী শ্রমিক। বিগত এক দশক সময় ব্যাপি জি.ডি.পিতে পোশাক খাতের অবদান গড়ে ১২ শতাংশের উপরে রয়েছে। এক কথায় গত তিন দশকে দেশের পোশাক খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সেক্টর হিসাবে পোশাক খাত দেশের অর্থনীতির রাশ টেনে ধরতে সক্ষম হচ্ছে। এ সেক্টরের অভাবনীয় অগ্রগতির পিছনে যে সমস্ত বিষয় কাজ করছে, তন্মধ্যে- সস্তা শ্রম, কৌটা ফ্যাসিলিটিজ, এখাতে ট্যাক্স ও ভ্যাট হ্রাস এবং রপ্তানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনা, দেশে ব্যক্তিখাতের উত্থান, ব্যবসায়ী মহলের দক্ষতা এবং অতীত ও বর্তমান সরকারের স্বদিচ্ছা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পোশাক খাতে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

তবে একথাও সত্য যে, শুরুতে পোশাক খাতের উত্থান ও অগ্রগতির পথ তত মসৃণ ছিলনা, শত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করেই এ সেক্টর আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। ঐ সমস্ত সমস্যার কিছু কিছু সমাধান করা গেলেও বেশিরভাগ সমস্যা আজোও অমিমাংশিতই রয়ে গেছে, যা এ সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পোশাকখাতে বিরাজমান ঐ সমস্ত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দূর করতে এখনি যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া গেলে আগামীতে এ সেক্টরের পথ চলা যেমন কঠিন হবে, তেমনি প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। কেননা, অতীতের প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। অতীতে এ সেক্টরের বহু সীমাবদ্ধতা যেমন-উৎপাদনে আধুনক প্রযুক্তি ও উন্নত মেশিনারীজ ব্যবহারের পরিবর্তে সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা, কারখানার অনুন্নত পরিবেশ ও নন কম্পলায়েন্সড ফ্যাক্টরী নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হলেও, ভবিষ্যতে তা আর সম্ভব নয়। কারন, পোশাক খাতে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী আরোও অনেক দেশ এগিয়ে আসছে, যারমধ্যে ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, হংকং এবং কম্বোডিয়া অন্যতম। কাজেই আগামীতে পোশাক খাতের পথচলা সহজ ও মসৃণ করে তুলতে এবং বিশ্ব পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে পোশাকখাতে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহের যথাযথ সমাধানপূর্বক এখাতকে যুগোপযোগি করে তুলতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ২০২০ সালের প্রেক্ষাপটে দেশের পোশাকখাতে বিরাজমান উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে তুলেধরা হলো :-

১. অশিক্ষিত ও অদক্ষ শ্রমিক :

বিভিন্ন সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী ২০১৮ সাল নাগাদ দেশের পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমসংখ্যা প্রায় ৪.০০ মিলিয়নের অধিক, যাদের প্রায় ৮৫ শতাংশই গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা অশিক্ষিত ও অদক্ষ নারী শ্রমিক। শ্রমিকদের অদক্ষতার কারনে পোশাক শিল্পে উৎপানশীলতা কাংঙ্কিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা, ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও শিপমেন্ট বিলম্বিত হওয়ার মাধ্যমে এ ব্যবসাকে ঝুকির মাঝে রেখেছে। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। কাজেই, আগামীতে এ শিল্পের পথচলা নির্বিঘ্ন করে তুলতে উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরি।

২. ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে অদক্ষতা :

দক্ষ ব্যবস্থাপনাই উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভজনক ব্যবসার মূল ভিত্তি, দেশের পোশাক সেক্টরে যার অুপস্থিতি দৃশ্যমান। উৎপাদন, বিপনন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য মানসন্মত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দেশে চালু না থাকার ফলে উন্নত ব্যবস্থাপনার দিকথেকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে গতিশীলতা আনয়নপূর্বক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও লাভজনক পরিচালন নিশ্চিত করতে সকল সেক্টরের জন্য দেশে মানসন্মত ও যুগোপযোগি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা অপরিহার্য।

৩. কারখানার অনুন্নত মান ও পরিবেশ :

দেশের বেশিরভাগ পোশাক কারখানা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জ্বরাজ্বীর্ণ ভবনে অবস্থিত, যেখানে যোগাযোগ, অগ্নিনির্বাপণ ও অন্যান্য সুবিধা অনেকাংশে অনুপস্থিত। কারখানার ভিতরকার পরিবেশ এবং শ্রমিকদের খাওয়া ও বিশ্রামের জায়গা ইত্যাদি অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর। ফলে ই.ইউ এবং আমেরিকান ক্রেতাদের একটি বড় অংশই এ সমস্ত বিষয়ে বহু আগে থেকেই ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে আসছে এবং সমাধানের জন্য সময়ও বেধে দিয়েছে। যদিও বেশিরভাগ কারখানা ইতিমধ্যে এ সমস্ত সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সমর্থ হয়েছে, তথাপি অনেক কারখানা

SJFBD

আজোও পূর্বের অবস্থায় রয়ে গেছে। আগামীতে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রেতা আকৃষ্ট করতে এ সমস্ত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা জরুরি ভিত্তিতে সমাধানে সচেষ্ট হওয়া জরুরি।

৪. নন কমপ্লায়েন্সড ফ্যাক্টরী :

ফ্যাক্টরির কাঠামো, অবস্থান, অগ্নিনির্বপন ব্যবস্থা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের আওতায় শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা কমপ্লায়েন্সড ফ্যাক্টরির বৈশিষ্ট্য, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বাংলাদেশের সিংহভাগ পোশাক কারখানারই কমপ্লায়েন্সড করা নেই। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্রেতাই কমপ্লায়েন্সড ফ্যাক্টরিতে ক্রয়াদেশ দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আগামীতে যা সকল পর্যায়ের ক্রেতাদের একচ্ছত্র চাওয়া হতে পারে। নন কমপ্রায়েন্সড ফ্যাক্টরি সমুহকে দ্রুত কমপ্লায়েন্সের আওতায় নিয়ে আসতে সরকারিভাবে আর্থিক সহযোগিতা ব্যাতিত অনেক উদ্যোক্তার পক্ষে পুরোপুরি নিজস্ব বিনিয়োগে এ কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব।

৫. অপর্যাপ্ত অবকাঠামো :

দেশে শিল্প ও বানিজ্যের উন্নয়নে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন অন্যতম পূর্বশর্ত, যারমধ্যে রয়েছে- সড়ক, নৌ ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিকমিউনিকেশনস্, বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দর এবং বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস ইত্যাদি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিন এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। Global Competitiveness Index 2019 অনুযায়ী সামগ্রিক অবকাঠামোর দিকথেকে বিশ্বে ১৪১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৫ তম। এ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে সিঙ্গাপুর ১ম স্থানে, জাপান ৬ষ্ঠ, দ. কোরিয়া ১৩, মালয়েশিয়া ২৭, চীন ২৮, থাইল্যান্ড ৪০, ইন্দোনেশিয়া ৫০, ফিলিপাইন ৬৪, ভিয়েতনাম ৬৭, ভারত ৬৮, শ্রীলংকা ৮৪ এবং পাকিস্তান ১১০ তম অবস্থানে রয়েছে। কাজেই আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে শিল্প ও বানিজ্যের দ্রুত প্রসারকল্পে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা খুবই জরুরি।

SJIBD

৬. সীমিত রপ্তানি বাজার :

বিগত প্রায় তিন যুগের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশই আমেরিকা এবং ই.ইউ ভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ, যেমন- জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স ও ইউ.কে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য দেশের পোশাকও সমানতালে রপ্তানি হচ্ছে। অথচ দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশে তৈরী পোশাকের চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্য রপ্তানির নতুন ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। আগামীতে এ সেক্টরে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে ঐ সমস্ত দেশের বাজার ধরার জন্য বাংলাদেশকে আরোও উদ্যোগী হওয়া অত্যন্ত অপরিহার্য।

৭. পণ্যে বৈচিত্রতা না আনা :

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রায় ৭০ শতাংশই স্বল্প মূল্যের নির্দিষ্ট কয়েকটি আইটেম (টি-সার্ট, সুয়েটার, জিনস্ এবং অন্য দু-একটি আইটেম) এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। উচ্চমূল্যের পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে এবং পণ্যে বৈচিত্রতা আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্প মূল্যের আইটেমের কারনে এ সমস্ত পণ্যে প্রফিট মার্জিন খুবই সীমিত এবং দেশের পোশাকখাত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাঝেই টিকে রয়েছে বলা চলে। কোনো কারনে দু-একটি শিপমেন্ট বাতিল

হলে বেশিরভাগ উদ্যোক্তার পক্ষে তখন এ ধকল কাটিয়ে উঠা কঠিন হয়ে উঠে। কাজেই স্বল্প মূল্যের গতানুগতিক পোশাক রপ্তানির পাশাপাশি উচ্চমূল্যের লাক্সারি আইটেম রপ্তানি বৃদ্ধি করতে না পারলে এবং আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক পণ্যে বৈচিত্রতা আনতে না পারলে আগামীতে প্রতিদ্বন্ধী অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠা কঠিন হবে এ বাস্তবতা মাথায় রেখে আগানো উচিৎ, যারজন্য প্রয়োজন :-

- ফ্যাশন ডিজাইন ও উন্নয়নে দেশে পর্যাপ্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের ফ্যাশন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- বি.জি.এম.ই এর উদ্যোগে নিয়মিত আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারযোগ্য ফ্যাশন-শো আয়োজন।
- আন্তর্জাতিক ফ্যাশন-শো গুলোতে বাংলাদেশের নিয়মিত অংশগ্রহন ; এবং
- একাডেমিক শিক্ষায় "ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট" বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা।

৮. আমদানি নির্ভর কাঁচামাল :

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প অদ্যাবধি আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করেই টিকে রয়েছে, যা এখাতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি লীড টাইম বৃদ্ধির মাধ্যমে এ শিল্পকে অনেক বেশি ঝুকিতে রেখেছে। পুরোপুরি আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে কোনো শিল্পই খুব বেশিদুর আগানো সম্ভব নয়। লীড টাইম বৃদ্ধির কারনে নির্দিষ্ট সময়ে শিপমেন্টে ব্যার্থ হয়ে অহরহ এয়ার শিপমেন্ট এবং অনেকক্ষেত্রে ক্রয়াদেশ বাতিলের ঘটনাও ঘটছে, যা উদ্যোগক্তাদেরকে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মাঝে ফেলে প্রতিষ্ঠানের ভীত নড়বড়ে করে তোলে এবং টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই, পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন এবং এশিল্পকে স্বনির্ভর করে তুলতে এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কাপড় ও অন্যান্য এক্সেসরীজ পুরোপুরি দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রির দ্রুত প্রসার অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় আগামীতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই।

৯. উদ্যোক্তাদের মাঝে মূলধন ঘাটতি :

স্বল্প আয়ের দেশ হওয়ার কারণে ব্যাক্তিপর্যায়ে মূলধন ঘাটতি বাংলাদেশে অতি সাধারণ বিষয়। বড় ফ্যাক্টরী গুলোর জন্য ব্যাংকের অর্থায়ন উন্মুক্ত থাকলেও, কোলেটারিয়েলের অভাবে ছোট ফ্যাক্টরিগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাংকের অর্থায়ন খুবই সীমিত। ফলে ছোট আকারের ফ্যাক্টরিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামান্য সি.এম (Sewing and Making) চার্জের বিনিময়ে সারাবছর সাব-কন্ট্রাক কাজ করে ফ্যাক্টরী চালাতে হয়, সরাসরি রপ্তানি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না, দেশে পোশাক শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

১০. বিনিয়োগ স্থবিরতা :

২০১২-১৩ অর্থবছরের পর থেকে দেশের পোশাকখাতে নতুন বিনিয়োগ অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে। বি.জি.এম.ই এর তথ্যমতে ২০১৮ সাল নাগাদ এখাতে রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৬,৮২১টি, যারমধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ চালু রয়েছে ৪,৬২০টি প্রতিষ্ঠান [স্মারণী-৫.৫(১)]। অন্যদিকে পোশাকখাতে ই.পি.জেড এর বাহিরে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় বিনিয়োগকারিদের আপত্তি রয়েছে। সবমিলিয়ে ২০১২ সালের পর থেকে দেশের পোশাকখাতে বিনিয়োগ স্থবিরতা বিরাজ করছে, এ খাতের প্রসারের ক্ষেত্রে যা নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে। দেশে পোশাক শিল্পের দ্রুত বিস্তার ও টেকসই উন্নয়নে পোশাক ও টেক্সটাইল

উভয়খাতে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্রণোদনা ঘোষণাপূর্বক এখাতে পর্যাপ্ত দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১. অপর্যাপ্ত সরকারি প্রণোদনা :

কোনো শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তুলতে হলে ঐ শিল্পখাতে পর্যাপ্ত সরকারি প্রণোদনা নিশ্চিত করাপূর্বক ঐ শিল্পে বিনিয়োগ ঝুকিমুক্ত করার মাধ্যমে বিনিয়োগকারিদের আকৃষ্ট করার প্রবণতা বিশ্বব্যাপি চালু রয়েছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রেও ট্যাক্স ও ভ্যাট সুবিধার পাশাপাশি নগদ প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অর্থবছর ২০১৮-১৯ নাগাদ নন ট্রাডিশনাল আইটেম রপ্তানির বিপরীতে ৪% নগদ প্রণেদনার পাশাপাশি সকল গন্তব্যে রপ্তানির বিপরীতে ১% নগদ প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু থাকার পাশাপাশি ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে সকল ধরনের পোশাক রপ্তানির বিপরীতে বাড়তি আরোও ১% নগদ প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামীতে পোশাক খাতের প্রতিযোগীতা সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে রপ্তানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনার পরিমাণ আরোও বৃদ্ধির পাশাপাশি চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার আলোকে শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য প্রণোদনার সুযোগ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে এখাতের পথচলা নির্বিঘ্ন হয়।

১২. শ্রমিকদের বেতন কাঠামো :

বাংলাদেশের পোশাকখাত মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্বল্পমূল্যের আইটেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে প্রফিট মার্জিন অত্যন্ত সীমিত। তাই শতচেষ্টা করেও এখাতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন কাঠামো চাহিদানুযায়ী বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। ফলে এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, খাওয়া দাওয়া, স্বাস্থ্য ও বিনোদন অত্যন্ত নিন্মমানের, যা তাদের কর্মক্ষমতার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে এবং এ সেক্টরের সামগ্রীক উৎপাদনশীলতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।

১৩. রাজনৈতিক অস্থিরতা :

যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু ২০১০ সালের আগ পর্যন্ত দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, অবরোধ ও হানাহানি ছিল নৈমত্তিক ব্যাপার, যার প্রভাবে দেশের শিল্পসেক্টরে উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে একটি রাজনৈতিক অস্থিতিশীল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার কারনে সে সময়ে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে এবং ঐ সময়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছিল।

১৪) উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অপর্যাপ্ততা :

শিল্প সেক্টরে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে মানসন্মত পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং এ সেক্টরকে যুগোপযোগী করে তোলে, দেশে শিল্পের প্রসার ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা অপরিহার্য। বাংলাদেশের পোশাকখাতে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান ব্যাতিত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার আজো তেমন বিস্তার ঘটেনি, স্বনামধন্য ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় যা প্রথম স্থানে রয়েছে। আগামীর পথচলা নির্বিঘ্ন করে তুলতে এবং প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পোশাক শিল্পে উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চমান ক্ষমতা সম্পন্ন মেশিনারীজের ব্যবহার শতভাগ বৃদ্ধি করা ব্যাতিত গত্যান্তর নেই।

SJFBD

১৫) শ্রমিক আন্দোলন :

কারণে অকারণে শ্রমিক আন্দোলন, মালিক শ্রমিক অসন্তোষ, নির্দিষ্ট সময়ে বেতন ভাতা পরিশোধ না করা এবং অনেক সময় অনেক তুচ্ছ কারনে প্রতিষ্ঠান লে-অফ ঘোষণা করা ইত্যাদি এদেশের শিল্প সেক্টরে সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসাবে বিবেচিত। এ সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা বিশ্বব্যাপি মিড়িয়া গুলোতে ফলাও করে প্রচারিত হয়, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পাশাপাশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শঙ্কিত ও বিরক্ত করে তোলে, যার বিরুপ প্রভাবে একসময় ক্রেতারা এদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দেশ থেকে পোশাক কিনতে বাধ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু তৈরী পোশাকখাত একটি শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প, এ সেক্টরের সাথে বিভিন্ন দেশের ক্রেতাদের বড় আকারের স্বার্থ জড়িত, সেহেতু নিঃসন্দেহে এটি একটি স্পর্শকাতর সেক্টর এবং এ সেক্টরের আওতাভুক্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ছোট খাট ঘটনাও মূহূর্ত্বে সারা দুনিয়ায় প্রচার হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই পোশাকখাতে কোনো অবস্থাতেই যাতে শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাধতে না পারে এবং মালিক শ্রমিক সম্পর্ক সবসময় বজায় থাকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের পুরোপুরি সজাগ থাকা উচিৎ।

১৬) লীড টাইমে শিপমেন্ট করতে না পারা :

সাধারণত বিভিন্ন দেশের ক্রেতারা ঐ সমস্ত দেশে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে আবহাওয়া উপযোগী পোশাকের ক্রয়াদেশ দিয়ে থাকেন, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সরবরাহ করা অপরিহার্য। ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পর ক্রেতার নিকট ঐ পোশাক অনেকটা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এ কারণে মাষ্টার এল.সিতে উল্ল্যেখিত তারিখের মধ্যেই (লীড টাইমে) শিপমেন্ট করা এত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিবিধ কারণে বাংলাদেশে লীড টাইমের মধ্যে শিপমেন্ট করা অনেকক্ষেত্রে খুবই চ্যালেঞ্জের, যারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে :-

- অন্য দেশথেকে কাপড় আমদানি।
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব হওয়া।
- লোড শেডিং, শ্রমিক অন্দোলন ও অন্যান্য কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া।
- বায়িং হাউজ সমূহের মধ্যস্থতায় এক্সেসরিজ পেতে বিলম্ব হওয়া।
- ব্যাংকের অসহযোগিতা ও অন্যান্য কারনে ব্যাক-টু-ব্যাক খুলতে বিলম্ব হওয়া।

SJIFBD

ঙ) বাংলাদেশের পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহু প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসা দেশের পোশাকখাত অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি পরিপক্ক ও সম্ভাবনাময়। এদশের শস্তা শ্রম, অনুকুল প্রাকৃতিক পরিবেশ, এদেশের মানুষের কর্মতৎপরতা ও আত্মবিশ্বাস এবং সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য পোশাক খাতকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ বিশ্ব পোশাক রপ্তানিতে চীনের দখলে রয়েছে ৩০.৪%, বাংলাদেশের দখলে ৬.৮%, ভিয়েতনামের দখলে ৬.২% এবং অবশিষ্ট ৫৬.৬% রয়েছে এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও ই.ইউর দখলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও আমেরিকার মধ্যেকার অর্ন্তদ্বন্ধের কারণে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে চীনের পোশাক রপ্তানি উল্ল্যেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আভ্যন্তরীণ মজুরি বৃদ্ধির কারনে চীন ক্রমান্বয়ে পোশাক শিল্প থেকে ডাইভার্ট হয়ে উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের দিকে ঝুকছে। অন্যদিকে মিয়ানমারের আভ্যন্তরীন কলহের কারণে বিদেশি ক্রেতারা নতুন বাজার খুঁজছে। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চীন ও মিয়ানমারের দখলে থাকা

বাংলাদেশের পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

পোশাকের বিশ্ব বাজার ক্রমান্বয়ে অন্যান্য দেশের আয়ত্বে চলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানির বিশাল এ শূন্যতা পূরনের সুযোগ বাংলাদেশ ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে এবং এ খাতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলার মাধ্যমে দেশের পোশাক শিল্পকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঠিকমত উপস্থাপন করতে পারলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের পোশাক রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ৭৫-৮০ বিলিয়ন (বিশ্ব চাহিদার ১৫%-১৬%) ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়, প্রয়োজন শুধু এখাতের প্রসার ও উন্নয়নে সরকারের বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ এবং সহযোগিতা। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কারণে বাংলাদেশের পোশাকখাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময, তন্মধ্যে রয়েছে :-

১. দীর্ঘ পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় পোশাক শিল্প বাংলাদেশে এখন আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ ও অভিজ্ঞ, ভবিষ্যতে এখাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।
২. ইতিমধ্যেই বিশ্ব পোশাক রপ্তানির বাজারে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান তৈরী হয়েছে, ভবিষ্যতে যা আরোও পরিপক্ক ও প্রসারিত হবে।
৩. শস্তা শ্রম ও অনুকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারনে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের সাথে টিকে থাকা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।
৪. পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে তোলার মাধ্যমে চীনের দখলে থাকা বিশ্ব পোশাক বাজারের বিশাল অংশ দখলের অপূর্ব সুযোগ বাংলাদেশের রয়েছে।
৫. যেহেতু খুব দ্রুতই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে, সেহেতু আগামীতে এ সেক্টরে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে, এ খাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নের জন্য যা অপরিহার্য।
৬. দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো, যেমন- সড়ক ও রেল যোগাযোগ, বন্দর অবকাঠামো ও সক্ষমতা, টেলিকমিউনিকেশনস্, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস ইত্যাদি খাতের উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে, যা আগামীতে দেশে শিল্প ও বানিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
৭. চীন ইতিমধ্যেই প্রায় ৫ (পাঁচ) হাজার বাংলাদেশি পণ্যের শুকমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে, যারমধ্যে তৈরী পোশাকও রয়েছে। চীনের মত বিশাল দেশের বাজারে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের সুযোগ নিঃসন্দেহে এখাতের ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনার হাতছানি।

চ) পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও প্রসারে প্রস্তাবনা :

বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাকখাত আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত একটি সম্ভাবনাময় খাত। বিশ্বের বহু দেশ ও ক্রেতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এখন বাংলাদেশের পোশাক খাতের সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৭০ এর মাঝামাঝিতে স্বল্প সংখ্যক কারখানা নিয়ে এ সেক্টরের যাত্রা শুরু হলেও ২০১৮ সাল নাগাদ এ খাতে রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬,৮২১ টি, যার মধ্যে ঐ সময় নাগাদ সচল

পোশাক খাতের আধুনিকায়ন ও প্রসারে প্রস্তাবনা।

রয়েছে ৩,৮৫৬ টি প্রতিষ্ঠান এবং এটি বর্তমানে দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমূখী খাত। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এখাতে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৩৪,১৩৩ মিলিয়ন, যা ঐ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির ৮৪.২১%। ২০১৯-২০ অর্থবছর নাগাদ বিশ্ব পোশাক রপ্তানির ৬.৮% বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ঐ সময়ে সারাবিশ্বে ১০টি প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। দেশে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এখাত ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ২০১৯ সাল নাগাদ এখাতে কর্মরত শ্রমসংখ্যা ৪.০০ মিলিয়নের অধিক, যা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় আকারের ভূমিকা রেখে আসছে।

তবে একথাও সত্য যে দেশের পোশাকখাত অদ্যাবধি বহু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত। ফলে একদিকে যেমন এখাতের কাঙ্কিত প্রসার ঘটছেনা, তেমনি পোশাকখাতে বিরাজমান এ সমস্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহের দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করা না গেলে আগামীতে এখাতের পথচলা হবে রীতিমত কঠিন। কেননা, বিশ্ব পরিক্রমায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট দ্রুতই পাল্টাচ্ছে এবং পোশাকখাতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পাশাপাশি এ সেক্টরে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্ধী আরোও অনেক দেশ দ্রতই এগিয়ে আসছে। দেশের পোশাকখাতে বিরাজমান সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধানপূর্বক এখাতের প্রসার ও মান উন্নয়নে সচেষ্ট না হলে , আগামীতে প্রতিদ্বন্ধী দেশ সমূহ বাংলাদেশের স্থান দখল করে নেওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কাজেই আগামীর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের পোশাক খাতের প্রসার এবং এ খাতকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিনোমাক্ত সুপারিশ সমূহ পেশ করা হলো :-

১) **পোশাকখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ :** ২০১২ সাল নাগাদ দেশে পোশাক শিল্পের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা গেলেও ২০১২ পরবর্তী সময়ে এ সেক্টরে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং হ্রাস পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর নাগাদ এ সেক্টরে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৫,৮৭৬টি, অর্থবছর ২০১৮-১৯ নাগাদ যা ৪,৬২০টিতে দাঁড়িয়েছে **{ স্মারণী-৫.৬(১) }**, অর্থাৎ এ সময়কালে পোশাকখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়নি মোটেও। দেশে পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে আগামীতে এখাতে পর্যাপ্ত দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা অপরিহার্য।

২) **উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা :** উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন বিশ্বব্যাপি সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আজোও খুব সীমিত পর্যায়ে রয়েছে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মানসন্মত পণ্য উপাদন এবং এখাতের আধুনিকায়নে যা বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এখাতের উন্নয়ন ও প্রসারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরা জরুরি।

৩) **শ্রমিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার :** দক্ষ শ্রমিকই মানসন্মত উৎপাদন বৃদ্ধির হাতিয়ার। বাংলাদেশের পোশাকখাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৮৫ শতাংশই নারী, যাদের সিংহ ভাগই প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ থেকে উঠে আসা অশিক্ষিত ও অদক্ষ, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যাতিত যাদের কাছথেকে উৎপাদনশীলতা আসাকরা অযৌক্তিক। ভবিষ্যতে দেশে পোশাক শিল্পের মানসন্মত প্রসার ও টেকসই উন্নয়নে এ সেক্টরে উৎপাদনশীলতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা অপরিহার্য, যারজন্য প্রয়োজন এ সেক্টরের উপযোগী দক্ষ শ্রমিক বাহিনী গড়ে তুলতে দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শ্রমিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার ।

৪) **প্রশাসনিক দক্ষতার মানোন্নয়ন :** শিল্পসেক্টরে উৎপাদন, বিপনন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ প্রশাসনই লাভজনক পরিচালনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মানসন্মত পরিচালনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লাভজনক টিকেথাকা নিশ্চিত করতে তাই প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। পোশাকখাতে প্রশাসনিক দক্ষতার মানোন্নয়নে দেশে উন্নত **" প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ"** ব্যবস্থার প্রসার অপরিহার্য।

SJFD

৫) **পোশাকখাতে ট্যাক্স ও ভ্যাট সুবিধার পাশাপাশি নগদ ও অন্যান্য প্রণোদনা বৃদ্ধি করা :** দেশে পোশাক খাতের প্রসার ও উন্নয়নে ট্যাক্স ও ভ্যাট সুবিধার পাশাপাশি রপ্তানি মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে নগদ প্রণোদনার ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যদিও এখাতের দ্রুত প্রসার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনের তুলনায় চলমান নগদ প্রণোদনার হার যথেষ্ঠ অপ্রতুল। আগামীতে পোশাক খাতের প্রতিযোগীতা সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে রপ্তানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনার পরিমাণ আরোও বৃদ্ধির পাশাপাশি চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার আলোকে শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য প্রণোদনার সুযোগ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে এখাতের পথচলা নির্বিঘ্ন হয়।

৬) **পোশাক খাতের উন্নয়নে গবেষণার মাত্রা বৃদ্ধি করা :** দেশে পোশাকখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে, বিশেষ করে এখাতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, এখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং পণ্যে বৈচিত্রতা আনয়নের মাধ্যমে দেশের পোশাক শিল্পকে বিশ্বব্যাপি ব্রান্ডিং করে তুলতে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন।

৭) **দেশের সামগ্রিক অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়ন :** শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য। অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের পিছনে অবস্থান করছে। Global Competitiveness Index 2019 অনুযায়ী সামগ্রিক অবকাঠামোর দিকথেকে বিশ্বে ১৪১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৫ তম, যেখানে সিঙ্গাপুর ১ম স্থানে, জাপান ৬ষ্ঠ, দ. কোরিয়া ১৩, মালয়েশিয়া ২৭, চীন ২৮, থাইল্যান্ড ৪০, ইন্দোনেশিয়া ৫০, ফিলিপাইন ৬৪, ভিয়েতনাম ৬৭, ভারত ৬৮ এবং শ্রীলংকা ৮৪তম অবস্থানে রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ডজনখানেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, তথাপি টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বিনিয়োগ আরোও অনেকগুণ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

৮) **পোশাকখাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং কোলেটারিয়েল ব্যাতিত ব্যাক-টু-ব্যাক ফ্যাসিলিটিজ প্রদান করা :** দেশে চলমান ঋণ ব্যবস্থায় শিল্প সেক্টরে প্রদত্ত ঋণের ৭০%-৮০% প্রদত্ত হয় চলতি মূলধনের বিপরীতে এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ হিসাবে প্রদত্ত হয় মাত্র ২০%-৩০%, শিল্প সেক্টরের প্রসারের ক্ষেত্রে যা নিসন্দেহে অপ্রতুল। স্বল্প আয়ের এদেশে ব্যাংকের অর্থায়ন ব্যাতিত ব্যাক্তি পর্যায়ে বড় অংকের মূলধনের যোগান দেওয়া খুবই কঠিন, যা দেশে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া, কোলেটারিয়েল ব্যাতিত ব্যাক-টু-ব্যাক ফ্যাসিলিটিজ না পাওয়ার ফলে বহু ফ্যাক্টরিকে বছরের পর বছর অন্যের সাবকন্ট্রাক করেই চলতে হয়, এখাতের প্রসারে যা আরেকটি বড় সমস্যা। কাজেই পোশাকখাতের দ্রুত প্রসার এবং চলমান কারখানা সমূহে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে এখাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি কোলেটারিয়েল ব্যাতিত ব্যাক-টু-ব্যাক এল.সি সুবিধা থাকা বাঞ্চনীয়।

৯) **রপ্তানি বাজারের পরিসর বৃদ্ধি এবং পণ্যে বৈচিত্রতা আনয়ন :** বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশই রপ্তানি হয় আমেরিকা ও ইউরোপের নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশে, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ঐ সমস্ত দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ খুবই সীমিত। এর অন্যতম কারণ বিশ্ববাজারে চাহিদা রয়েছে এমন আইটেমসমূহের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি মাত্র বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়, যা পৃথিবীর সবদেশে সমানভাবে চলেনা। কাজেই, আগামীতে এখাতের প্রসার ও উন্নয়নে বিশ্ব চাহিদার সাথে মিল রেখে পোশাক পণ্যে বৈচিত্রতা আনয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য চুক্তি ও শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে পোশাক রপ্তানির বাজার পরিসর বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া জরুরি।

১০) **পোশাক শিল্পের কাঁচামাল দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ :** যেকোনো শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত করা ঐ শিল্পের প্রসার ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রধান পূর্বশর্ত। পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কাপড়, অদ্যাবধি যা চীন, ভারত ও অন্যান্য দু-একটি

SJFBD

দেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প টিকে রয়েছে। পুরোপুরি আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে কোনো শিল্পই বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, এতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঐ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ পরোক্ষভাবে কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/দেশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, যা ঐ শিল্পের বিকাশ ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে চরম অনিরাপদ। কাজেই, আগামীতে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলাপূর্বক এ শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও লাভজনক টিকেথাকা নিশ্চিত করতে এদেশে টেক্সটাইল শিল্পের দ্রুত ও পর্যাপ্ত বিকাশে পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত কাপড় পুরাপুরি দেশে উৎপাদিত হয়।

১১) **ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করা :** দেশে শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ব্যবসা সহজীকরনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষেত্র সমূহের মানসন্মত উন্নয়ন এবং লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় শক্তিশালি হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতা ২০১৯ গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে (LPI Ranking 2019) ১৬০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম। ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে শ্রীলংকা ৯৪তম, মালদ্বীপ ৮৬তম, ইন্দোনেশিয়া ৪৬তম, ভারত ৪৪তম, মালয়েশিয়া ৪১তম, থাইল্যান্ড ৩২তম, চীন ২৬তম এবং দ. কোরিয়া ২৫তম অবস্থানে রয়েছে। কাজেই, আগামীতে পোশাকখাতে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এখাতের দ্রুত প্রসার নিশ্চিত করতে দেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন ও লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় শক্তিশালী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২) **কারখানার মান ও পরিবেশ উন্নয়ন :** দেশের বেশিরভাগ পোশাক কারখানা এখনো শহরের অলিগলিতে জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত, যেখানে যোগাযোগ ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মারাত্মক সংকট রয়েছে। তাছাড়া, অনেক কারখানার ভিতরকার পরিবেশ, অফিস এবং শ্রমিকদের খাওয়া ও বিশ্রামের স্থান মানসন্মত নয়। ফলে সঙ্গত কারনে ভালমানের ক্রেতারা ঐসমস্ত কারখানায় ক্রয়াদেশ দিতে অনীহা বোধ করেন, যা ঐ শ্রেণীর কারখানা টিকে থাকারক্ষেত্রে চরম প্রতিকুলতা হিসাবে কাজ করছে। কাজেই, পোশাক শিল্পের মানোন্নয়নে মানসন্মত পরিবেশে কারখানা স্থাপন এবং কারখানার ভিতরকার পরিবেশ উন্নয়নে বাধ্যবাধকতা থাকা প্রয়োজন।

SJFBD

১৩) **শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ :** অপ্রিয় সত্য হলো, দেশের পোশাকখাত টিকিয়ে রাখার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান এ সেক্টরে কর্মরত ৪.০০ মিলিন শ্রমিকের। মজুরি কম হওয়ায় এ সমস্ত শ্রমিকদের সিংহভাগই শহরের বস্তি ও নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে বসবাস করেন, যা তাদের স্বাস্থ্যঝুকি বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জীবনমানের উপর বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং এ সেক্টরে উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করছে। তাছাড়া, পোশাক শ্রমিকদের শতভাগই নিঃস্ব ও সহায়সম্বলহীন, সঞ্চয় বলতে এদের কিছুই থাকেনা বললেই চলে। ফলে কর্মজীবন শেষে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তাদেরকে আবার গ্রামেই ফিরে যেতে হয়, যেখানে অভাব অনটনে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাতে হয়, যা সত্যিই অমানবিক। অথচ পোশাকখাতের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন অপরিহার্য বিষয়। কাজেই পোশাকখাতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগে নিম্নোক্ত সুবিধাবলি নিশ্চিত করা জরুরি :-

- কারখানা জোনের নিকটবর্তী স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক হোষ্টেল তৈরী করা।
- পোশাকখাতে কর্মরত শ্রমিকদের পরিবারের জন্য রেশনিং সিষ্টেম চালুকরা।
- শ্রমিকদের মাতৃত্বকালিন ছুটি ও ভাতা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা।
- শ্রমিকদের জন্য মালিকপক্ষের উদ্যোগে জীবনবীমা পলিসি বাধ্যতামূলক করা।
- মাসিক বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিপরীতে **"অবসরকালীন পেনশন স্কীম"** চালুকরা।

১৪) ব্যাকওয়ার্ড শিল্পের প্রসার ও মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ : বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প বিস্তারের সুবাদে এখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট এক্সেসরীজ, ডায়িং, ওয়াস, প্যাকেজিং এন্ড প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি ব্যাকওয়ার্ড শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং পোশাক রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামীতে পোশাকখাতের প্রসার ও উন্নয়নের সাথে মিল রেখে ব্যাকওয়ার্ড শিল্পের পর্যাপ্ত প্রসার ও মানোন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৫) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা : পোশাক শিল্প যেহেতু শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প, সেহেতু এ শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই, পোশাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এ শিল্পকে সবসময় রাজনৈতিক প্রভাব ও কর্মসূচীর আওতামুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৬) দুর্ণীতি প্রতিরোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : দেশের সরকারি সেক্টরে ঘুষ ও দুর্ণীতি একটি পুরাতন ব্যাধি, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে যা মারাত্মকভাবে মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে এবং যা দেশে শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। Global Corruption Perception Index (CPI) , 2019 অনুযায়ী দুর্ণীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় সব দেশের উর্ধ্বে। ঐ র‍্যাংকিং অনুযায়ী ১৮০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম, যেখানে সিঙ্গাপর ৪র্থ, হংকং ১৬, জাপান ২০, ভূটান ২৫, দ. কোরিয়া ৩৯, মালয়েশিয়া ৫১, চায়না ৮০, ভারত ৮০, ইন্দোনেশিয়া ৮৫, ভিয়েতন্মা ৯৬, থাইল্যান্ড ১০১, নেপাল ১১৩, ফিলিপাইন ১১৩, পাকিস্তান ১২০, মালদ্বীপ ১৩০ এবং মিয়ানমার ১৩০ তম স্থানে রয়েছে। সর্বস্তরে আইনের শাসন বলবৎ না থাকার কারনে দুর্ণীতি এমন প্রকট আকার ধারণ করেছে, যার কারনে দেশে ব্যবসায়িক ও সামাজিক পরিবেশ অনিরাপদ ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে এবং দেশে শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যর স্বাভাবিক গতিধারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আগামীতে দেশে পোশাকখাতের নিরবচ্ছিন্ন পথচলা নিশ্চিত করতে সর্বস্তরে আইনের শাসন বলবৎ করার পাশাপাশি কঠোর হস্তে দুর্ণীতি দমন এবং দুর্ণীতির প্রতি জিরো ট্রলারেন্স নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

SJPBD

****

অধ্যায় : ৫.৭

আই.সি.টি খাতের উন্নয়ন ও প্রসার।

আই.সি.টি খাতের উন্নয়ন ও প্রসার।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বিশ্বব্যাপি ICT সেক্টরের উত্থান।

খ) আই.সি.টি অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশর অংশগ্রহন।

১) ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১।
২) গ্লোবাল ইন্টারনেট এক্সেস ফ্যাসিলিটিজ।
৩) ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
৪) আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়ন।
৫) (ক) ই-গভঃর্মেন্ট ডেভেলপমেন্ট।
(খ) ই-গর্ভঃমেন্ট উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান।
৬) আই.সি.টি সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
৭) মোবাইল ফোন কভারেজ।
৮) দেশব্যাপি ফাইবার অপটিক কানেকশন।
৯) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন।

গ) আউট সোর্সিং এবং আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি।

১.০ আউট সোসিং।
২.০ ICT পণ্য ও সেবা রপ্তানি।
৩.০ ICT পণ্য ও সেবা রপ্তানিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।

ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বার্ষিক বরাদ্ধ।

ঙ) বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

চ) আই.টি ইন্ডাষ্ট্রির আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও মার্কেট সাইজ প্রাক্কলন।

ছ) আই.টি সেক্টরে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজের ধরণ ও দক্ষতা।

জ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান।

ঝ) আই.সি.টি সেক্টর উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

LICT
LEVERAGING ICT FOR GROWTH
EMPLOYMENT & GOVERNANCE

ক) বিশ্বব্যাপি ICT সেক্টরের উত্থান :

বিশ্বব্যাপি ICT সেক্টরের উত্থান :

বিগত দুই দশকে প্রযুক্তির উচ্ছমাত্রার অগ্রগতি বিশ্বব্যাপি ডিজিটাল রিভ্যালুয়েশনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা 4IR নামে পরিচিত। ডিজিটাল সিস্টেম, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, মেশিন লার্নিং ও ব্যাপক তথ্য বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে যা স্বায়ত্বশাসিত যানবাহন, রোবোটিক, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, 3D প্রিন্টিং, ন্যানো ও বায়োটেকনোলজি এবং কোয়ান্টাম কাউন্টিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য ডিজিটাল ব্যবস্থার সম্পূর্ণটাই ICT and ITES সার্ভিস সংশ্লিষ্ট যা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কর্ণধার হিসাবে স্থান পেয়েছে এবং সারাবিশ্বে অসাধারণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০৫ সালে বিশ্বব্যাপি ICT সেক্টরের মার্কেট সাইজ ছিল USD ২,৬২২ বিলিয়ন, ২০১৯ সাল নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে USD ৫,০৬৯ বিলিয়নে [স্মারণী-৫.৭(১)], বছরে যা গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে USD ১৬৩.১৩ বিলিয়ন। এ সময়কালে ICT and ITES সার্ভিস সমূহের মধ্যে যে সমস্তক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে তন্মধ্যে শতাংশের হিসাবে সফ্টওয়্যার ১২%, হার্ডওয়্যার ২৩%, সার্ভিস ২১%, নতুন প্রযুক্তি ১৭% ও টেলিকম সার্ভিস ২৬% স্মারণী-৫.৭(২)।

স্মারণী-৫.৭(২): ২০০৫-২০১৯ সময়কালে বিশ্বব্যাপি ICT and ITES সার্ভিস সমূহের বিভিন্নক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতির চিত্র :-

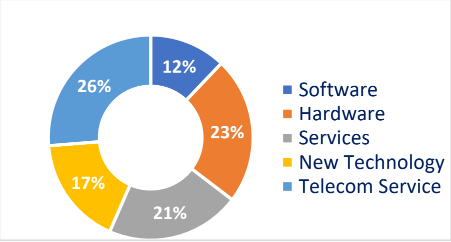

Source : Researchgate

স্মারণী-৫.৭(১): ২০০৫-২০১৯ সময়কালে বিশ্বব্যাপি ICT সেক্টরে ক্রমবর্ধমান রেভিনিউ প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

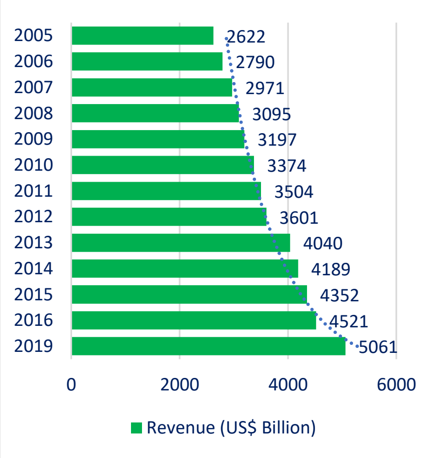

Source : Researchgate

খ) আই.সি.টি অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশর অংশগ্রহণ :

আই.সি.টি অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশর অংশগ্রহন :

বিগত দশকে সরকারের ডিজিটালাইজেশন কনসেপ্ট বাস্তবায়নে দেশে আই.সি.টি অবকাঠামো নির্মাণ, অপটিক্যাল ফাইবার, সাবমেরিন ক্যাবল ও 4G টেকনোলজি কানেকটিভিটি, সরকারি অনলাইন পরিসেবা, অনলাইন ব্যাংকিং, মানব সম্পদ উন্নয়নে আই.সি.টি প্রশিক্ষণ এবং দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশনের আওতায় নিয়ে আসা সহ দৃশ্যমান অনেক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে, যা সরকারের ই-গভঃর্মেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন যথেষ্ট সম্বাবনাময় করে তুলেছে। ফলে ২০২০ সাল নাগাদ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা দঁড়িয়েছে প্রায় ৬৬.৪৪ মিলিয়ন, মোবাইল ব্যবহারকারির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৩ মিলিয়ন এবং আউট সোসিং এ বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে, যা দেশের অর্থনীতির বিকাশে নতুন সম্ভাবনা যোগ করেছে।

সময়ের চাহিদা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারপূর্বক দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেন এবং দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে একাধিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। সর্বশেষ প্রণীত **" তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮"** বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যাতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে :-

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা।
- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিতকরণ ; এবং
- সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

২০১৯ সাল নাগাদ দেশের আই.সি.টি সেক্টরে দৃশ্যমান অগ্রগতি সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে তুলেধরা হলো :-

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল

ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ :

১) ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ :

"ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নে ডিজিটাল ব্যবস্থার পর্যাপ্ত উন্নয়নপূর্বক ই-গভর্ণেন্ট ব্যবস্থায় রুপান্তরিত হতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে সেন্ট্রালাইজড রেজিস্ট্রেশন, ওয়ার্কফ্লো ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেমস্, ই-টেন্ডারিং, ই-কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, ই-পেমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট মেনেজমেন্ট সিস্টেম এবং আরোও অনেক ক্ষেত্রে সরকারি পরিসেবা প্রদানে অনলাইন সংযোগ শক্তিশালী, দেশে দক্ষ আই.সি.টি জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার এবং আই.সি.টি অবকাঠামো নির্মাণসহ ডিজিটালাইজেশনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষেত্র সমূহের উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বিগত বছরগুলোতে আই.সি.টি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে, যেমন-ডাটা সেন্টার উন্নয়ন, সফটওয়ার, ডিভাইসেস, আইটি কমিউনিকেশন সার্ভিস এবং অন্যান্য আই.টি সার্ভিস ইত্যাদিক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে এবং দেশে ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, যদিও আই.সি.টি খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আশপাশের দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেকটা ধীরগতিতে এগুচ্ছে। উদাহরণস্বরুপ (২০১০-২০১৭) এ সাতবছর সময়কালে গ্লোবাল আই.সি.টি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স এ বাংলাদেশ অগ্রগতির পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে দশ ধাপ পিছিয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় যা যথেষ্ট বেশি পিছিয়ে পড়া [স্মারণী-৫.৭(৩)]।

স্মারণী-৫.৭(৩) : ২০১০-২০১৭ সময়কালে আই.সি.টি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স এ বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের অগ্রগতির চিত্র :-

Country	IDI 2017		IDI 2010		Rank Change 2010-2017
	Rank	Score	Rank	Score	
S. Korea	2	8.85	1	8.40	- 1
Japan	10	8.43	13	7.42	+ 3
Singapore	18	8.05	19	7.08	+ 1
Malaysia	63	6.38	58	4.45	- 5
Thailand	78	5.67	89	3.30	+ 11
China	80	5.60	80	3.55	-
Maldives	85	5.25	67	4.05	- 18
Philippines	101	4.67	92	3.22	- 8
Vietnam	108	4.43	81	3.53	- 27
Indonesia	111	4.33	101	2.83	- 10
Sri Lanka	117	3.91	105	2.79	- 12
Bhutan	121	3.69	119	1.93	- 2
India	134	3.03	116	2.01	- 18
Nepal	140	2.88	134	1.56	- 6
Bangladesh	147	2.53	137	1.52	- 10

Source: ITU IDI , Note: Higher Ranking indicates lower position

গ্লোবাল ইন্টারনেট এক্সেস ফ্যাসিলিটিজ :

২) গ্লোবাল ইন্টারনেট এক্সেস ফ্যাসিলিটিজ :

২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ দুটি সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমস্ SEA-ME-WE 4(SMW4) and SEA-ME-WE 5 (SMW5) এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং 2G, 3G and 4G ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্লোবাল ইন্টারনেট এক্সেস ফ্যাসিলিটিজ ভোগ করছে। ২০২১-২০২৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশ তৃতীয় সাবমেরিন ক্যবলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা দেশে 5G ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটির দ্বার উন্মুক্ত করবে।

সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমস্ উন্নয়নের ফলে ইন্টারনেট স্পীড বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকগুণ, ফলে

দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সালে যেখানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির হার ছিল জনসংখ্যার অনুপাতে ০.০৭%, ২০১৯ সাল নাগাদ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্তার হিসাবে তা দঁড়িয়েছে ৪০.৩৪% (বি.টি.আর.সি এর হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫৫%), [স্মারণী-৫.৭(৪)]। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সময়কালে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

স্মারণী-৫.৭(৪): ২০০০-২০১৯ সময়কালে দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির হার (%)বৃদ্ধির চিত্র :-

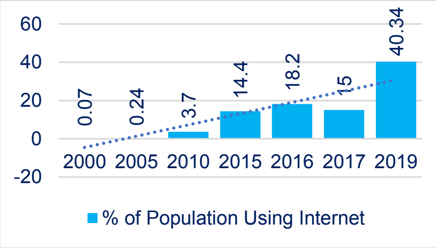

Source: World Bank Data

৩) ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বিগত দশকে তথ্য প্রযুক্তিক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতির ফলে দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা নিঃসন্দেহে সত্য, তবে এটাও সত্য যে এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেকটা ধীরগতি।

ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০০০-২০১৭ সময়কালে জনসংখ্যার অনুপাতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির হার বৃদ্ধি পেয়েছে ভিয়েতনামে ৫৭.৮৯%, চীনে ৫২.৫২%, ভূটানে ৪৭.৭১%, ভারতে ৩৩.৯২%, শ্রীলংকায় ৩৩.৪৬%, মিয়ানমারে ৩০.৬৮%, লাওস এ ২৫.৪০%, পাকিস্তানে ১৫.৪৫% এবং বাংলাদেশে ১৪.৯৩% স্মারণী-৫.৭(৫) । ইন্টারনেট ব্যবহারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে অনেক ধীর গতিতে এগুচ্ছে এবং পিছনে পড়ে রয়েছে, যাথেকে সহসা বেরিয়ে আসতে না পারলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশর অবস্থান ক্রমান্নয়ে নাজুক হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

স্মারণী-৫.৭(৫) : ২০০০ - ২০১৭ সময়কালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে জনসংখ্যার অনুপাতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির হার (%) :-

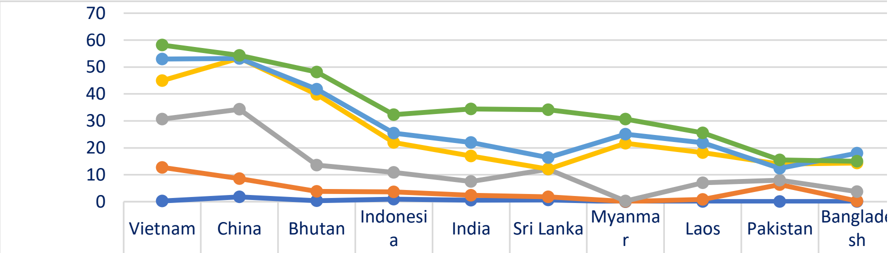

	Vietnam	China	Bhutan	Indonesia	India	Sri Lanka	Myanmar	Laos	Pakistan	Bangladesh
2000	0.25	1.78	0.4	0.93	0.53	0.65		0.11	0.06	0.07
2005	12.74	8.52	3.85	3.6	2.39	1.79	0.07	0.85	6.33	0.24
2010	30.65	34.3	13.6	10.92	7.5	12	0.25	7	8	3.7
2015	45	53.3	39.8	21.98	17	12.1	21.73	18.2	14	14.4
2016	53	53.2	41.77	25.45	22	16.4	25.07	21.87	12.39	18.02
2017	58.14	54.3	48.11	32.29	34.45	34.11	30.68	25.51	15.51	15

Source: World Bank Data

আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়ন :

৪) আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়ন :

আই.সি.টি শিল্পের দ্রুত উন্নয়নে দেশে বিশ্বমানের আই.সি.টি অবকাঠামো নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি এবং এলক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি হাইটেক পার্ক, একটি আইটি পার্ক ও একটি সফট্ওয়ার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে বর্তমান সরকার এগুচ্ছে। এলক্ষ্য বাস্তবায়নে এরিমধ্যে বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরোও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০১৯ সাল নাগাদ দেশে আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়নের সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

- **হাই-টেক পার্ক :** ২০১৯ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক, কালিয়াকৈর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে আরোও অন্তত ১২টি আইটি/ হাই-টেক পাক নির্মাণাধীন রয়েছে।
- **সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক :** জনতা টাওয়ার সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা এবং শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, রাজশাহী।
- **আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার :** শেখ কামাল আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, নাটোর, আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, রাজশাহী এবং আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, খুলনা।
- Tier-IV ডাটা সেন্টার, কালিয়াকৈর।
- ইলেক্ট্রনিক্স সিটি, সিলেট (নির্মাণাধীন)।

তবে বাস্তবতা হলো আই.সি.টি খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যেও একমাত্র পাকিস্তান ব্যাতিত অন্য সকল দেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ICT Development Index 2017 অনুযায়ী ১৭৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৭তম, যেখানে আশপাশের অন্যান্য দেশ সমূহ, যেমন- মালয়েশিয়ার অবস্থান ৬৩তম, থাইল্যান্ড ৭৮, ভিয়েতনাম ১০৮, ইন্দোনেশিয়া ১১১, শ্রীলংকা ১১৭, ভূটান ১২১, ভারত ১৩৪, মিয়ানমার ১৩৫, লাওস ১৩৯ এবং নেপাল ১৪০তম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.৭(৬)]।

স্মারণী-৫.৭(৬): ICT Development Index 2017 অনুয়ায়ী ১৭৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ও আশপাশের দেশ সমূহের তুলনামূলক অবস্থান :-

Source: ITU IDI Note: Higher Ranking indicates lower position.

LEVERAGING ICT FOR GROWTH EMPLOYMENT & GOVERNANCE

ই-গভঃর্মেন্ট ডেভেলপমেন্ট :

৫ (ক) ই-গভঃর্মেন্ট ডেভেলপমেন্ট :

বিগত বছরগুলোতে দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে, যেমন- প্রশাসনিক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য সকলক্ষেত্রে পরিসেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নতুন কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদিক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং দেশে ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থার সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তুলছে।

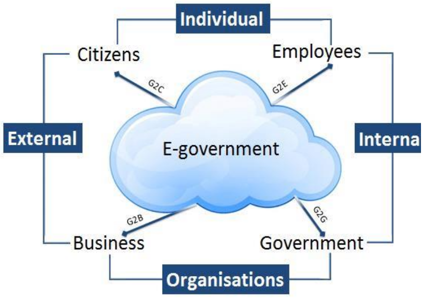

UN E-government Development Index 2014 অনুযায়ী ১৯১ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৮তম, ২০২০ সাল নাগাদ এক্ষেত্রে ২৯ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ ১১৯তম স্থানে উঠে এসেছে, যা **"ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসেপ্ট"** বাস্তবায়নে দেশে ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতির অন্যতম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি [স্মারণী-৫.৭(৭)] ।

২০২০ সাল নাগাদ দেশে চলমান উল্লেখযোগ্য সরকারি ই-পরিসেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে :-

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অনলাইনে ভর্তির নিবন্ধন ও ফল প্রকাশ।
- অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ণ দাখিল, অনলাইন টেন্ডারিং, ই-পাসপোর্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমস্ চালু।
- অনলাইন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টেলিমেডিসিন ও ভিডিও কনফারেন্সিং।
- বিদেশে চাকরি প্রার্থীদের নিবন্ধিকরন, ভ্যাট নিবন্ধন ও তীর্থযাত্রার জন্য নিবন্ধিকরন।
- ৫ হাজারের অধিক ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু।
- উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে পোষ্ট অফিস সমূহে প্রায় ১০ হাজারের অধিক ই-সেন্টার চালুর মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড ও অন্যান্য সেবা প্রদান।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান।

স্মারণী-৫.৭(৭) : ২০১৪-২০২০ সময়কালে UN E-govt. Development Index এ বাংলাদেশের অবস্থান ও অগ্রগতির চিত্র :-

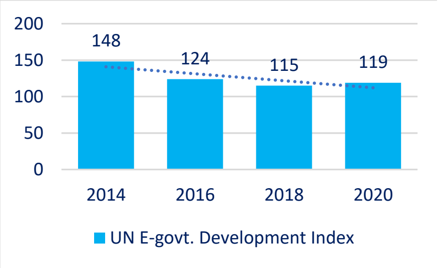

Source: Un E-govt. Development Index
Note: Higher value indicates lower rank

যদিও ICT সেক্টরে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন, তথাপি ICT সেক্টরের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে সরকারের বাস্তবমূখী উদ্যোগ, যেমন- দেশে ICT অবকাঠামো উন্নয়ন, ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, স্পীড ও সেবার মানোন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, IT প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন, এখাতে ট্যাক্স ও ভ্যাট সুবিধার পাশাপাশি ICT পণ্য ও সার্ভিস রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা এবং দেশের টেলিযোগাযোগ

SIRBD

ব্যবস্থাপনায় অভাবনীয় অগ্রগতি এদেশের ICT সেক্টরকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তুলছে, আগামীতে যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে।

৫ (খ) ই-গভঃর্মেন্ট উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান :

ই-গভঃর্মেন্ট উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান :

ডিজিটালাইজেশন কনসেপ্ট বাস্তবায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ই-গভঃর্মেন্ট উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি বেশ সাফল্যজনক, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এক্ষেত্রে যথেষ্ট গতিময়তা পেয়েছে। EDGI Rank 2020 অনুযায়ী ই-গভঃর্মেন্ট উন্নয়নে বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১৯১ দেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়া, নেপাল ও পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে ১১৯তম স্থানে উঠে এসেছে, যদিও এক্ষেত্রে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, ভারত, মালদ্বীপ ও ভুটান বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

স্মারণী-৫.৭(৮) : ই-গভঃর্মেন্ট উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবা প্রদানে ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

EDGI Rank 2020	Country	Scores in Different Index in 2020			
		EDGI Index	Online Service Index	Telecom. Infrastructure Index	Human Capital Index
57	Thailand	0.7565	0.7941	0.7004	0.7751
85	Sri Lanka	0.6708	0.7176	0.5289	0.766
86	Vietnam	0.6667	0.6529	0.6694	0.6779
100	India	0.5964	0.8529	0.3515	0.5848
105	Maldives	0.574	0.4353	0.5981	0.6886
103	Bhutan	0.5777	0.6824	0.5367	0.5139
119	Bangladesh	0.5189	0.6118	0.3717	0.5731
124	Combodia	0.5113	0.4529	0.5466	0.5344
132	Nepal	0.4699	0.4	0.4691	0.5405
153	Pakistan	0.4183	0.6294	0.2437	0.3818

Source: UN E-gov. survey 2020

SJHBD

৬) আই.সি.টি সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন :

বিগত এক দশকে দেশে আই.সি.টি সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অনেকটা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এ সেক্টরে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে বলা চলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়নে সরকারের কৌশল সমূহ হচ্ছে :-

- দেশীয় ও বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আই.সি.টি পেশাজীবী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন।
- দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তকরণ।

- কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি, সহায়তা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ভবিষ্যত প্রযুক্তি ও শিল্প খাতের বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহায়তায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান বাজার সম্প্রসারণ।

উপরোক্ত কৌশলের অংশ হিসাবে দেশে আন্তর্জাতিক চাহিদার ভিত্তিতে আই.টি ও আউট সোর্সিং এ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে এবং এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ২০২১ সাল নাগাদ দেশে ২.০০ মিলিয়ন আই.টি প্রফেশনাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আই.সি.টি সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন :

তবে "গ্লোবাল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স" এর মূল্যায়নে বিগত বছরগুলোতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। HDI Index 2000 অনুযায়ী ১৮৯ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৬তম, ২০১০ সাল নাগাদ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়ে ১২৯তম স্থানে পৌঁছে। কিন্তু, ২০১৫ সাল নাগাদ আবার অবনতি হয়ে ১৪২তম স্থানে পৌঁছায় এবং ২০১৯ সাল নাগাদ যা পৌঁছায় ১৩৫তম স্থানে। ২০১৫-২০১৯ সময়কালে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৭ ধাপ [স্মারণী-৫.৭(৯)]।

স্মারণী-৫.৭(৯) : ২০০০-২০১৯ সময়কালে মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র :-

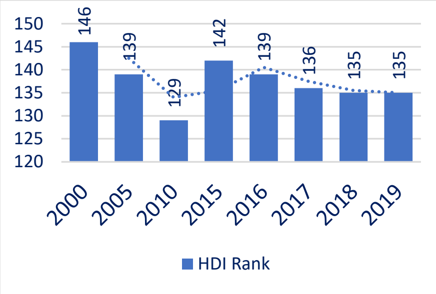

Source: UNDP Note: Higher value indicates lower rank.

২০১৯ সাল নাগাদ মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও মিয়ানমার ছাড়া অন্যান্য সকল দেশের তুলনায় যথেষ্ট পিছনে অবস্থান করছে। HDI Rank ২০১৯ অনুযায়ী ১৮৯ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম, যেখানে মালয়েশিয়া ৬১তম, শ্রীলংকা ৭১৪তম, থাইল্যান্ড ৭৭তম, চীন ৮৫তম, পিলিপাইন ১০৬তম, ইন্দোনেশিয়া ১১১তম, ভিয়েতনাম ১১৮তম, ভারত ১২৯তম এবং ভূটান ১৩৪তম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.৭(১০)]।

স্মারণী-৫.৭(১০) : ২০১৯ সাল নাগাদ মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

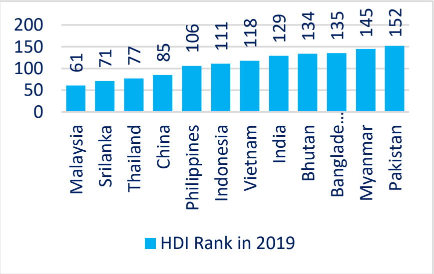

Source: UNDP Note: Higher value indicates lower rank

৭) মোবাইল ফোন কভারেজ :

মোবাইল ফোন কভারেজ :

২০১৯ সালের শেষ নাগাদ দেশের প্রায় ৯৯% জনসংখ্যা এবং ৯৫% ভৌগলিক এরিয়া মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৫.৫৭২ মিলিয়ন, ২০১০ সালের ডিসেম্বরে যা ছিল ৬৭.৯২ মিলিয়ন। ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৭.৬৫২ মিলিয়ন, গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে ১০.৮৫ মিলিয়ন [স্মারণী-৫.৭(১১)] ।

স্মারণী-৫.৭(১১) : ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশে মোবাইল ফোন সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা (মিলিয়ন) বৃদ্ধির চিত্র :-

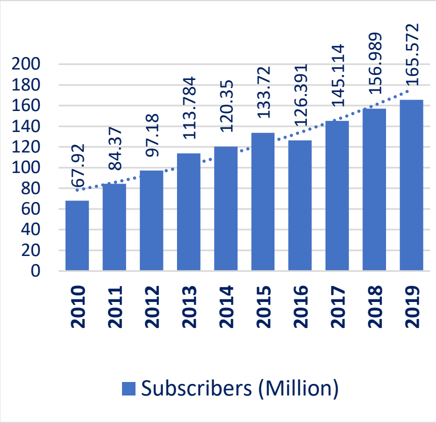

Source: BTRC

৮) দেশব্যাপি ফাইবার অপটিক কানেকশন :

দেশব্যাপি ফাইবার অপটিক কানেকশন

দেশব্যাপি ইন্টারনেট সেবা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দেশের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরিভিত্তিতে ফাইবার অপটিক কানেকশন নিশ্চিত করার প্রকল্প সরকার কতৃক হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মাঝামাঝি নাগাদ সারাদেশে প্রায় ২৮,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশন নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে, যা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত (BTCL)|

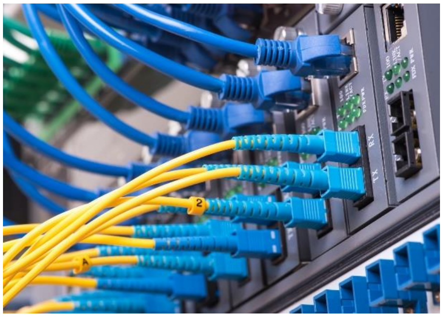

দেশে দ্রুত বর্ধনশীল ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের চাহিদা মিটাতে এবং দেশব্যাপি নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক সিস্টেমস্ এর সাথে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে সংযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০২১ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশ তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক (SEA-ME-WE6) কানেকশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা ২০২৪ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হওয়ার কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল কানেকশন (SEA-ME-WE4) এবং ২০১৭ সালে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE5) কানেকশনের সাথে যুক্ত হয়। ২০২০ সাল নাগাদ দুটি সাবমেরিন ক্যাবল থেকে ব্যান্ডউইথ ক্ষমতা 2600Gbps, যার মাধ্যমে দেশে 4G নেটওয়ার্ক চালু রয়েছে। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল কানেকশন সম্পন্ন হলে ব্যান্ডউইথ 7200Gbps এ উন্নীত হবে, যার ফলে দেশে 5G নেটওয়ার্ক চালু করা সহজ হবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন :

৯) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন :

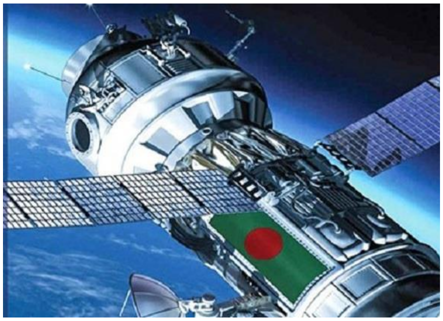

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (BS-1) প্রথম বাংলাদেশি ভূতাত্বিক যোগাযোগ উপগ্রহ যা মে ১০, ২০১৮ সালে ফ্রান্সের Thales Alenia Space এর কারিগরি সহায়তায় উৎক্ষেপন করা হয়, যা দেশব্যাপি বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে সম্প্রচার এবং টেলিযোগাযোগ সেবা সহজতর করবে এবং যার ফলে স্যাটেলাইট মালিকানাধীন দেশসমূহের তালিকায় বাংলাদেশ ৫৭তম গৌরবোজ্জ্বল স্থানে আসীন হলো।

এ স্যাটেলাইটে ২৬টি কু-ব্যান্ড এবং ১৪টি সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার রয়েছে, যা সমগ্র বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের উপর ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম, যার মাধ্যমে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের ব্যবসা বানিজ্য প্রসারের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি কক্ষপথ স্যুটে ১১৯.১ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ পূর্বে অবস্থান করছে, যারজন্য ২০১৭ সালে রশিয়ার স্যাটেলাইট কোম্পানি "ইন্টারস্পুটনিক" এর কাছ থেকে ২৮ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলারে কক্ষপথের স্যুট কেনা হয়েছিল। এ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরের জয়দেবপুরে এবং রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় দুটি আর্থ ষ্টেশন স্থাপিত হয়েছে। এ স্যাটেলাইটের বিস্তারিত সুবিধাবলি নিম্নে তুলেধরা হলো :-

Bangabandhu Satellite-1 system is specified in term of end-user service utilization and performances to provide:

- *Direct To Home (DTH) : service consisting of multiplexed digital television, radio and associated data direct to very small antennas.*
- *Video Distribution : multiplexed digital television, radio and associated data services to medium-sized antennas*
- *VSAT Private Networks : shall support private networks consisting of voice, data, video and Internet services, to banks, gas stations, etc. with medium-sized antennas.*
- *Broadband : service that allows the end-user (individual, organization, corporation or Government) to remotely access the Internet at high speed with high quality of service.*
- *Communications Trunks : wide band high data rate point-to-point services*

Source : **Thales Alenia Space Journal.**

LICT
Leveraging ICT for Growth, Employment & Governance

আউট সোর্সিং :

গ) আউট সোর্সিং এবং আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি :

১) আউট সোর্সিং :

বিগত দশকে দেশে ইন্টারনেট ব্যবস্থার ফলপ্রসু উন্নয়নের ফলে একদিকে যেমন জনসংখ্যার অনুপাতে ইন্টারনেট ব্যবহাকরির হার বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৯ সাল নাগাদ প্রায় ৮০.৩৪%), পাশাপাশি শিক্ষিত যুব সমাজে ক্যারিয়ার অপশন হিসাবে ফ্রিল্যান্সিং বাংলাদেশে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেশে ইন্টারনেট এক্সেস সহজীকরন, ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আই.সি.টি অবকাঠামো নির্মাণ এবং ফ্রিল্যান্সিং ও আই.সি.টি প্রশিক্ষণ বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

২০১৯ সাল নাগাদ দেশে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ রেজিষ্ট্রার্ড ফ্রিল্যান্সার রয়েছে, যারমধ্যে আনুমানিক ৫.০০ লক্ষ ফ্রিল্যান্সার নিয়মিত কাজ করছে। ফলে বিগত কয়েক বছর ফ্রিল্যান্সিং এ বাংলাদেশের রেভিনিউ গ্রোথ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৯ সালে ফ্রিল্যান্সিং এ বার্ষিক ২৭% রেভিনিউ গ্রোথ নিয়ে শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় অষ্টম স্থানে অবস্থান করছে [স্মারণী-৫.৭(১২)] ।

তবে এক্ষেত্রে কিছুটা হতাশার বিষয় হচ্ছে গ্লোবাল আউটসোর্সিং র‍্যাংকিং এ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৬তম এবং ২০১৭ সাল নাগাদ ৫ ধাপ এগিয়ে ২১তম স্থানে পৌছায়, কিন্তু ২০১৯ সালে ১১ ধাপ পিছিয়ে ৩২তম স্থানে পৌছায় [স্মারণী-৫.৭(১৩)]। গ্লোবাল আউটসোর্সিং র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী ভারত ১ম, চীন ২য়, মালয়েশিয়া ৩য়, ইন্দোনেশিয়া ৪র্থ, ভিয়েতনাম ৫ম, থাইল্যান্ড ৭ম, ফিলিপাইন ১০ম, শ্রীলংকা ২৫তম, বাংলাদেশ ৩২তম এবং পাকিস্তান ৩৭তম স্থানে অবস্থান করছে। অর্থাৎ আউটসোর্সিং এ বাংলাদেশ অদ্যাবধি দুয়েকটি দেশ ব্যতিত এশিয়ার অন্যান্য সকল দেশের পিছনে অবস্থান করছে [স্মারণী-৫.৭(১৪)] ।

স্মারণী-৫.৭(১২) : ২০১৯ গ্লোবাল ফ্রিল্যান্স র‍্যাংকিং অনুযায়ী শীর্ষ ১০ দেশের বার্ষিক রেভিনিউ গ্রোথ :-

Rank 2019	Country	Revenue Growth %
1	USA	78%
2	UK	59%
3	Brazil	48%
4	Pakistan	47%
5	Ukraine	36%
6	Philippine	35%
7	India	29%
8	Bangladesh	27%
9	Russia	20%
10	Surbia	

Source: The Global Gig-Economy Index 2019

SJFBD

আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি :

স্মারণী-৫.৭(১৩) : ২০১৪-২০১৯ সময়কালে "গ্লোবাল আউট সোর্সিং র‍্যাংকিং" এ বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র :-

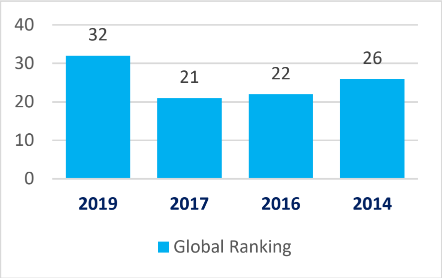

Source: A.T Kearney Global Service Location Index
Note : Higher value indicates lower Rank.

স্মারণী-৫.৭(১৪) : Global Service Location Index 2019 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য আউটসোর্সিং এ অগ্রগামী দেশসমূহের অবস্থান :-

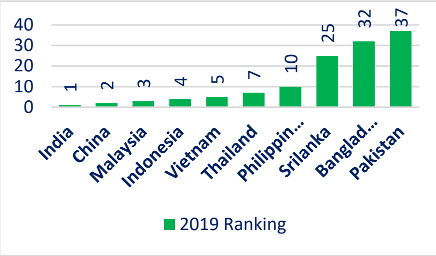

Source: A.T Kearney Global Service Location Index
Note : Higher value indicates lower Rank.

২) আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি :

বিগত দুই দশকে ডিজিটাল/জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে সারাবিশ্বে আই.সি.টি কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ২০০০ সালের পর থেকে বিশ্বে আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানি উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে ২০০৪ সাল নাগাদ বিশ্বে আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানির পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ১৩২.৯৮ বিলিয়ন, ২০১৭ সাল নাগাদ যা দাঁড়িয়েছে ৫৩৬.০২ বিলিয়ন। এ সময়কালে আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৮.৩৩%।

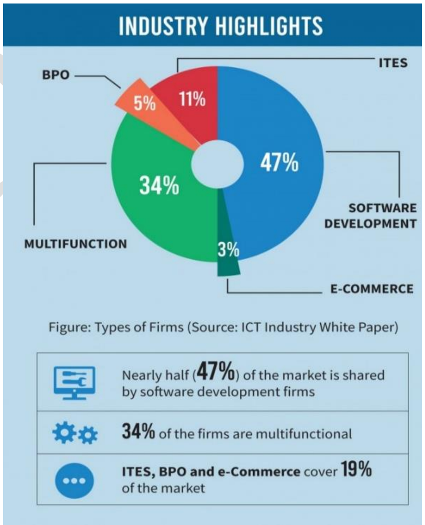

আশার কথা হচ্ছে বিগত দশকে, বিশেষ করে ২০০৮ সালের পর থেকে বাংলাদেশে আই.সি.টি সংশ্লিষ্ঠ সার্ভিস, সফট্ওয়্যার ও ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানি প্রায় ২.৫০ থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশের আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৬০৬ মিলিয়ন, ২০০৮ সালে যা ছিল ১৩৭.৮৫ মিলিয়ন [স্মারণী-৫.৭(১৫)] ।

স্মারণী-৫.৭(১৫) : ১৯৯৬-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানির চিত্র :-

Source: Indexmundi

ICT সেবা রপ্তানিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

৩) ICT সেবা রপ্তানিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানিতে বাংলাদেশর ধারাবাহিক অগ্রগতি যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক এবং বিগত পাঁচ বছরের (২০১৫-২০১৯) এক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির হার ৭% (5-years CAGR), যেখানে ভারতের প্রবৃদ্ধি ২.৬%, মালয়েশিয়ার ০.৭%, পাকিস্তানের ৫.৫%, শ্রীলংকার ৬.২% এবং ইন্দোনেশিয়ার -২.৪%। এক্ষেত্রে চায়না, সিঙ্গাপুর ও দ. কোরিয়ার 5-years CAGR (%) যথাক্রমে ৮.১%, ৯.৬% ও ৯.৪%।

তবে আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানি আয়ের পরিমাণের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী ICT সার্ভিস রপ্তানিতে ১৭৪ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৮তম। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন- ভারত ১ম, চীন ৫ম, সিঙ্গাপুর ১৩তম, দ. কোরিয়া ২৫তম, মালয়েশিয়া ৩০তম, পাকিস্তান ৪৫তম, শ্রীলংকা ৪৬তম এবং ইন্দোনেশিয়া ৪৭তম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.৭(১৬)] ।

আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানি আয়ে বড় ধরনের উল্ফলন ঘটাতে হলে আই.সি.টি সেক্টরকে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অন্যান্য আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশের আলোকে দেশে পর্যাপ্ত আই.সি.টি অবকাঠামো নির্মাণ, সর্বাধুনিক ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার, এখাতে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে আরোও অধিক পরিমাণে সম্পৃক্তকরন এবং দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ আই.সি.টি প্রফেশনাল তৈরিসহ এখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার এখনি সময়।

স্মারণী-৫.৭(১৬) : ২০১৫-২০১৯ সময়কালে ICT সার্ভিস রপ্তানিতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের তুলনামূলক অবস্থান :-

2019 Rank	Country	Yearly Export (USD Million)					
		2015	2016	2017	2018	2019	5-years CAGR (%)
1	India	76,368	76,541	78,519	82,075	84,88	+ 2.6
5	China	24,549	25,432	26,977	28,388	29,83	+ 8.1
13	Singapore	9,248	11,635	11,309	12,079	12,71	+ 9.6
25	S. Korea	3,502	3,719	4,301	4,442	4,697	+ 9.4
30	Malaysia	2,656	2,576	2,678	2,775	2,851	+ 0.7
45	Pakistan	789	873	1,004	1,018	1,062	+ 5.5
46	Sri Lanka	805	858	926	964	1,010	+ 6.2
47	Indonesia	971	970	1,012	1,007	1,008	- 2.4
58	Bangladesh	482	623	526	580	606	+ 7.0

Source: Nationmaster.com

ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বার্ষিক বরাদ্ধ :

অর্থবছর ২০১১-১২ নাগাদ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছিল। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আলাদা করনপূর্বক দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত ও টেকসই উন্নয়নে আই.সি.টি অবকাঠামো নির্মাণ, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থার উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে আলাদা উন্নয়ন বরাদ্ধ চালু করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত দশকজুড়ে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নে জাতীয়বাজেটে এখাতে উন্নয়ন বরাদ্ধ প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্বি করা হয়েছে, যদিও এখাতের সম্ভাবনার তুলনায় বরাদ্ধকৃত বাজেট মোটেও যথেষ্ট ছিলনা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বার্ষিক বরাদ্ধ :

২০১২-১৩ অর্থবছরে এখাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ ছিল টাকা ২৯৪ কোটি, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৩০ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৮০ কোটি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,০৭৩ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৬০৬ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩,৭৮৪ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৪৬৮ কোটি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৬৪৫ কোটি টাকা [স্মারণী-৫.৭(১৭)] ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্ছ বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ ছিল ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩,৭৮৪ কোটি টাকা, পরবর্তী দুই অর্থবছরে যা ক্রমান্বয়ে কমে যথাক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৪৬৮ কোটি ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৬৪৫ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

স্মারণী-৫.৭(১৭) : বিগত দশকে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে জাতিয় বাজেটে বার্ষিক বরাদ্ধের চিত্র :-

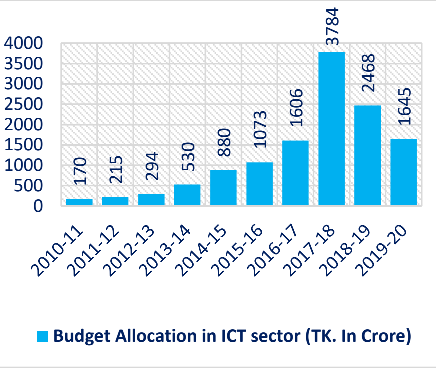

Source: MOF

ঙ) বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির বিকাশে আই.সি.টি বিশ্বব্যাপি অন্যতম সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে শক্ত অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে, ফলে বিশ্বব্যাপি আই.সি.টি মার্কেট সাইজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। IDC Forecast অনুযায়ী ২০১৮ সালে গ্লোবাল আই.সি.টি ব্যয় ছিল ইউ.এস.ডলার ৪,৬৫৯ বিলিয়ন, ২০২৩ সাল নাগাদ যা দাঁড়াবে ৫,৮১৬ বিলিয়ন ডলার [স্মারণী-৫.৭(১৮)] ।

বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

অত্যন্ত আশার কথা হচ্ছে বাংলাদেশ যথাসময়ে এ অগ্রযাত্রায় সামিল হতে পেরেছে। বিগত দশকে বাংলাদেশ আই.সি.টি শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রে যে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, যেমন- ২০১৯ সাল নাগাদ জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০%, আই.সি.টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে প্রায় ২ হাজারের অধিক, আউটসোর্সিং এ শিক্ষিত যুব শ্রেণির একটি বড় অংশ নিয়োজিত হয়েছে এবং আশানুরুপ সফলও হয়েছে এক্ষেত্রে এবং সবচেয়ে বড় বিষয়, বিগত বছরগুলোতে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরনের পাশাপাশি আই.সি.টি সার্ভিস রপ্তানিতেও বাংলাদেশ যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে (যদিও সেটা পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় যথেষ্ট সামান্য)। আরো আশার কথা হচ্ছে, আই.সি.টি কে সরকার অগ্রাধিকার শিল্প বিবেচনায় নিয়ে এ শিল্পের দ্রুত বিকাশে দেশে উন্নত আই.সি.টি অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, আই.সি.টি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ আই.সি.টি প্রফেশনাল তৈরিতে প্রশিক্ষণ

ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং সরকারি পরিষেবা সহজে জনগণের দ্বারগোড়ায় পৌঁছাতে ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থার উন্নয়নে বহুদূর এগিয়েছে।

আই.সি.টি শিল্পের অগ্রগতির এ ধারা আরোও বেগবান ও যুগোপযোগি করে গড়ে তোলা পূর্বক এ শিল্পকে দেশের অর্থনীতির তৃতীয় চালিকা শক্তিতে পরিণত করার মাধ্যমে এ শিল্পে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত যুব শ্রেণীর কর্মসংস্থান, ব্যবসা বানিজ্যের গতি প্রবাহ বৃদ্ধিসহ পর্যাপ্ত আই.সি.টি প্রোডাক্টস্ ও সার্ভিস উৎপাদনপূর্বক আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান জানান দেওয়ার অপূর্ব এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে সম্ভাব্য সবকিছুই করা উচিত। এদেশের উদ্যমী যুবসমাজ, সস্তা শ্রম, সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং এখাতে পর্যাপ্ত দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারের সময়োপযোগী ও বাস্তবসন্মত উদ্যোগ অপার এ সম্ভাবনার যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে আশাকরি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মতে " **দেশে ব্যবসায়িক গতিশীলতা, প্রাতিষ্ঠানিক ভীত, অর্থায়ন ব্যবস্থা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম"** শিল্প সসমৃদ্ধি অর্জনের গোপন চাবিকাঠি।

স্মারণী-৫.৭(১৮) : Global ICT spending forecast 2018-2023 (US$ Billion) :-

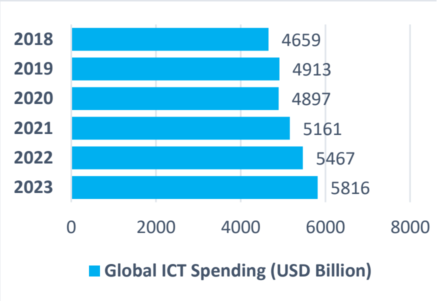

Source: IDC

চ) আই.সি.টি ইন্ডাস্ট্রির আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও মার্কেট সাইজ প্রাক্কলন :

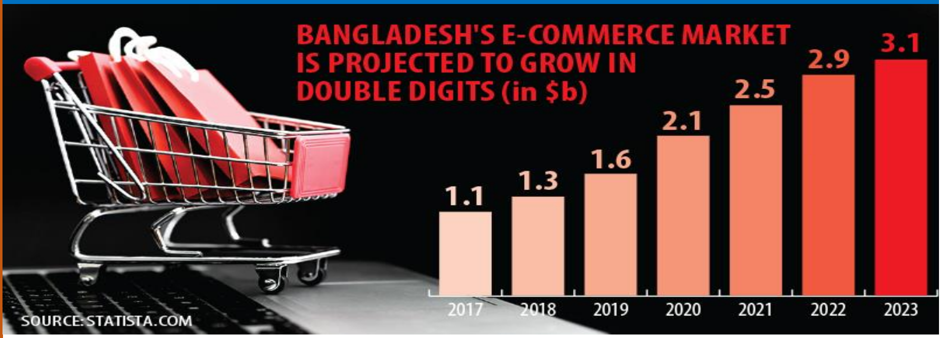

১) আই.সি.টি শিল্পের আভ্যন্তরীণ চাহিদা :

বিশ্বব্যাপি আই.সি.টি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এ শিল্পের আন্তর্জাতিক মার্কেট সাইজ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাপি ICT সেক্টরের মার্কেট সাইজ ছিল USD ২,৬২২ বিলিয়ন, ২০১৯ সাল নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে USD ৫,০৬১ বিলিয়নে [স্মারণী-৫.৭(১)]। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে দেশে ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থার প্রচলন, তথ্য আদান প্রদান, যোগাযোগ ও ব্যবসা বানিজ্যে আই.সি.টি এর ব্যবহার

আই.সি.টি শিল্পের আভ্যন্তরীণ চাহিদা :

বৃদ্ধি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে আই.সি.টি শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজার সাইজ অতি দ্রুতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, একটি বেসরকারি সংস্থার প্রক্কলন অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ যা দাঁড়াবে ইউ.এস.ডলার ৪.৬-৪.৮ বিলিয়ন এবং এ সময়কালে আই.সি.টি সেক্টরে সমন্বিত বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ১৫%। দেশের সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে আই.সি.টি এর ব্যবহার এখন অনেকটা অবধারিত হয়ে পড়েছে এবং প্রশাসনের সকল স্তরে এবং ব্যবসায়িকক্ষেত্রে আই.সি.টির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। BASIS সার্ভে ২০১৩ এর ভিত্তিতে UNCTAD কতৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে আই.সি.টি শিল্পের চাহিদার হার (%) নিন্মে তুলেধরা হলো।

স্মারণী-৫.৭(১৯) : BASIS সার্ভে ২০১৩ এর ভিত্তিতে UNCTAD কতৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে আই.টি শিল্পের চাহিদা (%) :-

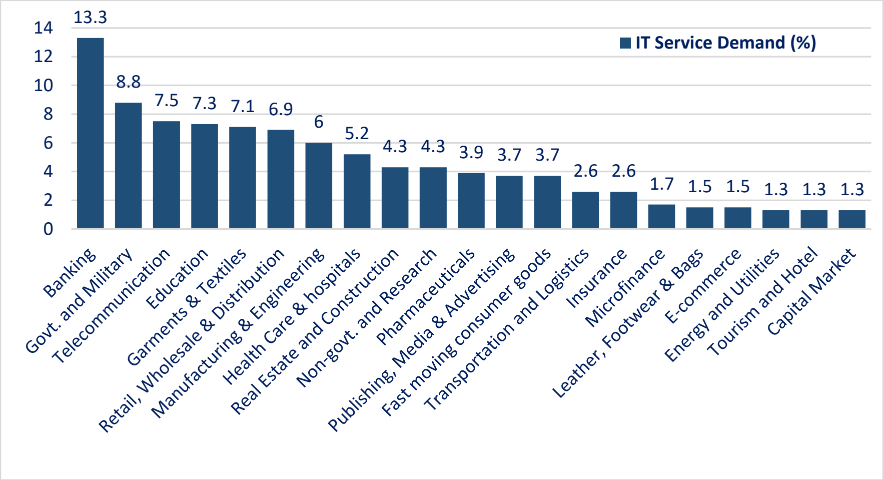

Source: UNCTAD Report

২) আই.সি.টি ইন্ডাস্ট্রির আভ্যন্তরীণ মার্কেট সাইজ :

সরকার ঘোষিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে দেশে ই-গভঃর্মেন্ট সিষ্টেমস্ ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি পরিষেবা সমূহ সহজে জনগণের দ্বারগোড়ায় পৌঁছাতে প্রশাসনের সকল স্তরে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ, ব্যাংকিং, শিক্ষা, ইস্যুরেন্স, স্বাস্থ্য সেবাসহ ব্যবসা বানিজ্যের সকল স্তরে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকটা অবধারিত হয়ে পড়ছে। ফলে দেশে আই.সি.টি শিল্পের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বাজার সাইজ দ্রুতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। BCG Everest Group এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে আই.টি ও আই.সি.টি সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের আভ্যন্তরীণ মার্কেট সাইজ ইউ.এস.ডলার ০.০৯ - ১.১ বিলিয়ন, ২০১৮ সাল নাগাদ ইউ.এস.ডলার ২.৩-২.৬ বিলিয়ন (এ সময়ে সমন্বিত বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে ৩৪%) এবং ২০২৫ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ইউ.এস.ডলার ৪.৬-৪.৮ বিলিয়ন (এ সময়কালে সমন্বিত বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ১৫%) [স্মারণী-৫.৭(২০)] ।

যে সমস্ত কারনে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে আরোও অনেক দ্রুত প্রসারিত হবে :-

- দেশে বিশ্বমানের আই.সি.টি অবকাঠামো গড়ে উঠছে, ফলে আগামীতে এখাতে দেশি /বিদেশি বিনিয়োগ উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।
- প্রতিবছর অসংখ্য আই.টি গ্রাজুয়েট এ সেক্টরে যুক্ত হচ্ছে, ভবিষ্যতে যারা এ সেক্টরকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

আই.টি ইন্ডাস্ট্রির আভ্যন্তরীণ মার্কেট সাইজ :

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশে ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি সকল সেক্টরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবার চাহিদা ও আকার দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যাক্তি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুতই বাড়ছে।
- ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ও ইন্টারনেট এক্সেস সহজলভ্য হওয়ার কারণে সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে।
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আই.সি.টি সেক্টরে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- আউট সোর্সিং জগতে বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন এরিমধ্যে ভালো অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে, যা ছাত্রদের শিক্ষার পাশাপাশি আর্থিক সঙ্গতি নিশ্চিত করছে এবং শিক্ষা জীবন শেষে বেকারত্ব থেকে রক্ষা করছে।
- তুলনামূলক সস্তা শ্রম ও আই.সি.টি সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগ এ সেক্টরের সম্ভাবনা আরোও বাড়িয়ে তুলছে।

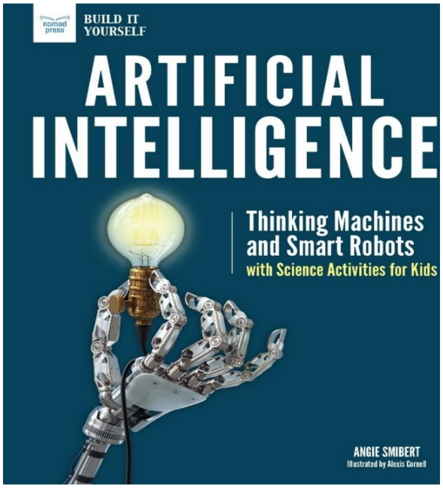

স্মারণী-৫.৭(২০) : Bangladesh ICT Industry Domestic Market Size Forecast (US$ Billion) :-

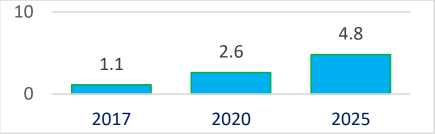

Source: BCG Everest Group

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আই.সি.টি সেক্টর উন্নয়নে সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে দেশের আই.সি.টি সেক্টরেরর অগ্রগতির বর্তমান ধারা ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে এবং আই.সি.টি প্রোডক্টস্ ও সার্ভিস রপ্তানির পরিমাণ দ্রুতই কাঙ্কিত পর্যায়ে পৌছাবে, যা ২০২৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্ছ আয়ের দেশের পৌছানোর স্বপ্ন পূরনের অন্যতম সহায়ক হিসাবে কাজ করবে আশাকরা যায়।

ছ) আই.সি.টি সেক্টরে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজের ধরন ও দক্ষতা :

Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS) ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে সফ্টওয়্যার ও আই.টি সক্ষম পরিসেবা সমূহের উন্নয়নে ”ন্যাশনাল ট্রেডবডি” হিসাবে কাজ করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠান তাদের নিয়মিত কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সদস্য কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিষেবা বিকাশ এবং সরকারি নীতিমালার অনুকুলে সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশি আই.টি প্রোডাক্টস্ ও সার্ভিস সমূহের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বজার বিকাশে কাজ করে আসছে এবং দেশিয় আই.টি

বেসিস সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ মূলত আই.টি সেক্টরে ৯-১০টি ক্যাটাগরিতে কাজ করে, তন্মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্ছ ৬ টি ক্যাটাগরিতে এবং স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট ৩-৪টি ক্যাটাগরিতে কাজ করছে।

আই.টি সেক্টরে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজের ধরন ও দক্ষতা :

শিল্প বিকাশে এরিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভূমিকার যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে।

বেসিস সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ মূলত আই.টি সেক্টরে ৯-১০টি ক্যাটাগরিতে কাজ করে, তন্মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্ছ ৬ টি ক্যাটাগরিতে এবং স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট ৩-৪টি ক্যাটাগরিতে কাজ করছে। উল্লেখযোগ্য কাজের ধরণ (Nature of Business) ও দক্ষতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেসিস সদস্য পতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ৫৫.৬৬% কাষ্টমাইজড সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এ দক্ষ, আই.টি সক্ষম সার্ভিস এ দক্ষ ১৬.৯৮%, ই-কমার্স এ দক্ষ ১২.৪৫%, মোবাইল এপ্লিকেশনে দক্ষ ৪.৭২%, প্রোডাক্ট কোম্পানি ৪.৩৪%, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনে দক্ষ ৩.০২%, কন্সাল্টিং এ দক্ষ ১.৫১% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা রয়েছে ১.৩৭% প্রতিষ্ঠানের [স্মারণী-৫.৭(২১)]।

স্মারণী-৫.৭(২১) : কাজের ধরণ (Nature of Business) ও দক্ষতা বিশ্লেষণে বেসিস সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা (%) :-

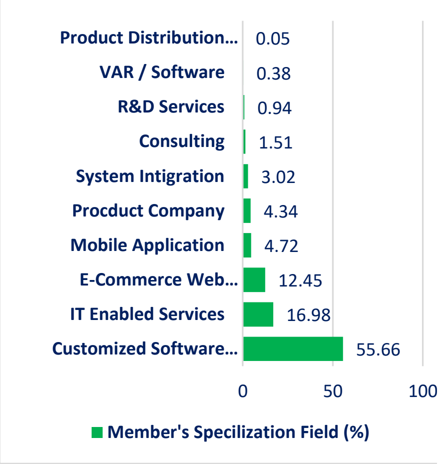

Source: BASIS Software & IT Service Catalog.

জ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান :

বিগত দুই দশকজুড়ে বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এখাতে কর্মসংস্থান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বিশ্বব্যাপি তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, সেবার মান ও পরিধি এবং আন্তর্জাতিক বানিজ্যে তথ্য প্রযুক্তি প্রেডাক্টস্ ও সেবার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ, যা বিশ্বের বহু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশ যথাসময়ে এ অগ্রযাত্রার অন্যতম সহযাত্রী হিসাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে এবং আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশ গঠতে এখাতের উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বিগত দশকে দেশে আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়ন, ইন্টারনেট সেবা সহজীকরণ, আই.সি.টি প্রশিক্ষণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান

জোরদার, এখাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সরকারি সেবা সহজীকরনে দেশে ই-গভঃর্মেন্ট ব্যবস্থার উন্নয়নে এরিমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দেশে তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং উঠছে, শিক্ষিত যুব সমাজের একটি বড় অংশ প্রতিনিয়ত এখাতের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং আই.সি.টি পণ্য ও সেবা দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিঠানোর পাশাপাশি কিছু কিছু রপ্তানিও হচ্ছে। আউট সোসিং এ বাংলাদেশ এরিমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভালো অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে যা দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আই.সি.টি সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রতির ক্ষেত্রে অন্যমাত্রা যোগ করেছে নিঃসন্দেহে।

কিন্তু আশংকার বিষয় হচ্ছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সারা বিশ্ব যে গতিতে এগুচ্ছে, বাংলাদেশের অগ্রগতি এক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশ এমনকি আশপাশের অনেক দেশের তুলনায় যথেষ্ট মন্থর ও ধীরগতি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়নে আই.সি.টি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহের অগ্রগতির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একমাত্র পাকিস্তান ব্যাতিত অন্য সকল দেশের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। অপর্যাপ্ত আই.সি.টি অবকাঠামো, উন্নত প্রশিক্ষণ ও মূলধন যোগানে পর্যাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠপোশকতার অভাবে দেশে আন্তর্জাতিক মানের আই.টি প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠা, দেশিয় প্রতিষ্ঠান সমূহে উৎপাদিত আই.টি পণ্য ও সেবার ধরণ ও মান অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকা, মানসন্মত প্রশিক্ষণের অভাবে এখাতে পর্যাপ্ত উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনবল তৈরি না হওয়া এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে অপর্যাপ্ত সরকারি উন্নয়ন বরাদ্ধ দেশের আই.সি.টি সেক্টরে মন্থরতার অন্যতম কারণ।

স্মারণী-৫.৭(২২) : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপে ২০১৯ সাল নাগাদ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় একনজরে বাংলাদেশ ও আশপাশের দেশসমূহের তুলনামূলক অবস্থান তুলেধরা হলো :-

Global Index	India	Myanmar	Thailand	Vietnam	Sri Lanka	Bhutan	Banglades
ICT Development Index 2017	134	-	78	108	117	121	147
E-govt. dev. Index 2020	100	146	57	86	85	103	119
Human Dev. Index 2019	129	145	77	118	71	134	135
Global Service Location Index 2019	1	-	7	5	25	-	32
ICT Service Export Ranking 2019	1	85	61	-	46	171	58
population using Internet by 2017 (%)	34.45	30.68	-	58.14	34.11	48.11	15.0

Source: World Bank, A.T Kearney and Other Sources.

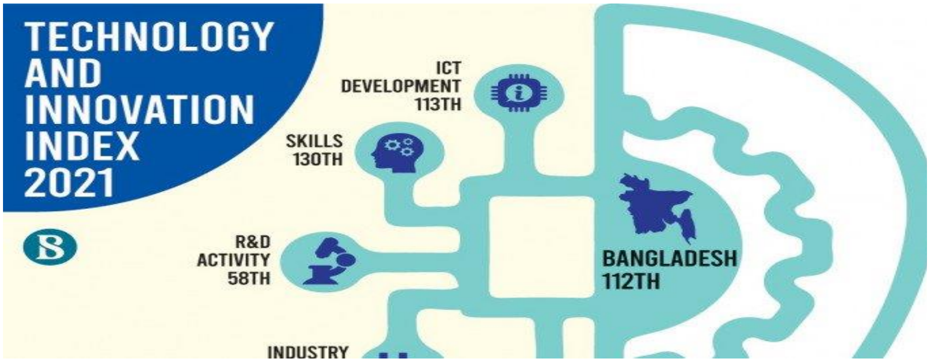

ঋ) আই.সি.টি সেক্টর উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

ICT-S
Information & Communication Technology Solutions

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি পূর্বক দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার অপূর্ব সুযোগ এখন বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে। উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এসুযোগ কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। দেশের বিশাল সংখ্যক যুব শক্তি, শস্তা শ্রম, অনুকুল কর্মপরিবেশ, ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ বাজার এবং ভৌগলিক ও আঞ্চলিক সুবিধা ইত্যাদি বহুবিধ কারেণে এদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে সম্ভাবনাময়। প্রয়োজন শুধু অপার এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকারের যথাযথ উদ্যোগ ও দূরদর্শী পরিকল্পণা। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক এবং এখাতের উন্নয়নে এরিমধ্যে দেশে আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভঃর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা, এখাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ ইত্যাদিক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে, এখন শুধু দ্রুত এগিয়ে যাবার চ্যালেঞ্জ। চিন্তার বিষয় হলো, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নে আশপাশের দেশ সমূহ যে গতিতে এগুচ্ছে, বাংলাদেশের অগ্রগতি এক্ষেত্রে সে তুলনায় অনেকটা ধীরগতি, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এদেশের অবস্থানকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশকে একটি আধুনিক আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে সরকারের চলমান কর্মকান্ড সমূহকে আরোও গতিশীল ও যুগোপযোগি করার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণা ও পরামর্শ এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমন্ময়ে দেশের আই.সি.টি সেক্টরের দ্রুত উন্নয়নে নিন্মোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশকরা হলো :-

আই.সি.টি সেক্টর উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

১. আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশসমূহের আলোকে দেশে আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
২. দেশব্যাপি উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি সংযোগ খরচ কমিয়ে আনা এবং গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে এ খরচ অর্ধেকে নামিয়ে আনার মাধ্যমে দেশের সকল স্তরের মানুষের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার সহজলভ্য করে তোলা।
৩. আই.সি.টি খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন আই.সি.টি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা জোরদার করা এবং প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণ দানকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মে নিয়োজিত হতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।
৪. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সরকারি পরিসেবার সকলক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
৫. জেলা শহর ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষিতদের জন্য আই.সি.টি ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে সমান সুযোগ সুবিধা ও মূলধন সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৬. শিক্ষা কারিকুলামে অষ্টমশ্রেণী থেকে আই.সি.টি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে আই.সি.টি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।

৭. দেশে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন আই.টি প্রফেশনাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে আই.টি সাবজেক্ট এ স্নাতক ও সানাতকোত্তর সমাপ্তকারিদের জন্য আই.সি.টি সমৃদ্ধ দেশ সমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জন্য সরকারি সুযোগ সুবিধা ও মূলধন সরবরাহ নিশ্চিত পূর্বক প্রশিক্ষিত কর্মে নিয়োজিত হতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।

৮. আই.সি.টি সেক্টরে পর্যাপ্ত কর্মপ্রবাহ ও ব্যবসা বানিজ্য দ্রুত বৃদ্ধিকল্পে এখাতে দেশি বিদেশি বিনেয়োগ আকর্ষণে ট্যাক্স ও ভ্যাট মওকুফ ও ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার পাশাপাশি আই.সি.টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে ক্যাশ ইনসেনটিভ ব্যবস্থা আরোও সম্প্রসারিত করা।

৯. পর্যাপ্ত সংখ্যক আই.টি ভিলেজ / সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ও আই.সি.টি ইনকিউবেটর স্থাপনপূর্বক দেশে আই.সি.টি ব্যবসার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ও এখাতে বিনিয়োগ আকর্ষণীয় করে তোলা।

১০. দেশে আন্তর্জাতিক মানের ডাটা সার্ভার / তথ্য সংরক্ষণাগার গড়ে তোলাপূর্বক ডাটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১১. ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সহজে দেশে আনতে পে-পল সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা।

১২. দেশে তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে আ.ই.সি.টি খাতে গবেষণার মাত্রা বৃদ্ধি করা এবং এ লক্ষ্যে জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করা।

১৩. **উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা গোষ্ঠী তৈরীর লক্ষ্যে দেশব্যাপি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানসন্মত "উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" চালুকরা এবং প্রশিক্ষণ দানকারি প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রশিক্ষিত ব্যাক্তিকে কারিগরি সহযোগিতা, ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত বিষয়ে ব্যবসা / আত্মকর্ম সংস্থানে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।

১৪. **ঝুকি ও অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় সরকারি সুযোগ ও সহযোগিতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা :** আই.টি সেক্টরে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা দেশে ও বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে মানসন্মত পণ্য ও সেবা উৎপাদন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি এখাতে উৎপাদিত সকল পণ্য ও সেবা রপ্তানির উপর উল্ল্যেখযোগ্যহারে নগদ প্রণোদনার পাশাপাশি নতুন স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে নুন্যতম ১০ বছরের ট্যাক্স ও ভ্যাট সুবিধা প্রদান করা যা এ শিল্পে বিনিয়োগের ঝুকি হ্রাস করার পাশাপাশি এখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

১৫. **সকল রপ্তানিমূখী IT / ITES শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন বাধ্যতামূলক করা :** রপ্তানিমূখী IT / ITES প্রতিষ্ঠান সমূহে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদন নিশ্চিত করতে সকল রপ্তানিমূখী IT / ITES প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন সহজিকরনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৬. **ব্যক্তিপর্যায়ে মূলধনের অপর্যাপ্ততা দূরীকরন :** স্বল্প আয়ের এ দেশে মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ সীমিত হওয়ার কারনে ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবসায়ে বড় আকারের মূলধন বিনিয়োগের ঝুকি নেওয়া সবক্ষেত্রেই কঠিন। ফলে নতুন শিল্প স্থাপন এবং স্থাপিত শিল্প পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই পঁজি স্বল্পতা এদেশের শিল্প সেক্টরে অন্যতম বড় সমস্যা, যা দেশে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প বিকাশে) যুগ যুগ ধরে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। দেশে আই.সি.টি শিল্পের দ্রুত বিকাশে এখাতে শহজ শর্তে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি মূলধন সরবরাহ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

১৭. **বিনিয়োগ ও ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সূত্রিতা হ্রাস করা :** দেশে শিল্প সেক্টরের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগ ও ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্র, সিদ্ধান্ত প্রদান, শিল্প প্লট বরাদ্ধ, পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করা সবচেয়ে জরুরি, বতমানে আমলাতানিত্রক জটিলতায় যা পুরোপুরি অনুপস্থিত। এ সমস্যা নিরসনে বাস্তব সন্মত উদ্যোগ দেশে শিল্প ও বানিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে বহু পুরানো সমস্যা দূরীভূত হওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে যথেষ্ট গতিশীলতা আসবে এটা নিশ্চিত।

****

SJHBD

অধ্যায় : ৫.৮

সেবাখাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।

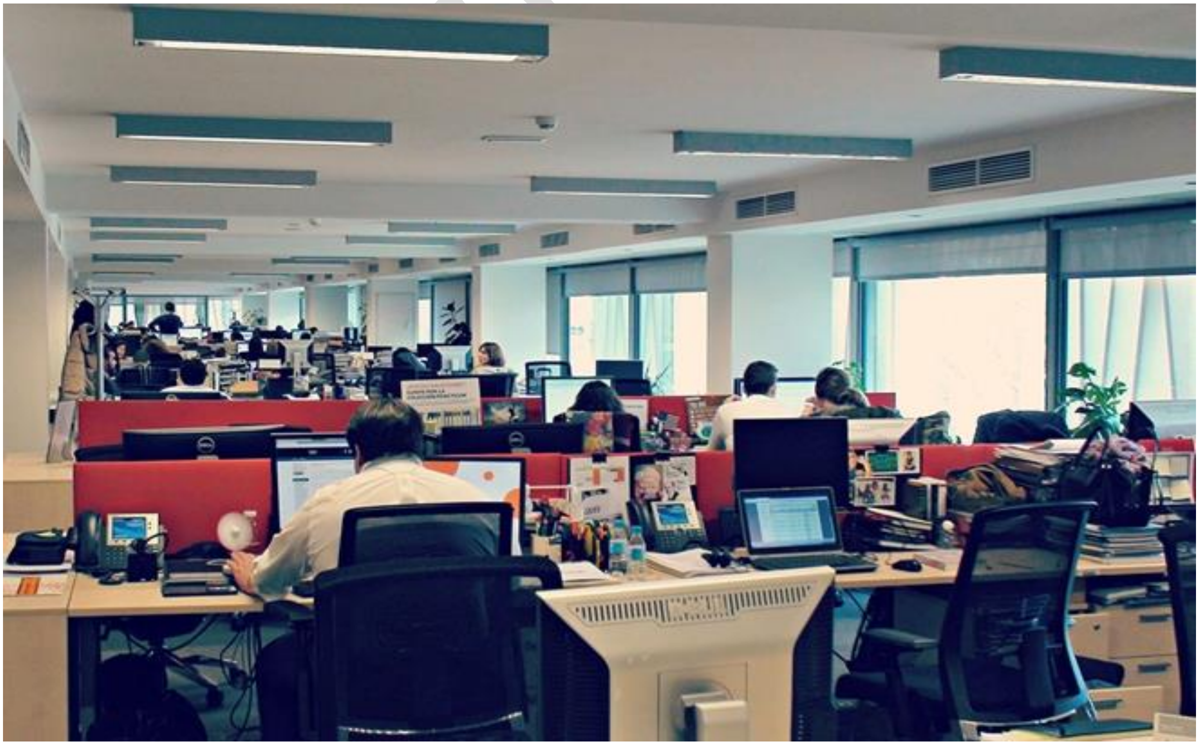

সেবাখাতের আধুনিকায়ন ও প্রসার।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বিশ্বব্যাপি সেবাখাতের উত্থান।
খ) বাংলাদেশের সেবাখাত।
   ১) সেবাখাতের আকার ও প্রসার।
   ২) জি.ডি.পেতে সেবাখাতের অবদান।
   ৩) সেবাখাতে সেবা-উপখাত সমূহের অংশ।
   ৪) সেবাখাতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
গ) প্রধান তিনটি সেক্টরে কর্মসংস্থান।
ঘ) আন্তর্জাতিক বানিজ্যে সেবাখাতের অংশগ্রহণ।
   ১) সেবাখাতে আমদানি ও রপ্তানি।
   ২) জি.ডি.পি অনুপাতে সেবা বানিজ্য।
ঙ) সেবাখাতে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ।
চ) সেবাখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

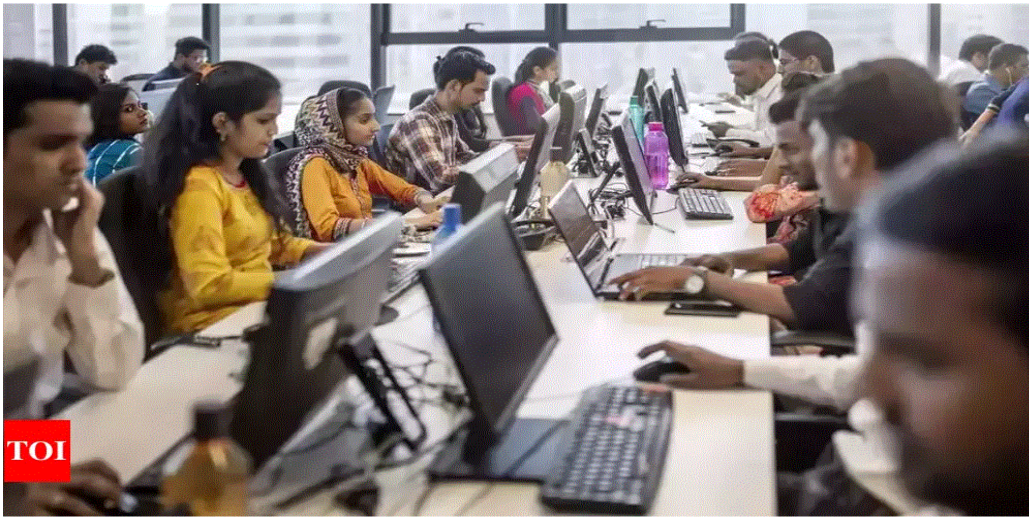

ক) বিশ্বব্যাপি সেবাখাতের উত্থান :

বিশ্বব্যাপি সেবাখাতের উত্থান :

বিশ্ববানিজ্য সংস্থার মতে "সাম্প্রতিক সময়ে সার্ভিস সেক্টর (মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি) বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে অর্থনীতির মেরুদন্ডে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার অন্যতম আকর্ষনীয় অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশেষকরে উন্নত দেশগুলো পণ্যের চেয়ে সেবা রপ্তানিতে অতিদ্রুত এগুচ্ছে এবং অনেকক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো এক্ষেত্রে উন্নত দেশ সমূহকে অতিক্রম করে গেছে। ফলে বিশ্ববানিজ্যে সেবাখাতের প্রবৃদ্ধি পণ্য রপ্তানির চেয়ে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। WTO Report 2019 অনুযায়ী ২০০৫ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক সেবা রপ্তানিতে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের অংশগ্রহণ ১০% এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে সেবাখাতে মোট রপ্তানির ২৫% এবং মোট আমদানির ৩৪.৪% এর অংশীদার উন্নয়নশীল দেশ সমূহ। ২০০৫-২০১৭ সময়কালে আন্তর্জাতিক বানিজ্যে সার্ভিস ট্রেড় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক ৫.৪% হলেও এ সময়ে পণ্য বানিজ্যের ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬%। ২০১৮ সালে বিশ্বে সেবা আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ইউ.এস.ডলার ৫,৪৮৪ বিলিয়ন ও ৫,৭৭১ বিলিয়ন, যা ঐ বছরে সম্পাদিত মোট আন্তর্জাতিক বানিজ্যের প্রায় ২৪.৫৮%।

প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে সেবাখাতের কার্যক্রমের পরিধি আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে সেবাখাতের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালি হয়ে উঠছে। দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সেবাখাতের অংশগ্রহণ, সেবারপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রাখার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবাখাত অতিমাত্রায় কার্যকরি হওয়ার কারণে বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপি সেবাখাতের অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) সার্ভে ২০১৬ অনুযায়ী বিশ্বে মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ এবং বিশ্বব্যাপি মোট কর্মসংস্থানের 88% সার্ভিস সেক্টরের অবদান এবং WTO Report 2019 অনুযায়ী ২০১৭ সালে সারা বিশ্বে সার্ভিস ট্রেড় এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ১৩.৩ ট্রিলিয়ন।

প্রযুক্তিই সেবাখাতকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফল করে তুলেছে এবং বিশ্ববানিজ্যে সেবাখাতের দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। ২০১৭ সালে বিশ্ব বানিজ্যে বিভিন্ন পন্থায় সেবা রপ্তানি এবং বিশ্বব্যাপি সেবা রপ্তানির বাজার বৃদ্ধির চিত্র নিন্মে তুলেধরা হলো :-

স্মারণী-৫.৮(১) : মুড অব সাপ্লাই অনুযায়ী ২০১৭ সালে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক বানিজ্যে বিশ্বব্যাপি সেবাখাতের অংশগ্রহনের হার (%) :-

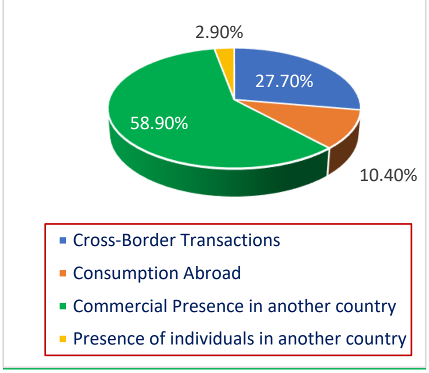

Source: WTO Report, 2019

স্মারণী-৫.৮(২) : ২০০০-২০১৯ সময়কালে বিশ্বব্যাপি সেবা রপ্তানির বাজার বৃদ্ধির চিত্র (Billion US$) :-

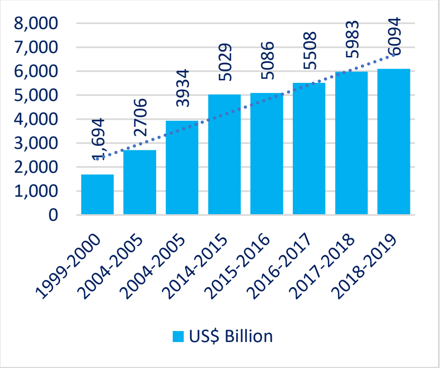

Source : World Bank Data

স্মারণী-৫.৮(৩) : ২০১৭ সালে সংঘটিত বিশ্ব বানিজ্যে সেবা উপখাত সমূহের অংশগ্রহনের হার (%) :-

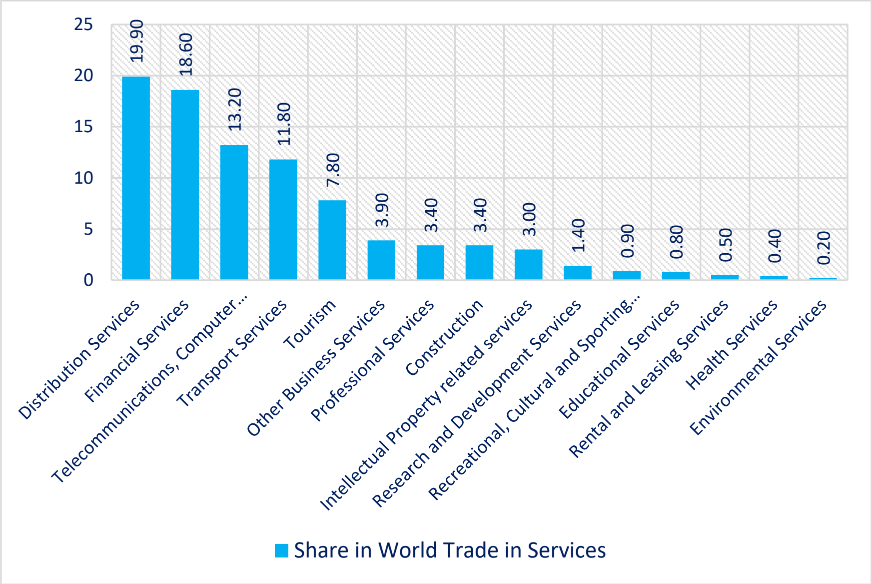

Source : WTO Report 2019

খ) বাংলাদেশের সেবাখাত :

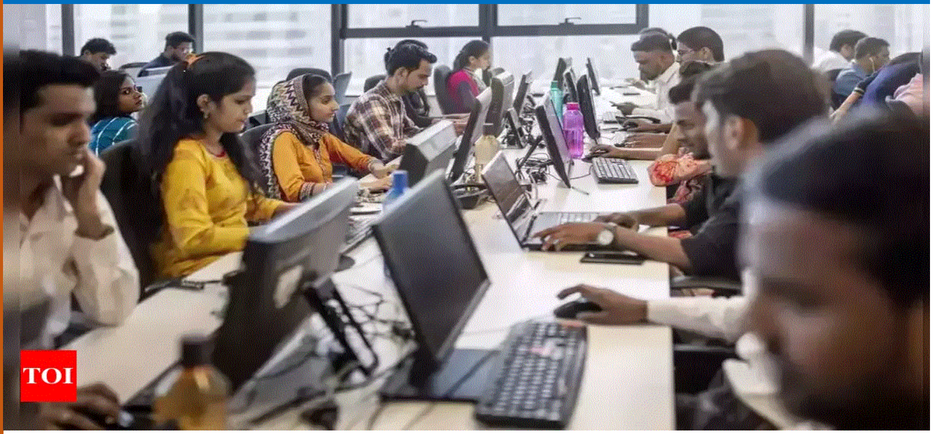

১) দেশের সেবাখাতের আওতা :

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত- এগ্রিকালচার, ইন্ডাষ্ট্রি এবং সার্ভিস সেক্টর। দেশের অর্থনীতির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সার্ভিস সেক্টর। ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত জি.ডি.পিতে সার্ভিস সেক্টরের অবদান গড়ে ৫০ শতাংশের নীচে থাকলেও ২০০০ পরবর্তী সময়ে দেশে প্রাইভেট সেক্টরে অগ্রগতির ফলে এ সময়ে সার্ভিস সেক্টরের আকার ও প্রসার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশে ব্যবসা বানিজ্য ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ফলে ২০১৯ সাল নাগাদ জি.ডি.পিতে সার্ভিস সেক্টরের অংশ দাঁড়িয়েছে ৫১.২৬% এবং এ সময়কালে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪০ শতাংশই সার্ভিস সেক্টরে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির দ্রুত

বিকাশের পক্ষে সার্ভিস সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে সার্ভিস সেক্টর মূখ্য ভূমিক্ পালন করে। বিগত তিন দশক সময়কালে জি.ডি.পিতে তিনটি প্রধান সেক্টরের (এগ্রিকালচার, ইন্ডাষ্ট্রি এবং সার্ভিস) অংশগ্রহনের চিত্র [স্মারণী-৫.৮(৪)] এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো।

দেশের সেবাখাতের আওতা :

সার্ভিস সেক্টরের আওতাভূক্ত খাত সমূহের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে- নির্মাণ, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট, ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশনস্, ব্যাংক, রিয়েল এষ্টেট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, মিডিয়া, সামাজিক কাজ, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পানি সরবরাহ ইত্যাদি।

স্মারণী-৫.৮(৪) : অর্থবছর ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পিতে প্রধান তিনটি সেক্টরের অবদানের চিত্র :-

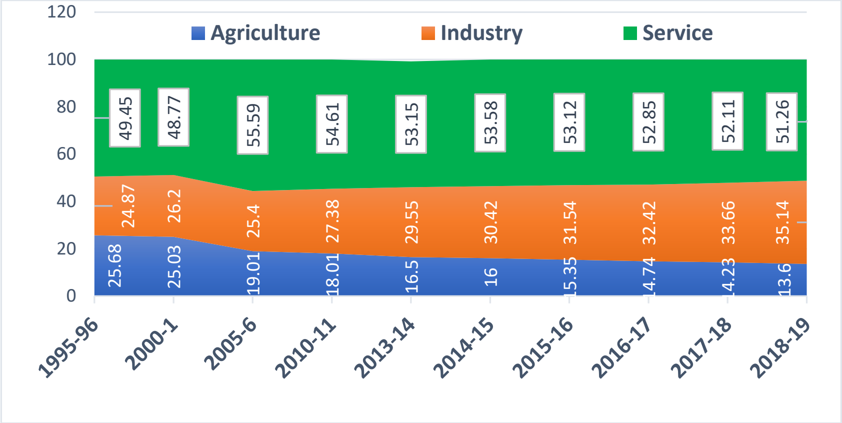

Source: BD Economic Review 2019

২) সেবাখাতের আকার ও প্রসার :

সেবাখাতের আকার ও প্রসার :

বাংলাদেশের অর্থনীতি যে তিনটি প্রধান খাতে বিভক্ত- এগ্রিকালচার, ইন্ডাষ্ট্রি ও সার্ভিস, বিগত কয়েক দশক সময় ব্যাপিয়া জি.ডি.পির প্রায় অর্ধেকের বেশি সার্ভিস সেক্টরের অবদান। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবাখাতের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে সেবাখাতের দ্রুত বিস্তার ঘটছে। তবে, দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সেবাখাতের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে সেবাখাতের প্রসার ও সেবা রপ্তানিতে অনেকটা অগ্রগতি অর্জন করেছে, যদিও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় তা যথেষ্ট অপ্রতুল। অর্থবছর ২০১৯-২০ নাগাদ দেশের সেবাখাতের আকার দাঁড়িয়েছে টাকা ১৮,৪১৮ বিলিয়ন, অর্থবছর ২০০০-০১ সময়কালে যা ছিল টাকা ১,৫০৩ বিলিয়ন এবং বিগত দুই দশক সময়কালে সেবাখাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৫.৫০ শতাংশ থেকে ৬.৫০ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে স্মারণী-৫.৮(৫) ।

স্মারণী-৫.৮(৫) : অর্থবছর ২০০০-০১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে সেবাখাতের আকার ও প্রসারের চিত্র :-

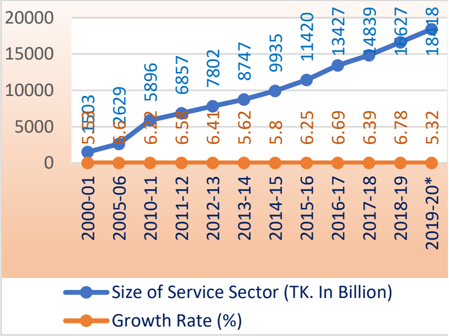

Source: BD Economic review * Provisional

জি.ডি.পেতে সেবাখাতের অবদান :

৩) জি.ডি.পেতে সেবাখাতের অবদান :

বিগত তিন দশকে দেশের জি.ডি.পিতে সার্ভিস সেক্টরের অংশগ্রহণ না কমলেও তেমন বৃদ্ধিও পায়নি। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে সার্ভিস সেক্টরের অংশগ্রহণ ছিল ৪৯.৪৫% এবং সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে সার্ভিস সেক্টরের অংশগ্রহণ ৫১.২৬% এবং এ সময়কালে সেবা উপখাত সমূহের দু-একটিতে সামান্য অগ্রগতি হলেও, অন্যান্য সেবা উপখাত সমূহ কমবেশি পিছিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে গেছে **"কমিউনিটি, সোস্যাল এন্ড পার্সোনাল সার্ভিস"**, ২০০৫-৬ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে এখাতের অংশগ্রহনের হার ১২.৩৭ শতাংশ থাকলেও, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৮.১৬ শতাংশে। পিছিয়ে যাওয়ার দিকখেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে রিয়েলস্টেট ও স্বাস্থ্যসেবা। ২০০৫-৬ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে রিয়েলস্টেট সার্ভিসের অংশ ছিল ১২.৩৭ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা দাঁড়িয়েছে ৬.১৩ শতাংশে এবং ২০০৫-৬ অর্থবছরে জি.ডি.পিতে স্বাস্থ্যসেবার হার ২.০৩ শতাংশ থাকলেও, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে ১.৮৫ শতাংশে।

স্মারণী-৫.৮(৬) : ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পি তে সেবা উপখাত সমূহের অংশগ্রহণের হার (%) :-

Service Sub-sectors	Financial Year					
	2005-6	2010-11	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Wholesale & Retail	13.61	14.02	13.99	14.01	13.95	13.88
Transport & Communication	10.16	11.23	11.31	11.26	11.13	10.98
Community, Social and Personal	12.37	10.72	9.18	8.86	8.52	8.16
Real Estate Services	8.29	7.41	6.64	6.49	6.31	6.13
Public Administration and Defence	3.08	3.33	3.63	3.70	3.71	3.65
Financial & Insurance Services	3.11	2.99	3.39	3.45	3.45	3.45
Education	2.18	2.21	2.39	2.48	2.46	2.42
Health and Social Works	2.03	1.95	1.84	1.85	1.83	1.85
Hotel & Restaurant	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74
Total Service Sector Share in GDP	55.59	54.61	53.12	52.85	52.11	51.26
Share of Agriculture Sector	19.01	18.01	15.35	14.74	14.23	13.61
Share of Industrial Sector	25.40	27.38	31.54	32.42	33.66	35.14
Total Share in GDP (%)	100	100	100	100	100	100

Source : MOF

SJFBD

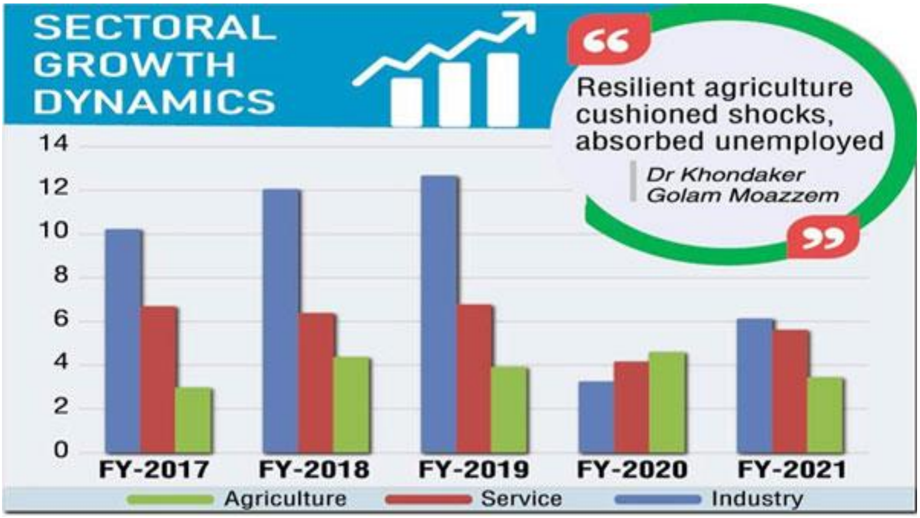

সেবাখাতে সেবা-উপখাত সমূহের অংশ :

৪) সেবাখাতে সেবা-উপখাত সমূহের অংশ (%) :

আভ্যন্তরীণ পলিসি অনুযায়ী দেশের সেবাখাত যে সমস্ত উপখাতে বিভক্ত, তন্মধ্যে আকারের দিক থেকে সেবা উপখাত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় " হোল সেল এন্ড রি-টেল ২৭%" , এক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে- ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশনস্ ২১% , কমিউনিটি, সোস্যাল এন্ড পার্সোনাল সার্ভিস ১৬% এবং রিয়েলস্টেট ১২%।

স্মারণী-৫.৮(৭) : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জি.ডি.পির অংশ অনুযায়ী সেবাখাতে সেবা-উপখাত সমূহের অংশ (%) :-

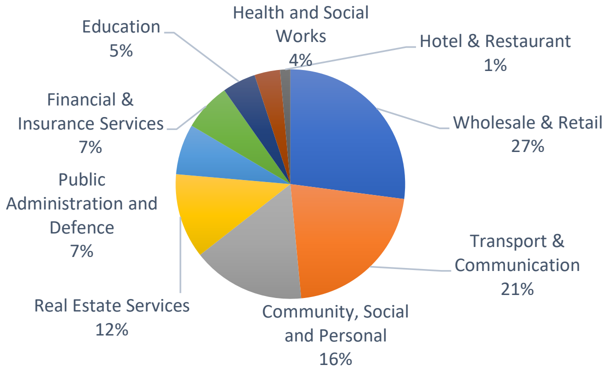

Source : BD Economic Review 2019

সেবাখাতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

৫) সেবাখাতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বিগত দশকে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের জি.ডি.পির আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্ভিস সেক্টরের উল্ল্যেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। ফলে ঐ সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডে সেবাখাতের অংশগ্রহণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে উল্ল্যেখযোগ্য হারে, যদিও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর ব্যাত্যয় ঘটেছে পুরোপুরি। ২০১০-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশের জি.ডি.পির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৭.৬৪%, কিন্তু এ সময়কালে জি.ডি.পিতে সার্ভিস সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং হ্রাস পেয়েছে। অথচ এ সময়কালে জি.ডি.পির আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি জি.ডি.পিতে সার্ভিস সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতে ৪.১%, ইন্দোনেশিয়ায় ২.৭%, থাইল্যান্ডে ৭.৪%, কম্বোডিয়ায় ৪.২%, মালয়েশিয়ায় ৪.৫%, ভিয়েতনামে ৪.২%, মিয়ানমারে ৬.৫% এবং বাংলাদেশে বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে ০.৫%।

স্মারণী-৫.৮(৮) : ২০১০-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের জি.ডি.পি আকার ও সেবাখাতের তুলনামূলক প্রসারের চিত্র :-

Country	GDP in Billion USD			Service, Value added % of GDP		
	2010	2018	Increased %	2010	2018	Increased %
India	1,676.0	2,719.	62.23	45.0	49.1	+ 4.1
Indonesia	755.1	1,042.	38.02	40.7	43.4	+ 2.7
Thailand	341.1	505.0	48.05	49.5	56.9	+ 7.4
Combodia	286.0	331.0	15.73	53.5	57.7	+ 4.2
Malaysia	255.0	359.0	40.78	48.5	53.0	+ 4.5
Vietnam	115.9	245.2	111.56	36.9	41.1	+ 4.2
Myanmar	49.5	71.2	43.84	36.7	43.2	+ 6.5
Bangladesh	115.3	274.0	137.64	53.5	53.0	- 0.5

Source : World Bank Data

গ) প্রধান তিনটি সেক্টরে কর্মসংস্থান :

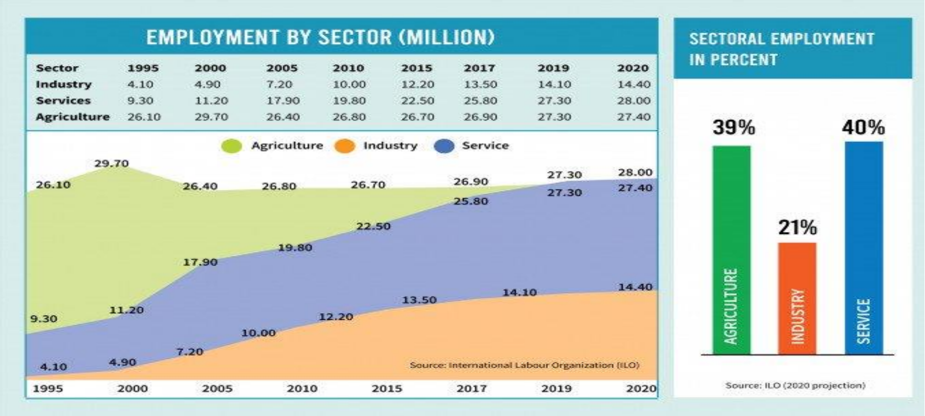

Sector	1995	2000	2005	2010	2015	2017	2019	2020
Industry	4.10	4.90	7.20	10.00	12.20	13.50	14.10	14.40
Services	9.30	11.20	17.90	19.80	22.50	25.80	27.30	28.00
Agriculture	26.10	29.70	26.40	26.80	26.70	26.90	27.30	27.40

প্রধান তিনটি সেক্টরে কর্মসংস্থান :

১) সামগ্রিক কর্মসংস্থান :

সময়ের আবর্তন ও চাহিদায় বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে অর্থনৈতিক ট্রানাসফরমেশন ঘটছে প্রতিনিয়ত, বাংলাদেশও এ নিয়মের বাইরে নয়। ২০০০ সালের পর থেকে দেশে শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের আকার বৃদ্ধির ফলে কৃষি সেক্টর থেকে শ্রমসংখ্যা হ্রাস পেয়ে এ দুই সেক্টরে শ্রমসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। LFS : 1999-2000 অনুযায়ী দেশের মোট কর্মসংস্থানের ১৩.০৮% শিল্প সেক্টরে, ৩৬.১৫% সার্ভিস সেক্টরে এবং ৫০.৭৭% কৃষি সেক্টরে। সর্বশেষ LFS : 2016-17 অনুযায়ী দেশে কর্মরত শ্রমসংখ্যা ৬০.৮২ মিলিয়ন, যারমধ্যে কৃষিখাতে কর্মরত ২৪.৬৯ মিলিয়ন (৪০.৬%), শিল্পসেক্টরে কর্মরত ১২.৪২ মিলিয়ন (২০.৪%) এবং সেবাখাতে কর্মরত ২৩.৭১ মিলিয়ন (৩৯%)।

সারণী-৫.৮(৯) : ২০০০-২০১৭ সময়কালে দেশের তিনটি প্রধান সেক্টরে কর্মসংস্থানের চিত্র :-

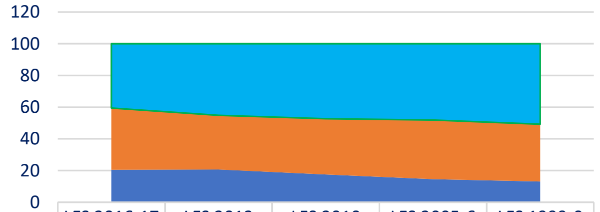

	LFS 2016-17	LFS 2013	LFS 2010	LFS 2005-6	LFS 1999-0
Employment in Agriculture	40.6	45.1	47.33	48.1	50.77
Employment in Service Sector	39	34.2	35.18	37.35	36.15
Employment in Industry	20.4	20.7	17.49	14.55	13.08

Source : MOF

২) সেবাখাতে কর্মসংস্থান :

LFS-2010 সময়কালে সেবাখাতে কর্মরত শ্রমসংখ্যা ছিল মোট কর্মসংস্থানের ৩৫%, LFS-2013 সময়কালে ছিল ৩৪% এবং LFS: 2016-17 সময়কালে যা দাঁড়িয়েছে ৩৯%। সেবা উপখাত সমূহের মধ্যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে "হোলসেল এন্ড রিটেইল ট্রেড", ২০১৬-১৭ সময়কালে যা ছিল মোট কর্মসংস্থানের ৩৬.৪%। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে "ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড স্টোরেজ" ২২.০৫% এবং এডুকেশন রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে ৯.২৩%।

সেবাখাতে কর্মসংস্থান :

স্মারণী-৫.৮(১০) : LFS: 2016-17 সময়কালে সেবা উপখাত সমূহে কর্মরত শ্রমসংখ্যা এবং ২০১০-২০১৮ সময়কালে সেবাখাতে কর্মসংস্থান হ্রাস বৃদ্ধির চিত্র :-

Major Services	LFS: 2016-17		Share in Total Employment (%)		
	No. of Employment '000'	Share in Service Sector (%)	LFS: 2016	LFS: 2013	LFS 2010
Wholesale and retail trade	8,638	36.4	14.2	13.0	13.97
Transportation and storage	5,231	22.05	8.6	6.4	7.36
Accommodation and food service	1,156	4.87	1.9	1.5	1.54
Information and communication	182	.77	0.3	0.2	0.10
Financial and insurance activities	426	1.80	0.7	0.8	0.67
Real estate activities	122	.51	0.2	0.1	0.06
Professional, scientific and technical	243	1.02	0.4	0.6	0.21
Administrative and support service	365	1.54	0.6	0.7	0.90
Public administration and defense	973	4.10	1.6	1.3	1.00
Education	2,190	9.23	3.6	3.2	2.38
Human health and social work	487	2.05	0.8	1.3	0.80
Arts, entertainment and recreation	61	.26	0.1	0.1	0.12
Other service activities	2,433	10.26	4.0	2.8	4.02
Activities of households as employer	1,217	5.13	2.0	2.0	1.87
Employment in Service Sector:	**23,724**	**100**	**39.0**	**34.0**	**35.0**
Total Employment :	**60,828**	**100**	**100**	**100**	**100**

Source : BBS LFS 2010, 2013 and 2016

SFBD

ঘ) আন্তর্জাতিক বানিজ্যে সেবাখাতের অংশগ্রহণ :

১) সেবাখাতে আমদানি ও রপ্তানি :

বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় অংশ জুড়ে যেহেতু সেবাখাতের অবস্থান, সেহেতু সেবা আমদানি ও রপ্তানি দেশের সামগ্রিক বানিজ্যের উপর বড় আকারের প্রভাব বিস্তার করে। সেবাখাতের উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক, যা দেশীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র সমূহকে একীভূত করনের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। শুধুমাত্র পণ্য রপ্তানির উপর নির্ভরশীল হয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিকরা অন্তত প্রযুক্তির এ যুগে রীতিমত অসম্ভব। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাইতো প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেবাখাতের প্রসার ঘটিয়ে সেবাখাতকে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিংহভাগই সেবাখাতের অন্তর্গত। দেশের সেবাখাতে পর্যাপ্ত প্রসার ও উন্নয়ন না হওয়ায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিংহভাগ কাজ অদ্যাবধি হয় নিজের টাকায় নয়তো ঋণের টাকায় সেবা আমদানির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে ইউ.এস.ডলার ২,৯৮১ মিলিয়ন সেবা রপ্তানির বিপরীতে সেবা আমদানি ছিল ইউ.এস.ডলার ১০,৪৩৭ মিলিয়ন, সেবা রপ্তানির তুলনায় যা ২৫০.৩৪% বেশি। অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে সেবাখাতে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ৬৪৮.৪০ মিলিয়ন, অথচ এ সময়ে সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ২৭০.৮০ মিলিয়ন [স্মারণী-৫.৮(১১)] ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল

সেবাখাতে আমদানি ও রপ্তানি :

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই, যেমন- ভারত, থাইল্যান্ড, কম্বোড়িয়া ও মিয়ানমার সেবা রপ্তানিতে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে। যে সমস্ত দেশের সেবা রপ্তানির তুলনায় আমদানি কিছুটা বেশি, সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশ খুবই বাজে অবস্থানে রয়েছে, যেমন- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেবা রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি দ. কোরিয়ায় ২৯.৪৭%, মালয়েশিয়ায় ১০%, ইন্দোনেশিয়ায় ২৯.৬৩%, ভিয়েতনামে ২০% আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা ২৫০.৩৪% [স্মারণী-৫.৮(১২)] ।

দেশে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে হয় নিজেদের সেবাখাতের প্রসার ঘটাতে হবে, নয়তো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে সেবা আমদানির মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে, যা কোনো দেশের উন্নয়নের পক্ষে ইতিবাচক দিক হতে পারে না। কাজেই, দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা আমদানি হ্রাস করতে এবং রপ্তানিখাতের দ্রুত প্রসার ও রপ্তানি বহুমূখী করনের লক্ষ্যে সেবাখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন নিশ্চিতপূর্বক সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবাখাতের অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধিকরা করা অত্যন্ত বাস্তবসন্মত ও জরুরি।

স্মারণী-৫.৮(১১) : ২০১৪-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশের সেবা আমদানি ও রপ্তানির চিত্র :-

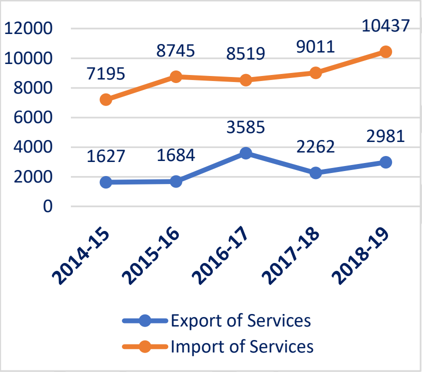

Source : Nordeatrade.com

স্মারণী-৫.৮(১২) : ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের সেবা বানিজ্যের চিত্র :-

Country	Trade in Commercial Services in 2018		
	Export (Billion USD)	Import (Billion USD)	Import Higher / Lower than Export %
India	204	175	+ 14.22
S. Korea	95	123	- 29.47
Thailand	84	55	+ 34.52
Malaysia	40	44	10.00
Indonesia	27	35	- 29.63
Vietnam	15	18	- 20.00
Combodia	5.25	2.98	+ 43.24
Myanmar	5.08	3.87	+ 23.82
Bangladesh	2.98	10.44	- 250.34

Source : World Trade Statistics 2019

জি.ডি.পি অনুপাতে সেবা বানিজ্য :

২) জি.ডি.পি অনুপাতে সেবা বানিজ্য :

বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপি সেবাখাতের অভাবনীয় উত্থানের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেবাখাতের আকার ও আয়তন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা কাজে লাগিয়ে সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিপূর্বক দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার প্রবণতাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে ও দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নশীল দেশ সমূহের তুলনায় এমনকি স্বল্পোন্নত অনেক দেশের তুলনায় একদমই পিছনে পড়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে জি.ডি.পি অনুপাতে সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশ ১%, মিয়ানমার ৭.৪%, কম্বোডিয়া ২১.৪%, ইথিওপিয়া ৫.৬%, নেপাল ৬.২%, আফগানিস্তান ৩.৮% এবং ভূটান ৭%। স্মারণী-৫.৮(১৩)

স্মারণী-৫.৮(১৩) : ২০১৮ সালে জি.ডি.পি অনুপাতে বাংলাদেশ ও স্বল্পোন্নত কয়েকটি দেশের পণ্য ও সেবা রপ্তানির চিত্র :-

Country	GDP in 2018 (Million USD)	Export Ration to GDP		
		Goods %	Service %	Total % to GDP
Bangladesh	287,630	13.5	1.0	14.5
Myanmar	68,559	17.1	7.4	24.5
Combodia	24,529	52.9	21.4	74.3
Ethiopia	80,279	3.4	5.6	9.0
Nepal	28,812	4.0	6.2	10.2
Afganistan	19,585	18.6	3.8	22.4
Bhutan	2,627	22.7	7.0	29.7

Source : World Trade Statistics 2019

ঙ) সেবাখাতে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ :

সেবাখাতে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ :

সম্ভাবনাময় হওয়ার কারনে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের দিকথেকে সার্ভিস সেক্টর অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। বিগত দশকে দেশে আসা বিদেশি বিনিয়োগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এসেছে সার্ভিস সেক্টরে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে বিভিন্ন সেক্টরে মোট বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ইউ.এস.ডলার ১৭,৯৪৬.৫৩ মিলিয়ন, গড়ে যা বছরে ১,৯৯৪.০৬ মিলিয়ন, যারমধ্যে সেবাখাতে বিনিয়োগ ইউ.এস.ডলার ৬,৬৪৬.৫৯ মিলিয়ন , গড়ে বছরে ৭৩৮.৫১ মিলিয়ন (৩৭.০৪%) স্মারণী-৫.৮(১৪) ।

স্মারণী-৫.৮(১৪) : ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে সেবাখাতে বিদেশি বিনিয়োগের চিত্র :-

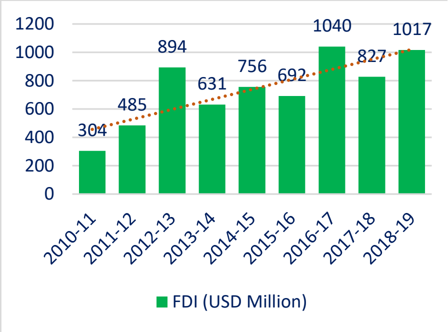

Source: FDI Survey 2019 by BB

স্মারণী-৫.৮(১৫) : বিগত দশকে দেশে সেক্টর অনুযায়ী বিদেশি বিনিয়োগের (FDI) চিত্র :-

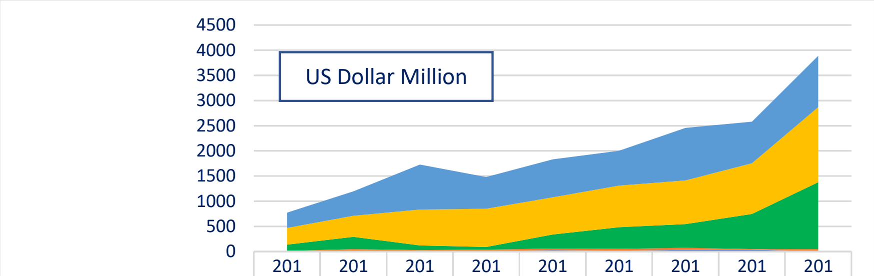

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Service Sector	303.97	485.43	894.23	630.87	756.25	691.58	1039.8	827.01	1017.5
Manufacturing Sector	330.25	414.98	712.88	757.47	737.54	825.85	869.43	1005.7	1493.8
Power, Gas & Petroleum	127.19	244.94	93.67	50.43	279.98	430.16	467.93	696.56	1328.7
Agriculture & Fisheries	11.53	49.5	29.72	28.99	29.22	36.57	43.26	14.5	39.19
Other Sector	0	0	0	12.58	30.88	19.1	34.43	36.81	9.9

Source: FDI Survey 2019 by BB

চ) সেবাখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে সেবাখাত বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় আকারের স্থান দখল করে নিয়েছে। UNCTAD সার্ভে ২০১৬ অনুযায়ী বিশ্বে মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ এবং বিশ্বব্যাপি মোট কর্মসংস্থানের ৪৪% সার্ভিস সেক্টরের অবদান এবং WTO Report 2019 অনুযায়ী ২০১৭ সালে সারা বিশ্বে সার্ভিস ট্রেড় এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ১৩.৩ ট্রিলিয়ন, প্রতিবছর যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এটা এখন পরিষ্কার যে আগামীতে সেবাখাতই বিশ্ব অর্থনীতির নেতৃত্ব দেবে। আশার কথা হচ্ছে, বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সেবাখাতের প্রসার ও উর্ধ্বমূখীতা অব্যাহত রয়েছে। অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পিতে সেবাখাতের অবদান গড়ে প্রায় ৫৩% এর উপরে এবং এ সময়ে সেবাখাতে প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬% এর উপরে রয়েছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ সেবাখাতে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৭৮% [স্মারণী-৫.৮(৫)]।

সেবাখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছাতে দেশে ব্যবসা বানিজ্যের গতিপ্রবাহ ও শ্রমসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধিপূর্বক সর্বস্তরে জীবনমান উন্নয়ন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে দেশের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে সেবাখাতের মানসন্মত প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলক্ষ্যে সকল সেবা উপখাত সমূহের সমান প্রসার ও উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। LFS: 2016-17 অনুযায়ী ঐ সময়ে দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৩৯% সেবাখাতে, যারমধ্যে হোলসেল এন্ড রিটেইল ট্রেড সেক্টরে ৩৬.৪%, ট্রান্সপোর্টেশনে ২২.০৫%, শিক্ষায় ৯.২৩% এবং অন্যান্য সব উপখাত মিলিয়ে ৩২.৩২% [স্মারণী-৫.৮(১০)]। অর্থাৎ বিগত বছরগুলোতে সেবাখাতের নির্দিষ্ট কয়েকটি উপখাতের প্রসার ঘটলেও সেবাখাতের আওতাভূক্ত বেশিরভাগ উপখাত সমূহের প্রসার ও উন্নয়ন তেমন ঘটেনি বলা চলে, দেশের সেবাখাত প্রসারের ক্ষেত্রে যা মোটেও শুভলক্ষণ নয়।

কাজেই দেশে সেবাখাতের পর্যাপ্ত প্রসার এবং এখাতের মানসন্মত উন্নয়নে সেবাখাতের আওতাভূক্ত সকল উপখাত সমূহের সমান প্রসার ও উন্নয়ন অপরিহার্য, যারমধ্যে রয়েছে - নির্মাণ, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট, ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশনস্, ব্যাংক, রিয়েল এষ্টেট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, মিডিয়া, সামাজিক কাজ, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পানি সরবরাহ ইত্যাদি। সকল সেবা উপখাত সমূহের সমান প্রসার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি হচ্ছে :-

১) সেবাখাতের প্রসার ও উন্নয়নে কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
২) সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন।
৩) ব্যাক্তিখাতে সেবা সেক্টরের প্রসারে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
৪) সেবাখাতে ঋণপ্রবাহ পর্যাপ্ত বৃদ্ধিকরা।
৫) সেবাখাতে সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরন।
৬) এখাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা।
৭) কারিগরি শিক্ষার হার বৃদ্ধিপূর্বক সেবাখাতে প্রশিক্ষিত জনবলের যোগান বৃদ্ধিকরা।
৮) এখাতের প্রসার ও উন্নয়নে গবেষণার মাত্রা বৃদ্ধিকরা।
৯) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, আই.টি ইত্যাদি খাতের দ্রুত উন্নয়নে অন্যান্য দেশের সাথে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় এবং যৌথ উদ্যোগে কাজ করা।
১০) সেবাখাতে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাস্তবসন্মত উদ্যোগ গ্রহণ।
১১) দেশে নিরাপদ বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং ব্যবসা আরম্ভের ক্ষেত্রসমূহ সহজ করা।
১২) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন, দুর্ণীতি দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৫.৯

রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন।

রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন।

খ) বানিজ্য উন্নয়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা।
   ১) ব্যবসা সহজিকরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান।
   ২) গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতার বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান।
   ৩) লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবস্থান।

গ) বাংলাদেশের রপ্তানি বানিজ্য।
   ১) বাংলাদেশে রপ্তানি বানিজ্যের ক্রমঃবিকাশ।
   ২) দেশের রপ্তানি বানিজ্যের সামগ্রিক চিত্র।
   ৩) রপ্তানি বাজারের আওতা ও পরিসর।
   ৪) বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি।
   ৫) রপ্তানি অংশীদার দেশ সমূহের বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের হার।

ঘ) খাতওয়ারি রপ্তানি এবং জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানি।
   ১) খাতওয়ারী রপ্তানি।
   ২) মোট রপ্তানিতে খাতভিত্তিক রপ্তানির অংশ।
   ৩) জি.ডি.পি অনুপাতে বাৎসরিক রপ্তানি।
   ৪) মোট রপ্তানি ও জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান।
   ৫) বিশ্ব রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ।

ঙ) আমদানি বানিজ্য।
   ১. বাংলাদেশের আমদানি বানিজ্য।
   ২. সেক্টরভিত্তিক আমদানির চিত্র।
   ৩. জি.ডি.পি অনুপাতে আমদানি।
   ৪. বার্ষিক আমদানি প্রবৃদ্ধি।

চ) বানিজ্য ভারসাম্য।

ছ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আওতায় চলমান বানিজ্য।
   ১. ইউরোপের দেশ সমূহের সাথে বানিজ্য।
   ২. আমেরিকার সাথে বানিজ্য।

জ) আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় চলমান বানিজ্য।

ঝ) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সামগ্রিক বানিজ্য।

ঞ) রপ্তানিখাতে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ।

চ) রপ্তানিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

ক) রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন :

রপ্তানি বানিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন :

কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে রপ্তানিখাত মূখ্য ভূমিকা পালন করে। দেশে রপ্তানিমূখী শিল্পের আধিক্য একদিকে যেমন পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, অন্যদিকে রপ্তানি বৃদ্ধিপূর্বক দেশের অর্থনীতি মজবুত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজ দেশের শক্ত অবস্থান তৈরি করে, বর্তমান উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার বিশ্বে যা অপরিহার্য। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রপ্তানিমূখী শিল্পের প্রসার ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, এখাতে দক্ষ জনবল নিয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, রপ্তানিখাত বহুমূখীকরন এবং বিশ্বব্যাপি রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ।

দেশের রপ্তানিখাতের সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাকের নেতৃত্বে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ইউ.এস.ডলার ১৬,২০৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৪০,৫৩৫ মিলিয়ন। এ সময়কালে দেশের মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, ফলে রপ্তানিতে একক পণ্যের আধিপত্যে রপ্তানিখাত কোনঠাসা হয়ে পড়েছে, টেকসই রপ্তানিখাত গড়েতোলার পক্ষে যা মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ। অন্যদিকে, বিগত সময়গুলোতে ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদার অনুপাতে শিল্পসেক্টরের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে আমদানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ফলে বানিজ্য ঘাটতি প্রতিবছর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসে যা দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ১৮,২৫৮ মিলিয়ন, যা ঐ অর্থবছরে সম্পাদিত মোট বৈদেশিক বানিজ্যের ২০.১৪%।

২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে রপ্তানিখাতের উন্নয়নে সরকার ইতিমধ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ প্রণয়ন করেছেন, যাতে ২০২১ সাল নাগাদ রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ইউ.এস.ডলার ৬০ বিলিয়ন, যার মধ্যে তৈরি পোশাক বপ্তানি বাবদ ৫০ বিলিয়ন এবং অন্যান্য পণ্য ১০ বিলিয়ন।

SJFBD

খ) বানিজ্য উন্নয়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা :

১) ব্যবসা সহজিকরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান :

বানিজ্য উন্নয়ন সক্ষমতার দিকথেকে বাংলাদেশের অগ্রগতি মোটেও সন্তোসজনক নয়। দ্রুত ও সহজে ব্যবসা শুরু করা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশসমূহের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ব্যবসা বানিজ্যের সহজ পরিচালন ও অনুকুল বিনিয়োগ পরিবেশের উপর দেশে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার নির্ভরশীল। ব্যবসা সহজীকরনের ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে ১৯০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭০তম, পরবর্তী বছর গুলোতে তা ক্রমান্বয়ে কিছুটা অগ্রগতি হয়ে ২০২০ সাল নাগাদ তা ১৬৮তম স্থানে দাঁড়িয়েছে [স্মারণী-৫.৯(১)]।

২০১৪-২০২০ সময়কালে ব্যবসা সহজিকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ, যেমন- ব্যবসা শুরু করা, নির্মাণ কাজের অনুমতি প্রদান, বিদ্যুৎ সংযোগ, সম্পত্তি নিবন্ধন, ঋণ পাওয়া, সংখ্যলঘু

স্মারণী-৫.৯(১) : ২০১৪-২০২০ সময়কালে "সহজ ব্যবসা পরিচালন" সূচকে (Ease of Doing Business Index) ১৯০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান :-

ব্যবসা সহজিকরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান :

বিনিয়োগকারিদের সুরক্ষা প্রদান, কর পরিশোধ, সীমান্ত বানিজ্য, চুক্তি বলবৎ ও দেউলিয়াত্ব সমাধান এ ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের মাত্র ৩টি ক্ষেত্রে (সিরিয়াল-২,৩ ও ৫) সামান্য অগ্রগতি হলেও অবশিষ্ট সকল সূচকেই পিছিয়ে পড়েছে, দেশে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ও দেশি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রধান অন্তরায় [স্মারণী-৫.৯(২)]।

Source : Doing Business Ranking by W.B, 2020
Note : Higher Score indicates lower position.

স্মারণী-৫.৯(২) : ২০১৪-২০২০ সময়কালে ব্যবসা সহজিকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ধারাবাহিকতার চিত্র :-

S.L	Index	YEAR						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Starting Business	111	115	115	122	131	138	131
2	Dealing with Construction	142	144	138	138	130	138	135
3	Getting Electricity Connection	189	188	187	187	185	179	176
4	Registering Property	183	184	186	185	185	183	184
5	Getting Credit	125	131	152	157	159	161	119
6	Protecting Minority Investors	43	43	69	70	76	89	72
7	Paying Taxes	78	83	148	151	152	151	151
8	Trading Across Borders	140	140	173	173	173	176	176
9	Enforcing Contracts	188	188	189	189	189	189	189
10	Resolving Insolvency	146	147	153	151	152	153	154

Source : Doing Business Ranking by W.B, 2020 Note : Higher Score indicates lower position.

২) গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতার বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান :

বানিজ্য সক্ষমতার অনেকগুলো সূচকের মধ্যে- গতিশীল বানিজ্য, অবকাঠামো ও বানিজ্য উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সূচক সমূহ অন্যতম। ২০১৮ সাল নাগাদ বানিজ্য সক্ষমতায় ১৪০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম, অবকাঠামোর দিকথেকে ১০৯তম, আভ্যন্তরীণ বাজার বিবেচনায় ৩৬তম, ব্যাক্তিখাতে আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের ক্ষেত্রে ৭৯তম, ইনোভেশনের দিক থেকে ১০২তম, গবেষণা ও উন্নয়নে ৭৭তম, বানিজ্যিকীকরনে ১০৯তম, ব্যক্তিখাতের অবদানে ৬০তম এবং সহজ শ্রমবাজারের দিকথেকে ১১৫ তম অবস্থানে রয়েছে স্মারণী-৫.৯(৩) ।

গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতার বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান :

সারণী-৫.৯(৩) : Global Enabling Trade Report, 2018 অনুযায়ী বানিজ্য সক্ষমতার দিকথেকে ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান :-

SL	Index	Rank	Score out of 100
1	**Business Dynamism**	120	43.6
	A. Trade Openness	125	50.9
	B. Trade tariff (%)	128	11.91
	C. Complexity of Tariff	33	92.0
	D. Border Clearance Efficiency	115	32.5
2	**Infrastructure**	109	53.4
	A. Transport Infrastructure	99	37.8
	B. Road Infrastructure	128	34.8
	C. Railroad Infrastructure	42	42.2
	D. Airport Infrastructure	78	48.5
	E. Sea Port Infrastructure	86	25.8
	F. Efficiency of Port Service	93	40.9
	G. Utility Infrastructure	109	69.0
3	**Other Indicators :**		
	A. Domestic market Size	36	66.5
	B. Domestic Credit to Private	79	46.8
	C. Entrepreneurial Culture	98	43.6
	D. Innovation Capacity	102	30.6
	E. Research and Development	77	23.2
	F. Commercialization	109	41.2
	G. Private Sector Performance	60	50.5
	H. Labour Market flexibility	115	50.9

Source : GET Report, 2018

৩) লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবস্থান :

আন্তর্জাতিক বানিজ্য সহজিকরনের ক্ষেত্রে লজিষ্টিক সাপোর্ট, যেমন-কাষ্টমস্, অবকাঠামো, জাহাজীকরণ, ট্রাকিং এন্ড ট্রেসিং এবং লীড টাইম ইত্যাদি অন্যতম। অপর্যাপ্ত লজিষ্টিক সাপোর্টের কারনে যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ সমূহ আন্তর্জাতিক বানিজ্যে পিছিয়ে পড়ছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। লজিস্টিক সাপোর্টের দক্ষতা ও পর্যাপ্ততার দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় দেশ সমূহের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় ২০১৯ সালের গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে (LPI Ranking 2019) ১৬০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম, শ্রীলংকা ৯৪তম, মালদ্বীপ ৮৬তম, ইন্দোনেশিয়া ৪৬তম, ভারত ৪৪তম, মালয়েশিয়া ৪১তম, থাইল্যান্ড ৩২তম, চীন ২৬তম এবং দ. কোরিয়া ২৫তম অবস্থানে রয়েছে।

লজিষ্টিক সাপার্ট সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবস্থান :

স্মারণী-৫.৯(৪) : LPI Ranking 2019 অনুযায়ী লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সম্ভাবনাময় দেশসমূহের অবস্থান :-

Country	LPI Rank	LPI Score	Customs	Infrastructure	Int'l Shipment	Logistic Competence	Tracking & Tracing	Timeliness
Hong Kong	12	3.92	3.81	3.97	3.77	3.93	3.92	4.14
S. Korea	25	3.61	3.40	3.73	3.33	3.59	3.75	3.92
Thailand	32	3.41	3.14	3.14	3.46	3.41	3.47	3.81
Vietnam	39	3.27	2.95	3.01	3.16	3.40	3.45	3.67
Malaysia	41	3.22	2.90	3.15	3.35	3.30	3.15	3.46
India	44	3.18	2.96	2.91	3.21	3.13	3.32	3.50
Indonesia	46	3.15	2.67	2.89	3.23	3.10	3.30	3.67
Bangladesh	100	2.58	2.30	2.39	2.56	2.49	2.79	2.92
Pakistan	122	2.42	2.12	2.20	2.63	2.59	2.27	2.66

Source : World Bank Report, 2018

স্মারণী-৫.৯(৫) : LPI Ranking 2019 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের অবস্থান :-

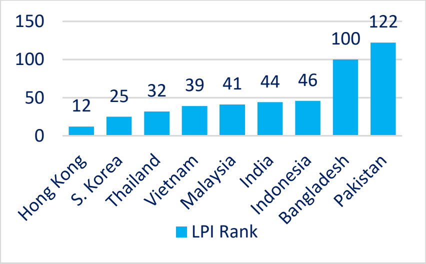

Source : World Bank Report, 2018
Note : Upper Ranking indicates lower position

স্মারণী-৫.৯(৬) : Infrastructure Ranking 2018 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের অবস্থান :-

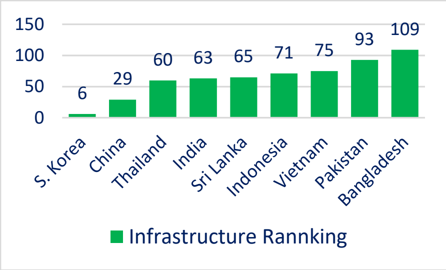

Source : Global Competitiveness Report, 2018
Note : Upper Ranking indicates lower position

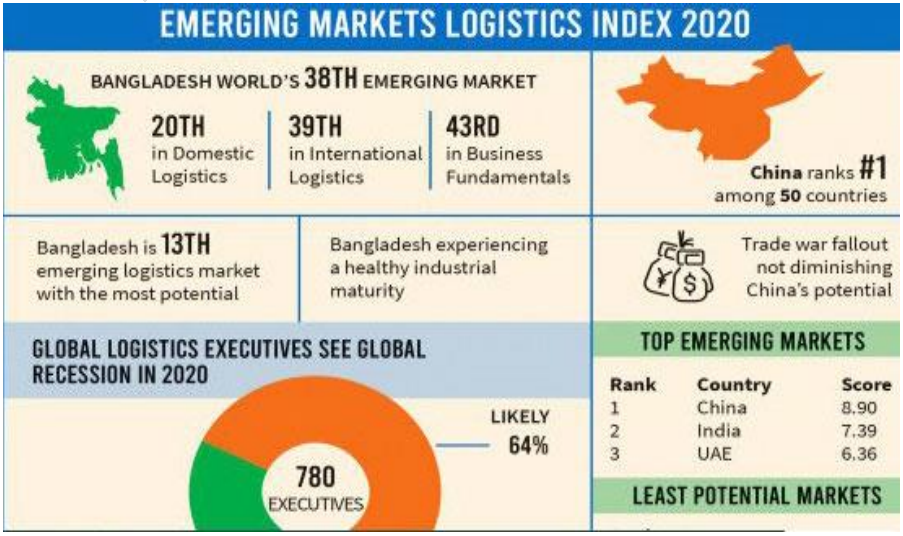

গ) বাংলাদেশের রপ্তানি বানিজ্য :

১) বাংলাদেশে রপ্তানি বানিজ্যের ক্রমবিকাশ :

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ রপ্তানি বানিজ্যে প্রবেশ করলেও ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশের রপ্তানির আকার ছিল খুবই সীমিত। **১৯৯০** সালের পর থেকে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দেশের রপ্তানিখাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে এবং সেই থেকে অদ্যাবধি তৈরি পোশাক দেশের রপ্তানি বানিজ্যে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৯-৮০ সময়কালে রপ্তানি বানিজ্যের আকার ছিল ইউ.এস.ডলার ৩৪৮ - ৭৫০ মিলিয়ন এবং এ সময়কালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গড়ে বার্ষিক ১১.৯৩%। অর্থবছর ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০ সময়কালে রপ্তানি বানিজ্যের আকার ছিল ইউ.এস.ডলার ৭১০ -১,৫২৪ মিলিয়ন এবং এ সময়কালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গড়ে বার্ষিক ৮.২২%। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৯-০০ সময়কালে রপ্তানি বানিজ্যের আকার ছিল ইউ.এস.ডলার ১,৭১৮ - ৫,৭৫২ মিলিয়ন এবং এ সময়কালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গড়ে বার্ষিক ১৪.৫৩%।২০০০-০১ থেকে ২০০৯-১০ সময়কালে রপ্তানি বানিজ্যের আকার ছিল ইউ.এস.ডলার ৬,৪৬৭ - ১৬,২০৫ মিলিয়ন এবং এ সময়কালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গড়ে বার্ষিক ১১.১৯% এবং ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে রপ্তানি বানিজ্যের আকার দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ২৪,৩০২-৪০,৫৩৫ মিলিয়ন এবং এ সময়কালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে গড়ে বার্ষিক ৭.৪৫%।

স্মারণী-৫.৯(৭) : ১৯৭২-২০১৮ সময়কালে প্রতি ১০ বছরের গড় রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

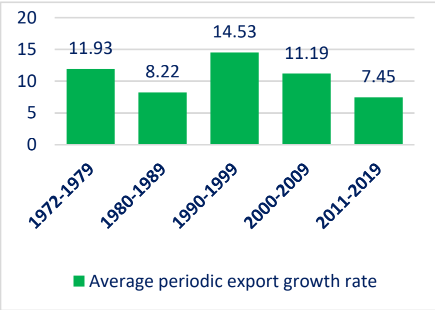

Source : MOF

২) দেশের রপ্তানি বানিজ্যের সামগ্রিক চিত্র :

দেশের রপ্তানিখাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক উপখাত সমূহের মধ্যে - তৈরী পোশাক, আই.সি.টি প্রোডাকটস্, লেদার এন্ড লেদার প্রোডকটস্, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ঔষধ, পাট ও পাটজাত পণ্য, প্লাস্টিক প্রোডাকট্স, হোম টেক্সটাইল, ফার্নিছার ও লাগেজ অন্যতম। তবে বিগত দুই যুগেরও অধিক কাল ধরে দেশের রপ্তানি বানিজ্য অনেকটা একক পণ্য নির্ভর হয়ে পড়েছে, যা একটি দেশের টেকসই অর্থনীতি গড়ার পক্ষে মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ।

SJFBD

দেশের রপ্তানি বানিজ্যের সামগ্রিক চিত্র :

স্মারণী-৫.৯(৮) : ২০১৭-১৮ সময়কালে মোট রপ্তানিতে একক পণ্যের আধিক্যের দিকথেকে বাংলাদেশ ও দ. এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের তুলনামূলক চিত্র:-

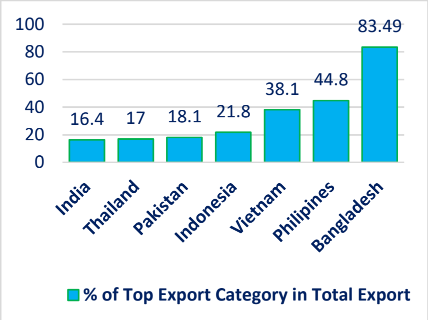

Source : USAID

বিগত দশকে (২০০৯-২০১৮) দেশে বার্ষিক গড় রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ২৯,৭৯৭ মিলিয়ন এবং গড়ে মোট রপ্তানি মূল্যের ৮১% তৈরি পোশাক, ১৪.৫% শিল্পজাত পণ্য এবং ৪.৫% কৃষিজাত পণ্য। মোট রপ্তানিতে একক পণ্যে নির্ভরশীলতার দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের তুলনায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ নির্ভরশীলতা বহুগুণ বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানিতে একক পণ্যের অংশ ভারতে ১৬.৪%, থাইল্যান্ডে ১৭%, পাকিস্তানে ১৮.১%, ইন্দোনেশিয়ায় ২১.৮%, ভিয়েতনামে ৩৮.১%, ফিলিপাইনে ৪৪.৮% এবং বাংলাদেশে ৮৩.৪৯% [স্মারণী-৫.৯(৮)]।

৩) রপ্তানি বাজারের আওতা ও পরিসর :

প্তানি বাজারের আওতা ও পরিসর :

বিশ্বের যে ১২ টি দেশ বাংলাদেশের রপ্তানি বানিজ্যের বড় অংশীদার সেগুলো হচ্ছে- আমেরিকা, জার্মানি, বৃটেন, স্পেন, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, কানাড়া, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, ভারত ও চীন। বার্ষিক মোট রপ্তানির গড়ে ৭৫-৮০% রপ্তানি হয় এ ১২টি দেশে এবং অবশিষ্ট ২০-২৫% রপ্তানি হয় অন্যান্য দেশে [স্মারণী-৫.৯(৯)]।

স্মারণী-৫.৯(১০) : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশভিত্তিক মোট রপ্তানির চিত্র :-

Country	Export Value (In Million USD)	% of Export
USA	6,876.29	16.96
Germany	6,173.16	15.23
U.K	4,169.31	10.28
Spain	2,554.82	6.30
France	2,217.56	5.47
Italy	1,643.12	4.05
Netherlands	1,278.79	3.15
Poland	1,273.09	3.15
Japan	1,365.74	3.37
Canada	1,339.80	3.30
India	1,248.05	3.07
China	831.20	2.05
Other Countries	9,564.07	23.62
Total :	**40,535.00**	**100**

Source : Ministry of Commerce

স্মারণী-৫.৯(৯) : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রপ্তানির হার (%) :-

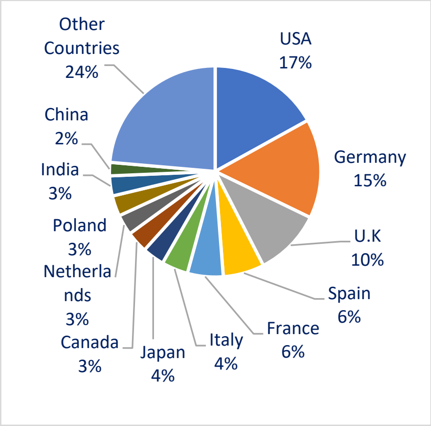

Source : Economic Review 2019

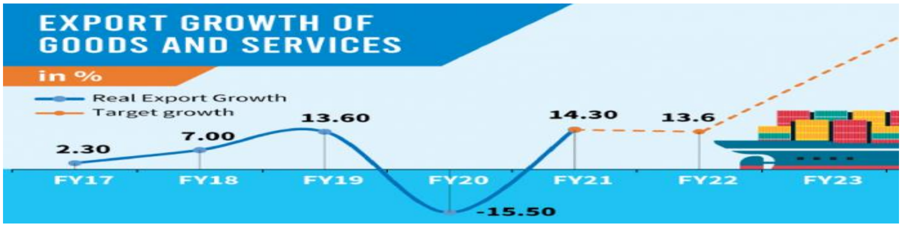

বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি :

৪) বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি :

বিগত দশকে (২০০৯ - ২০১৮) দেশে রপ্তানি খাতের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি ১০.৫২%, এ সময়কালে সর্বোচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪১.৮৯% এবং সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.১৬%। বাৎসরিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৪.১১%, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪১.৪৯%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫.৯৯%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১.২১%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৯%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.৩৯%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯.৭৭%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.১৬%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫.৮১% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০.৫৫% [স্মারণী-৫.৯(১১)]।

স্মারণী-৫.৯(১১) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

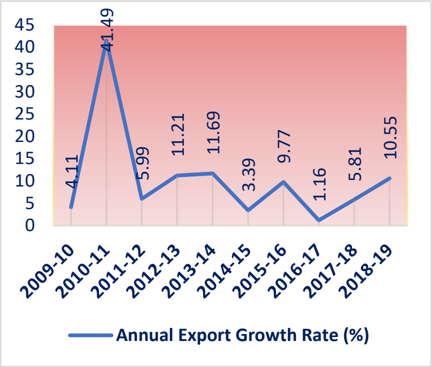

Source : Ministry of Finance

রপ্তানি অংশীদার দেশ সমূহের বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের হার :

৫) রপ্তানি অংশীদার দেশ সমূহের বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের হার :

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এ নির্দিষ্ট দেশসমূহের বাজারেও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অতিমাত্রায় নগণ্য। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে প্রাথমিক ও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়নি, এমনকি প্রতিযোগি দেশসমূহের তুলনায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও তুলনামূলকভাবে কম। বাংলাদেশের রপ্তানি বানিজ্যের ১২ টি বড় অংশীদার দেশের ২০১৮ সালের সন্মিলিত আমদানি ইউ.এস.ডলার ১০,৯১৪ বিলিয়ন, বাংলাদেশ থেকে ঐ বছর এ ১২টি দেশের সন্মিলিত মোট আমদানি ইউ.এস.ডলার ৩০.৯৭ বিলিয়ন, যা তাদের মোট আমদানির .২৮% মাত্র।

দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বর্তমান রপ্তানি অংশীদার দেশ সমূহে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রপ্তানিখাতের দ্রুত প্রসারে মনযোগি হওয়া অত্যন্ত জরুরি, কারণ, নতুন বাজার খোঁজার চেয়ে বর্তমান বাজার সম্প্রসারণ অনেকগুণ সহজ হবে এটা স্বাভাবিক। রপ্তানিতে বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের রপ্তানিখাতের কাঙ্খিত প্রসার অসম্ভব এবং রপ্তানি আয় পর্যাপ্ত বৃদ্ধি না পেলে বড় আকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, যা আমাদের ভবিষ্যতের বড় স্বপ্নগুলোকে দুঃস্বপ্নের দিকে ধাবিত করবে নিঃসন্দেহে।

নিম্নে রপ্তানি অংশীদার দেশ সমূহের বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহনের চিত্র তুলেধরা হলো :-

স্মারণী-৫.৯(১২) : ২০১৮ সালে প্রধান ১২ টি রপ্তানি অংশীদার দেশে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ সংশিষ্ট দেশ সমূহের মোট আমদানির শতাংশ (%) হারে :-

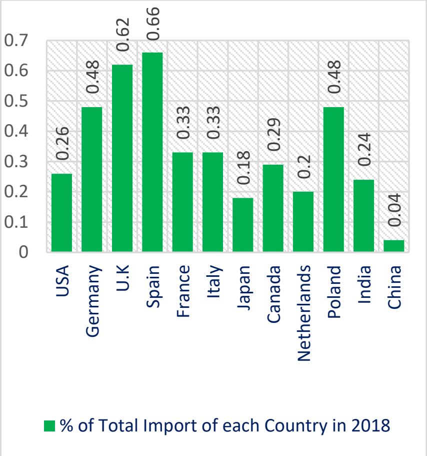

Source: World Trade Statistical Review 2019

স্মারণী-৫.৯(১৩)] : ২০১৮ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি অংশীদার দেশ সমূহের মোট আমদানি এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানির অংশ :-

Country	Import in 2018		
	Total Import (Billion USD)	Import from Bangladesh (Billion USD)	As % of Total Import
USA	2,614	6.88	.26
Germany	1,286	6.17	.48
UK	674	4.17	.62
Spain	388	2.55	.66
France	673	2.22	.33
Italy	501	1.64	.33
Japan	749	1.37	.18
Canada	469	1.34	.29
Netherlan	646	1.28	.20
Poland	267	1.27	.48
India	511	1.25	.24
China	2,136	.83	.04

Source: World Trade Statistics 2019

ঘ) খাতওয়ারি রপ্তানি এবং জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানি :

১) খাতওয়ারী রপ্তানি :

বাংলাদেশের রপ্তানিখাত প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত, প্রাথমিক পণ্য, শিল্পজাত পণ্য ও তৈরি পোশাক।

- প্রাথমিক পণ্য সমূহ (Primary Commodities) : কাঁচা পাট, হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস এবং কৃষিজাত পণ্য।

খাতওয়ারী রপ্তানি :

- **শিল্পজাত পণ্য** (Industrial Products) : পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, কেমিক্যাল প্রোডাক্টস, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, আই.সি.টি প্রোডাক্টস এবং শিল্পজাত অন্যান্য পণ্য সমূহ।
- **তৈরি পোশাক** (Readymade garments) : ওভেন এবং নীট গার্মেন্টস।

বিগত দশকে (২০০৯-২০১৮) দেশে বার্ষিক গড় রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ২৯,৭৯৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে প্রাথমিক পণ্যের অংশ গড়ে ৪.৫০%, শিল্পজাত পণ্য ১৪.৫০% এবং তৈরী পোশাক ৮১%। এসময়কালে রপ্তানি খাতের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি বছরে ১০.৫২%, সর্বোচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪১.৮৯%, সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.১৬% এবং বার্ষিক রপ্তানি জি.ডি.পি অনুপাতে গড়ে ১৭.৫৪ শতাংশ।

স্মারণী-৫.৯(১৪) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের খাতওয়ারি রপ্তানি, মোট রপ্তানিতে খাতওয়ারি রপ্তানির অংশ, বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানির চিত্র :-

Exports

(In Million USD)

S.L	Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
A	**Primary Commodity :**										
	Raw Jute	196	357	266	230	126	112	173	168	156	112
	Frozen & Live Fish	445	625	598	544	638	568	536	526	508	500
	Agricultural Products	243	334	403	536	615	586	596	553	674	909
	Total Primary Commodity :	**884**	**1,316**	**1,267**	**1,310**	**1,379**	**1,266**	**1,305**	**1,247**	**1,338**	**1,521**
	As % of Total Export	**5.46**	**5.74**	**5.21**	**4.85**	**4.57**	**4.06**	**3.81**	**3.60**	**3.65**	**3.75**
B	**Manufactured Goods :**										
	Jute Goods	540	758	701	801	698	757	747	794	870	704
	Leather & Leather Goods	430	651	766	981	1,124	1,31	1,161	1,234	1,086	1,020
	Home Textiles	539	789	906	792	793	804	753	799	879	852
	Chemical Products	103	105	103	93	93	112	124	140	151	205
	Engineering Products	311	310	375	367	367	447	510	689	356	341
	Other Products	902	1,085	1,095	1,167	1,241	1,200	1,563	1,603	1,373	1,758
	Total Mfg. Goods :	**2,825**	**3,698**	**3,946**	**4,201**	**4,316**	**4,451**	**4,858**	**5,259**	**4,715**	**4,880**
	As % of Total Export	**17.43**	**16.13**	**16.24**	**15.54**	**14.30**	**14.26**	**14.18**	**15.17**	**12.86**	**12.04**
C	**Readymade Garments :**										
	Woven	6,013	8,432	9,603	11,040	12,442	13,065	14,739	14,393	15,426	17,245
	Knitwears	6,483	9,482	9,486	10,476	12,050	12,427	13,355	13,757	15,189	16,889
	Total RMG Export :	**12,496**	**17,914**	**19,089**	**21,516**	**24,492**	**25,492**	**28,094**	**28,150**	**30,615**	**34,134**
	As % of Total Export	**77.11**	**78.13**	**78.55**	**79.61**	**81.13**	**81.68**	**82.00**	**80.07**	**83.49**	**84.21**
	Total Export (A+B+C) :	**16,205**	**22,928**	**24,302**	**27,027**	**30,187**	**31,209**	**34,257**	**34,656**	**36,668**	**40,535**
	Export As % of GDP	**16.94**	**16.02**	**19.92**	**20.16**	**19.54**	**18.99**	**17.34**	**16.65**	**15.04**	**14.8**
D	**Annual Export Growth Rate (%)**										
	Primary Commodity : :	1.61	48.87	(3.72)	3.39	5.27	(8.19)	3.08	(4.37)	7.21	13.68
	Manufactured Goods : :	20.37	30.90	6.71	6.46	2.74	3.13	9.14	16.51	16.70	3.50
	Readymade Garments :	1.20	43.36	6.56	12.71	13.83	4.08	10.21	(1.23)	**10.33**	**11.49**
	Annual Growth Rate :	**4.11**	**41.49**	**5.99**	**11.21**	**11.69**	**3.39**	**9.77**	**1.16**	**5.81**	**10.55**

Source : EPB

SJFBD

মোট রপ্তানিতে খাতভিত্তিক রপ্তানির অংশ :

২) মোট রপ্তানিতে খাতভিত্তিক রপ্তানির অংশ :

বিগত দশকে দেশের রপ্তানি বানিজ্যে ব্যাপক উল্ফলন ঘটেছে এটা মানতেই হবে। এ সময়কালে বাৎসরিক রপ্তানি আয় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ইউ.এস.ডলার ১৬,২০৫ মিলিয়ন, ২০১০-১১ অর্থবছরে ২২,৯২৮ মিলিয়ন, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২৪,৩০২ মিলিয়ন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৭,০২৭ মিলিয়ন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩০,১৮৭ মিলিয়ন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩১,২০৯ মিলিয়ন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৪,৬৫৬ মিলিয়ন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৬,৬৬৮ মিলিয়ন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০,৫৩৫ মিলিয়ন। ।এ সময়কালে বার্ষিক গড় রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ২৯,৭৯৭.৪০ মিলিয়ন, যাতে প্রাথমিক পণ্যের অংশ ৪.৪৭%, শিল্পজাত পণ্য ১৪.৮২% এবং তৈরী পোশাকের অংশ ৮০.৭১%।

উল্ল্যেখ করার মত বিষয় হলো এ সময়কালে মোট রপ্তানিতে তৈরী পোশাকের অংশ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে প্রাথমিক ও শিল্পজাত পণ্যের অংশ ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ইউ.এস.ডলার ১৬,২০৫ মিলিয়ন, যাতে প্রাথমিক পণ্যের অংশ ৫.৪৬%, শিল্পজাত পণ্য ১৭.৪৩% এবং তৈরী পোশাকের অংশ ৭৭.১১%। সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ৪০,৫৩৫ মিলিয়ন, যাতে প্রাথমিক পণ্যের অংশ ৩.৭৫%, শিল্পজাত পণ্য ১২.০৪% এবং তৈরী পোশাকের অংশ ৮৪.২১%। অর্থাৎ দেশের মোট রপ্তানিতে তৈরী পোশাকের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও প্রাথমিক ও শিল্পজাত পণ্যের অংশ মোট রপ্তানি অনুপাতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে স্মারণী-৫.৯(১৫) ।

স্মারণী-৫.৯(১৫) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে মোট রপ্তানিতে খাতওয়ারি রপ্তানির অংশ :-

Major Export Items
F.Y : 2018-19

84.21% - RMG
2.52% - Leather Goods
2.24% - Agri. Products.
2.01% - Jute & Jute Goods
1.23% - Frozen & Live Fish
2.10% - Home Textile
0.51% - Chemical Products
0.84% - Eng. Products.
4.34% - Other Products

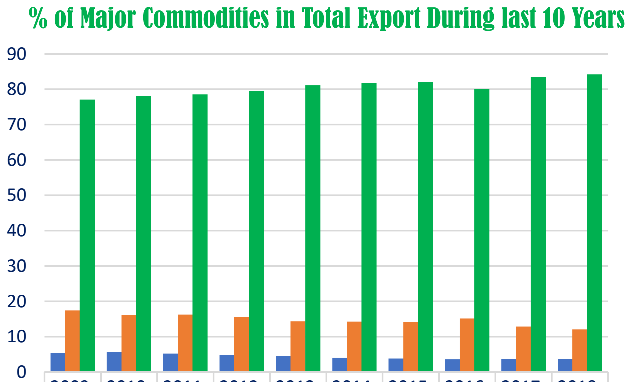

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Primary Commodity (%) :	5.46	5.74	5.21	4.85	4.57	4.06	3.81	3.6	3.65	3.75
Manufactured Goods (%) :	17.43	16.13	16.24	15.54	14.3	14.26	14.18	15.17	12.86	12.04
Readymade Garments (%) :	77.11	78.13	78.55	79.61	81.13	81.68	82	80.07	83.49	84.21

Source : EPB

৩) জি.ডি.পি অনুপাতে বাৎসরিক রপ্তানি :

অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বার্ষিক রপ্তানি জি.ডি.পি অনুপাতে গড়ে ১৭.৫৪ শতাংশ, বার্ষিক ভিত্তিতে যা ছিল ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৬.৯৪%, ২০০১০-১১ অর্থবছরে ১৬.০২%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯.৯২%,

জি.ডি.পি অনুপাতে বাৎসরিক রপ্তানি :

২০১২-১৩ অর্থবছরে ২০.১৬%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৯.৫৪%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮.৯৯%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৭.৩৪%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬.৬৫%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৫.০৪% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪.৮%।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, বিগত দশকে ধারাবাহিকভাবে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেলেও, ২০১২-১৩ অর্থবছরের পর থেকে জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে, যেমন- জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানি ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২০.১৬%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৯.৫৪%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮.৯৯%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬.৬৫%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৫.০৪% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪.৮% [স্মারণী-৫.৯(১৬)] ।

স্মারণী-৫.৯(১৬) : অর্থবছর : ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বাৎসরিক রপ্তানি ও জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানির চিত্র :-

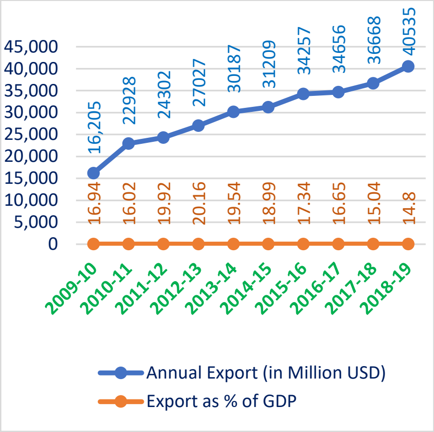

Source : BD Economic Review.

৪) মোট রপ্তানি ও জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান :

মোট রপ্তানি ও জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান।

বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে বার্ষিক মোট রপ্তানি ও জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও শ্রীলংকা ব্যাতিত অন্যান্য সব দেশের পিছনে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূল্যায়ন অনুযায়ী এক্ষেত্রে চীন প্রথম, জাপান দ্বিতীয়, হংকং তৃতীয়, সিঙ্গাপুর চতুর্থ, ভারত পঞ্চম, থাইল্যান্ড ষষ্ট, ভিয়েতনাম সপ্তম, মালয়েশিয়া অষ্টম, ইন্দোনেশিয়া নবম, বাংলাদেশ দশম, পাকিস্তান একাদশ এবং শ্রীলংকা দ্বাদশতম স্থানে রয়েছে স্মারণী-৫.৯(১৭) ।

স্মারণী-৫.৯(১৭) : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক মোট রপ্তানি ও জি.ডি.পি অনুপাতে রপ্তানিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :-

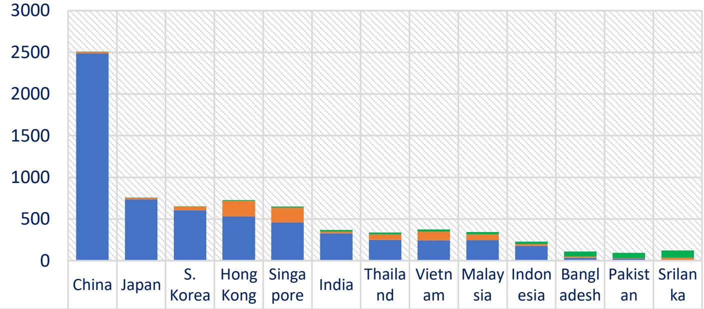

	China	Japan	S. Korea	Hong Kong	Singapore	India	Thailand	Vietnam	Malaysia	Indonesia	Bangladesh	Pakistan	Srilanka
Rank among 100 Countries	1	4	5	8	13	19	21	27	28	29	58	61	88
Export as % of GDP	19.5	18.4	44	188.3	176.4	19.7	66.8	105.8	68.8	21	14.8	8.8	22.8
Export in Billion USD	2487	737	605	531	460	330	251	244	249	180	36.3	24.8	11.9

Source : World bank Data

৫) বিশ্ব রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ :

বিশ্ববানিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ সমূহের তুলনায় একদমই পিছনের সারিতে অবস্থান করছে। বিশ্ববানিজ্য সংস্থার রিপোর্ট অনযায়ী ২০১৭ সালে বিশ্বে

বিশ্ব রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ :

৫০টি প্রধান রপ্তানিকারক দেশের মোট রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ১৩,৫৩০ বিলিয়ন, তন্মধ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ মাত্র .৩% (৩৬ বিলিয়ন), যেখানে চীনের অংশগ্রহণ ১৬.২%, জাপান ৫%, দ. কোরিয়া ৪.১%, হংকং ৩.৯%, সিঙ্গাপুর ২.৭%, ভারত ২.১%, থাইল্যান্ড ১.৭%, মালয়েশিয়া ১.৬%, ইন্দোনেশিয়া ১.২% এবং পাকিস্তানের অংশগ্রহণ .২% [স্মারণী-৫.৯(১৮)] । কাজেই, ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণে শিল্পায়ন বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমূখী করনের মাধ্যমে রপ্তানিমূখী অর্থনীতি গড়ে তুলতে রপ্তানিখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

স্মারণী-৫.৯(১৮) : ২০১৭ সালে বিশ্বে প্রধান পণ্য রপ্তানিকারক ৫০টি দেশের সম্মিলিত রপ্তানিতে বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অংশ :-

Source : WTO Report, 2018

ঙ) আমদানি বানিজ্য :

বাংলাদেশের আমদানি বানিজ্যে :

১) বাংলাদেশের আমদানি বানিজ্যে :

বাংলাদেশের আমদানিখাত - প্রাইমারী পণ্য, ইন্টারমিডিয়েট পণ্য, ক্যাপিট্যাল মেশিনারীজ এবং অন্যান্য পণ্য এ চারটি প্যধান ক্যাটাগরিতে বিভক্ত।

- প্রাইমারী পণ্য (Primary Goods) : চাউল, গম, তৈল বীজ, ক্রুড পেট্রোলিয়াম এবং কাঁচা তুলা।
- ইন্টারমিডিয়েট পণ্য (Intermediate Goods) : এডিবল অয়েল, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস্, ফার্টিলাইজার, ক্লিংকার, ষ্টাপল ফাইবার, সুতা ইত্যাদি।
- ক্যাপিট্যাল মেশিনারীজ (Capital Machinery) : শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনারীজ ও যন্ত্রাংশ।
- অন্যান্য পণ্য (Other Goods) : আমদানিকৃত অন্যান্য সকল ধরনের পণ্য সামগ্রী।

বিগত অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে বাৎসরিক গড় আমদানি ইউ.এস.ডলার ৩৯,৭০৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে প্রাইমারী পণ্য ১১.৯৯%, ইন্টারমিডিয়েট পণ্য ২১.২০%, ক্যাপিট্যাল মেশিনারীজ ৭.৩৩% এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ৫৯.৪৮%। এ সময়কালে বাৎসরিক গড় আমদানি প্রবৃদ্ধি ১২.০৪%, সর্বোচ্ছ আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪১.৭৯%, সর্বনিন্ম ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০.০৭% এবং এ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে বার্ষিক আমদানি গড়ে ২৪.৩৩ শতাংশ ।

স্মারণী-৫.৯(১৯) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালের খাতওয়ারি আমদানি, মোট আমদানিতে খাতওয়ারি অংশ, বার্ষিক আমদানি প্রবৃদ্ধি এবং জি.ডি.পি অনুপাতে আমদানির চিত্র :-

S.L	Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
A	**Major Primary Goods :**							(In Million USD)		
	Rice	75	830	288	30	348	508	113	89	1,605
	Wheat	761	1,081	613	696	1,126	983	949	1,197	1,494
	Oil Seeds	130	103	177	242	524	374	534	432	571
	Crude Petroleum	535	923	987	1,102	929	316	386	478	365

SJFBD

	Raw Cotton	1,439	2,689	2,083	2,005	2,422	2,296	2,245	2,529	3,235
	Total Primary Goods :	**2,940**	**5,626**	**4,148**	**4,075**	**5,349**	**4,477**	**4,227**	**4,725**	**7,270**
	As % of Total Import	12.39	16.72	11.68	11.96	13.15	11.00	9.80	10.05	12.35
B	**Major Intermediate Goods :**									
	Edible Oil	1,050	1,067	1,644	1,402	1,766	924	1,450	1,626	1,863
	Petroleum Products	2,021	3,186	3,922	3,642	4,070	2,076	2,275	2,898	3,652
	Fertilizer	717	1,241	1,381	1,188	1,026	1,339	1,117	737	1,006
	Clinker	333	446	504	487	615	638	574	644	766
	Staple Fiber	118	180	428	454	492	1,078	1,018	1,017	1,180
	Yearn	718	1,391	1,384	1,356	1,506	1,851	1,969	1,972	2,351
	Total Intermediate Goods :	**4,957**	**7,511**	**9,263**	**8,529**	**9,475**	**7,906**	**8,403**	**8,894**	**10,818**
	As % of Total Import	**20.88**	**22.32**	**26.08**	**25.02**	**23.29**	**19.42**	**19.49**	**18.92**	**18.38**
C	**Capital Machinery**	**1,595**	**2,325**	**2,005**	**1,835**	**2,288**	**3,321**	**3,556**	**3,817**	**5,462**
	As % of Total Import	**6.72**	**6.91**	**5.65**	**5.38**	**5.63**	**8.16**	**8.25**	**8.12**	**9.23**
D	**Other Goods**	14,246	18,196	20,099	19,645	23,563	25,000	26,936	29,569	35,315
	As % of Total Import	**60.01**	**54.6**	**56.59**	**57.64**	**57.93**	**61.42**	**62.46**	**62.91**	**59.99**
	Total Import (A+B+C+D) :	**23,738**	**33,658**	**35,516**	**34,084**	**40,675**	**40,704**	**43,122**	**47,005**	**58,865**
	Import as % of GDP	**23.15**	**21.78**	**27.5**	**27.95**	**26.76**	**25.52**	**24.75**	**21.3**	**20.27**
	Growth Rate (%) :									
	Major Commodity :	**0.82**	**91.36**	**(26.27)**	**(1.76)**	**31.26**	**(16.30)**	**(5.58)**	**11.78**	**53.86**
	Intermediate Goods	**(1.55)**	**51.52**	**23.33**	**(7.92)**	**11.09**	**(16.56)**	**6.29**	**5.84**	**21.63**
	Capital Machinery Import	**12.32**	**45.77**	**(13.76)**	**(8.48)**	**24.69**	**45.15**	**7.08**	**7.34**	**43.09**
	Other Goods	**8.45**	**27.73**	**10.46**	**(2.26)**	**19.94**	**6.10**	**7.74**	**9.78**	**19.43**
	Total Import Growth :	**5.47**	**41.79**	**5.52**	**(4.03)**	**19.34**	**0.07**	**5.94**	**9.00**	**25.23**

Source : BD Economic Review

SIFBD

খাতভিত্তিক আমদানির চিত্র :

২) খাতভিত্তিক আমদানির চিত্র :

বিগত দশকে দেশে গড়ে বাৎসরিক আমদানি ব্যয় ইউ.এস.ডলার ৩৯,৭০৭ মিলিয়ন, যারমধ্যে ১১.৯৯% প্রাইমারী পণ্য, ২১.২০% ইন্টারমিডিয়েট পণ্য, ৭.৩৩% ক্যাপিট্যাল মেশিনারীজ এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ৫৯.৪৮% যা নিম্নে প্রদত্ত স্মারণী-৫.৯(২০) এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো :-

স্মারণী-৫.৯(২০) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বাৎসরিক মোট আমদানিতে খাত ভিত্তিক অংশ (%) :-

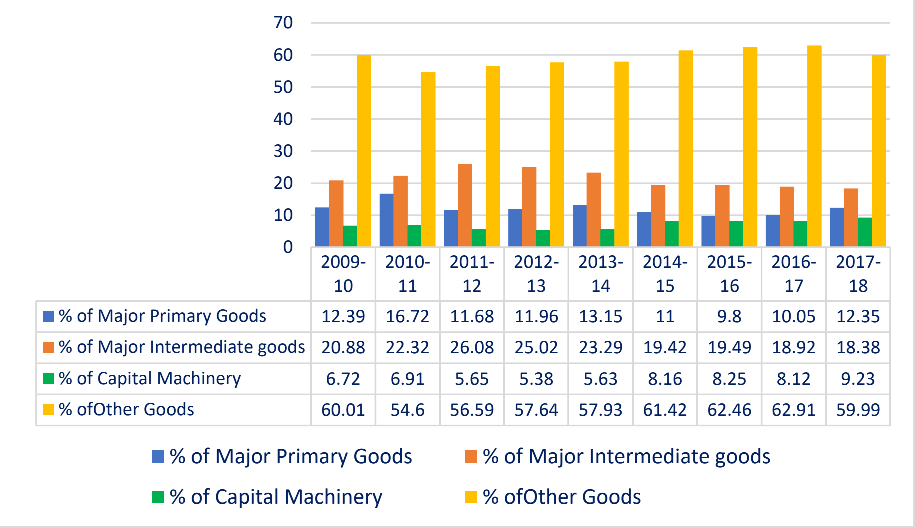

Source : BD Economic Review

জি.ডি.প অনুপাতে আমদানি :

৩) জি.ডি.প অনুপাতে আমদানি :

অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বাৎসরিক গড় আমদানি ইউ.এস.ডলার ৩৯,৭০৭ মিলিয়ন, বাৎসরিক ভিত্তিতে যা ছিল ২০০৯-১০ অর্থবছরে ইউ.এস.ডলার ২৩,৭৩৮ মিলিয়ন, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৩,৬৫৮ মিলিয়ন, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩৫,৫১৬ মিলিয়ন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৪,০৮৪ মিলিয়ন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪০,৬৭৫ মিলিয়ন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪০,৭০৪ মিলিয়ন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৩,১২২ মিলিয়ন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৭,০০৫ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৮,৮৬৫ মিলিয়ন [স্মারণী-৫.৯(২১)] ।

এ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে বার্ষিক আমদানি গড়ে ২৪.৩৩ শতাংশ, বাৎসরিক ভিত্তিতে যা ছিল ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৩.১৫%, ২০১০-১১ অর্থবছরে ২১.৭৮%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২৭.৫%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৭.৯৫%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৬.৭৬%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৫.৫২%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৪.৭৫%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২১.৩% এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০.২৭%।

স্মারণী-৫.৯(২১) : অর্থবছর : ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮) সময়কালে বাৎসরিক আমদানি ও জি.ডি.পি অনুপাতে আমদানির চিত্র :-

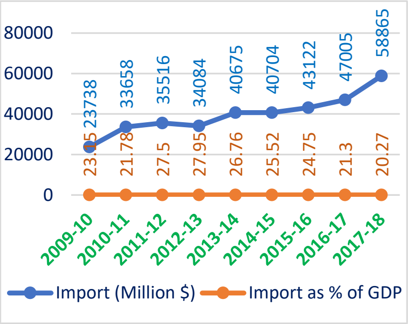

Source : BD Economic Review

SJFBD

বাৎসরিক আমদানি প্রবৃদ্ধির চিত্র :

৪) বাৎসরিক আমদানি প্রবৃদ্ধি :

বিগত অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে বাৎসরিক গড় আমদানি প্রবৃদ্ধি ১২.০৪%, সর্বোচ্চ আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪১.৭৯% এবং সর্বনিম্ন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০.০৭%। এ সময়কালে বাৎসরিক আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৫.৪৭%, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪১.৭৯%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫.৫২%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে (৪.০৩)%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৯.৩৪%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০.০৭%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫.৯৪%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯% এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫.২৩% স্মারণী-৫.৯(২২) ।

স্মারণী-৫.৯(২২) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বাৎসরিক আমদানি প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

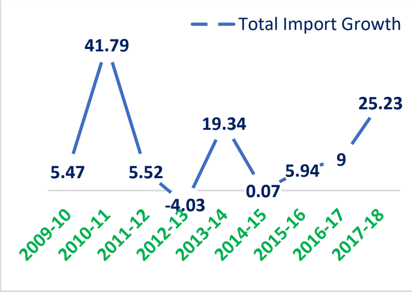

Source : BD Economic Review

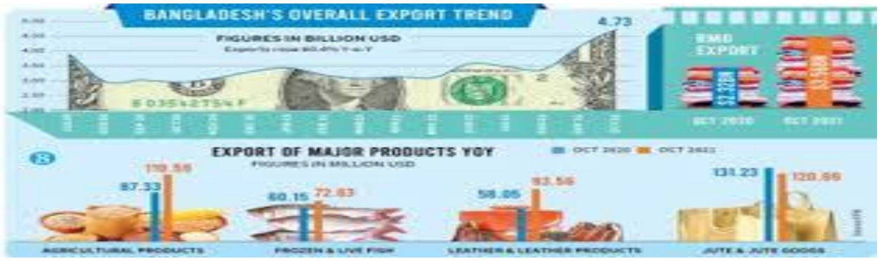

চ) বানিজ্য ভারসাম্য :

বানিজ্য ভারসাম্য :

সীমিত শিল্প উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরনে পিছিয়ে থাকা, কৃষিখাতের যুগোপযোগি প্রসার ও উন্নয়ন না হওয়া, উদার আমদানি নীতি এবং আরোও বহুবিধ কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতি অদ্যাবধি আমদানি নির্ভর হয়ে রয়েছে। রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ায় এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফিতির ফলে স্বাধীনতার পর থেকে দেশের বানিজ্য ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে, যা দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টি করছে।

স্মারণী-৫.৯(২৩) : ২০০৪-৫ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে বানিজ্য ঘাটতির চিত্র :-

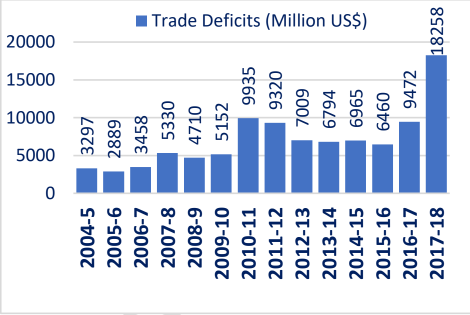

Source : MOF

অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে গড়ে বাৎসরিক রপ্তানি (FOB) ইউ.এস.ডলার ২৬,৮১৩ মিলিয়ন, বাৎসরিক গড় আমদানি (FOB) ইউ.এস.ডলার ৩৫,৩১৮ মিলিয়ন এবং গড়ে বাৎসরিক বানিজ্যের আকার ছিল ইউ.এস.ডলার ৬২,১৩১ মিলিয়ন। এ সময়কালে গড়ে বাৎসরিক বানিজ্য ঘাটতি ইউ.এস.ডলার ৮,৫০৫ মিলিয়ন (মোট বানিজ্যের ১৩.৬৯%), বাৎসরিক ভিত্তিতে যা ছিল ২০০৮-৯ অর্থবছরে ইউ.এস.ডলার ৪,৭১০ মিলিয়ন (মোট বানিজ্যের ১৩.১৩%), ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৫,১২৫ মিলিয়ন (১৩.৬১%), ২০১০-১১ অর্থবছরে ৯,৯৩৫ মিলিয়ন (১৮.০২%), ২০১১-১২ অর্থবছরে ৯,৩২০ মিলিয়ন (১৬.২৭%), ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৮,০০৯ মিলিয়ন (১৩.৫৪%), ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬,৭৯৪ মিলিয়ন (১০.২৪%), ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬,৯৬৫ মিলিয়ন (১০.১৯%), ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬,৪৬০ মিলিয়ন (৮.৮১%), ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯,৪৭২ মিলিয়ন (১২.২২%) এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৮,২৫৮ মিলিয়ন (২০.১৪%)।

স্মারণী-৫.৯(২৪) : অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশের সামগ্রিক বৈদেশিক বানিজ্যের চিত্র :-

Transactions	Financial Years									(In Million USD
	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Export (FOB)	15,581	16,263	22,592	23,989	25,567	29,777	30,697	33,441	34,019	36,205
Import (FOB	20,291	21,388	32,527	33,309	33,576	36,571	37,662	39,901	43,491	54,463
Trade Deficits	- 4,710	- 5,125	- 9,935	- 9,320	- 8,009	- 6,794	- 6,965	- 6,460	- 9,472	-18,258
% of Deficits	13.13	13.61	18.02	16.27	13.54	10.24	10.19	8.81	12.22	20.14
Trade Size	35,872	37,651	55,119	57,298	59,143	66,348	68,359	73,342	77,510	90,668

Source : MOF **Note :** Average Yearly Trade Size : USD 62,131 Million and Average Yearly Trade Deficit : 13.69%

ছ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আওতায় চলমান বানিজ্য :

স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার সদস্যভূক্ত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহে ডিউটি ফ্রি অথবা সমন্বিত ট্যারিফের আওতায় পণ্য রপ্তানির সুযোগ ভোগ করে আসছে। এ সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানিতে ইউরোপসহ বিশ্বের ৩৮ টি দেশে GSP (Generalized System of Preference) সুবধা পেয়ে থাকে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধুমাত্র তৈরী পোশাক রপ্তানিতে এ সুবিধা ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে।

১) ইউরোপের দেশ সমূহের সাথে বানিজ্য :

বাংলাদেশ ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের মধ্য বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ২০০১ সালে বলবৎকৃত ” Joint Co-operation Agreement” এর আওতায় বালাদেশ ইউরোপিয় ইউনিয়নভূক্ত ২৮টি দেশের কাছ থেকে রপ্তানি পণ্যের উপর জি.এস.পি সুবিধা পেয়ে আসছে। EU GSP Scheme এর আওতায় বিশ্বের ৫০টি স্বল্পোন্নত দেশ ই.ইউ ভূক্ত দেশসমূহে আর্মস ব্যতিত অন্যান্য সকল পণ্য শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধায় রপ্তানির সুযোগ রয়েছে, যা জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে পুরোপুরি কার্যকরি হয়েছে, যদিও বাংলাদেশ অদ্যাবধি তৈরীপোশাক ব্যতিত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ সুবিধা খুব কমই কাজে লাগাতে পারছে। বিগত ২০১৫-২০১৯ সময়কালে ইউরোপে বাংলাদেশের রপ্তানি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইউরোপভূক্ত দেশ সমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির গড়ে প্রায় ৯৪% তৈরী পোশাক এবং অন্যান্য পণ্য গড়ে ৫-৬% মাত্র।

ইউরোপের দেশ সমূহের সাথে বানিজ্য :

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইউরোপে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ১২.৭ বিলিয়ন ইউরো, তন্মধ্যে তৈরী পোশাক ১১.৯ বিলিয়ন (৯৩.৭০%) এবং অন্যান্য পণ্য ০.৮ বিলিয়ন (৬.৩০%)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ১৬.৩ বিলিয়ন ইউরো, তন্মধ্যে তৈরী পোশাক ১৫.৩ বিলিয়ন (৯৩.৮৭%) এবং অন্যান্য পণ্য ১.০ বিলিয়ন (৬.১৩%) [স্মারণী-৫.৯(২৫)]। অর্থাৎ ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলাদেশের সকল পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধায় প্রবেশের সুযোগ থাকলেও একমাত্র তৈরীপোশাক ব্যতিত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ সুবিধা খুব সামান্যই কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে।

স্মারণী-৫.৯(২৫) : অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে ইউরোপভূক্ত দেশ সমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির চিত্র :-

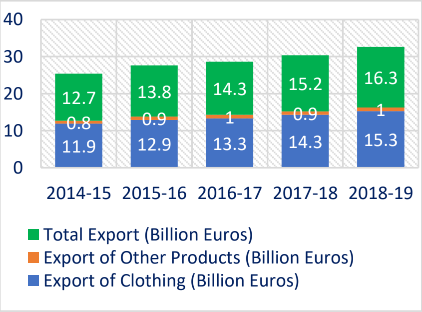

Source: BD Economic Review

স্মারণী-৫.৯(২৬) : ২০১৫-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশ ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের মধ্যেকার আন্ত বানিজ্যের চিত্র :-

Year	Export to EU (Billion Euros)				Import from EU (Billion Euros)			Trade Balance (Billion Euros)
	Textile & Clothing	Other Products	Total Export (Billion Euros)	Export of Other Products as % of Total Export	Textile & Clothing	Other Products	Total Import (Billion Euros)	
2015	11.9	0.8	12.7	6.30	.48	1.8	2.3	+ 10.40
2016	12.9	0.9	13.8	6.52	.44	2.0	2.4	+ 11.40
2017	13.3	1.0	14.3	6.99	.41	2.5	2.9	+ 11.40
2018	14.3	0.9	15.2	5.92	.43	2.8	3.2	+ 12.00
2019	15.3	1.0	16.3	6.13	.45	2.6	3.0	+ 13.70

Source: EU Commission, GD Trade

২) আমেরিকার সাথে বানিজ্য :

বাংলাদেশ তৈরী পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে আমেরিকার বাজারে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জি.এস.পি সুবিধা ভোগ করে আসছিল। আমেরিকা ২০১৩ সালে বাংলাদেশের উপর থেকে জি.এস.পি সুবিধা তুলে নেওয়ার পর উভয় দেশের মধ্যে ট্রেড় এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট উন্নয়নে নভেম্বর, ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত অন্য আরেকটি চুক্তির আওতায় অদ্যাবধি দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্য চলে আসছে, যা নিন্মে তুলেধরা হলো।

SJBD

স্মারণী-৫.৯(২৭) : ২০১৬-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যেকার বানিজ্যের চিত্র :-

Financial Year	Total Export (US$ Million)	Total Import (US$ Million)	Trade Balance (US$ Million)
2016	6,221	1,134	+ 5,087
2017	5,846	1,358	+ 4,489
2018	5,983	2,160	+ 3,823
2019	6,350	1,735	+ 4,615

জ) আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় চলমান বানিজ্য :

বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে অঞ্চলভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এযাবৎ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলভূক্ত দেশসমূহের সাথে যে সমস্ত আঞ্চলিক বানিজ্য সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য চুক্তি সমূহ হচ্ছে :-

APTA : Asia Pacific Trading Arrangements :

1. APTA : Asia Pacific Trading Arrangements.
2. SAFTA : South Asian Free Trade Area.
3. BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation.

১) APTA : Asia Pacific Trading Arrangements :

১৯৭৫ সালে চীন, ভারত, লাওস (Lao PDR), দ. কোরিয়া, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি নভেম্বর, ২০০৫ সাল থেকে কার্যকর শুরু হয়, যা ব্যাংকক চুক্তি নামেও পরিচিত। সদস্যভূক্ত বড় অর্থনীতির দেশ সমূহ তুলনামূলক ছোট ও অনুন্নত অর্থনীতির দেশ সমূহকে বানিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রধানের লক্ষ্যে আমদানিকৃত পণ্যের উপর ট্যারিফ ও ডিউটি হ্রাসের মাধ্যমে সদস্যভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বানিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই এ চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য।

সর্বশেষ জানুয়ারি, ২০১৭ সালে এ চুক্তির ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ট্যারিফ সুবিধার আওতায় ৬ টি সদস্য দেশের সাম্মিলিতভাবে অফারকৃত পণ্যের সংখ্যা আনুমানিক ১০,০০০, যা জুলাই, ২০১৮ থেকে কার্যকরি হয়েছে, যা নিম্নরুপ :-

SL	Country	No. of Products Offered under Tariff Concession
1	India	3,102 Products
2	South Korea	2,797 Products
3	China	2,191 Products
4	Laos	999 Products
5	Bangladesh	602 Products
6	Srilanka	598 Products

এ চুক্তির আওতায় ছোট ও অনুন্নত অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ও লাওস এ দুটি দেশকে অতিরিক্ত বানিজ্য সুবিধা প্রদানের অংশ হিসাবে চায়না ১৮১ টি, শ্রীলংকা ৭৫ টি ও ভারত ৪৮ টি পণ্যের উপর আংশিক ট্যারিফ সুবিধা এবং দ. কোরিয়া ৯৫১ টি পণ্যের উপর ১০০% ট্যারিফ সুবিধা ঘোষণা করেছে। (Financial Express : September 25, 2018)

SJIBD

ক) APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন :

APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় রয়েছে চীন, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, লাওস ও মংঙ্গোলিয়া। নিন্মে ২০১৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের এক নজরে সার্বিক পরিস্থিতি তুলেধরা হলো :-

Country	Land Area (Million sq. km)	Population (Million)	GDP Size (US$ Billion)	Per Capita Income (Current US$)	Export in 2018 (Billion US$)
China	9.39	1,392.73	13,608.15	9,770.80	2,494.23
India	2.97	1,352.62	2,718.73	2,010.00	323.06
South Korea	0.10	51.61	1,619.42	31,380.10	605.17
Bangladesh	0.13	161.36	274.02	1,698.30	43.53
Sri Lanka	0.06	21.67	88.90	4,102.05	11.97
Lao PDR	0.23	7.62	17.95	2,542.50	5.57
Mongolia	1.55	3.17	13.07	4,121.70	7.01

Source : World Bank data

খ) APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে আন্ত-বানিজ্য :

APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্যের গতি প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহের জন্য অধিক সংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান এবং আন্ত-বানিজ্য সহজীকরনের লক্ষ্যে পণ্যের অরিজিন নির্ধারনে সকল সদস্য দেশের একই পদ্ধতি অনুস্মরণ অথবা প্রয়োজনে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশ সমূহের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে। APTA চুক্তির সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য সদস্য দেশসমূহের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ পণ্যের উপর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় বাংলাদেশ এ চুক্তির আওতায় অন্য সকল সদস্য দেশের চেয়ে খুবই নগণ্য পরিমাণ রপ্তানি সুবিধা নিতে পারছে এবং সবার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বানিজ্য ঘাটতিতে রয়েছে। অবাক করার মত বিষয় হচ্ছে, মঙ্গোলিয়া APTA চুক্তির নতুন সদস্য দেশ হওয়া সত্বেও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আন্ত বানিজ্যে বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ রপ্তানি করেছে এবং ঐ বছর APTA আন্ত-বানিজ্যে মঙ্গোলিয়ার বানিজ্য উদ্বৃত্ত ইউ.এস.ডলার + ১,৪৫৭.০৮ মিলিয়ন, অথচ ঐ অর্থবছরে আন্তবানিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি ইউ.এস.ডলার - ১৯,৩৭১.৯৭ মিলিয়ন। APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে সংঘটিত আন্ত বানিজ্যের গড়ে প্রায় ৯০% চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার দখলে এবং অবশিষ্ট ১০% ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য সদস্য দেশের দখলে রয়েছে।

আঞ্চলিক বানিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে APTA নিসন্দেহে একটি অনবদ্য উদ্যোগ, কিন্তু চায়না ও দক্ষিণ কোরিয়া এ চুক্তির পুরোপুরি সদ্যবহার ও ভারত অংশিক সদ্যবহার করতে পারলেও বাংলাদেশ এ চুক্তির খুব সামান্যই সদ্যবহার করতে পারছে বলা চলে। উদাহরণস্বরুপ-২০১৫-১৬ অর্থবছরে APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে আন্ত রপ্তানি সর্বমোট ইউ.এস.ডলার ৩৭৮.৯০ বিলিয়ন, যারমধ্যে চীনের রপ্তানি ১৭২.৬৭ বিলিয়ন (৪৫.৫৭%), দ. কোরিয়া ১৭৩.০১ বিলিয়ন (৪৫.৬৬%), ভারত ২৫.০৫ বিলিয়ন (৬.৬১%), বাংলাদেশ ১.৮৮ বিলিয়ন (০.৪৯%) লাওস ১.৫৬ বিলিয়ন (০.৪১%), শ্রীলংকা ১.১০ বিলিয়ন (০.২৯%) এবং মঙ্গোলিয়া ৩.৬৪ বিলিয়ন (০.৯৬%) [স্মারণী-৫.৯(২৮)]। ঐ একই অর্থবছরে APTA চুক্তির আওতায় বানিজ্য ঘাটতি (ইউ.এস.ডলার) বাংলাদেশের ১৯,৩৭১.৯৭ মিলিয়ন, ভারতের ৪৭,০৪৫.৬৬ মিলিয়ন, শ্রীলংকার ৭,৬৬৯.৯৪ মিলিয়ন এবং চীনের ৪,১৯৫.৮২ মিলিয়ণ। এ সময়ে দ. কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও লাওস এ তিন দেশের বানিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে যথাক্রমে ৭৫,৪৩৬.৯৪ মিলিয়ন, ১,৪৫৭.০৮ মিলিয়ন ও ৪২৩.১৯ মিলিয়ন।

স্মারণী-৫.৯(২৮) : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে APTA সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে সংঘটিত আন্ত-বানিজ্যের চিত্র :-

Importing Countries	Exporting Countries (US$ Million)							Total Imports (Million US$)
	China	Bangladesh	India	Lao PDR	S. Korea	Sri Lanka	Mongolia	
China	-	869.40	11,764.13	1,359.61	158,974.53	273.44	3,622.60	176,863.71
Bangladesh	14,300.64	-	5,668.79	0.35	1,158.42	118.87	-	21,247.07
India	58,397.76	677.10	-	172.41	12,214.05	632.27	2.35	72,095.94
Lao PDR	986.97	0.14	23.93	-	126.41	2.14	-	1,139.59
South Korea	93,707.10	293.11	3,465.42	22.74	-	70.87	10.36	97,569.60
Sri Lanka	4,286.88	29.35	4,118.25	7.59	324.42	-	2.12	8,768.61
Mongolia	988.54	6.00	9.76	0.02	208.71	1.08	-	1,214.11
Total Export	172,667.89	1,875.10	25,050.28	1,562.72	173,006.54	1,098.67	3,637.43	378,898.63

Trade Summary : 2015-16

(Million US$)

Total Export	172,667.89	1,875.10	25,050.28	1,562.72	173,006.54	1,098.67	3,637.43	378,898.63
Export (%)	45.57	0.49	6.61	0.41	45.66	0.29	0.96	
Total Import	176,863.71	21,247.07	72,095.94	1,139.59	97,569.60	8,768.61	2,180.35	378,898.63
Import (%)	46.68	5.61	19.03	0.30	25.75	2.31	0.32	
Trade Balance	- 4,195.82	- 19,371.97	- 47,045.66	+ 423.13	+75,436.94	- 7,669.94	+1,457.08	-

Source : Review by Selim Raihan, Professor- Dept. of Economics, DU.

২) SAFTA : South Asian Free Trade Area :

SAFTA : South Asian Free Trade Area :

সার্কভূক্ত দেশসমূহের মাঝে (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, ভুটান, নেপাল ও মালদ্বীপ) ট্যারিফ ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে বানিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এপ্রিল, ১৯৯৩ সালে SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangements) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ডিসেম্বর, ১৯৯৫ থেকে কার্যকরি শুরু হয়। SAPTA পুরোপুরি কার্যকর করতে ২০০২ সাল পর্যন্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে চার (৪) দফা ট্রেড় নেগোসিয়েশনের পর ঐক্যমতে পৌঁছাতে ব্যার্থ হলে সার্কভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে আন্তযোগাযোগ, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও ট্রানজিট সুবিধার উন্নয়নে ২০০৪ সালে SAFTA (South Asian Free Trade Area) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ২০০৬ সালের শুরু থেকে কার্যকরি হয়।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, সার্কভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তঃদেশিয় বানিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা SAFTA চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও, সকল সদস্য দেশ আমদানি ও রপ্তানি উভয়ক্ষেত্রে সিংহভাগ ভারতের উপর নির্ভরশীল। অন্য সদস্য দেশ সমূহের মাঝে আন্ত বানিজ্যিক লেনদেন মাত্রারিক্ত কম এবং অনেকক্ষেত্রে মোটেও নেই। কারণস্বরুপ বলা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক বানিজ্যের অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলির ঘাটতি (যেমন- পণ্যের গুণগত মান, প্রতিযোগিতা মূলক দাম, দ্রুত শিপমেন্ট ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অপর্যাপ্ততা) সম্বলিত দেশের সাথে কোনো দেশই সাধারণত বানিজ্যিক লেনদেন করতে আগ্রহী হয়না, যত চুক্তি বা ভালো সম্পর্ক থাকুক না কেন। সার্কভূক্ত বেশিরভাগ দেশই আন্তর্জাতিক বানিজ্যের অত্যাবশ্যকীয় শর্তবলির ঘাটতিতে ভূগছে, ফলে বানিজ্যেরক্ষেত্রে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হওয়া কঠিন। অতএব, বলা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয়ক্ষেত্রে বানিজ্য সহযোগিতা চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চুক্তিভূক্ত দেশ সমূহের আন্তর্জাতিক বানিজ্যের অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলির পর্যাপ্ততার উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

SAFTA চুক্তির আওতায় সার্কভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে আন্তঃ বানিজ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভারত অন্য সকল সদস্য দেশের আমদানি ও রপ্তানির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং পাকিস্তান এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে SAFTA সদস্য দেশসমূহের মোট আন্তঃ রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ২২,৭৪২.২০ মিলিয়ন, যারমধ্যে ভারত ১৬,৯৩৩.১৯ মিলিয়ন (৭৪.৪৬%), পাকিস্তান ২,৭৯৮.৩৪ মিলিয়ন (১২.৩০%), বাংলাদেশ ৭৬৭.৯৫ মিলিয়ন (৩.৩৮%), শ্রীলংকা ৯২৩.৬৪ মিলিয়ন (৪.০৬%), আফগানিস্তান ৬৫২.৩৭ মিলিয়ন (২.৮৭%), ভূটান ১৭০.৫১ মিলিয়ন (০.৭৫%), নেপাল ৩৯৭.১৭ মিলিয়ন (১.৭৫%) এবং মালদ্বীপ ৯৯.০৩ মিলিয়ন (০.৪৪%) রপ্তানি করে। ঐ অর্থবছরে মোট আন্ত আমদানির ২৮.৫১% বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ১৯.৯৫%, নেপাল ১৯.৯৪%, ভারত ১১.৩১%, পাকিস্তান ৯.১৭%, আফগানিস্তান ৮.১৭%, ভূটান ১.৬৬%, এবং মালদ্বীপের দখলে ১.২৯%।

সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃ আমদানিতে বাংলাদেশর স্থান প্রথম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের হিসাব মতে ঐ বছর বাংলাদেশের আন্তঃ আমদানি ইউ.এস.ডলার ৬,৪৮৪.১৭ মিলিয়ন, যার ৮৭.৪৩% ভারত, ১০.১২% পাকিস্তান, ১.৮৩% শ্রীলংকা এবং .৬২% ভুটান, নেপাল ও মালদ্বীপ থেকে আমদানি হয়েছে। আন্তবানিজ্যে ঘাটতির দিক থেকেও বাংলাদেশ প্রথম স্থানে রয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সার্ক আন্তঃ বানিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি ইউ.এস.ডলার ৫,৭১৬.২২ মিলিয়ন, যেখানে নেপালের ঘাটতি ৪,১৩৬.৯১ মিলিয়ন, শ্রীলংকার ৩,৬১৪.৫২ মিলিয়ন, আফগানিস্তানের ১,২০৪.৮৫ মিলিয়ন, ভূটানের ২০৭.৬১ মিলিয়ন এবং মালদ্বীপের ১৯৪.৯৩ মিলিয়ন। এ সময়ে আন্তঃবানিজ্যে ভারত ও পাকিস্তানের বানিজ্য উদ্বৃত্ত যথাক্রমে ইউ.এস.ডলার ১৪,৩৬১.৫৬ মিলিয়ন ও ৭১৩.৫৪ মিলিয়ন স্মারণী-৫.৯(২৯) ।

SJFBD

স্মারণী-৫.৯(২৯) : SAFTA চুক্তির আওতায় সার্কভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংঘটিত আন্তঃ বানিজ্যের চিত্র :-

Intra-SAARC Trade scenario during F.Y : 2015-16

(Exports & Imports among SAARC Countries)

Imports	Export (US$ Million)								Total Imports (Million US$)
	India	Pakistan	Bangladesh	Sri Lanka	Afganistan	Bhutan	Nepal	Maldives	
India	0	461.08	677.10	632.27	282.29	127.33	385.31	6.25	2 ,571.63
Pakistan	1,592.58	0.00	48.60	66.33	369.90	0.11	0.96	6.32	2,084.80
Bangladesh	5,668.79	656.16	0.00	118.87	0.05	39.97	0.05	0.28	6,484.17
Sri Lanka	4,118.25	304.12	29.35	0.00	0.05	0.00	0.21	86.18	4,538.16
Afganistan	472.99	1,369.77	4.71	0.63	0.00	0.00	9.12	0.00	1,857.22
Bhutan	374.21	0.00	2.44	0.04	0.00	0.00	1.49	0.00	378.18
Nepal	4,526.22	0.81	2.62	1.26	0.08	3.09	0.00	0.00	4,534.08
Maldives	180.15	6.40	3.13	104.24	0.00	0.01	0.03	0.00	293.96
Total Export:	16,933.19	2,798.34	767.95	923.64	652.37	170.51	397.17	99.03	22,742.20
	Trade Summary of 2015-16 (Million US$)								
Country Export	16,933.19	2,798.34	767.95	923.64	652.37	170.51	397.17	99.03	22,742.20
Export %	74.46	12.30	3.38	4.06	2.87	0.75	1.75	0.44	100
Country Import	2 ,571.63	2,084.80	6,484.17	4,538.16	1,857.22	378.18	4,534.08	293.96	22,742.20
Import %	11.31	9.17	28.51	19.95	8.17	1.66	19.94	1.29	100
Trade Balance	14,361.56	713.54	- 5,716.22	-3,614.52	- 1,204.85	- 207.61	- 4,136.91	- 194.93	Nil

Source : Review by Selim Raihan, Professor- Dept. of Economics, DU

SJFBD

BIMSTEC :

৩) BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation :

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলভূক্ত দেশ সমূহের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বানিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা বর্তমান বিশ্বে মডেল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্ববানিজ্য সংস্থার হিসাবে এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ২৮৭ টি আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তি (RTAs) স্বাক্ষরিত হয়েছে। BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation) ঠিক তেমনি একটি আঞ্চলিক বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি যা দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড এই ৪টি দেশের মধ্যে ৬ই জুন, ১৯৯৭ সালে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে মিয়ানমার এবং ২০০৪ সালে ভূটান ও নেপাল এ চুক্তিতে যোগ দেয়। এ চুক্তির আওতায় সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে ১৪ টি সেক্টরকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে :-

1	Trade and Investment	8	Cultural Cooperation
2	Technology	9	Environment and Disaster Management
3	Energy Sector	10	Public Health
4	Transport and Communication	11	People to People contact
5	Tourism	12	Poverty Alleviation
6	Fisheries	13	Counter-Terrorism and Transnational Crime
7	Agriculture	14	Climate change

ক) একনজরে BIMSTEC সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের অবস্থান :

BIMSTEC সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় রয়েছে ভারত ও থাইল্যান্ড এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নেপাল ও ভূটান। ২০২০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে BIMSTEC সদস্যভূক্ত দেশ সমূহের এক নজরে সার্বিক পরিস্থিতি নিন্মের ছকে তুলেধরা হলো :-

Country	Land Area (Million Sq. KM)	Population (Million)	GDP Size (US$ Billion)	Per Capita Income (Current US$)
India	2.97	1,380.00	2,708.77	1,928.00
Thailand	0.51	69.80	501.88	7,187.00
Bangladesh	0.13	164.69	329.12	1,961.00
Sri Lanka	0.06	21.41	80.77	3,681.00
Myanmar	0.65	54.41	81.26	1,468.00
Nepal	0.14	29.14	34.47	1,155.00
Bhutan	0.04	0.77	2.50	3,001.00

Source : statisticstimes.com / Worldometer

BIMSTEC আন্তঃ বানিজ্যের চিত্র :

খ) BIMSTEC আন্তঃ বানিজ্যের চিত্র :

২০১৫-১৬ অর্থবছরে BIMSTEC আন্তঃ বানিজ্যের আকার দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৩৭.৯৬ বিলিয়ন, ২০০০ সালে যা ছিল ৩.৯২ বিলিয়ন, ২০০৫ সালে ৯.৬৫ বিলিয়ন এবং ২০১০ সালে ২৪.৮২ বিলিয়ন (WTC, Mumbai)। BIMSTEC সদস্যভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃ রপ্তানির প্রায় ৯৫% ভারত, থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারের দখলে, অবশিষ্ট ৫% রপ্তানি করে শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে BIMSTEC আন্তঃ রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৩৭,৯৬০.১৮ মিলিয়ন, যারমধ্যে ভারতের রপ্তানি ১৮,৯৯৮.২৫ মিলিয়ন (৫০.০৫%), থাইল্যান্ড ১১,৫২৫.৯২ মিলিয়ন (৩০.৩৬%), মিয়ানমার ৫,৪১৯.৩৫ মিলিয়ন (১৪.২৮%), শ্রীলংকা ৭২৮.৩৯ মিলিয়ন (১.৯২%), বাংলাদেশ ৬৬৫.৮২ মিলিয়ন (১.৬৪%) এবং নেপাল ৬২২.৪৫ মিলিয়ন (১.৬৪%) স্মারণী-৫.৯(৩১)।

ঐ অর্থবছরে BIMSTEC আন্তঃ আমদানিতে ভারতের অংশ ২৩.২৮%, থাইল্যান্ড ১৮.৬১%, মিয়ানমার ১৪.৭৪%, শ্রীলংকা ১১.৮৪%, বাংলাদেশ ১৮.৫৩% ও নেপাল ১৩%। ঐ অর্থবছরে BIMSTEC আন্তঃ বানিজ্যে ঘাটতির দিকথেকে বাংলাদেশ প্রথম (ইউ.এস.ডলার ৬.৩৭ বিলিয়ন), নেপাল দ্বিতীয় (৪.৩১ বিলিয়ন), শ্রীলংকা তৃতীয় (৩.৭৭ বিলিয়ন) এবং মিয়ানমার চতুর্থ (০.১৭ বিলিয়ন) স্থানে রয়েছে। এ সময়ে আন্তঃ বানিজ্যে ভারত ও থাইল্যান্ডের বানিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে যথাক্রমে ইউ.এস.ডলার ১০.১৬ বিলিয়ন ও ৪.৪৬ বিলিয়ন স্মারণী-৫.৯(৩০)।

স্মারণী-৫.৯(৩০) : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে BIMSTEC আন্ত বানিজ্যে সদস্য দেশসমূহের ঘাটতি / উদ্বৃত্তের চিত্র :-

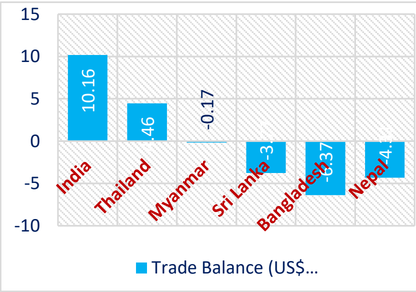

Source : Researchgate.net

স্মারণী-৫.৯(৩১) : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে BIMSTEC আন্ত বানিজ্যের (BIMSTEC Inter-Trade) চিত্র :-

Importing Countries	Exporting Countries (Million US$)	Total Imports (Million US$)

SJFBD

	India	Thailand	Myanmar	Sri Lanka	Bangladesh	Nepal	
India	-	5,686.98	1,401.03	591.69	556.64	602.04	8,838.38
Thailand	3,045.26		3917.02	58.46	43.60	0.90	7,065.27
Myanmar	955.94	4,614.95	-	5.76	16.97		5,593.62
Sri Lanka	3,977.06	461.92	29.71	-	26.06	0.04	4,494.79
Bangladesh	6,174.40	698.91	71.59	68.30	-	19.44	7,032.64
Nepal	4,845.59	63.16		4.18	22.55	-	4,935.48
Total Export:	18,998.25	11,525.92	5,419.35	728.39	665.82	622.45	37,960.18
Trade Summary of 2015-16							(Million US$)
Total Export:	18,998.25	11,525.92	5,419.35	728.39	665.82	622.45	37,960.18
Export %	50.05	30.36	14.28	1.92	1.75	1.64	100
Total Import	8,838.38	7,065.27	5,593.62	4,494.79	7,032.64	4,935.48	37,960.18
Import %	23.28	18.61	14.74	11.84	18.53	13.00	100
Trade Balance	10,159.87	4,460.65	-174.27	-3,766.40	-6,366.82	-4,313.03	

Source : Researchgate.net

ঝ) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সামগ্রিক বানিজ্য :

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সামগ্রিক বানিজ্য :

বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যের সিংহভাগ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন বানিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি সমূহের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং এ সমস্ত চুক্তিতে ঘোষণাকৃত শুল্কমুক্ত ও অন্যান্য সুবিধা কাজে লাগানোর সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দেশ ভিত্তিক আমদানি ও রপ্তানির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের সামগ্রিক বানিজ্য বিশ্লেষণে দেখাযায়, চলমান আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তিসমূহের আওতায় (APTA, SAFTA and BIMSTEC) আমদানি বানিজ্যের ৮০% এবং রপ্তানি বানিজ্যের আনুমানিক ১০% সম্পাদিত হয়। অবশিষ্ট ২০% আমদানি ও ৯০% রপ্তানি সম্পাদিত হয় ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সাথে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের বানিজ্য ঘাটতি ইউ.এস.ডলার ৭,৮৬৫ মিলিয়ন, যারমধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সাথে বানিজ্য উদ্বৃত্ত ইউ.এস.ডলার ২৩,৫৯০ মিলিয়ন এর বিপরীতে আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তিসমূহের আওতায় বানিজ্য ঘাটতি ইউ.এস.ডলার ৩১,৪৫৫ মিলিয়ন।

অর্থাৎ আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তি সমূহের আওতায় বাংলাদেশ আমদানি চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারলেও ঐ সমস্ত চুক্তিতে ঘোষণাকৃত শুল্কমুক্ত ও অন্যান্য সুবিধা কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারছেনা মোটেও, ফলে আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তি সমূহের আওতায় বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য স্মারণী-৫.৯(৩২)।

স্মারণী-৫.৯(৩২) : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের আওতায় বাংলাদেশের সামগ্রিক বানিজ্যের চিত্র :-

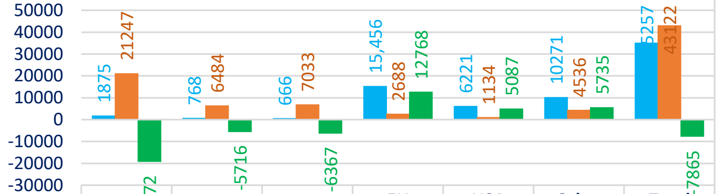

	APTA	SAFTA	BIMSTEC	EU Market	USA Market	Other Countries	Total Trade
Export (Million US$)	1875	768	666	15,456	6221	10271	35257
Import (US$ Million)	21247	6484	7033	2688	1134	4536	43122
Trade Balance (US$ Million)	-19372	-5716	-6367	12768	5087	5735	-7865

Source : MOF, Research gate and other source.

ঞ) রপ্তানিখাতে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

রপ্তানিখাতে বিরাজমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

দেশে রপ্তানিমূখী শিল্পের অপর্যাপ্ততা, উন্নত কাঁচামাল ও প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা না থাকায় নিন্মমানের পণ্য উৎপাদন, সীমিত রপ্তানি বাজার পরিসর এবং শিল্পসেক্টরে প্রশাসনিক ও লজিষ্টিক দূর্বলতাসহ বহুবিধ কারণে দেশের রপ্তানিখাত গুটিকয়েক রপ্তানিপণ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর থেকে ৫ দশক অতিক্রান্ত হলেও একমাত্র তৈরি পোশাক ব্যাতিত অন্য কোনো পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে তেমন কোনো উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। ফলে আন্তর্জাতিক বানিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অদ্যাবধি খুব নগণ্যই রয়ে গেছে। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার রিপোর্ট ২০২১ অনুযায়ী ২০২০ সালে বিশ্বের ১০০টি প্রধান রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫২ তম এবং ঐ সময়ে আন্তর্জাতিক বানিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ .২% (৪৬.৬০ বিলিয়ন) মাত্র, যেখানে চীনের অংশগ্রহণ ১৪.৭%, জাপান ৩.৬%, হংকং ৩.১%, দ. কোরিয়া ২.৯%, সিঙ্গাপুর ২.১%, ভারত ১.৬%, থাইল্যান্ড ১.৩%, মালয়েশিয়া ১.৩% এবং ইন্দোনেশিয়ার অংশগ্রহণ ০.৯% ।

রপ্তানিখাতের উন্নয়নে বিগত সরকারগুলো বারবার রপ্তানি নীতিমালা পরিবর্তন করেছে ঠিকই কিন্তু দেশের রপ্তানিখাতের অবস্থান তৈরি পোশাক ব্যাতিত অন্যান্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে অনেকটা একই অবস্থানে রয়ে গেছে। বর্তমান সরকারের আমলেও রপ্তানি নীতিমালা ২০১৬ ও ২০১৮-২১ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতায় সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, স্থলপথ, ব্রীজ, রেলওয়ে, পোর্ট এবং গভীর সমুদ্র বন্দরসহ অন্তত ১০ টি খাতে মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি রপ্তানিমূখী শিল্পোন্নয়নে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে শতাধিক রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকার উন্নয়নসহ বেশকিছু রপ্তানি পণ্যের উপর ক্যাশ ইনসেনটিভ, ট্যাক্স মওকুফ, কর অবকাশ সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।

রপ্তানিখাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত এসমস্ত উদ্যোগ নিঃসন্দেহে রপ্তানিখাতের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, তবে রপ্তানিখাতে বিরাজমান অন্তর্নিহিত সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করনপূর্বক ঐ সমস্ত সমস্যার যথাযথ সমাধান ব্যাতিত এখাতের উন্নয়নে সকল পরিকল্পণা অতীতের ন্যায় ভেস্তে যাবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

নিন্মে রপ্তানিখাতে বিরাজমান সমস্যা সমূহের সংক্ষিপ্তসার তুলেধরা হলো :-

১. **ব্যবসার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ও ব্যবসা সহজিকরনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা :** ব্যবসার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি ও ব্যবসা সহজিকরনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে। বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়ন সূচক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ সালে সহজ ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭০তম, পরবর্তী বছর গুলোতে ক্রমান্বয়ে অবনতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ২০১৫ সালে ১৭৩ তম, ২১৬ সালে ১৭৮তম, ২০১৭ সালে ১৭৬তম, ২০১৮ সালে ১৭৭তম, ২০১৯ সালে ১৭৬তম এবং ২০২০ সালে কিছুটা এগিয়ে ১৬৮তম স্থানে অবস্থান করছে [স্মারণী-৫.৯(১)]।

   এ সময়কালে দেশে ব্যবসা সহজিকরনে বিবেচ্য, যেমন- সহজ ব্যবসা পরিচালন, ব্যবসা শুরু করা, নির্মাণ কাজের অনুমতি প্রদান, বিদ্যুৎ সংযোগ, সম্পত্তি নিবন্ধন, ঋণ পাওয়া, সংখ্যলঘু বিনিয়োগকারিদের সুরক্ষা প্রদান, কর পরিশোধ, সীমান্ত বানিজ্য, চুক্তি বলবৎ ও দেউলিয়াত্ব সমাধান এ ১১ টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের মধ্যে ৩টি সূচকের সামান্য অগ্রগতি হলেও অবশিষ্ট সকল সূচকেই বাংলাশে পিছিয়ে পড়েছে, দেশে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ও দেশি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রধান অন্তরায় [স্মারণী-৫.৯(২)]।

SIFBD

২. **গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতায় পিছিয়ে থাকা :** গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় দেশসমূহের তুলনায় অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ বানিজ্য সক্ষতায় ১৪০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম, অবকাঠামোর দিকথেকে ১০৯তম, আভ্যন্তরীণ বাজার বিচেনায় ৩৬তম, ব্যক্তিখাতে আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের ক্ষেত্রে ৭৯তম, ইনোভেশনের দিক থেকে ১০২তম, গবেষণা ও উন্নয়নে ৭৭তম, বানিজ্যিকীকরনে ১০৯তম, ব্যক্তিখাতের অবদানে ৬০তম এবং সহজ শ্রমবাজারের দিকথেকে ১১৫ তম অবস্থানে রয়েছে স্মারণী-৫.৯(৩) ।

রপ্তানিখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতার সকল সূচকে স্বল্পতম সময়ে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় রপ্তানিখাতের দৈন্যদশা সহসা কাটিয়ে উঠা অসম্ভব।

৩. **লজিষ্টিক সাপার্ট সক্ষমতায় পিছিয়ে থাকা :** আন্তর্জাতিক বানিজ্য উন্নয়নে লজিষ্টিক সাপোর্ট, যেমন-কাষ্টমস্, অবকাঠামো, জাহাজীকরণ, লজিষ্টিক সক্ষমতা, ট্রাকিং এন্ড ট্রেসিং এবং লীড টাইম ইত্যাদি অন্যতম ফ্যাক্টর। লজিস্টিক সাপোর্টের দক্ষতা ও পর্যাপ্ততার দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় দেশ সমূহের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৮ সালের গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে ১৬০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম, শ্রীলংকা ৯৪তম, মালদ্বীপ ৮৬তম, ইন্দোনেশিয়া ৪৬তম, ভারত ৪৪তম, মালয়েশিয়া ৪১তম, থাইল্যান্ড ৩২তম, চীন ২৬তম এবং দ. কোরিয়া ২৫তম অবস্থানে রয়েছে। কাজেই, রপ্তানিখাতের দ্রুত প্রসার নিশ্চিত করতে লজিষ্টিক সাপোর্ট সক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পূর্বক রপ্তানি সহজিকরণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি করার বিকল্প নেই।

৪. **অপর্যাপ্ত অবকাঠামো :** শিল্পোন্নয়ন, বানিজ্য বৃদ্ধি ও সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিক অবকাটামোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ উন্নত অবকাঠামো বিবেচনায় ১৪০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯, যেখানে পাকিস্তান ৯৩, ভিয়েতনাম ৭৫, ইন্দোনেশিয়া ৭১, শ্রীলংকা ৬৫, ভারত ৬৩, থাইল্যান্ড ৬০, চীন ২৯ ও দ. কোরিয়া ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.৯(৬)]।

শিল্পোন্নয়ন ও বানিজ্য প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় আরোও অনেক বৃদ্ধি করা জরুরি, সেটা যেভাবেই হউক।

৫. **দেশে রপ্তানিমূখী শিল্পের অপর্যাপ্ততা :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দুর্বল রপ্তানি নীতির কারণে একদিকে যেমন দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক রপ্তানিমূখী শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়নি, অন্যদিকে রপ্তানিখাতে পণ্যের সংখ্যা ও রপ্তানি বাজার কোনোটাই বৃদ্ধি পায়নি। ফলে অদ্যাবধি একমাত্র তৈরি পোশাক ব্যাতিত অন্য কোনো পণ্য রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে প্রতিবছর বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতে হয়, ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি বানিজ্য ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে, একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা অন্যতম বড় অন্তরায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মোট ইউ.এস.ডলার ৩৬,২০৯ মিলিয়ন রপ্তানির বিপরীতে আমদানি ছিল ইউ.এস.ডলার ৫৪,৪৬৩ মিলিয়ন এবং ঐ অর্থবছরে বানিজ্য ঘাড়তির পরিমাণ

SJFBD

ইউ.এস.ডলার ১৮,২৫৮মিলিয়ন যা ঐ অর্থবছরে সম্পাদিত মোট বৈদেশিক বানিজ্যের ২০.১৪%।

৬. **আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে পিছিয়ে থাকা :** বাংলাদেশে উৎপাদনশীলখাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার কম হওয়ার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মানসন্মত পণ্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছেনা, ফলে উন্মুক্ত অর্থনীতির এ যুগে প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়ে থাকার পাশাপাশি দেশের শিল্প সেক্টরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

৭. **এক্সপোর্ট কোয়ালিটি উন্নয়নে অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা :** রপ্তানিজাত সকল পণ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকল্পে দেশে পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ও বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে পিছিয়ে পড়ছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যার্থ হচ্ছে, রপ্তানি বৃদ্ধিরক্ষেত্রে যা অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা। উদাহরণস্বরুপ, তৈরীপোশাকের আন্র্জাতিক মান নিশ্চিতকল্পে দেশে বিভিন্ন স্তরে যে ধরনের পরীক্ষাগার ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সকল রপ্তানিজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকল্পে একই ধরনের ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যক।

৮. **রপ্তানিতে একক পণ্য নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া :** বিগত দুই যুগেরও অধিক কাল ধরে দেশের রপ্তানি বানিজ্য অনেকটা একক পণ্য নির্ভর হয়ে পড়েছে, যা একটি দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ। বিগত দশকে (২০০৯-২০১৮) দেশে বার্ষিক গড় রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ২৯,৭৯৭ মিলিয়ন, যার ৮১% তৈরি পোশাক, ১৪.৫% শিল্পজাত পণ্য এবং ৪.৫% কৃষিজাত পণ্য। মোট রপ্তানিতে একক পণ্যে নির্ভরশীলতার দিকথেকে এশিয়ার অন্যান্য সম্ভাবনাময় দেশ সমূহের তুলনায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ নির্ভরশীলতা বহুগুণ বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানিতে একক পণ্যের অংশ ভারতে ১৬.৪%, থাইল্যান্ডে ১৭%, পাকিস্তানে ১৮.১%, ইন্দোনেশিয়ায় ২১.৮%, ভিয়েতনামে ৩৮.১%, ফিলিপাইনে ৪৪.৮% এবং বাংলাদেশে ৮৩.৪৯%।

রপ্তানিতে একক পণ্য নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি কৃষি ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের মানসন্মত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঐ সমস্ত পণ্যের বাজার অন্বেষণে প্রয়োজনীয় সবকিছু করা উচিৎ, যাতে ভবিষ্যতে যদি কখনো তৈরি পোশাক শিল্পে স্থবিরতা দেখা দেয়, অন্যান্য পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে তা যেন পুষিয়ে নেওয়া যায়।

৯. **সেবা রপ্তানিতে পিছিয়ে থাকা :** সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে ও দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নশীল দেশ সমূহের তুলনায় এমনকি স্বল্পোন্নত অনেক দেশের তুলনায় একদমই পিছনে পড়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে জি.ডি.পি অনুপাতে সেবা রপ্তানি বাংলাদেশ ১%, মিয়ানমার ৭.৪%, কম্বোডিয়া ২১.৪%, ইথিওপিয়া ৫.৬%, নেপাল ৬.২%, আফগানিস্তান ৩.৮% এবং ভূটান ৭%।

১০. **সীমিত রপ্তানি বাজার পরিসর : বাংলাদেশের রপ্তানি বানিজ্যের ৭৫-৮০% এর অংশীদার** যে ১২ টি দেশ, সেগুলো হচ্ছে- আমেরিকা, জার্মানি, বৃটেন, স্পেন, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, কানাড়া, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, ভারত ও চীন। বার্ষিক মোট রপ্তানির গড়ে ৭৫-৮০% রপ্তানি হয় এ ১২টি দেশে এবং অবশিষ্ট ২০-২৫% রপ্তানি হয় অন্যান্য দেশে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ৪০,৫৩৫ মিলিয়ণ, যার ১৬.৯৬% আমেরিকায়, ১৫.২৩% জার্মানি, ১০.২৮% বৃটেন, ৬.৩০% স্পেন, ৫.৪৭% ফ্রান্স, ৪.০৫% ইটালি, ৩.৩৭% জাপান, ৩.৩০%

SJFD

কানাড়া, ৩.১৫% নেদারল্যান্ডস্, ৩.১৫% পোল্যান্ড, ৩.০৭% ভারত, ২.০৫% চীন এবং ২৩.৬২% অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়।

১১. **রপ্তানিমূখী শিল্পেরক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনে বাধ্যবাধকতা না থাকা :** উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সনদ ঐ প্রতিষ্ঠান কতৃক মানসন্মত পণ্যোৎপাদনের স্বীকৃতি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। বাংলাদেশে রপ্তানিমূখী শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনে বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে বিশ্ববাজারে বেশিরভাগ পণ্য অবমূল্যায়িত ও প্রত্যাখ্যাত হয়, যা রপ্তানি বৃদ্ধিরক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা।

১২. **আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বানিজ্য সহযোগিতা চুক্তির অপ্রতুলতা :** আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইউরোপ ও আমেরিকার সাথে চলমান বানিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানি বানিজ্যের প্রায় ৬০% সম্পাদিত হয়। এশিয়া জোনে তিনটি বানিজ্য চুক্তি (APTA, SAFTA and BIMSTEC) চলমান থাকলেও এ সমস্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশর রপ্তানির পরিমাণ খুবই সামান্য, যা মোট রপ্তানির ১০% এর নিচে।

১৩. **চলমান বানিজ্য সহযোগিতা চুক্তি সমূহের আওতায় পর্যাপ্ত সুবিধা নিতে ব্যার্থ হওয়া :** চলমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বানিজ্য সহযোগিতা চুক্তি সমূহের আওতায় প্রদত্ত সুবিধাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ খুব কম সুবিধা কাজে লাগাতে পারছে বলা চলে। ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের প্রায় সব পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার থাকলেও একমাত্র তৈরিপোশাক ব্যাতিত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ সুবিধা নিতে পারছে খুবই সামান্য। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ১৬.৩ বিলিয়ন, যারমধ্যে তৈরিপোশাক ১৫.৩ বিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য পণ্য ১ বিলিয়ন ডলার মাত্র। আমেরিকার বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রেও একই চিত্র, একমাত্র তৈরিপোশাক ব্যাতিত বিশাল আমেরিকার বাজারে অন্যান্য পণ্য রপ্তানির পরিমাণ খুবই সামান্য।

তাছাড়া, আঞ্চলিকভাবে তিনটি প্রধান বানজ্য চুক্তির (APTA, SAFTA and BIMSTEC) আওতায় ১০,০০০ এর অধিক পণ্যের উপর সম্পূর্ণ / আংশিক শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকলেও অন্যান্য সদস্য দেশ সমূহের তুলনায় বাংলাদেশ এ সুবিধা নিতে পারছে খুবই সামান্য। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তিসমূহের আওতায় বাংলাদেশের রপ্তানি ইউ.এস.ডলার ৩,৩০৯ মিলিয়ন, যা ঐ সময়ে দেশের মোট রপ্তানির ৯.৩৯% মাত্র। ঐ অর্থবছরে আঞ্চলিক চুক্তি সমূহের আওতায় আমদানি ইউ.এস.ডলার ৩৪,৭৬৪ মিলিয়ন, যা ঐ সময়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮১% এবং ঐ অর্থবছরে আঞ্চলিক চুক্তিসমূহের আওতায় দেশের বানিজ্য ঘাটতি ইউ.এস.ডলার ৩১,৪৫৫ মিলিয়ন।

SIIFBD

১৪. **স্বল্প সংখ্যক শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এবং ব্যবসা উন্নয়নে ঐসব সংগঠনের সীমিত তৎপরতা :**

দেশের বর্তমান শীর্ষ চারটি ব্যবসায়ী সংগঠন হলো :-

i) Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI).
ii) Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).
iii) Foreign Chamber of Commerce and Industries (FCCI) ; এবং
iv) Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI)

দেশের সামগ্রিক ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে সকল দেশে ব্যবসায়িক সংগঠনসমূহ সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবসা বানিজ্য সম্প্রসারণে ব্যবসায়িক সংগঠনসমূহের উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকর্মের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :-

- ব্যবসাবানিজ্যের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সরকারের নজরে তুলেধরা এবং ঐ সমস্ত সমস্যার যথাযথ সমাধানে সরকারকে বাস্তবধর্মী পরামর্শ প্রদান করা।
- দেশে শিল্প ও ব্যবসাবানিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর পন্থা এবং রপ্তানি প্রসারে আন্তর্জাতিক চাহিদার ভিত্তিতে শুল্ক ও ট্যারিফ সমন্বয়ের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- বিভিন্ন দেশথেকে আগত ব্যবসায়ী ডেলিগেটদের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐ সমস্ত দেশের সাথে ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন দেশে ডেলিগেট প্রেরনের মাধ্যমে ঐ সমস্ত দেশের সাথে বানিজ্য সম্ভাবনা যাছাইপূর্বক তা কাজে লাগাতে সরকার ও ব্যবসায়ী মহলকে উদ্বুদ্ধ করা।
- বাংলাদেশের জন্য বানিজ্য সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে নতুনভাবে বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি চলমান বানিজ্য চুক্তি সমূহের আওতায় প্রদত্ত সুবিধাবলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে ব্যবসায়ী মহলে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে শিল্প ও ব্যবসাবানিজ্যের উন্নয়নে ব্যবসায়ী মহলে সচেতনতা বৃদ্ধিপূর্বক ব্যবসায়ী মহলকে সক্রিয় করে তোলা ; এবং
- আন্তর্জাতিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন সমস্যা, যেমন-অমদানিক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী পণ্য সর্বরাহ না করা, নিম্নমানের অথবা মেয়াদোর্ত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করা এবং রপ্তানিক্ষেত্রে তুচ্ছ কারণে শিপমেন্ট বাতিল করা ও পেমেন্ট আটকে রাখাসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ঠ দেশসমূহের দুতাবাসের মাধ্যমে ব্যবসায়ী মহলকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।

উল্ল্যেখ করার মত বিষয় হচ্ছে, প্রথমত আমাদের দেশে শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠণ রয়েছে হাতেগুণা কয়েকটি মাত্র, দ্বিতীয়ত জাতিয় বাজেট সময়কালিন কিছুটা সরগরম হওয়া ছাড়া দেশে শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে এ সমস্ত সংগঠনের অন্য কোনো উল্ল্যেখযোগ্য ক্রিয়াকর্ম তেমন চোখে পড়েনা।

১৫. **রপ্তানিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে অপর্যাপ্ত গবেষণা ও প্রযুক্তি বিনিময় কার্যক্রম :** রপ্তানিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে পণ্য ও সেবা দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে দেশে মানসম্পন্ন রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন এবং সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে সেবার মানোন্নয়নে প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরা অপরিহার্য। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে দেশিয় পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও সেবাখাতের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকরা অত্যন্ত জরুরি। বলা বাহুল্য, গবেষণা ও প্রযুক্তি বিনিময় এ দুটোর কোনোটিই এখনো আমাদের দেশে পর্যাপ্ত নয়।

১৬. **প্রশাসনিক অদক্ষতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা :** প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ছাড়পত্র ও সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হওয়ার কারণে ব্যবসা উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি বছরের পর বছর একই অবস্থানে থেমে আছে। ফলে সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করেও শিল্প ও বানিজ্য সেক্টরে পর্যাপ্ত বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে, যা দেশের ব্যবসা বানিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা।

১৭. **সরকারি অফিস সমূহে ঘুষ, দুর্ণীতি, স্বজনপ্রীতি ও অসহযোগিতা :** সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি অফিস সমূহে ঘুষ. দুর্ণীতি, স্বজনপ্রীতি ও অসহযোগিতার কারণে শিল্প সেক্টরে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি দেশে ব্যবসা বানিজ্য কঠিন করে তুলছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে

SJFBD

দেশের ভাবমূর্তি মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলছে, শিল্প ও বানিজ্য সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ার এটি আরেকটি প্রধান কারণ।

১৮. **উদ্যোক্তা তৈরিতে নিম্নমানের প্রশিক্ষণ ও সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকা :** বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে ভালমানের উদ্যোক্তা ব্যাতিত যেকোনো ব্যবসায়ে টিকেথাকা অত্যন্ত কঠিন। ভালমানের উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রয়োজন উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষিতরা যাতে প্রশিক্ষণ প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে থেকে দ্রুত ব্যবসা শুরু করতে পারে সেজন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন, যেমন-ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ, ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অফিস , প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ, রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্য নির্বাচন, সম্ভাব্য রপ্তানি বাজার ভিজিট করার মাধ্যমে বাস্তব ধারণা সংগ্রহ এবং রপ্তানির জন্য ক্রয়াদেশ সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে চলমান উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত দায়সারা গোছের, যা কোনো অবস্থাতেই ভালমানের উদ্যোক্তা তৈরীর নিশ্চয়তা দেয় না।

১৯. **রপ্তানি অর্থায়নে ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যবাধকতা না থাকা :** বাংলাদেশের মত স্বল্পআয়ের দেশে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগানো সবারপক্ষে সবসময়ই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রপ্তানি অর্থায়নে ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যবাধকতা না থাকায় ব্যাংকের সাথে পূর্বসম্পর্ক অথবা ভাল রেফারেন্স না থাকলে সাধারণত ব্যাংক সমূহ সবক্ষেত্রে রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে অর্থায়নে সম্মত হয় না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী সবারক্ষেত্রে রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে শতভাগ অর্থায়নে ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যবাধকতা থাকলে রপ্তানির পরিমাণ নিঃসন্দেহে আরোও অনেক বৃদ্ধি পেত।

২০. **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি পণ্যের পর্যাপ্ত প্রচার প্রচারনা না থাকা :** বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ এবং এদেশের শিল্প ও প্রযুক্তি সক্ষমতা সীমিত, আর এসমস্ত সঙ্গত কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা ও কদর কম থাকাটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থার উত্তোরণে দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক প্রচার প্রচারণা বিশ্বব্যাপি এদেশের পণ্য সুপরিচিতি পাবে এবং রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধিপাবে এ নিশ্চয়তা অনায়াসে দেয়া যায়। আক্ষেপের বিষয়, বাংলাদেশ অদ্যাবধি এ বাস্তবতা থেকে যোজন যোজন দুরে।

২১. **বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের কৌটা ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার আদায়ে অপর্যাপ্ত কুটনৈতিক তৎপরতা :** একমাত্র ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শতভাগ শুল্ক ও কৌটামুক্ত প্রশোধির রয়েছে, যদিও তৈরিপোশাক ব্যাতিত অন্যান্য পণ্যেরক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ সুবিধা খুব সামান্যই কাজে লাগাতে পারছে। ২০১৩ সালের পর থেকে আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের জন্য জি.এস.পি সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। আঞ্চলিক চুক্তি সমূহের আওতায় এশিয়ার দু-একটি দেশে কিছু কিছু পণ্যের উপর সম্পূর্ণ বা আংশিক শুল্ক সুবিধা পেলেও তা খুব সামান্যই কাজে লাগাতে পারছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন দেশের সাথে কুটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে পর্যাপ্ত বানিজ্য সুবিধা আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

২২. **রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের সীমিত তৎপরতা :** যেহেতু বাংলাদেশের শিল্প ও প্রযুক্তি এখনো যথেষ্ট উৎকর্ষতা পায়নি এবং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের পরিচিতি একদমই সীমিত, সেহেতু সরকার ও ব্যবসায়ি শীর্ষ সংগঠন সমূহের যৌথ প্রচেষ্টা এবং সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য দেশসমূহের সাথে ব্যাপক কুটনৈতিক তৎপরতা ব্যাতিত বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার দ্রুত বৃদ্ধি করা কঠিন হবে এটা একেবারেই নিশ্চিত। হতাশার বিষয় হচ্ছে, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে সরকার যথেষ্ট আগ্রহী হলেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের

SJIBD

সাথে কুটনৈতিক যোগাযোগ যেমন বৃদ্ধি পায়নি, তেমনি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর তৎপরতাও তেমন চোখে পড়েনা, দেশের রপ্তানি বানিজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এ চিত্র সুস্পষ্ট।

২৩. **রপ্তানিমূখী শিল্পের ঝুকি মোকাবেলায় অপ্রতুল সরকারি সহযোগিতা :** আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশে মানসন্মত রপ্তানিযোগ্য পণ উৎপাদনে সরকারি বাধ্যবাধকতা না থাকা, উৎপাদন খরচ সীমিত রাখতে অপর্যাপ্ত সরকারি সহযোগিতা এবং প্রমোশনাল পণ্য ও সেবা রপ্তানির বিপরীতে অপর্যাপ্ত ক্যাশ ইনসেনটিভ ব্যবস্থার ফলে পণ্য ও সেবা রপ্তানিতে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছেনা।

চ) রপ্তানিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

আমদানি বিল ও বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিতপূর্বক দারিদ্র শূণ্যের কৌটায় নামিয়ে আনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির টেকসই গতিশীলতা নিশ্চিত করতে রপ্তানিখাতের প্রসার ও উন্নয়ন এবং রপ্তানিখাতের বহুমূখীকরন একমাত্র বিকল্প। বিগত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে দেশের রপ্তানিখাত একক পণ্য (তৈরী পোশাক) নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা রপ্তানিখাতকে ক্রমান্বয়ে ঝুকিপূর্ণ করে তোলার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে ঝুকির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত সস্তা শ্রম ও অনুকুল প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকা সত্বেও অদ্যাবধি দেশের রপ্তানিখাতে একমাত্র তৈরী পোশাক ব্যাতিত অন্যান্য কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে উল্টো হ্রাস পেয়েছে। তৈরি পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা উর্ধ্বমূখী থাকায় রপ্তানিখাতের দৈন্যদশা চোখে পড়ছেনা। অদুর ভবিষ্যতে তৈরিপোশাক শিল্পে বাংলাদেশের প্রতিযোগি হিসাবে ভারত, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ আরোও অনেক দেশ যুক্ত হবে এটা এখন স্পষ্ট। কাজেই, আগামির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৈরি পোশাক খাতের পুরোপুরি আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগি করে তোলার পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সেবা খাতের প্রসার ও সেবা রপ্তানি পর্যাপ্ত বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরি উদ্যোগ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি, যাতে কোনো অবস্থাতেই দেশের রপ্তানিখাত হুমকির মুখে না পড়ে।

রপ্তানি বানিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় দেশসমূহের তুলনায় অনেক অনেক পিছনের সারিতে অবস্থান করছে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ১০০ টি প্রধান রপ্তানি কারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫৮তম এবং ঐ সময়ে বিশ্বের মোট রপ্তানি

রপ্তানিখাতের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

বানিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ .৩% মাত্র। তাছাড়া, অনুন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতার অভাবে সার্ভিস সেক্টরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অত্যন্ত নগণ্য, যার দ্রুত উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরি। দেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরনে রপ্তানি বানিজ্যে পণ্য ও সার্ভিস উভয়খাতে পর্যাপ্ত প্রসার ঘটিয়ে রপ্তানিতে একক পণ্য নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বানিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

রপ্তানিখাতের প্রসার ও রপ্তানি বহুমূখী করনে সরকার ইতিমধ্যে " **EXPORT POLICY 2018-21"** প্রণয়ন করেছেন, যার মূখ্য উদ্দেশ্য সমূহ নিন্মে তুলেধরা হলো :-

1. Achieve exports of $60 billion by 2021, $50 billion from RMG;
2. Ensure product and market diversification with a view to achieve MIC status by 2021;
3. Ensure compliance and best-practices to enhance exports;
4. Assist exporters in different forms;
5. Promotion of Bangladeshi goods worldwide
6. Attract FDI in export sector for high-value products;

এক্সপোর্ট পলিসি ২০১৮-২১ বাস্তবায়নে যে সমস্ত ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে :-

1. Policy support including bonded warehouse, duty draw back, low cost capital for raw material imports etc;
2. Improve ease of doing business ranking; One stop shop(OSS) system for investors;
3. Capacity building and automation of trade related bodies to ensure better and faster services;
4. National single Window for customs clearance;
5. Encouraging exporters-CIP, Export Trophy,
6. Participating in International trade fairs, exchange business delegation;
7. Economic diplomacy-negotiation for market access and Free trade agreements.

SJFBD

দেশের রপ্তানিখাতের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন এবং রপ্তানিখাতের বহুমূখী করনে প্রস্তাবনা সমূহ নিন্মে উপস্থাপিত হলো :-

১. পর্যাপ্ত আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকরি উদ্যোগ বাস্তবায়ন :

প্রতিযোগিতামূলক দামে মানসন্মত পণ্যের সরবরাহ আন্তর্জাতিক বাজারের অন্যতম প্রধান শর্ত। উন্নত প্রযুক্তির এ যুগে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্প ব্যাতিত প্রতিযোগিতামূলক দামে মানসন্মত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা অসম্ভব। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে তাই দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন খুবই জরুরি এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে যে সমস্ত বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে :-

ক. রপ্তানিমুখি শিল্প স্থাপনে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থাপিত শিল্পের পরিচলনায় চলতি মূলধন সরবরাহের পর্যাপ্ততা।

খ. রপ্তানিমুখি শিল্পে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে আকর্ষণীয় প্রণোদনায় ও ছাড়ে বিনিয়োগ আকর্ষণ।

গ. নতুন শিল্প স্থাপনের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প যাতে আনুপাতিকহারে বেড়ে উঠে সে লক্ষ্যে ই.পি.জেড ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চল গুলোতে সবধরনের শিল্পের ভারসাম্য রক্ষার নীতি চালু করা।

ঘ. উৎপাদিত পণ্যের মান বজায় রাখতে সকল রপ্তানিমূখী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বাধ্যতামূলকভাবে আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

ঙ. রপ্তানিমূখী শিল্পের ঝুকি মোকাবেলায় চীন ও অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশ সমূহের আদলে নগদ ভূর্তুকি, ট্যাক্স, ভ্যাট ও অন্যান্য সুবিধা পর্যাপ্ত প্রদানের মাধ্যমে সকল রপ্তানিমূখী শিল্পের লাভজনক টিকে থাকা নিশ্চিত করা।

চ. দেশে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে গবেষণা কার্যক্রম ব্যাপক বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দ্রুত বানিজ্যিকী করনের মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রসার নিশ্চিত করা এবং এলক্ষ্যে জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করা।

ছ. রপ্তানিমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুবিধার আদলে সব ধরনের শিল্পের কাঁচামাল দেশে উৎপাদনে পর্যাপ্ত শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

জ. রপ্তানি অর্থায়ন সহজ করতে সকল ধরনের পণ্য রপ্তানিতে সমান সুযোগ প্রদানে সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

২. ব্যবসা সহজিকরনের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের সেবার মানোন্নয়নে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি :

দেশে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ও দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ব্যবসা সহজিকরণের সাথে সংশ্লিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ, যেমন- ব্যবসা শুরু করা, নির্মাণ কাজের অনুমতি প্রদান, বিদ্যুৎ সংযোগ, সম্পত্তি নিবন্ধন, ঋণ পাওয়া, সংখ্যলঘু বিনিয়োগকারিদের সুরক্ষা প্রদান, কর পরিশোধ, সীমান্ত বানিজ্য, চুক্তি বলবৎ ও দেউলিয়াত্ব সমাধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কেননা, ব্যবসা সহজিকরনের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহে প্রদত্ত সেবার মান ও সময়ের উপর দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বহুলাংশে নির্ভর করে।

সেবার মানোন্নয়ন পুরোপুরি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের প্রশাসনিক সততা ও দক্ষতার উপর। বাংলাদেশের সরকারি সেক্টরে প্রশাসনিক সততা ও দক্ষতার অভাব এবং দীর্ঘসূত্রিতা অনেক পুরানো ব্যাধি, যা নিয়ে দেশের মানুষের ভোগান্তি ও নালিশের শেষ নেই এবং এযাবৎ সকল সরকারের আমলেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এবিষয়ে অহরহ আপত্তি তুল আসছে। ব্যবসা সহজিকরনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সার্ভিস সেক্টরের আওতাভূক্ত এবং সার্ভিস সেক্টরের অগ্রগতি পুরোপুরি প্রশাসনিক দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, যার উপর নির্ভর করে সেবার মান ও গতি। বল বাহুল্য, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি একান্তভাবে সরকারের নীতিমালা, মনোভাব, দক্ষতা, দূরদর্শীতা ও সাহসিকতার উপর নির্ভরশীল। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে কঠোর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বাস্তবমূখী নীতিমালার ভিত্তিতে দক্ষভাবে মন্ত্রণালয় সমূহ পরিচালিত হলে দেশের সকল সেক্টরে সকল পর্যায়ে প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটতে বাধ্য, যা অদ্যাবধি কোনো সরকারের আমলেই পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

দেশের সামগ্রিক সেবাখাতে প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক সকল স্তরে সেবার মান ও গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসা বানিজ্যের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে নিন্মোক্ত ক্ষেত্র সমূহের সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের আরোও অনেক বেশি সক্রিয় ও কঠোর হওয়া উচিৎ।

ক) প্রশাসনের সকলস্তরে দক্ষতা ও গতিশীলতা আনয়নে সরকারের বাস্তমূখী নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

খ) সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল স্তরে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের দ্বার উন্মুক্ত করা।

গ) সরকারি নীতিমালায় ব্যবসা বানিজ্যের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নেওয়া।

ঘ) প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুগোপযোগি করে তোলা।

SJFBD

ঙ) সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে যাতে সততার ভিত্তিতে সেবাদানের মনোভাব সৃষ্টি হয় সেলক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা চালানো এবং প্রশাসনের সৎ ও যোগ্য ব্যাক্তিদের যথাযথ মূল্যায়ন।

চ) আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসায়নে সকলক্ষেত্রে ওয়ান ষ্টপ ও অনলাইন ভিত্তিক সেবা চালু করা।

ছ) ঘুষ ও দুর্ণীতি প্রতিরোধে সরকারের কঠোর অবস্থান ও জিরো ট্রলারেন্স নীতির বাস্তবায়ন করা।

ছ) সরকারি কাজে অবহেলা, বিলম্বিত ও দুর্ণীতির আশ্রয়কে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া হিসাবে গণ্য করে কঠোর শাস্তির বিধান চালু করা।

৩) গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্তে পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও লজিষ্টিক সাপোর্ট উন্নয়ন :

বানিজ্য সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে গতিশীল বানিজ্য নিশ্চিত করতে অবকাঠামো উন্নয়ন (স্থলপথ, রেলপথ, বিমানবন্দর, সমূদ্রবন্দর, ইউটিলিটি ও বন্দর সক্ষমতা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বানিজ্য সক্ষমতার দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান অদ্যাবধি বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় একদমই পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ বানিজ্য সক্ষতায় ১৪০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম, লজিস্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় ১৬০ দেশের মধ্যে ১০০তম এবং অবকাঠামো উন্নয়নের দিকথেকে ১৪০ দেশের মধ্যে ১০৯তম। অনুন্নত অবকাটামো ও অপর্যাপ্ত লজিষ্টিক সাপোর্টের কারণে যে সমস্ত দেশ আন্তর্জাতিক বানিজ্যে পিছিয়ে পড়ছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম।

কাজেই, বানিজ্য সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্তে দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধের পাশাপাশি লজিষ্টিক অবকাঠামো ও লজিষ্টিক সাপোর্ট সার্ভিস উন্নয়ন, যেমন-কাষ্টমস সক্ষমতা, দ্রুত জাহাজিকরণ, ট্রাকিং এন্ড ট্রেসিং ও অন্যান্য লজিষ্টিক সক্ষমতা উন্নয়নে অফিশিয়াল দক্ষতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

৪) বর্তমাণ বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণে কার্যকরি উদ্যোগ বাস্তবায়ন :

বাংলাদেশের রপ্তানি বানিজ্যের প্রায় ৬০-৬৫% রপ্তানি হয় আমেরিকা ও ইউরোপের দেশ সমূহে এবং অবশিষ্ট ৩৫-৪০% রপ্তানি হয় কানাডা ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ১৬.৯৬% আমেরিকায়, ৪৭.৬৩% ইউরোপে এবং ৩৫.৪১% কানাডা ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহে সম্পাদিত হয়। পণ্যের গুণগত মান, প্রতিযোগিতা মূলক দাম, অফিসিয়াল অদক্ষতা, কুটনৈতিক তৎপরতার অভাব, ব্রান্ডিং, আন্তর্জাতিক প্রচার প্রচারনা ও গ্লোবাল বানিজ্য সক্ষমতায় পিছিয়ে থাকার কারণে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বাজারে বাংলাদেশ রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়ছে। ইউরোপের দেশ সমূহে বাংলাদেশের সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার থাকলেও বিগত পাঁচ বছরে একমাত্র তৈরীপোশাক ব্যতিত ইউরোপে অন্যান্য পণ্য রপ্তানির হার মোটেও বৃদ্ধি পায়নি। তাছাড়া, একাধিক আঞ্চলিক বানিজ্য সহযোগিতার আওতায় এশিয়ার অনেক দেশে বাংলাদেশের প্রায় ১০ শহস্রাধিক পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঐ সমস্ত দেশে রপ্তানির পরিমাণ অদ্যাবধি মোট রপ্তানির ১০ শতাংশের নিচে।

বর্তমান রপ্তানি অংশীদার দেশ সমূহের প্রদত্ত সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগানোর পাশাপাশি নতুর রপ্তানি বাজার অন্বেষন ব্যাতিত রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা অসম্ভব এবং এজন্য প্রয়োজন এ্যাকশনধর্মী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা, যেমন :-

ক) উৎপাদন ব্যয় কমাতে ও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্প স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সহজ হয়।

খ) সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বাধ্যতামূলকভাবে আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন বাধ্যতামূলক করা

SUFBD

গ) রপ্তানিকারকদের অফিসিয়াল দক্ষতা উন্নয়নে দেশে রপ্তানি প্রশিক্ষণ সহজলভ্য করে তোলার পাশাপাশি রপ্তানি কার্যকলাপের সাথে জড়িত সরকারি এজেন্সি সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ডকুমেন্টেশন উন্নয়নে প্রশিক্ষণ জোরদার করা।

ঘ) বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার আদায়ে কুটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা।

ঙ) বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দুতাবাস সমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশি পণ্যের প্রদর্শনী ও ট্রেড ফেয়ারের মাত্রা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা।

চ) সরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি পণ্যকে ব্রান্ডিং ও জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ছ) বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি সমূহের আওতায় বানিজ্য সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাতে রপ্তানিকারক, ব্যাংক ও রপ্তানি কার্যকলাপে জড়িত সরকারি এজেন্সি সমূহের কর্মকর্তাদের মাঝে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরা।

জ) চলমান বানিজ্য চুক্তি সমূহের কোনো ধারা উপ-ধারার কারনে রপ্তানি ব্যাহত হলে তা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহন করা।

ঝ) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিদ্যমান অন্যান্য বানিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি সমূহে বাংলাদেশ নতুন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য কুটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করা। উল্ল্যেখ্য, নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে চুক্তির খসড়া তৈরীতে আন্তর্জাতিক বানিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি, যাতে কোনো ধারা উপ-ধারা দেশের স্বার্থের বিপরীতে না যায়।

৫) সেবাখাতের উন্নয়ন ও সেবা রপ্তানি বৃদ্বিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ :

বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে সেবাখাত (মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি) বিশ্বব্যাপি অর্থনীতির মেরুদন্ডে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার অন্যতম আকর্ষনীয় অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি সেবা রপ্তানি দেশের সামগ্রিক বানিজ্য বৃদ্ধির অন্যতম উৎস হিসাবে কাজ করে। সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে ও দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নশীল দেশ সমূহের তুলনায় এমনকি স্বল্পোন্নত অনেক দেশের তুলনায় একদমই পিছনে পড়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে জি.ডি.পি অনুপাতে সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশ ১%, মিয়ানমার ৭.৪%, কম্বোডিয়া ২১.৪%, ইথিওপিয়া ৫.৬%, নেপাল ৬.২%, আফগানিস্তান ৩.৮% এবং ভূটান ৭%।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে সেবাখাতের দ্রুত উন্নয়নপূর্বক সেবাখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে মনযোগি হওয়া বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে, কেননা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিংহভাগই সেবাখাতের সাথে সম্পৃক্ত। সেবাখাতের উন্নয়ন একদিকে যেমন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য সেবা আমদানি কমিয়ে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করবে, অন্যদিকে সেবা রপ্তানির ফলে বিশ্বব্যাপি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে উল্ল্যেখযোগ্য হারে। তাছাড়া, যে সমস্ত বিষয়ের উপর সেবাখাতের উন্নয়ন ও অগগ্রতি নির্ভরশীল, প্রযুক্তি, গবেষণা ও দক্ষতা তাদের অন্যতম। ফলে সেবাখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে দেশে প্রযুক্তি, গবেষণা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে, যা দেশের সেবাখাতকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশকে প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে তুলবে এবং দেশে গড়ে উঠবে প্রযুক্তি সম্পন্ন, দক্ষ ও উচ্চমানের মানব সম্পদ। কাজেই সেবাখাতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি করতে নিন্মোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ব্যাপক উন্নয়ন আবশ্যক :-

ক) প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন।

খ) গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরা।

গ) উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দেশসমূহের সাথে প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

SJFBD

৬) রপ্তানি ঝুকি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত সরকারি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা : আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে মানসন্মত রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে সরকারি বাধ্যবাধকতা আরোপ এবং উৎপাদন খরচ সীমিত রাখতে ট্যাক্স, ভ্যাট ও প্রচলিত অন্যান্য সুবিধা পুরোপুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের আলোকে সকল ধরনের প্রমোশনাল পণ্য ও সেবা রপ্তানির বিপরীতে পর্যাপ্ত ক্যাশ ইনসেনটিভ প্রথা (যা বর্তমানে সীমিত আকারে চালু রয়েছে) চালু করার মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া।

৭) খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করা :

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষির অনুকুলে একথা সবাই জানি। যেহেতু শিল্প ও প্রযুক্তিতে এদেশ এখনো পর্যাপ্ত পিছিয়ে আছে, সেহেতু কৃষিজাত পণ্যকে রপ্তানির প্রধান হাতিয়ার করেই রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগাতে হবে, পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্যান্য পণ্যের প্রমোশন করতে হবে, বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বরাবরই ব্যার্থ হচ্ছে। অথছ দুনিয়ার বহু উন্নত দেশের রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ আসে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে। ২০১৭ সালে বিশ্বে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ১,১৬৭ বিলিয়ন, যার ৮.৮% আমেরিকা, ৭.৭% নেদারল্যান্ডস, ৫.৪% চীন ও ৫.৬% জার্মানি থেকে রপ্তানি হয়। এ সব কয়টি দেশই শিল্পোন্নত, কিন্তু পাশাপাশি কৃষি পণ্য রপ্তানিতেও তারা শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে।

রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি অগ্রাধিকার দিয়ে এর অনুকুলে বেশকিছু সুযোগ সুবিধার কথা বলা হলেও, কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সুনির্দিষ্ট কোনো রুপরেখা বা পরিকল্পণা এতে নেই। ফলে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশের ব্যবসায়িরা দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করেও কাঙ্কিত পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে ব্যার্থ হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ সমূহের মধ্যে রয়েছে :-

ক) আমদানিকারক দেশসমূহের চাহিদা মোতাবেক মানসন্মত পণ্য সরবরাহ করতে না পারা।
খ) অনুন্নত মোড়কীকরণ।
গ) দ্রুত শিপমেন্ট সমস্যা ; এবং
ঘ) রপ্তানি আদেশ সংগ্রহ পূর্বক বিদেশের বাজার ধরতে না পারা।

৮) কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা :

কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে তাই প্রয়োজন এসমস্ত সমস্যার গভীরে পৌঁছে ব্যর্থতার কারণ সমূহ উৎঘাটনপূর্বক ঐ সমস্ত সমস্যার বাস্তব সন্মত সমাধানে আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, যারজন্য প্রয়োজন :-

ক) এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর অধীনে আলাদাভাবে " **Agri Export Promotion Cell" (AEPC)** গঠণপূর্বক প্রত্যেক জেলাশহরে এ সেলের শাখা আফিস স্থাপন করার মাধ্যমে কৃষিপণ্য রপ্তানি উন্নয়নে কার্যাবলি পরিচালনা করা ।

খ) নিয়মিত রপ্তানি প্রশিক্ষণ পরিচালনা : বিভিন্ন দেশ থেকে রপ্তানি আদেশ সংগ্রহ, রপ্তানির জন্য মানসন্মত কৃষিপণ্য সংগ্রহ, উন্নত মোড়কীকরন, দ্রুত জাহাজিকরন, ডকুমেন্টেশন এবং ব্যাংক থেকে রপ্তানি মূলধন সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর AEPC প্রধান অফিস ও জেলা অফিস সমূহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে কৃষিপণ্য রপ্তানির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।

গ) প্রশিক্ষণ শেষে AEPC অফিসের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমন- Trade Licence, TIN Certificate, ERC, VAT Registration এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করবেন।

SIFBD

ঘ) তারপর AEPC অফিস সমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষিতদের মধ্য থেকে ২/৩ জনের ছোট ছোট টীম করে প্রত্যেক টিমের জন্য প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করা সহজ হবে এবং ঐ সমস্ত পণ্য কোন কোন দেশে রপ্তানি করা যাবে তা নির্ধারণ করে দেবেন।

ঙ) প্রত্যেক টীম যেন ব্যবসা শুরু করার আগে ঐ টীমকে রপ্তানির জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া দেশ সমূহের অন্তত একটি দেশ ভ্রমণ করার মাধ্যমে সে দেশের বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি, সেখানকার বাজার ও আড়ত সমূহে রক্ষিত পণ্যের ধরণ, পণ্যের গুণগত মান, কোন পণ্যের চাহিদা কেমন এবং মোড়কের ধরন ইত্যাদি স্ব-চক্ষে পর্যবেক্ষণ করে বিস্তারিত ধারণা নিতে পারে এবং একই সাথে বিভিন্ন ক্রেতার সাথে সরাসরি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সুবিধা ও সামর্থের মধ্যে প্রাথমিকভাবে অন্তত ২/১টি এক্সপোর্ট অর্ডার সংগ্রহ করতে পারে এ ব্যপারে জোর দিতে হবে। AEPC অফিস সমূহ এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও নিন্মোক্ত সহযোগিতা সমূহ প্রদান করবেন, যেমন :-

১) বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহ যাতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বাংলাদেশি ব্যবসায়িদেরকে ঐ সমস্ত দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের সহযোগিতায় সেখানকার আমদানিকারক, আড়ৎদার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে ভ্রমণরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াসহ যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করেন এ ব্যাপারে সরকারিভাবে বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।

২) **রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ :** বলার অপেক্ষা রাখেনা যে শুধুমাত্র বাজার থেকে সংগ্রহ করা কৃষিপণ্য কোনো অবস্থাতেই পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে প্রয়োজন রপ্তানিকারক ও কৃষকদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে রপ্তানির জন্য আলাদাভাবে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা, যা ন্যায্য দামে কৃষকদের কাছথেকে রপ্তানিকারকগণ সংগ্রহ করবেন। ব্যবসায়ীগণ তাদের সুবিধামত যে কোনো উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সহযোগিতায় স্থানীয় কৃষকদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে চাহিদামত পণ্য উৎপাদন করিয়ে নেবেন। রপ্তানি মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে সারা দেশের কৃষি কর্মকর্তাগণ এক্ষেত্তে ব্যবসায়ীদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা।

৩) সকল ধরনের কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ব্যাংক কতৃক শতভাগ রপ্তানি অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

৪) সকল ধরনের কৃষিপণ্য রপ্তানির উপর ট্যাক্স ও ভ্যাট পুরোপুরি মওকুপের পাশাপাশি ক্যাশ ইনসেনটিভ চালু রাখা, যাতে আন্তর্জাতিক বাজার ধরা সহজ হয়।

৫) কৃষিপণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করতে এক্ষেত্রে আলাদা রপ্তানি ট্রপি ও সি.আই.পি প্রবর্তন।

৬) রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত বিমান বন্দরে নিয়ে আসা পঁচনশীল কৃষিপণ্য সমূহ বিমানে উঠানোর আগ পর্যন্ত সংরক্ষনের জন্য প্রত্যেক বিমান বন্দরে পর্যাপ্ত জায়গা সমৃদ্ধ আলাদা হিমাগার স্থাপনপূর্বক ঐ সমস্ত পণ্যের পঁচন রোধ করা।

৭) কৃষিজাত পণ্য দ্রুততার সাথে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ছোট / মাঝারি আকারের একাধিক কার্গো বিমান ক্রয় করা অত্যন্ত জরুরি, যা পরিবহন সমস্যায় পণ্য সামগ্রী নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের চাহিদানুযায়ী দ্রুত পণ্য সরবরাহে বড় ধরনের অগ্রগতি সাধিত হবে নিঃসন্দেহে।

****

SJFBD

অধ্যায় - ৫.১০

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের উন্নয়ন ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের উন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বিদ্যুৎ।

১) উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন।
২) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ক্ষমতা।
৩) বিদ্যুতের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি।
৪) মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার।
৫) মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান।
৬) সেক্টরভিত্তিক বিদ্যুতের ব্যবহার।
৭) ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন লস।
৮) বিদ্যুতের সিষ্টেমস্ লসে বাংলাদেশের অবস্থান।
৯) নবায়নযোগ্য জ্বালানী।
১০) বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার।
১১) বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়নে বার্ষিক বরাদ্ধ।
১২) বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন।
১৩) বিদ্যুৎ সেক্টরে ভূর্তুকি।
১৪) বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা।

খ) জ্বালানী।

১) দেশের প্রাথমিক জ্বালানির সামগ্রিক পরিস্থিতি।
২) দেশে প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার।
৩) মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার।

১) প্রাকৃতিক গ্যাস।

ক) বাংলাাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির ইতিহাস।
খ) প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদে বাংলাদেশের অবস্থান।
গ) গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবহার।
ঘ) মাথাপিছু গ্যাস ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান।
ঙ) সেক্টর অনুযায়ী গ্যাসের ব্যবহার।
চ) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে রেভেনিউ অর্জন
ছ) গ্যাস রেভেনিউর দিকথেকে বাংলাদেশর অবস্থান।
জ) দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রাক্কলন।
ঝ) গ্যাস সেক্টর উন্নয়নে করনীয় সমূহ।

২) কয়লা।

ক) বাংলাদেশে কয়লার সামগ্রিক পরিস্থিতি।
খ) কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার।
গ) কয়লা ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান।
ঘ) কয়লা আমদানির চিত্র।
ঙ) কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধিকল্পে করনীয়।

৩) জ্বালানী তেল।

ক) দেশে জ্বালানি তেল পরিস্থিতি।
খ) তেলের দৈনিক চাহিদা ও উত্তোলন।
গ) তেল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান।
ঘ) জ্বালানি তেলের দৈনিক ব্যবহার।
ঙ) জ্বালানি তেল আমদানি।
চ) জ্বালানী তেলের উপর ভূর্তুকি।

গ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

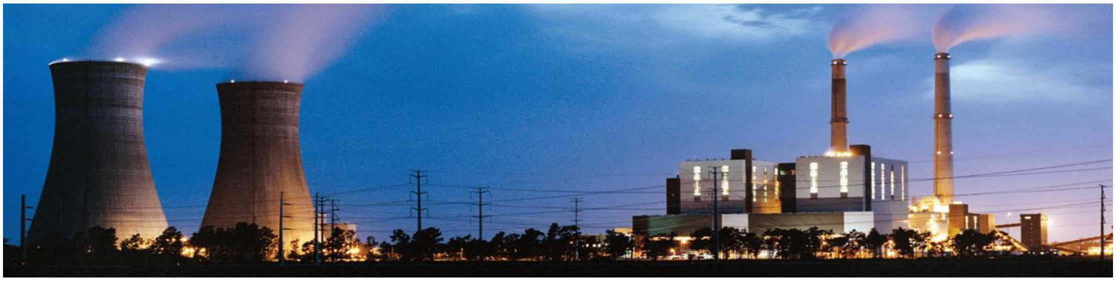

ক) বিদ্যুৎ :

বিদ্যুৎ :

বর্তমান সভ্যতায় কোনো দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেরক্ষেত্রে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য বিষয়। শিল্পকারখানা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটিক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিরক্ষেত্রে বিদ্যুতের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘসময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানিক্ষেত্রে আশপাশের দেশ সমূহের তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে। অতীতের সরকারগুলো বিদ্যুতের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি করার উপর জোর না দেওয়ায় এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় এক্ষেত্রে বাংলাদেশর অগ্রগতি শূণ্যের কৌঠায় রয়ে গেছে। ফলে দেশের শিল্পোন্নয়নসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং পিছিয়ে পড়েছে। Global Electricity Generation Ranking 2020 অনুযায়ী ১০০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৪৯তম, যেখানে ভারত ৩য়, জাপান ৫ম, দ. কোরিয়া ১০ম, ইন্দোনেশিয়া ২০তম, থাইল্যান্ড ২৩তম, ভিয়েতনাম ২৪তম, মালয়েশিয়া ২৮তম, পাকিস্তান ৩২তম এবং ফিলিপাইন ৩৬তম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.১০(১)] ।

২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছাতে ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎখাতে SDG-7 (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক। অবশ্য বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উন্নয়নের সোপান হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং বিগত ১০ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সরকার বেশকিছু বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, যারমধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জ্বালানিখাতে অগ্রগতি অর্জন।

স্মারণী-৫.১০(১): গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০২০ অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

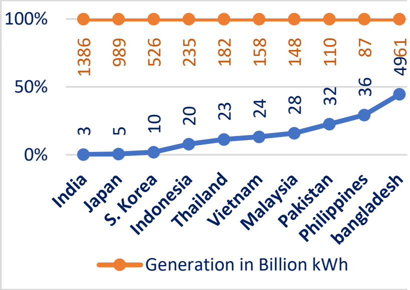

Source: Indexmundi.com

১) উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন :

উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন :

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৮-৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৫,৭১৯ মেগাওয়াট এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন ৪,১৬২ মেগাওয়াট এর মধ্যে সীমিত থাকলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দৃশ্যপট পাল্টাতে শুরু করে। অর্থবছর ২০০৯-১০ সময়কালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল স্থাপিত ক্ষমতা ৫,৮২৩ মেগাওয়াট এর বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ৪,৬০৬ মেগাওয়াট, অর্থবছর ২০১৮-১৯ সময়কালে এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়িয়েছে স্থাপিত ক্ষমতা ১৮,৯৬১ মেগাওয়াট এর বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ১২,৮৯৩ মেগাওয়াট। এ ১০ বছর সময়কালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ১৩,১৩৮ মেগাওয়াট (২২৫.৬২%), প্রতিবছর গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩১৩.৮ মেগাওয়াট (২২.৫৬%) স্মারণী-৫.১০(২)।

স্মারণী-৫.১০(২): অর্থবছর ২০০০-১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনের চিত্র:

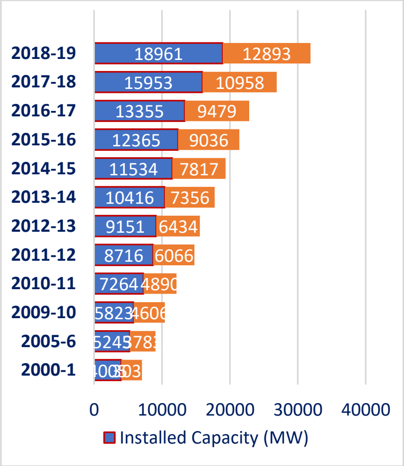

Source: Researchgate

২) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ক্ষমতা :

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ক্ষমতা :

২০২০ সাল নাগাদ চালু হওয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২০,৮১৩ মেগাওয়াট, ব্যবহৃত জ্বালানির ভিত্তিতে বণ্টন করলে দাঁড়ায় কয়লাভিত্তিক ৫২৪ মেগাওয়াট (২.৫২%), গ্যাস ভিত্তিক ১১,৫০২ মেগাওয়াট (৫৫.২৬%), লিকুইড ফুয়েল (HFO) ৫,৫০৭ মেগাওয়াট (২৬.৪৬%), HSD ১,৮৫৫ মেগাওয়াট (৮.৯১%), আমদানিকৃত বিদ্যুৎ ১,১৬০ মেগাওয়াট (৫.৫৭%), হাইড্রো পাওয়ার ২৩০ মেগাওয়াট (১.১১%) এবং সোলার পাওয়ার ৩৫ মেগাওয়াট (০.১৭%) স্মারণী-৫.১০(৩)।

সেক্টর অনুযায়ী বন্টন করলে দাঁড়ায়, পাবলিক সেক্টরে ৯,৫৬৮ মেগাওয়াট (৪৭%), প্রাইভেট সেক্টরে ৮,৮৮৪ মেগাওয়াট (৪৩%), জয়েন্টভেঞ্চার ৭৭১ মেগাওয়াট (৪%) এবং আমদানিকৃত ৩,১৬০ মেগাওয়াট (৬%)

স্মারণী-৫.১০(৩): ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত BPDB আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে উৎপাদন ও বন্টন ক্ষমতা :-

Fuel based Installed Capacity				Sector based Installed Capacity		
Fuel Type	No. of Plants	Installed capacity (MW)	%	Sector	Capacity (MW)	%
Coal	3	524	2.52	Public Sector	9,568	47
Gas	64	11,502	55.26	Private Sector	8,884	43
HFO	56	5,507	26.46	Joint Venture	771	4
HSD	10	1,855	8.91	Import	1,160	6
Imported	-	1,160	5.57			
Hydro	1	230	1.11			
Solar	4	35	0.17			
Total :	**138**	**20,813**	**100**	**Total :**	**20,383**	**100**

Source: BPDB and Powercell Note: Excluding Captive Power & Renewable Energy.

৩) বিদ্যুতের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি :

চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতির চিত্র :

বিগত দুই দশক (২০০০-২০১৯) সময়কালে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১ সময়কালে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা গড়ে প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৩৯% এবং অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ৮.৭৬%। অন্যদিকে অর্থবছর ১৯৯৯-০০ থেকে ২০১৫-১৬ সময়কালে দেশে বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতি ছিল বছরে গড়ে প্রায় ২১% এবং ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন

স্মারণী-৫.১০(৪): অর্থবছর ১৯৯৯-০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুতের উৎপাদন ও ঘাটতির চিত্র:

cal Year	Maximum Demand (MW)	Max. Peak Generation (MW)	Deficiency	
			MW	%
1999-00	3,149	2,665	484	15.37
2003-04	4,259	3,592	667	15.66
2008-09	6,066	4,162	1,904	31.39
2009-10	6,454	4,606	1,848	28.63

মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার :

ঘাটতি ছিল বছরে গড়ে ৫.২০%। অতএব এটা স্পষ্ট যে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদন দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনেরক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় অগ্রগতি স্মারণী-৫.১০(৪)।

2010-11	6,765	4,890	1,875	27.72
2011-12	7,518	6,066	1,452	19.31
2012-13	8,349	6,434	1,915	22.94
2013-14	9,268	7,356	1,912	20.63
2014-15	10,283	7,817	2,466	23.98
2015-16	11,405	9,036	2,369	20.77
2016-17	10,500	9,479	1,021	9.72
2017-18	11,500	10,958	542	4.71
2018-19	13,044	12,893	151	1.16

Source: BPDB Annual Report

৪) মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার :

অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থবছর ২০০৯-১০ সময়কালে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০.৩২ kWh এর বিপরীতে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ছিল ১৭০.২৭ kWh, ২০১৮-১৯ সময়কালে তা বৃদ্ধিপেয়ে মাথাপিছু উৎপাদন ৪২৫.৯২ kWh এর বিপরীতে মাথাপিছু ব্যবহার দাঁড়িয়েছে ৩৭৪.৬২ kWh । এ সময়কালে বিদ্যুতের মাথাপিছু উৎপাদন ছিল গড়ে বার্ষিক ২৯৩.৫৩ kWh এবং মাথাপিছু ব্যবহার গড়ে বার্ষিক ২৫৪.৩৪ kWh. অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ এ দশ বছরের ব্যবধানে দেশে বিদ্যুতের মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বার্ষিক ৮.৮২% এবং মাথাপিছু ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বার্ষিক ৮.৫৬% হারে [স্মারণী-৫.১০(৫)]।

স্মারণী-৫.১০(৫): অর্থবছর ২০০৪-৫ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে বিদ্যুতের মাথাপিছু উৎপাদন ও ব্যবহারের চিত্র :-

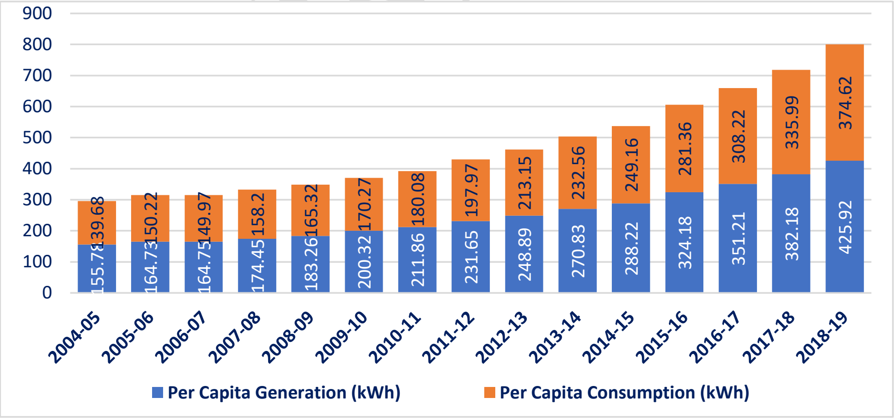

Source: BPDB Annual Report

৫) মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তান ও নেপাল ব্যাতিত অন্যান্য সব দেশের পিছনে অবস্থান করছে। গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০২০ অনুযায়ী মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারে ২১৭ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৭০তম। ঐ র‍্যাংকিং এ পাকিস্তান ১৬৫, শ্রীলংকা ১৬০, পিলিপাইন ১৫১, ইন্দোনেশিয়া ১৪৮, ভারত ১৪৫, মালদ্বীপ ১৪৩, ভিয়েতনাম ১২৬, থাইল্যান্ড ৯৪, চীন ৬৯, মালয়েশিয়া ৬৩, জাপান ৩১, সিঙ্গাপুর ২৭ এবং দ. কোরিয়া ১৫তম স্থানে অবস্থান করছে। ঐ র‍্যাংকিং অনুযায়ী মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার (kWh) আফগানিস্তানে ১৫৮, নেপালে ১৮৩, বাংলাদেশে ৩৩৬, পাকিস্তানে ৪৪৪, শ্রীলংকায় ৫৬১, পিলিপাইনে ৭৩৯, ইন্দোনেশিয়ায় ৮১২, ভারতে ৮৭৭, মালদ্বীপে ৯৫৩, ভিয়েতনামে ১,৪৭৬, থাইল্যান্ডে ২,৭৩৬, চীনে ৪,০১৮, মালয়েশিয়ায় ৪,৩০৪, জাপানে ৭,৪৯৮, সিঙ্গাপুরে ৭,৯৫৪ এবং দ. কোরিয়ায় ৯,৮৭২ kWh [স্মারণী-৫.১০(৬)]।

স্মারণী-৫.১০(৬) : গ্লোবাল র‌্যাংকিং ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহে মাথাপিছু বিদ্যুৎ (kWh) ব্যবহার :-

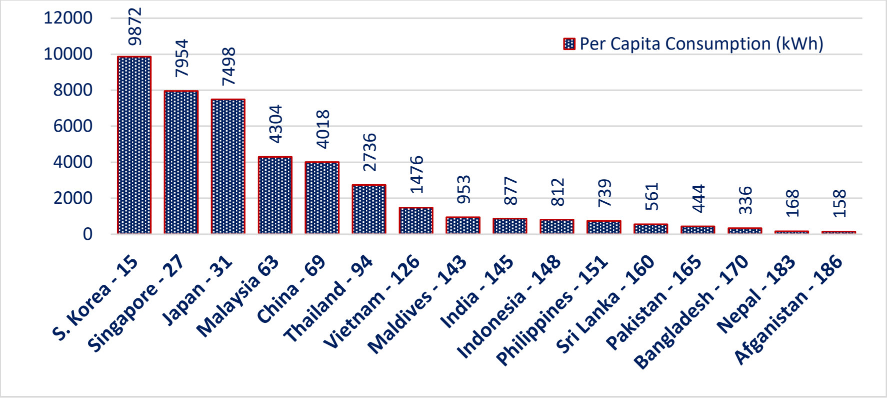

Source: Indexmundi   Note: Higher Rank is lower position.

সেক্টরভিত্তিক বিদ্যুতের ব্যবহার :

৬) সেক্টরভিত্তিক বিদ্যুতের ব্যবহার :

২০১৮-১৯ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫৩.৩১% আবাসিকখাতে, ২৯.৫৫% শিল্প কারখানায়, ১২.১১% বানিজ্যিকখাতে, ২.৮১% চাষাবাদে এবং ২.২২% অন্যান্যখাতে ব্যবহৃত হয় স্মারণী-৫.১০(৭) ।

স্মারণী-৫.১০(৭) : ২০১৮-১৯ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন সেক্টরে বিদ্যুতের ব্যবহার :-

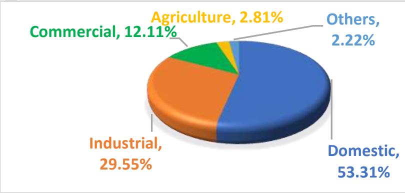

Source: Energy and Mineral Resources Div.

ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লস :

৭) ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লস :

বিদ্যুতের উৎপাদন থেকে শুরু করে বিতরণ ও গ্রাহক পর্যায়ে ব্যবহার পর্যন্ত যে ঘাটতি দেখাযায়, সেটাই বিদ্যুতের ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউসন লস বা সিষ্টেমস্ লস। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কম বেশি সিষ্টেমস্ লস রয়েছে। বিদ্যুৎখাতে শৃঙ্খলা ফিরাতে এবং বিদ্যুৎ খাতকে লাভজনক করে তুলতে সিষ্টেম লস সীমিত পর্যায়ে রাখার বিকল্প নেই। অবশ্য বাংলাদেশ অনেক আগেথেকে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল রয়েছে এবং সিষ্টেম লস কমিয়ে আনতে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় যথেষ্ট পিছনে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে বিদ্যুতের সিষ্টেম লস ছিল সামগ্রিকভাবে ১৫.৭৩%, ২০১৯-২০ সময়কালে এসে যা কমে দাঁড়িয়েছে ১১.২৩%। সিষ্টেম লস কমিয়ে আনার বর্তমাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সিষ্টেম লস আরোও কমিয়ে আসবে এমনটি আশাকরা যায় [স্মারণী-৫.১০(৮)]।

স্মারণী-৫.১০(৮) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে বিদ্যুতের ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লসের চিত্র :-

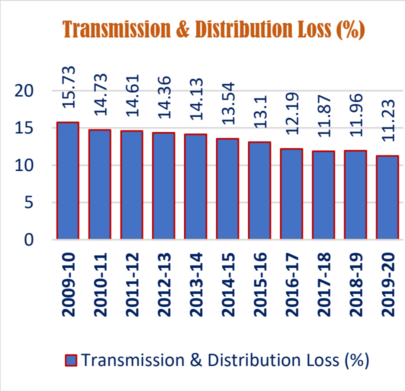

Source: Powercell

SJFBD

বিদ্যুতের সিষ্টেমস্ লসের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

৮) বিদ্যুতের সিষ্টেমস্ লসের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

বিদ্যুতের সিষ্টেমস্ লস নিয়ন্ত্রণের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অনেক পিছনে অবস্থান করছে। গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০১৪ অনুযায়ী বিদ্যুতের সিষ্টেমস লসের দিকথেকে ১৩৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থান ৬৪তম। ঐ র‍্যাংকিং এ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে মিয়ানমারের অবস্থান ২৩, ভারত ২৫, পাকিস্তান ৩০, শ্রীলংকা ৬৩, ফিলিপাইন ৮৩, ইন্দোনেশিয়া ৮৪, ভিয়েতনাম ৮৫, থাইল্যান্ড ১১৩, মালয়েশিয়া ১১৭, চীন ১১৯, জাপান ১২৮, দ. কোরিয়া ১৩৩ এবং সিঙ্গাপুর ১৩৮তম স্থানে রয়েছে। ঐ সময়ে বিদ্যুতের সিষ্টেমস লস মিয়ানমারে ২০.৪৯%, ভারতে ১৯.৩৩%, পাকিস্তানে ১৭.১৪%, শ্রীলংকায় ১১.৪৪%, বাংলাদেশে ১১.৪০%, ফিলিপাইনে ৯.৪১%, ইন্দোনেশিয়ায় ৯.৪০%, ভিয়েতনামে ৯.২৯%, থাইল্যান্ডে ৬.১১%, মালয়েশিয়ায় ৫.৭৯%, চীনে ৫.৪৭%, জাপানে ৪.৩১%, দ. কোরিয়ায় ৩.৩৫% এবং সিঙ্গাপুরে ২.০৩% [স্মারণী-৫.১০(৯)]।

স্মারণী-৫.১০(৯) : গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০১৪ অনুযায়ী বিদ্যুতের সিস্টেম লসের দিকথেকে ১৩৮ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

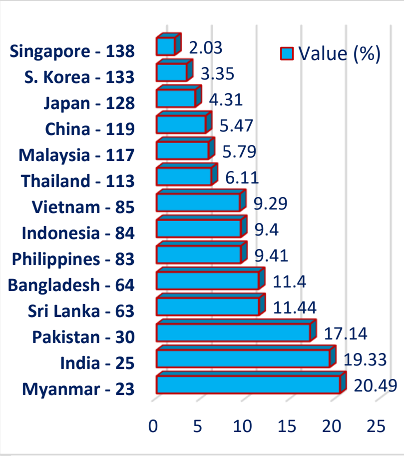

Source: Indexmundi Note: Higher Rank is Higher Position

নবায়নযোগ্য জ্বালানী :

৯) নবায়নযোগ্য জ্বালানী (Renewable Energy) :

জ্বালানি নিরাপত্তায় বাংলাদেশ যথেষ্ট ঝুকির মধ্যে রয়েছে, কেননা, দেশে ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় ৭৩ শতাংশই আমদানি নির্ভর। এমতাবস্থায় দেশে তেল, গ্যাস ও কয়লা পর্যাপ্ত অনুসন্ধান ও উত্তোলনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমেই কেবল এ মহা সমস্যা মোকাবেলা করার একমাত্র পথ। বলা বাহূল্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদন ও ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি একদমই প্রাথমিক অবস্থায় রয়ে গেছে, ২০১৯ সাল নাগাদ যা মোট দিদ্যুৎ উৎপাদনের ০.০১% মাত্র। এ পরিস্থিতির উন্নয়নে Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) নেট মিটারিংয়ের আওতায় on-grid Solar Energy উৎপাদন বৃদ্ধি করতে একটি গাইডলাইন তৈরী করেছেন, যাতে ২০২১ সাল নাগাদ ২০০০ মেগাওয়াট সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২১ সালের শেষ নাগাদ দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের চিত্র :-

Technology	Off-grid (MW)	On-grid (MW)	Total (MW)
Solar	348.43	198.50	546.93
Wind	2.00	0.90	2.90
Hydro	-	230.00	230.00
Biogas to Electricity	0.69	-	0.69
Biomass to Electricity	0.40	-	0.40
Total :	**351.52**	**429.40**	**780.92**

Source : SREDA

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার :

১০) বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার :

দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের সিংহভাগই গ্যাস ও তেলভিত্তিক। অর্থবছর ২০১৯-২০ নাগাদ মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের আনুমানিক ৭১.৮০% গ্যাসভিত্তিক, ৪.২০% কয়লাভিত্তিক, ১৩.৪০% তরল জ্বালানীভিত্তিক, ১.২০% হাইড্রো পাওয়ার, ৯.৩০% আমদানিভিত্তিক এবং ০.১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানীভিত্তিক উৎপাদন। অর্থবছর ২০০৮-৯ সময়ে দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৮৮.৪৪%, কয়লাভিত্তিক উৎপাদন ৪.০২% এবং তরল জ্বালানীভিত্তিক উৎপাদন ৫.৯৩%। দেশে জ্বালানী স্বল্পতার কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার কথা থাকলেও ২০০৮-২০১৯ এ ১২ বছরের ব্যবধানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ১৬.৬৪%, বছরে গড়ে হ্রাস পেয়েছে ১.৩৯% মাত্র এবং তরল জ্বালানীভিত্তিক উৎপাদন হ্রাসের পরিবর্তে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ৭.৪৭%, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৬২%। এ সময়কালে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন অনেকটা একই পর্যায়ে রয়েছে স্মারণী-৫.১০(১০)।

স্মারণী-৫.১০(১০) : অর্থবছর ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানী ব্যবহারের তথ্য :-

Financial Year	Total Generation MKWh	Fuel Based (%)					
		Gas	Coal	Liquid Fuel	Water	Renewable Energy	Import
2008-09	26,533	88.44	4.02	5.93	1.61	-	-
2009-10	29,247	89.21	3.53	4.76	2.50	-	-
2010-11	31,355	82.12	2.49	12.61	2.78	-	-
2011-12	35,118	79.15	2.52	16.13	2.21	-	-
2012-13	38,229	78.12	3.02	16.51	2.34	-	-
2013-14	42,195	72.42	2.46	18.35	1.39	5.37	-
2014-15	45,836	69.44	2.05	19.90	1.23	7.37	-
2015-16	52,193	68.63	1.62	20.57	1.84	7.32	-
2016-17	57,276	66.44	1.76	21.96	1.71	8.13	-
2017-18	62,676	63.31	2.70	24.72	1.63	7.63	0.01
2018-19	70,533	68.49	1.74	19.07	1.03	9.62	0.05
2019-20	71,419	71.80	4.20	13.40	1.20	9.30	0.10

Source : Power Division Annual Report

Graphical presentation of Fuel based and Technology based electricity generation by the end of financial year 2019-2020.

বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়নে বার্ষিক বরাদ্দ :

Figure-5.10(10)A : Fuel Based Electricity Production capacity by the end of F.Y 2019-20 :-

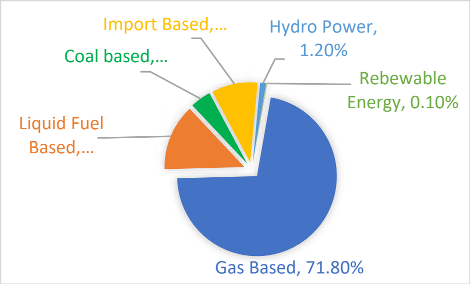

Source : Power Division Annual Report

Figure-5.10(10)B : Technology based Electricity Generation capacity by the end of F.Y 2019-20 :-

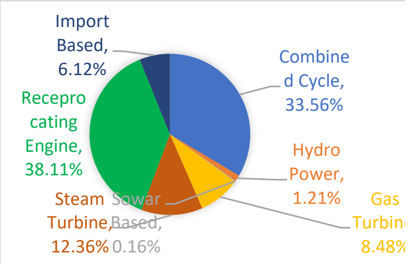

Source : Power Division Annual Report

১১) বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়নে বার্ষিক বরাদ্দ :

স্মারণী-৫.১০(১১) : বিগত দশকে বিদ্যু সেক্টরে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ এবং বাস্তবায়নের চিত্র :-

Fiscal Year	ADP Allocation		Disbursement	
	Tk.in Crore	Growth (%)	Tk. In Crore	%
2008-9	2,677	-	2,298.73	86
2009-10	2,644	-1.21	2,024.54	77
2010-11	5,982	126.22	5,912.82	98.85
2011-12	7,208	20.50	7,179.65	99.61
2012-13	8,803	22.13	8,868.01	101
2013-14	7,928	-9.94	7,916.84	99.85
2014-15	8,277	4.39	8,330.86	100.65
2015-16	15,476	86.98	15,514.76	10.25
2016-17	16,223	4.82	16,702.60	102.96
2017-18	24,947	53.78	25,810.61	103.46
2018-19	24,836	-0.45	23,145.11	93.19
2019-20	24,827	-0.04	23,238.25	93.49

Source: Powerdivision

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যুৎখাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত এখাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ ৯ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে এ চিত্র পুরোপুরি পাল্টে যায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এখাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ দাঁড়ায় ১৫,৪৭৬.২১ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬,২২২.৮২ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৪,৯৪৭.৪৪ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৪,৮৩৬.৪২ কোটি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪,৮২৬.৭৮ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ এ পাঁচবছর সময়কালে বিদ্যুৎখাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ ছিল বছরে গড়ে ২১,২৬১.৯৩ কোটি টাকা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যুৎখাতে এ.ডি.বি বাস্তবায়নের হার ৯৫ শতাংশের উপরে রয়েছে [স্মারণী-৫.১০(১১)]।

বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন :

১২) বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন :

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যাক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধিপাবে এটা স্বাভাবিক, যে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ও নীট চাহিদা বৃদ্ধিপাবে যথাক্রমে বছরে গড়ে ৯% এবং ৯.২%, সেই হিসাবে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন দাঁড়াবে ১৭৭ Twh এবং চাহিদা দাঁড়াবে ১৫৯.৭ Twh [স্মারণী-৫.১০(১২)]। অবশ্য আগামীতে বিদ্যুতের চাহিদা পূরনে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে পরিকল্পণা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছেন।

স্মারণী-৫.১০(১২) : ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার প্রাক্কলন :-

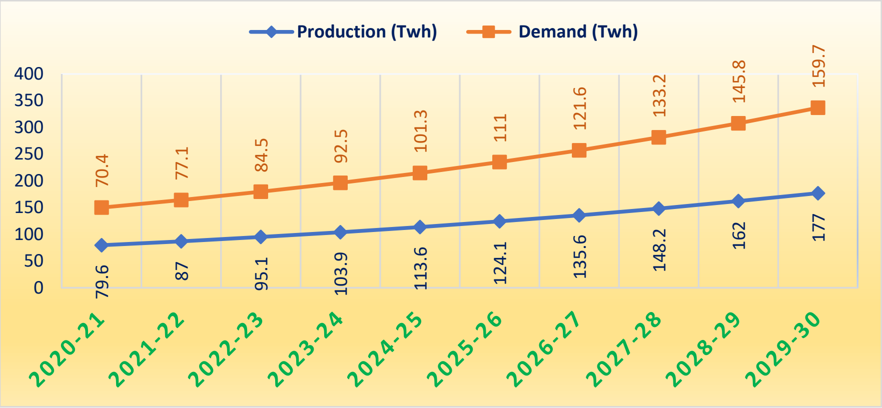

Source: IEEFA

১৩) বিদ্যুৎ সেক্টরে ভূর্তুকি :

বিদ্যুৎ সেক্টরে ভূর্তুকি :

বিদ্যুৎ সেক্টরে ভূর্তুকি বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের নিয়মিত ব্যয়ের অংশ এবং জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম লোকসানী খাত হিসাবে এরিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষকরে, বিগত দশকে দেশে আবিষ্কৃত কয়লা উত্তোলনপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহারের পরিবর্তে, গ্যাস ও আমদানিকৃত তরল জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, বিদ্যুতের মূল্য সহনীয় রাখতে ভূর্তুকি মূল্যে প্রচুর লোকসান দিয়ে সরকার এ বিদ্যুৎ জনগনের নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে, ফলে এ সেক্টরে ভূর্তুকির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০২০-২১ সময়কালে বিদ্যুৎ সেক্টরে ভূর্তুকির পরিমাণ ছিল গড়ে বার্ষিক টাকা ৬৩.৬১ বিলিয়ন, ২০১০-১১ অর্থবছরে যা ছিল টাকা ২৯.৭৩ বিলিয়ন, ২০২০-২১ অর্থবছর নাগাদ যা দাঁড়িয়েছে টাকা ১১৭ বিলিয়ন স্মারণী-৫.১০(১৩)।

স্মারণী-৫.১০(১৩) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০২০-২১ সময়কালে বিদ্যুৎ সেক্টরে ভূর্তুকির চিত্র :-

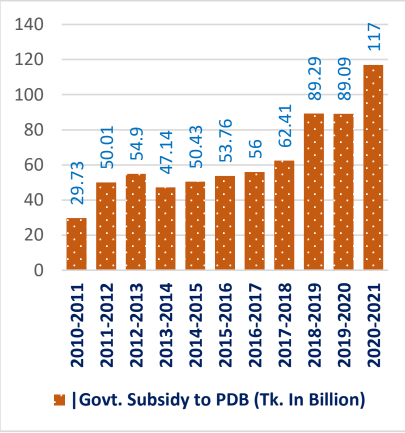

Source : Financial Express Nov. 17, 2021

১৪) বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পণা :

বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌছানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ২০২১ সাল নাগাদ সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সরকার power system master plan (PSMP) ২০১৬ প্রণয়ন করেছেন যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। PSMP ২০১৬ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিপাবে ২০২১ সাল নাগাদ ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৬০,০০০ মেগাওয়াট। ঐ প্রাক্কলন অনুযায়ী মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়াবে ২০২০ সাল নাগাদ ৫১০ KWh, ২০২১ সাল নাগাদ ৭০০ KWh, ২০৩০ সাল নাগাদ ৮১৫ KWh এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ১৪৭৫ KWh।

স্মারণী-৫.১০(১৪) : PSMP ২০১৬ অনুযায়ী ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পণার চিত্র :-

SL No.	Description	Year 2020	Year 2021	Year 2030	Year 2041
1	Power generation capacity (MW)	22,787*	24,000	40,000	60,000
2	Electricity Demand (MW)	14,800	19,000	33,000	52,000
3	Transmission line (Ckt. KM)	12,119	12,000	27,300	34,850
4	Grid Substation Capacity (MVA)	44,340	46,450	120,000	261,000
5	Distribution line (KM)	560,000	515,000	526,000	530,000
6	Power Generation per capita (KWh)	510	700	815	1475
7	Access to electricity	96%	100%	100%	100%

Source: Power division annual report * with captive & RE

খ) জ্বালানি :

জ্বালানি :

১) বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানি সম্পদের সামগ্রিক পরিস্থিতি :

প্রাকৃতিক জ্বালানি সম্পদের দিকথেকে বাংলাদেশ এখনো অনেকটা আমদানি নির্ভর। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বানিজ্যিক জ্বালানি সম্পদ সমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, উৎপাদিত ও আমদানিকৃত কয়লা ও তেল, আমদানিকৃত এল.পি.জি ও এল.এন.জি এবং বিদ্যুৎ অন্যতম। দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার আনুমানিক ২৭% আভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং অবশিষ্ট ৭৩% বানিজ্যিক আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করা হয়। বানিজ্যিক জ্বালানির ক্ষেত্রে প্রায় ৬৩% প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অবশিষ্ট ৩৭% আমদানিকৃত তেল ও কয়লার উপর নির্ভরশীল।

স্মারণী-৫.১০(১৫) : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানির হিসাব :

SL	Name	Unit	Total	
			MTOE	%
1	Oil (Crude + Refined) in K ton	8,650	8.65	15.83
2	LPG in K Tone	699	0.70	1.28

স্মারণী-৫.১০(১৬) : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানি শতাংশ (%) হিসাবে প্রকাশ :-

3	Natural Gas in Bcf	965	22.37	40.96
4	LNG in Bcf	116	2.69	4.93
5	Coal (Imported) K ton	5,754	3.64	6.67
6	Coal (Local) in K ton	803	0.51	0.93
7	RE (Hydro) in MW	230	0.17	0.31
8	RE (Solar) in MW	368	0.27	0.49
9	Electricity (Imported) in MW	1,160	0.86	1.58
10	**Total Comm. Energy**		**39.85**	72.99
11	Biomass		14.75	27.01
12	**Total Primary Energy**		**54.60**	100.00

Source: Energy and Mineral Resources Division

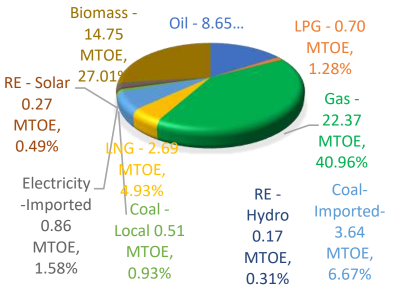

Source: Energy and Mineral Resources Division

দেশে প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার :

২) দেশে প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার :

বিগত দশকে দেশের অর্থনীতি প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি শিল্প ও বানিজ্য সেক্টর প্রসারিত হয়েছে, ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-২০১৮ সময়কালের প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার বিশ্লেষণে দেখাযায়, এ সময়কালে দেশে প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবৃহত হয়েছে বছরে গড়ে ২৭.৪৬ MTOE এবং এ সময়ে ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে ৬.৭৩%। এ সময়কালে প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার হয়েছে (MTOE) ২০০৯ সালে ২০.৬, ২০১০ সালে ২১.৬, ২০১১ সালে ২৩, ২০১২ সালে ২৫, ২০১৩ সালে ২৫.৫, ২০১৪ সালে ২৭, ২০১৫ সালে ৩১.৩, ২০১৬ সালে ৩৩ এবং ২০১৭ সালে ৩৫.৮ MTOE [স্মারণী-৫.১০(১৭)]।

স্মারণী-৫.১০(১৭) : বিগত দশকে (২০০৯-২০১৮) সময়কালে দেশে বাৎসরিক প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির চিত্র :-

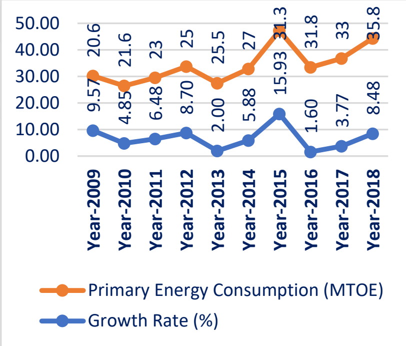

Source: Energy and Mineral Resources Divi.

মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার :

৩) মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার :

মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বের বহুদেশের তুলনায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৯ সালের তথ্যানুযায়ী মাথাপিছু প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার (Gigajoules) বাংলাদেশে ১০.৮, পাকিস্তানে ১৬.৪, শ্রীলংকায় ১৬.৮, ফিলিপাইনে ১৮.৭, ভারতে ২৪.৯, ইন্দোনেশিয়ায় ৩২.৯, ভিয়েতনামে ৪২.৭, থাইল্যান্ডে ৮০.৬, চীনে ৯৮.৮, মালয়েশিয়ায় ১৩৩.৪, জাপানে ১৪৭.২, হংকং এ ১৬৬.৯ এবং দ. কোরিয়ায় ২৪১.৫ Gigajoules [স্মারণী-৫.১০(১৮)]।

স্মারণী-৫.১০(১৮) : ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দ.এশিয়ার অন্যান্য দেশের মাথাপিছু প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহারের চিত্র:-

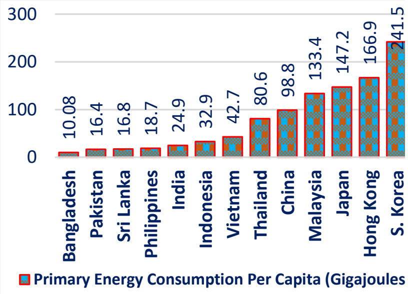

Source: BP(World Energy Analysis)

১) প্রাকৃতিক গ্যাস :

বাংলাাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির ইতিহাস :

ক) বাংলাাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির ইতিহাস :

তৎকালীন বার্মা তেল সংস্থা ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলায় প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে শেল অয়েল কোম্পানি এবং পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম ১৯৬০ এর দশকে আরও ৭ (সাত)টি বড় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বানিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমলে ড. কামাল হোসেন (তৎকালিন জ্বালানি মন্ত্রী) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম বিধিমালা ১৯৭৪ প্রবর্তন করেন এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কোম্পানি "পেট্রোবাংলা" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সালে পেট্রোবাংলা দেশে তেল, গ্যাস আবিষ্কারের কার্যক্রম শুরু করেন এবং ৯ (নয়)টি বড় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ১৯৮৬ সালে পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে হরিপুরে প্রথম বানিজ্যিক তেল সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা হয়। (উইকিপিডিয়া)

১৯৫৫ সালে প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে অদ্যাবধি (জুন ২০১৯) দেশে সর্বমোট আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি (Onshore- 25 + Off-shore-2) , তন্মধ্যে জুন, ২০১৯ নাগাদ ২০টি গ্যাসক্ষেত্র উৎপাদনের আওতায় এসেছে। আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্র সমূহের উত্তোলনযোগ্য মজুদ ছিল ২৮.৬৯ টি.সি. এফ, গত ১৮ বছর যাবৎ উত্তোলনের পর জুন, ২০১৯ নাগাদ মজুদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সরকারি হিসাবে ১১.৭৬ টি.সি. এফ।

জুন, ২০১৯ নাগাদ দেশের গ্যাস সেক্টরের সংক্ষিপ্তসার নিন্মেও ছকে তুলেধরা হলো :-

SL No.	Particulars	Total
1	Total number of Gas Fields	27
2	No. of Gas fields under production	20
3	No. of Wells where gas producing from	112
4	Present Gas production capacity	2,750 MMcfd
5	Average Gas production rate	1,744 – 2,750 MMcfd
6	Annual Production by NOC	385.34 Bcf (40%)
7	Annual Production by IOC	575.43 Bcf (60%)
8	Total Recoverable reserve at the time of invention	28.69 Tcf
9	Cumulative production till June, 2019	16.93 Tcf
10	Recoverable Reserve as of June, 2019	11.76 Tcf

Source: Energy and Mineral Resources Division report

SJFBD

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

খ) প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মওজুদ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। শুরুতে ১৯৫৫ সালের দিকে দেশে গ্যাসের মওজুদ ৩৯ ট্রিলিয়ন ঘণফুট ধারণা করা হলেও ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক র‌্যাংকিংয়ে বাংলাদেশে গ্যাসের মওজুদ ১৮৬ বিলিয়ন ঘণ মিটার এবং গ্যাস মওজুদের দিকথেকে ১০২ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫ তম নির্ধারিত হয়। ঐ র‌্যাংকিং এ গ্যাস রিজার্ভের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ, যেমন- চীনের অবস্থান ১০ম, ইন্দোনেশিয়া ১৩ তম, ভারত ২৩ তম, মালয়েশিয়া ২৪তম, ভিয়েতনাম ২৮তম, মিয়ানমার ৩০তম, পাকিস্তান ৩১তম, থাইল্যান্ড ৪৪তম এবং ফিলিপাইন ৫১তম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.১০(১৯)]।

স্মারণী-৫.১০(১৯) : গ্যাস মওজুদের দিকথেকে ২০১৮ সালের র‌্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দ. এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান:-

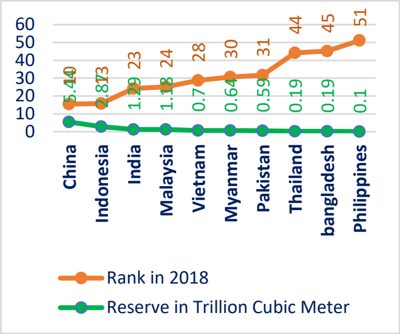

Source: Worldpopulationoverview.com
Note: Higher Rank indicates lower position.

গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবহার :

গ) গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবহার :

গ্যাস বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ, যার আহরণ ও ব্যবহার বানিজ্যিক ভিত্তিতে করা হচ্ছে এবং এখাতে রাজস্ব অর্জিত হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও ১৯৬০ সাল থেকে কিছু কিছু গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। মূলতঃ ১৯৮০ সালের পর থেকে দেশে গ্যাসের বানিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং ১৯৯০ সালের পর থেকে তা বিস্তৃতি পেয়েছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গ্যাসের বার্ষিক উত্তোলন ও ব্যবহার ১৭০ বিলিয়ন ঘণফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সাল নাগাদ ৯৬৯ বিলিয়ন ঘণফুটে পৌঁছায় [স্মারণী-৫.১০(২০)]।

স্মারণী-৫.১০(২০) : অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলন ও ব্যবহারের চিত্র :-

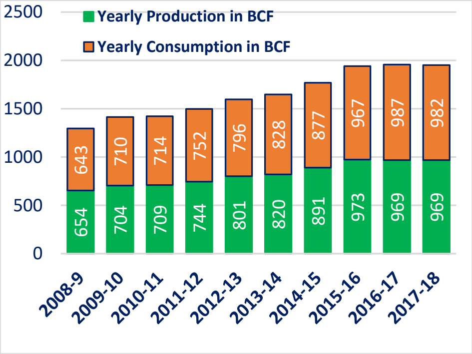

Source: MOF

২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক র‌্যাংকিং অনুযায়ী গ্রাস উত্তোলন ও ব্যবহারে ১১৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩২তম, যেখানে মালয়েশিয়া ৩০তম, পাকিস্তান ২১তম, ইন্দোনেশিয়া ২০তম, দ. কোরিয়া ১৯তম, ভারত ১৪তম, থাইল্যান্ড ১৩ তম, জাপান ৫তম এবং চীন তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

ঘ) মাথাপিছু গ্যাস ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

মাথাপিছু প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। গ্লোবাল র‌্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী মাথাপিছু গ্যাস ব্যবহারে ২১৪ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮১ তম। মাথাপিছু গ্যাস ব্যাবহারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে সিঙ্গাপুর ১৫তম স্থানে, ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের মধ্যে জাপান ৩২ তম, মালয়েশিয়া ৩৪তম, দ. কোরিয়া ৩৭তম, থাইল্যান্ড ৪২তম,

মাথাপিছু গ্যাস ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

পাকিস্তান ৭৭তম, চীন ৮২তম, ইন্দোনেশিয়া ৮৪তম, ভিয়েতনাম ৯১তম, মিয়ানমার ৯২তম, ভারত ১০১তম এবং ফিলিপাইন ১০৫ তম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.১০(২১)]।

স্মারণী-৫.১০(২১) : গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী মাথাপিছু গ্যাস ব্যবহারে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

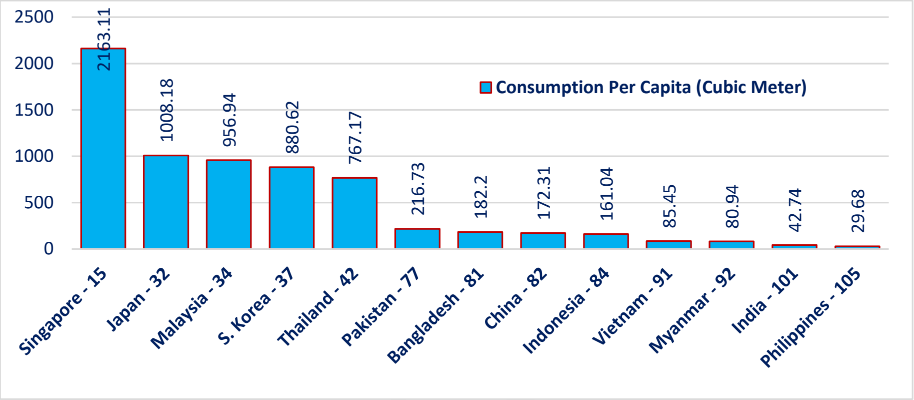

Source: Indexmundi   Note: Higher ranking means lower position

সেক্টর অনুযায়ী গ্যাসের ব্যবহার :

ঙ) সেক্টর অনুযায়ী গ্যাসের ব্যবহার :

বাংলাদেশে যে কয়টি সেক্টরে অদ্যাবধি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে তন্মধ্যে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, ফার্টিলাইজার, শিল্প কারখানা, বাসাবাড়ী ও যানবাহনে সি.এন.জি সর্বরাহ অন্যতম। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী উত্তোলিত গ্যাসের ৪০% বিদ্যুৎখাতে, ক্যাপটিভ পাওয়ারে ১৬%, বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ১৭%, বাসা বাড়ীতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত ১৬%, সার উৎপাদনে ৫%, যানবাহনে সি.এন.জি সর্বরাহ ৫% এবং বানিজ্যিক ব্যবহার ১% [স্মারণী-৫.১০(২২)]।

স্মারণী-৫.১০(২২) : ২০১৬-১৭ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন সেক্টরে গ্যাসের ব্যবহার :-

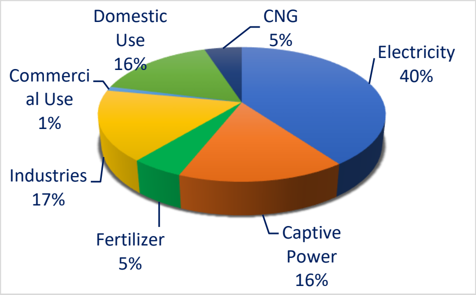

Source : MOF

প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে রেভেনিউ অর্জন :

চ) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে রেভেনিউ অর্জন :

১৯৮০ পরবর্তী দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বানিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকে এখাতে সরকারের কিছু কিছু রাজস্ব আয় শুরু হয়, ১৯৯০ সালের পর থেকে যা বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে গ্যাস থেকে অর্জিত বার্ষিক রেভেনিউ জি.ডি.পি অনুপাতে গড়ে ১% এর নীচে রয়েছে, অর্থবছর ১৯৯৯-০০ সময়ে যা ছিল জি.ডি.পি অনুপাতে ০.৩৬%, ২০১০-১১ সময়ে ১.১৯% এবং ২০১৭-১৮ সময়ে ০.৫৩% স্মারণী-৫.১০(২৩)। গ্যাসের প্রাকৃতিক রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার ফলে এবং সাম্প্রতিক সময়গুলোতে আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হওয়ার ফলে ২০১৫ সালের পর থেকে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গ্যাস সংযোগ সীমিত করা হয়েছে, ফলে এ সময়ে গ্যাস সেক্টর থেকে সরকারের রাজস্ব আয়ও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস রেভেনিউ এর দিকথেকে বাংলাদেশর অবস্থান :

স্মারণী-৫.১০(২৩) : বিগত দুই দশক সময়কালে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে জি.ডি.পি অনুপাতে রেভেনিউ (নীট) অর্জনের চিত্র :-

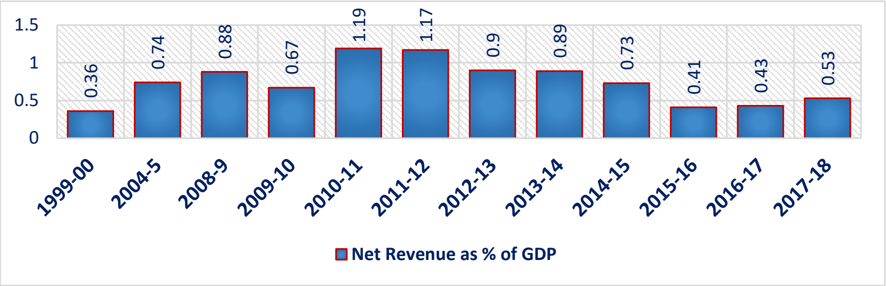

Source: Globaleconomy.com

ছ) প্রাকৃতিক গ্যাস রেভেনিউ এর দিকথেকে বাংলাদেশর অবস্থান :

প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে রেভিনিউ অর্জনের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে ভারত ও ফিলিপাইন ব্যাতিত অন্যান্য সব দেশের পিছনে অবস্থান করছে। ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং অনুযায়ী গ্যাস রেভিনিউ অর্জনে ১৩৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৩ তম। ঐ র‍্যাংকিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে মালয়েশিয়ার অবস্থান ১৩, ইন্দোনেশিয়া ২৪, থাইল্যান্ড ২৬, পকিস্তান ৩১, ভিয়েতনাম ৩২, ফিলিপাইন ৪৯ এবং ভারত ৬১ তম স্থানে রয়েছে। ২০১৮ সালে গ্যাসখাতে রেভিনিউ অর্জন জি.ডি.পি অনুপাতে বাংলাদেশে ০.৫৩%, মালয়েশিয়ায় যা ছিল ২.৯৯%, ইন্দোনেশিয়ায় ১.০৪%, থাইল্যান্ডে ০.৮৭%, পকিস্তানে ০.৬১%, ভিয়েতনামে ০.৫৮%, ফিলিপাইনে ০.১৭% এবং ভারতে ০.০৫% [স্মারণী-৫.১০(২৪)]।

স্মারণী-৫.১০(২৪) : ২০১৮ সালের গ্লোবাল র‍্যাংকিং অনুযায়ী জি.ডি.পি অনুপাতে গ্যাস রেভিনিউ অর্জনে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

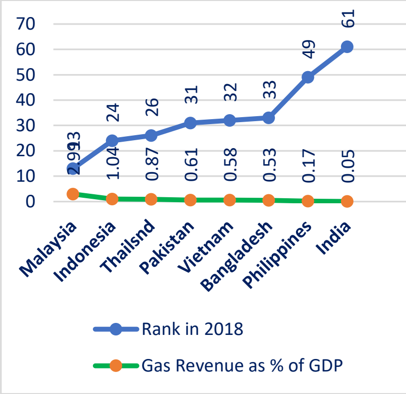

Source: Globaleconomy.com

SJBD

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রাক্কলন :

জ) দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রাক্কলন :

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের জ্বালানিখাতে অন্যতম উৎস হওয়ার কারণে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সেক্টরে গ্যাসের ব্যাবহার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ সময়কাল পর্যন্ত দেশে আনুমানিক ৩,৩৯২ MMscfd চাহিদার বিপরীতে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ আমদানিকৃত LNG সহ ৩,৩৩১ MMscfd. দেশের জ্বালানি সেক্টরে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে গ্যাসের চাহিদা দাঁড়াবে ৪,৬২২ MMscfd [স্মারণী-৫.১০(২৫)]।

স্মারণী-৫.১০(২৫) : ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাক্কলিত চাহিদার পরিমাণ :-

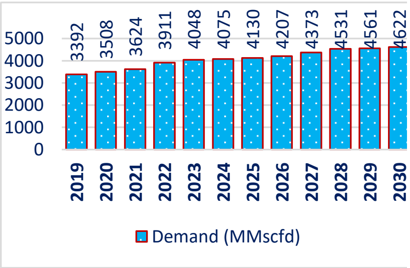

Source: EMRD

ঝ) গ্যাস সেক্টর উন্নয়নে করনীয় সমূহ :

বিগত বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জ্বালানি হিসাবে গ্যাসের ব্যবহার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা মিটাতে বিগত সময়গুলোতে গ্যাসের উত্তোলনও ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, ফলে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। জুন, ২০১৯ সময়কালে দেশে গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য রিজার্ভ এর পরিমাণ ছিল নিম্নরুপ :-

শুরুতে গ্যাস আবিষ্কারের সময় উত্তোলনযোগ্য রিজার্ভ ছিল	২৮.৬৯ টি.সি.এফ
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত গ্যাসের মোট উত্তোলন	১৬.৯৩ টি.সি.এফ
জুন, ২০১৯ সময়কালে দেশে গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য রিজার্ভ	১১.৭৬ টি.সি.এফ

গ্যাস সেক্টর উন্নয়নে করনীয় সমূহ :

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে গ্যাসের চাহিদা ভবিষ্যতে আরোও বৃদ্ধিপাবে এবং সেক্ষেত্রে গ্যাসের বর্তমান রিজার্ভ আগামী ১২-১৪ বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা। দেশে যদি দ্রুত নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হয় এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা না যায়, তাহলে আগামীতে গ্যাসের মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিবে, যা দেশের জ্বালানি সেক্টরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। কাজেই গ্যাস সেক্টরের দ্রুত উন্নয়নে প্রয়োজন :-

- গ্যাসের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে যে সমস্ত আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র এখনো উৎপাদনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি, ঐসব গ্যাসক্ষেত্র থেকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলনে আগানো উচিত, যাতে অধিকতর উৎপাদন সম্ভব হয়।
- দ্রুততার সাথে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কারের লক্ষ্যে বিদেশের দক্ষ প্রতিষ্ঠানদ্বারা দেশের জলভাগ ও স্থলভাগ উভয়ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ রাখা ।
- পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে গ্যাস আমদানির সম্ভাব্যতা যাছাইয়ের পাশাপাশি এল.এন.জি আমদানি আরোও সাশ্রয়ী করে তুলতে সমীক্ষা পরিচালনা করা।
- নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আবাসিক ও বানিজ্যিক সকল ধরনের গ্যাস সংযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা।
- এখনথেকে আবাসিক ও বানিজ্যিক উভয়ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী বিকল্প জ্বালানি সন্ধানে রাখা উচিত, যা দেশে আগামীতে জ্বালানি চাহিদা পূরনে সক্ষম।

SJFBD

২) কয়লা :

ক) বাংলাদেশে কয়লার সামগ্রিক পরিস্থিতি :

বাংলাদেশে কয়লার সামগ্রিক পরিস্থিতি :

কয়লা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক সম্পদ। জ্বালানি হিসাবে কয়লা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট ভাটায় জ্বালানি হিসাবে এর ব্যবহার বিশ্বব্যাপি বিস্তৃত। বাংলাদেশে প্রথম কয়লা খনি আবিস্কৃত হয় ১৯৬২ সনে। পরবর্তীতে আরও ৪টি সহ অদ্যাবধি মোট ৫টি খনিতে কয়লা আবিস্কৃত হয়েছে, সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী যাতে মওজুদের পরিমাণ রয়েছে আনুমানিক ৭,৯৬২ মিলিয়ন মেট্রিক টন (প্রমাণিত ও পরিমাপকৃত মজুদ ৩,৩০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন), যাদের অধিকাংশই এখনো উৎপাদনের আওতায় আসেনি। দেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত কয়লা মওজুদের পরিমাণ ৩৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন স্মারণী-৫.১০(২৭)। কয়লা উত্তোলনে ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ১৩০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬০ তম। বিভিন্ন গবেষণা তথ্যমতে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে অনাবিস্কৃত কয়লা মওজদ রয়েছে, যা প্রচলিত খনির মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য নয়।

স্মারণী-৫.১০(২৬) : আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০১৭ অনুযায়ী আবিস্কৃত কয়লা মওজুদে ১৯০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের অবস্থান ও মওজুদের পরিমাণ :-

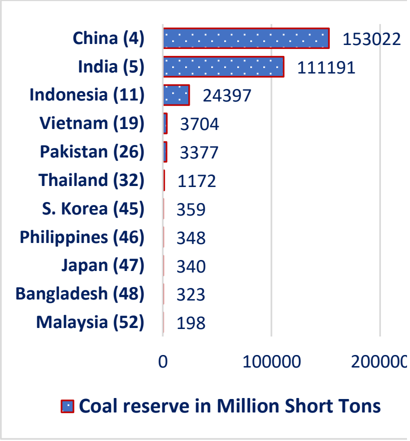

Source: Globaleconomics.com

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ভবিষ্যতে জ্বালানি চাহিদা মিটাতে অনাবিস্কৃত এ কয়লা যতদ্রুত সম্ভব আবিস্কারের উদ্যোগ নেওয়া গেলে দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে। এযাবৎ আবিস্কৃত মওজুদের পরিমাণ কম হলেও দেশি / বিদেশি বিভিন্ন তথ্যমতে বাংলাদেশে আবিস্কৃত কয়লার গুণগত মান ভাল এবং এ কয়লার চাহিদাও যথেষ্ট। দেশে এযাবৎ আবিস্কৃত কয়লার মওজুদের বিবরণ নিন্মেও স্মারণীতে তুলেধরা হলো :-

SIPBD

স্মারণী-৫.১০(২৭) : Major coal fields and reserves in Bangladesh by 2014 :-

Coal fields	Year of discovery	Depths of coal seam (in meter)	No. of coal seam	Reserve (Million ton)	Status
Jamalganj (Joypurhat)	1962	640-1158	7	5,450	Mining not feasible economically
Barapukuria (Dinajpur)	1985	118-506	6	390	Underground mine started production
Khalashpir (Rangpur)	1989	257-451	8	685	Undeveloped
Dighipara (Dinajpur)	1995	250	7	865	Undeveloped
Phulbari (Dinajpur)	1997	152-246	1	572	Open pit mine feasibility study undertaken in 2004
Total :			29	7,962	

Source: CPD and Banglapedia Note: Measured and probable Reserve of Coal is 3,300 Million M.T

খ) কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার :

কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার :

বাংলাদেশে অদ্যাবধি ৫টি খনিতে কয়লা আবিষ্কৃত হলেও একমাত্র বড়পুকুরিয়া খনি ব্যাতিত অন্য চারটি খনি অদ্যাবধি উৎপাদনের আওতায় আসেনি। ফলে কয়লা উৎপাদন ও ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে কয়লা উৎপাদনের তুলনায় ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপুল আমদানির মাধ্যমে ঘাটতি পূরতে করতে হয়েছে। অর্থবছর ২০০৭-৮ থেকে ২০১৬-১৭ এ দশ বছর সময়কালে দেশে প্রতিবছর গড়ে কয়লা আমদানি হয়েছে ১,৪৮৯.৪ হাজার সর্ট টন (TMT)। অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে কয়লা উৎপাদন ও ব্যবহারের তথ্য [স্মারণী-৫.১০(২৮)] এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো।

স্মারণী-৫.১০(২৮) : অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে বার্ষিক কয়লা উত্তোল ও ব্যবহারের চিত্র :-

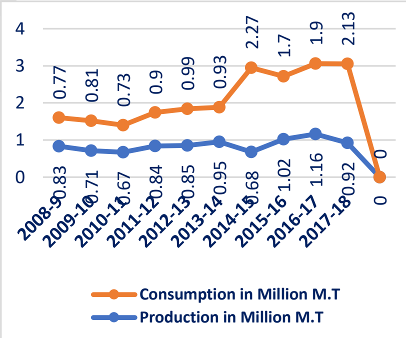

Source: BCMCL

স্মারণী-৫.১০(২৯) : আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০১৮ অনুযায়ী কয়লা ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

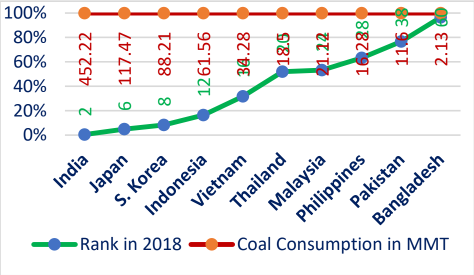

Source: Ceicdata Note: Higher Rank indicates Lower Position.

গ) কয়লা ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান :

কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

কয়লা ব্যবহারের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান একদমই পিছনের দিকে। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০১৮ অনুযায়ী কয়লা ব্যবহারে ১৩০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬০ তম, যেখানে ভারতের অবস্থান ২, জাপান ৬, দক্ষিণ কোরিয়া ৮, ইন্দোনেশিয়া ১২, ভিয়েতনাম ১৬, থাইল্যান্ড ২০, মালয়েশিয়া ২৪, ফিলিপাইন ২৮ এবং পাকিস্তান ৩৮ তম স্থানে রয়েছে। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ঐ বছরে কয়লার ব্যবহার ভারতে ৪৫২.২২ মিলিয়ন মে.টন, জাপানে ১১৭.৪৭, , দক্ষিণ কোরিয়ায় ৮৮.২১, ইন্দোনেশিয়ায় ৬১.৫৬, ভিয়েতনামে ৩৪.২৮, থাইল্যান্ডে ১৮.৫, মালয়েশিয়ায় ২১.১২, ফিলিপাইনে ১৬.২৮, পাকিস্তানে ১১.৬ এবং বাংলাদেশে ২.১৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন [স্মারণী-৫.১০(২৯)]।

দেশে কয়লা আমদানির চিত্র :

ঘ) দেশে কয়লা আমদানির চিত্র :

বাংলাদেশে আবিস্কৃত কয়লার মজুদ ও বার্ষিক উত্তোলনের পরিমাণ আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় পরিমাণে কম হওয়ার ফলে প্রতিবছর প্রচুর কয়লা আমদানির মাধ্যমে এ ঘাটতি পূরণ করতে হয়। অর্থবছর ২০০৭-৮ থেকে ২০১৬-১৭ এ দশ বছর সময়কালে দেশে প্রতিবছর গড়ে কয়লা আমদানি হয়েছে ১,৪৮৯.৪ হাজার সর্ট টন (TMT), যা ছিল ২০০৭-৮ অর্থবছরে ১,০৫৮, ২০০৮-৯ অর্থবছরে ১,৪১৫, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১,১০৯, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১,৩০১, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১,০৮৮, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১,৩১৮, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৪৫, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২,২০০, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৩৬৩ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩,০৯৭ হাজার সর্ট টন [স্মারণী-৫.১০(৩০)]।

স্মারণী-৫.১০(৩০) : অর্থবছর ২০০৭-৮ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে দেশে কয়লা আমদানির চিত্র :-

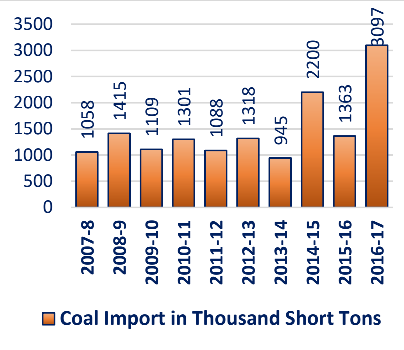

Source: Globaleconomy.com

দেশে কয়লার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে আবিস্কৃত কয়লাক্ষেত্র সমূহ যতদ্রুত সম্ভব উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসা উচিত। কেননা, প্রতিবছর কয়লা আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাহিরে চলে যায়, যা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যেত।

কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধিকল্পে করনীয় :

ঙ) কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধিকল্পে করনীয় :

বাংলাদেশে জ্বালানির প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস , বিদ্যুৎ উৎপাদনে যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিপিডিবি এর তথ্যমতে জুন, ২০১৯ নাগাদ দেশে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার ২.৫২% কয়লা চালিত, ৫৫.২৬% গ্যাস, ২৬.৪৬% তরল জ্বালানি এবং ১৫.৭৬% নবায়নযোগ্য ও অন্যান্য জ্বালানি দ্বারা পরিচালিত। জুন ২০১৯ নাগাদ দেশে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ১১.৭৬ টি.সি.এফ, ব্যবহারের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামি ১২-১৪ বছরের মধ্যে যা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ বাস্তবতায় ভবিষ্যতে দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বৃদ্ধিপূর্বক নতুন কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার ও কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ব্যাতিত বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে এযাবৎ আবিস্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মজুদের পরিমাণ ৭,৯৬২ মিলিয়ণ মেট্রিক টন, যদিও নিশ্চিভাবে পরিমাপকৃত মজুদের পরিমাণ ৩,৩০০ মিলিয়ণ মেট্রিক টন, যা ঠিকমত উত্তোলন করা গেলে আগামিতে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধিপূর্বক গ্যাসের ব্যবহার কমে আসবে এবং বর্তমান মজুদকৃত গ্যাস তিনগুণ সময় ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু হতাশার বিষয় হচ্ছে চলমান উত্তোলন পদ্ধতিতে কয়লার এ মজুদের বেশিরভাগাই উত্তোলনযোগ্য নয়, ফলে আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে একমাত্র বড়পুকুরিয়া খনিতেই অদ্যাবধি কয়লা উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে।

বিভিন্ন সুত্রমতে বাংলাদেশে আবিষ্কৃত কয়লার গুণগতমাণ ভাল, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প কারখানায়ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। যেহেতু বাংলাদেশে তেল, গ্যাস ও কয়লার মজুদ বিশ্বের জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশ সমূহের তুলনায় অনেক কম, সেহেতু জ্বালানি চাহিদা পূরণে ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত কয়লার পর্যাপ্ত উত্তোলন নিশ্চিতকল্পে গতাণুগতিক উত্তোলন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের পাশাপাশি নতুন কয়লাক্ষেত্র আবিস্কারের জন্য কার্যকরি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরি। তাছাড়া, কয়লাক্ষেত্র সমূহ থেকে পর্যাপ্ত কয়লা আহরনে যে সমস্ত খনিথেকে সাধারণ নিয়মে কয়লা উত্থোলন সম্ভব নয়, ঐ সমস্ত খনিথেকে **"কয়লা গ্যাসিফিকেশন"** প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক আবিষ্কৃত মজুদের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

SJBD

৩) জ্বালানি তেল :

দেশে জ্বালানি তেল পরিস্থিতি

ক) দেশে জ্বালানি তেল পরিস্থিতি :

অর্থনীতির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদাও বৃদ্ধিপাচ্ছে ব্যাপকভাবে, কিন্তু সে তুলনায় জ্বালানি তেলের আভ্যন্তরীণ সংস্থান নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে এযাবৎ যৎসামান্য জ্বালানি তেলের সন্ধান পাওয়া গেলেও, উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ মাত্র ০.০৩ বিলিয়ন ব্যারেল।

জ্বালানি তেল মজুদের দিকথেকে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০২০ অনুযায়ী ১৮৬ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮০ তম। ঐ র‍্যাংকিংয়ে চীন ১২, ভারত ২৩, ভিয়েতনাম ২৪, ইন্দোনেশিয়া ২৭, পাকিস্তান ৫০, থাইল্যান্ড ৫১, মিয়ানমার ৬২, এবং জাপান ৭৭ তম স্থানে রয়েছে। ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে জ্বালানি তেলের মজুদ চীনে ২৬.১৫ বিলিয়ন ব্যারেল, ভারতে ৪.৪২ বিলিয়ন, ভিয়েতনামে ৪.৪০, ইন্দোনেশিয়ায় ৩.১৫, পাকিস্তানে ০.৩৪, থাইল্যান্ডে ০.২৯, মিয়ানমারে ০.১৪, জাপানে ০.০৪ এবং বাংলাদেশে ০.০৩ বিলিয়ন ব্যারেল [স্মারণী-৫.১০(৩১)]।

স্মারণী-৫.১০(৩১) : আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০২০ অনুযায়ী জ্বালানি তেলের মজুদের দিকথেকে দ. এশিয়ার কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

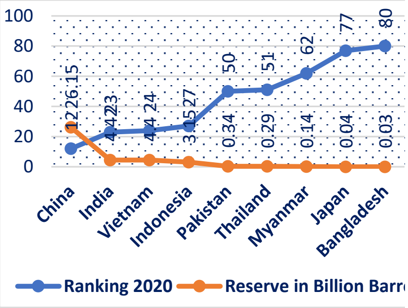

Source: Globaleconomy.com

তেলের দৈনিক চাহিদা ও উত্তোলন :

স্মারণী-৫.১০(৩২) : ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশে জ্বালানি তেলের দৈনিক চাহিদা ও উত্তোলনের চিত্র :-

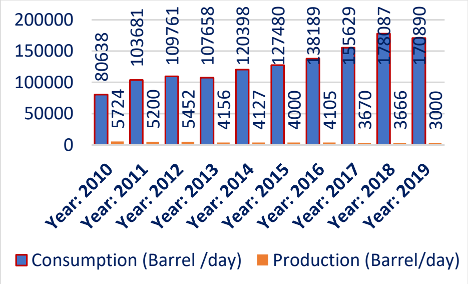

Source: Indexmudi and ciecedata

খ) তেলের দৈনিক চাহিদা ও উত্তোলন :

বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দৈনিক চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই সামান্য, ফলে বার্ষিক চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যাপক ঘাটতি থাকে যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর মাধ্যমে নিয়মিত আমদানিপূর্বক জ্বালানি তেলের আভ্যন্তরীণ বিশাল এ ঘাটতি পূরণ করা হয়। বিগত ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশে জ্বালানি তেলের দৈনিক গড় চাহিদা ছিল ১,২৯,২৪২ ব্যারেল, যার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে গড়ে দৈনিক ৪,৩১০ ব্যারেল মাত্র। এ সময়কালে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৯%। ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশে জ্বালানি তেলের দৈনিক চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ [স্মারণী-৫.১০(৩২)]। এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো।

জ্বালানি তেল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান :

গ) তেল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান :

জ্বালানি তেল উৎপাদন ও ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী জ্বালানি তেল উৎপাদনে ১০০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮৩ তম এবং জ্বালানি তেল ব্যবহারের দিকথেকে ২১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭৪ তম। Oil Production Ranking 2019 অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে চীন ৭ম, ইন্দোনেশিয়া ২৪তম, ভারত ২৫, মালয়েশিয়া ২৬, ভিয়েতনাম ৩৩, থাইল্যান্ড ৩৪, পাকিস্তান ৪৪, ফিলিপাইন ৭৬, এবং জাপান ৮২ তম স্থানে রয়েছে। ঐ র‍্যাংকিং অনুযায়ী জ্বালানি তেলের দৈনিক উৎপাদন (মিলিয়ন ব্যারেল) চীনে ৩.৭৭, ইন্দোনেশিয়ায় ০.৭৭, ভারতে ০.৭১, মালয়েশিয়ায় ০.৬৫, ভিয়েতনামে ০.২৪, থাইল্যান্ডে ০.২৩, পাকিস্তানে ০.০৯, ফিলিপাইনে ০.০১, জাপানে ০.০০৩২ এবং বাংলাদেশে ০.০০৩ মিলিয়ন ব্যারেল [স্মারণী-৫.১০(৩৩)]।

স্মারণী-৫.১০(৩৩) : Oil Production Ranking 2019 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের অবস্থান :-

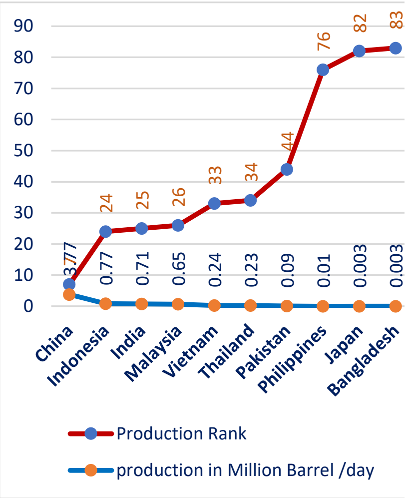

Source: Indexmundi.com Note: Higher Rank indicates lower position

দেশে জ্বালানি তেলের ব্যবহার :

স্মারণী-৫.১০(৩৪) : Oil Consumption Ranking 2019 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের অবস্থান :-

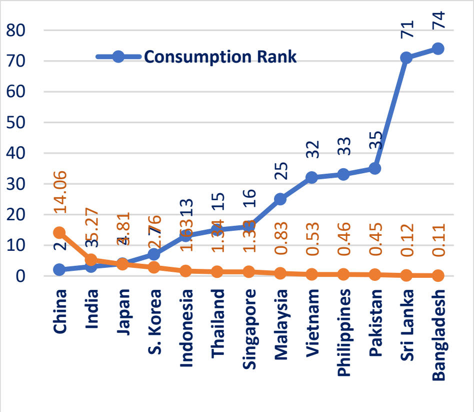

Source: International Energy Agency (IEA)
Note: Higher Rank indicates lower position

ঘ) জ্বালানি তেলের দৈনিক ব্যবহার :

Oil Consumption Ranking 2019 অনুযায়ী ২১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ৭৪তম। ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে চীন ২য়, ভারত ৩য়, জাপান ৪র্থ, দ. কোরিয়া ৭ম, ইন্দোনেশিয়া ১৩, থাইল্যান্ড ১৫, সিঙ্গাপুর ১৬, মালয়েশিয়া ২৫, ভিয়েতনাম ৩২, ফিলিপাইন ৩৩, পাকিস্তান ৩৫ এবং শ্রীলংকা ৭১ তম স্থানে রয়েছে। ঐ র‍্যাংকিং অনুযায়ী জ্বালানি তেলের দৈনিক ব্যবহার (মিলিয়ন ব্যারেল) চীনে ১৪.০৬, ভারতে ৫.২৭, জাপানে ৩.৮১, দ. কোরিয়ায় ২.৭৬, ইন্দোনেশিয়ায় ১.৬৩, থাইল্যান্ডে ১.৩৪, সিঙ্গাপুরে ১.৩৩, মালয়েশিয়ায় ০.৮৩, ভিয়েতনামে ০.৫৩, ফিলিপাইনে ০.৪৬, পাকিস্তানে ০.৪৫, শ্রীলংকায় ০.১২ এবং বাংলাদেশে ০.১১ মিলিয়ন ব্যারেল [স্মারণী-৫.১০(৩৪)]।

ঙ) জ্বালানি তেল আমদানি :

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি বাড়ছে মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং এসব কিছুর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দেশে ব্যাক্তিগত যানবাহন ও গণপরিবহনের সংখ্যা। ফলে দেশে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা

জ্বালানি তেল আমদানির চিত্র :

ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে, পাশাপাশি বাড়ছে পেট্রোলিয়াম আমদানির পরিমাণ। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে পেট্রোলিয়াম আমদানির পরিমাণ ছিল ২৪.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে ডিজেল, অকটেন ও জেট ফুয়েল আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে ৯.০৩% স্মারণী-৫.১০(৩৫) । এ সময়কালে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের বার্ষিক গড় আমদানি ছিল :-

ক) ক্রুড অয়েল বছরে গড়ে - ১২.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন।
খ) ডিজেল, অকটেন ও জেট ফুয়েল গড়ে ৩৯.৫৩ লক্ষ মে.টন
গ) ফার্নেস অয়েল বছরে গড়ে ৫.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

সামগ্রিকভাবে দেশে জ্বালানি তেলের চাহদা বৃদ্ধিপাচ্ছে বছরে গড়ে প্রায় ৯% হারে। ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতির আকার যতই বৃদ্ধিপাবে, শিল্পসেক্টর ও পরিবহনখাত ততই প্রসারিত হবে এবং জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধিপাবে আনুপাতিক হারে।

স্মারণী-৫.১০(৩৫) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে ক্রুড অয়েল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়ম পণ্য আমদানির চিত্র :-

F. Year	Crude Oil Lac MT	Refined Oil (Lac MT)	
		Diesel, Octane & Jet Fuel	Furnace Oil
2010-11	14.09	24.88	2.31
2011-12	10.83	34.10	6.81
2012-13	12.92	28.27	8.04
2013-14	11.77	31.58	10.16
2014-15	13.03	34.04	6.92
2015-16	10.93	33.37	3.35
2016-17	13.88	38.71	5.21
2017-18	11.72	48.92	6.51
2018-19	13.58	42.82	3.19
2019-20	11.52	38.65	1.76
2020-21	15.06	41.75	-

Source: Bangladesh Petroleum Corporation

দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রয়োজনে জ্বালানি তেল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধানের মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে নতুন আয়ত্বকৃত জলসীমায় ব্যাপক অনুসন্ধান এক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল বয়ে আনার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

চ) জ্বালানী তেল আমদানীর বিপরীতে ভূর্তুকি :

জ্বালানী তেলের উপর ভূর্তুকি :

বাংলাদেশে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের প্রায় ৭৩% আমদানি নির্ভর, যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর মাধ্যমে আমদানি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম প্রতিনিয়ত উঠানামা করে এবং অনেক সময় ক্রাইসিস এর কারণে দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে প্রতিনিয়ত সমন্বয় করা সম্ভব হয়না। ফলে বি.পি.সি এ ক্ষেত্রে প্রতিবছর প্রচুর লোকসানের সন্মুখীন হন, যা ভূর্তুকি হিসাবে সরকার পূরন করে দেয়। অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ সময়কালে এই ভূর্তুকির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০০৯-১০ অর্থবছরে টাকা ৯০০ কোটি, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪,০০০ কোটি, ২০১১-১২ অর্থবছে ৮,৫৫০ কোটি, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৩,৫৫৮ কোটি, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২,৪৭৮ কোটি এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে টাকা ৬০০ কোটি। অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম হ্রাস পাওয়ার কারণে এ খাতে সরকারের কোনো ভূর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি স্মারণী-৫.১০(৩৬) ।

স্মারণী-৫.১০(৩৬) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ সময়কালে জ্বালানি তেলের উপর সরকারি ভূর্তুকির চিত্র :-

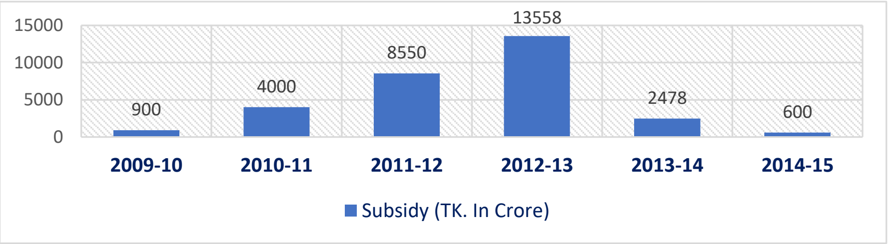

Source : MOF

SJFBD

গ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টর উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

কোনো দেশের টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহজলভ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। বিবিধ কারণে ২০০৮-৯ সাল পর্যন্ত দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরে অনেকটা স্থবিরতা বিরাজ করেছে। সে সময় সীমিত সংখ্যক বিদ্যুৎকেন্দ্র, সীমিত গ্রীড ক্যাপাসিটি, ট্রান্সমিশন ও ডিষ্ট্রিবিউশন লাইনের স্বল্পতা এবং মুষ্টিমেয় গ্রীড সাবষ্টেশন ক্যাপাসিটি নিয়ে স্বল্প সংখ্যক জনগোষ্টির মাঝে বিদ্যুৎ বিতরণ সম্ভব হতো। কিন্তু ২০১০ পরবর্তী সময়কালে বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে এ সেক্টরে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরতে শুরু করে এবং ২০২০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় অনেকটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। ফলে ২০১৯ সাল নাগাদ দেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩৮টি, ২০০৯ সাল নাগাদ যা ছিল ২৭টি। এ সময়ে গ্রীড ক্যাপাসিটি ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াট এর বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১২,৩৭৯ মেগাওয়াট, যা ২০০৯ সাল নাগাদ ছিল গ্রীড় ক্যাপাসিটি ৪,৯৪২ মেগাওয়াটের বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ৩,২৬৮ মেগাওয়াট। ২০১৯ সাল নাগাদ দেশের ৯৮% এলাকা বিদ্যুতায়নের আওতায় এসছে, ২০০৯ সাল নাগাদ যা ছিল ৪৭% স্মারণী-৫.১০(৩৭)। তাছাড়া, দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে বর্তমান সরকার আগামীর চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ২০২১ সাল নাগাদ ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৬০,০০০ মেগাওয়াট।

স্মারণী-৫.১০(৩৭): বিগত দশকে (২০০৯-২০১৯) বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরে অগ্রগতির চিত্র :-

Particulars	Up to 2009	Addition during the period	2019	Remarks
No. of Power Plants	27	+ 111	138	
Grid Capacity (MW)	4,942	+ 18,606	23,548	
Highest Generation (MW)	3,268	+ 9,625	12,893	
Power Import	-	+ 1,160	1,160	
Total Consumers (Million)	10.8	+ 27.6	38.4	
Transmission Line (CKT KM)	8,000	+ 4,379	12,379	Till May 29, 2019
Distribution Line (KM)	260,000	+ 326,000	586,000	
Grid Sub-station Capacity (MVA)	15,870	+ 31,434	47,304	
Access to Electricity	47%	+ 51%	98%	
Per Capita Generation (kWh)	220	+ 292	512	Fiscal Year 2019-20
System Loss	14.33%	- 3.10%	11.23%	Fiscal Year 2019-20
ADB Allocation (BDT Billion)	2,677	+ 24,960	27,637	Fiscal Year 2020-21

Source: Powercell

বিগত দশকে দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরে উল্লিখিত অগ্রগতি সত্ত্বেও মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০২০ অনুযায়ী মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারে ২১৭ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৭০তম। ঐ র‍্যাংকিং অনুযায়ী মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার (kWh) বাংলাদেশে ৩৩৬, পাকিস্তানে ৪৪৪, শ্রীলংকায় ৫৬১, পিলিপাইনে ৭৩৯, ইন্দোনেশিয়ায় ৮১২, ভারতে ৮৭৭, মালদ্বীপে ৯৫৩, ভিয়েতনামে ১,৪৭৬, থাইল্যান্ডে ২,৭৩৬, চীনে ৪,০১৮, মালয়েশিয়ায় ৪,৩০৪, জাপানে ৭,৪৯৮, সিঙ্গাপুরে ৭,৯৫৪ এবং দ. কোরিয়ায় ৯,৮৭২ kWh [স্মারণী-৫.১০(৬)]।

অন্যদিকে, প্রাকৃতিক জ্বালানি সম্পদের দিকথেকেও বাংলাদেশ এখনো অনেকটা আমদানি নির্ভর। দেশে উল্ল্যেখযোগ্য বানিজ্যিক জ্বালানি সমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, উৎপাদিত ও আমদানিকৃত কয়লা ও তেল, আমদানিকৃত এল.পি.জি ও এল.এন.জি অন্যতম। দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার আনুমানিক ২৭% আভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং অবশিষ্ট ৭৩% বানিজ্যিক আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করা হয়। বানিজ্যিক জ্বালানির ক্ষেত্রে প্রায় ৬৩% প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অবশিষ্ট ৩৭% আমদানিকৃত তেল ও কয়লার উপর নির্ভরশীল।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরনে আগামীতে শিল্প ও বানিজ্যসহ সামগ্রীক অর্থনৈতিকক্ষেত্রে বড় আকারের বিপ্লব প্রয়োজন, যা দেশের জি.ডি.পি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন কাঙ্কিত পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী সমূহের মধ্যে **"বিদ্যুৎ ও জ্বালানি "** সেক্টরের উন্নয়ন একটি অবধারিত বিষয়। কেননা, আগামীতে অর্থনীতির আকার প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে শিল্প সেক্টর ও ব্যাক্তি পর্যায়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাবে, যা মোকাবেলা করার সামগ্রিক প্রস্তুতি থাকা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য।

সেই দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টর এখনও যথেষ্ট অপরিপক্ক, অনগ্রসর এবং দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঝুকিপূর্ণ, আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে সেক্টরে নীতিনির্ধারণী ও প্রতিষ্ঠানিক অনেকক্ষেত্রে শুদ্ধাচার এবং পূণর্গঠন অপরিহার্য, যা নিন্মরুপ :-

১. দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের প্রায় ৮৫ শতাংশই গ্যাস ও তেলভিত্তিক, যে সমস্ত জ্বালানির প্রায় ৭৩% বানিজ্যিক আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরন করা হয়। অর্থবছর ২০১৯-২০ সময়ে দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের আনুমানিক ৭১.৮০% গ্যাসভিত্তিক, ৪.২০% কয়লাভিত্তিক, ১৩.৪০% তরল জ্বালানীভিত্তিক, ১.২০% হাইড্রো পাওয়ার, ৯.৩০% আমদানিভিত্তিক এবং ০.১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানীভিত্তিক উৎপাদন স্মারণী-৫.১০(১০)। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আমদানিভিত্তিক জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতি টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ।

২. দেশে জ্বালানী স্বল্পতার কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার ক্রমান্নয়ে হ্রাস করার কথা থাকলেও ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ১৬.৬৪%, বছরে গড়ে হ্রাস পেয়েছে ১.৩৯% মাত্র এবং তরল জ্বালানীভিত্তিক উৎপাদন হ্রাসের পরিবর্তে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ৭.৪৭%, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৬২%। এ সময়কালে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন অনেকটা একই পর্যায়ে রয়েছে স্মারণী-৫.১০(১০)।

৩. বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কয়লা মজুদ থাকা সত্ত্বেও ঐ সমস্ত কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহারের উপর জোর না দিয়ে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে গ্যাস এবং তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে, স্বল্প আয়ের জনগণ এবং উৎপাদনমূখি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর যা মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৪. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূর্তুকি মূল্যে প্রচুর লোকসান দিয়ে সরকার এ বিদ্যুৎ জনগনের নিকট বিক্রয় করতে হচ্ছে, ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ সেক্টরে ভূর্তুকির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০২০-২১ সময়কালে বিদ্যুৎ সেক্টরে ভূর্তুকির পরিমাণ গড়ে বার্ষিক টাকা ৬৩.৬১ বিলিয়ন, ২০১০-১১ অর্থবছরে যা ছিল টাকা ২৯.৭৩ বিলিয়ন, ২০২০-২১ অর্থবছর নাগাদ যা দাঁড়িয়েছে টাকা ১১৭ বিলিয়ন স্মারণী-৫.১০(১৩)। বলা বাহুল্য, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর যদি লোকসানি হয় এবং ভূর্তুকির উপর নির্ভরশীল হয়ে চলতে হয়, তাহলে ঐ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সব সময়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৫. যেহেতু দেশে আবিষ্কৃত গ্যাসের রিজার্ভের পরিমাণ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে এবং নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের গতিও মন্থর, অন্যদিকে তরল জ্বালানী পুরোপুরি আমদানি নির্ভর, সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকরা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ০.০১% মাত্র।

৬. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে Transmission & Distribution (T&D) Systems Management এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন, যাতে বিদ্যুৎ বিতরনে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন লস নির্দিষ্ট মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হয় এবং এখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, যাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতিয় গ্রীডে সংযোজন সহজতর হয়। তাছাড়া, T&D Systems Management সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজন :-

ক) এ সেক্টরে ব্যাক্তিখাতের অংশগ্রহনের কার্যকারিতা যাছাই করা।
খ) এ সেক্টরে দেশি / বিদেশি বিনিয়োগ আকর্শনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা; এবং
গ) T&D প্রতিষ্ঠান সমূহের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ।

৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরের দ্রুত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ও টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং এলক্ষ্যে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ সহজতর করা।

৮. জ্বালানি খাতে স্বাবলম্বীতা অর্জনে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে এর ব্যবহার পর্যাপ্ত বৃদ্ধিকরাপূর্বক জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৯. বিদ্যুতের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার স্বার্থে এ সেক্টরে ব্যাক্তিখাতের বিনিয়োগ আরোও বৃদ্ধিকরা।

১০. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের পরামর্শ মেনে চলা।

****

অধ্যায় : ৫.১১

টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন।

টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) অবকাঠামো উন্নয়ন।
- ১) অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি।
- ২) সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান।
- ৩) ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে দৃশ্যমান অবকাঠামোর সংক্ষিপ্তসার।

খ) অবকাঠামো উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য কেন অপরিহার্য ?

গ) অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ।
- ১) অবকাঠামো উন্নয়নে চলমান মেগাপ্রজেক্ট সমূহ।

ঘ) বাস্তবায়নাধীন ১০ মেগা প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার।

ঙ) টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে SDG-9 অর্জনে অগ্রগতি।

চ) ভবিষ্যতে দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো কেমন হওয়া উচিৎ ?

ছ) বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ।

জ) যে সমস্ত সেক্টরে অবকাঠামো আরোও ব্যাপক সম্প্রসারন প্রয়োজন।
- ১) সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন।
- ২) রেলপথ উন্নয়ন ও রেল নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিকরা।
- ৩) বিমান বন্দর সমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরা।
- ৪) স্থল বন্দর সমূহের সেবার মান, ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ৫) সমুদ্র বন্দর সমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ৬) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ৭) নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- ৮) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন।
- ৯) অন্যান্য সেক্টরে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন।

অবকাঠামো উন্নয়ন :

ক) অবকাঠামো উন্নয়ন :

অবকাঠামো অর্থ সেই সব মৌলিক সুযোগ সুবিধা এবং পরিসেবার ক্ষেত্র যা দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমূহকে সচল করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে। যে কোনো দেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি ঐ দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন। একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমন্বয়ে সামগ্রিক অবকাঠামো গঠিত, যা সোস্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল নামেও পরিচিত। এসমস্ত সুবিধা সরাসরি পণ্য ও সেবা উৎপাদন করেনা, তবে দেশের শিল্প বানিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিসহ জীবন যাপনের প্রতিটিক্ষেত্র সহজ করে তোলার মাধ্যমে অর্থনীতির গতি প্রবাহ বিস্তৃত করে।

সামগ্রিক অবকাঠামো দু-ভাগে বিভক্ত, যেমন- হার্ড অবকাঠামো এবং সফ্‌ট অবকাঠামো।

- **হার্ড অবকাঠামো :** সে সমস্ত দৃশ্যমান মূলধনী সম্পদ, যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখে। উদাহরনস্বরুপ- দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, বন্দর, টেনিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য পরিসেবা ব্যবস্থা।
- **সফ্‌ট্ অবকাঠামো :** শক্ত অবকাঠামো পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত নিয়ম কানুনই সফ্‌ট্ অবকাঠামো। উদাহরনস্বরুপ- কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ইত্যাদি।

বৃহদার্থে সামগ্রিক অবকাঠামো দু-ভাগে বিভক্ত , যেমন- অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো।

- **অর্থনৈতিক অবকাঠামো :** সে সমস্ত অবকাঠামো উৎপাদন, বণ্টন ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, যেমন- যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, বন্দর, টেনিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য পরিসেবা।
- **সামাজিক অবকাঠামো :** সে সমস্ত অবকাঠামো সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী সরকারসমূহ এদেশে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে মনযোগি না হওয়াতে সামগ্রিক অবকাঠামোগত দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দু-একটি দেশ ব্যাতিত অন্যান্য প্রায় সকল দেশের তুলনায় অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। Global Competitiveness Index 2019 অনুযায়ী সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের দিকথেকে বিশ্বে ১৪১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৫ তম। এ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে সিঙ্গাপুর ১ম স্থানে, জাপান ৬ষ্ঠ, দ. কোরিয়া ১৩, মালয়েশিয়া ২৭, চীন ২৮, থাইল্যান্ড ৪০, ইন্দোনেশিয়া ৫০, ফিলিপাইন ৬৪, ভিয়েতনাম ৬৭, ভারত ৬৮, শ্রীলংকা ৮৪ এবং পাকিস্তান ১১০ তম অবস্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.১১(১)] ।

স্মারণী-৫.১১(১) : Global Competitiveness Index 2019 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

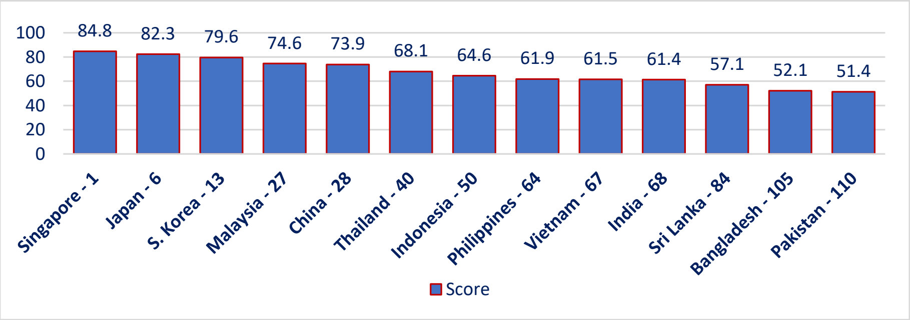

Source: Global Competitiveness Index 2019

অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি :

১) অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি :

২০১৬-১৭ অর্থবছর নাগাদ দেশে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৬.০০ বিলিয়ন, ২০১১-১২ অর্থবছর নাগাদ যা ছিল ইউ.এস.ডলার ২.০০ বিলিয়ন (দি ইনডিপেন্ডেন্ট, ২৬ শে মার্চ, ২০১৯)। এ পাঁচ বছর সময়কালে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ইউ.এস.ডলার ৪.০০ বিলিয়ন, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৮০ বিলিয়ন। ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ দেশে সামগ্রিক ফিজিক্যাল অবকাঠামোর চিত্র নিম্নের চকে তুলেধরা হলো :-

Overall Infrastructure of the Country Upto Financial Year : 2017-18	
International Airport	03 Nos.
Domestic Airport	7 Nos.
Road	3.33 Lakh KM
Rail Road	2,956 KM
Land Port	23 Nos.
Sea Port	1 No.
River Port	2 Nos
Power Production Capacity	11,623 MW /Day
Gas Production Capacity	969 BCF

Source : MOF

সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান :

২) সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান :

অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্নক্ষেত্রে, যেমন- সড়ক পথ, রেল যোগাযোগ, স্থলবন্দর, বিমান বন্দর ও সমূদ্রবন্দর ইত্যাদিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। Global Competitiveness Report, 2018 অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্নক্ষেত্রে ১৪০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯ তম। ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে দ. কোরিয়ার অবস্থান ৬, চীন ২৯, থাইল্যান্ড ৬০, ভারত ৬৩, শ্রীলংকা ৬৫, ইন্দোনেশিয়া ৭১, ভিয়েতনাম ৭৫ এবং পাকিস্তান ৯৩ তম স্থানে রয়েছে।

স্মারণী-৫.১১(২) : অবকাঠামো উন্নয়ন র‌্যাংকিং ২০১৮ অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্নক্ষেত্রে ১৪০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

Country	Infrastructure Ranking	Scores in Various Indexes				
		Overall Infrastructure	Roads	Railroads	Port	Air
South Korea	**6**	91.3	78.8	81.4	72.8	80.6
China	**29**	78.1	59.7	59.0	58.6	60.7
Thailand	**60**	69.7	55.9	27.4	51.5	66.8
India	**63**	68.7	57.4	57.9	60.4	64.1
Sri Lanka	**65**	68.6	46.7	38.6	51.1	57.3
Indonesia	**71**	66.8	48.1	61.4	54.1	66.7
Vietnam	**75**	65.4	36.0	39.2	46.4	47.4
Pakistan	**93**	59.0	49.1	46.4	51.3	52.3
Bangladesh	**109**	53.4	35.2	40.9	40.9	45.5

Source : Global Competitiveness Report, 2018
Note : 1. Upper Ranking indicates lower position
2. Highest Scores is 100 for all Index.

SJHBD

৩) ২০১৮ সাল নাগাদ দেশে দৃশ্যমান অবকাঠামোর সংক্ষিপ্তসার :

২০১৮ সাল নাগাদ দেশে দৃশ্যমান অবকাঠামোর সংক্ষিপ্তসার :

- **বিমান বন্দর :** তিনটি আন্তর্জাতিক ও সাতটি আভ্যন্তরীণ।
- **সড়কপথ :** সর্বমোট ৩.৩৩ লক্ষ কিলো মিটার, তন্মধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩.৫ হাজার কিলোমিটার, অবশিষ্টাংশ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের রাস্তা ঘাট।
- **রেলপথ :** ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ দেশে সর্বমোট ২,৯৫৬ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে, যা শুধুমাত্র দেশের প্রধান প্রধান শহর ও নদী বন্দর সমূহের সাথে সংযুক্ত, দেশের বেশিরভাগ শহর রেল যোগাযোগের সাথে সংযুক্ত নয়।
- **স্থল বন্দর :** বাংলাদেশে বিভিন্ন সীমান্তে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৩ টি স্থল বন্দর রয়েছে, যে সমস্ত বন্দর দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রতিনিয়ত আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। এ সমস্ত স্থল বন্দর এবং বন্দরের সাথে সম্পৃক্ত রাস্তাঘাট বহু পুরানো ও জরাজীর্ণ।
- **সমুদ্র বন্দর :** ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা ২ টি, চট্রগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর, তাছাড়া বর্তমানে পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণাধীন রয়েছে। তবে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়েই দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। World Port Ranking 2015 অনুযায়ী বিশ্বের ১০০ টি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান কার্গো ভলিয়মের ভিত্তিতে ৭৫তম এবং কন্টেইনার ট্রাফিক এর ভিত্তিতে ৬৫তম অবস্থানে রয়েছে।এ র‌্যাংকিংয়ে উভয় দিক থেকে প্রথমস্থানে রয়েছে সাংহাই পোর্ট, চায়না এবং দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর।
- **বিদ্যুৎ :** অক্টোবর, ২০২০ সাল নাগাদ দেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কয়লাভিত্তিক - ৩টি, গ্যাসভিত্তিক - ৬৪টি, তরল জ্বালানী ভিত্তিক - ৬৬টি, হাইড্রো পাওয়ার - ১টি এবং সোলার ভিত্তিক - ৪টি সহ মোট ১৩৮টি, যেগুলোর স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০,৮১৩ মেগাওয়াটের বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ১২,৮৯৬ মেগাওয়াট [স্মারণী : ৫-১১(৩)]।

স্মারণী-৫.১১(৩) : গ্লোবাল পোর্ট র‌্যাংকিং ২০১৫ এ অগ্রভাগে থাকা দক্ষিণ এশিয়ার বন্দর সমূহের অবস্থান:-

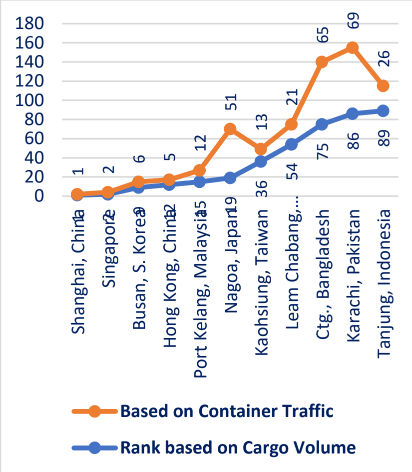

Source : World Shipping Council

স্মারণী-৫.১১(৩): ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত BPDB আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের তথ্য:

Fuel Type	No. of Plants	Installed capacity (MW)	%
Coal	3	524	2.5
Gas	64	11,502	55.
HFO	56	5,507	26.
HSD	10	1,855	8.9
Imported	-	1,160	5.5
Hydro	1	230	1.1
Solar	4	35	0.1
Total :	138	20,813	10

Source: BPDB and Powercell Note: Excluding Captive Power & Renewable Energy.

SJIBD

- **প্রাকৃতিক গ্যাস :** জুন ২০১৯ নাগাদ দেশে সর্বমোট আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি (Onshore-25+Off-shore-2) , তন্মধ্যে জুন, ২০১৯ নাগাদ ২০টি গ্যাসক্ষেত্র উৎপাদনের আওতায় এসেছে। আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র সমূহের উত্তোলনযোগ্য মজুদ ছিল শুরুতে ২৮.৬৯ টি.সি. এফ, গত ১৮ বছর যাবৎ উত্তোলনের পর জুন, ২০১৯ নাগাদ মজুদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সরকারি হিসাবে ১১.৭৬ টি.সি. এফ [স্মারণী : ৫-১১(৪)]।

স্মারণী-৫.১১(৪): জুন, ২০১৯ নাগাদ দেশের গ্যাস সেক্টরের সংক্ষিপ্তসার :-

Particulars	Total
Nos of Gas Fields	27
Gas fields under production	20
No. of Wells producing gas	112
Gas production capacity	2,750 MMcfd
Average Gas production	1,744 – 2,750 MI
Annual Production by NOC	385.34 Bcf (40%
Annual Production by IOC	575.43 Bcf (60%
Recoverable reserve at the time of invention	28.69 Tcf
Cumulative production till June, 2019	16.93 Tcf
Recoverable Reserve as of June, 2019	11.76 Tcf

Source: Energy and Mineral Resources Division report.

- **আই.সি.টি অবকাঠামো :**

২০১৯ সাল নাগাদ দেশে আই.সি.টি অবকাঠামো উন্নয়নের সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

ক) **হাই-টেক পার্ক :** ২০১৯ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক, কালিয়াকৈর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে আরোও অন্তত ১২টি আইটি/ হাই-টেক পাক নির্মাণাধীন রয়েছে।

খ) **সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক :** জনতা টাওয়ার সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা এবং শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, রাজশাহী।

গ) **আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার :** শেখ কামাল আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, নাটোর, আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, রাজশাহী এবং আই.টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, খুলনা।

ঘ) Tier-IV ডাটা সেন্টার, কালিয়াকৈর।

ঙ) ইলেক্ট্রনিক্স সিটি, সিলেট (নির্মাণাধীন)।

খ) অবকাঠামো উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য কেন অপরিহার্য ?

অবকাঠামো কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বা ইঞ্জিন, উৎপাদন, বণ্টন ও দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে যা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। উন্নত দেশসমূহে তাই অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশকে স্থায়ী মূলধনে সমৃদ্ধশালী করে তোলার প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্যনীয়। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, যা ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে। বৃহৎ এ স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বসমূহের মধ্যে রয়েছে :-

SJFBD

অবকাঠামো উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য কেন অপরিহার্য ?

১. অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য।
২. ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে SDG-9 (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) অর্জন বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক।
৩. বিগত সময়গুলোতে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ কম হওয়াতে অবকাঠামোগত দিকথেকে বিশ্বে বাংলাদেশ অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এ শূণ্যতা পূরণ করা অত্যন্ত জরুরি।
৪. অবকাঠামো যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিমাপের অন্যতম মাপকাঠি। অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাই দেশের স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধিকরা গুরুত্বপূর্ণ।
৫. উৎপাদন, বণ্টন ও দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবকাঠামো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে তাই অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি।

এক কথায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো অঙ্গাংগিভাবে জড়িত। এ কারণে অবকাঠামো উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে তাই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য অবধারিত হয়ে উঠেছে।

গ) অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

বর্তমান সরকার অবকাঠামো উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পরিচালিকা শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ও পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এস.ডি.জি অর্থায়ন কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে এগুচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) মোতাবেক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশে জি.ডি.পি অনুপাতে বার্ষিক ৫% এর বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি (এডিপি) পেয়েছে গড়ে প্রায় ১৯.০০%। এ সময়কালে অবকাঠামো উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় গড়ে টাকা ১,২১২.৬৭ বিলিয়ন , জি.ডি.পি অনুপাতে যা ৫.৩% [স্মারণী-৫.১১(৬)] ।

সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে ইতিমধ্যে মাঝারি আকারের বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, বিভিন্ন সেক্টরে ১০টির বেশি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং আরোও মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য চীন ও অন্যান্য দাতা দেশসমূহের সাথে আলাপ আলোচনা চলছে।

স্মারণী-৫.১১(৬) : অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় এবং প্রবৃদ্ধির চিত্রঃ-

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Average in 5 years.
ADP Exp. (TK. In Billion)	712	871	1071	1482	1583	1557	1,212.67
As % of GDP	5.0	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.3
Growth %	25.13	22.33	22.96	38.38	6.82	-1.64	19.00%
a) Average ADP Exp. during last 6 years TK. 1,212.67 Billion b) Average ADP Exp. as % of GDP – 5.3% c) Average growth during this period – 18.99%							

Source: BD Economic Review

অবকাঠামো উন্নয়নে চলমান মেগাপ্রজেক্ট সমূহ :

১) অবকাঠামো উন্নয়নে চলমান মেগাপ্রজেক্ট সমূহ :

বর্তমান সরকার দেশে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) অনুযায়ী এ সময়কালে অবকাঠামো উন্নয়নে বার্ষিক ব্যয় ধরা হয়েছে জি.ডি.পি অনুপাতে প্রায় ৪.২%। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের পর থেকে দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং বিভিন্ন সেক্টরে অবকাঠামো উন্নয়নে আরোও মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে । এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১৬ সালের পর থেকে বাংলাদেশে স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে জাতিয় বাজেটের প্রায় ৩০% এর বেশি।

দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে ইতিমধ্যে যে সমস্ত প্রজেক্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন সেক্টরে যে সমস্ত মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সমস্ত প্রজেক্ট সম্পন্ন হলে দেশের জি.ডি.পি অন্তত ২%-৩% বৃদ্ধি পাবে।

স্মারণী-৫.১১(৭) : ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নে চলমান মেগা প্রজেক্ট সমূহ :-

SL	Name of the Project	Estimated Cost	Sector	Timeline of completion
1	Rooppur Newclear Power Plant (2400 MW)	USD 12.65 Billion	Power Sector	By 2025
2	Rampal Coal Power Plant	USD 5.00 Billion	Power Sector	By 2021
3	Matarbari Power Plant	USD 4.40 Billion	Power Sector	By 2024
4	Padma Multipurpose Bridge	USD 3.65 Billion	Communication	By 2025
5	Padma Rail Link	USD 4.63 Billion	Communication	By 2024
6	Karnafully Underwater Tannel	USD 2.49 Billion	Communication	By 2022
7	Ctg.-Cox's Bazar Railway Link	USD 2.13 Billion	Communication	By 2022
8	Dhaka Elevated Express Way	USD 1.63 Billion	Communication	By 2022
9	Dhaka – Ctg. Express Railway	USD 11.40 Billion	Communication	By 2022
10	Dhaka Metro Rail Project	USD 2.82 Billion	Communication	By 2021
11	Moheskhali LNG Terminal	USD 179.5 Million	Power Sector	By 2019
12	Payra Deep Sea Port	USD 98.5 Million	Communication	By 2021
13	Hazrat Shahjalal Int'L Airport (Ext.)	USD 42.10 Million	Communication	By 2022

Source: Databd.co

ঘ) বাস্তবায়নাধীন ১০ মেগা প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার :

১) রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প :

রুপপুর ২৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরে একটি অনন্য সংযোজন, যা হবে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পারমাণবিক জগতে প্রবেশ।

বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চিন্তার শুরু ১৯৬১ সালে তৎকালিন পূর্বপাকিস্তানের সময়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর চীন ও রাশিয়ার সাথে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলে আসছে। অবশেষে রাশিয়া ২০০৯ সালে বাংলাদেশে পুর্নাঙ্গ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব দেয়, যাতে বাংলাদেশ সন্মতি প্রদান করে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যাপারে মে, ২০১০ সালে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ সরকারের পুর্ণাঙ্গ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যে চুক্তির আওতায় পাবনা জেলায়, ঈশ্বরদী উপজেলার রুপপুর ইউনিয়নে ১২.৬৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে দেশের অন্যতম আকর্ষণ ”রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প”।

রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প :

রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার :-

Reactor	Model	Gross MWe	Cons. started	Completion
Rooppur-1	VVER-1200/V-523	1200	Nov., 2017	2023
Rooppur-2	VVER-1200/V-523	1200	July, 2018	2024

Source: World Nuclear Organization

Rooppur Nuclear Power Plant

বাংলাদেশের সম্প্রসারনশীল অর্থনীতিতে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নত দেশগুলোতে বহু আগে থেকেই পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মিটাতে রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বড় আকারের ভূমিকা পালন করবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প :

২) রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প :

Rampal Coal Power Plant

খুলনার বগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় ১৮৩৪ একর জায়গায় প্রায় ৫.০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে "রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প"। এ প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াট, যা ২০২১ সাল নাগাদ সমাপ্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বৃহৎ এ প্রকল্পটি নির্মাণ করছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (BIFPCL), যা National Thermal Power Corporation of India এবং Bangladesh Power Development Board এর মধ্যে গঠিত (৫০ : ৫০) জয়েন্টভেঞ্চার।

মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প :

৩) মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প :

কক্সবাজার জেলায় মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি এরিয়ায় ১২০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৫০০ একর জায়গাজুড়ে স্থাপিত হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে এ প্রকল্পের প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়, যা আগষ্ট ০২, ২০১৪ সালে একনেক সভায় পাশ হয়। এ প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫,৯৮৪ কোটি টাকা (৪.৪০ বিলিয়ন ডলার), যারমধ্যে JICA কতৃক অর্থায়ন ২৮,৯৩৯ কোটি টাকা। Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) এর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত এ মেগা প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সাল নাগাদ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

Matarbari Coal Power Plant

পদ্মা বহুমূখী সেতু :

৪) পদ্মা বহুমূখী সেতু :

Padma Multi Purpose Bridge

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা বহুমূখী সেতু বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিরাট মাইল ফলক। আনুমানিক ৩.৬৫ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলারে নির্মিত এ সেতু নির্মাণের ফলে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বেশিরভাগ অংশ রাজধানীর সাথে সরাসরি যুক্ত হবে, যা ঐ সমস্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা তাদের জীবন মান উন্নয়নে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে এবং বৃদ্ধি পাবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতি প্রবাহ। পদ্মা, ব্রম্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বেসিনে অবস্থিত ৬,১৫০ মিটার দৈর্ঘ ও ১৮ মিটার প্রস্থ সম্পন্ন এ সেতু জুন ২৫, ২০২২ তারিখে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

SJFBD

পদ্মা সেতু রেল লিংক :

৫) পদ্মা সেতু রেল লিংক :

পদ্মা বহুমূখী সেতুর উপরের ডেকে চার লেন বিশিষ্ট সড়ক পথ এবং নিচের ডেকে সিঙ্গেল ব্রড়গেজ রেল লাইন অবস্থিত, যার ফলে চারটি রুটে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ১৬৯ কি.মি এলাকা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে এবং রাজধানীর সাথে যশোহরের সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। চীনের অর্থায়নে নির্মিত দেশের বৃহত্তম এ রেল লিংক নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪.৬৩ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার, যা ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে শেষ করার পরিকল্পণা রয়েছে।

পদ্মা রেল লিংক স্থাপিত হওয়ার ফলে রাজধানীর সাথে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিতের পাশাপাশি এ অঞ্চলের পণ্য বাজারজাত করন অনেক সহজতর হবে। ফলে এ অঞ্চলের কৃষকেরা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাওয়ার পাশাপাশি এ অঞ্চলে ব্যবসা বানিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে।

Padma Bridge Rail Link

কর্ণফুলি আন্ডার ওয়াটার ট্যানেল :

৬) কর্ণফুলি আন্ডার ওয়াটার ট্যানেল :

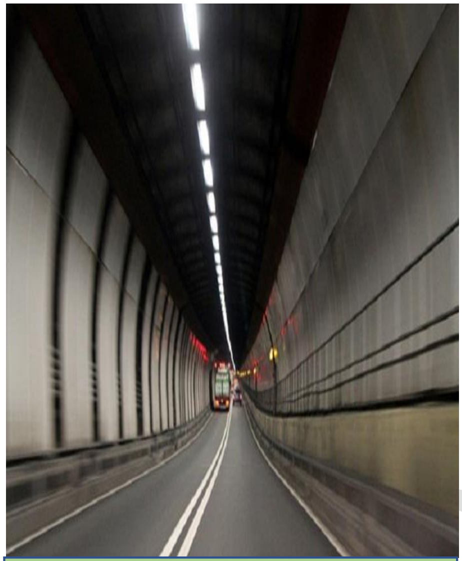

Karnafuly Under Water Tannel

চট্রগাম শহরের কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত আনুমানিক ৯.১ কিলোমিটার দৈর্ঘের কর্ণফুলি ট্যানেলের ভিত্তিপ্রস্তর ২০১৬ সালে স্থাপিত হয়, যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে আনুমানিক ২.৪৯ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ট্যানেলের খনন কার্য উদ্ভোধন করেন, যা ২০২২ সাল নাগাদ সমাপ্ত করার পরিকল্পণা রয়েছে।

এ ট্যানেল নির্মাণের ফলে চট্রগ্রামের সাথে বান্দ্রবান, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধিত হবে এবং এ সমস্ত অঞ্চলের অর্থনীতিতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে। বলা বাহুল্য, কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলি ট্যানেল দেশের প্রথম আন্ডারওয়াটার ট্যানেল, যা দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে আরেকটি বড় ধরনের মাইলফলক।

SJFBD

চট্রগ্রাম কক্সবাজার রেল লিংক :

৭) চট্রগ্রাম কক্সবাজার রেল লিংক প্রজেক্ট :

চট্রগ্রাম শহরের সাথে পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার এবং দক্ষিণ চট্রগ্রামের চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, লৌহাগড়া, রামু ও উখিয়ার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ১০৩.৪৭৭ কিলোমিটার (সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ রেলওয়ে ট্রেক) দীর্ঘ **"চট্রগ্রাম্‌ কক্সবাজার রেল লাইন"** স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যা ২০২৩ সাল নাগাদ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। যোগাযোগ ও পরিবহন সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নে স্থাপিত এ প্রকল্প চট্রগ্রাম ও এর আশপাশের অঞ্চল সমূহের ব্যবসা বানিজ্য, বিনিয়োগ ও পর্যটন উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। মেগা এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২.১৩ বিলিয়ন ডলার, যারমধ্যে ১.৬১৮ বিলিয়ন ডলার যোগান দিবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং অবশিষ্ট ৫১২ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়ন। দুই ধাপে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরিকল্পণা রয়েছে :-

প্রথম ধাপে : দোহাজারি থেকে শুরু হয়ে চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, লৌহাগড়া, রামু, উখিয়া ও কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন।

দ্বিতীয় ধাপে : কক্সবাজার থেকে মিয়ানমার বর্ডার পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন ।

Ctg. - Cox's Bazar Rail Link Project

Project Summary :-

1 New Construction of 103.477 km Single Lin Dual Gauge Railway Track (Dohazari to Cox' Bazar);
2 Construction of 09 Railway Station, namel Dohazari, Satkania, Lohagara, Harbang Chakaria, Dulahazra, Islamabad, Ramu an Cox's Bazar
3 Construction of 4 Large bridges (over 100 m) 39 Major bridges (50 m to 100 m) and 14 culverts;
4 Construction of Elephant Crossing (underpas and overpass)
5 Construction of Modern Computer Based Inte Locking (CBI) signaling system
6 Construction of an ICONIC station building a Coax's Bazar.

Source: Ministry of Railway Report

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে :

৮) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে :

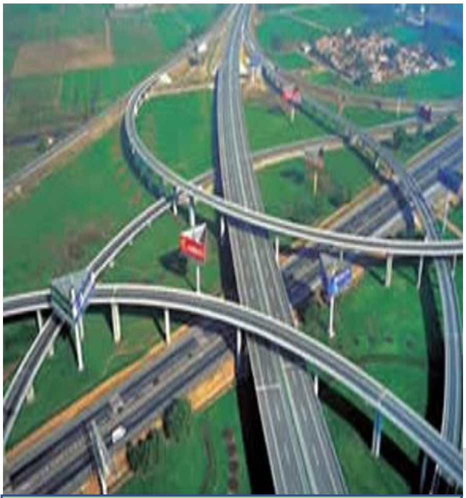

Dhaka Elevated Expressway

ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট নিরসনে হযরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাজধানীর কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ ও যাত্রাবাড়ী হয়ে কুতুবখালি (ঢাকা-চট্রগ্রাম হাইওয়ে সংযোগ) পর্যন্ত আনুমামনিক ২৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্রীজ অথরিটি এবং ইটালিয়ান -থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড এর মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভিত্তিতে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১.৬৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মাণাধীন মেগা এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১১ সালে, যা ২০২১ সাল নাগাদ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যদিও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হওয়ার বিষয়ে এখনো কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে।

"ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে" প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দ্রুত যানবাহন চলাচলে বাইপাস সুবিধা বৃদ্ধিপাবে, যা ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ অংশের যানজট নিরশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার পাশাপাশি ঢাকার এ অংশকে উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত করবে।

ঢাকা - চট্রগ্রাম এক্সপ্রেস রেলওয়ে :

৯) ঢাকা - চট্রগ্রাম এক্সপ্রেস রেলওয়ে :

ঢাকা - চট্রগ্রাম যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যাতায়াতের সময় কমিয়ে আনতে "ঢাকা - চট্রগ্রাম ভায়া কুমিল্লা / লাকসাম হাইস্পীড রেললাইন" প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যা মার্চ ১৮, ২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কতৃক অনুমোদিত হয়। আনুমানিক ২৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি এরিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২০ সালে এ প্রকল্পের DPP (Development Project Plan) একনেক সভায় অনুমোদন পায়। যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে মেগা এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৭,০০০ কোটি টাকা (১১.৪০ বিলিয়ন ডলার)।

দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইলেট্রিক হাইস্পীড ট্রেন চালু হলে মাত্র ৭৩ মিনিটে ঢাকা থেকে চট্রগ্রাম যাতায়াত সম্ভব হবে, যার ফলে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় শুধু বৈপ্লবিক পরিবর্তনই সাধিত হবেনা, এ প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জগতে প্রবেশ করবে, যা দেশের ব্যবসা, বানিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে নিঃসন্দেহে।

Dhaka – Ctg. Express Railway

SIFBD

ঢাকা মেট্রো রেল :

১০) ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্প :

Dhaka Metro Rail

সর্বমোট ৫টি রুটের সমন্বয়ে (MRT Line 1,2,4,5 and 6) ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প প্রস্তাবিত হলেও, ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট সার্ভে (DHUTS 1) ঢাকার STP (Strategic Transport Plan) মূল্যায়ন করেন এবং প্রথম ধাপে MRT Line - 6 উত্তরা - মতিঝিল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন, যার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ইউ.এস.ডলার ২.৮২ বিলিয়ন। বর্তমানে MRT Line – 6 এর বাস্তবায়ন কাজ চলছে , যা ২০২২ সালের শেষ নাগাদ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পণা রয়েছে। এ লাইনে দু-দিকথেকে ২৪টি ট্রেন চলাচল করবে, যাতে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী যাতায়াতের সুযোগ থাকবে বলে জানা গেছে।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা মেট্রো রেল নিঃসন্দেহে একটি অনন্য সংযোজন, যোগাযোগ অবকাঠামোর দিকথেকে যা বাংলাদেশকে আধুনিক বিশ্বের কাতারে সামিল করার পাশাপাশি বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ শহরে যানজট নিরষনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে।

ঙ) টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে SDG-9 অর্জনে অগ্রগতি :

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে SDG 9: “ Resilient Infrastructure, Sustainable Industrialization and Innovation” অর্জন বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য।

Resilient Infrastructure : Infrastructures are primarily classified into two broad heads namely, hard infrastructures like roads, airports, sea ports or river ports, railroads etc. and soft infrastructures like education system, healthcare system, law and order situation, financial system, form of government, financial service and government responses to the civil emergency etc. of a country

SDG টার্গেট মাথায় রেখে অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছেন। ২০১৬ সালের পরথেকে দেশে স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে বাজেটের প্রায় ৩০% এর অধিক হারে। বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগখাতে অন্তত ১০ টি মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং এ সমস্ত মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৪০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে SDG-9 অর্জনে অগ্রগতি :

বাংলাদেশের সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশসমূহের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে SDG 9 অর্জনে বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়নে জি.ডি.পি অনুপাতে নির্ধারিত পর্যায়ে ব্যয় বৃদ্ধিকরা প্রয়োজন। Global Infrastructure Outlook 2017 অনুযায়ী ২০১৬-২০৩০ সময়কালে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন গ্যাপ ১৯২ বিলিয়ন ডলার, যা পূরণ করতে ২০১৬-২০৩০ সময়কালে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশে জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন- বিদ্যুৎ খাতে ২.০%, স্থলপথ ১.১%, টেলিকম ০.৮%, পানি ০.৬%, রেলপথ ০.২% এবং বিমান বন্দর উন্নয়নে ০.১% [স্মারণী-৫.১১(৮)] ।

স্মারণী-৫.১১(৮) : SDG 9 অর্জনে ২০১৬-২০৩০ সময়কালে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে জি.ডি.পি অনুপাতে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন :-

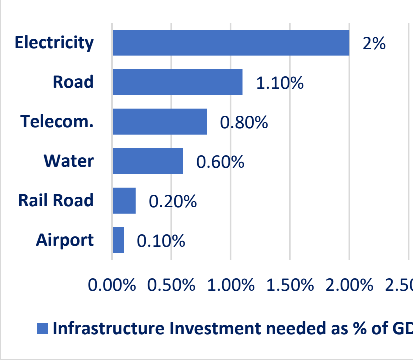

Global Infrastructure Outlook 2017

স্মারণী-৫.১১(৯) : অর্থবছর ২০১৭-১৮ নাগাদ SDG 9 অর্জনে বাংলাদেশের সর্বশেষ অগ্রগতির ছিত্র :-

Indicator	Particulars	Periods					
		2000	2005	2010	2015	2016	2017
9.1.1a	Road density per 100 square kilo meter	14.09		14.41	14.48	14.45	14.61
9.2.1	Manufacturing value added as a proportion of GDP (%)	15.76	16.13	17.75	20.16	21.01	21.71
9.2.1	Manufacturing value added per capita (constant 2010 US $)	2380	2635	2774	2607	3877	4210
9.2.2	Manufacturing employment as a proportion of total employment (%)	7.3	11.03	12.46	16.4	14.4	14.4

Indicator	Particulars	Periods					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.5.2	Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitant	5.56	5.66	5.69	5.98	6.16	-
9.a.1	Total official international support (official development assistance plus other official flows) to infrastructure (In Million USD)	813.10	1167.40	1580.20	1247.20	1736.56	-
9.c.1	Proportion of population covered by a mobile network by technology (%)	99	99	99	99.4	99.46	99.49

Source : SDG Profile 2018

চ) ভবিষ্যতে দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো কেমন হওয়া উচিৎ ?

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশসমূহের একটি হিসাবে বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌছানোর লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ এগুচ্ছে, যা সত্যিকার অর্থে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। বৃহৎ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগামী বছরগুলোতে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখা বাংলাদেশের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ সমস্ত বৃহৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির আকার ও আয়তন সম্প্রসারণপূর্বক টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা। অবকাঠামো উন্নয়ন যেহেতু টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসাবে বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত, সেহেতু বাংলাদেশকে টেকসই

ভবিষ্যতে দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো কেমন হওয়া উচিৎ ?

অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিতপূর্বক ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য প্রয়োজন দেশের প্রতিটি সেক্টরের অবকাঠামোগত বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক অবকাঠামো উন্নয়নে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ পরিকল্পণা গ্রহণ এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে অবকাঠামোগত দিকথেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা এবং দেশের স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করা।

আশার কথা হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়নে পিছিয়ে থাকলেও বর্তমান সরকার অবকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত দিয়েছেন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে অনেক বৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, বেশ কয়েকটি প্রকল্প এরিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরো বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়ার চিন্তা চলছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে (অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০) সময়কালে বার্ষিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্ধের প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ২১.০২% [স্মারণী-৫.১১(১০)] .

বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র এডিপি বরাদ্ধের উপর নির্ভরশীল হয়ে এদেশে কাঙ্কিত পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন সম্ভব নয়, তারজন্য প্রয়োজন স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে দেশীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা, কারণ পুরোপুরি বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে কখনো কাঙ্কিত পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রত্যেক সেক্টরে প্রয়োজন অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সঠিক পর্যায়ে যাছাই বাছাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আরেকটি জরুরি বিষয়, কেননা, যে কোনো প্রকল্পের অর্থনৈতিক গ্রহনযোগ্যতা পরিমাপের ক্ষেত্রে ঐ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার মাত্রাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

স্মারণী-৫.১১(১০) : অর্থবছর ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে সেক্টর অনুযায়ী সংশোধিত এডিপি বরাদ্ধের চিত্র :-

SL	Economic Sectors	Financial Year			(TK. In Crore)	
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	Agriculture	4,410.05	5,741.6	5,283.52	6,918.24	6,623.53
2	Rural Dev. & Institutions	9,046.13	10,761.43	16,722.00	15,154.25	15,777.91
3	Water Resources	2,609.49	3,342.11	4,147.31	5,000.87	6,552.79
4	Industries	1,711.35	974.12	1,563.55	2,046.27	3,238.10
5	Power	15,478.21	13,447.57	22,340.32	23,225.36	23,631.78
6	Oil, Gas & Natural Resources	1,068.17	1,067.87	1,346.48	2,209.12	2,417.07
7	Transport	19,212.13	27,360.23	37,513.22	38,099.58	47,431.92
8	Communication	1,434.82	1,915.79	937.44	2,021.01	1,739.64
9	Water Supply & Housing	11,092.38	14,391.17	15,146.83	20,371.84	26,839.25
10	Education & Religion	10,101.74	12,845.97	14,186.56	15,468.65	20,429.10
11	Sports & Culture	261.00	314.19	318.61	653.66	587.93
12	Health & Family Welfare	5,556.47	5,655.33	9,607.51	10,902.07	10,108.40
13	Mass Media	117.98	176.00	219.65	250.39	171.25
14	Social Welfare & Women dev.	424.48	347.19	431.86	649.71	798.06
15	Public Administration	2,327.43	2,344.55	2,118.91	4,964.3	5,137.49
16	Science & Technology	1,808.38	5,472.04	12,593.18	13,353.63	16,790.43
17	Labour & Employment	421.29	450.77	356.25	464.3	544.37
18	Others	3,918.50	4,092.07	3547.80	5,246.75	4,101.56
	Total :	91,000.00	1,10,700.00	1,48,381.00	1,67,000.00	1,92,921.00
	Yearly Growth Rate (%)	21.33	21.65	34.04	12.55	15.52

Source: MOF

ছ) বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

অবকাঠামো উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও অবকাঠামোর দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবকাঠামোখাতে বিনিয়োগের গুরুত্ব

দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ :

অনুধাবনপূর্বক এখাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি না করা, অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের জন্য দাতা দেশসমূহের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা এবং দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে অতীতের সরকার সমূহের স্বদিচ্ছা ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি না থাকার কারণে বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক কারণে এদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন তুলনামূলক কঠিন, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাপেক্ষ, যা এখাতকে আরোও পিছিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নেরক্ষেত্রে প্রধান কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা নিম্নে তুলেধরা হলো :-

১. ভৌগলিকভাবে নিছু প্রকৃতির হওয়াতে জলাবদ্ধতা ও ছোটবড় অসংখ্য নদনদীর কারণে বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল।

২. অর্থনীতির পরিধি সীমিত হওয়ার কারনে অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণ বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ নিশ্চিত করা অনেক কঠিন। ফলে অবকাঠামো উন্নয়নের সিংগভাগই বিদেশি ঋণ নির্ভর।

৩. প্রযুক্তিগত দিকথেকে পিছিয়ে থাকার কারণে অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ পুরোপুরি বিদেশি প্রযুক্তি ও টেকনিশিয়ানদের উপর নির্ভরশীল, যা প্রকল্প ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দেয়।

৪. বেশিরভাগ নদী প্রশস্ত ও খরস্রোতা হওয়ার কারনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যথেষ্ট ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, যা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বিদেশি ঋণ পাওয়া কঠিণ।

৫. প্রতিবছর বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের বেশিরভাগ অবকাঠামো নষ্ট হয়ে যায়, যা মেরামত করা অনেক ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।

৬. প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অযৌক্তিক শর্তের কারণে অনেক বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ সম্ভব হয়না, ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না।

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি নির্দিষ্ট সময় পর ঐ সমস্ত প্রকল্পের মেরামত ও উন্নয়ন আবশ্যক, যা বাংলাদেশে পুরোপুরি ফলোআপ করার প্রবণতা আজো সৃষ্টি হয়নি। ফলে অনেক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের দীর্ঘ সময় পরও মেরামত ও উন্নয়নের অভাবে ক্রমান্বয়ে ব্যবহার অনুপযোগি হয়ে পড়ছে।

৮. আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সময় ও ব্যয় দুটোই বৃদ্ধি পায়, যা ঐ প্রকল্পের উপর বড় আকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৯. ঘুষ ও দুর্নীতির কারণে বেশিরভাগ প্রকল্পে মান সন্মত কাজ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না, ফলে বাস্তবায়নের কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্যা দেখা দেয়।

১০. অবকাঠামো উন্নয়নে আগের সরকার সমূহের স্বদিচ্ছা ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাব।

স্মারণী-৫.১১(১১) : অর্থবছর ১৯৯০-৯১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে সমন্বিত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধের চিত্র :-

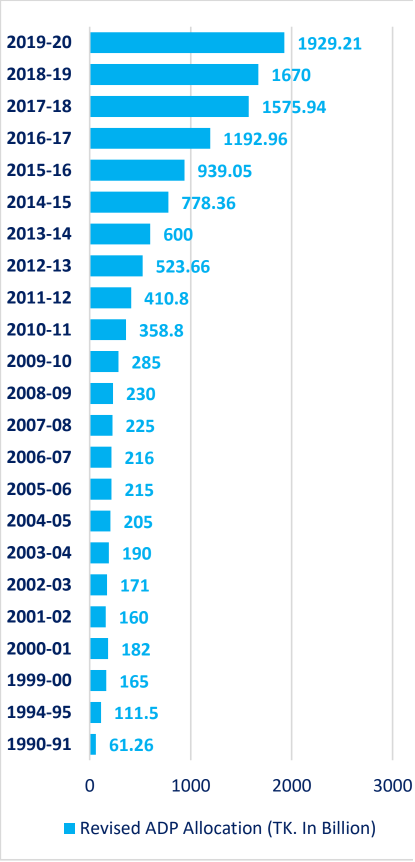

Source: BD Economic Review

SJFBD

জ) যে সমস্ত সেক্টরে অবকাঠামো আরোও ব্যাপক সম্প্রসারন প্রয়োজন :

যে সমস্ত অবকাঠামো আরোও ব্যাপক সম্প্রসারন প্রয়োজন :

অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশসমূহের তুলনায় অদ্যাবধি অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে এটা ধ্রুব সত্য। যদিও ২০১০ পরবর্তী সময়ে বর্তমান সরকারের আমলে দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, বন্দর উন্নয়ন ও টেলিকমিউনিকেশন খাতে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, তথাপি ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পিছিয়ে থাকা সামগ্রিক অবকাঠামোর যুগোপযোগী উন্নয়ন অত্যন্ত অপরিহার্য, কেননা, অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাতিত কাঙ্কিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন অসম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট সকল সেক্টরের উন্নয়ন ঐ সমস্ত সেক্টরের অবকাঠামোগত পর্যাপ্ততার উপর নির্ভরশীল। উদাহরনস্বরুপ, দেশে স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে মানসন্মত হাসপাতাল এবং জনসংখ্যার অনুপাতে হাসপাতাল বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য কর্মীদের মানসন্মত প্রশিক্ষণ এবং ঔষধ শিল্পের প্রসার ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য। অনুরুপভাবে, শিক্ষা সেক্টরের উন্নয়নে দেশে পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নত কারিকুলাম অপরিহার্য, যেগুলো শিক্ষা সেক্টরের অবকাঠামোর অন্তর্গত।

কাজেই, আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের কাঙ্কিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত সকল সেক্টরের টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহায, তবেই কেবল প্রতিটি সেক্টর থেকে কাঙ্কিত পর্যায়ে রিটার্ণ আসবে, যা দেশে টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এক কথায় প্রতিটি সেক্টরের টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাতিত কোনো সেক্টরেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কাঙ্কিত অবদান রাখতে সক্ষম নই, অর্থনৈতিক অগ্রগতিরক্ষেত্রে এটিই চিরাচরিত নিয়ম।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সমস্তক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন আরোও জোরদার করা উচিৎ, নিন্মে তার সংক্ষিপ্তসার তুলেধরা হলো :-

১) **সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন :** উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা দেশে ব্যবসা বানিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। অর্থবছর ২০১৭-১৮ নাগাদ দেশে সর্বমোট ৩.৩৩ লক্ষ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে, যারমধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩.৫ হাজার কিলোমিটার (১.০৫%), অবশিষ্টাংশ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের রাস্তা ঘাট। নিয়মিত সংস্কারের অভাবে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বেশিরভাগ রাস্তাঘাট জরাজীর্ণ। ২০১৭ সাল নাগাদ দেশে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে রোড় ডেনসিটি ১৪.৬১ কিলো মিটার হলেও দেশে হাইওয়ের পরিমাণ মোট সড়কের মাত্র ১.০৫%, বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের জন্য

মানসম্মত যোগাযোগ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে যা খুবই অপ্রতুল। কাজেই, আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে হাইওয়ের পরিধি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহের রাস্তাঘাট নিয়মিত সংস্কারের আওতায় আনা জরুরি।

২) **রেলপথ উন্নয়ন ও রেল নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিকরা :** সড়ক পথের পাশাপাশি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতিতে রেল যোগাযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে দূর দূরান্ত থেকে কম খরচে পণ্য পরিবহনে রেলপথের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ফলে বেশিরভাগ দেশে গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর সমূহকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ দেশে সর্বমোট ২,৯৫৬ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে, যা শুধুমাত্র দেশের প্রধান প্রধান শহর ও নদী বন্দর সমূহের সাথে সম্পৃক্ত, দেশের বেশিরভাগ শহর রেল যোগাযোহের সাথে সংযুক্ত নয়। শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে পরিবহন খরচ কমাতে দেশের সব জেলা শহর দ্রুত রেল যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসতে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

৩) **বিমান বন্দর সমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরা :** আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিমান বন্দর একমাত্র মাধ্যম। দেশে বর্তমানে তিনটি আন্তর্জাতিক ও সাতটি আভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর রয়েছে। একমাত্র ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়েই সিংহভাগ আন্তর্জাতিক ট্রানজিট সম্পন্ন হয়, ট্রানজিটের দিকথেকে চট্টগ্রাম বিমান বন্দর দ্বিতীয় এবং সিলেট বিমান বন্দর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ভবিষ্যতে দেশব্যাপি শিল্প সেক্টরের সম্প্রসারণের সাথে সাথে ঢাকা ব্যাতিত অন্য দুটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়েও ট্রানজিট বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী এ দুটি বিমান বন্দরের ট্রানজিট ও অন্যান্য সক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাছাড়া, কক্সবাজার কে পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করতে কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিণত করা আবশ্যক, যাতে বিদেশি পর্যটকগণ সরাসরি কক্সবাজারে আসা যাওয়া করতে পারে। এতে পর্যটনখাতে আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

SJFBD

৪) **স্থল বন্দর সমূহের সেবার মান, ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** বাংলাদেশে বিভিন্ন সীমান্তে ছোট বড় প্রায় ২৩টি স্থল বন্দর রয়েছে, যে সমস্ত বন্দর দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রতিনিয়ত আমদানি রপ্তানি কার্য সম্পাদিত হয়, যা দেশের রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। স্থল বন্দর সমূহের অবকাঠামো, ব্যবস্থাপনা এবং এ সমস্ত বন্দরের সাথে সম্পৃক্ত রাস্তাঘাট বহু পুরানো ও জরাজীর্ণ। দেশে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে গুরুত্ব বিবেচনায় স্থলবন্দর সমূহের সার্বিক অবকাঠামো, ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

৫) **সমুদ্র বন্দর সমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা :** আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যে গতিশীলতা আনতে এবং আভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহন স্বাচ্ছন্দ্য করতে নদী ও সমুদ্র বন্দর অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা ২ টি, চট্রগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর, তাছাড়া বর্তমানে পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র চট্রগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি রপ্তানি সম্পন্ন করতে হয়, যেখানে কন্টেইনার ট্রাফিক অন্যতম বড় সমস্যা। World Port Ranking 2015 অনুযায়ী বিশ্বের ১০০ টি ব্যাস্ততম বন্দরের মধ্যে চট্রগ্রাম বন্দরের অবস্থান কার্গো ভলিয়মের ভিত্তিতে ৭৫তম এবং কন্টেইনার ট্রাফিক এর ভিত্তিতে ৬৫তম অবস্থানে রয়েছে। কজেই আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যে গতিশীলতা অনতে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চট্রগ্রাম বন্দরকে পুরোপুরি আধুনিকায়নের মাধ্যমে বন্দরের আওতা, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও পারফরম্যান্স বৃদ্ধির পাশাপাশি মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের আধুনিকায়নপূর্বক এ দুটি বন্দরের কার্যক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা জরুরি।

৬) **বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা :** ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ইনষ্টলড ক্যাপাসিটি ১৮,৯৬১ মেঘাওয়াটের এর বিপরীতে দৈনিক সর্বোচ্চ উৎপাদন ১২,৮৯৩ মেঘাওয়াট। ২০১৮ সাল নাগাদ সারাদেশে ৯০% জনগোষ্ঠি বিদ্যুতায়নের আওতায় এসেছে এবং ঐ সময়ে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬৪ কিলোওয়াট/ঘণ্টায় (সিপিডি ষ্টাডি)। CIA World fact Book এর তথ্যমতে ২০১৭ সাল নাগাদ গড়ে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার (KWH) বাংলাদেশে ৩৫১, পাকিস্তানে ৪৭১, মালয়েশিয়ায় ৪,২৩২, থাইল্যান্ডে ২,৪০৪, ইন্দোনেশিয়ায় ১,০৫৮, দ. কোরিয়ায় ৯,৭২০, জাপানে ৭,৩৭১, ইন্ডিয়ায় ১,১৮১ এবং চীনে ৪,৪৭৫।

বিগত দশকে বিদ্যুৎখাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি যথেষ্ট সাফল্যজনক এবং দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারে সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ সমূহের তুলনায় বাংলাদেশ অদ্যাবধি যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই আগামীতে শিল্পায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির কাঙ্কিত বিকাশের লক্ষ্যে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার আরোও অনেক বৃদ্ধি করতে হবে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

৭) **নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ৯৬৮.৭ বিলিয়ন কিউবিক ফিট। ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং অনুযায়ী গ্যস উত্তোলনে বিশ্বে ২১৫ টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ২৭তম এবং গ্যাস ব্যবহারে ৩২তম স্থানে রয়েছে। গ্যাস উৎপাদনের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের মধ্যে চীনের স্থান ৬ষ্ঠ, ইন্দোনেশিয়া ১২তম, মালয়েশিয়া ১৩তম, পাকিস্তান ২১তম, থাইল্যান্ড ২২তম, ইন্ডিয়া ২৫তম, মিয়ানমার ৩৩তম, ভিয়েতনাম ৪৪তম এবং জাপান ৫৮তম স্থানে রয়েছে। কাজেই ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্পোৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এখাতে বিনিয়োগ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৮) **শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন :** শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে পর্যাপ্ত অবকাঠামো এখনো বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি। ফলে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী এবং আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য, অন্যথায় এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরোও পিছিয়ে পড়বে।

৯) **অন্যান্য সেক্টরে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন, যারমধ্যে রয়েছে :-**

ক) পানি সম্পদ ও নদী শাসন ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন :
খ) মানব সম্পদ উন্নয়নে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ :
গ) শিল্প সেক্টরের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ :
ঘ) আই.সি.টি সেক্টরের দ্রত প্রসার ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ :
ঙ) সমূদ্র অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসারে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ :
চ) উপজেলা পর্যায়ে SME সেক্টরের বিকেন্দ্রিকরনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ :
ছ) রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার সহজিকরনে পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়ন :
জ) প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানসন্মত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্প্রসারণ :
ঝ) সরকারি পরিসেবা সহজীকরন ও ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসারে অবকাঠামোগত উন্নয়ন :
ঞ) দুর্ণীত দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন :
ট) পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা সম্বলিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন :

SJIBD

অধ্যায় : ৫.১২

বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা।

বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা।
- ১) What is Foreign Direct Investment (FDI) ?
- ২) অর্থনৈতিক উন্নয়নে FDI এর গুরুত্ব।
- ৩) খাতওয়ারি দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ।
- ৪) বিদেশি বিনিয়োগের উৎস।
- ৫) বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।

খ) FDI ষ্টক পজিশন।
- ১) সামগ্রিক FDI ষ্টক পজিশন।
- ২) সেক্টর ভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশন।
- ৩) দেশভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশন।
- ৪) FDI ষ্টক পজিশনে বাংলাদেশের অবস্থান।
- ৫) FDI এর আওতায় কর্মসংস্থান।

গ) দেশের সামগ্রিক FDI পরিস্থিতির মূল্যায়ন।

ঘ) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ।

ঙ) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে যা প্রয়োজন।

বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা :

ক) বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা :

শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধন গঠণের মাধ্যমে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিকরাসহ প্রযুক্তি আদান প্রদানের মাধ্যমে বিশেষকরে বাংলাদেশেরমত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে বিদেশি বিনিয়োগ তাই অনন্য ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, ২০১৯ অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টরে গড়ে প্রতিবছর ইউ.এস.ডলার ১২.৫ বিলিয়ন বিনিয়োগ প্রয়োজন, যার একটি বড় অংশ আসবে বিদেশি বিনিয়োগ থেকে।

১) What is Foreign Direct Investment (FDI) ?

According to the International Monetary Fund (IMF), FDI refers to investments made to acquire a lasting interest in enterprises operating outside the economy of the investor (Ridgeway, 2004). The IMF also considers an investment to be classified as FDI if the investor holds a partial ownership share of at least 10% and exercises a significant amount of management control. This is similar to the way in which the Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) defines FDI. According to the OECD (2012), “A foreign direct investment enterprise is an enterprise resident in one economy and in which an investor resident in another economy owns, either directly or indirectly, 10% or more of its voting power if it is incorporated or the equivalent for an unincorporated enterprise” (Researchgate)

দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উন্নয়ন অন্যতম পূর্বশর্ত। কেননা, শিল্প সেক্টরের প্রসার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধিপূর্বক পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনীতির ভীত মজবুত ও টেকসই করে তোলার পাশাপাশি দেশের জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে এবং দেশে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন গঠণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বলা বাহুল্য, শিল্প সেক্টরের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নে প্রয়োজন এখাতে পর্যাপ্ত দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ, আর বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজন উন্নত অবকাঠামো, বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং লাভজনক বিনিয়োগের নিশ্চয়তা। ২০০৫ সালের আগ পর্যন্ত দেশের শিল্পসেক্টরে দেশি ও বিদেশি উভয় প্রকার বিনিয়োগ অনেকটা সীমিত থাকলেও ২০০৫ পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এ চিত্র পাল্টাতে থাকে এবং বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে বাস্তবধর্মী নীতিমালা গ্রহণের ফলে ২০১০ পরবর্তী সময়কালে দেশে বিভিন্ন সেক্টরে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে

SJIFBD

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার .৪৫ বিলিয়ন, World Investment Report 2019 অনুযায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ইউ.এস.ডলার ৩.৬১ বিলিয়ন, এযাবৎকালে যা সর্বোচ্চ।

অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশের শিল্প সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখাযায় ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল গড়ে বার্ষিক ১.০০ বিলিয়ন ডলারের নিচে। ২০১০ সালের পর থেকে দেশের শিল্প সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, ২০১০-১১ অর্থবছরে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ইউ.এস.ডলার ১.২৩ বিলিয়ন, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১.২৬ বিলিয়ন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১.৫৮ বিলিয়ন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২.৬ বিলিয়ন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৫৪ বিলিয়ন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৮৩ বিলিয়ন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.৩৩ বিলিয়ন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৮১ বিলিয়ন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২.৯৪ বিলিয়ন। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ২.০০৩ বিলিয়ন [স্মারণী-৫.১২(১)]।

এ সময়কালে দেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়, যেমন- ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত দেশি বিনিয়োগের পরিমাণ গড়ে ৩.০০ বিলিয়ন ডলারের নিচে থাকলেও ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ চিত্র ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে, ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশি বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়ায় ইউ.এস.ডলার ৬.২৭৭ বিলিয়ন, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭.১৩৭ বিলিয়ন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.০৮১ বিলিয়ন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫.৪৪৬ বিলিয়ন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮.৩০৭ বিলিয়ন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১.৫৬১ বিলিয়ন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৩.০৬২ বিলিয়ন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬.৬৬৩ বিলিয়ন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫.৩৩৪ বিলিয়ন। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশি বিনিয়োগ এসেছে গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ৯.২৪৬ বিলিয়ন [স্মারণী-৫.১২(২)]।

স্মারণী-৫.১২(১) : অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আসার চিত্র :-

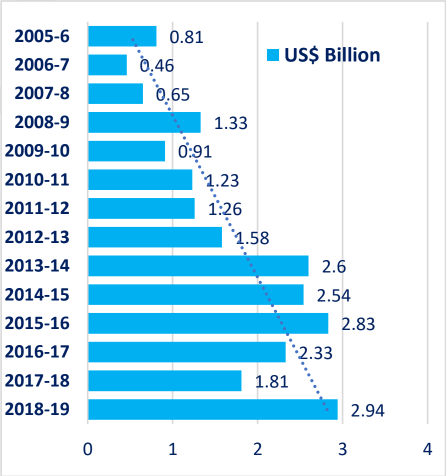

Source: World Bank Data

স্মারণী-৫.১২(২) : ২০১০ থেকে ২০১৯ সময়কালে শিল্প সেক্টরে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের চিত্র :-

Financial Year	Local Investment (US$ Billion)	Foreign Investments		Total Investments (Local + Foreign) (US$ Billion)
		Value (US$ Billion)	As % of GDP	
2005-6	2.730	0.81	1.17	3.54
2006-7	3.130	0.46	0.64	3.59
2007-8	1.294	0.65	0.82	1.94
2008-9	3.118	1.33	1.45	4.45
2009-10	2.588	0.91	0.88	3.49
2010-11	6.277	1.23	1.07	7.51
2011-12	7.137	1.26	0.98	8.40
2012-13	6.081	1.58	1.19	7.66
2013-14	5.446	2.60	1.74	8.05
2014-15	8.307	2.54	1.47	10.85
2015-16	11.561	2.83	1.45	14.39
2016-17	13.062	2.33	1.05	15.39
2017-18	16.663	1.81	0.73	18.47
2018-19	15.334	2.94	1.07	18.27

Source: World Bank and BIDA

অর্থনৈতিক উন্নয়নে FDI এর গুরুত্ব :

২) অর্থনৈতিক উন্নয়নে FDI এর গুরুত্ব :

Modernization Theory states that FDI can positively contribute to economic growth in developing countries. According to Modernization Theory, demand for capital formation in developing nations can be met by FDI through capital investment which can augment economic growth (Firebaugh, 1992). Modernization Theory also suggests that FDI transfers knowledge, technologies, managerial skills, and ideas which can contribute to the economic development of the recipient country (Mengistu & Adams, 2007). This concept is supported by Mello (1999) who concluded that foreign investment is an important element to fill the resource gap in many developing nations. For instant, FDI has enabled economic growth in South and East Asia by increasing capital formation (Fry, 1999).

খাতওয়ারি দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ :

৩) খাতওয়ারি দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগ :

বিগত এক দশকের **খাতভিত্তিক দেশি বিনিয়োগ** বিশ্লেষণে দেখা যায়, এক্ষেত্রে ক্যামিক্যালস্, টেক্সটাইলস, সার্ভিস ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম অগ্রাধিকারপ্রপাপ্ত খাত, এগ্রোবেসড, ফুড এন্ড এলাইড, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন এবং গ্লাস এন্ড সিরামিকস দ্বিতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত এবং লেদার, এন.ই.সি এবং অন্যান্য খাত তৃতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে বিনিয়োগ কারিদের নিকট চিহ্নিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাতওয়ারি বিনিয়োগের দিকথেকে ক্যামিক্যালস সেক্টরে ৩৫.৬৫%, টেক্সটাইলস ২০.০৩%, সার্ভিস ১২.৫৩%, ইঞ্জিনিয়ারিং ১২.০৩%, এগ্রোবেসড ৫.১৫%, ফুড এন্ড এলাইড ৪.৭০%, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন ৩.৯১%, গ্লাস এন্ড সিরামিকস ৩.৪৯%, লেদার ১.৯৫% এবং অন্যান্য খাতে ০.৫৬% বিনিয়োগ হয়েছে [স্মারণী-৫.১২(৩)]।

স্মারণী-৫.১২(৩) : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন সেক্টরে দেশিয় বিনিয়োগের চিত্র:-

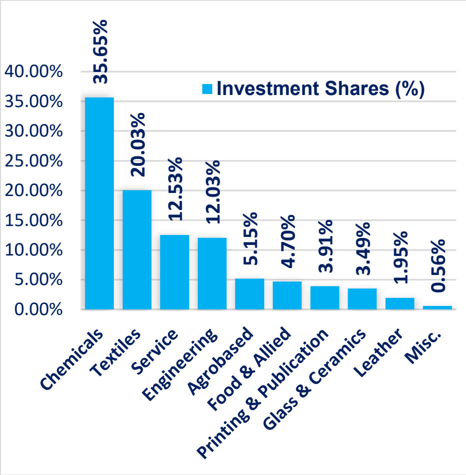

Source: BIDA

২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাতভিত্তিক **বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে** এগ্রোবেসড ২৬.৮৫%, প্রথম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এক্ষেত্রে টেক্সটাইল ৪.১৪% ও ইঞ্জিনিয়ারিং ৪.৭১% দ্বিতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং ক্যামিক্যাল ১.৫০% ও ফুড এন্ড এলাইড ০.৮১%, তৃতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। এক্ষেত্রে বিবিধখাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি ৬১.২০% [স্মারণী-৫.১২(৪)]।

স্মারণী-৫.১২(৪) : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগের চিত্র :-

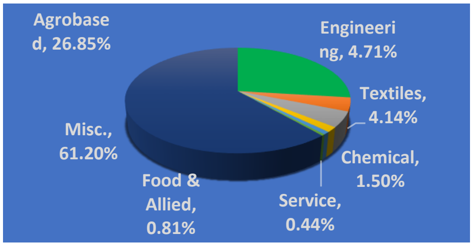

Source: BIDA

৪) বিদেশি বিনিয়োগের উৎস :

বাংলাদেশের শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগকারি দেশের সংখ্যা অদ্যাবধি কম/বেশি

বিদেশি বিনিয়োগের উৎস :

স্মারণী-৫.১২(৫) : ২০১৯ সালে দেশভিত্তিক বিদেশি বিনিয়োগ আসার চিত্র :-

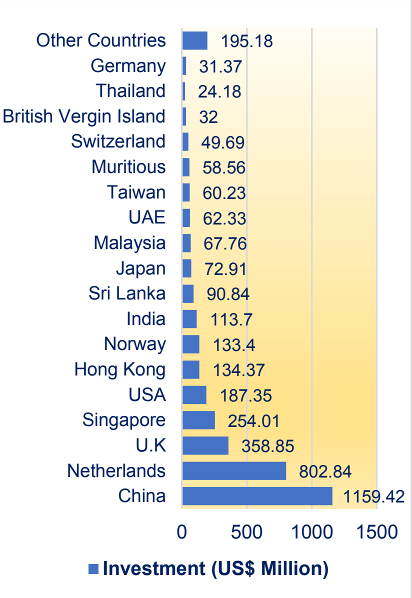

Source: Bangladesh Bank Data

২৫ টির মত, তন্মধ্যে যে ১৭টি দেশ তাদের বিনিয়োগের মাত্রা ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর কিছুকিছু বৃদ্ধিকরে আসছে, সেগুলো হচ্ছে- চীন, নেদারল্যান্ডস, ইউ.কে, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, হংকং, নরওয়ে, ভারত, দ. কোরিয়া, শ্রীলংকা, জাপান, মালয়েশিয়া, ইউ.এ.ই, তাইওয়ান, মরিশাস, সুইজারল্যান্ড এবং বৃটিশ ভারজিন দ্বীপপুঞ্জ অন্যতম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুলনামূলকভাবে বেশি বিনিয়োগকারি দেশসমূহের মধ্যে চীন, নেদারল্যান্ডস, ইউ.কে এবং সিঙ্গাপুর অন্যতম। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে চীনের নীট বিনিয়োগ প্রায় ১,১৫৯.৪২ মিলিয়ন ডলার, নেদারল্যান্ডস ৮০২.৮৪ মিলিয়ন, ইউ.কে ৩৫৮.৮৫ মিলিয়ন এবং সিঙ্গাপুর ২৫৪.০১ মিলিয়ন ডলার স্মারণী-৫.১২(৫)।

স্মারণী-৫.১২(৬) : ২০১০-২০১৯ সময়কালে দেশভিত্তিক নীট বিদেশি বিনিয়োগ আসার চিত্র :-

Country	Periods						
	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019
China	5.70	16.69	49.84	61.40	68.58	1,029.90	1,159.42
Netherlands	40.98	38.52	97.77	88.87	90.04	691.92	802.84
U.K	74.22	104.84	273.55	330.32	313.87	370.58	358.85
Singapore	13.22	77.12	135.17	673.05	701.04	171.06	254.01
USA	45.95	52.83	224.60	217.74	208.71	174.25	187.35
Hong Kong	40.10	48.93	93.40	98.46	111.70	169.78	134.37
Norway	-	-	107.27	160.26	187.41	108.10	133.40
India	10.51	26.00	82.79	79.20	95.41	121.46	113.70
S. Korea	19.42	73.69	131.39	151.33	178.50	72.97	-
Sri Lanka	4.87	20.70	69.33	-	24.85	61.32	90.84
Japan	9.82	79.00	77.74	48.26	44.47	58.40	72.91
Malaysia	-	97.73	40.43	38.62	46.15	92.74	67.76
UAE	17.93	36.41	56.23	-	-	55.50	62.33
Taiwan	3.37	13.34	55.06	45.84	27.28	51.74	60.23
Muritious	-	10.64	-	32.37	53.72	67.54	58.56
Switzerland	-	-	31.17	26.30	21.69	49.31	49.69
Bermuda	-	-	-	-	28.69	37.31	32.00
British Vergin Islands	5.30	33.50	32.92	41.93	41.51	44.17	24.18
Thailand	-	-	31.74	35.17	58.69	-	31.37
Germany	-	10.58	-	21.87	24.84	26.22	-
Other Country	51.13	192.57	243.47	181.73	127.66	159.03	195.18
Total :	**342.52**	**933.09**	**1,833.87**	**2,332.72**	**2,454.81**	**3,613.30**	**3,888.99**

Source: Bangladesh Bank

বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

৫) বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বিগত দশকে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন- ২০১০ সালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ১.২৩ বিলিয়ন, প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে তা কিছু কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৮ সালে দেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ২.৯৪ বিলিয়ন, যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ। বিগত এক দশক (২০১০-২০১৯) সময়কালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ২.০৭ বিলিয়ন, কম্বোডিয়ায় যা ২.২৯ বিলিয়ন, থাইল্যান্ডে ৯.০৫ বিলিয়ন, ভিয়েতনামে ১০.৭৭ বিলিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১০.৭৭ বিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ১০.৯ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ১৯.৩৮ বিলিয়ন, ভারতে ৩৭.১৮ বিলিয়ন এবং সিঙ্গাপুরে ৭২.৭৭ বিলিয়ন ডলার [স্মারণী-৫.১২(৭)]।

স্মারণী-৫.১২(৭) : বিগত ২০১০-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশে গড়ে বিদেশি বিনিয়োগ আসার চিত্র :-

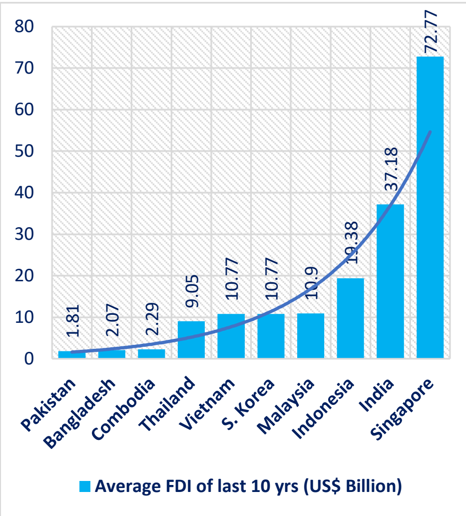

Source: World Bank Data

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অনেক পিছনে অবস্থান করছে।

স্মারণী-৫.১২(৮) : বিগত এক দশকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশে বিদেশি বিনিয়োগের চিত্র :-

(US$ Billion)

Countries	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	10 years Average
Pakistan	2.02	1.33	0.86	1.33	1.89	1.67	2.58	2.50	1.74	2.22	1.81
Bangladesh	1.23	1.27	1.58	2.60	2.54	2.83	2.33	1.81	2.94	1.60	2.07
Combodia	1.40	1.54	1.99	2.07	1.85	1.82	2.48	2.79	3.21	3.71	2.29
Thailand	14.75	2.47	12.90	15.94	4.98	8.93	2.81	8.23	13.21	6.32	9.05
Vietnam	8.00	7.43	8.37	8.90	9.20	11.80	12.60	14.10	15.50	-	10.77
S. Korea	9.50	9.77	9.50	12.77	9.27	4.10	12.10	17.91	12.18	10.57	10.77
Malaysia	10.89	15.12	8.90	11.30	10.62	9.86	13.47	9.37	8.57	-	10.90
Indonesia	15.29	20.57	21.20	23.28	25.12	19.78	4.54	20.51	18.91	24.58	19.38
India	27.40	36.50	24.00	28.15	34.58	44.01	44.46	39.97	42.12	50.61	37.18
Singapore	55.32	49.16	55.31	64.39	68.70	69.78	70.72	97.77	91.04	105.47	72.77

Source: World Bank Data

খ) FDI ষ্টক পজিশন :

FDI ষ্টক পজিশন :

১) সামগ্রিক FDI ষ্টক পজিশন :

বিগত দশকে দেশে সামগ্রিক FDI ষ্টক পজিশন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে সামগ্রিকভাবে FDI ষ্টক ছিল ইউ.এস.ডলার ৫,১৩৯.১৯ মিলিয়ন, ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধিপেয়ে ২০১০ সাল নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে ৫,৯৬৯.৪৬ মিলিয়ন, ২০১১ সালে ৬,২১৯.০৬ মিলিয়ন, ২০১২ সালে ৬,২৫০.৮৬ মিলিয়ন, ২০১৩ সালে ৮,৩৬৩.০৬ মিলিয়ন, ২০১৪ সালে ৯,৩৪০.২৩ মিলিয়ন, ২০১৫ সালে ১২,৫০১.১৩ মিলিয়ন, ২০১৬ সালে ১৩,৪৪৬.১৪ মিলিয়ন, ২০১৭ সালে ১৪,৪৬৬.৫৭ মিলিয়ন, ২০১৮ সালে ১৫,৭৯১.৩৪ মিলিয়ন এবং ২০১৯ সাল নাগাদ দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ১৮,৬৮০.২১ মিলিয়ন। এ সময়কালে FDI ষ্টক প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ১৪.৯৭% [স্মারণী-৫.১২(৯)]।

স্মারণী-৫.১২(৯) : অর্থবছর ২০০৯-২০১৯ সময়কালে বৎসরান্তে সামগ্রিক FDI ষ্টক পজিশন :-

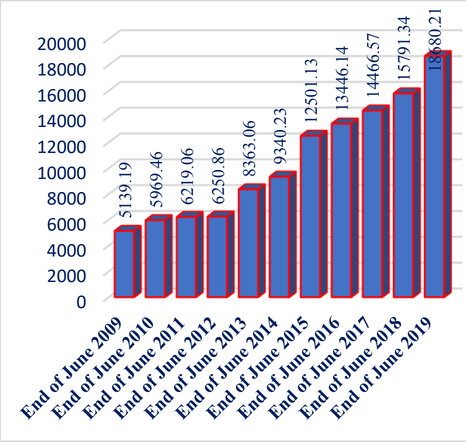

Source: Bangladesh Bank Data

সেক্টর অনুযায়ী FDI ষ্টক পজিশন :

২) সেক্টর ভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশন :

সেক্টরভিত্তিক FDI ষ্টক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ দেশের বিভিন্ন সেক্টরে FDI ষ্টক এর সন্নিলিত পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ১৮,৬৮০.২১ মিলিয়ন, যারমধ্যে গ্যাস এন্ড পেট্রোলিয়াম সেক্টরে সবচেয়ে বেশি ইউ.এস.ডলার ৩,৭২০ মিলিয়ন। তারপরের অবস্থানগুলোতে রয়েছে যথাক্রমে টেক্সটাইল ৩,২৯৯ মিলিয়ন, পাওয়ার ২,৯০৪ মিলিয়ন, ব্যাংকিং ২২৮৪ মিলিয়ন, ফুড এন্ড এলাইড ১,১৮৭ মিলিয়ন, টেলিকমিউনিকেশন ৯১১ মিলিয়ন, ট্রেডিং ৪০৮ মিলিয়ন, লেদার এন্ড লেদার প্রোডাক্টস ৪০০ মিলিয়ন, এগ্রি এন্ড ফিশিং ২৮৫ মিলিয়ন, আই.টি ২৬৭ মিলিয়ন এবং অন্যান্য সেক্টরে ৩,০১৬ মিলিয়ন ডলার [স্মারণী-৫.১২(১০)]।

স্মারণী-৫.১২(১০) : ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ সেক্টরভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশন:-

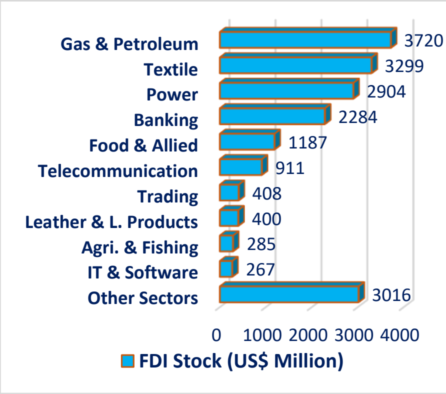

Source: Bangladesh Bank Data

দেশভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশন :

৩) দেশভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশন :

দেশভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশনের ক্ষেত্রে ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশে বিনিয়োগকারি দেশ সমূহের মধ্যে আমেরিকার অবস্থান সবচেয়ে উপরে ইউ.এস.ডলার ৩,৬৮৮ মিলিয়ন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউ. কে ২,২৯৭ মিলিয়ন, তৃতীয় চায়না ২,০০৯ মিলিয়ন, চতুর্থ নেদারল্যান্ডস ১,৪২১ মিলিয়ন, পঞ্চম সিঙ্গাপুর ১,২১৪ মিলিয়ন এবং ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া ১,১০৫ মিলিয়ন ডলার। অন্যান্য বিনিয়োগকারি দেশ সমূহের মধ্যে ২০১৯ সাল নাগাদ FDI ষ্টক পজিশনে হংকং ৯০০ মিলিয়ন, অষ্ট্রেলিয়া ৮৪৬ মিলিয়ন, মালয়েশিয়া ৮২৩ মিলিয়ন, ভারত ৬০৩ মিলিয়ন, জাপান ৩৮৫ মিয়িন, শ্রীলংকা ৩৬০ মিলিয়ন, তাইওয়ান ৩৪৪ মিলিয়ন, বৃটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ ৩১৪ মিলিয়ন, থাইল্যান্ড ২৮২ মিলিয়ন, সৌদি আরব ২৬০ মিলিয়ন, মারিসাস ২৪৪ মিলিয়ন, পাকিস্তান ২১৪ মিলিয়ন, নরওয়ে ২১৩ মিলিয়ন, ইউ.এ.ই ২০৪ মিলিয়ন এবং অন্যান্য দেশ ৯৫৬ মিলিয়ন ডলার [স্মারণী-৫.১২(১১)]।

স্মারণী-৫.১২(১১) : ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ দেশভিত্তিক FDI ষ্টক পজিশন :-

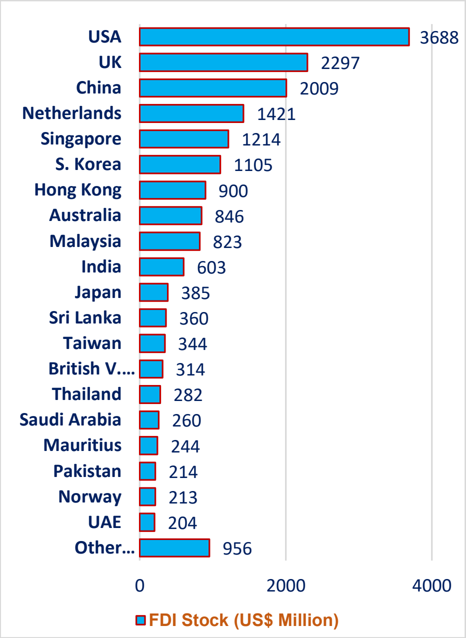

Source: Bangladesh Bank Data

FDI ষ্টক পজিশনে বাংলাদেশের অবস্থান :

৪) FDI ষ্টক পজিশনে বাংলাদেশের অবস্থান :

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় একদমই পিছনে পড়ে রয়েছে। CIA World Factbook তথ্যের ভিত্তিতে উইকিপিডিয়া প্রকাশিত FDI Ranking 2017 অনুযায়ী ১২৮ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮৯ তম, যেখানে কম্বোড়িয়া ৬৯, পাকিস্তান ৫৯, ফিলিপাইন ৫০, তাইওয়ান ৪৬, মালয়েশিয়া ৪০, দ. কোরিয়া ২৯, থাইল্যান্ড ২৮, ইন্দোনেশিয়া ২৪, জাপান ২২, ভিয়েতনাম ২০, ভারত ১৯ এবং চীন ৪র্থ স্থানে রয়েছে। ঐ সময়কালে FDI ষ্টক বাংলাদেশে ইউ.এস.ডলার ১৪.৬২ বিলিয়ন, কম্বোড়িয়ায় ২৯.১৭ বিলিয়ন, পাকিস্তানে ৪১.৫৬ বিলিয়ন, ফিলিপাইনে ৭৮.৭৯ বিলিয়ন, তাইওয়ানে ৮৫.৫৮ বিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ১৩৩.২০ বিলিয়ন, দ. কোরিয়ায় ১৯৩ বিলিয়ন, থাইল্যান্ডে ২০৫.৫০ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ২৪৭.৭০ বিলিয়ন, জাপানে ২৬৮.৪০ বিলিয়ন, ভিয়েতনামে ৩১৮.৭০ বিলিয়ন, ভারতে ৩৬৭.৫০ বিলিয়ন এবং চীনে ১,৫১৪ বিলিয়ন ডলার [স্মারণী-৫.১২(১২)]।

স্মারণী-৫.১২(১২) : ২০১৭ সালের ড়িসেম্বর নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের FDI Stock Position :-

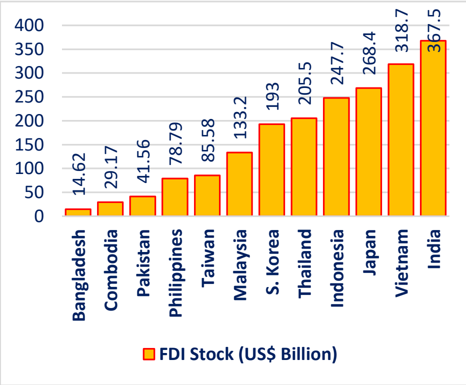

Source : FDI Ranking 2017

FDI এর আওতায় কর্মসংস্থান :

স্মারণী-৫.১২(১৩) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে FDI আওতাভুক্ত প্রজেক্ট সমূহে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির চিত্র :-

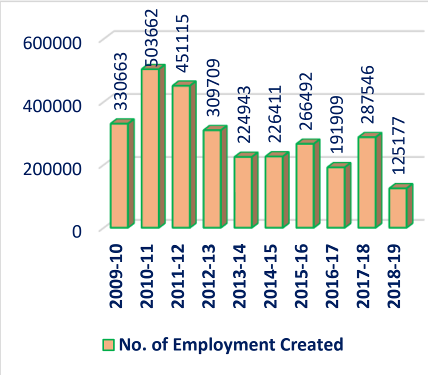

Source: BD Economic Review and BIDA

৫) FDI এর আওতায় কর্মসংস্থান :

বিদেশি বিনিয়োগ দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধিপূর্বক উৎপাদনশীলতা, জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি ও স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিপূর্বক দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। অর্থবছর ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশে FDI আওতাভুক্ত প্রজেক্ট সমূহে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ০.২৯ মিলিয়ন, যা ঐ সময়ে দেশের মোট শ্রমসংখ্যার ০.৪৮%। অর্থমন্ত্রণালয়ের হিসাবে বিগত এক দশক (২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালে FDI প্রজেক্ট সমূহে বিভিন্ন পর্যায়ে (Managerial, technical, supervisory and skilled-unskilled Jobs) কর্মরত শ্রমসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২.৯০ মিলিয়ন, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.২৯ মিলিয়ন, যা স্মারণী-৫.১২(১৩) এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো।

গ) দেশের সামগ্রিক FDI পরিস্থিতির মূল্যায়ন :

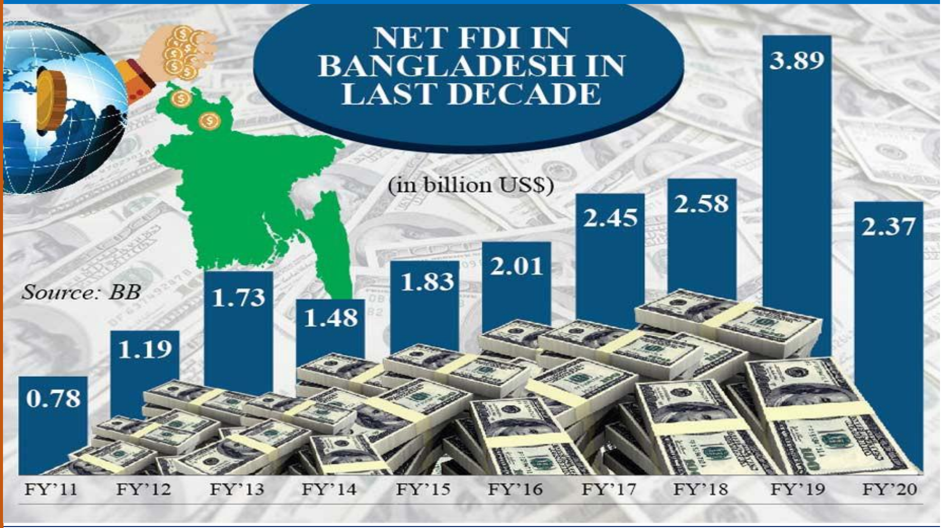

বিগত এক দশকের বিনিয়োগ পরিস্থিতি, FDI ষ্টক পজিশন এবং গ্লাবাল FDI র‌্যাংকিং এ বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছাতে বাংলাদেশের জন্য তা মোটেও যথেষ্ট নয়। কেননা, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আসার প্রবণতা অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ সমূহের তুলনায়

একদমই কম। বিগত এক দশক (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০) সময়কালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ২.০৭ বিলিয়ন। অথচ এ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ - কম্বোডিয়ায় গড়ে ২.২৯ বিলিয়ন, থাইল্যান্ডে ৯.০৫ বিলিয়ন, ভিয়েতনামে ১০.৭৭ বিলিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১০.৭৭ বিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ১০.৯ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ১৯.৩৮ বিলিয়ন, ভারতে ৩৭.১৮ বিলিয়ন এবং সিঙ্গাপুরে গড়ে ৭২.৭৭ বিলিয়ন ডলার [স্মারণী-৫.১২(৮)]। ঐ সময়কালে FDI ষ্টক পজিশন বাংলাদেশে ইউ.এস.ডলার ১৪.৬২ বিলিয়ন, কম্বোড়িয়ায় ২৯.১৭ বিলিয়ন, পাকিস্তানে ৪১.৫৬ বিলিয়ন, ফিলিপাইনে ৭৮.৭৯ বিলিয়ন, তাইওয়ানে ৮৫.৫৮ বিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ১৩৩.২০ বিলিয়ন, দ. কোরিয়ায় ১৯৩ বিলিয়ন, থাইল্যান্ডে ২০৫.৫০ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ২৪৭.৭০ বিলিয়ন, জাপানে ২৬৮.৪০ বিলিয়ন, ভিয়েতনামে ৩১৮.৭০ বিলিয়ন, ভারতে ৩৬৭.৫০ বিলিয়ন এবং চীনে ১,৫১৪ বিলিয়ন ডলার [স্মারণী-৫.১২(১২)]।

দেশের সামগ্রিক FDI পরিস্থিতির মূল্যায়ন :

বাংলাদেশের শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগকারি দেশের সংখ্যা কম/বেশি ২৫ টির মত হলেও, তন্মধ্যে ১৭টি দেশ তাদের বিনিয়োগের মাত্রা ধারাবাহিকবাবে প্রতিবছর কিছুকিছু বৃদ্ধিকরে আসছে এবং বিনিয়োগের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে মাত্র পাঁচটি (আমেরিকা, বৃটেন, চীন, নেদারল্যান্ডস্ এবং সিঙ্গাপুর) দেশের আধিপত্য। তাছাড়া, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ অদ্যাবধি নির্দিষ্ট কয়েকটিখাতে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, যাতে এগ্রোবেসড প্রথম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, টেক্সটাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বিতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং ক্যামিক্যাল ও ফুড এন্ড এলাইড তৃতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

তবে এটাও সত্যি যে সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ আগের তুলনায় যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। World Investment Report 2019 অনুযায়ী বিশ্বব্যাপি রপ্তানি উন্নয়ন ও বিকাশে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক নীতিমালাটি বানিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য আগের মত এত অনুকুল ছিল না, ফলে এ সময়ে বিশ্বব্যাপি আন্তঃসীমান্ত উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফলে ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপি FDI প্রবণতা প্রায় ১৩% কমে দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ১.৩ ট্রিলিয়ন, গ্লোবাল ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইসিস শুরু হওয়ার পরথেকে যা সর্বনিম্ন, বিগত যুগে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিরক্ষেত্রে যা বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। (ফাইন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস- ডিসেম্বর ৩১, ২০১৯)

অতএব, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় একথা বলা যায় যে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের বর্তমান ধারা এবং বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই আশপাশের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পক্ষে যা একেবারেই অপর্যাপ্ত। কাজেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিযোগিতার এ সময়কালে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের আলোকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির পাশাপাশি আকর্ষণীয় ছাড় ও প্রণোদনার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিপূর্বক শিল্প ও প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জন বাংলাদেশের জন্য এখন অবধারিত হয়ে পড়েছে।

SJFBD

ঘ) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় শর্তে ও সুবিধায় বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করছে। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারির অংশের কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই। বিদেশি বিনিয়োগকারিগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যাপক কর ছাড়, আর্থিক প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে অনায়াসে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি ২০১৬ এর আওতায় বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার ২০১৬ সালে বিনিয়োগ বোর্ড রিফমর্ড করে BIDA প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এ প্রচেষ্টার আওতায় বিনিয়োগকারিদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা

প্যাকেজ, লিগ্যাল প্রটেকশন, বিভিন্ন দেশের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর, কর অবকাশ সুবিধা এবং ব্যবসার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, যার সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

Investment Facilities :

Private investment from overseas sources is welcome in all areas of the economy with the exception of the four reserved sectors, which can be made either independently or through venture on mutually beneficial terms and conditions. Foreign investment is, however, especially desired in the following major categories of industries:

- Export oriented industries
- Industries in the Export Processing Zones (EPZs)
- High technology products that will be either import substitute or export oriented.

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

1) Facilities/Incentives :

I. For foreign direct investment, there is no limitation pertaining to foreign equity participation, i.e. 100 percent foreign equity is allowed. Non-resident institutional or individual investors can make portfolio investments in stock exchanges in Bangladesh. Foreign investors or companies may obtain full working loans from local banks. The terms of such loans will be determined on the basis of bank-client relationship.

II. A foreign technician employed in foreign companies will not be subjected to personal tax up to 3 (three) years, and beyond that period his/ her personal income tax payment will be governed by the existence or non-existence of agreement on avoidance of double taxation with country of citizenship.

III. Full repatriation of capital invested from foreign sources will be allowed. Similarly, profits and dividend accruing to foreign investment may be transferred in full. If foreign investors reinvest their repatriable dividends and or retained earnings, those will be treated as new investment. Foreigners employed in Bangladesh are entitled to remit up to 50 percent of their salary and will enjoy facilities for full repatriation of their savings and retirement benefits.

IV. (d) Foreign entrepreneurs are, therefore, entitled to the same facilities as domestic entrepreneurs with respect to tax holiday, payment of royalty, technical know-how fees etc.

V. (e) The process of issuing work permits to foreign experts on the recommendation of investing foreign companies or joint ventures will operate without any hindrance or restriction. Multiple entry visa" will be issued to prospective foreign investors for 3 years. In the case of experts," multiple entry visa" will be issued for the whole tenure of their assignments.

2) Other Incentives :

- Citizenship by investing a minimum of US $ 500,000 or by transferring US$ 1,000,000 to any recognised financial institution (Non-repatriable).
- Permanent residentship by investing a minimum of US$ 75,000 (non-repatriable).

SJHD

- Special facilities and venture capital support will be provided to export-oriented industries under "Thrust sectors" . **Thrust Sectors** include Agro-based industries, Artificial flower-making, Computer software and information technology, Electronics, Frozen food, Floriculture, Gift items, Infrastructure, Jute goods, Jewellery and diamond cutting and polishing, leather, Oil and gas, Sericulture and silk industry, Stuffed toys, Textiles, Tourism.

3) Investment Protections / International Agreements :

- **Legal Protection**: The policy framework for foreign investment in Bangladesh is based on 'The Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act. 1980,' which ensures legal protection to foreign investment in Bangladesh against nationalisation and expropriation. It also guarantees non-discriminatory treatment between foreign and local investment, and repatriation of proceeds from sales of shares and profit.
- **International Agreements**: Bangladesh has concluded bilateral agreements for avoidance of double taxation and investment treaties for promotion and protection of investment with the following countries.
- **Bilateral agreements:** Belgium, Canada, China, Denmark, France, Germany, India, Italy, Japan, Poland, Romania, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Sweden, Thailand, The Netherlands, United Kingdom (including Northern Ireland). Negotiations are ongoing with U.S.A, Iran, Philippines, Qatar, Australia, Nepal, Turkey, Indonesia, Cyprus, Norway, Finland and Spain.
- **Investment treaty:** Belgium, Canada, France, Germany, Iran, Italy, Japan, Malaysia, Pakistan, Philippines, Poland, Republic of Korea, Romania, Switzerland, Thailand, The Netherlands, Turkey, United Kingdom, USA, Indonesia. Negotiations are ongoing with India, Hungary, Oman, Maldova, DPRK, Egypt, Austria, Mauritius, Uzbekistan.

SJBD

In addition, Bangladesh is a signatory to MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), OPIC (Overseas Private Investment Corporation) of USA, ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) and a member of the WIPO (World Intellectual Property Organization) permanent committee on development co-operation related to industrial property.

4) Incentives to Non-Resident Bangladeshis (NRBs) :

Investment of NRBs will be treated on par with FDI. Special incentives are provided to encourage NRBs to invest in the country. NRBs will enjoy facilities similar to those of foreign investors. Moreover, they can buy newly issued shares/debentures of Bangladeshi companies . A quota of 10% has been fixed for NRBs in primary public shares. Furthermore, they can maintain foreign currency deposits in the Non-resident Foreign Currency Deposit (NFCD) account.

5) RELAXATION / LIBERALISATION OF EXCHANGE CONTROL REGULATIONS :

Bangladesh 'Taka' is convertible for current external transactions. Individuals/firms resident in Bangladesh may conduct all current external transactions, including trade and investment related transaction, through banks in Bangladesh authorised to deal in foreign exchange (Authorised Dealers) without prior approval of the Bangladesh Bank. Non- resident direct investment in industrial enterprise in Bangladesh and non-

resident portfolio investment through stock exchanges in Bangladesh also do not require prior approval of the Bangladesh Bank. Remittance of post-tax dividend/profit on non resident direct or portfolio investment do not require prior approval. Sale proceeds, including capital gains on non-resident portfolio investment may also be remitted abroad without prior approval. Repatriation of sale proceeds of non-resident investment in unlisted companies is allowed by Bangladesh Bank on the basis of the net asset value of the shares of the company. Investors may obtain relevant procedural details by contacting any Authorised Dealer bank in Bangladesh .

To facilitate investment, prior approval of the Bangladesh Bank is no longer required for :

- Remittance of profits to their head offices by foreign firms and companies operating in Bangladesh.
- issuance of shares to non-residents against investment for setting up industries in Bangladesh.
- Remittance of dividends on such shares to the non-resident investors.
- Portfolio investment by non-residents including foreign individuals/enterprises in shares and securities through stock exchanges in Bangladesh .
- Remittance of dividends on portfolio investment by non-residents through stock exchanges in Bangladesh .
- Remittance of sale proceeds, including capital gains of portfolio investments of non-residents through stock exchanges in Bangladesh.
- Remittance of principal and interest instalments on loans/suppliers credits obtained by industrial units from foreign lenders with approval of the BOI. 100% foreign owned (Type A) industrial units in the EPZs (Export Processing Zone) do not require prior permission of BOI for such foreign borrowing.
- Remittance in repayment of principal and payment of interest of such loans.
- Remittance of technical fees and royalties against technical assistance/royalty agreements in conformity with BOI guidelines.
- Remittance of savings of expatriate personnel at the time of their leaving Bangladesh, out of the salaries and benefits stated in their employment contracts as approved by BOI.
- Extension of term loans by banks on normal banking considerations to foreign firms operating in Bangladesh, subject to compliance of the instruction of GFET-2009, Vol-1, chapter-16, para 4(B).
- Extension of working capital loans to all foreign owned/controlled industrial and trading firms/companies by banks on the basis of bank customer relationship and normal banking practice.
- Obtaining of interest-free repatriable short-term foreign currency loans by foreign firms investing in Bangladesh from their head offices or any other sources through any authorised dealer.

6) General facilities/ incentives :

- **Tax holiday :**
  Tax holiday facilities are provided in accordance with existing laws, which will be available for 5 or 7 years depending on the location of the industrial enterprise.

- **Accelerated depreciation :**

SJFBD

Industrial undertakings not enjoying tax holiday will enjoy accelerated depreciation allowance up to 100 per cent of the cost of the machinery or plant if the industrial undertaking is set up in any municipal areas and 80 per cent in the first year and 20 per cent in the second year if the Industrial undertaking is set up elsewhere in the country.

- **Tax exemption :**

  i) Tax exemption on royalties, technical know-how fees received by any foreign collaborator, firm, company and expert.
  ii) Exemption of income tax up to 3 years for foreign technicians employed in industries specified in the relevant schedule of the income tax ordinance.
  iii) Tax exemption on income of the private sector power generation company for 15 years from the date of commercial production.
  iv) Tax exemption on capital gains from the transfer of shares of public limited companies listed with a stock exchange.

7) **Concessionary duty on imported capital machinery :**

Import duty, at the rate of 5% ad valorem, is payable on capital machinery and spares imported for initial installation or BMR/BMRE of the existing industries . The value of spare parts should not, however, exceed 10% of the total C & F value of the machinery. For 100% export oriented industries, no import duty is charged in case of capital machinery and spares. However, import duty @ 5% is secured in the form of bank guarantee or an indemnity bond will be returned after installation of the machinery.

Value Added Tax (VAT) is not payable for imported capital machinery and spares. (Source : Bangladesh bank)

ঙ) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে যা প্রয়োজন :

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগি হওয়া সত্ত্বেও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রস্তুতি এবং সরকারি পদক্ষেপ সমূহ পুরোপুরি যুগোপযোগি না হওয়ার কারণে আশপাশের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে বিদেশি

বিনিয়োগ কম আসছে। কারণ এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রায় বার্ষিক গড়ে ১২ বিলিয়নের স্থলে বার্ষিক ২.০৭ বিলিয়ন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের পক্ষে ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়, যদিনা এ পরিস্থিতির বাস্তবসন্মত অগ্রগতি সম্ভব হয়।

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামগ্রিক প্রস্তুতি, যেমন, সকল পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন (যোগাযোগ, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বন্দর অবকাঠামো, ব্যবসায়িক অনুকুল পরিবেশ, নিরাপত্তা ও লাভজনক বিনিয়োগের নিশ্চয়তা এবং দুর্ণীতি দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি), অন্যান্য প্রতিযোগি দেশসমূহের তুলনায় যা হতে হবে অবশ্যই অগ্রগামি এবং যুগোপযোগি। এক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে বিনিয়োগ প্রণোদনা ও সুযোগ সুবিধা। সামগ্রিক প্রস্তুতি মজবুত ও টেকসই না হলে, যত প্রণোদনায় দেওয়া হউক না কেন, কাংঙ্কিত বিনিয়োগ আকর্ষণে অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে।

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে যা প্রয়োজন :

তবে আশার কথা হচ্ছে, অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টরে বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং ছোট, বড় ও মাঝারি আরোও অনেক প্রকল্প এরিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পণার আওতায় আরোও নতুন নতুন অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। আশাকরা যায় অদুর ভবিষ্যতে আবকাঠামোগত দিকথেকে বাংলাদেশ একটি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌছাতে সক্ষম হবে।

কাজেই, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরাম্বিত করার মাধ্যমে ২০৪১ সালের কাঙ্কিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে দেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরাম্বিত করণপূর্বক রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌছাতে হবে নিঃসন্দেহে। যারজন্য প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক সামগ্রিক প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগ প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। তাই FDI আকর্ষণে সরকারের চলমান প্রক্রিয়াকে আরোও বেগবান ও কার্যকরি করে তুলতে বর্তমান প্রস্তুতি ও চলমান সুযোগ সুবিধাসমূহ প্রস্তাবিত বিষয় সমূহের আলোকে আরোও বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগি করে গড়ে তোলা যেতে পারে, যেমন :-

১. সামগ্রিক অবকাঠামো, যেমন- স্থলপথ, জলপথ, রেলপথ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা।
২. চাহিদানুযায়ী গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এসব সম্পদের সদ্ব্যবহারে আরোও যুগোপযোগি উপায় অবলম্বন করা।
৩. বন্দর ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বন্দরের সংখ্যা বৃদ্ধিকরা।
৪. ব্যবসা সহজিকরনের সাথে সংশ্লিষ্ট সূচক সমূহের দ্রুততার সাথে উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেবার মানোন্নয়নে ব্যবসায়িক সেবার সকলক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা।
৫. বিদেশি বিনিয়োগকারি, সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা, কর্মচারি ও অন্যান্য পর্যটকদের নিরাপদ অবস্থান ও অবাধ বিচরণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৬. বিদেশি বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ও অন্যান্য পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবীমা চালু করার পাশাপাশি বিদেশি ব্যাক্তিবর্গের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে স্পেশালাইজড চিকিৎসা ব্যবস্থা চালুকরা।
৭. বিদেশি ব্যাক্তিবর্গ অবসর কাটাতে পর্যটন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, পর্যটন কেন্দ্র সমূহের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের চাদিানুযায়ী অবসর কাটানোর সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে পর্যটন কেন্দ্র সমূহে বিদেশিদের অবসর কাটানোর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আলাদা " Foreign Amusement Zone" তৈরী করা।
৮. দেশের জেলা শহরগুলোতে বিদেশি লোকজন অবস্থান করার মত মানসন্মত হোটেল, মোটেল, ডিশ ও অন্যান্য সুবিধা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধিকরা।

৯. ভিসা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, যাতে বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ও অন্যান্য পর্যটকগণ ভিসা পেতে ভোগান্তির শিকার না হয়।

১০. শহজ শর্তে বিশ্বের নামি দামি ব্রান্ড ও কোম্পানি সমূহের শো-রুম, শাখা অফিস ও উৎপাদন ইউনিট চালু করার সুযোগ থাকা, যাতে যে কোনো নামী দামী কোম্পানি সহজে এদেশে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ অথবা স্থানান্তর করতে পারে।

১১. অন্যান্য প্রতিযোগি দেশ সমূহের সাথে মিল রেখে ট্যারিফ ও কাস্টমস্ ডিউটি সমন্বয় করা।

১২. কোম্পানি গঠণ, ফান্ড ট্রান্সফার, লভ্যাংশ প্রেরণ ইত্যাদি সহজতর করা।

১৩. বিদেশি অর্থায়নকৃত প্রজেক্ট সমূহে কর্মরত সকল বিদেশি কর্মকর্তা, কর্মচারি ও ট্যেকনিশিয়ানদের বেতন ও ভাতা বর্তমান নিয়মে করমুক্ত রাখা।

১৪. বিদেশি অর্থায়নকৃত প্রত্যেক প্রজেক্টে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বাংলাদেশি টেকনিশিয়ান নিয়োগ দেওয়া ও প্রশিক্ষিত করার বিধান চালুকরা, যাতে পরবর্তিতে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলাদেশি বিনিয়োগকৃত প্রজেক্ট সমূহের মানোন্নয়ন করতে সক্ষম হন।

১৫. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যে স্থাপিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নপূর্বক কলকারখানা স্থাপনের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করার পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে গজিয়ে উঠা বিভিন্ন দ্বীপসমূহে আরোও নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা।

১৬. বর্তমান বিশ্ব ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ভারত, চীন, জাপান , দক্ষিণ কোরিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব দেশের সাথে বিভিন্নখাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন গজিয়েউঠা দ্বীপ সমূহের উন্নয়নে যৌথভাবে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

১৭. বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা সমূহ ব্যাপকভাবে বিদেশি গণমাধ্যম সমূহে প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

১৮. বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি দুতাবাস সমূহের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারিদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে সংঘটিত ও অনুপ্রাণিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯. ভালোমানের বিনিয়োগকারিদেরকে সহজ শর্তে সন্মানজনক নাগরিকত্ব প্রদানের পাশাপাশি ভি.আই.পি ও সি.আই.পি মর্যাদা প্রদান করা।

২০. সরকারি উদ্যোগে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগকারিদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আলাদা ক্লাব পরিচালনা করা।

****

অধ্যায় : ৫.১৩

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহার।

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহার।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ।
খ) প্রাকৃতিক সম্পদের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান।
গ) বাংলাদেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ।
 ১) প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ।
ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার।

ভূ-উপরিভাগের উল্ল্যেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের আহরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐ সমস্ত সম্পদের ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা কয়েকটি ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-

১) সামুদ্রিক মৎস আহরণে পিছিয়ে থাকা।
২) বনজ সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা।
৩) পানি ও নদী সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি।
৪) বঙ্গোপসাগরে আয়ত্বকৃত জলসীমার পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার না হওয়া।
৫) বঙ্গোপসাগরের বুকে গজিয়ে উঠা দ্বীপসমূহের যথাযথ উন্নয়ন না হওয়া।
 ক) বাংলাদেশের স্বনামধন্য দ্বীপসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
৬) পাহাড়িয়া অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে না পারা।
 ক) দেশের পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ।
৭) মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকা সত্বেও পর্যটন উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা।
৮) কর্মক্ষম যুবশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারা।

ঙ) **খনিজ সম্পদ :** বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের পর্যাপ্ততা ।
চ) খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা।

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ :

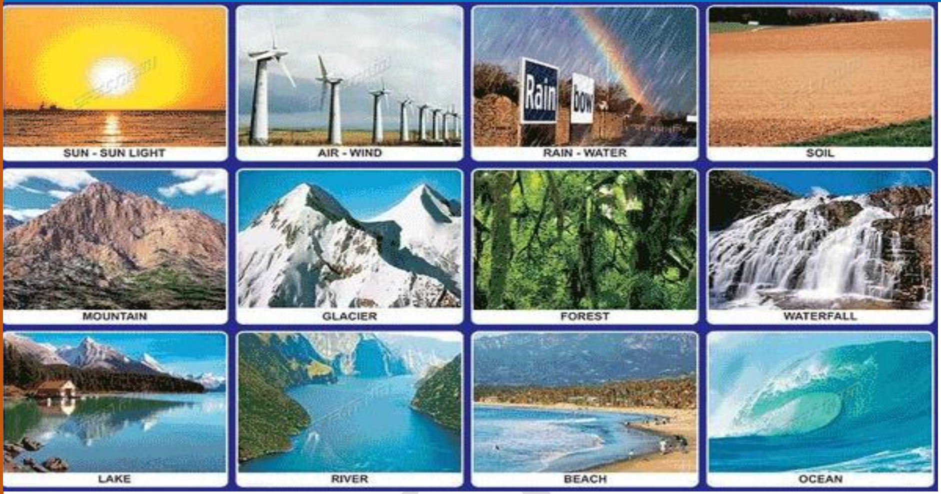

প্রাকৃতিক সম্পদ :

প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্রই প্রাকৃতিক সম্পদে প্রাচুর্যময়। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে কম বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং নিজস্ব সামর্থ অনুযায়ী ঐ সমস্ত সম্পদ আহরণপূর্বক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উহার ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশসমূহ যে যতবেশি আহরণ ও উহার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছে, সে দেশ তত্দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। উদাহরণস্বরুপ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ঐ সমস্ত দেশের তেল ও গ্যাসের প্রাকৃতিক মওজুদ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বহুমুখি প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারি, যারমধ্যে রয়েছে খনিজ সম্পদ, মৎস ও বনজ সম্পদ, এদেশের উর্বর মাটি, দেশজুড়ে অসংখ্য ছোটবড় নদী ও পাহাড়, সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগরে নতুন আয়ত্বকৃত সমুদ্রসীমা ,বঙ্গোপসাগরের বুকে নতুন নতুন গজিয়ে উঠা দ্বীপসমূহ এবং বিশাল জনসম্পদ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অঢেল সমারোহের অন্যতম, যেসমস্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাপক সম্ভাবনা বিরাজমান। তবে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারেরক্ষেত্রে জাতিসংঘের একটি সার্বজনীন এজেন্ডা হচ্ছে " আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সম্বোধন টেকসই উন্নয়নের অন্যতম স্তম্ব"। ১৭টি থিম্যাটিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে ১৩ ,১৪ ও ১৫ (ক্লাইমেট এ্যাকশন, জলের নিচের জীবন ও ভূমির জীবন) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবের সমস্যাসমূহ মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু সম্পর্কিত এ সমস্ত সমস্যার সমাধান না করে যে কোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যার্থ হতে পারে। অবশ্য সরকার এরিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, যারমধ্যে রয়েছে :-

১) জলবায়ু দূষণ ব্যবস্থাপনা।
২) বন ও স্থিতিশীল গ্রামীণ উন্নয়ন।
৩) পরিবেশগত অংশীদারি সম্পদের উপর অঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৪) সমূদ্র অর্থনীতির উন্নয়ন ; এবং
৫) বৃহদাকারে বনায়ন।

জলবায়ু সংক্রান্ত জাতিসংঘের সার্বজনীন এজেন্ডা মাথায় রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহারে বাংলাদেশের বর্তমাণ পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সমূহ নিন্মে তুলেধরা হলো :-

খ) প্রাকৃতিক সম্পদের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

Natural Resources & Resilience Performance Rank 2019 অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের দিকথেকে ১১৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৩তম। ঐ র‍্যাংকিং অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে মিয়ানমার ১৫ তম, থাইল্যান্ড ৪৬, পাকিস্তান ৫৩, চীন ৬৯, মালয়েশিয়া ৭৪, ভিয়েতনাম ৯৪, ভারত ৯৮, ফিলিপাইন ১০৮ এবং ইন্দোনেশিয়া ১১০ তম স্থানে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের দিকথেকে ভারত, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান বাংলাদেশের পিছনে হলেও, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আয়ের দিকথেকে ঐসব দেশ বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে জি.ডি.পি অনুপাতে আয় মিয়ানমারে ৬.৫৯%, থাইল্যান্ডে ২.০১%, পাকিস্তানে ১.১৩%, চীনে ১.৫৮%, মালয়েশিয়ায় ৭.৫৪%, বাংলাদেশে ০.৬৬%, ভিয়েতনামে ৪.৩২%, ভারতে ২.২৭%, ফিলিপাইনে ১.৪৭% এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৪.৭৮% [স্মারণী-৫.১৩(১)]।

প্রাকৃতিক সম্পদের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

এখন দেখার বিষয়, যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে রয়েছে, তন্মধ্যে কি পরিমাণ সম্পদ ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত সম্পদ সমূহের পর্যাপ্ত আহরণ এবং এর যথাযথ বানিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে কিনা এবং অনাবিষ্কৃত সম্পদ সমূহের দ্রুত আবিষ্কারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ? তাছাড়া, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- সাগর, পাহাড়, সুন্দরবন, নতুন আয়ত্বকৃত সমুদ্রসীমা এবং বঙ্গোপসাগরের বুকে নতুন নতুন গজিয়ে উঠা দ্বীপসমূহ ইত্যাদি সম্পদের কতটুকুই বা যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রয়োজনে এসব সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনাই বা কি ? কারণ, প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগে অর্থনীতির বহুমূখীতা নিশ্চিত করতে না পারলে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখা সত্যিকার অর্থে কঠিন হবে।

স্মারণী-৫.১৩(১) : ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে জি.ডি.পি অনুপাতে আয়ের দিকথেকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

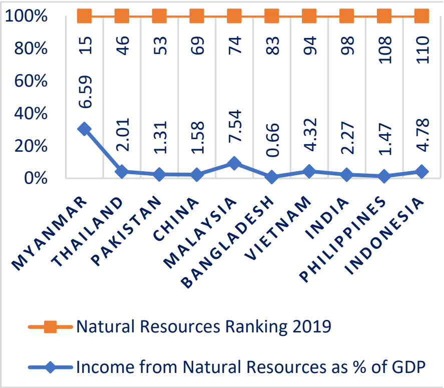

Source: Globaleconomy.com and GFSI

SJFBD

গ) বাংলাদেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ :

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ স্বর্গীয় জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, উর্বর মাটি, অসংখ্য নদী নালা, খাল বিল ও পাহাড়সমৃদ্ধ বহুমূখী প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারি। যে সমস্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে এ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির এ অঢ়েল ভান্ডারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যথাযথভাবে নিবন্ধ না হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামর্থ উৎকর্ষতা পায়নি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার অদ্যাবধি একদমই সীমিত রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ :

উদাহরনস্বরুপ, অপুরন্ত সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও এদেশের কৃষি সেক্টর আজো অনেকটা সেকেলে রয়ে গেছে, অগাধ প্রাণোচ্ছল কর্মক্ষম যুবশক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশাল এ জনশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলাপূর্বক পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছেনা, অঢ়েল সমূদ্র সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও ঐ সমস্ত সম্পদের যথাযথ আহরণ সম্ভব হচ্ছেনা এবং জলে ও স্থলে অসংখ্য খনিজ সম্পদ বিদ্যমান থাকলেও ঐ সমস্ত সম্পদের পর্যাপ্ত আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা আজো সম্ভবপর হয়ে উঠছেনা। ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আয়ের দিকথেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে জি.ডি.পি অনুপাতে আয় মালয়েশিয়ায় ৭.৫৪%, মিয়ানমারে ৬.৫৯%, ইন্দোনেশিয়ায় ৪.৭৮%, ভিয়েতনামে ৪.৩২%, ভারতে ২.২৭%, থাইল্যান্ডে ২.০১%, চীনে ১.৫৮%, ফিলিপাইনে ১.৪৭%, পাকিস্তানে ১.১৩% এবং বাংলাদেশে ০.৬৬% [স্মারণী-৫.১৩(১)]।

১) প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ :

যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ, তা দু-ভাগে ভাগকরা যায়, যেমন- ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভূ-গর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ / খনিজ সম্পদ।

ক) ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :-

১. ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।
২. মৎস ও বনজ সম্পদ।
৩. এদেশের উর্বর মাটি ও অনুকুল আবহাওয়া।
৪. দেশজুড়ে অসংখ্য ছোটবড় নদী।
৫. প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সুন্দরবন।
৬. বঙ্গোপসাগরে আয়ত্বকৃত জলসীমা।
৭. বঙ্গোপসাগরের বুকে গজিয়ে উঠা দ্বীপসমূহ।
৮. অসংখ্য পাহাড় ও পার্বত্য এলাকা সমূহ।
৯. অঢেল কর্মক্ষম জনসংখ্যা।
১০. কৃষি ও শিল্পের জন্য অনুকুল পরিবেশ।

খ) ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক / খনিজ সম্পদ :

যে সমস্ত ভূ-গর্ভস্থ প্রাকৃতিক / খনিজ সম্পদে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ, তন্মধ্যে-প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানী তেল, কয়লা, চুনাপাথর, হার্ডরক, কঙ্কর, পাথর, কাঁচের বালি, নির্মাণ বালি, সাদামাটি, ইটের কাদামাটি, পিট এবং সৈকত বালির ভারী খনিজ সম্পদ অন্যতম, যদিও অদ্যাবধি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলন ও ব্যবহার ব্যাপক বানিজ্যিক ভিত্তিতে হয়ে আসছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে।

SJHBD

ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার :

ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার :

ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের তুলনায় যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ, যদিও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি আমাদের ওদাসীনতা, আহরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে ঐ সমস্ত সম্পদের পর্যাপ্ত আহরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐ সমস্ত সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে দেশের অর্থনীতির প্রসার তৈরী পোশাক, বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কয়েকটিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। উদাহরনস্বরুপ, উৎপাদনমূখী শিল্পের অনগ্রসরতা, অফুরন্ত সম্ভাবনাময় হওয়া সত্বেও কৃষিখাতের অনগ্রসরতা, উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের নদী ও পানি

অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার :

সম্পদের সদ্ব্যবহারপূর্বক অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে না পারা, বঙ্গোপসাগরে আয়ত্বকৃত বিশাল জলসীমার সদ্ব্যবহার করতে না পারা, পাহাড় ও পাহাড়ি অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোপুরি কাজে লাগাতে না পারা, বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে উঠা চর সমূহের দ্রুত উন্নয়নপূর্বক অর্থনৈতিক উন্নয়নের আওতায় আনতে না পারা, দেশের কর্মক্ষম বিশাল যুবশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নিয়োজিত করতে না পারা, বনজ সম্পদ আহরণে পিছিয়ে থাকা, মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য থাকা সত্বেও পর্যটন উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা এবং আরোও অনেকক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ আহরণ ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছেনা।

বাংলাদেশের ভূ-উপরিভাগের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের আহরন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐ সমস্ত সম্পদের ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা কয়েকটি ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১) সামুদ্রিক মৎস আহরনে পিছিয়ে থাকা :

সামুদ্রিক মৎস আহরনে পিছিয়ে থাকা :

মৎস আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে প্রাণীজ প্রেটিনের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি উদ্বৃত্ত মৎস বিদেশে রপ্তানিপূর্বক প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব, যা রপ্তানি খাতের প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিলেও সামুদ্রিক মৎস আহরণের ক্ষেত্রে সে তুলনায় মোটেও আগায়নি। সামুদ্রিক মৎস আহরণে বাংলাদেশের ব্যাপক সুযোগ সুবিধা ও জলসীমা থাকলেও, অদ্যাবধি বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিগত ২০ বছর (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালে দেশে সামুদ্রিক মৎস আহরণের হার গড়ে বছরে ৫.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৩.৯০%, যা মৎস আহরণকারি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহের তুলনায় এবং এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় অনেক অনেক কম। ২০১৪-২০১৮ সময়কালে গড়ে বার্ষিক সামুদ্রিক মৎস আহরণ বাংলাদেশে ০.৬৫ মিলিয়ন মে.টন, মিয়ানমারে যা ১.১৮ মিলিয়ন মে.টন, থাইল্যান্ডে ১.৩৭, দ. কোরিয়ায় ১.৪২, মালয়েশিয়ায় ১.৫০, ফিলিপাইনে ১.৮৬, ভিয়েতনামে ৩.০০, জাপানে ৩.২১, ভারতে ৩.৬৯, ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৩৪ এবং চীনে ১৩.৫১ মিলিয়ন মে.টন। (বিস্তারিত : অধ্যায়-৩.৯)।

স্মারণী-৫.১৩(২) : ২০১৪-২০১৮ সময়কালে গড়ে বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের সামুদ্রিক মৎস আহরণের চিত্র :-

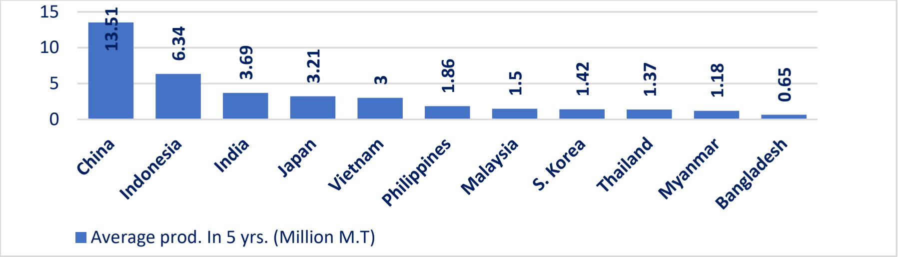

Source: FAO Report 2020

২) বনজ সম্পদ আহরন ও সদ্ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা :

বনজ সম্পদ আহরন ও সদ্ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা :

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। জ্বালানি কাঠ সরবরাহ, শিল্পের কাঁচামাল জোগান, জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি সরাসরি অবদান রাখে। তাছাড়া, দেশে বনভিত্তিক শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমস্ এর মাধ্যমে ভূমির সুরক্ষা, জল নিয়ন্ত্রণ ও মাটি গঠন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কাজগুলি বনভূমির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, বার্ষিক ভিত্তিতে হিসাব করলে যাদের আর্থিক মূল্য প্রতিবছর বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ভূখন্ড অনুপাতে বনভূমির অংশ ১১% মাত্র, ঐ সময়ে চীনে যা ২২.১%, ফিলিপাইনে ২৭%, থাইল্যান্ডে ৩২.১%, মিয়ানমারে ৪৪.২%, ভিয়েতনামে ৪৭.৬%, ইন্দোনেশিয়ায় ৫৩% এবং কম্বেডিয়ায় ৫৩.৬%। বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ তুলনামূলক কম হওয়ায় এবং দেশে বনভিত্তিক শিল্প, যেমন- কাগজ, পাল্প, আসবাবপত্র ও বন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পের পর্যাপ্ত বিকাশ না ঘটায় এ সেক্টরের আর্থিক পরিধি ও কর্মসংস্থান আজো অনেক সীমিত। ফলে জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান অদ্যাবধি একদমই সীমিত। অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান ১.৬২% - ১.৮২% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বছরে গড়ে যা ১.৭২%। (বিস্তারিত : অধ্যায়-৫.১৪)।

স্মারণী-৫.১৩(৩): অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান :-

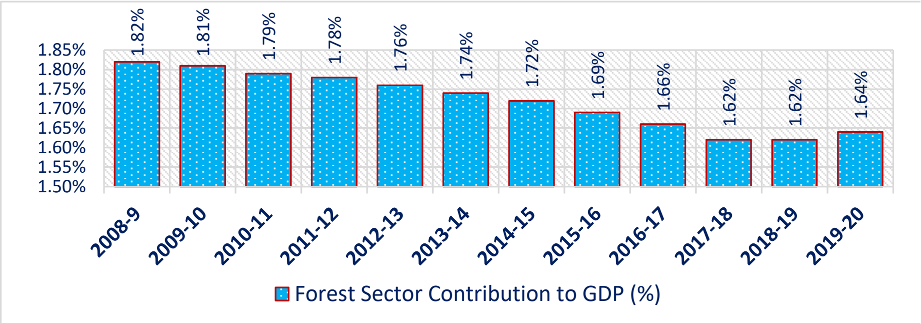

Source: BD Economic Review

৩) পানি ও নদী সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি :

পানি ও নদী সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি :

কৃষি কার্যক্রম পুরোপুরি এবং পরিবেশগত অনেক বিষয় পানির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, যা মানুষের জীবন জীবিকা ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পানির পর্যাপ্ততা যেমন কৃষিকাজের জন্য অপরিহার্য, তেমনি পানি সংকটের কারনে কৃষি কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। পানিসম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাই প্রয়োজন দেশে উন্নত ও টেকসই পানি ও নদী সম্পদ ব্যবস্থাপনা। পানি ও নদী সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে বন্যার কবলথেকে সফলভাবে দেশকে রক্ষা করার মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষকদের রক্ষা করা এবং শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ। বর্তমানে পানি সংরক্ষনের অন্যতম উৎসগুলি হচ্ছে বিভিন্ন নদ নদী, খালবিল, ঝিল, পুকুর, লেক ও ইরিগেশন প্রকল্পসমূহ। উন্নত ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের নদ নদীসমূহের পানি নিয়ন্ত্রণ এবং চাষাবাদ, শিল্প ও অন্যান্য কাজে পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্যে এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির বড় সম্ভাবনা লুকায়িত। (বিস্তারিত : অধ্যায়-৫.১৫)।

কার্যকর পানি ও নদী শাসন ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতির কারনেই দেশে বন্যার বয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭২ থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ২৯৭টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে, যার প্রায় ২৮.৯৬% বন্যা। বিভিন্ন সুত্রমতে বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ গড়ে প্রায় ইউ.এস.ডলার ২.২ বিলিয়ন, যা বার্ষিক জি.ডি.পির ১.৫%।

স্মারণী-৫.১৩(৪) : বিগত ১৯৮০ থেকে ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশে সংঘটিত বড় আকারের বন্যাসমূহের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ভূমির পরিমাণ (বর্গ কিলোমিটার) :-

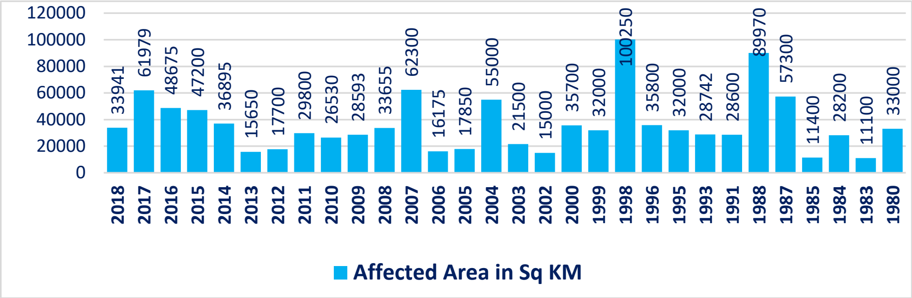

Source: Annual Flood Report 2018

৪) বঙ্গোপসাগরে আয়ত্বকৃত জলসীমার পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার না হওয়া :

বঙ্গোপসাগরে আয়ত্বকৃত জলসীমার পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার না হওয়া :

সবুজ অর্থনীতির ন্যায় নীল অর্থনীতিও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অংশ, কোনো দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নেরক্ষেত্রে যার প্রভাব ব্যাপক। বিশ্বের বহুদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সবুজ ও নীল অর্থনীতির সমন্বয়ে গঠিত, যা ঐ সমস্ত দেশের অর্থনীতির প্রসার ও গতি সমানতালে বৃদ্ধি করে চলেছে। উদাহরণস্বরুপ, অষ্ট্রেলিয়া, চায়না, ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশসমূহ, আমেরিকা সহ আরোও অনেক দেশ সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের অর্থনীতি প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে তুলছে।

বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষানুসারে বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনীতি বহু সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ, যারমধ্যে রয়েছে- পর্যটন উন্নয়ন, ফিশারীজ এন্ড একুয়া কালছার, মেরিন ট্রান্সপোর্ট, শিপ বিল্ডিং ও শিপ ব্রেকিং এবং বিবিধ রকমের খনিজ পদার্থ। আগামীতে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রভাব কেমন হবে, এ সমস্ত সম্পদের পর্যাপ্ত আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবহারের উপর তা পুরোপুরি নির্ভর করবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহ কমবেশি বঙ্গোপসাগর কতৃক আশির্বাদপুষ্ট, যা ঐ অঞ্চলে সামুদ্রিক অর্থনীতির বড় ধরনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের একটি উল্ল্যেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের বর্তমান জলসীমার অন্তর্গত। বাংলাদেশের এখতিয়ারভূক্ত বিশাল এ জলসীমা প্রচুর মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, যারমধ্যে রয়েছে প্রায় ৫০০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী, অজস্র খনিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস এবং আরোও অজস্র সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। মিয়ানমার তাদের জলসীমায় এরিমধ্যে বিশাল গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কার করেছে, যে সম্ভাবনা বাংলাদেশ সীমানাতেও প্রবল।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী সমূদ্র অঞ্চলের পানিতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মত মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে ১৩টি ভারী খনিজ সমৃদ্ধ সিল্ট রয়েছে, যারমধ্যে ইলামানাইট, গারনেট, কোলেমানাইট, জিরকন, সরীসৃপ এবং ম্যাগনেটাইট তাদের মতে সোনার চেয়েও মূল্যবান। এ সমস্ত খনিজ সম্পদ সঠিকভাবে আহরণ করা গেলে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সম্পদ অর্জিত হবে নিঃসন্দেহে। (বিস্তারিত : অধ্যায়- ৫.১৭)।

৫) বঙ্গোপসাগরের বুকে গজিয়ে উঠা দ্বীপসমূহের যথাযথ উন্নয়ন না হওয়া :

দ্বীপ বলতে নদী বা সাগরের বুকে গজিয়ে উঠা ভূখন্ড, যা প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে উঠা অপরুপ সৌন্দর্য মন্ডিত প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার। পৃথিবীর অনেক দ্বীপ এবং দ্বীপ রাষ্ট্র সৌন্দর্য ও সম্পদের কারণে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যারমধ্যে রয়েছে :-

1. Maldives
2. Bora Bora, French Polynesia
3. Palawan, Philippines
4. Seychelles
5. Santorini, Greece
6. The Cook Islands
7. Bali, Indonesia
8. The Dalmatian Islands, Croatia
9. Fiji
10. Kaua'i, USA
11. Koh Samui, Thailand
12. St. Lucia, The Caribbean
13. Capri, Italy
14. Ko Phi Phi, Thailand
15. Whitsunday Islands, Australia
16. Sardinia, Italy
17. St. Barts, The Caribbean
18. Mallorca, Spain
19. The Bahamas
20. Lofoten Islands, Norway

বঙ্গোপসাগরের বুকে গজিয়ে উঠা দ্বীপসমূহের যথাযথ উন্নয়ন না হওয়া :

বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য নদীর অববাহিকায় ছোট বড় প্রায় ৩২টি দ্বীপ / চর রয়েছে এবং নতুন নতুন আরোও অনেক চর জেগে উঠছে। কিছু কিছু দ্বীপের বয়স কয়েকশ বছর পার হয়ে গেছে এবং ঐ সমস্ত দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠেছে বহু আগে, যদিও ঐ সমস্ত দ্বীপে এখনও জীবন মান উন্নয়নে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার বিস্তার ঘটেনি। যে সমস্ত দ্বীপ বিগত ২০/৩০ বছরের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে ঐ সমস্ত দ্বীপে আজো জনবসতি পুরোপুরি গড়ে উঠেনি। এর অন্যতম কারণ, যেহেতু ঐ সমস্ত দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের মাঝে গজিয়ে উঠেছে, সেহেতু সেখানে মিষ্টি পানীয় জলের অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, মানব বসতি গড়ে তোলার পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা না থাকা এবং নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি। সরকার যদি দ্বীপসমূহের দ্রুত উন্নয়নে সচেষ্ট হন এবং এ লক্ষ্যে জাতিয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করেন, তাহলে ক্রমান্নয়ে প্রতিটি দ্বীপ দ্রুত উন্নয়নের আওতায় এনে সেখানে বনায়ন,

পর্যটনের প্রসার এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার মাধ্যমে ঐ সমস্ত দ্বীপ সমূহকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসতে পারেন এবং সেখানে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠার পাশাপাশি নগরায়ন বর্ধিত হবে।

নিম্নে ২০২১ সাল নাগাদ বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে উঠা ছোট বড় দ্বীপ/চর সমূহের তালিকা :-

বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমাংশে	বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে	বঙ্গোপসাগরের পূর্বাংশে
১. আশার চর।	১. ভোলা ।	১. সেন্ট মার্টিন দ্বীপ।
২. আন্দার চর।	২. বাল্লার চর।	২. চেরা দ্বীপ।
৩. চর লক্ষী।	৩. সন্দ্বীপ	৩. জালিয়া দ্বীপ।
৪. চর মানিকা।	৪. উরির চর।	৪. কুতুবদিয়া।
৫. নিঝুম দ্বীপ।	৫. সোমা দ্বীপ।	৫. মহেশখালী দ্বীপ।
৬. রমনাবাদ দ্বীপ।	৬. হাতিয়া।	৬. সোনাদিয়া দ্বীপ।
৭. চর মনতাজ।	৭. মনপুরা দ্বীপ।	
৮. রাঙ্গাবালি চর।	৮. চর ছাকুচিয়া।	
৯. দুবলার চর।	৯. চর নিজাম।	
১০. বুড়ির চর।	১০. চর কুকরি মুকরি।	
১১. পাখির চর।	১১. ডাল চর।	
১২. ড়িমের চর।	১২. চর গাজী।	
১৩. চর বাগালা।	১৩. চর ফায়েজউদ্দীন।	

SIEBD

বাংলাদেশে এ যাবৎ জেগে উঠা দ্বীপ / চর সমূহের সন্নিলিত আয়তন প্রায় ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার। গত এক দশকে বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় প্রায় ডজন খানেক নতুন দ্বীপ জাগ্রত হয়েছে। সরকারি হিসাবে ২০০৭ সাল পরবর্তী বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠা চর সমূহের সন্নিলিত আয়তন প্রায় ১২৫,৩৭০ একর (৫০৭ বর্গ কিলোমিটার)। CEGIS এর হিসাবে দেশে পদ্মা ও মেঘনা নদীর ভাঙ্গনের ফলে প্রতিবছর গড়ে ৩২ বর্গ কিলোমিটার ভূমি নদীগর্ভে তলিয়ে যায় এবং বন্যার সাথে পলিমাটি বয়ে আনার কারণে বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য নদীর অববাহিকায় প্রায় ৫২ বর্গ কিলোমিটার ভূমি নতুন করে জাগ্রত হয়। ফলে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২০ বর্গ কিলোমিটার নতুন ভূমি মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সে হিসাবে গত ১০০ বছরে দেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ ২ হাজার বর্গ কিলোমিটার। নিম্নে বাংলাদেশের স্বনামধন্য দ্বীপ/চর সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলেধরা হলো ।

বাংলাদেশের স্বনামধন্য দ্বীপসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

ক) বাংলাদেশের স্বনামধন্য দ্বীপসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-

১. সন্দ্বীপ :

চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলে মেঘনা নদীর মুখে এ দ্বীপ অবস্থিত। আনুমানিক ৫০ কি.মি. দৈর্ঘ এবং ১৫ কি.মি প্রস্থ বিশিষ্ট এ দ্বীপে ২০২১ সাল নাগাদ প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের বসবাস। এ দ্বীপের মাটি খুবই উর্বর এবং এখানে প্রচুর পরিমানে বালি রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এখনো এ দ্বীপে যথেষ্ঠ অপ্রতুল। তবে বর্তমান আওয়ামিলীগ সরকারের আমলে সমূদ্রের তলদেশ দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন ও ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের ফলে সেখানে উন্নয়নের প্রাণ সঞ্চার হতে শুরু করেছে।

২. ভোলা :

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও পুরাতন দ্বীপ ভোলা, যার আয়তন প্রায় ১,২২১ বর্গ কি.মি.। বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার আওতাধীন এ দ্বীপের বয়স প্রায় ৫০০ বছর, ২০২১ সাল নাগাদ যেখানে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার বসবাস। দেশের সবচেয়ে পুরানো এ দ্বীপের সৌন্দর্যের খ্যাতি অনেক, তাই এ দ্বীপকে বাংলাদেশে দ্বীপের রাণী বলা হয়। এটি সমূদ্র পৃষ্ট থেকে মাত্র ৬ ফিট উচু। প্রচুর মহিষ, মহিষের দুধ ও দইয়ের জন্য এ দ্বীপ যথেষ্ট খ্যাত।

৩. হাতিয়া :

চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে নোয়াখালী জেলার আওতাধীন হাতিয়া দ্বীপে অন্তত ১৯টি চর রয়েছে। আঠারশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মেঘনা নদীর মুখে জেগে উঠা এ দ্বীপের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বঙ্গোপসাগর, যার আয়তর প্রায় ২,১০০ বর্গ কি.মি.। ২০২১ সাল নাগাদ এখানে প্রায় ৬ লাখের বেশি জনসংখ্যার বসবাস রয়েছে। নৌকা, লঞ্চ অথবা ষ্টিমারই এ দ্বীপে যাতাতের অন্যতম মাধ্যম। বয়স ও সম্ভাবনার তুলনায় নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে এ দ্বীপ অদ্যাবধি অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে। বৈচিত্রপূর্ণ এ দ্বীপটিতে দর্শনীয় অনেক স্থান ও ঐতিহ্য রয়েছে, পর্যটন উন্নয়নে যা কাজে লাগানোর ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান।

SJFBD

৪. মহেশখালী :

কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মহেশখালী উপজেলায় অবস্থিত এ দ্বীপের আয়তন ৩৬২.১৮ বর্গ কি.মি। প্রায় ২ শত বছরের বেশি পুরানো এটিই বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ যেখানে পাহাড় রয়েছে। মহেশখালী উপজেলায় আরোও যে তিনটি ছোট আকারের দ্বীপ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- সোনাদিয়া, মাতারবাড়ী এবং ধুবলাঘাটা। পান, শুটকি, চিংড়ি, লবন ও মুক্তা উৎপাদনের জন্য এ দ্বীপ এরিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে।

৫. সেন্ট মার্টিন :

কক্সবাজার জেলা থেকে ১২০ কি.মি দূরে বঙ্গোপসাগরের বুকে প্রায় ১৭ বর্গ কি.মি জায়গা জুড়ে এ দ্বীপের অবস্থান। এ দ্বীপের অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দয্য, সমূদ্রের স্বচ্ছ জলরাশি এবং প্রবালের সমারোহ এরিমধ্যে পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দ্বীপের উন্নয়ন ও সংস্কারপূর্বক দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসা জরুরি।

SJFBD

৬. কুতুবদিয়া :

কক্সবাজার জেলার আওতাধীন কুতুবদিয়া উপজেলার অন্তর্গত আরেক দ্বীপ কুতুবদিয়া, আয়তনে যা ২১৬ বর্গ কি.মি। ধারনা করা হয় যে ১৪০০ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ দ্বীপ আবিষ্কৃত হয় এবং ১৫০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এ দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। বিভিন্ন বেসরকারি তথ্যমতে ২০২১ সাল নাগাদ এ দ্বীপে প্রায় সোয়া লাখ লোকের বসবাস। অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এ দ্বীপে রয়েছে মনোরম সমুদ্র সৈকত, দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং লাইট হাউজ। এ দ্বীপ লবন চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭. নিঝুম দ্বীপ :

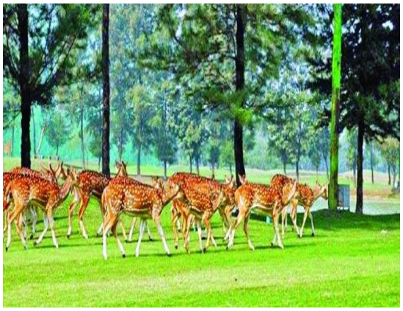

নোয়াখালী জেলার আওতাধীন হাতিয়া উপজেলায় অবস্থিত কয়েকটি চর নিয়ে গঠিত ছোট্ট এ দ্বীপের আয়তন আনুমানিক ১৪,০৫০ একর। প্রাকৃতিক অপরুপ সৌন্দয্যমন্ডিত এ দ্বীপে গড়ে উঠেছে বন্য প্রাণীদের অভয়াশ্রম, যেখানে রয়েছে বিভিন্ন বন্য প্রাণীর পাশাপাশি কয়েকশ প্রজাতির পাখি এবং প্রচুর চিত্রা হরিণ। বলা হয়ে থাকে যে এ দ্বীপে প্রায় ৪০ হাজারের বেশি চিত্রা হরিণ রয়েছে।

৮. সোনাদিয়া দ্বীপ :

কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মহেশখালী উপজেলায় সোনাদিয়া দ্বীপ অবস্থিত। তিনদিকে সমুদ্র সৈকত বেষ্টিত অপরূপ এ দ্বীপের আয়তন ৯ বর্গ কি.মি। ধারনা করা হয় যে ১৮০০ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে এবং ২০২১ সাল নাগাদ এখানে বসবাসরত জনসংখ্যার পরিমাণ আনুমানিক ২০০০, যাদের মূল পেশা মৎস শিকার। মহেশখালী এবং সোনাদিয়া দ্বীপ পাশাপাশি অবস্থিত, পর্যটন ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের ক্ষেত্রে এ দ্বীপের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

৯. মনপুরা দ্বীপ :

বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার আওতাধীন দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও অন্য তিনদিকে মেঘনা নদী বেষ্টিত ছোট্ট এ দ্বীপটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ব্যাপক জনবসতি গড়ে উঠার পক্ষে পর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে এখানে। পর্যটন উন্নয়নের পাশাপাশি এ দ্বীপে অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের সম্ভাব্যতা যাছাই করা যেতে পারে।

১০. ছেরা দ্বীপ :

সেন্টমার্টিন থেকে আনুমানিক ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে জেগে উঠা এ দ্বীপের আয়তন তিন কিলোমিটারের মত, যা ২০০০ সালে আবিষ্কৃত হয়। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এ দীপে রয়েছে প্রচুর নারিকেল গাছ, প্রাকৃতিক পাথর এবং কোরাল। প্রবল জোয়ারের সময় এ দ্বীপের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পানিতে তলিয়ে যায়, যা ভাটার সময় ভেসে উঠে, ভ্রমণপিপাসুদের দৃষ্টিতে এ যেন এক দুর্লভ ও অভাবনীয় দৃশ্য। পর্যটন প্রসার ও উন্নয়নের জন্য এ দ্বীপে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

১১. শাহ্ পরীর দ্বীপ :

বাংলাদেশ ও মিয়ানমার বর্ডারে টেকনাফ সীমান্তে সেন্টমার্টিন দ্বীপের কাছাকাছি ছোট্ট এ দ্বীপের অবস্থান। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা সত্বেও ২০২১ সাল নাগাদ এ দ্বীপে প্রায় ৪০ হাজার মানুষের জনবসতি গড়ে উঠেছে, যাদের মূল পেশা মৎস শিকার ও লবন চাষ। বঙ্গোপসাগরের বুকে গজিয়ে উঠা এ দ্বীপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ, যেখানে পর্যটন বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান।

১২. ধুবলার চর :

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমান্তে সুন্দরবনের পাশে কম/বেশি ১০টি চর নিয়ে ধুবলার চর গঠিত। কয়েকশত বছরের পুরানো এ দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮১ বর্গ কিলোমিটার। মনোরম এ দ্বীপটিতে বহু জেলে পরিবারের বসবাস, যাদের প্রধান পেশা মাছধরা এবং শুটকি তৈরী করা। এ দ্বীপে অবস্থানরত জেলেরা ছাড়াও মৌসুমে ইলিশ শিকারের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জেলেরা এখানে এসে জড়ো হয়। এ দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ প্রতিবছর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া হিন্দুদের রাশমেলা। বহু পুরানো হওয়া সত্ত্বেও এখানে নাগরিক সুবিধা আজো তেমন প্রসারিত হয়নি। দ্রুত উন্নয়নের আওতায় এনে পর্যটন ও জনবসতি গড়ে তোলার পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো স্থান।

১৩. চর কুকরি মুকরি :

ভোলা থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দুরে এ দ্বীপের অবস্থান। ১৯৮৯-৯০ সময়ে বন বিভাগ এখানে ব্যাপক আকারে ম্যানগ্রোভ বনায়ন শুরু করে। বর্তমানে এ দ্বীপে ৮,৫৬৫ হেক্টর বন বিভাগ রয়েছে, যারমধ্যে ২১৭ হেক্টর বন্য প্রাণীদের অভয়ারণ্য এবং অবশিষ্ট ৪,৮১০ হেক্টর চাষাবাদের আওতাধীন জমি। কৃষি ও মৎস শিক্যর এ দ্বীপের অধিবাসীদের প্রধান পেশা। প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যে ঘেরা এ দ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা পর্যাপ্ত বৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যটন বিকাশ ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের সম্ভাবনা যাছাই করা উচিত।

SIFBD

১৪. ভাসান চর :

বঙ্গোপসাগরের তীর থেকে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার আওতাধীন এ চরের আয়তন ১১৬ বর্গ কিলোমিটার। ২০০৬ সালের দিকে এ দ্বীপ জেগে উঠে, বর্তমানে সেখানে রোহিঙ্গা পূনর্বাসন চলছে। জোয়ারের পানি প্রতিরোধে এ দ্বীপে বেরি বাঁধ নির্মাণ জরুরি। অপরুপ সৌন্দর্যের অধিকারি এ দ্বীপে পর্যটনের ব্যাপক সম্ভাবনা বিরাজমান।

১৫. ঢাল চর :

বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার আওতাধীন চরফ্যাশন উপজেলার মনপুরা থানায় ”ঢাল চর” অবস্থিত। মেঘনা নদীর বুকে জেগে উঠা ছোট্ট এ দ্বীপে বর্তমানে প্রায় ১৩,০০০ জনসংখ্যার বসবাস রয়েছে। মেঘনার খরস্রোতে এ চরের পূর্বাংশে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গনের ফলে চরের আয়তন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, যা ঠেকানো গেলে চরটি রক্ষা পেত অনায়াসে। পর্যটন উন্নয়নে এ চরের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

৬) পাহাড়িয়া অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে না পারা :

বাংলাদেশে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৮৪টি পাহাড় রয়েছে, যারমধ্যে কেউকারাডং সবচেয়ে উচু পর্বত হিসাবে পরিচিত। এদেশে নিরবচ্ছিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে Chottogram Hill Tracts অন্যতম, যা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা নিয়ে গঠিত, যার সন্মিলিত আয়তন ১৩,২৯৪ বর্গ কিলোমিটার, দেশের সামগ্রিক আয়তনের প্রায় এক দশমাংশ। ২০২১ সাল নাগাদ এ অঞ্চলে বসবাসরত সন্মিলিত জনসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ১.৬ মিলিয়ন, যাদের সিংহভাগই উপজাতি গোষ্ঠি। জুম চাষ এবং পাহাড়ের গায়ে অন্যান্য কৃষির আবাদই এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নয়নের কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষ অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে। দীর্ঘসময় আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও গৃহ যুদ্ধের কারণে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রায় এবং হিংসা, হানাহানি ও সন্ত্রাস সেখানে নিত্যদিনের সঙ্গী। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারনে এখানে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের চোঁয়া খুব কমই লেগেছে, যদিও বর্তমান সরকারের আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে দু-একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম প্রসারের তৎপরতা চলছে।

CDRB Survey 1999 অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলসমূহে ভূমির পরিমাণ সন্মিলিতভাবে ৩২.৮৫ লক্ষ একর, তন্মধ্যে ২০.৪৭ লক্ষ একর বনভূমি, যা পার্বত্য অঞ্চল সমূহের মোট ভূমির ৬২.৩১% এবং দেশের মোট বনভূমির প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই সামান্য সেখানে, মোট ভূমির ৯ শতাংশ বা ৩.০ লক্ষ একর মাত্র স্মারণী-৫.১৩(৫) ।

স্মারণী- ৫.১৩(৫) : **Land Use Pattern in Hill Tracts :-**

'000' Acers

Land Use Pattern	Banderban	Khagrachari	Rangamati	Total
Total Area	1,107	667	1,511	3,285
Not for Cultivation	580	167	8	755
Forest	305	371	1,371	2,047*
Cultivable Waste	117	40	15	172
Total Cropped Area	90	64	146	300*
Net Cropped Area	63	42	109	214

Source : CDRB Report 1999

পাহাড়িয়া অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে না পারা :

যেহেতু পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতা রয়েছে, অথচ সেখানকার অধিবাসীদের প্রধান পেশা কৃষি, সঙ্গত কারণে সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন মান অনুন্নত হতে বাধ্য, যদিনা অন্য কোনো পন্থায় তাদের কর্মসংস্থান বা আয় রোজগারের পথ প্রসস্ত করা যায়। তাছাড়া, দেশের মোট ভূখন্ডের এক দশমাংশ ভূমি (পাহাড়ি বনাঞ্চল) থেকে জি.ডি.পিতে কি পরিমাণ অবদান রাখছে সেটাও দেখার বিষয়। প্রকৃত অর্থে দেশের বেশিরভাগ পাহাড় গাছ গাছড়াহীন, ঐ সমস্ত পাহাড়ের বেশিরভাগ অংশে গাছ না থাকার ফলে অনেক পাহাড়ের মাটি ক্রমান্বয়ে পাথরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং গাছ জন্মানোর অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এমনিতে বাংলাদেশ বনজ সম্পদ আহরণের দিক থেকে অনেক বেশি পশ্চাদপদ। তারউপর পাহাড়গুলো যদি ক্রমান্বয়ে গাছ জন্মানোর অযোগ্য হয়ে পড়ে তাহলে আগামীতে বনজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে আরোও পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা দুরুহ হয়ে পড়বে, যার সুদুর প্রসারি প্রভাবে দেশের আবহাওয়ায় বড় আকারের পরিবর্তন অবধারিত, সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যা বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

কাজেই, সময় এসেছে পার্বত্য অঞ্চল গুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সবল করার এবং সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়ার। যেহেতু আমাদের ভূমি সীমিত, প্রযুক্তিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আগামীতে দেশের অর্থনীতির দ্রুত প্রসার নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন দেশের প্রতিটি খন্ড জমি থেকে সর্বোচ্ছ উৎপাদন বের করে তা জাতীয় অর্থনীতিতে যোগ করবার। বিশেষকরে, ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরনে এ পলিসি কঠোরভাবে কাজে লাগানো উচিত। শুধুমাত্র তৈরী পোশাক রপ্তানি ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উপর নির্ভর করে আগামীতে পথ চলা হবে চরম বোকামি।

ক) দেশের পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :-

১) পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড় সমূহে পরিকল্পিত উপায়ে প্রতিবছর হেলিকপ্টারের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে দুর্গম পাহাড় গুলোতে প্রচুর গাছ জন্মায়। যা দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বনজ শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

২) পাহাড় সমূহের উন্নয়নে এবং পাহাড়ে বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে সেখানে গবেষনাগার স্থাপন করা।

৩) কৃষি বিভাগের মাধ্যমে পাহাড়ী অঞ্চল সমূহকে পরিকল্পিত উপায়ে চাষাবাদের আওতায় এনে সেখানে বিভিন্ন ফল, কাজু বাদাম, মসলা জাতিয় পণ্য (যেমন- গোলমরিচ, এলাচ, দারচিনি, আদা, হলুদ ইত্যাদি) ব্যাপক আকারে চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহন করা, যাতে ঐ সমস্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয় রোজগার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে ফল ও মসলার চাহিদা পূরণ হয়।

৪) সেখানে বানিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল ইত্যাদির খামার গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

৫) পার্বত্য অঞ্চল সমূহের সাথে রাজধানী ও অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে আরোও অধিক পরিমাণে মানুষ সেখানে বসবাস করতে আগ্রহী হয়, যারা ঐ সমস্ত অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবে।

৬) পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত প্রতিটি পরিবারের জন্য রেশন কার্ড, বয়স্ক ভাতা এবং সঞ্চয়ের আওতায় সরকারি প্রভিডেন্ড ফান্ড সুবিধা প্রদান করা।

৭) পার্বত্য অঞ্চল সমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা।

৮) আকর্ষনীয় স্পট গুলোতে পর্যটন প্রসারে হোটেল, মোটেল ও অন্যান্য সুবিধা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা।

৯) পার্বত্য অঞ্চল সমূহের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা ; এবং

১০)পাহাড়ি সংস্কৃতির প্রসারকল্পে সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধিকরা।

৭) মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দয্য থাকা সত্বেও পর্যটন উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা :

মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দয্য থাকা সত্বেও পর্যটন উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা :

অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। নদীমাতৃক এ দেশের শ্যামল প্রকৃতি, উষ্ণ আবহাওয়া, ষড়ঋতুর বৈচিত্রতা, সবুজে ঘেরা অসংখ্য ছোটবড় পাহাড়, প্রাকৃতিক ঝর্ণা ও হ্রদ, বৈচিত্রেভরা সুন্দরবন আর বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমূদ্র সৈকতের অধিকারি এদেশের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস, স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। পর্যটনের জন্য এমন আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত দেশ পৃথিবীতে আরেকটি বিরল। বিশ্বের ছোটবড় প্রায় সকল দেশই পর্যটনকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আসছে এবং পর্যটন শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি পর্যটক আকর্ষণপূর্বক পর্যটনের পাশাপাশি এখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতসমূহ, যেমন হোটেল, মোটেল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদিক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বাংলাদেশ পর্যটনখাতে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করলেও পর্যটনখাতের অজস্র সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পর্যটনকে পরিচিত করে তোলা বাংলাদেশের পক্ষে আজো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। ফলে পর্যটনখাতে এদেশের আয়, এখাতে কর্মসংস্থান এবং গ্লোবাল র‌্যাংকিং এ বাংলাদেশের পর্যটনখাত অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। Travel and Tourism Competitiveness Report, 2019 অনুযায়ী ১৪০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম, যেখানে জাপন ৪র্থ, চীন ১৩তম, দ. কোরিয়া ১৬তম, সিঙ্গাপুর ১৭তম, মালয়েশিয়া ২৯তম, থাইল্যান্ড ৩১তম, ভারত ৩৪তম, ইন্দানেশিয়া ৪০তম, ভিয়েতনাম ৬৩তম, ফিলিপাইন ৭৫তম, শ্রীলংকা ৭৭তম, কম্বোডিয়া ৯৮তম, নেপাল রয়েছে ১০২তম এবং পাকিস্তান ১২১তম স্থানে রয়েছে। (বিস্তারিত : অধ্যায়- ৫.১৬)।

স্মারণী-৫.১৩(৬): গ্লোবাল ট্যুরিজম র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

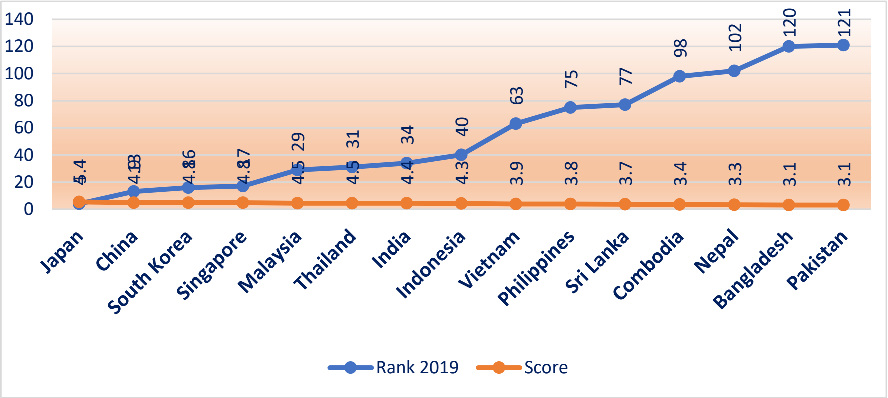

Source: Travel and Tourism Competitiveness Report, 2019 Note: Lower Rank indicates higher position.

৮) কর্মক্ষম যুবশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারা :

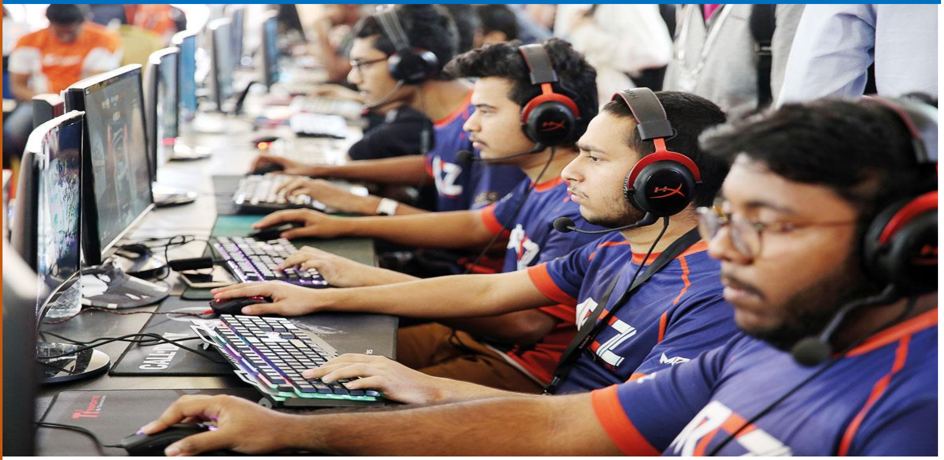

কর্মক্ষম যুবশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারা :

"গ্লোবাল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স" এর মূল্যায়নে বিগত বছরগুলোতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। HDI Index 2000 অনুযায়ী ১৮৯ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম, ২০১০ সাল নাগাদ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়ে ১২৯তম স্থানে পৌঁছে। কিন্তু, ২০১৫ সাল নাগাদ আবার অবনতি হয়ে ১৪২তম স্থানে পৌঁছায় এবং ২০১৯ সাল নাগাদ যা পৌঁছায় ১৩৫তম স্থানে। ২০১৫-২০১৯ সময়কালে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৭ ধাপ।

২০১৯ সাল নাগাদ মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও মিয়ানমার ছাড়া অন্যান্য সকল দেশের তুলনায় যথেষ্ট পেছনে অবস্থান করছে। HDI Rank ২০১৯ অনুযায়ী ১৮৯ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম, যেখানে মালয়েশিয়া ৬১তম, শ্রীলংকা ৭১৪তম, থাইল্যান্ড ৭৭তম, চীন ৮৫তম, পিলিপাইন ১০৬তম, ইন্দোনেশিয়া ১১১তম, ভিয়েতনাম ১১৮তম, ভারত ১২৯তম এবং ভূটান ১৩৪তম স্থানে রয়েছে ।

স্মারণী-৫.১৩(৭): ২০১৯ সাল নাগাদ মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

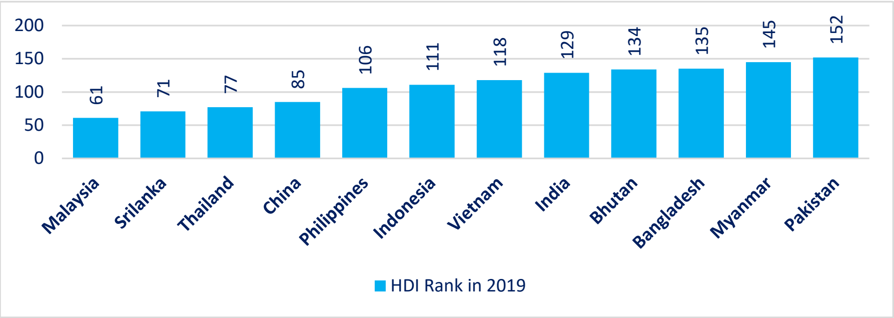

Source: UNDP Note: Higher value indicates lower rank

ঙ) খনিজ সম্পদ :

বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের পর্যাপ্ততা :

ভূতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশ বেঙ্গল অববাহিকার একটি বৃহত্তর অংশ দখল করে আছে, যার প্রায় ১২% পলল পাথর, ৮% উত্তীর্ণ প্লাইষ্টোসিন রেসিডিয়াম এবং ৮০% অনিয়ন্ত্রিত বালি, পলি ও কাদামাটি নিয়ে গঠিত। একটি ভিন্ন ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে অবস্থিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদে, যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চুনাপাথর, হার্ডরক, কঙ্কর, পাথর, কাঁচের বালি, নির্মাণ বালি, সাদামাটি, ইটের কাদামাটি, পিট এবং সৈকত বালির ভারী খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তেল ও গ্যাসের নির্গমন পথে তৃতীয় বারাইল শৈলগুলি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল তৈরি করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে ভাল প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, ফলে দেশে শিল্পায়ন ও ব্যবসা বানিজ্যের পরিধি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খনিজ সম্পদ শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল, নির্মাণ কাজ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং জ্বালানি ও শক্তি উৎপাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে খনিজ সম্পদ দেশের অর্থনীতির জন্য শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনও বটে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের বহুমুখি ব্যবহার রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে তুলেধরা হলো :-

খনিজ সম্পদ :

ক) **শিল্পের কাঁচামাল :** খনিজ সম্পদ বহু শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। যেমন, পানি বিশুদ্ধকরন, কাঁচ ও সিরামিক্স এর তৈজসপত্র তৈরি, নির্মাণ কাজ এবং গলফ্ কোর্স এন্ড স্পোর্স ফিল্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিলিকা বালি ও লাইমষ্টোন এবং ক্লে সিমেন্টের কাঁচামাল হিসাবে বহুল ব্যবহৃত উপাদান।

খ) **জ্বালানি ও শক্তির উৎস :** বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প ও আবাসিক ক্ষেত্রে জ্বালানির অন্যতম উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও জ্বালানি তেল।

গ) **নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের উপাদান :** হার্ডরক, নির্মাণ বালি, কঙ্কর ইত্যাতি খনিজ সম্পদ ইমারত ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের প্রধান উপাদান

তবে একথা সত্য যে খনিজ সম্পদের দিকথেকে বাংলাদেশ তত সমৃদ্ধ নয় এবং আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ সমূহের অনেকগুলোই পরিমাণে অপর্যাপ্ত এবং নিন্মমানের এবং ঐ সমস্ত খনিজ সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহারের যথাযথ ধারণা ও প্রযুক্তি কোনোটাই আমাদের নেই। ফলে এ যাবত আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ সমূহের মধ্যে একমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাতিত অন্যান্য খনিজ সম্পদের বানিজ্যিক উত্তোলন ও ব্যবহার যথাযথভাবে নিশ্চিত করা আজো সম্ভবপর হয়ে উঠছেনা, উদাহরণস্বরুপ পিট। (সুত্র : জার্নাল, বিভিন্ন রিচার্চ পেপার ও নিজস্ব বিশ্লেষণ)

বাংলাদেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিন্মে তুলেধরা হলোা :-

HARD ROCK :

HARD ROCK

হার্ড রক সাধারণতঃ বেসমেন্ট অথবা স্পটিকের বেসমেন্ট নামে পরিচিত, যা গ্রানাইট বা মার্বেলের মত একীভূত শিলা। দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় মাটির ১২৮ ফুট গভীরে অজস্র পরিমাণে হার্ড রকের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা ১৯৯৮ সালে আবিষ্কৃত হয় এবং ২০০৭ সাল থেকে উত্তোলন শুরু হয়। তাছাড়া, রংপুরের রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জে ১৭১-২৬৫ মিটার গভীরতায়, বগুড়ায় ২,১৫০ মিটার, জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জে ৬০০-৬৬৭ মিটার এবং রাজশাহীতে ৬১৫ মিটার গভীরতায় প্রচুর হার্ডরকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এছাড়া, দিনাজপুর জেলার তেতুলিয়া ও পঞ্চগড়ে এবং বৃহত্তর চট্রগ্রামের বহুস্থানে, যেমন- কাপ্তাই, আলীকদম, উখিয়া, টেকনাফ ও সেন্টমার্টিনের পৃষ্ঠভাগে বেল্ডার ও কঙ্কর ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে।

Lime Stone :

Lime Stone

লাইম ষ্টোন মূলতঃ সিমেন্টের প্রধান কাঁচামাল। তাছাড়া, কাগজ, ইস্পাত, চিনি, কাঁচ ও চুন তৈরিতেও এটি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ১৯৫৭ সালে সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রথম চুনাপাথর পাওয়া যায়। তারপর ১৯৫৮ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্তান (জি.এস.পি) ঐ স্থান সার্ভে করে ০.৬০ বর্গ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে ১.৮০ মিলিয়ন টন শেলী ও কেরোলিন জাতীয় চুনাপাথর চিহ্নিত করে, যার গুণগতমান তত উন্নত ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৫১-১৯৫৭ সময়কালে সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট অঞ্চলে ছোট আকারের চুনাপাথর পাওয়া যায়। জি.এস.পি ঐ

অঞ্চলে মাটির ৩০-১০০ মিটার নিচে চুনাপাথরের অস্তিত্ব নিশ্চিত করে, যেখানে ০.৭৭ বর্গ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে প্রায় ১৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন চুনা পাথর মজুদ রয়েছে। কিছু স্তানে বিশেষ করে লারঘাট এলাকায় এ চুনাপাথর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬-১০ মিটার নিছে অবস্থিত।

উপ-পৃষ্ঠের চুনাপাথর প্রথম আবিষ্কার হয় ১৯৬৭ সালে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে তৎকালিন বাংলাদেশ সরকার এ খনি থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে চুনাপাথর উত্তোলনের অনুমতি দেয়। ৬.৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এ খনিতে মজুদ চুনাপাথরের পরিমাণ প্রায় ২৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

- **PEAT :**

PEAT

পিট ঘরোয়া জ্বালানি, ইটভাটা ও বয়লারে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের উত্তর-পূবাঞ্চল, মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ব্রাম্মণবাড়ীয়া ও কিশোরগঞ্জের জলাভূমিতে প্রায় ৫৫০ বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে পিটের অস্তিত্ব রয়েছে, যার আনুমানিক মজুদের পরিমাণ ১৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও বেশি। তবে দেশে পিটের বানিজ্যিক ব্যবহার না থাকার ফলে পিটের উৎপাদন আজো শুরু হয়নি।

SJFBD

- **GLASS SAND :**

glass sand

কাঁচের বালি কাঁচ তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলাদেশের শেরপুর, হবিগঞ্জের শাহজিবাজার ও তেলিয়াপাড়া, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এবং চট্রগ্রামের হাটহাজারিতে প্রচুর পরিমাণে এ বালি মজুদ রয়েছে। তাছাড়া দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুরের খালিশপুরে মাটির উপরিভাগে কাঁচ বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের ভূতাত্বিক জরিপ (জি.এস.পি) ১৯৬০ সালে শেরপুর জেলার শ্রীবার্দিতে প্রথম কাঁচবালি আবিষ্কার করেন। সেখানে ০.১৫-২.১৩ মিটার পুরু ৩০টি লেন্সে ০.৫৯৬ বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে আনুমানিক ০.৬৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন কাঁচবালি মজুদ রয়েছে। তাছাড়া হবিগঞ্জে ০.১৫-১.৮০মিটার পুরু ০.৯৮১১ বগকিলোমিটার জায়গাজুড়ে ০.৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কাঁচবালি মজুদ রয়েছে।

- **White clay**

বাংলাদেশের নেত্রকোনা, শেরপুর ও চট্রগ্রাম জেলার বিভিন্নস্থানে বিস্তর পরিমাণে হোয়াইট ক্লে (সাদা মাটি) মজুদ রয়েছে। তাছাড়া, দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া,বড়পুকুরিয়া, দিঘীপাড়া এবং নওগাঁ জেলার পাটনিটালায় সাদা মৃত্তিকার মজুদ রয়েছে। উন্মুক্ত সাদামাটি মানের দিকথেকে ভাল না হওয়ার কারণে

White clay — উচ্চমানের আমদানিকৃত কাদামাটির সাথে মিশ্রিত করে এটি বাংলাদেশে সিরামিকস্ কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

Reserve of Heavy Minerals :

SL	Minerals	Reserve (M. Ton)
1	Zircon	158
2	Rutile	70
3	Ilmenite	10,25,558
4	Kyanite	96,709
5	Garnet	90,745
6	Magnetite	80,599
7	Monazite	17,352

Source: Journal of Environmental Agricultural Science.

তাছাড়া, অন্যান্য খনিজ সম্পদ, যেমন- বীচ বালি, ইট বালি এবং বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী (নির্মাণ বালি, নুড়ি পাথর) ইত্যাদি অজশ্র পরিমানে মজুদ রয়েছে। (সোর্স : বাংলাপেডিয়া)

চ) খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

Minerals and Energy Resources

খনিজ সম্পদ প্রতিটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার সঠিক ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত পৃথিবীর সমস্ত দেশ খনিজ সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরুপ আমেরিকা, রাশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের বহু দেশের কথা বলা যায়।

বাংলাদেশ আকারে ছোট হলেও, এখানে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের পরিমাণ একেবারে কম নয়। কিন্তু প্রাপ্ত খনিজ সম্পদসমূহের বানিজ্যিক উত্তোলন এবং এসব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের

খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার বাস্তব ধারণা ও প্রযুক্তি দুটোরই ঘাটতি রয়েছে এদেশে। ফলে বহু খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এযাবৎ বানিজ্যিক ভিত্তিতে আহরণ ও ব্যবহার চলছে গুটিকয়েক সম্পদের, যারমধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাপকভাবে এবং কয়লা, তেল, হার্ডরক, চুনাপাথর ও অন্যান্য দু-একটি আইটেম আংশিকভাবে। তাছাড়া, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশে নতুনভাবে খনিজ সম্পদ আবিষ্কারে অনুসন্ধান কার্যক্রম একদমই সীমিত হয়ে পড়েছে, ফলে বিগত এক দশকে দেশে নতুন কোনো খনিজ সম্পদের আবিষ্কার হয়নি বলা চলে।

প্রতিটি খনিজ সম্পদই সম্ভাবনাময়, যার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার বাস্তব সন্মত পরিকল্পনা ও দক্ষতা প্রয়োজন, ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থানপেতে বাংলাদেশের জন্য যা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশকে একটি টেকসই অর্থনীতির দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে অবশ্যই এদেশে বিদ্যমান খনিজ সম্পদ সমূহের পর্যাপ্ত আহরণ এবং এর যথাযথ ব্যবহারের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এযাবৎ আবিস্কৃত খনিজ সম্পদসমূহের বানিজ্যিক উত্তোলন এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে এবং আরোও খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র উপহার দিতে একটি দূরদর্শী ও কার্যকরি খনিজ সম্পদ নীতিমালা এ মূহুর্ত্বে খুব বেশি প্রয়োজন।

দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নে প্রস্তাবনা সমূহ নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১. একটি দূরদর্শী ও বাস্তবসন্মত **"খনিজ সম্পদ নীতিমালা"** প্রণয়ণ, যে নীতিমালার আওতায় দেশে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, উত্তোলন এবং আবিস্কৃত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

২. খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ জোরদার করা, বিশেষ করে খনি ও পরিবেশগত বিষয়, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও দূশন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন।

৩. খনিজ সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের সাথে প্রযুক্তি আদান প্রদান এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা।

৪. ইতিমধ্যে আবিস্কৃত খনিজসম্পদ সমূহের বানিজ্যিক উত্তোলন এবং উহাদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নতুন খনিজসম্পদ আবিষ্কারে দেশি ও বিদেশি ভালো মানের প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. খনিজ সম্পদ বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে রপ্তানি বাজার অন্বেষণ।

SJFBD

****

অধ্যায় : ৫.১৪

বন ও পরিবেশ উন্নয়ন।

বন ও পরিবেশ উন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বনজ সম্পদ।

খ) দেশের বিভিন্ন ধরনের বনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
   ১) পার্বত্য বনাঞ্চল।
   ২) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।
   ৩) সমতলে শালবন।

গ) বাংলাদেশের বন সেক্টরের মূল্যায়ন।
   ১) দেশের প্রাকৃতিক বনভূমির পরিসংখ্যান।
   ২) বনভূমির পরিমাণের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
   ৩) বাংলাদেশের বনভূমির ধরন ও শ্রেণীবিভাগ।

ঘ) অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনভূমির গুরুত্ব।

ঙ) জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান।

চ) বন সেক্টরে কর্মসংস্থান।

ছ) বন ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ।

জ) ফরেষ্ট সেক্টর উন্নয়নে এস.ডি.জি-১৫ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

ঝ) বন ও পরিবেশ উনয়নে প্রস্তাবনা।

ক) বনজ সম্পদ :

বনজ সম্পদ :

মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন রক্ষায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃতি ও জীবন রক্ষায় বন কার্বন সঞ্চয় ও কার্বন সিন্ক হিসাবে কাজ করে, অক্সিজেন উৎপন্ন করে, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষায় যা অপরিহার্য। তাছাড়া, হাইড্রোলজিক্যাল চক্র নিয়ন্ত্রণ, গ্রহীয় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, পানি বিশুদ্ধকরন, বন্য প্রাণী জগতের জন্য বাসস্থান প্রদান, বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস, বিষাক্ত গ্যাস ও শব্দ দুষণ হ্রাস, মাটি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, ঝড় ও ভূমিধ্বস প্রতিহত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করে এবং পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলে। এ কারণে কোনো দেশের মোট ভূখন্ডের অন্তত এক তৃতীয়াংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন, যা ঐ দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে।

২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে শ্রেণীবদ্ধ বনাঞ্চলের পরিমাণ আনুমানিক ১.১২ মিলিয়ন হেক্টর, যা মোট ভূমির প্রায় ১৬.৭%, যারমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ সরকারি বনাঞ্চল ১৪.৯% এবং অবশিষ্ট ১.৮% গ্রামাঞ্চলের বনাঞ্চল। টপোগ্রাফির ভিত্তিতে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, ১) পার্বত্য বন ২) সমতলে শালবন ; এবং ৩) ম্যানগ্রোব বনাঞ্চল, FAO Report 2000 অনুযায়ী যার পরিমান নিম্নরুপ :-

পার্বত্য বনাঞ্চল	৫০৮,৯৯১ হেক্টর	৪৫.০৮%
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল	৪৮৯,৮৭২ হেক্টর	৪৩.৭০%
সমতলে সালবন	১২১,৮৮৪ হেক্টর	১০.৯০%

২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মোট আয়তন ১৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার, যারমধ্যে কৃষি ভূমি ৫৯%, সরকারি বনাঞ্চল ১৫%, নদী ও জলাভূমি ৬%, ভিলেজ ট্যান্ক ৫%, গ্রামীণ বনভূমি ২%, আরবান স্যাটেলমেন্ট ১% এবং অন্যান্য খাতে ব্যবহৃত ১২% স্মারণী-৫.১৪(১) ।

স্মারণী-৫.১৪(১) : ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট ভূমির বিন্যাস (শতাংশ হারে) :-

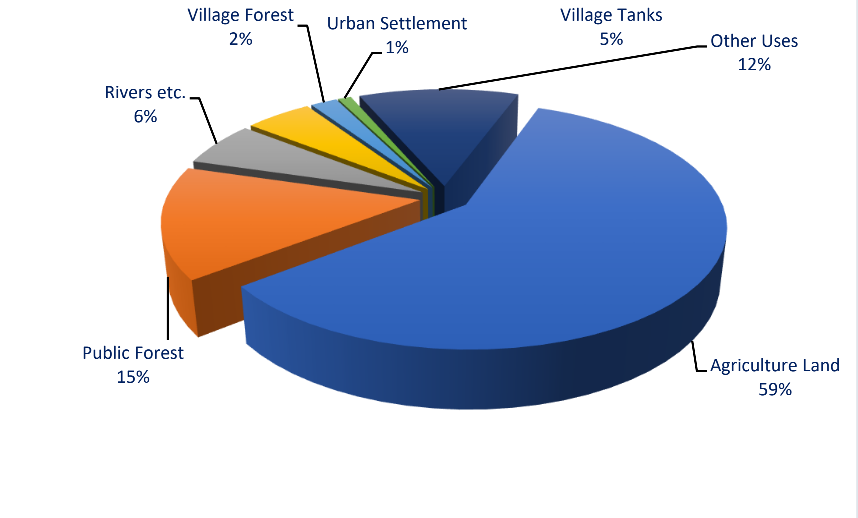

Source: FAO Report 2000

SJFBD

খ) দেশের বিভিন্ন ধরনের বনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

পার্বত্য বনাঞ্চল :

১) পার্বত্য বনাঞ্চল :

পাহাড় ও পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত বনাঞ্চলই পার্বত্য বনভূমি, যা গ্রীষ্মকালীন চিরসবুজ ও আধা চিরসবুজ গাছপালার সমন্বয়ে গঠিত। দেশের মোট বনভূমির প্রায় অর্ধেক পাহাড়ি বনাঞ্চল। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেটের মৌলভী বাজার ও হবিগঞ্জে পাহাড়ি বনাঞ্চল অবস্থিত। বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, বাঁশ, বেত, ঝোপঝাড় ও জীববৈচিত্র নিয়ে এ সমস্ত বনাঞ্চল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এ সমস্ত বনাঞ্চল স্থানীয় জ্বালানি ও শিল্প কারখানার কাঁচামালের চাহিদা মিটানোর জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ গাছালির অন্যতম ভাডার।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল :

২) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল :

বাংলাদেশে দুই ধরনের ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট রয়েছে, সুন্দরবন এবং উপকূলীয় চরাঞ্চলের বনভূমি।

সুন্দরবন : বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বেসিনে ১৪০,০০০ হেক্টর জায়গাজুড়ে অবস্থিত সুন্দরবন বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোব ফরেষ্ট, যার ৬০% বাংলাদেশে এবং ৪০% অংশ ভারতের সীমানায় অবস্থিত। সুন্দরবন সাধারণত তিনটি জোনে বিভক্ত - সামান্য লবণাক্ত, মাঝারি লবণাক্ত ও লবণাক্ত জোন। বনের উত্তর পূর্বাংশে সামান্য লবণাক্ত জোন অবস্থিত, যা গঙ্গা থেকে মিষ্টি জল সরবরাহ গ্রহণ করে। মাঝারি লবণাক্ত জোনটি বনের মাঝামাঝি অংশে অবস্থিত এবং বনের অবশিষ্ট অংশ লবণাক্ত জোন।

সুন্দরবন একটি উচ্চ উৎপাদনশীল ম্যানগ্রোভ জলাভূমি বাস্ততন্ত্র। সামাজিক, অর্থনৈতিক, জীববৈচিত্র ও পরিবেশগত দিকথেকে এ বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অবদান প্রচুর, যাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বহু লোকের জীবন জীবিকা পরিচালিত হয় এবং বিশাল জীববৈচিত্রের মিলনমেলা এ সুন্দরবন।

সমতলে শালবন :

৩)সমতলে শালবন :

এটি একটি ”ট্রপিক্যাল ময়েষ্ট ডিজিটাইস” টাইপ বনাঞ্চল, যা শাল নামে এক প্রজাতির গাছদ্বারা আচ্ছাদিত। সালবন সাধারণত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আসাম থেকে পাঞ্জাব, মধ্য ভারতের পূর্ব জেলাসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় গুলোতে বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশের মধ্য ও নিন্মাঞ্চল সমুহে বেশিরভাগ শালবন অবস্থিত, যদিও পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এ বনের আকার অনেকটা সীমিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের প্রায় ১,২১,০০০ হেক্টর জায়গাজুড়ে শালবন রয়েছে, যা দেশের মোট বনভূমির প্রায় ৩২%। এ দেশের বেশিরভাগ শালবন গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর এবং রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। বড় শালবন সমূহের বেশিরভাগ বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত।

গ) বাংলাদেশের বন সেক্টরের মূল্যায়ন :

দেশের প্রাকৃতিক বনভূমির পরিসংখ্যান

১) দেশের প্রাকৃতিক বনভূমির পরিসংখ্যান :

বাংলাদেশের মোট ভূমির পরিমাণ কম বেশি ১৪৭,৫৭,০০০ হেক্টর, ২০১৫ সাল নাগাদ সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে দেশে মোট প্ল্যানন্টেশন এরিয়া আনুমানিক ২৪,৯১,৫৫৫ হেক্টর (১৬.৮%), ২০২০ সাল নাগাদ যা ২০% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বিগত ৫০ বছরে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে প্রায় ২০৯,০০০ হেক্টর জমিতে বনায়ন হয়েছে এবং এ সময়কালে প্রায় ৪৫,০০০ হেক্টর জমি বনভূমি থেকে চাষাবাদের আওতায় এসেছে। প্রতিবছর সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। বনভূমি রক্ষায় সরকারি তৎপরতার কমতি না থাকলেও দেশে প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগতভাবেই কমছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে ১৯৯০ সময়কালে দেশে প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ ছিল সব মিলিয়ে ৬,৪৩,৬০০ হেক্টর, ২০১৫ সালে যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫০২,২৮০ হেক্টর। এ ২৫ বছরের ব্যবধানে দেশে প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ১৪১,৩২০ হেক্টর, গড়ে প্রতিবছর হ্রাস পেয়েছে ৫,৬৫২.৮০ হেক্টর।

স্মারণী-৫.১৪(২) : ১৯৯০ - ২০১৫ সময়কালে দেশে প্রাকৃতিক বনভূমি সংকোচনের চিত্র :-

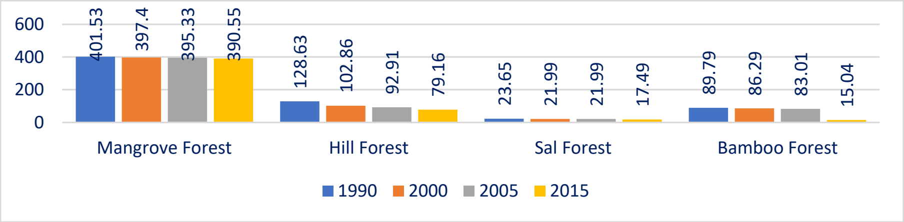

World Bank Report

বনভূমির পরিমাণের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

২) বনভূমির পরিমাণের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগতভাবেই কমছে। ১৯৯০ সালে দেশে প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ ছিল ৬৪৩,৬০০ হেক্টর, ২০১৫ সাল নাগাদ যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫০২,২৮০ হেক্টর। বন উজাড় করে চাষাবাদ, বসতবাড়ী নির্মাণ, শিল্পকারখানা স্থাপন এবং আরোও বহুবিধ কারণে দেশে প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগতভাবেই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে মোট ভূখন্ডের অনুপাতে বনভূমির অংশ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক কম। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ভূখন্ড অনুপাতে বনভূমির অংশ ১১%, ঐ সময়ে চীনে যা ২২.১%, ফিলিপাইনে ২৭%, থাইল্যান্ডে ৩২.১%, মিয়ানমারে ৪৪.২%, ভিয়েতনামে ৪৭.৬%, ইন্দোনেশিয়ায় ৫৩% এবং কম্বোডিয়ায় ৫৩.৬% স্মারণী-৫.১৪(৩) ।

স্মারণী-৫.১৪(৩) : ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের মোট ভূমি অনুপাতে সরকারি বনভূমির হার (%) :-

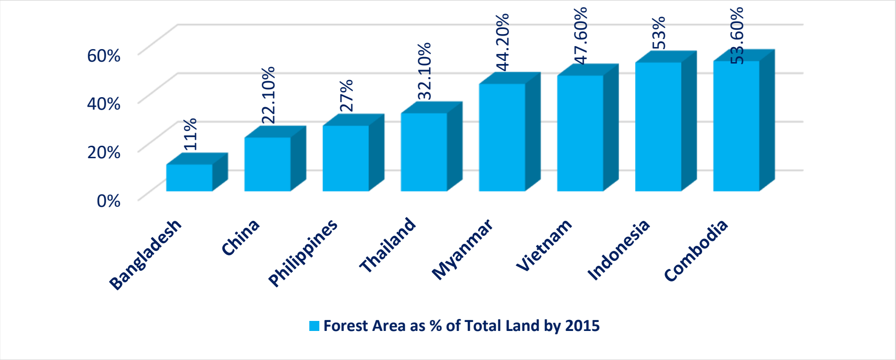

Source: FAO Report 2015

বাংলাদেশের বনভূমির ধরন ও শ্রেণীবিভাগ :

৩) বাংলাদেশের বনভূমির ধরন ও শ্রেণীবিভাগ :

১৯৯৯ সালের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে শ্রেণীবদ্ধ ও অশ্রেণীবদ্ধ মিলিয়ে বনভূমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৪৮ মিলিয়ন হেক্টর, যারমধ্যে সরকারি বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২.২১ মিলিয়ন হেক্টর এবং বেসরকারি বনভূমির পরিমাণ ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর। সরকারি সেক্টরে ২.২১ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমির মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট ৬৭.১৪%, অশ্রেণীবদ্ধ ষ্টেট ফরেষ্ট ২৯.৮৫%, প্রোটেক্টেড ফরেষ্ট ১.৭৪%, খাস ফরেষ্ট ০.৪৬%, অর্জিত ফরেষ্ট ০.৪৩% এবং ভেস্টেড ফরেষ্ট ০.৩৮%।

স্মারণী-৫.১৪(৪) : দেশে শ্রেণীবদ্ধ ও অশ্রেণীবদ্ধ মিলিয়ে মোট বনভূমির শ্রেণীবিভাগ :-

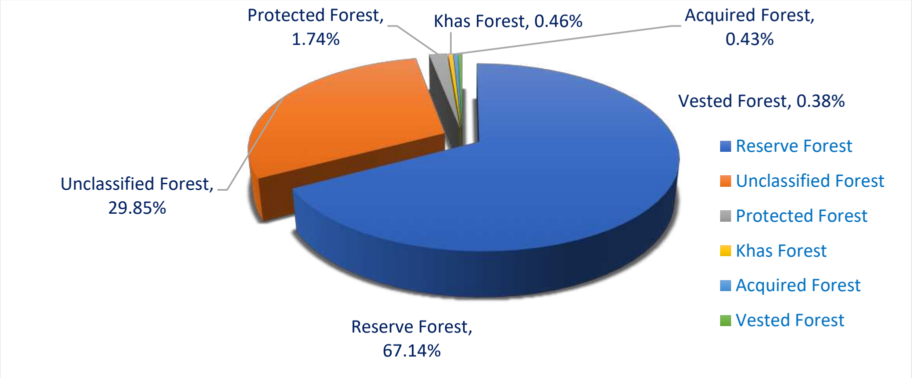

Source: FAO Report

অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনভূমির গুরুত্ব :

ঘ) অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনভূমির গুরুত্ব :

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির অবদান বহুবিধ। জ্বালানি কাঠ সরবরাহ, শিল্পের কাঁচামাল জোগান, জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি সরাসরি অবদান রাখে। তাছাড়া, দেশে বনভিত্তিক শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমস্ এর মাধ্যমে ভূমির সুরক্ষা, জল নিয়ন্ত্রণ ও মাটি গঠন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কাজগুলি বনভূমির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, বার্ষিক ভিত্তিতে হিসাব করলে যাদের আর্থিক মূল্য বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির প্রধান প্রধান গুরুত্বাবলি সমূহের মধ্যে রয়েছে :-

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিক ঝুকি মোকাবেলায় জোয়ারের ঢেউ, সামুদ্রিক ঝড়, সাইক্লোন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে ম্যানগ্রোভ ও উপকুলীয় বনাঞ্চল সমূহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।
- বাতাশে অতিরিক্ত কার্বন নিঃশরণ জনিত সমস্যা নিরসনে অধিক পরিমাণে গাছ লাগানো ও বনায়ন সৃষ্টির বিকল্প নেই, কেননা গাছ কার্বন শোষনের মাধ্যমে আবহাওয়ার উন্নয়ন ঘটায়।
- বন জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করা ছাড়াও শিল্পের কাঁচামাল জোগান দেয়, যেমন কাগজ শিল্পের জন্য বাঁশ, আশবাবপত্রের জন্য কাঠ এবং দেশে বনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে সহায়তা করে। তাছাড়া, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বন দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে।
- ন্যাচারাল ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে ভূমির ক্ষয়রোধ, জল নিয়ন্ত্রণ ও মাটি গঠণপূর্বক বনভূমি দেশের জন্য বড় আকারের আর্থিক উপকার করে থাকে।

জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান :

ঙ) জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান :

বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ তুলনামূলক কম হওয়ায় এবং দেশে বনভিত্তিক শিল্প, যেমন- কাগজ, পাল্প, আসবাবপত্র ও বন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পের পর্যাপ্ত বিকাশ না ঘটায় এ সেক্টরের আর্থিক পরিধি ও এ সেক্টরে কর্মসংস্থান আজো অনেক সীমিত। ফলে জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান অদ্যাবধি একদমই সীমিত। অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অংশগ্রহণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ ১২ বছর সময়কালে জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান ১.৬২% - ১.৮২% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বছরে গড়ে যা ১.৭২% স্মারণী-৫.১৪(৫) ।

স্মারণী-৫.১৪(৫) : অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জি.ডি.পি তে বন সেক্টরের অবদান:

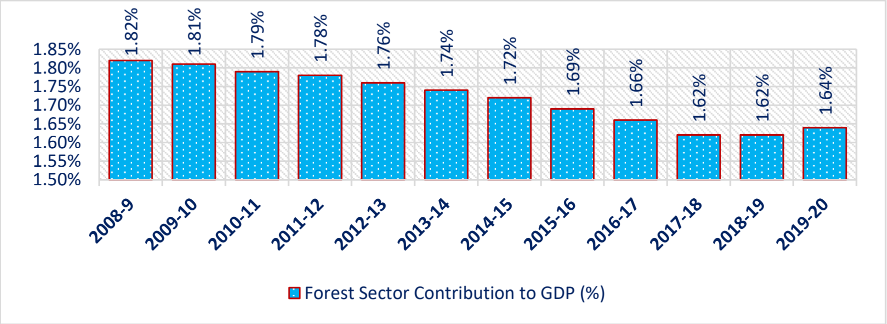

Source: BD Economic Review

চ) বন সেক্টরে কর্মসংস্থান :

বন সেক্টরে কর্মসংস্থান :

দেশে বন ও বন সংশ্লিষ্ট শিল্পের পর্যাপ্ত প্রসার না ঘটায় এ সেক্টরে কর্মসংস্থান অদ্যাবধি একদমই সীমিত, দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশের তুলনায় যা অনেক কম, দীর্ঘ সময়ধরে যা প্রায় একই অবস্থানে রয়ে গেছে। বন সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রসারে বিগত সরকারগুলোর কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় এবং এ সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় মূলত এ স্থিতাবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ২০১১ সালের তথ্যানুযায়ী ঐ সময়ে মোট কর্মসংস্থান অনুপাতে বন সেক্টরে কর্মসংস্থান বাংলাদেশে ০.১%, ভারতে ০.১%, শ্রীলংকায় ০.৩%, দ. কোরিয়ায় ০.৪%, ভিয়েতনামে ০.৫%, ইন্দোনেশিয়ায় ০.৫%, থাইল্যান্ডে ০.৬%, জাপানে ০.৬%, ভূটানে ০.৭% এবং মালয়েশিয়ায় ১.৭%।

স্মারণী-৫.১৪(৬) : ১৯৯০ থেকে ২০১১ সময়কালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অনুপাতে বন সেক্টরে কর্মসংস্থানের চিত্র :

Country	Year (Employment as % of total labor force)					
	1990	1995	2000	2005	2010	2011
Malaysia	2.4	2.9	2.2	2.1	1.8	1.7
Bhutan	1.5	1.3	2.6	1.0	0.9	0.7
Japan	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6
Thailand	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6
Indonesia	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5
Vietnam	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5
S. Korea	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
Sri Lanka	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
India	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Bangladesh	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Source: FAO Report 2011

ছ) বন ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

বন ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

বিশ্বব্যাপি আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে যে সমস্ত দেশ পরিবেশগত ঝুকির শীর্ষে রয়েছে, বাংলাদেশ তাদের একটি। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে নিচু জমি, দারিদ্রতা, অনুন্নত অবকাঠামো এবং আবহাওয়াজনিত সমস্যা মোকাবেলায় স্বল্প জ্ঞানের কারণে বাংলাদেশে এ সমস্যা আরোও প্রকট আকার ধারণ করছে। পরিবেশগত যে সমস্ত সমস্যা বাংলাদেশ বর্তমানে মোকাবেলা করছে, তন্মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানিতে ধাতব দূষণ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, ঝড়, সাইক্লোন ও জ্বলোস্বাস বেড়ে যাওয়া, উষ্ণতা, অতিবৃষ্টি এবং সমূদ্রে পানির স্তর বেড়ে যাওয়া অন্যতম, যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সন্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি এ সমস্ত সমস্যার বাস্তবসন্মত সমাধান ব্যাতিত আগামীতে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে এটা নিশ্চিত। সুদূরপ্রসারি এ সমস্ত সমস্যা সমূহ বাস্তবসন্মতভাবে মোকাবেলা করতে তাই প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকরি পরিকল্পণা এবং এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ।

আশার কথা হচ্ছে, পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমূহ মোকাবেলায় বর্তমান সরকার EFCC CIP 2016-2021 বাস্তবায়ন করছে, যে প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ইকোসিস্টেমস এর মানোন্নয়নপূর্বক দেশে দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ ও

স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের মানোন্নয়ন এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশে EFCC সেক্টরের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিপূর্বক এ সেক্টরের চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানে EFCC CIP একটি কৌশলগত কাঠামো, যা বাংলাদেশ সরকার এবং উহার উন্নয়ন অংশীদারগণের বিনিয়োগের জন্য EFCC সেক্টরের অগ্রাধিকার খাতসমূহ চিহ্নিত ও বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। উল্লেখ্য, EFCC CIP একটি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিমাপ ও ফ্রেমওয়ার্ক , যা বাংলাদেশ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) এর বরাবরে উপস্থাপন করেছে।

EFCC CIP 2016-21 পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

স্মারণী-৫.১৪(৭) : Total estimated cost of EFCC CIP 2016-21, existing financing and financing gap :-

No.	Program Title	Financing Proposal (US$ Million)			
		CIP Total	Existing Financing	Financing Gap	Gap (%)
Pillar 1 : Sustainable Development and management of Natural Resources :					
1.1	Enhance sustainable management and socioeconomic benefits from Forests.	885.0	54.2	830.8	94%
1.2	Biodiversity Conservation	538.5	44.9	493.6	92%
1.3	Sustainable management of wetlands, rivers and marine ecosystems.	693.1	490.5	202.6	29%
1.4	Soil and groundwater management	343.5	52.8	290.7	85%
	Total (Pillar 1) :	**2,460.1**	**642.3**	**1,817.8**	**74%**
Pillar 2 : Environmental Pollution Reduce and Control :					
2.1	Reduce Industrial Pollution	651.6	65.0	586.0	90%
2.2	Reduce Municipal and household pollution.	2,869.2	1,040.5	1,828.7	64%
2.3	Reduce pollution from agriculture and others	196.6	3.3	195.3	98%
	Total (Pillar 2) :	**3,719.4**	**1,108.8**	**2,610.6**	**70%**
Pillar 3 : Adaption and Resilience to, and Mitigation of Climate Change :					
3.1	Disaster risk reduction	1,654.7	724.1	930.6	56%
3.2	Sustainable Infrastructure development	2,202.4	1,705.5	496.9	23%
3.3	Mitigation and Low Carbon development	783.3	455.6	327.7	42%
3.4	Increase resilience at community level	251.6	36.2	215.4	86%
	Total (Pillar 3) :	**4,892.0**	**2,921.4**	**1,970.6**	**40%**
Pillar 4 : Environmental Governance , Gender, Human and Institutional capacity Development :					
4.1	Improve Legislative, Regulatory and Policy framework	82.5	6.5	76.0	92%
4.2	Improve stakeholders participation and gender equality in EFCC sectors.	416.5	4.3	412.2	99%
4.3	Improve Organizational capacity for evidence based decision making.	109.0	29.6	79.4	73%
	Total (Pillar 4) :	**608.0**	**40.4**	**567.6**	**93%**
	Total Cost of CIP	**11,679.5**	**4,713.0**	**6,966.5**	**60%**

Source: FAO Report (EFCC : Environment, Forestry and Climate Change CIP: Country Investment Plan)

জ) ফরেষ্ট সেক্টর উন্নয়নে এস.ডি.জি-১৫ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন :

ফরেষ্ট সেক্টর উন্নয়নে এস.ডি.জি টার্গেট ১৫ বাস্তবায়ন :

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDG Target 15 : Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. ২০১৫ সালে এস.ডি.জি টার্গেট ১৫ ”এস.ডি.জি গোল ২০৩০” এর অন্তভূক্ত করা হয়, যা ফরেষ্ট সেক্টরের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এস.ডি.জি টার্গেট ১৫ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়সমূহ হচ্ছে :-

- আন্তর্জাতিক চুক্তি সমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০ সাল নাগাদ প্রাকৃতিক ও আভ্যন্তরীণ মিঠাপানির ইকোসিস্টেমস্ এবং এতদসংক্রান্ত পরিসেবাগুলির যথাযথ সংরক্ষণ, পুণরুদ্ধার এবং এগুলোর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সবধরনের বনাঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপানা নিশ্চিতের পাশাপাশি বন উজাড় বন্ধ করা, অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধার এবং বিশ্বব্যাপি পর্যাপ্ত পরিমাণে বনায়ন ও বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংস রোধ, জীববৈচিত্র রক্ষা এবং হুমকিতে থাকা ও বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষনে ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সুরক্ষায় এবং পাচার রোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহন করা; এবং
- জাতিয় পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং দারিদ্র বিমোচনের কৌশলেরক্ষেত্রে ন্যাচারাল ইকোসিস্টেমস্ এবং জীববৈচিত্রের যথাযথ মূল্যায়ন ও কাজে লাগানো।

ঝ) বন ও পরিবেশ উনয়নে প্রস্তাবনা :

উন ও পরিবেশ উনয়নে প্রস্তাবনা :

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব ও অবদান সীমাহীন। বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে বন সংশ্লিষ্ট শিল্প, যেমন কাগজ, আসবাবপত্র, হ্যান্ডিক্রাফটস ও বনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প প্রসারের মাধ্যমে এ সেক্টরে অর্থনৈতিক প্রবাহ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে আরোও গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কেননা, বাংলাদেশের পেক্ষাপটে এ সেক্টর উন্নয়নের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। একমাত্র বন সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সমস্যার সমাধান বহুলাংশে সম্ভব।

আশার কথা হচ্ছে, বর্তমান সরকার দেশের বন ও বনজ সম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে। বন সেক্টর উন্নয়নে ন্যাশনাল ফরেষ্ট পলিসি ২০১৬ (ড্রাফ্ট) প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে বন সেক্টর সম্প্রসারণ ও জীববৈচিত্র রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশে মূল ভূমির ২০% বৃক্ষায়নের আওতায় নিয়ে আসার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যাক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, এ সেক্টরের দ্রুত উন্নয়নে ফরেষ্ট মাষ্টারপ্ল্যান ২০১৬-২১ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার মূল লক্ষ্য সমূহ হুবাহু নিন্মে তুলেধরা হলো :-

1. To bring 20% of the geographical area of the country under forest and tree cover with minimum canopy density of 50%.
2. To conserve the remaining natural sal, hill and mangrove forests and to prevent further degradation or deforestation.
3. Strengthen the conservation of wildlife and biodiversity
4. Creation of a strong coastal shelterbelt of climate resilient plantations on newly accreted charlands and other unused public lands.
5. To improve the socioeconomic condition of the forest dependent communities.
6. To develop forest products industries and occupations in order to generate more employment opportunities.
7. To strengthen applied forestry research including on current and emerging issues like impacts of climate change, so that informed interventions can be planned and implemented.
8. To strengthen the forestry sector institutions in order to enable them to deliver on all the goals.

প্রস্তাবনা সমূহ :-

বন সেক্টর উন্নয়নে বর্তমান সরকারের উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট সুদূরপ্রসারি, যা ভবিষ্যতে এ সেক্টরের টেকসই উন্নয়নে বড় আকারের ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং দেশের পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সমস্যার সুরাহা করবে নিঃসন্দেহে। বন, পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তন উন্নয়নে সরকারের গৃহীত উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন সেক্টরের সম্পৃক্ততা আরোও বৃদ্ধি করতে নিন্মোক্ত পদক্ষেপসমূহ এ সেক্টরের উন্নয়নের গতিশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে আশাকরি :-

১. দেশের পাহাড়সমূহ এবং পার্বত্য বনাঞ্চল সমূহের বেশিরভাগই গাছ গাছড়াহীন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকাসমূহে হেলিকপ্টারের সাহায্যে বীজ ছিটিয়ে দেশের সকল পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহকে বৃক্ষায়নের আওতায় নিয়ে আসা।

২. পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাহাড় ও পাহাড়ি অঞ্চল সমূহে দেশি বিদেশি ফল চাষ, মসলা জাতিয় পণ্য, যেমন- লং, এলাছি, দারচিনি ইত্যাদি চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. বঙ্গোপসাগরের বুকে গজিয়ে উঠা দ্বীপসমূহকে দ্রুত বনায়নের আওতায় এনে সেখানে সম্ভাব্য পর্যটন ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা।

৪. দেশে বন ও বনসংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নে গবেষণার মাত্রা বৃদ্ধি করা।

৫. বন ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন দেশের সাথে এ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

৬. দেশে বন ব্যবস্থাপনায় উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

৭. বন বিভাগের দক্ষতা ও জনবল দুটোই পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা।

৮. পরিবেশ উন্নয়নে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে দেশে বনাঞ্চল বৃদ্ধির পাশাপাশি নগরায়ন, নদীশাসন এবং শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় আরোও সচেষ্ট হওয়া।

৯. পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু ঝুকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করা; এবং

১০. বাংলাদেশ যেহেতু আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে পরিবেশগত ঝুকির মধ্যে থাকা শীর্ষ দেশসমূহের তালিকায় রয়েছে, সেহেতু ক্ষতিপূরণ আদায়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ বিষয়ে বাংলাদেশের আরোও সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

SIEBD

অধ্যায় : ৫.১৫

পানি ও নদী সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা।

পানি ও নদী সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বাংলাদেশে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
 ১) বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের ধরণ।
 ২) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকির দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান।
 ৩) বাংলাদেশে বন্যার বয়াবহতা বৃদ্ধির কারণ সমূহ।

খ) পানির উৎস ও পানিজনিত দুর্যোগ সমূহ।
 ১) বাংলাদেশে পানির প্রধান উৎস দুটি : ভূপৃষ্ঠের জল ও ভূগর্ভস্থ জল।
 ২) শুস্ক মৌসুমে পানির চাহিদা এবং সরবরাহ।

গ) দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র।
ঘ) দেশে বন্যার স্থায়ী সমাধানে প্রস্তাবনা।

ক) বাংলাদেশে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

বাংলাদেশে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

ভৌগলিক ও জটিল টোপোগ্রফিক বৈশিষ্ট্য এবং নদ নদীর আধিক্যের কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দূর্যোগ প্রবণ ও বন্যা কবলিত এলাকা। হিমালয় থেকে উৎপন্ন গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র ও মেঘনা নদী ছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় নদী এদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নিচু ভূমি হওয়ার কারণে বর্ষা মৌসুমে দেশের অধিকাংশ এলাকা এমনিতেই জলে সয়লাব হয়ে যায়। তার উপর বর্ষা মৌসুমে হিমালয় থেকে প্রবাহিত জলরাশি ভারতের জলরাশির সাথে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রতিবছর সারাদেশে বিশেষ করে দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে মারাত্মক বন্যার সৃষ্টি করে হাজার হাজার কাঁচা ঘরবাড়ি, লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমির শস্য ও অজস্র রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং নদীভাঙ্গনের ফলে প্রতিবছর কয়েক হাজার পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে পথে নামে, যা এদেশের অগণিত মানুষের জীবনমান বিনষ্ট করার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

অন্যদিকে, গ্রীষ্ম মৌসুমে দেশের অধিকাংশ নদ নদীর পানি শুকিয়ে যায়, পাশাপাশি ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকরা নদীসমূহের পানি ফারাক্কা ও অন্যান্য বাঁধের মাধ্যমে ভারত আটকে দেয়, ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রয়োজনীয় জলের অভাবে দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে চাষাবাদ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়, যা এদেশে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭২ থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ২৯৭টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে, যার প্রায় ২৮.৯৬% বন্যা। বিভিন্ন সুত্রমতে বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ গড়ে প্রায় ইউ.এস.ডলার ২.২ বিলিয়ন, যা বার্ষিক জি.ডি.পির ১.৫%। স্মারণী-৫.১৫(১) এর মাধ্যমে ১৯৮৩ থেকে ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশে সংঘটিত বড় আকারের বন্যাসমূহের দ্বারা আক্রান্ত ভূমির পরিমাণ তুলেধরা হলো।

উপরোক্ত ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও বন্যা পরবর্তী সময়ে উপদ্রুত এলাকাসমূহে পানিবাহিত ও অন্যান্য রোগ বালাই ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং পশুখাদ্যের অভাবে প্রতিবছর বহু গৃহপালিত পশু মারা যায়। বর্ষা মৌসুমে নদ নদীর পানি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দেয়, যাতে প্রতিবছর অসংখ্য ঘরবাড়ি ও আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়, যারফলে নদী তীরবর্তী শত শত পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে।

SJFBD

স্মারণী-৫.১৫(১) : বিগত ১৯৮০ থেকে ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশে সংঘটিত বড় আকারের বন্যাসমূহের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ভূমির পরিমাণ (বর্গ কিলোমিটার) :-

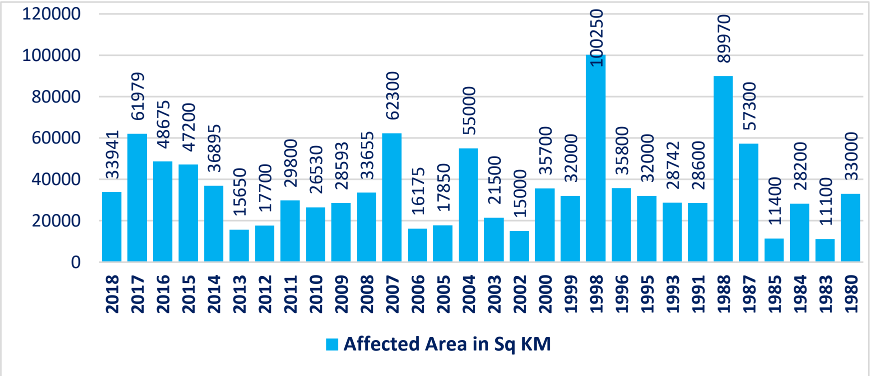

Source: Annual Flood Report 2019

বাংলাদেশে সংঘঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের ধরণ :

১) বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের ধরণ :

শুধু ঝড়, জ্বলোশ্বাস ও বন্যা নয়, ভৌগলিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ প্রায় সবধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে, যারমধ্যে ঝড় ৪৭.৪৭%, বন্যা ২৮.৯৬%, মহামারি ৯.৭৬%, চরম তাপমাত্রা ৭.৪১%, ভূমিকম্প ৩.০৩%, ভূমিধ্বস ১.৬৮% এবং খরা ১.৬৯% স্মারণী-৫.১৫(২) ।

স্মারণী-৫.১৫(২) : ১৯৭২ থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও হার (%) :-

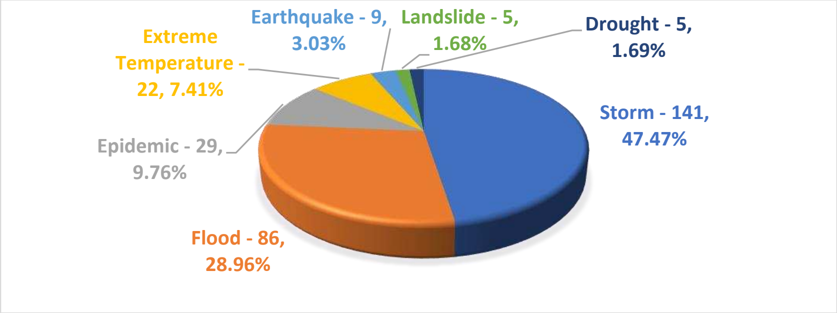

Source: Omniscience Journal, Volume 8

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকির দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

২) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকির দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকির দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ১০টি ঝুকিপূর্ণ দেশের একটি। ১৯৯৯-২০১৮ এ বিশ বছর সময়কালে বাংলাদেশ প্রকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে মোট ১৯১ বার। একই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে মিয়ানমার আক্রান্ত হয়েছে ৫৫ বার, পাকিস্তান ১৫২, নেপাল ১৮০, ভিয়েতনাম ২২৬ এবং ফিলিপাইন ৩১৭ বার। Global Climate Risk Index 2020 অনুযায়ী ১৯৯৯-২০১৮ সময়কালে প্রাকৃতিক দৃর্যোগের ঝুকির দিকথেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। এ তালিকায় প্রথম অবস্থানে রয়েয়েছে পোর্টোরিকো, মিয়ানমার দ্বিতীয়, হাইতি তৃতীয়, ফিলিপাইন চতুর্থ, পাকিস্তান পঞ্চম, ভিয়েতনাম ষষ্ঠ, বাংলাদেশ সপ্তম, থাইল্যান্ড অষ্টম, নেপাল নবম এবং ডোমিনিকা দশম স্থানে রয়েছে স্মারণী-৫.১৫(৩)।

স্মারণী-৫.১৫(৩) : ১৯৯৯-২০১৮ সময়কালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকির দিকথেকে বিশ্বের ১০টি সব চেয়ে ঝুকিপূর্ণ দেশের অবস্থান :-

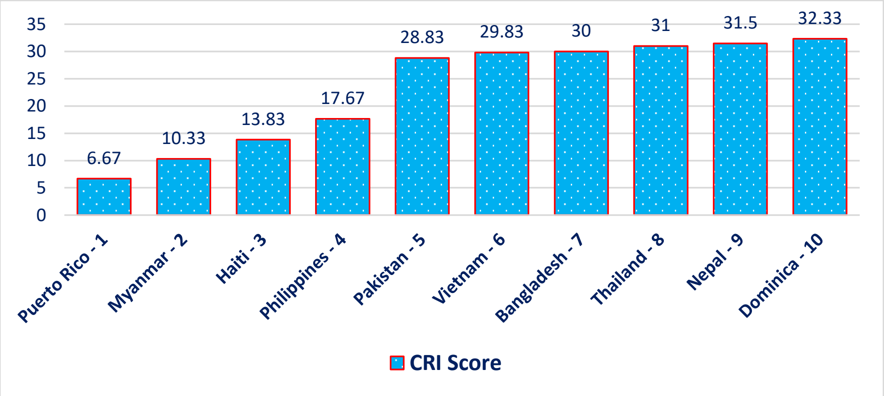

Source: Global Climate Risk Index 202

বাংলাদেশে বন্যার বয়াবহতা বৃদ্ধির কারণ সমূহ :

৩) বাংলাদেশে বন্যার বয়াবহতা বৃদ্ধির কারণ সমূহ :

বিশ্বের বহুদেশে বিশেষকরে ভৌগলিকভাবে নিছু দেশসমূহে বন্যা ও জলাবদ্ধতা একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশের নিছু ভূমি, অসখ্য ছোটবড় নদী, অতিবৃষ্টি এবং হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করা একাধিক নদী এ সমস্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তাছাড়া প্রধান প্রধান নদী সমূহের নাব্যতা ও প্রশস্ততা ঠিক রাখতে নিয়মিত খনন না করা, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং নদী ও খাল দখল ও ভরাট ইত্যাদি কারণও এজন্য বহুলাংশে দায়ী। ফলে প্রতিবছর বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের সহজাত সসমস্যায় রুপ নিয়েছে, যা দেশে চাষাবাদ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীনৈতিক উন্নয়নেরক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। বাংলাদেশে বন্যা ও জলাবদ্ধতার করণ দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাকৃতিক ও মনষ্যসৃষ্ট কারণ।

বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রাকৃতিক কারণ সমূহ :-

১) নিচু ভূমি ও সমুদ্র পৃষ্ঠথেকে কম উচ্চতা।
২) নদ নদী ও জলাভুমির সংখ্যা বেশি।
৩) অতিমাত্রার বৃষ্টি।
৪) ভারতের উপর দিয়ে বয়ে আসা নদীসমূহ বর্ষামৌসুমে অতিমাত্রাই পানি বয়ে নিয়ে আসা।

বন্যা ও জলাবদ্ধতার মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ :-

১) নদী ও খাল অবৈধ দখল ও ভরাট।
২) নিয়মিত নদী খনন না করায় পানি নিষ্কাষণে প্রতিবন্ধকতা।
৩) অপরিকল্পিত নগরায়ন।
৪) বিশ্বব্যাপি পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সমূদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া।
৫) ভারত কতৃক বাঁধ নির্মাণ ও পানি নিয়ন্ত্রণ করা।
৬) ভাঙ্গনকবলিত এলাকা সমূহে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ না করা।

খ) পানির উৎস ও পানিজনিত দুর্যোগ সমূহ :

পানির উৎস ও পানিজনিত দুর্যোগ সমূহ :

১) বাংলাদেশে পানির প্রধান উৎস দুটি : ভূপৃষ্ঠের জল ও ভূগর্ভস্থ জল।

ভূপৃষ্ঠের জল : বাংলাদেশে ভূপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক জলের উৎস দুটি, বর্ষার জল এবং বিভিন্ন নদী ও শাখানদী সমূহের মাধ্যমে ভারত ও মিয়ানমার থেকে বয়ে আসা জল। বর্ষা মৌসুমে স্থানীয় বৃষ্টির পানি ও আশপাশের দেশসমূহ থেকে বয়ে আসা পানি মিলিয়ে গঙ্গা, যমুনা ও ব্রম্মপুত্র এ তিনটি প্রধান নদীতে আনুমানিক ৮,০০,০০০ মিলিয়ন ঘণমিটার পানির সমাগম ঘটে, ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চল সমূহ ব্যাপকভাবে প্লাবিত ও বন্যাকবলিত হয়ে প্রতিবছর প্রচুর শস্যহানি, কাঁচাঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো বিনষ্ট করে। তাছাড়া, অন্যান্য নদ নদীর পানিও তখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেমন : -

- বর্ষায় প্রধান প্রধান নদী সমূহে অস্বাভাবিক পানিবৃদ্ধি পাওয়ার কারণে "বর্ষাকালিন বন্যা"।
- পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের নদ নদীসমূহে জলাবদ্ধতার কারণে স্থানীয় বন্যা।
- জুন - আগষ্ট সময়কালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে সারাদেশে বন্যা; এবং
- উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে উচ্চ জোয়ার এবং ঝড়ের উৎস দ্বারা সৃষ্ট বন্যা।

ভূগর্ভস্থ জল : বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চল সমূহে পানীয় জলের জন্য এবং শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য কিছু পাহাড়ি অঞ্চল ব্যাতিত পুরো দেশই ভূগর্ভস্ত জলের উপর নির্ভরশীল। এখানে ভূগর্ভস্থ জল প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, তবে বুয়েট গবেষণা ২০০৪ অনুযায়ী বিবিধ কারণে এদেশে স্বাস্থসন্মত পানীয় জলের অভাব রয়েছে, যেমন :-

- পানিতে আর্শেনিকের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি।
- অতিরিক্ত পরিমাণ দ্রবীভূত লৌহা।
- উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের পানিতে লবণাক্ততা।
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া ; এবং
- পাহাড়ি অঞ্চল সমূহে শিলা / পাথরের স্তর।

এ সমস্ত কারণে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ অতিবৃষ্টি সমৃদ্ধ ও নদীমাতৃক এবং প্রচুর জলের সমাগম থাকা সত্বেও ভবিষ্যতে এখানে স্বাস্থ্যসন্মত পানিয় জলের সংকট আসন্ন।

SIFBD

২) শুষ্ক মৌসুমে পানির চাহিদা এবং সরবরাহ :

কৃষিনির্ভর এদেশের প্রায় ৮০% জনগোষ্ঠী কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত। দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের কৃষি সেক্টরের উপর বাড়তি খাদ্যোৎপাদনের চাপ। ফলে কৃষি সেক্টরে পানির চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে নদনদী গুলোতে অঢেল পানি থাকলেও, শুষ্ক মৌসুমে নদ নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি কাজে পানির অভাব দেখা দেয়, যা পুরোপুরি ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা মিটানো হয়।

দেশে প্রাকৃতিক জলের মূল উৎস প্রধান প্রধান নদী ও শাখা নদী সমূহ। বাংলাদেশের ৮০% অঞ্চল গঙ্গা, যমুনা ও ব্রম্মপুত্র বেসিনের প্লাবন ভূমিতে অবস্থিত হলেও, এদেশের মাত্র ৭-৮% অঞ্চল এ বেসিনের মধ্যে অবস্থিত। নিম্ন বেসিনের কারণে শুষ্ক মৌসুমে ঐ সমস্ত নদ নদীসমূহের পানির প্রবাহ পুরোপুরি ভারতের সাথে নদী ব্যবস্থাপনায় বিতরণকৃত পানির উপর নির্ভরশীল। ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে দেশের কৃষি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ঠিক রাখার ক্ষেত্রে যা রীতিমত ঝুকিপূর্ণ। ভারত কর্তক গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে শুষ্ক মৌমুমে

শুষ্ক মৌসুমে পানির চাহিদা এবং সরবরাহ :

বাংলাদেশে পানি প্রবেশের মূল স্রোতধারা ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকে। জানুয়ারি থেকে মে এ পাঁচ মাস বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৭ সালে সম্পাদিত আন্তঃ চুক্তির আওতায় শুষ্ক মৌসুমে দু-দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টিত হয়, যা নিম্নের চকে তুলেধরা হলো :-

10 day period		Total supply at Farakka (cusecs)	Amount for India		Amount for Bangladesh	
			cusecs	%	cusecs	%
January	1-10	98,500	40,000	40.6	58,500	59.4
	11-20	89,750	38,500	42.9	51,250	57.1
	21-31	82,500	35,500	42.4	47,500	57.6
February	1-10	79,250	33,000	41.6	46,250	58.4
	11-20	74,000	31,500	43.2	42,000	56.1
	21-28/29	70,000	30,750	43.9	39,250	57.6
March	1-10	65,250	26,750	41.0	38,500	59.0
	11-20	63,500	25,500	40.2	38,000	59.8
	21-31	61,000	25,000	41.0	39,250	59.0
April	1-10	59,000	24,000	40.7	35,000	59.3
	11-20	55,500	20,750	37.4	34,750	62.6
	21-30	55,000	20,500	37.3	34,500	62.7
May	1-10	56,500	21,500	38.1	35,000	61.9
	11-20	59,250	24,000	40.5	35,250	59.5
	21-31	65,500	26,750	40.8	38,750	59.2

Source: PRIO Report 2013

গ) দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র :

বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম পুরোপুরি এবং পরিবেশগত অনেক বিষয় পানির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, যা এদেশের মানুষের জীবন জীবিকা ও সামগ্রিক অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পানির পর্যাপ্ততা যেমন কৃষিকাজের জন্য অপরিহার্য, তেমনি পানি সংকটের কারণে কৃষি কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। পানিসম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাই প্রয়োজন দেশে উন্নত ও টেকসই পানি ও নদী সম্পদ ব্যবস্থাপনা। পানি ও নদী সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে বন্যার কবলথেকে সফলভাবে দেশকে রক্ষা করার মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষকদের রক্ষা করা এবং শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য

পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ। বর্তমানে পানি সংরক্ষনের অন্যতম উৎসগুলি হচ্ছে বিভিন্ন নদ নদী, খালবিল, ঝিল, পুকুর, লেক ও ইরিগেশন প্রকল্পসমূহ।

দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র :

বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনার অন্যতম জটিলতা হচ্ছে, বর্ষা মৌসুমে ভারত থেকে বয়ে আসা পানির ঢল যেমন পুরো দেশে বন্যা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, গ্রীষ্ম মৌসুমে গঙ্গার উপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশে মারাত্মক পানি সংকটের সৃষ্টি করে। ফলে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং সেখানকার কৃষকেরা অবর্ণনীয় ক্ষতির সন্মুখীন হয়। উন্নত পানি ও নদী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতপূর্বক বন্যা প্রবণতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি শুস্ক মৌসুমের জন্য পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে গ্রীষ্ম ও বর্ষা দুই মৌসুমেই দেশের নিন্মাঞ্চল ও নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে মারাত্মক এ দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করে তাদের জীবন মান উন্নয়ন ব্যাতিত গত্যান্তর নেই। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পানি ও নদী ব্যবস্থাপনায় এযাবৎ বিভিন্ন সরকারের আমলে কমবেশি নিয়ম নীতি প্রণীত হয়েছে এবং ঐ সমস্ত নিয়মনীতির আওতায় দেশের প্রধান নদীসমূহে পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যার মধ্যে আছে :-

- National Water Policy (1999);
- Coastal Zone Policy (2005);
- Coastal Development Strategy (2006);
- National Water Management Plan 2011 ; and
- Bangladesh Water Act 2013.

উন্নত ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের নদ নদীসমূহের পানি নিয়ন্ত্রণ এবং চাষাবাদ, শিল্প ও অন্যান্য কাজে পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্যে এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির বড় সম্ভাবনা লুকায়িত। বর্ষা মৌসুমে দ্রুত পানি নিঃস্কাশন এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যারজন্য প্রয়োজন দেশের প্রধান প্রধান নদ নদীসমূহের নাব্যতা ও প্রশস্ততা ঠিক রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং এবং ভাঙ্গন কবলিত এলাকা সমূহে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সঠিক পন্থায় নদী শাসন, পানি নিঃস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পার্শ্ববর্তী দেশ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করা নদীসমূহের পানির সঠিক বন্টনে কার্যকর চুক্তি। অন্যথায় বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে পানির অভাবে এদেশের মানুষের দুর্ভোগ সহজে নিরাময় হওয়ার নয়। তাছাড়া, শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উপর নির্ভর না করে দেশে পানি ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থা ক্ষতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে । কেননা, এযাবৎকালের অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ভারত কখনো বাংলাদেশের পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সুযোগ দেবেনা।

SIPBD

ঘ) দেশে বন্যার স্থায়ী সমাধানে প্রস্তাবনা :

দেশে বন্যার স্থায়ী সমাধানে প্রস্তাবনা :

প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশ বন্যা প্রবণ অঞ্চল হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে বন্যা বাংলাদেশের বিশাল অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জীবনে একটি বড় সমস্যা, যা প্রায় প্রতিবছরই ঘটে। প্রতিটি বন্যায় গড়ে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভূমি প্লাবিত হয়, যা কৃষি সেক্টরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করার পাশাপাশি অসখ্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো বিনষ্ট করে বিপুল মানুষের জীবন জীবিকায় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে, বিশেষ করে ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশ অক্ষুন্ন রাখতে দেশের প্রতিটি অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্ববহ করে তোলা আবশ্যক, যারজন্য প্রয়োজন বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

দেশে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে হলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে চলমান প্রক্রিয়া সমূহের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নে বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, যার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পণা এবং বড় অংকের বাজেট।

দেশে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রয়োজন :-

১) **অবকাঠামো উন্নয়ন :** খরস্রোতা নদীসমূহের তীর ভাঙ্গন রোধ, প্লাবন রোধ ও স্রোতের গতি পরিবর্তনে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ।

২) **নদী ড্রেজিং :** নদীর স্রোতপ্রবাহ ঠিক রাখতে এবং ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নদী ও শাখা নদীসমূহে নিয়মিত ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩) **খাল খনন :** নিম্নাঞ্চল সমূহ থেকে দ্রুত বন্যার পানি নিঃষ্কাশনে ঐ সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক খাল খনন এবং পূণঃ খনন।

৪) **ভূমিক্ষয় রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ :** ভূমিক্ষয় জলাবদ্ধতার আরেকটি কারণ। ভূমিক্ষয় রোধে স্থানীয় কৃষি অফিস সমূহের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এলক্ষ্যে চাষাবাদে নিয়মনীতি মানতে উদ্বুদ্ধ করা।

৫) **বেসিনভিত্তিক যৌথ কার্যক্রম :** গঙ্গা, যমুনা ও ব্রম্মপুত্র বেসিনে স্রোত নিয়ন্ত্রণে ভারতের সাথে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থায় এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা।।

৬) **নদী ও খালসমূহ দখলমুক্ত করা :** বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে দখলকৃত নদী ও খাল সমূহ পুরোপুরি দখলমুক্ত করে পুণঃ খননের মাধ্যমে পানি চলাচল নির্বিগ্ন করা।

৭) **পরিকল্পিত নগরায়ন :** সঠিক উপায়ে পানি নিঃষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক পরিকল্পিত উপায়ে নগরায়ন।

৮) **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা :** পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে সচেষ্ট হওয়া জরুরি।

৯) **বড় আকারের সমীক্ষা পরিচালনা :** পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বড় আকারের সমীক্ষা পরিচালনা পূর্বক বিভিন্ন দেশের আলোকে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা; এবং

১০) **সক্ষমতা অর্জন :** প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অধিকতর সক্ষমতা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

SJFBD

অধ্যায় : ৫.১৬

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প।

১) দেশে বিদেশি পর্যটক আগমনের পরিসংখ্যান।

খ) পর্যটনখাতে বার্ষিক রেভিনিউ।

গ) জি.ডি.পি ও কর্মসংস্থানে পর্যটনখাতের অংশ।

ঘ) বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

১) বাংলাদেশ কেন পারবেনা ?

২) পর্যটক আকর্ষণে ব্যাতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পর্যটন কেন্দ্রসমূহ।

ঙ) পর্যটন শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

ক) বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প :

বাংলাদেশের পর্যটনখাত :

"পর্যটন শিল্প" বর্তমান বিশ্বে একটি অতিদ্রুত বর্ধনশীল একক শিল্প। বিশ্বের বহু দেশে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে এ শিল্পকে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস হিসাবে ব্যবহার করে দেশের অর্থনীতির অভাবনীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ রয়েছে যেসব দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ পর্যটনশিলেল্পর উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ২০১৯ সালে পর্যটন খাত থেকে জি.ডি.পি অনুপাতে ২০% - ৩০% এর উপরে আয় হয়েছে এমন দেশসমূহের মধ্যে Macau, Maldives, Aruba, British Virgin Islands, US Virgin Islands, Bahamas, Canada and Vanuatu অন্যতম। World Tourism Organization (WTO) এর হিসাবে ২০১৫-২০১৯ এ পাঁচ বছর সময়কালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ১০.৪% পর্যটনখাতে প্রবাহিত হয়েছে এবং এ সময়কালে বিশ্বে প্রতি ৫টি নতুন কর্মসংস্থানের একটি পর্যটনখাতে সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ সারাবিশ্বে পর্যটনখাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১৯ মিলিয়ন।

অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। নদীমাতৃক এ দেশের শ্যামল প্রকৃতি, উষ্ণ আবহাওয়া, ষড়ঋতুর বৈচিত্রতা, সবুজে ঘেরা অসংখ্য ছোটবড় পাহাড়, প্রাকৃতিক ঝর্ণা ও হ্রদ, বৈচিত্রেভরা সুন্দরবন আর বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকতের অধিকারি এদেশের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস, স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। পর্যটনের জন্য এমন আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত দেশ পৃথিবীতে আরেকটি বিরল। বিশ্বের ছোটবড় প্রায় সকল দেশই পর্যটনকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আসছে এবং পর্যটন শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি পর্যটক আকর্ষণপূর্বক পর্যটনের পাশাপাশি এখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতসমূহ, যেমন হোটেল, মোটেল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদিক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বাংলাদেশ পর্যটনখাতে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করলেও পর্যটনখাতের অজস্র সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পর্যটনকে পরিচিত করে তোলা বাংলাদেশের পক্ষে আজো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। ফলে পর্যটনখাতে এদেশের আয়, এখাতে কর্মসংস্থান এবং গ্লোবাল র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের পর্যটনখাত অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। Travel and Tourism Competitiveness Report, 2019 অনুযায়ী ১৪০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম, যেখানে জাপন ৪র্থ, চীন ১৩তম, দ. কোরিয়া ১৬তম, সিঙ্গাপুর ১৭তম, মালয়েশিয়া ২৯তম, থাইল্যান্ড ৩১তম, ভারত ৩৪তম, ইন্দানেশিয়া ৪০তম, ভিয়েতনাম ৬৩তম, ফিলিপাইন ৭৫তম, শ্রীলংকা ৭৭তম, কম্বোডিয়া ৯৮তম, নেপাল ১০২তম এবং পাকিস্তান ১২১তম স্থানে রয়েছে স্মারণী-৫.১৬(১)।

স্মারণী-৫.১৬(১) : গ্লোবাল ট্যুরিজম র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :-

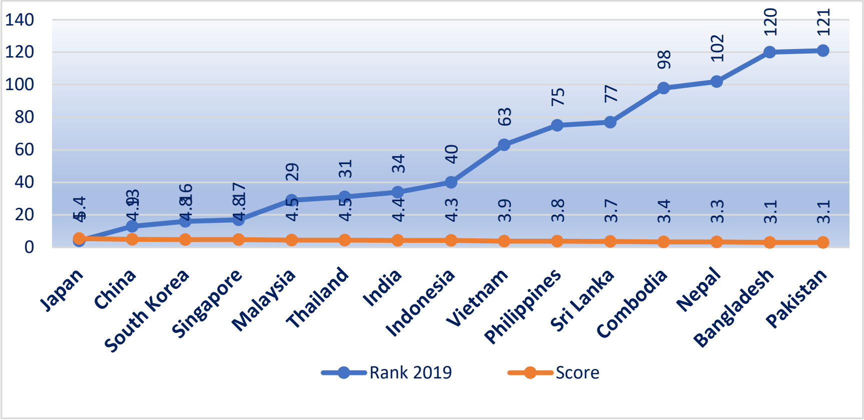

Source: Travel and Tourism Competitiveness Report, 2019 Note: Lower Rank indicates higher position.

১) দেশে বিদেশি পর্যটক আগমনের পরিসংখ্যান :

বিদেশি পর্যটক আগমনের পরিসংখ্যান :

বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা দ্রুতই বাড়ছে। World Tourism Organization (WTO) এর হিসাবে ২০১৯ সালে সারাবিশ্বে ১.৫ বিলিয়ন পর্যটক ভ্রমণ করেছে, যা প্রতিবছর প্রায় ৪% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী ব্যবসায়িক ও অন্যান্য কারণে যে সমস্ত দেশের লোক বাংলাদেশ ভ্রমণ করে তন্মধ্যে ৭০-৮০% ভারতের পর্যটক, অবশিষ্ট ২০-৩০% পর্যটক আসে চীন, আমেরিকা, জাপান, মালয়েশিয়া, দ. কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাড়া, জার্মানি, নেপাল ও সৌদি আরব থেকে। ২০১৪-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ২০১৪ সালে ১৩৩,৯০২ জন, ২০১৫ সালে ১২৬,২৬৪ জন, ২০১৬ সালে ১৮২,৪৬৯ জন, ২০১৭ সালে ২৩৭,৪৫২ জন, ২০১৮ সালে ২৬৭,২০৯ জন এবং ২০১৯ সালে ৩২৩,২৯৫ [স্মারণী-৫.১৬(২)]।

স্মারণী-৫.১৬(২) : ২০১৪-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটক আগমনের চিত্র :-

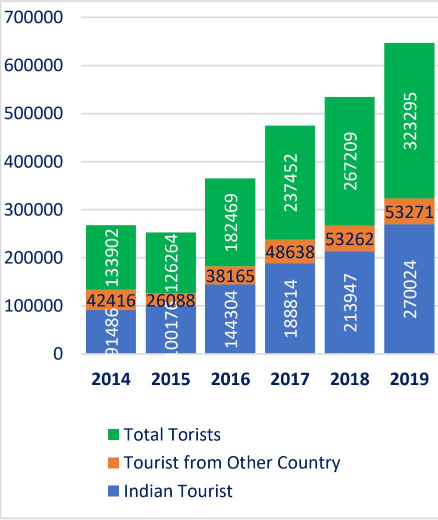

Source: Bangladesh Tourism Board

পর্যটক আগমনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের তুলনামূলক অবস্থান :

২) পর্যটক আগমনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের তুলনামূলক অবস্থান :

পর্যটক আকর্ষণের দিকথেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে থাইল্যান্ড। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০১৮ সালে দেশটিতে পর্যটক আগমনের সংখ্যা ৩৮.১৮ মিলিয়ন। ঐ সময়ে পর্যটক আগমনের সংখ্যা জাপানে ৩১.১৯ মিলিয়ন, ভারতে ১৭.৪২ মিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ১৫.৮১ মিলিয়ন, ভিয়েতনামে ১৫.৫০ মিলিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৫.৩৫ মিলিয়ন, সিঙ্গাপুরে ১৪.৬৭ মিলিয়ন, কম্বোডিয়ায় ৬.২০ মিলিয়ন, শ্রীলংকায় ২.৩৩ মিলিয়ন, মালদ্বীপে ১.৪৮ মিলিয়ন , নেপালে ১.১৭ মিলিয়ন এবং বাংলাদেশে ০.২৭ মিলিয়ন [স্মারণী-৫.১৬(৩)]।

স্মারণী-৫.১৬(৩) : ২০১৪ - ২০১৮ সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে বিদেশি পর্যটক আগমনের চিত্র :-

Visitors in Million

Country	2014	2015	2016	2017	2018
Bangladesh	0.13	0.13	0.18	0.24	0.27
Nepal	0.79	0.54	0.75	0.94	1.17
Maldives	1.21	1.23	1.29	1.39	1.48
Sri Lanka	1.53	1.80	2.05	2.12	2.33
Combodia	4.50	4.78	5.01	5.60	6.20
Singapore	11.86	12.05	12.91	13.90	14.67
S. Korea	14.20	13.23	17.24	13.34	15.35
Vietnam	7.87	7.94	10.01	12.92	15.50
Indonesia	9.44	10.41	11.52	14.04	15.81
India	13.11	13.28	14.57	15.54	17.42
Japan	13.41	19.74	24.04	28.69	31.19
Thailand	24.81	29.92	32.53	35.59	38.18

Source: World Bank and BPC

খ) পর্যটনখাতে বার্ষিক রেভিনিউ :

পর্যটনখাতে বার্ষিক রেভিনিউ :

বাংলাদেশের পর্যটনখাত অদ্যাবধি মূলত দেশিয় পর্যটকদের উপর নির্ভরশীল। দেশের পর্যটনখাতে আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ সুবিধা না থাকার কারনে বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটদের আগমন নিতান্তই স্বল্প। একমাত্র ব্যবসায়িক কাজকর্মে স্বল্প সময়ের জন্য বিদেশি লোকজন এদেশে আসে, তাও আবার মুষ্টিমেয় কিছু দেশ থেকে। ফলে দেশের পর্যটনখাতের আশানুরুপ বিস্তৃতি ঘটেনি এবং পর্যটনখাতে বাংলাদেশের আয় অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় খুবই সামান্য। ২০১৪-২০১৮ এ পাঁচ বছর সময়কালে পর্যটনখাতে বাংলাদেশের আয় ছিল গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ২৪৫ মিলিয়ন, ঐ সময়ে পর্যটনখাতে নেপালের আয় ছিল গড়ে ইউ.এস.ডলার ৫৩৩ মিলিয়ন, শ্রীলংকার ৩,৪৪৭ মিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ার ১৩,২৯৬ মিলিয়ন, মালয়েশিয়ার ১৯,৯০৪ মিলিয়ন এবং ভিয়েতনামের ১৮,৯৯৪ মিলিয়ন [স্মারণী-৫.১৬(৪)]।

স্মারণী-৫.১৬(৪) : ২০১৪ থেকে ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের পর্যটনখাতে বার্ষিক গড় রেভিনিউ এর চিত্র :-

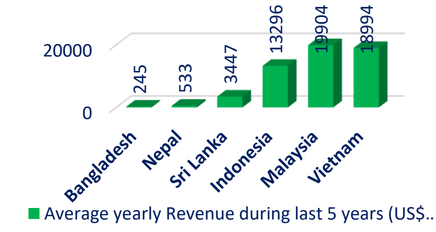

Source: CEIC Data

স্মারণী-৫.১৬(৫) : ২০১৪-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের পর্যটনখাতে রেভিনিউ অর্জনের চিত্র :-

Country	Periods		(USD Million)			5 year Average
	2014	2015	2016	2017	2018	
Bangladesh	154	150	214	348	357	245
Nepal	472	544	393	551	703	533
Sri Lanka	2,431	2,981	3,518	3,925	4,381	3,447
Indonesia	11,567	12,054	12,566	14,691	15,600	13,296
Malaysia	22,009	17,705	19,825	19,116	20,864	19,904
Vietnam	10,876	15,586	18,238	22,839	27,431	18,994

Source: CEIC Data

গ) জি.ডি.পি ও কর্মসংস্থানে পর্যটনখাতের অংশ :

বাংলাদেশের পর্যটনখাত পর্যাপ্ত প্রসারিত না হওয়ার কারণে দেশের জি.ডি.পিতে এখাতের অংশগ্রহণ যেমন খুবই সামান্য, তেমনি দেশের মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে পর্যটনখাতে কর্মসংস্থানও অদ্যাবধি একদমই সীমিত। World Tours and Travels Report 2020 অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জি.ডি.পিতে পর্যটনখাতের অংশগ্রহণ মাত্র ৩%, ঐ সময়ে পাকিস্তানে যা ছিল ৫.৯%, নেপালে ৬.৭%, ভারতে ৬.৮%, ভিয়েতনামে ৮.৮%, শ্রীলংকায় ১০.৩%, মালয়েশিয়ায় ১১.৫%, থাইল্যান্ডে ১৯.৭%, ফিলিপাইনে ২৫.৩% এবং কম্বোডিয়ায় ২৬.৪%। তাছাড়া, কর্মসংস্থানের দিকথেকেও বাংলাদেশের পর্যটনখাত এখনো একদমই প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে, যেমন ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের পর্যটনখাতে কর্মসংস্থান দেশের মোট কর্মসংস্থানের ২.৯% মাত্র, অথছ ঐ সময়ে পাকিস্তানে এ হার ৬.২%, নেপালে ৬.৯%, ভারতে ৮.০%, ভিয়েতনামে ৯.১%, ইন্দোনেশিয়ায় ৯.৭%, মালয়েশিয়ায় ১৪.৭%, থাইল্যান্ডে ২১.৪%, ফিলিপাইনে ২৪.১% এবং কম্বোডিয়ায় ২৬.৪% [স্মারণী-৫.১৬(৬)]।

জি.ডি.পি ও কর্মসংস্থানে পর্যটনখাতের অংশ :

স্মারণী-৫.১৬(৬) : ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে জি.ডি.পি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পর্যটনখাতের অংশ :-

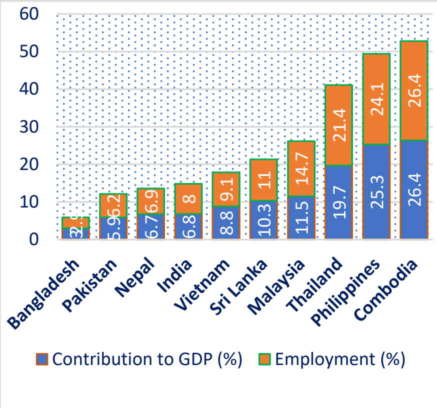

Source: WTTC

ঘ) বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

মানুষ সাধারণত অবসর সময়ে ভ্রমণ করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জানতে এবং বিভিন্ন দেশের স্থাপত্য কৌশলী, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অবলোকনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও বিশ্বকে উপভোগ করতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নিদর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের চাইতে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এদেশের অনাবিল সবুজ প্রকৃতি, নদীনালা, খাল বিল, পাহাড় সবসময় ভ্রমণ পিপাশুদের মুগ্ধ করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমূদ্র সৈকত ও ঐতিহাসিক সুন্দরবন এদেশেই অবস্থিত।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

তাছাড়া, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালিজাতির রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, যা হতে পারে বিশ্বব্যাপি পর্যটকদের ভ্রমণ পিপাসা মিটানোর অন্যতম উৎস, প্রয়োজন শুধু এসব ঐতিহ্য সমূহকে আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থাপন করা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত অসংখ্য পর্যটন স্পট এদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলো আকর্ষনীয় করে গড়ে তোলাপূর্বক দেশ বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান। তাছাড়া, যেসমস্ত পর্যটন স্পট এরিমধ্যে দেশে বিদেশে পরিচিতি পেয়েছে, যেমন- কক্সবাজার, পতেঙ্গা ও কুয়াকাটা সমুদ্র শৈকত, সেন্টমার্টিন, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, বান্দরবন, সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়, সিলেটের চা বাগান এবং এমন আরোও অনেক আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে যেগুলোর অবকাঠামে উন্নয়ন, সৌন্দর্য বর্ধন, যোগাযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক পর্যাপ্ত প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত করে তোলাপূর্বক পর্যটনখাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার ব্যাপক সুযোগ আমাদের রয়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।

১) বাংলাদেশ কেন পারবেনা ?

শ্রীলংকার মত দেশ যদি পর্যটনখাতে বছরে গড়ে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে, বাংলাদেশ এক্ষেত্রে আরো কয়েকগুণ বেশি আয়ের টার্গেট নিয়ে আগানো উচিৎ, কেননা ভৌগলিক অবস্থান, পরিপার্শ্বিক অবস্থা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধশালি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকথেকে অনেক আকর্ষনীয়। তবে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করতে এখাতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অন্যান্য খাতসমূহ, যেমন- যোগাযোগ, নিরাপত্তা, হোটেল, মোটেল, রেষ্টুরেন্ট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদিক্ষেত্রে মানসন্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ ভ্রমণ পিপাসুদের ক্ষেত্রে অর্থের চেয়ে নিরাপত্তা ও মানসন্মত সেবা অধিকতর কাম্য।

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ।

চন্দ্রনাথ ধাম, সীতাকুন্ড।

২) পর্যটক আকর্ষনে ব্যাতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ:

যেহেতু শিল্প ও প্রযুক্তিতে আমরা অদ্যাবধি পিছিয়ে আছি, সেহেতু পর্যটনখাতের দ্রুত প্রসারে ব্যাতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ বাস্তবায়নপূর্বক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজ দেশকে ব্রান্ডিং করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি পর্যটক আকর্ষণ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরুপ, ফ্রান্সের "আইফেল টাওয়ার", ভারতের "তাজমহল", আমেরিকার "ষ্টেচু অব লিবার্টি", মালয়েশিয়ার "টু-ইন টাওয়ার" , অষ্ট্রেলিয়ার "সিডনি অপেরা" এবং ডুবাই এর "বুর্জ খলিফা" নিজ নিজ দেশের অস্তিত্ব তুলেধরার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি পর্যটক আকর্ষণে দারুণভাবে সফল হয়েছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্থপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখতে ফ্রান্সের আদলে "বঙ্গবন্ধু আইফেল টাওয়ার" অথবা আমেরিকার আদলে "বঙ্গবন্ধু ষ্টেচু অব লিবার্টি" নির্মাণপূর্বক বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্রান্ডিং করে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে। তবে এ উদ্দেশ্যে যে ধরনের স্থাপত্যই নির্মাণ করা হউক না কেন, তা হতে হবে চলমান বিশ্বের আলোকে সম্পূর্ণ ব্যাতিক্রমধর্মী ও আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং এর নির্মাণশৈলী ও ব্যয় হতে হবে বিশ্বের ব্যতিক্রমধর্মী স্থাপত্য সমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এ জাতিয় স্থাপত্য নির্মাণে যে উচ্চমাত্রার ব্যয় হবে তার যোগান দিতে আমাদের মত দেশের পক্ষে এ মূহুর্ত্বে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। তবে একথাও সত্য যে এ জাতিয় স্থাপত্য নির্মাণের মাধ্যমে একরার বাংলাদেশকে ব্রান্ডিং করা গেলে, তার ফল ভোগ করা যাবে কয়েক যুগ ধরে। উদাহরণস্বরুপ, এ জাতিয় একটি স্থাপত্য নির্মাণে যদি আনুমানিক ব্যয় হয় ৩.০০ বিলিয়ন ডলার, পাশাপাশি দেশের অন্যান্য স্থানে নুন্যতম ১০ টি পর্যটন স্পট আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে আরোও ৩ বিলিয়ন এবং প্রচার প্রচারণা বাবত ২ বিলিয়ন সহ সর্বমোট ৮.০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। দেশে যদি বছরে নুন্যতম ২.০ মিলিয়ন বিদেশি পর্যটকের আগমণ ঘটে এবং প্রত্যেক পর্যটক গড়ে ২,০০০ ডলার খরচ করলে, পর্যটনখাতে বাংলাদেশের বার্ষিক আয় দাঁড়াবে ইউ.এস.ডলার (২০,০০,০০০ X

জাফলং, সিলেট।

মাধবকুন্ড ঝর্ণা, সিলেট।

২,০০০) ৪.০০ বিলিয়ন। পাশাপাশি বৃদ্ধিপাবে কর্মসংস্থান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের আয়। এজন্য প্রয়োজন হবে এখাতে সহজ শর্তে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ও পর্যটনে প্রশিক্ষিত জনবল, যা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ফয়েজ লেক, চট্টগ্রাম

৩) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পর্যটন কেন্দ্রসমূহ :

যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র সমূহকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে এদেশের পর্যটন শিল্পকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে :-

১. কক্সবাজার, পতেঙ্গা ও কুয়াকাটা শৈকত।
২. সেন্টমার্টিন দ্বীপ :
৩. চট্রগামের ফয়েজলেক :
৪. সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ পাহাড় :
৫. রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, কাপ্তাই লেক ও খাগড়াছড়ি :
৬. সাাভার জাতিয় স্মৃতিশৌধ, আহসান মন্জিল ও লালবাগ কেল্লা।
৭. সিলেটের জাফলং, মাধবকুন্ড ঝর্ণা, লাউয়াছড়া রেইন ফরেষ্ট ও শ্রীমঙ্গল চা বাগান।
৮. লালমাই, ময়নামতি ও শালবন বিহার।
৯. জাতিয় সংসদ ভবন।
১০. চট্রগ্রাম বন্দর এরিয়া।

সিলেট চা বাগান

SIFBD

ঙ) পর্যটন শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

বর্তমান সময়ে পর্যটন বিশ্বব্যাপি একটি বহুল বিকশিত ও সমাদৃত শিল্প, যা দেশে দেশে নিজস্ব কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমূহকে প্রস্ফুটিত ও আকর্ষণীয় করে তোলার মাধ্যমে দেশ বিদেশের পর্যটক আকর্ষণপূর্বক দেশের অর্থনীতি বিকশিত করার অন্যতম আকর্ষনীয় শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যে সমস্ত দেশ শিল্প ও কারিগরি দিকথেকে পিছিয়ে রয়েছে অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপত্য নিদর্শন ও ঐতিহ্যের দিকথেকে প্রাচুর্যময়, ঐসমস্ত দেশের অর্থনীতি বিকাশে পর্যটন শিল্প বড় আকারের ভূমিকা রাখছে। সেদিক থেকে পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশের জন্য একটি অত্যন্ত উপযোগি ও সম্ভাবনাময় শিল্প নিঃসন্দেহে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজ দেশের ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে শিল্প ও বানিজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার অপূর্ব সুযোগ বাংলাদেশের রয়েছে, যা নিয়ে কাজ শুরু করার সময় এখনি।

অবশ্য দেরিতে হলেও পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার সাম্প্রতিক সময়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন, আশাকরা যায় অদুর ভবিষ্যতে এর সুফল এদেশের জনগণ ভোগ করবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও

পর্যটন শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

উন্নয়নে সরকারের এ চিন্তা ভাবনাকে ইতিবাচক হিসাবে চিহ্নিত করে এ শিল্পের দ্রুত বিকাশে নিন্মোক্ত প্রস্তবনা সমূহ পেশ করা হলো :-

১. পর্যটন শিল্পের দ্রুত প্রসারে এ্যাকশনধর্মী সরকারি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং "বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন" কে আরোও শক্তিশালি করার মাধ্যমে এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা ।

২. ইতিমধ্যে পরিচিতি পেয়েছে এমন অন্তত ১০টি পর্যটন কেন্দ্রের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সৌন্দর্য বর্ধন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং সেখানে পর্যাপ্ত হোটেল, মোটেল ও রেষ্টুরেন্ট স্থাপনপূর্বক আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করন ।

৩. বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম এমন অন্তত একটি স্থাপত্য দেশে নির্মাণ করা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্রান্ডিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। উদাহরনস্বরুপ, স্বাধীনতার স্থপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখতে ফ্রান্সের আদলে **"বঙ্গবন্ধু আইফেল টাওয়ার"** অথবা আমেরিকার আদলে **"বঙ্গবন্ধু ষ্টেচু অব লিবার্টি"** নির্মাণপূর্বক বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্রান্ডিং করে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে।

৪. পর্যটনখাতের দ্রুত ও ব্যাপক উন্নয়নে সহজ শর্তে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণপূর্বক এখাতের ব্যাপক প্রসার নিশ্চিত করা ।

৫. বিদেশি পর্যটকদের জন্য মানোন্নীত পর্যটন কেন্দ্র সমূহের সাথে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঐসব পর্যটন কেন্দ্র সমূহকে বিমান বন্দরের সাথে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।

৬. জেলা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক আন্তর্জাতিক মানসন্মত হোটেল, মোটেল ও রেষ্টুরেন্ট স্থাপন ও এসবের মাননিয়ন্ত্রণে যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা রাখা।

৭. বিদেশি পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি অবসর কাটাতে অন্যান্য

বাংলাদেশের উল্ল্যেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ :

জাতীয় সংসদ ভবন।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার।

কাপ্তাই লেক, রাঙ্গামাটি।

SJFBD

পর্যটনভিত্তিক দেশ সমূহের আলোকে পর্যাপ্ত বিনোদন ব্যবস্থা রাখা ।

৮. বিদেশি পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবীমা সুযোগ চালু করার পাশাপাশি বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশেষায়িত হাসপাতালের ব্যবস্থা রাখা, যাতে পর্যটকগণ ন্যায্য মূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন ।

৯. পর্যটন সেবার মানোন্নয়নে ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যাক্তিবর্গ, গাইড ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারি ব্যাক্তিবর্গের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা আনতে এবং পর্যটন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল তৈরিতে দেশে উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরা ।

১০. সরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পর্যটন শিল্পের প্রসারে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহন করা।

১১. দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনের শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম অর্জন করা, যাতে বিদেশি পর্যটকগণ বাংলাদেশ ভ্রমনে স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসাহ বোধ করেন।

১২. বিমান বন্দর থেকে পর্যটক পরিবহনে হোটেল মোটেল সমূহের মানসন্মত পরিবহন ব্যবস্থা ও বৈচিত্রময় ডিশের আয়োজন থাকা।

১৩. বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসা প্রাপ্তি ও ভিসা নবায়ন ব্যবস্থা সহজতর করা।

১৪. বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশ্বের নামি দামি ব্রান্ডের জিনিসপত্রের শো-রুম চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে বিদেশি পর্যটকগণ তাদের চাহিদামত শপিং করতে পারেন।

১৫. প্রয়োজনে বড় পর্যটন কেন্দ্রসমূহে বিদেশি পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আলাদা **"ফরেন জোন"**, ক্লাব, সুইমিং পুল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চালু করা।

কুয়াকাটা সী-বিচ।

লালবাগ কেল্লা, ঢাকা।

জাফলং, সিলেট।

****

অধ্যায় : ৫.১৭

সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসার।

সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসার।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) সামুদ্রিক অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশ।
১) সামুদ্রিক অর্থনীতি/নীল অর্থনীতির সংজ্ঞা।
২) বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনীতির আওতা ও পরিসর।
খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামুদ্রিক অর্থনীতির ব্যবহার।
গ) বাংলাদেশে সামুদ্রিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।
১) শিপিং এবং পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ।
২) মেরিন ফিশারিজ।
৩) জলজ চাষ।
৪) পর্যটন শিল্পের প্রসার।
৫) এনার্জি সেক্টর উন্নয়ন।
৬) মেরিন বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক রিসোর্স।
৭) সাব মেরিন মাইনিং।
৮) জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ রি-সাইক্লিং শিল্পের উন্নয়ন।
ঘ) সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রস্তুতি।
ঙ) সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসারে প্রস্তাবনা।

ক) সামুদ্রিক অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশ :

সামুদ্রিক অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশ :

সবুজ অর্থনীতির ন্যায় নীল অর্থনীতিও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অংশ, কোনো দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নেরক্ষেত্রে যার প্রভাব ব্যাপক। বিশ্বের বহুদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সবুজ ও নীল অর্থনীতির সমন্বয়ে গঠিত, যা ঐ সমস্ত দেশের অর্থনীতির প্রসার ও গতি সমানতালে বৃদ্ধি করে চলেছে। উদাহরণস্বরুপ, অষ্ট্রেলিয়া, চায়না, ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশসমূহ, আমেরিকা সহ আরোও অনেক দেশ সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে তুলছে।

সামুদ্রিক অর্থনীতির ব্যাপক সুযোগ এখন বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে। আন্তর্জাতিক সালিশ ব্যবস্থাপনায় ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার নিষ্পত্তি ও সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বঙ্গোপসাগরে প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমার অধিকারি, যারমধ্যে রয়েছে ২০০ নটিক্যাল মাইল একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রতল (Continental Shelf)। পরিকল্পিত ও বাস্তবসন্মত উপায়ে বিশাল এ সমুদ্রসীমা কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষানুসারে বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনীতি বহু সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ, যারমধ্যে রয়েছে- পর্যটন, ফিশারীজ এন্ড একুয়া কালছার, মেরিন ট্রান্সপোর্ট, এনার্জি, শিপ বিল্ডিং ও শিপ ব্রেকিং এবং মিনারেল। আগামীতে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রভাব কেমন হবে, এ সমস্ত সম্পদের পর্যাপ্ত আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবহারের উপর তা পুরোপুরি নির্ভর করবে। নিন্মের চিত্রে বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনীতির সম্ভাবনাময় খাতসমূহ তুলেধরা হলো :-

Composition of Ocean Economy in Bangladesh (% of Gross Value Added based on 2014-2015) :-

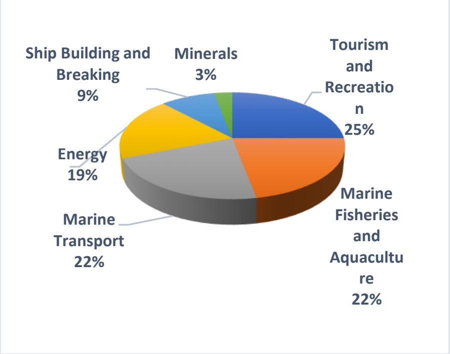

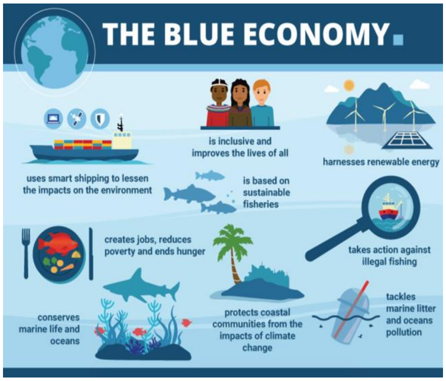

Source: World Bank Report

১) সামুদ্রিক অর্থনীতি/নীল অর্থনীতির সংজ্ঞা :

"নীল অর্থনীতি" একটি বিকাশমান বিশ্ব উদ্যোগ, যা উপকূলীয় দেশসমূহের টেকসই সামুদ্রিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। ২০১২ সালে রিও + ২০ ইউ.এন টেকসই উন্নয়ন সন্মেলনে সর্বপ্রথম এ ধারণার জোরালো সম্বোধন হয়। নীল অর্থনীতির (Blue economy) তত্ত্বকথা হচ্ছে "সাগর/মহাসাগর এর যথাযথ ব্যবহার এবং সেখানে অবস্থিত যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং আহরিত সম্পদের

যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অথনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা” যা গ্রীন ইকোনমির মত সমান গুরুত্ব বহন করে। এ ধারণাটি বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অনেকটা নতুন।

সামুদ্রিক অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় ?

এ তত্ত্বের যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য নীল অর্থনীতির বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা সমূহ হচ্ছে :

1. The sum of economic activities in ocean-based industries, and the assets, goods, and services of marine ecosystems (OECD's 2016 report''.

2. "A sustainable ocean economy, where economic activity is in balance with the long-term capacity of ocean ecosystems to support this activity and remain resilient and healthy" (Economist Intelligence Unit 2015); and

3. "comprising the range of economic sectors and related policies that together determine whether the use of oceanic resources is sustainable" (World Bank and UN DESA 2017)

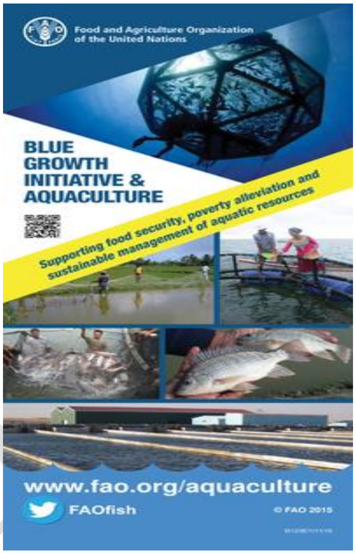

SIFBD

বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনীতির আওতা ও পরিসর :

২) বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনীতির আওতা ও পরিসর :

বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র পাকিস্তান ব্যাতিত অন্য সব দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জল সীমানা বেশি, যারমধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের ৫.৬%, বাংলাদেশের ২.৫%, ভারত ২.১%, শ্রীলংকা ১.৩%, মালদ্বীপ ০.৪% এবং মিয়ানমার ০.২%, যা নিন্মের চিত্রে তুলেধরা হলো :-

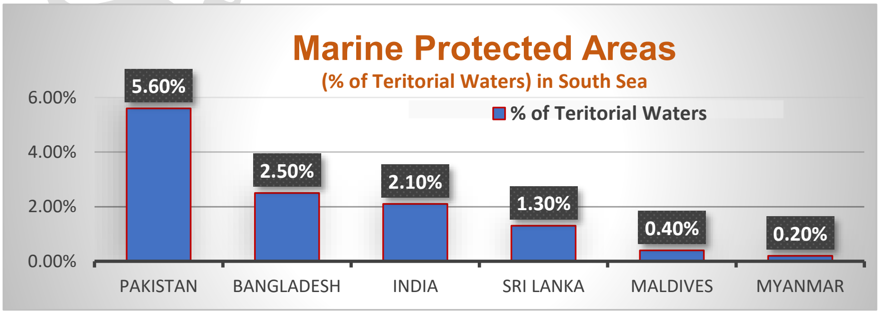

Source: Researchgate

বাংলাদেশ জলসীমা : বাংলাদেশ মেরিটাইম জোন এ্যাক্ট ২০১৮ (ড্রাফ্‌ট) এর ৪(২) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, নিন্মে তা হুবাহু তুলেধরা হলো :-

The Territorial Sea Baseline (TSB) of Bangladesh, from which the breadth of the Territorial Sea is measured seaward, enclosing those waters, which as a result of their close inter-relationship with the land, have the character of internal water shall consist of series of geodesics joining the base points at –

a) Land Boundary Terminus(LBT)(210 38'40.2"N, 890 09'-20.0"E);

b) Putney Island (210 -36’-39.2”N, 890 -22’-14.0”E);

c) The appropriate base point located along the furthest seaward extend of the low water line at Dakshin Bhasan Char (210 -38’-16.0N”, 900 -47’-16.5”E); and

d) Finally ending at base point at Cox’s Bazar (210 -25’-51.0”N, 910 -57’-42.0”E);

e) The TSB South of Cox’s Bazar from base point (d) 210 -25’-51.0”N, 910 -57’- 42.0”E) shall be normal baseline i.e. the low water line along the coast up to Teknaf point and Southern end of St. Martin’s Island as marked on the large scale chart officially recognized by Bangladesh.

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামুদ্রিক অর্থনীতির ব্যবহার :

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামুদ্রিক অর্থনীতির ব্যবহার :

সামুদ্রিক অর্থনীতি বহুদেশে কর্মসংস্থান, সম্পদ আহরণ, জাতিয় আয় এবং ঐ সমস্ত দেশের জীবনমানে বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। সম্ভাবনাময় এ খাতটি বহু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং এখাতের বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে তুলছে।

সমুদ্র অর্থনীতির যথাযথ বিকাশে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ এবং আহরিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। সমুদ্র অর্থনীতি পুরোপুরি কার্যকরি করে তুলতে এ সমস্ত বিষয়ের যথাযথ সমন্বয় অনন্য ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের বহু দেশে সমুদ্র অর্থনীতির আলাদা আয় ব্যয়ের হিসাব ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জাতিয় অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতির অংশগ্রহণ চিহ্নিত করার বিধান চালু রয়েছে। সমূদ্র অর্থনীতির সুফলকে জি.ডি.পির অন্তর্ভূক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র বহূ আগেই উদ্যোগ নিয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের দিকে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স এবং ইউ.কে এধরনের উদ্যোগ নেয়।

নিম্নে কয়েকটি দেশের জাতিয় অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতির অংশগ্রহনের চিত্র তুলেধরা হলো :-

SL	Country	Particulars
1	**USA**	Contribution to GDP in 2013 US$ 359 billion, which is more than 2% of GDP.
2	**China**	Total GVA in 2010 US$ 239 billion, which is 4% of GDP.
3	**Australia**	Contribution to GDP in 2012 AU$ 47.2 billion
4	**European Union**	Total GVA of EURO 500 billion annually, employing over 5 million people.
5	**Ireland**	Total GVA of EURO 3.37 billion in 2016, which is 1.7% of GDP.
6	**Mauritius**	10% of GDP on average during the period from 2012-2014.

Source: World Bank Data

গ) বাংলাদেশে সামুদ্রিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহ কমবেশি বঙ্গোপসাগর কতৃক আশির্বাদপুষ্ট, যা ঐ অঞ্চলে সামুদ্রিক অর্থনীতির বড় ধরনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের একটি উল্ল্যেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের বর্তমান জলসীমার অন্তর্গত। বাংলাদেশের এখতিয়ারভূক্ত বিশাল এ জলসীমা প্রচুর মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, যারমধ্যে রয়েছে প্রায় ৫০০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী, বিপুল পরিমাণে খনিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস এবং আরোও অজস্র সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। মিয়ানমার তাদের জলসীমায় এরিমধ্যে বিশাল গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে, যে সম্ভাবনা বাংলাদেশ সীমানাতেও প্রবল। অবশ্য ২০২২ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ অংশেও গ্যাসের বড় আকারের মওজুদের সন্ধান মিলেছে, বিশেষজ্ঞদের ধারনামতে সেখানে রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ১৭ - ১০৩ TCF এর মত হতে পারে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী সমুদ্র অঞ্চলের পানিতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মত মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে ১৩টি ভারী খনিজ সমৃদ্ধ সিল্ট রয়েছে, যারমধ্যে ইলামানাইট, গারনেট, কোলেমানাইট, জিরকন, সরীসৃপ এবং ম্যাগনেটাইট তাদের মতে সোনার চেয়েও মূল্যবান। এ সমস্ত খনিজ সম্পদ সঠিকভাবে আহরণ করা গেলে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সম্পদ অর্জিত হবে তাদের মতে।

সমুদ্র অর্থনীতির অধীনে আন্তর্জাতিকভাবে ২৭টি সেক্টর চিহ্নিত করা হলেও, বিভিন্ন সুত্রমতে প্রেক্ষাপট ও জলসীমা বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবন্ময় সেক্টর সমূহের মধ্যে ১) শিপিং এবং পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ ২) ফিশারিজ ও জলজ চাষ ৩) ট্যুরিজম ৪) এনার্জি ৫) মেরিন বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক রিসোর্স ; এবং ৬) সাব মেরিন মাইনিং অন্যতম।

বাংলাদেশে সামুদ্রিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

সামুদ্রিক অর্থনীতি গতানুগতিক ও সম্ভাবনাময় উভয় সেক্টরে টেকসই উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করে। বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবন্ময় সেক্টর সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১) **শিপিং এন্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ :** বর্তমানে বিশ্ববানিজ্যের প্রায় ৮০% সমূদ্রপথে বিশ্বব্যাপি বন্দরসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বানিজ্যে শিপিং পরিবহন এবং পোর্ট সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ প্রদানেরক্ষেত্রে উপকূলীয় দেশসমূহের জন্য ব্যবসায়িক সুবিধা ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হচ্ছে, যা বাংলাদেশ সামুদ্রিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারে, যারমধ্যে রয়েছে :-

- আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে নৌপরিবহন (শিপিং) ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়ন।

- আশপাশের দেশসমূহের মধ্যে কোস্টাল শিপিং/ফিডারসার্ভিস চালুকরা।
- বন্দর উন্নয়ন এবং নতুন বন্দর স্থাপন।
- নির্দিষ্ট সী-রুটে প্যাসেঞ্জার ফেরি চালু করা।
- আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন নেটওয়াক এর প্রসার ও উন্নয়ন।

২) **মেরিন ফিশারিজ :** উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য সামুদ্রিক মৎস আহরণ একটি লাভজনক পেশা। মাছ শুধু মানুষের পুষ্টি চাহিদাই পূরণ করেনা, পৃথিবীর বহু দেশের রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ দখল করে আছে মাছ রপ্তানি। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সামুদ্রিক মৎস আহরণ খাতে, যার প্রয় ৯০ শতাংশই উীন্নয়নশীল দেশসমূহে। বাংলাদেশের অবারিত সমুদ্রসীমায় বানিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস আহরণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করার অপূর্ব সুযোগ বিরাজমান, যারমধ্যে রয়েছে:

- সামুদ্রিক মৎস ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আহরণ।
- উপকূল ও গভীর সমূদ্রে মেরিকালচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার। (Cultivation, management, and harvesting of marine organisms in their natural environment (including estuarine, brackish, coastal, and offshore waters) or in enclosures such as pens, tanks, or channels.)

৩) **জলজ চাষ :** বর্তমানে জলজ চাষ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাদ্য সেক্টর, যা বিশ্বের মোট আহরিত মাছের প্রায় ৪৭% সরবরাহ করছে। FAO Report 2020 অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্বে একুয়াকালচার মৎস উৎপাদনের পরিমান ৮২.১০ মিলিয়ন মে.টন, যার ৩০.৮০ মিলিয়ন মে.টন (৩৭.৫২%) মেরিন একুয়াকালচার এবং ৫২.৩০ মিলিয়ন মে.টন (৬২.৪৮%) আভ্যন্তরীণ একুয়াকালচারে উৎপাদিত হয়েছে। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় একুয়াকালচার মৎস উৎপাদন এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জলজ প্রাণী উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করনের জন্য নিসন্দেহে যথেষ্ট উপযোগি।

SJFBD

৪) **পর্যটন শিল্পের প্রসার :** বিশ্বব্যাপি রপ্তানিখাতে ক্যামিক্যাল ও জ্বালানির পরে পর্যটনখাত তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। পর্যটনের অন্যতম শাখা মেরিন এন্ড কোষ্টাল ট্যুরিজম। অনেক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে মেরিন এন্ড কোষ্টাল ট্যুরিজম আলাদা গুরুত্ব বহন করে। ট্যুরিজম রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্বে ট্যুরিজমখাতে আয়ের পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ১.৭ ট্রিলিয়ন, যা ২০১৭ সালের তুলনায় ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র সৈকতের উন্নয়ন, বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপ সমূহের মানসন্মত উন্নয়ন, আন্ডার ওয়াটার ট্যুরিজম উন্নয়ন, যাত্রীবাহী জাহাজ ও প্রমোদ তরীর সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক বাংলাদেশ মেরিন ট্যুরিজমের মানসন্মত উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে দেশের পর্যটন খাতকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার অপূর্ব সুযোগ বিদ্যমান।

৫) **এনার্জি সেক্টর উন্নয়ন :** বিশ্বব্যাপি এনার্জির একটি বড় অংশ জলসীমায় অবস্থিত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তথ্যানুযায়ী সারাবিশ্বে উত্তোলনযোগ্য মজুদ তেলের প্রায় অর্ধেক গভীর জলে অবস্থিত। ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপি অফশোর ক্ষেত্রগুলি থেকে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন ঐ বছরের মোট উৎপাদনের ৩৩% এরও বেশি, ২০২৫ সাল নাগাদ যা ৩৪% এ দাঁড়াতে পারে। একই সময়ে অফশোর ক্ষেত্রগুলি থেকে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৫০% এর বেশি। তাছাড়া, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে সমুদ্র বায়ুথেকে অফশোর বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্রা উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অফশোর এনার্জি উৎপাদনে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিন্মোক্ত সুবিধাবলি বর্তমান :-

- অফশোর তেল ও গ্যাস আহরণ।
- মেরিন বেইজড বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- ব্লু এনার্জি (অসমোসিস) এবং বায়ুমেস উৎপাদন।
- সামুদ্রিক লবন উৎপাদন ও আহরণ।

- উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ থেকে নির্মাণ বালি, কংকর ইত্যাদি সংগ্রহ।
- সামুদ্রিক জিনগত সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা।

৬) **মেরিন বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক রিসোর্স :** বিভিন্ন সুত্রমতে ২০২৪ সাল নাগাদ বিশ্ব মেরিন বায়োটেকনোলজি মার্কেট সাইজ দাঁড়াবে ইউ.এস.ডলার ৭৭৫ বিলিয়ন। বিশ্বব্যাপি ক্লিনিক্যাল বিকাশ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে মেরিন বায়োটেক আগামি দিনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ২০১৭ সালে ক্লিনিক্যাল বিকাশে সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত ৩৫টির বেশি ড্রাগ রয়েছে। সমুদ্র অর্থনীতির অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ মাছ এবং শেলফিশ (Shellfish) ছাড়াও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের সক্ষমতা যাছাইয়ে জিন সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তির জন্য জেনেটিক রিসোর্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭) **সাব মেরিন মাইনিং :** সমুদ্র থেকে বালু ও কঙ্কর ব্যাতিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সমূহের উত্তোলন বিশ্বব্যাপি সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সমুদ্র সৈকত কতৃপক্ষ খনিজ কোড বিধিমালার আওতায় আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল অনুন্ধানের জন্য লাইসেন্স প্রদান করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপি সামুদ্রিক খনির খনিজ উপাদান সমূহের বার্ষিক টার্ণওভার ২০৩০ সাল নাগাদ ১০ বিলিয়ন ডলানে উন্নীত হবে আশাকরা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, উপকূলীয় দেশসমূহকে তাদের নিজস্ব সমুদ্রসীমা থেকে সর্বোত্তম সুবিধা আদায়ে যথাযথ প্রস্তুতি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮) **জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ রি-সাইক্লিং শিল্পের উন্নয়ন :** বাংলাদেশ ইতিমধ্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অনেকদূর এগিয়েছে এবং কয়েকবছর আগে থেকে রপ্তানিও শুরু করেছে, যদিও সংখ্যায় সেটা এখনও যথেষ্ট কম। তাছাড়া চট্রগ্রামের সীতাকুন্ডে অনেক আগে থেকেই জাহাজভাঙ্গা শিল্প চালু রয়েছে। বর্তমানে সমুদ্র পরিসীমা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ বাংলাদেশের জন্য জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা ও মেরামত শিল্পের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, যা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ জাহাজনির্মাণ, জাহাজভাঙ্গা ও মেরামত শিল্প প্রসারে বহুদূর এগিয়ে যাওয়ার অপূর্ব সুযোগ বিরাজমান।

উপরোক্ত সম্ভাবনা সমূহ ছাড়াও সমুদ্র অর্থনীতির পর্যাপ্ত প্রসারের ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি বহুলাংশে প্রসারিত হবে এবং কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জি.ডি.পি তে এ সেক্টরের অবদান সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় আকারের ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে, ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য যা অপরিহার্য।

SJFBD

ঘ) সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রস্তুতি :

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লাগার ফলে অতীতের সরকারগুলো এ বিষয়ে কোনো চিন্তাই করেনি। অবশেষে বর্তমান সরকারের আমলে সমদ্রসীমা নিয়ে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে দীর্ঘ এ বিরোধ মিমাংশা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেরক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। সরকার এরিমধ্যে সমুদ্র অর্থনীতি উন্নয়নে কাজ শুরু করেছেন এবং সমুদ্র সম্পদের আহরণ ও সদ্ব্যবহারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের কাজ সম্পন্ করেছেন। , যারমধ্যে রয়েছে :-

- Bangladesh Maritime Zone Act 2018 (Draft).
- Bangladesh Delta Plan 2100 for the next century.
- An independent Blue Economy Cell has been formed to ensure proper coordination of blue economy activities among all government and private sector maritime stakeholders.

সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রস্তুতি :

- Bangladesh Ocean Research Institute (BORI) ; and
- Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University (BSMRMU) was set up in 2013 for maritime higher education and research.

Bangladesh Action plan for blue economy in the 7th Five Years Plan.

The FYP focuses on three themes, one of which aims to implement "a sustainable development pathway that is resilient to disaster and climate change; entails sustainable use of natural resources; and successfully manages the inevitable urbanization transition"—consistent with the definition of the blue economy concept (GED 2015). The 7th FYP calls for the following twelve actions to be undertaken "to create and maintain a prosperous and sustainable blue economy:"

I. protecting and managing the fisheries for the present and the future generations,
II. developing a strong renewable energy sector using ocean and atmospheric forces,
III. maintaining existing (e.g., ship building) and developing new maritime industries; TOWARD A BLUE ECONOMY: A PATHWAY FOR 40 SUSTAINABLE GROWTH IN BANGLADESH
IV. extending fishing areas using new technologies and methods even beyond EEZ in the international waters,
V. developing a strong human resources base for domestic utilization, and export to foreign job markets,
VI. substantially increasing fisheries production and export earnings through improved aquaculture and introduction of mariculture.
VII. creating a competitive tourism industry, including ecotourism and marine cruises,
VIII. increasing revenue from shipping, commerce by expansion of domestic fleet, destinations, transshipment, transit provisions, linking sea-ports.
IX. give special priority to anticipated Climate Change impacts on all relevant matters, and adjust policies and plans,
X. maintain the inland river systems and ecosystems for fishery, sediment transport, and inland shipping,
XI. building a solid science, research and education base and
XII. along with other coastal areas, establishment of a marine academy in Khulna.

SJFBD

These twelve national actions areas are supported by three strategic policies, strategies, and plans currently under development. The three major initiatives include:

- Bangladesh's Integrated Coastal and Ocean Management Policy (ICOMP)
- Bangladesh's National Sustainable Development Strategy (NSDS)
- Bangladesh's Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)

ঙ) সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসারে প্রস্তাবনা :

সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রসারে প্রস্তাবনা :

সবুজ অর্থনীতির ন্যায় নীল অর্থনীতিও যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে সমান গুরুত্ববহ, বিশেষকরে উপকূলীয় যে সমস্ত দেশে নীল অর্থনীতি বিকাশের সুযোগ রয়েছে, ঐ সমস্ত দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা বড় ধরণের আশির্বাদ স্বরুপ। কেননা, স্থল সম্পদের তুলনায় সমুদ্র সম্পদের মূল্য, তাৎপর্য ও সম্ভাবনা কোনো অংশেই কম নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশি এবং সেদিকথেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট সৌভাগ্যবান। বাংলাদেশের নতুন আয়ত্বকৃত জলসীমা এবং সেখানে অবস্থিত জলজ, খনিজ এবং আবিস্কৃত ও অনাবিস্কৃত অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এ সমস্ত সম্পদের আহরণ ও এর সদ্ব্যবহারে বাংলাদেশ কতটুকু দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে তার উপর নির্ভর করছে আগামিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতি প্রবাহ, বিশেষ করে ২০৪১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা আনতে যার গুরুত্ব অপরিসীম। অপার এ সম্ভাবনা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও বাস্তবমূখী পরিকল্পণা, যা দেশের সামুদ্রিক সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে ভবিষ্যতে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

অবশ্য এখাতের উন্নয়নে সরকার এরিমধ্যে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং আরোও কিছু কিছু পরিকল্পণা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেহেতু নীল অর্থনীতির ধরনা বাংলাদেশের জন্য নতুন, সেহেতু এক্ষেত্রে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের সময় লাগাটা স্বাভাবিক।

সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ এবং এর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নীল অর্থনীতির উন্নয়নে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহকে আরোও বেগবান ও কার্যকরি করে তুলতে নিন্মোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ উপস্থাপিত হলো :-

১) সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য দেশের সমুদ্রনীতির আলোকে একটি দূরদর্শী, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সমূদ্রনীতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।

২) সমুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ এবং সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, যেমন-

- সামুদ্রিক মৎস আহরণে পর্যাপ্ত পরিমাণে আধুনিক সরঞ্জাম ও মাছ ধরার ট্রলার ক্রয়।
- গভীর সমূদ্রে মৎস আহরণ,সংরক্ষন ও রপ্তানির উপর উন্নত প্রশিক্ষণ।
- সমূদ্রের তলদেশে তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আবিস্কারে ভালোমানের বিদেশি কোম্পানি দ্বারা অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বায়োবিদ্যুৎ উৎপাদনে পদক্ষেপ নেওয়া ; এবং
- সমুদ্র সম্পদ আহরণে অন্যান্য সম্ভাবনা যাছাই করা।

৩) সমুদ্র সম্পদ আহরণ, ব্যবহার ও উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

৪) নিজস্ব সমুদ্র সীমা এবং সমুদ্র সীমায় আবিস্কৃত ও অনাবিস্কৃত সকল সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫) সমুদ্র সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধানে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে আঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে কাজ করা।

৬) পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ বৃদ্ধি ও নতুন পোর্ট স্থাপনপূর্বক শিপিং এবং এতদসংশ্লিষ্ট ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন ও বাস্তবায়ন, যেমন-

- আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে নৌপরিবহন (শিপিং) ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়ন।
- আশপাশের দেশসমূহের মধ্যে কোস্টাল শিপিং/ফিডারসার্ভিস চালুকরা।
- বন্দর উন্নয়ন এবং নতুন বন্দর স্থাপন।
- নির্দিষ্ট সী-রুটে প্যাসেঞ্জার ফেরি চালু করা।
- আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিকরা।

৭) বাংলাদেশে মেরিন ট্যুরিজমের মানসন্মত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের পর্যটন খাতকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে :-

- সমুদ্র সৈকতের উন্নয়ন।
- বঙ্গোপসাগরে নতুন গজিয়ে উঠা দ্বীপ সমূহের মানসন্মত উন্নয়নপূর্বক পর্যটনের আওতায় নিয়েআসা।
- আন্ডার ওয়াটার ট্যুরিজম উন্নয়ন; এবং
- যাত্রীবাহি জাহাজ ও প্রমোদ তরীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরা।
- এখাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮) অফশোর এনার্জি উৎপাদনে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাবলি যথাযথভাবে কাজে লাগানো, যেমন -

- সমুদ্র সীমায় অফশোর তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণ।
- মেরিন বেইজড বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- ব্লু এনার্জি (অসমোসিস) এবং বায়ুম্যাস উৎপাদন।
- সামুদ্রিক লবন উৎপাদন ও আহরণ।
- সামুদ্রিক জিনগত সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা।

৯) মেরিন বায়োটেকনোলজি উন্নয়ন এবং জেনেটিক রিসোর্স আহরণ।

১০)সাব মেরিন মাইনিং প্রক্রিয়ায় সমূদ্রের তলদেশ থেকে মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণ।

১১) জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা ও জাহাজ মেরামত শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার।

****

SJIFBD

অধ্যায় : ৫.১৮

রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।

রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) সরকারি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা।
- ১) সরকারি রাজস্ব কি ?
- ২) দেশে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিকরা কেন জরুরি ?

খ) জাতিয় বাজেটের আকার, প্রসার ও ঘাটতি।

গ) বাংলাদেশে চলমান রাজস্ব ব্যবস্থা।
- ১) লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রাজস্ব আহরণ।
- ২) আহরিত রাজস্ব আয়ের মধ্যে আয়করের অংশ।
- ৩) জাতিয় বাজেটের আকার ও রাজস্ব আয়ের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান।

ঘ) সরকার পরিচালন / অনুন্নয়ন ব্যয় ।
- ১) সরকার পরিচালনায় সামগ্রিক ব্যয়।
- ২) মন্ত্রণালয় অনুযায়ী সরকার পরিচালন ব্যয়।

ঙ) সরকারি আয়, ব্যয় ও দেনার ভারসাম্য।
- ১) সরকারি দায় দেনার সামগ্রিক চিত্র।
- ২) জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি আয়, ব্যয় ও দেনা।

চ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এ.ডি.পি)।
- ১) খাতওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি।
- ২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার।

ছ) দেশের চলমান রাজস্বখাতের মূল্যায়ন।

জ) সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা।

ক) সরকারি রাজস্ব আহরন বৃদ্ধি করা :

সরকারি রাজস্ব আহরন :

১) সরকারি রাজস্ব কি ?

The term " **Public Revenue** " refers to government revenues. It collectively covers income generated from sources such as taxes, fees, duties, tariffs, sale of public goods and services, profits or dividends from public enterprises, interest on loans, among other sources (http://www.ujp.gw.uk; Taylor, 1984, Buchanan, 1960; Pigou, 1982). একটি দেশের জাতীয় রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা হলো ঐ দেশের দক্ষ জনপ্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি, যা আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বাজেট ঘাটতি পূরনের মাধ্যমে ঐ দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড সচল রাখতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সরকার পরিচালন ব্যয় মিটানো, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়ন ও প্রসার এবং অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা উন্নয়নে সরকারি রাজস্ব আহরন বৃদ্ধি করার বিকল্প নেই।

২) দেশে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিকরা কেন জরুরি ?

SJIBD

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সরকার পরিচালন ও দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালন ব্যয় মিটানো হয় আভ্যন্তরীণ খাতসমূহ হতে অর্জিত রাজস্ব (আয়কর, ভ্যাট, শুল্ক ও অন্যান্য আয়) থেকে। যে দেশের অর্থনীতি যত মজবুত, ঐ দেশে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি তত সহজতর হওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় এবং রাষ্ট্রীয় বাজেটে সরকারি আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিতপূর্বক রাজস্ব উদ্বৃত্ত রেখে বাজেট প্রণয়ন ঐ দেশের বৈশিষ্ট্য। কেননা, ঘাটতি বাজেট সবসময় কোনো দেশের দুর্বল রাজস্ব ব্যবস্থার মুখোস উন্মোচন করে। এ কারণে পৃথিরীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজস্ব আহরনের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উদাহরনস্বরুপ- ২০১৯ সালে জি.ডি.পি অনুপাতে রাজস্ব আহরনের হার ইউরোপের দেশসমূহে গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশের উপরে। ঐ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে জাপানে এ হার জি.ডি.পি অনুপাতে ৩৩%, চীনে ২২.১%, মালদ্বীপে ১৮.৬%, ফিলিপাইন এ ১৮%, ভিয়েতনামে ১৭.৫%, থাইল্যান্ডে ১৭.২%, সিঙ্গাপুরে ১৩.৩%, মালয়েশিয়ায় ১২.৫%, ভূটানে ১০.৩% এবং বাংলাদেশে ৯.১% [স্মারণী-৫.১৮(১)]। অর্থাৎ সরকারি রাজস্ব আহরনের হার বাংলাদেশে এখনো বিশ্বের বেশিরভাগ দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। সরকারের আর্থিক সক্ষমতা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধিকরা অত্যন্ত জরুরি।

স্মারণী- ৫.১৮(১) : ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ও পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জি.ডি.পি অনুপাতে রাজস্ব আহরণের চিত্র :-

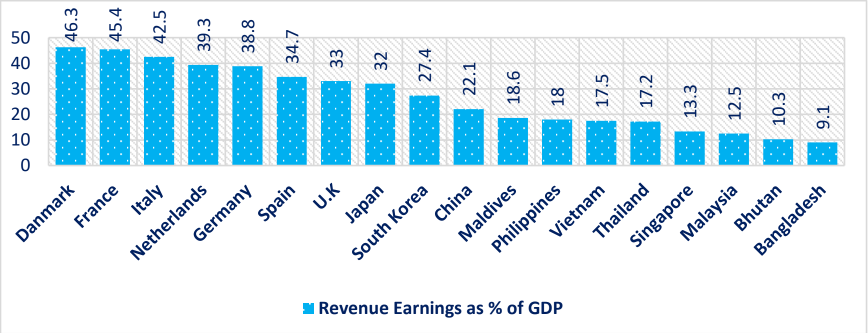

Source : OCED Data

খ) জাতিয় বাজেটের আকার, প্রসার ও ঘাটতি :

জাতিয় বাজেটের আকার, প্রসার ও ঘাটতি :

বিগত দশকে দেশের অর্থনীতির আকার আগের তুলনায় সম্প্রসারিত হয়েছে যথেষ্ট, ফলে জাতিয় বাজেটের আকার বেড়েছে কয়েকগুণ, পাশাপাশি বেড়েছে বাজেট ঘাটতি। উদাহরনস্বরুপ, অর্থবছর ২০১০-১১ সময়কালে ১৩২,১৭০ কোটি টাকার জাতিয় বাজেটের বিপরীতে ঘাটতি ছিল টাঃ ৩৯,৩২৩ কোটি (২৯.৭৫%) এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫২৩,১৯০ কোটি টাকার জাতিয় বাজেটের বিপরীতে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে টাঃ ১৪৫,৩৮০ কোটি (২৭.৭৯%)। এ ১০ বছরের ব্যবধানে জাতিয় বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ২৯৫.৮৫%, পাশাপাশি বাজেট ঘাটতি বেড়েছে ৩৩০.৮২%। অর্থাৎ, দেশের অর্থনীতি সম্প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে জাতিয় বাজেটের আকার, একইসাথে বাজেট ঘাটতিও অনেকটা সমানতালেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিবছর বাজেট ঘাটতির পরিমাণ গড়ে মোট বাজেটের প্রায় ২৫% - ৩০%। ২০১০-১১ অর্থবছরে টাঃ ১,৩২১.৭ বিলিয়ন বাজেটের বিপরীতে ঘাটতি ছিল টাঃ ৩৯৩.২৩ বিলিয়ন (২৯.৭৫%) এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে টাঃ ৫,২৩১.৯ বিলিয়ন বাজেটের বিপরীতে ঘাটতি টাঃ ১,৪৫৩.৮০ বিলিয়ন (২৭.৭৯%)। এ সময়কালে বাজেট ঘাটতির গড় হার বার্ষিক ২৭.৭২% [স্মারণী-৫.১৮(২)]।

বলা বাহুল্য, প্রতিবছর নানাবিধ কঠিন শর্তে বিভিন্ন দাতাসংস্থার নিকট থেকে খণ ও অনুদান এবং আভ্যন্তরীণভাবে ব্যাংকিং ও ননব্যাংকিং খাত থেকে প্রচুর পরিমাণে খণ নিয়ে বিশাল অংকের এই ঘাটতি পূরণ করতে হয়, যা দেশের অভ্যন্তরীণ খণপ্রবাহ ও ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ বিঘ্নিত করে তুলছে। পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় হলে একদিকে যেমন বাজেট ঘাটতি কমে আসতো, অন্যদিকে বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় বিদেশি ঋণ ও সাহায্য নির্ভরতাও কমে আসতো, যা হতো দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক বড় অগ্রগতি।

স্মারণী-৫.১৮(২) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জাতিয় বাজেটের আকার ও বাজেট ঘাটতির চিত্র :-

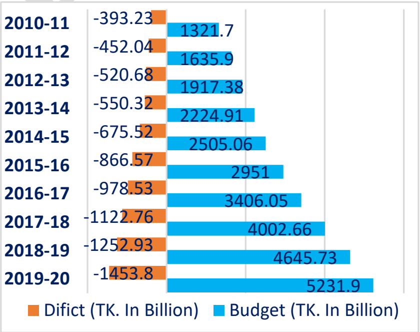

Source : BD Economic Review

SIFBD

স্মারণী-৫.১৮(৩) : এক নজরে বিগত এক দশকের (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০) জাতিয় বাজেটের সংক্ষিপ্তসার :-

Description	Financial Year							(Taka in Billion)
	2010-11	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Annual Budget	**1,321.70**	**1,917.38**	**2,505.06**	**2,951.0**	**3,406.05**	**4,002.66**	**4,645.73**	**5,231.90**
1. Revenue :								
A. NBR Tax Revenue :								
i) *Income Tax*	210.05	353.00	560.86	649.71	719.40	851.76	1,007.19	1,139.12
ii) *Value Added Tax*	270.92	404.66	550.13	642.63	727.64	912.54	1,105.54	1,230.67
iii) *Customs & Other Duties*	244.93	364.93	386.21	471.36	584.48	717.6	849.28	886.21
Sub-total :	**725.90**	**1,122.59**	**1,497.20**	**1,763.70**	**2,031.52**	**2,481.90**	**2,962.01**	**3,256.00**
B. Non-NBR Sources	34.52		55.72	58.74	72.50	86.22	97.27	145.00

C. Non-tax Revenue	168.05	45.65 228.46	276.62	261.99	323.50	311.79	333.52	377.10
Total Revenue (A+B+C)	**928.47**	**1,396.70**	**1,829.54**	**2,084.43**	**2,427.52**	**2,879.90**	**3,392.80**	**3,778.10**
2. Expenditures :								
A. Operating Exp. :								
i) Non-dev. Rev. Exp.	605.21	761.94	971.88	1,294.62	1,490.15	1,656.81	2,003.28	2,208.64
ii) Non-dev. Capital exp.	105.56	121.79	260.10	199.88	267.78	268.75	307.47	323.28
iii)Domestic & Foreign Int.	147.09	233.02	310.43	351.09	399.51	414.57	513.40	570.70
Sub-total :	**857.86**	**1,116.75**	**1,542.41**	**1,845.59**	**2,157.44**	**2,340.13**	**2,824.15**	**3,102.62**
B. Development Exp.	427.70	601.37	863.45	1,025.59	1,170.27	1,590.13	1,796.69	2,116.83
C. Loans, Adv. & Food A/C.	**36.14**	199.26	99.20	79.82	78.34	72.40	24.89	12.45
Total Expenditures :	**1,321.70**	**1,917.38**	**2,505.06**	**2,951.00**	**3,406.05**	**4,002.66**	**4,645.73**	**5,231.90**
Budget Deficit (2 – 1) :	**-393.23**	**- 520.68**	**-675.52**	**-866.57**	**-978.53**	**-1,122.76**	**-1,252.93**	**-1,453.80**
Deficit as % of budget	**29.75**	**27.16**	**26.97**	**29.37**	**28.74**	**28.05**	**26.97**	**27.79**
Deficit Financing :								
A. Foreign Borrowing	108.34	125.40	180.69	243.34	307.89	464.20	500.16	638.48
B. Foreign Grants	48.09	60.44	62.06	58.00	55.16	55.04	40.51	41.68
C. Domestic Borrowing:								
i) Banking Channel	156.80	230.00	312.21	385.23	389.38	282.03	420.29	473.64
ii) Non-banking Channel	80.00	140.84	120.56	180.00	226.10	321.49	291.97	300.00
Total (TK. In Billion):	**393.23** ======	**520.68** =======	**675.52** =======	**866.57** =======	**978.53** =======	**1,122.76** =======	**1,252.93** =======	**1,453.80** =======
Increased as % of Last Year :								
	2010-11	**2012-13**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
a) Budget Size Increased (%)	16.12	17.21	12.59	17.80	15.42	17.52	16.07	12.62
b) Increased Revenue (%)	16.85	17.98	9.25	13.93	16.46	18.64	17.81	11.36
c) Increased Budget Deficit (%)	14.45	15.18	22.75	28.28	12.92	14.74	11.59	16.03

Source : BD Economic Review

গ) বাংলাদেশে চলমান রাজস্ব ব্যবস্থা :

বাংলাদেশের রাজস্ব কাঠামো যথেষ্ট জটিল এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রিয়ায়িত, যা অনেকগুলো সংস্থা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিস্তৃত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সমন্বয়ে গঠিত। আয় ও লাভের উপর অর্পিত করই প্রত্যক্ষ কর এবং ভ্যাট, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, এক্সসাইজ ডিউটি, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক পরোক্ষ কর। দেশের রেভিনিউ খাত দু-ভাগে বিভক্ত, যেমন- ট্যাক্স রেভিনিউ (এন.বি.আর ট্যাক্স ও নন এন.বি.আর ট্যাক্স) এবং নন-ট্যাক্স রেভিনিউ। জাতিয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে IT Ordinance 1984 and IT Rules 1984, S.R.O, Gazette, Circular and Orders এর আওতায় এন.বি.আর ট্যাক্স ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, যারমধ্যে রয়েছে :-

১. পার্সোনাল ও কর্পোরেট ট্যাক্স।
২. ভ্যাট

৩. সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ও এক্সাইজ ডিউটি।
৪. কাষ্টমস্ ডিউটি।
৫. অন্যান্য ট্যাক্স (ভ্রমণকর, সম্পদকর, টার্ণওভার ট্যাক্স, এয়ার টিকেট ট্যাক্স, গিফ্ট ট্যাক্স, এ্যাডভার্টাইজমেন্ট ট্যাক্স) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে চলমান রাজস্ব ব্যবস্থা :

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এদেশের রাজস্ব আয় মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত, যেমন- এন.বি.আর ট্যাক্স, নন- এন.বি.আর ট্যাক্স এবং নন-ট্যাক্স রেভিনিউ। এন.বি.আর ট্যাক্স আবার তিন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত, যেমন- আয়কর, ভ্যাট এবং কাষ্টমস্ ও অন্যান্য ডিউটি।

রাজস্বখাতে এন.বি.আর কতৃক আদায়কৃত প্রত্যক্ষ কর বহির্ভূত বিভিন্ন সংস্থা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অন্যান্য যে সমস্ত আয় হয়ে থাকে, সেগুলো নন-এন.বি.আর ট্যাক্স হিসাবে বিবেচিত হয়, যেমন - নারকোটিক্স ডিউটি, ল্যান্ড রেভিনিউ, নন-জুড়িসিয়াল ষ্টাম্প, ল্যান্ড রেজিষ্ট্রেশন ফি, যানবাহনের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স ইত্যাদি। এন.বি.আর এবং নন-এন.বি.আর ট্যাক্স এর বাহিরে বিভিন্নমন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা কতৃক আহরিত অন্যান্য আয় সমূহ, যেমন- লভ্যাংশ, সুদ, প্রশাসনিক ফি, প্যানাল্টিস, লেভি ও অন্যান্য আয় নন-ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে পরিগণিত হয়।

নিন্মে বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণের প্রশাসনিক চিত্র সংক্ষেপে তুলেধরা হলো :-

Revenue Structure of Bangladesh
Excluding Grants, Loan and Food Account Transactions

NBR Tax
- Taxes on Income and Profit
- Value Added Tax (VAT)
- Import & Export Duty
- Supplementary Duty
- Other Taxes and Duty

Non-NBR Tax
- Narcotics and Liquor Duty
- Taxes on Vehicle
- Land Revenue
- Stamp Duty (Non Judicial)

Non Tax Revenue
- Dividend and Profit
- Interest, Penalties and Forfeitures.
- Receipts for services rendered
- Rents, Lease and Recoveries
- Toll and Levies
- Non-commercial Sales
- Defense Receipts
- Others non-tax Revenue Receipts

SHD

১) লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রাজস্ব আহরণ :

জাতিয় বাজেটে নির্ধারণকৃত খাতওয়ারি রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রাজস্ববোর্ড অর্থমন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অতীত ও বর্তমান সরকারের সময়কালে জাতিয় বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রাজস্ব আহরণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অতীতে যথেষ্ট ঘাটতি থাকলেও ২০১০-১১

লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রাজস্ব আহরণ :

অর্থবছর থেকে এ চিত্র কিছুটা পাল্টেছে, তথাপি বেশিরভাগ সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ৮০-৯০ শতাংশের বেশি অর্জন সম্ভব হয়নি [স্মারণী-৫.১৮(৫)]।

বিগত দশকে রাজস্ব আদায় ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে প্রায় শতভাগ হলেও ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯৬.৪০%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮৯.৪১%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৬.২০%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮৫.৮৪%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮২.৯০%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮০.২৬% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৬.২২%।

স্মারণী-৫.১৮(৪) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে এন.বি.আর রাজস্ব, ট্যাক্স রেভিনিউ এবং মোট রাজস্বের হার (%) :-

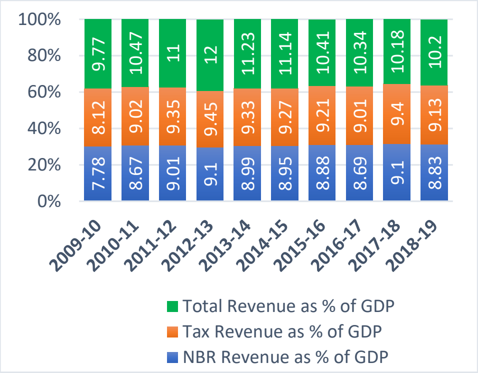

Source: NBR

স্মারণী-৫.১৮(৫) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে সংশোধিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এবং জি.ডি.পি অনুপাতে রাজস্ব আদায়ের হার (%) :-

(TK. In Billion)

Fiscal Year	Revenue Target	Collection					Achievement	As % of GDP		
		NBR Tax	Non-NBR Tax	Total Tax Revenue	Non-Tax Revenue	Total Revenue		NBR Revenue	Tax Revenue	Total Revenue
2009-10	794.61	620.42	27.43	647.85	131.69	779.54	98.10	7.78	8.12	9.77
2010-11	928.47	794.03	32.29	826.32	132.42	958.74	103.26	8.67	9.02	10.47
2011-12	1,183.85	950.59	36.34	986.93	186.45	1,173.38	99.12	9.01	9.35	11.12
2012-13	1,396.70	1,091.52	41.21	1,132.73	213.63	1,346.36	96.40	9.10	9.45	11.23
2013-14	1,674.59	1,208.20	46.11	1,254.31	243.00	1,497.31	89.41	8.99	9.33	11.14
2014-15	1,829.54	1,357.01	48.20	1,405.21	171.77	1,576.98	86.20	8.95	9.27	10.41
2015-16	2,084.43	1,536.27	56.44	1,592.71	196.48	1,789.19	85.84	8.88	9.21	10.34
2016-17	2,427.52	1,716.56	64.38	1,780.94	231.36	2,012.30	82.90	8.69	9.01	10.18
2017-18	2,879.90	2,023.13	66.11	2,089.24	222.29	2,311.53	80.26	9.10	9.40	10.40
2018-19	3,392.80	2,238.92	77.12	2,316.04	270.00	2,586.04	76.22	8.83	9.13	10.20
2019-20	3,778.10									

Source: NBR Note: Revenue Target are based on Original Budget

২) আহরিত রাজস্ব আয়ের মধ্যে আয়করের অংশ :

রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে জাতিয় রাজস্ব বোর্ড মূখ্য ভূমিকা পালন করে এবং মোট রাজস্বের প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ এন.বি.আর আহরিত রাজস্ব। অবশিষ্ট ১৫-২০ শতাংশ রাজস্ব আদায় করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা। বিগত এক দশকের (২০১০-২০১৯) তথ্য বিশ্লেষণে প্রধান তিনটি খাতে রাজস্ব আহরণের বার্ষিক গড় হার নিন্মে তুলেধরা হলো :-

ক) এন.বি.আর ট্যাক্স -

১. ইনকাম ট্যাক্স - বার্ষিক গড়ে ২৮.৬০%

২. ভ্যাট - বার্ষিক গড়ে ৩০.৭০%

৩. কাষ্টমস্ ডিউটি - বার্ষিক গড়ে <u>২৪.২০%</u> ৮৩.৫০%

খ) নন- এন.বি.আর ট্যাক্স - ৩.২০%

গ) নন- ট্যাক্স রেভিনিউ - <u>১৩.৩০%</u>

মোট : ১০০.০০%

উপরে প্রদর্শিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ আসে এন.বি.আর কতৃক আদায়কৃত আয়কর, ভ্যাট ও কাষ্টমস্ শুল্ক বাবত অর্জিত আয় থেকে।

আহরিত রাজস্ব আয়ের মধ্যে আয়করের অংশ :

উল্লেখ করার মত বিষয় হচ্ছে, এন.বি.আর কতৃক আদায়কৃত রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ্য করের অংশ তুলনামূলকভাবে অনেক কম, গড়ে ২৮.৬০%। ফলে জি.ডি.পি অনুপাতে আয়কর আদায়ের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান অদ্যাবধি বিশ্বে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। ২০১৯ সালের তথ্যানুযায়ী জি.ডি.পি অনুপাতে আয়কর আদায়ের হার বাংলাদেশে ৯.১%। ঐ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন জাপানে তা ৩২%, দ. কোরিয়ায় ২৭.৪%, চীনে ২২%, মালদ্বীপে ১৮.৬%, ফিলিপাইনে ১৮%, ভিয়েতনামে ১৭.৫% এবং থাইল্যান্ডে ১৭.২%। ইউরোপের দেশসমূহে এ হার গড়ে ৪০% এর উপরে [স্মারণী-৫.১৮(১)]। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে এন.বি.আর কতৃক আহরিত রাজস্ব অনুপাতে আয়কর আদায়ের হার ২৮% থেকে ৩৬% এর মধ্যে উঠানামা করেছে, গড়ে যা ছিল ৩২.৪৫% [স্মারণী-৫.১৮(৬)]।

স্মারণী-৫.১৮(৬) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে এন.বি.আর কতৃক আহরিত রাজস্বের তুলনায় আয়কর আদায়ের হার :-

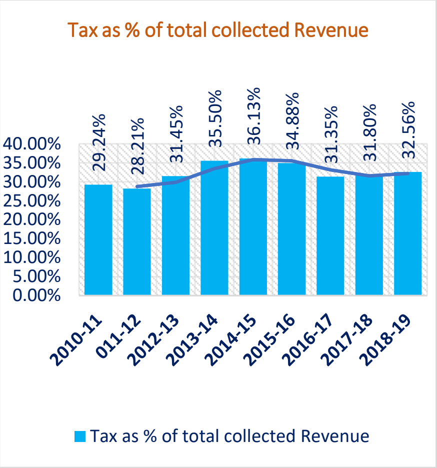

Source: NBR

স্মারণী-৫.১৮(৭) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালের জি.ডি.পি অনুপাতে এন.বি.আর রাজস্ব আদায় এবং মোট রাজস্বের অনুপাতে ট্যাক্স রেভেনিউ এর তুলনামূলক চিত্র :-

Year	NBR Revenue target	NBR Revenue Collection (in Billion Taka)				NBR Revenue as % of GDP	Income Tax as % of NBR Collection
		Income Tax	VAT	Duty	Total NBR Revenue		
2010-11	725.90	221.05	282.74	252.21	756.00	8.67	29.24
2011-12	918.70	260.61	343.04	320.05	923.70	9.01	28.21
2012-13	1,122.59	353.00	404.66	364.93	1,122.59	9.10	31.45
2013-14	1,360.90	443.70	458.77	347.53	1,250.00	8.99	35.50
2014-15	1,497.20	493.93	489.98	383.32	1,367.24	8.95	36.13
2015-16	1,763.70	542.45	560.81	451.93	1,555.19	8.88	34.88
2016-17	2,031.52	538.12	635.62	542.82	1,716.56	8.69	31.35
2017-18	2,481.90	656.45	788.94	618.18	2,064.07	9.10	31.80
2018-19	2,962.01	729.00	876.80	633.82	2,238.92	8.83	32.56
2019-20	3,256.00	730.04	848.53	605.52	2,184.09	9.10	33.43

Source: NBR

৩) জাতিয় বাজেটের আকার ও রাজস্ব আয়ের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

বাজেট সাইজ ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণের দিকথেকে গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী ২২৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম। ঐ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের মধ্যে চীন ২য়, দ. কোরিয়া ১৩ তম, ভারত ১৯তম, ইন্দোনেশিয়া ২৭তম, কম্বোডিয়া ৩৮তম, থাইল্যান্ড ৪২তম,

বাজেটের আকার ও রাজস্ব আয়ের দিকথেকে বাংলাদে-শের অবস্থান :

ভিয়েতনাম ৪৮তম, মালয়েশিয়া ৫১তম, সিঙ্গাপুর ৫২তম এবং পাকিস্তান ৫৫তম স্থানে রয়েছে [স্মারণী-৫.১৮(৮)]।

জি.ডি.পি অনুপাতে রাজস্ব আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছনে। ২০১০-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাজস্ব আহরণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে রাজস্ব আহরণের গড় হার বাংলাদেশে ১০.৩৬%, ভারতে ১২.৪৯%, শ্রীলংকায় ১২.৮২%, ইন্দোনেশিয়ায় ১৩.৯৫%, কম্বেডিয়ায় ১৫.৬৩%, নেপালে ১৮.৫০%, মালয়েশিয়ায় ১৮.৮৭%, থাইল্যান্ডে ১৯.৬৭%, ভূটানে ২০.৪৪% এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৪.৭৬% [স্মারণী-৫.১৮(৯)]।

স্মারণী-৫.১৮(৮) : বাজেট সাইজ ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণের দিকথেকে গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী ২২৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের অবস্থান :-

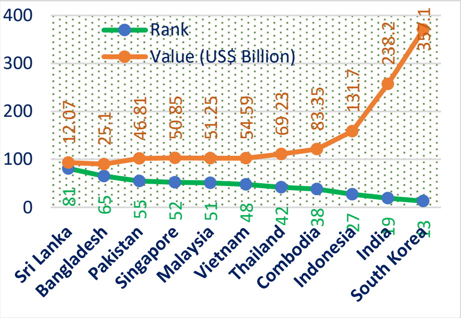

Source: Photius.com
Note: Lower Rank indicates higher position

স্মারণী-৫.১৮(৯) : ২০১০-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের জি.ডি.পি অনুপাতে (%) রাজস্ব আহরণের চিত্র :-

Country	Period									
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Average
Bangladesh	9.6	10.2	10.21	9.84	10.87	11.16	11.15	10.46	9.74	10.36
India		12.86	13.21	12.42	11.55	12.61	12.6	11.5	13.18	12.49
Sri Lanka	13.37	13.74	14.05	13.29	11.37	11.86	12.03	12.95	12.74	12.82
Indonesia	12.99	12.18	12.47	12.97	14.62	15.01	15.47	15.4	14.46	13.95
Combodia	22.17	18.56	17.37	16.58	16.58	13.75	12.64	11.55	11.47	15.63
Nepal		22.9	21.5	19.33	18.45	17.45	15.99	14.89	14.9	18.18
Malaysia	16.1	16.07	17	18.62	19.94	20.95	21.41	20.34	19.44	18.87
Thailand	19.46	19.12	19.81	20.55	19.69	20.61	18.94	19.81	19	19.67
Bhutan	22.17	18.67	18.8	19.63	19.92	20.46	21.32	20.96	22	20.44
S.Korea	27.52	26.19	25.76	24.81	24.99	26.12	26.65	20.69	20.1	24.76

Source : World Bank

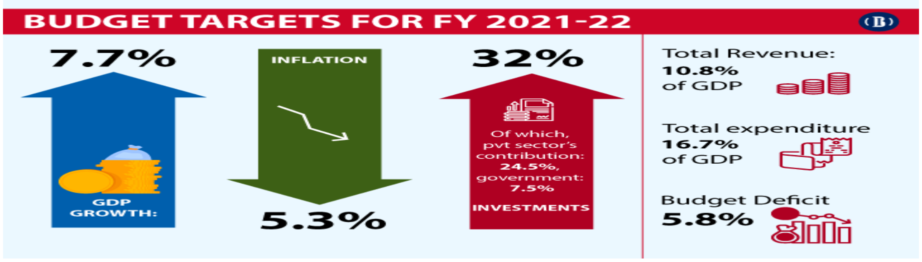

ঙ) সরকার পরিচালন / অনুন্নয়ন ব্যয় :

দেশের জাতিয় বাজেটের ধরণ অনুযায়ী সরকারি ব্যয় মূলত তিন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত, যেমন- পরিচালন ব্যয়/অনুন্নয়ন ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয় এবং লোন, এডভান্স এন্ড ফুড একাউন্ট। পরিচালন ব্যয় আবার তিনভাগে বিভক্ত, যেমন- পণ্য ও সেবাখাতে ব্যয়/রাজস্ব ব্যয়, অনুন্নয়ন মূলধনী ব্যয় এবং দেশী ও বিদেশি ঋণের সুদ।

সরকার পরিচালনায় সামগ্রিক ব্যয় :

১) সরকার পরিচালনায় সামগ্রিক ব্যয় :

দেশের অর্থনীতির পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ছে প্রশাসনিক দপ্তরসমূহের আকার ও জনবল, অনুন্নয়নখাতে মূলধনী ব্যয়, দেশি বিদেশি ঋণের সুদ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে সরকার পরিচালন ব্যয় ছিল টাকা ৮৪,১৮৮ কোটি, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে টাকা ২৮২,৪১৫ কোটি। বিগত এক দশকের ব্যবধানে সরকার পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে (২৮২,৪১৫-৮৪,১৮৮) = টাকা ১৯৮,২৭৭ কোটি , যা বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে টাকা ২২,০২৫ কোটি বা বার্ষিক গড়ে ১৯.৫৩% [স্মারণী-৫.১৮(১০)]। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বাজেট অনুপাতে সরকারি ব্যয় ৫৯% থেকে ৬৫% এর মধ্যে উঠানামা করেছে। এ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি ব্যয় ছিল ১৩% থেকে ১৪% [স্মারণী-৫.১৮(১১)]।

স্মারণী-৫.১৮(১০) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকার পরিচালন / অনুন্নয়ন ব্যয়ের চিত্র :-

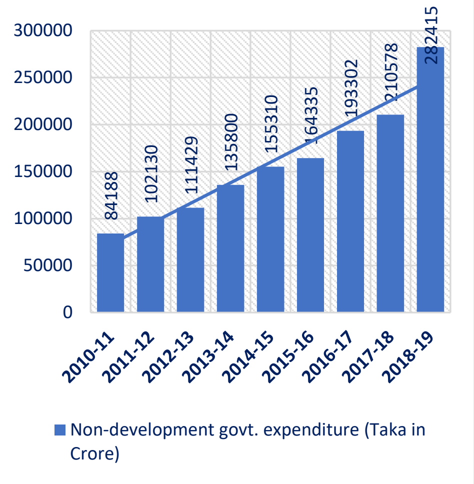

Source: BD Economic Review

স্মারণী-৫.১৮(১১) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে সংশোধিত বাজেটের আলোকে সরকার পরিচালন ব্যয়, বাজেট অনুপাতে সরকারি ব্যয় (%) এবং জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি ব্যয়ের চিত্র :-

Description	Financial Year							
	2010-11	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Annual Budget	1,321.70	1,917.38	2,505.06	2,951.0	3,406.05	4,002.66	4,645.73	5,231.90
Operating Expenditures :								
i) Recurrent Expenditure	605.21	761.94	971.88	1,294.62	1,490.15	1,656.81	2,003.28	2,208.64
ii) Non-dev. Capital exp.	105.56	121.79	260.10	199.88	267.78	268.75	307.47	323.28
iii) Domestic & Foreign Int.	147.09	233.02	310.43	351.09	399.51	414.57	513.40	570.70
Sub-total :	**857.86**	1,116.75	1,542.41	1,845.59	2,157.44	2,340.13	2,824.15	3,102.62
Govt. Exp. as % of Budget	64.91	58.24	61.57	62.54	63.34	58.46	60.79	59.30
Govt. Expenditures as % of GDP	13.86	14.40	14.00	13.77	13.45	13.56	14.30	14.75

Source : MOF and other sources.

দপ্তর অনুযায়ী সরকার পরিচালন / অনুন্নয়ন ব্যয় :

২) মন্ত্রণালয় অনুযায়ী সরকার পরিচালন ব্যয় :

মন্ত্রণালয় অনুযায়ী সরকারি ব্যয় বন্টনেরক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ৬ (ছয়) মন্ত্রণালয়ের সন্মিলিত ব্যয় মোট সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৪৫%-৫০%। উদাহরণস্বরুপ, ২০১০-১১ অর্থবছরে এ ৬ (ছয়) মন্ত্রণালয়ের সন্মিলিত ব্যয় ঐ বছরের মোট সরকারি ব্যয়ের ৪৬%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫০%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪৫%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৩%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫০%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৭%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৭%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৯% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৬% স্মারণী-৫.১৮(১৩) । গুরুত্বপূর্ণ এ ৬ (ছয়) মন্ত্রণালয় হচ্ছে :-

১. Ministry of Defense.
২. Ministry of Home Affairs
৩. Ministry of Primary & Mass Education
৪. Ministry of Education
৫. Ministry of Health
৬. Ministry of Agriculture

সরকারি ব্যয়ের আরেকটি বড় খাত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ, যা মোট ব্যয়ের প্রায় গড়ে ১৭% - ১৮%। ২০১০-১১ অর্থবছরে আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ ছিল ঐ বছরের সরকারি ব্যয়ের ১৮%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৮%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৮%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৭%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৭% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৮% স্মারণী-৫.১৮(১৩)। এ সময়কালে সরকারি ব্যয় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৫.৬৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্মারণী-৫.১৮(১২) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ বৃদ্ধির চিত্র :-

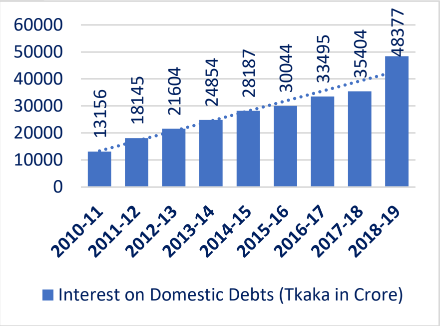

Source: BD Economic Review

স্মারণী-৫.১৮(১৩): অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে সমন্বিত বাজেট অনুসারে মন্ত্রণালয় অনুযায়ী সরকার পরিচালন ব্যয়ের চিত্র :-

SL	Particulars	Financial Years							(Taka in Crore)	
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-16	2017-18	2018-19
1	President's Office	11	11	12	13	15	20	19	22	23
2	National Parliament	105	113	134	164	200	238	294	298	298
3	Prime Minister's Office	181	177	208	255	325	359	418	585	487
4	Ministry of Defense	9,131	11,961	13,276	14,934	17,463	20,241	22,526	24,438	26,750
5	Ministry of Home Affairs	6,352	7,358	8,302	10,153	11,638	14,855	17,451	20,237	22,231
6	Primary & Mass Education.	4,936	5,267	5,537	7,435	8,084	11,600	11,535	12,687	14,154
7	Ministry of Education	8,431	8,658	9,290	11,215	12,055	16,001	20,669	21,586	23,768
8	Ministry of Health	4,881	5,114	5,507	6,139	6,976	9,690	9,911	11,314	12,242
9	Ministry of Agriculture	7,393	8,238	13,726	10,947	10,846	9,327	8,604	8,728	11,951
10	Other Ministries & Divisions	23,402	22,902	24,827	28,271	34,936	36,966	43,483	48,359	55,376
11	Interest on Domestic Debt	13,156	18,145	21,604	24,854	28,187	30,044	33,495	35,404	48,377
12	Interest on Foreign Debt	1,422	1,651	1,743	1,686	1,738	1,625	1,863	2,516	2,963
13	loans and advances of Finance Division.	5,287	12,532	7,263	19,734	22,847	13,369	23,034	24,404	63,795
	Total Non-dev. Expenditures :	**84,188**	**102130**	111,429	135,800	155,310	164,335	193,302	210,578	282,415
Yearly increase of Exp. (%) :		7.75	21.31	9.11	21.87	14.37	5.81	17.63	8.94	34.11
Total Exp. of 6 Ministries		46,596	55,638	60,823	67,062	81,714	90,696	98,990	111,096	41,124
Exp. of 6 min. as % of total exp.		46	50	45	43	50	47	47	39	46
Interest on Domestic Debt as % of total Expenditures		18	19	18	18	18	17	17	17	18

Source: BD Economic Review

ঙ) সরকারি আয়, ব্যয় ও দেনার ভারসাম্য :

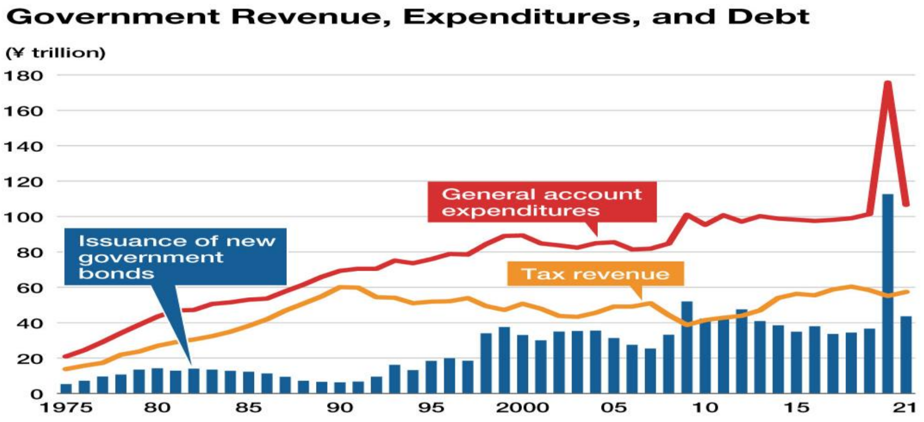

বিগত দশকে (২০১০-২০১৯) জাতিয় বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে ২৯৫.৮৫%, গড়ে যা বছরে ১৬.৫২%, পাশাপাশি সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ, গড়ে যা বছরে ১৫.৬৬%। এ সময়কালে বাজেটের আকার অনুপাতে বাজেট ঘাটতি গড়ে ২৭.৭২%। বাজেটের আকার ও ঘাটতি সমানতালে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাজেটের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজেট ঘাটতির পরিমাণও সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতিয় বাজেটের আকার ছিল টাকা ১,৩২১.৭০ বিলিয়ন এবং ঘাটতি ছিল টাকা ৩৯৩.৭৩ বিলিয়ন, বাজেট অনুপাতে যা ২৯.৭৫%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতিয় বাজেটের আকার দাঁড়িয়েছে টাকা ৫,২৩১.৯০ বিলিয়ন এবং ঘাটতির পরিমাণ টাকা ১,৪৫৩.৮০ বিলিয়ন, বাজেট অনুপাতে যা ২৭.৭৯% [স্মারণী-৫.১৮(১৪)]।

SJFBD

১) সরকারি দায় দেনার সামগ্রিক চিত্র :

বাজেট ঘাটতি যেহেতু বাংলাদেশে স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবছর দেশি বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ ও অনুদান নিয়ে জাতিয় বাজেটের ক্রমবর্ধমান বিশাল অংকের এ ঘাটতি পূরণ করাও একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে। বাজেট ঘাটতি পূরণে অর্থ সংস্থানের উৎস সমূহের মধ্যে বিদেশি উৎস থেকে ঋণ গড়ে ৩১.৮২%, বিদেশি অনুদান গড়ে ৭.৯৪% এবং দেশিয় উৎস (ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং) খাত থেকে ঋণ গড়ে ৬০.৯৪%। ফলে দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার নিকট সরকারের দেনার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারের সামগ্রিক দেনার পরিমাণ ছিল ইউ.এস. ডলার ৪০.৪৫৫ বিলিয়ন, ঐ সময়ের জি.ডি.পি অনপাতে যা ৩৫.৪৯% বা মাথাপিছু ২৬৭ ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে সরকারের সার্বিক দেনার পরিমাণ

স্মারণী-৫.১৮(১৪) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে বাজেটের আকার অনুপাতে বাজেট ঘাটতির চিত্র (%) :-

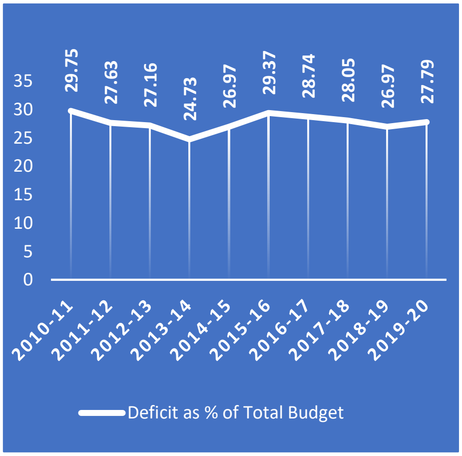

Source : BD Economic Review

সরকারি দায় দেনার সামগ্রিক চিত্র :

দাঁড়িয়েছে ইউ.এস. ডলার ৯১.৫২৪ বিলিয়ন, জি.ডি.পি অনপাতে যা ৩৩.৯৯% বা মাথাপিছু ৫৬৭ ডলার। এ দশ বছরের ব্যবধানে সরকারের সার্বিক দেনার পরিমাণ বেড়েছে ইউ.এস. ডলার ৫১.০৬৯ বিলিয়ন বা গড়ে বছরে ৫.১১ বিলিয়ন, যার প্রায় ৬১% দেশিয় উৎস (ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং) খাত থেকে নেওয়া, যা দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার জন্য বড় ধরনের ঝুকি তৈরি করছে [স্মারণী-৫.১৮(১৫) ও [স্মারণী-৫.১৮(১৬)]।

স্মারণী-৫.১৮(১৫) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারের দেনা এবং জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি দেনার চিত্র :-

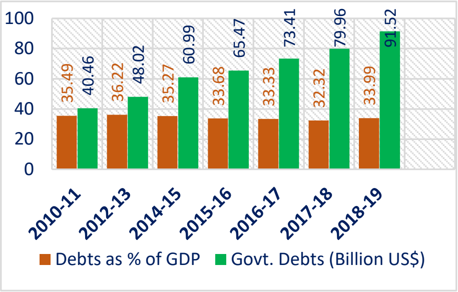

Source: World Bank, Koema.com and countryeconomy.com

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে দেশিয় উৎস থেকে ঋণ নেওয়ার বর্তমাণধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে তা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থারক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি তৈরি করবে, যা আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ এবং দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

স্মারণী-৫.১৮(১৬) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে জাতিয় বাজেটের ভিত্তিতে রাজস্ব আয়, ব্যয় ও দেনার চিত্র :-

Description	Financial Year							(Taka in Billion)
	2010-11	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Annual Budget	**1,321.70**	**1,917.38**	**2,505.06**	**2,951.0**	**3,406.05**	**4,002.66**	**4,645.73**	**5,231.90**
Revenue :								
i) Income Tax	210.05	353.00	560.86	649.71	719.40	851.76	1,007.19	1,139.12
ii) VAT	270.92	404.66	550.13	642.63	727.64	912.54	1,105.54	1,230.67
iii) Customs Duties	244.93	364.93	386.21	471.36	584.48	717.6	849.28	886.21
iv) Other Revenues	202.57	274.11	332.34	320.73	396.00	398.01	430.79	522.10
A. **Total Revenue :**	**928.47**	**1,396.70**	**1,829.54**	**2,084.43**	**2,427.52**	**2,879.90**	**3,392.80**	**3,778.10**
Expenditures :								
i) Operating Expenditures :	**857.86**	1,116.75	1,542.41	1,845.59	2,157.44	2,340.13	2,824.15	3,102.62
ii) Development Exp.	**427.70**	601.37	863.45	1,025.59	1,170.27	1,590.13	1,796.69	2,116.83
iii) Loans, Adv. & Food A/C.	**36.14**	199.26	99.20	79.82	78.34	72.40	24.89	12.45
B) Total Expenditures :	**1,321.70**	**1,917.38**	**2,505.06**	**2,951.00**	**3,406.05**	**4,002.66**	**4,645.73**	**5,231.90**
C) Budget Deficit (B-A) :	**-393.23**	**- 520.68**	**-675.52**	**-866.57**	**-978.53**	**-1,122.76**	**-1,252.93**	**-1,453.80**
Deficit as % of budget :	**29.75**	**27.16**	**26.97**	**29.37**	**28.74**	**28.05**	**26.97**	**27.79**
Deficit Financing :								
i) Foreign Borrowing	108.34	125.40	180.69	243.34	307.89	464.20	500.16	638.48
ii) Foreign Grants	48.09	60.44	62.06	58.00	55.16	55.04	40.51	41.68
iii) Domestic Borrowing:	236.80	370.84	432.77	565.23	615.48	603.52	712.26	773.64
Total :	393.23	520.68	675.52	866.57	978.53	1,122.76	1,252.93	1,453.80

D) Govt. debt (Billion US$)	40.455	48.024	60.985	65.470	73.411	79.964	91.524	-
Debt as % of GDP	35.49	36.22	35.27	33.68	33.33	32.32	33.99	-
Debt per Capita (US$)	267	310	395	419	465	501	567	-
Increased as % of Last Year :								
	2010-11	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
➢ Budget Increased (%)	16.12	17.21	12.59	17.80	15.42	17.52	16.07	12.62
➢ Increased Revenue (%)	16.85	17.98	9.25	13.93	16.46	18.64	17.81	11.36
➢ Increased Budget Deficit (%)	14.45	15.18	22.75	28.28	12.92	14.74	11.59	16.03

Source: World Bank, Koema.com and countryeconomy.com

জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি আয়, ব্যয় ও দেনার চিত্র :

২) জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি আয়, ব্যয় ও দেনা :

সরকারি ব্যয়ের আকার ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়া এবং পাশাপাশি জাতীয় বাজেটের আকার বৃদ্ধি পাওয়া। তবে এর জন্য রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়া জরুরি, অন্যথায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি আয় ও ব্যয়ের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় সব দেশের তুলনায় পিছনে অবস্থান করছে। World Economic Outlook 2020 এর তথ্যমতে ঐ সময়ে জি.ডি.পি অনুপাতে রাজস্ব আয় ও ব্যয় যথাক্রমে বাংলাদেশে ৯.৫৬% ও ১৫.০৩%, ইন্দোনেশিয়ায় ১২.৩৭% ও ১৮.২৩%, পাকিস্তানে ১৫.১১% ও ২৩.১২%, মিয়ানমারে ১৬.০৪% ও ২১.৬৫%, ভিয়েতনামে ১৬.৭১% ও ২১.৫৯%, ভারতে ১৮.৭৩% ও ৩০.৯৮%, ফিলিপাইনে ১৯.৬৫% ও ২৫.১১%, মালয়েশিয়ায় ২০.৩৬% ও ২৫.৪১%, থাইল্যান্ডে ২০.৬১% ও ২৫.৩১%, কম্বোডিয়ায় ২২.৪৭% ও ২৪.১৭%, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২২.৮৩% ও ২৫.৬৩%, ভূটানে ২৯.৫০% ও ৩২.২৮% এবং জাপানে ৩৪.০৫% ও ৪৬.৬৭% [স্মারণী-৫.১৮(১৭)] ।

অন্যদিকে, জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি নীট দেনার হার বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার দুয়েকটি দেশ ব্যাতিত অন্যান্য সব দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ২০২০ সালের তথ্যানুযায়ী জি.ডি.পি অনুপাতে নীট দেনা বাংলাদেশে ৫.৪৭%। ঐ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় এ হার ৫.৮৭%, পাকিস্তানে ৮.০১%, মিয়ানমারে ৫.৬১%, ভিয়েতনামে ৫.৪২%, ভারতে ১২.২৬%, ফিলিপাইনে ৫.৪৬%, মালয়েশিয়ায় ৫.০৫%, থাইল্যান্ডে ৪.৭০%, কম্বোডিয়ায় ১.৭০%, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২.৮১%, ভূটানে ২.৭৮% এবং জাপানে ১২.৬২% ।

SJFBD

স্মারণী-৫.১৮(১৭) : World Economic Outlook 2020 এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি আয়, ব্যয় এবং নীট ঋণের হার :-

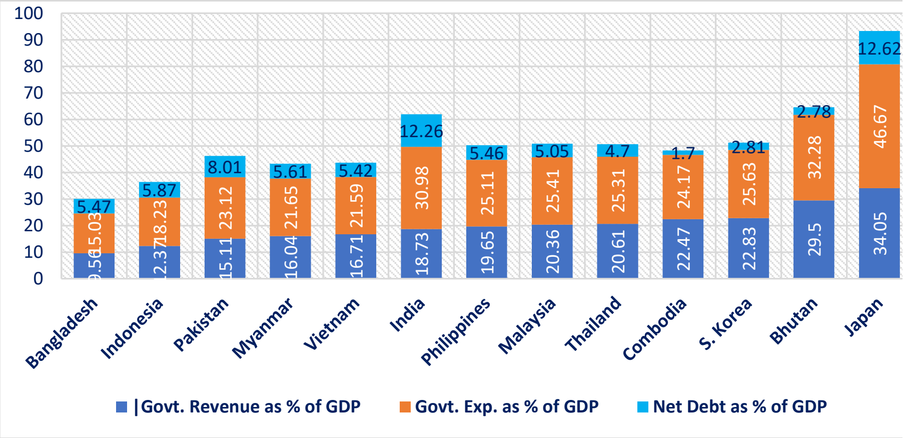

Source : Wikipedia

চ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এ.ডি.পি) :

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এ.ডি.পি) :

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই করতে সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন, যেমন- যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানি এবং জীবনমান উন্নয়নে সংশিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন অন্যতম পূর্বশর্ত। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে সরকার পরিচালন ব্যয় মিটানোর পাশাপাশি সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে দেশের আকার, আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো গড়ে তুলতে এখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন। একারণে সরকারের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা যেমন জরুরি, তেমনি সরকারিব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করে দেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরাও অত্যন্ত জরুরি। Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর জানুয়ারি ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে অবকাঠামো উন্নয়নে বছরে গড়ে ইউ.এস.ডলার ২৪ বিলিয়ন বিনিয়োগ প্রয়োজন, যারমধ্যে ২০১৪ সালে ২.৯ বিলিয়ন, ২০১৫ সালে ৩.৮ বিলিয়ন, ২০১৬ সালে ১৫.৫ বিলিয়ন, ২০১৭ সালে ৩১.৪ বিলিয়ন এবং ২০১৮ সালে ৪৬ বিলিয়ন ডলার এরিমধ্যে বিনিয়োগ হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর ২০১৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০-২০২০ সময়কালে অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রয়োজন ১৪৫.০০ বিলিয়ন ডলার, বছরে গড়ে ১৩.১৭৩ বিলিয়ন ডলার, জি.ডি.পি অনুপাতে যা দাঁড়ায় ১১.৫৬%, যারমধ্যে পরিবহণখাতে প্রয়োজন জি.ডি.পি অনুপাতে ৪.৯২%, বিদ্যুৎখাতে ১.২৪%, আই.সি.টি ৪.২৪% এবং পানি উন্নয়নে ১.১৯%।

তাছাড়া, ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছানোর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রয়োজন আরোও কয়েকগুণ বেশি। অক্সফোর্ড ইকোনমিক্স এর হিসাবে ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চআয়ের দেশের তালিকায় পৌঁছাতে ২০১৬-২০৪০ সময়কালে অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের আরোও ৬০৮.০০ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন।

SJFRD

অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪০ সাল নাগাদ এখাতে বিনিয়োগ ঘাটতি থেকে যাবে ১৯১.০০ বিলিয়ন ডলার। ঐ রিপোর্টের হিসাবে ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জি.ডি.পি আকার দাঁড়বে ইউ.এস ডলার ৮৭৯ বিলিয়ন এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে গড়ে ৫.৭%।

অক্সফোর্ড ইকোনমিক্স এর হিসাব অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান ধারা এবং ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ [স্মারণী-৫.১৮(১৮)] এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো ।

স্মারণী-৫.১৮(১৮) : অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশে বিনিয়োগের বর্তমান ধারা এবং ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রাক্কলনের চিত্র :-

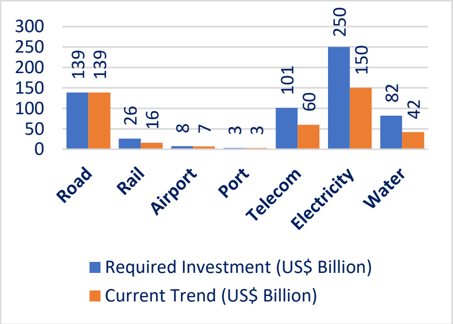

Source: AIIB Report 2019 and OXFORD Economic Report 2017

১) খাতওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

বর্তমান আওয়ামিলীগ সরকারের আমলে খাতওয়ারি উন্নয়ন বরাদ্ধ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে পাঁচটি সেক্টর সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও গ্রাম উন্নয়ন। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে উন্নয়ন ব্যয়ের গড়ে প্রায় ৭০ শতাংশ এ পাঁচটিখাতে

খাতওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

ব্যয় হয়েছে, যারমধ্যে প্রথমস্থানে রয়েছে পরিবহণ সেক্টর, এসময়কালে এ পাঁচখাতে সন্মিলিত ব্যয়ের গড়ে ২৪.৪০% এখাতে ব্যয় হয়েছে। দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে বিদ্যুৎ, সন্মিলিত ব্যয়ের ২৩.৭৪%, শিক্ষা তৃতীয়স্থানে, সন্মিলিত ব্যয়ের ১৮.৩৪%, গ্রাম উন্নয়ন চতুর্থস্থানে, সন্মিলিত ব্যয়ের ১৭.৪৩% এবং পানি সরবরাহ পঞ্চম স্থানে রয়েছে, যেখানে সন্মিলিত ব্যয়ের ১৬.০৯% ব্যয় হয়েছে। এ.ডি.পি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপে রয়েছে -কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পানিসম্পদ সেক্টর এবং তৃতীয় ধাপে রয়েছে তেল ও গ্যাস, যোগাযোগ, জনপ্রশাসন ও শিল্প সেক্টর। বলা বাহুল্য, তৃতীয় ধাপের এ চারটি সেক্টরে উন্নয়ন বরাদ্ধ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে রয়ে গেছে স্মারণী-৫.১৮(১৯) ।

স্মারণী-৫.১৮(১৯) : অর্থবছর ২০১৬-১৭ অনুযায়ী খাতওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র :-

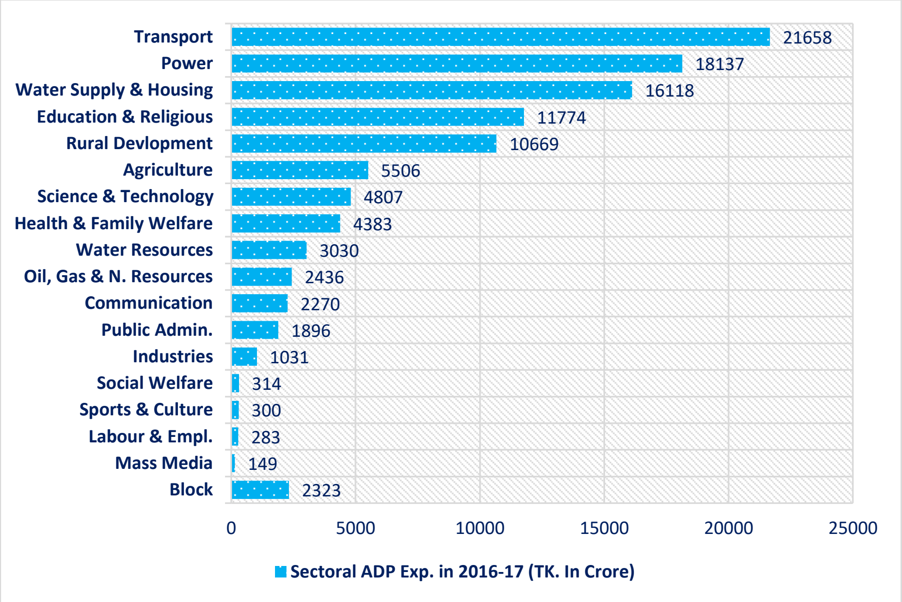

Source: BD Economic Review

স্মারণী-৫.১৮(২০) : অর্থবছর ২০০০-০১ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালের খাতওয়ারি সমন্বিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র :-

Sector	Financial Year						
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Transport	3,847.10	5364.03	8208.10	10197.61	13701.29	16660.23	21657.86
Power	6,189.92	7179.65	8868.01	7843.99	8230.78	15558.46	18136.89
Water Supply & Housing	3,062.41	4000.82	4325.37	5085.47	8325.17	12564.44	16118.00
Education & Religious	4,879.22	4660.74	6461.72	7954.45	8840.21	9957.88	11773.89
Rural Development	4,398.16	4905.58	6771.38	7138.77	8399.26	8924.60	10669.09
Agriculture	2,093.36	2423.37	2696.17	3420.05	3927.78	4867.51	5506.41
Science & Technology	137.91	124.83	260.51	1413.66	4584.38	1959.82	4806.82
Health & Family Welfare	2,865.20	2966.33	3508.84	3717.52	4128.24	4438.29	4382.74
Water Resources	1,155.26	1268.40	1593.42	1833.62	1922.27	2482.45	3030.41
Oil, Gas & N Resources	990.02	746.02	1629.82	1832.38	1879.71	2008.34	2435.90
Communication	261.80	839.65	685.81	631.62	1237.72	1764.13	2269.82
Public Administration	820.59	716.59	880.80	895.62	1174.12	1195.07	1895.64
Industries	344.78	932.95	1713.71	2374.66	1366.53	1356.58	1031.46
Social Welfare	277.74	292.13	391.21	408.62	342.93	382.11	314.34
Sports & Culture	342.69	132.87	172.79	262.51	162.75	252.87	300.44
Labour & Employment	34.49	104.44	295.81	336.01	484.13	355.03	282.79
Mass Media	88.59	56.84	53.96	106.23	102.00	119.78	149.02
Block	1,218.20	1304.63	1518.53	1460.76	2405.81	2219.75	2323.00
Total ADP Exp. :	**33,007.44**	**38019.85**	**50035.27**	**56913.45**	**71215.08**	**87067.34**	**107084.55**

Source: BD Economic Review

২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার :

রাজস্ব আদায় পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে বিভিন্ন সেক্টরে চাহিদানুযায়ী পর্যাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ নিশ্চিত করা অদ্যাবধি কোনো সরকারের আমলেই সম্ভব হয়ে উঠেনি। অর্থবছর ২০১০-১১ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ সবসময় বাজেট অনুপাতে ২৫-৩০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ.ডি.পি বাস্তবায়নের হার ছিল ৯০ শতাংশের মধ্যে। তবে বর্তমান আওয়ামিলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে জাতিয় বাজেটের আকার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধের এ চিত্র কিছুটা পাল্টাতে থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ বাস্তবায়নের হার :

২০১০-১১ অর্থবছরে সমন্বিত জাতিয় বাজেটের আকার ছিল টাকা ১৩০,০১১ কোটি এবং বার্ষিক সমন্বিত উন্নয়ন বরাদ্ধ ছিল টাকা ৩৫,৮৮০ কোটি, বাজেট অনুপাতে যা ২৭.৬০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতিয় বাজেটের সমন্বিত আকার দাঁড়ায় টাকা ৪৪২,৫৪১ কোটি এবং বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ টাকা ১৬৭,০০০ কোটি, বাজেট অনুপাতে যা ৩৭.৭৪%। এ নয় বছরের ব্যবধানে সমন্বিত বাজেটের আকার বেড়েছে টাকা ৩১২,৫৩০ কোটি এবং সমন্বিত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্ধ বেড়েছে টাকা ১৩১,১২০ কোটি, অর্থাৎ এ সময়কালে এ.ডি.পি বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে টাকা ১৪,৫৬৯ কোটি। এ সময়কালে এ.ডি.পি বরাদ্ধ ছিল সংশোধিত বাজেট অনুপাতে গড়ে ৩২ শতাংশের বেশি এবং বাস্তবায়নের হার গড়ে ৯৫% এর উপরে । বিগত নয় বছরে এ.ডি.পি বরাদ্ধ বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে গড়ে ৪.৫৯ শতাংশ স্মারণী-৫.১৮(২২)।

স্মারণী-৫.১৮(২১) : অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বার্ষিক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের চিত্র :-

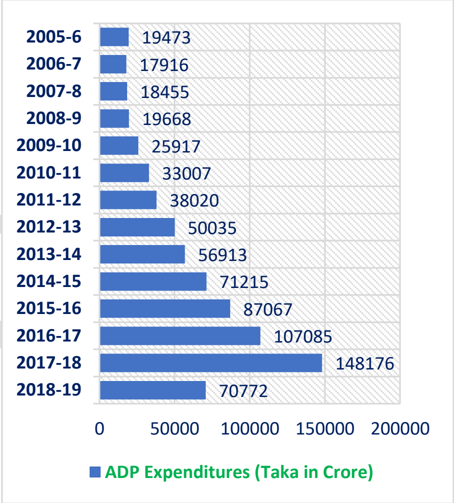

Source: MOF Budget Summary Note : * up to March 2019

স্মারণী-৫.১৮(২২) : অর্থবছর ২০০৫-৬ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের বার্ষিক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নর হার :-

F. Year	Revised Budget (TK in Crore)	ADP Allocation (Revised)				Actual ADP Exp.	
		TK. In Crore	Allocation as % of Budget	Growth %		Taka in Crore	%
2005-6	61,058	21,500	35.21			19,473	90.57
2006-7	66,836	21,600	32.32	-8.22		17,916	82.94
2007-8	93,608	22,500	24.04	-25.63		18,455	82.02
2008-9	94,140	23,000	24.43	1.64		19,668	85.51
2009-10	110,523	28,500	25.79	5.55		25,917	90.94
2010-11	130,011	35,880	27.60	7.02		33,007	91.99
2011-12	161,213	41,080	25.48	-7.67		38,020	92.55
2012-13	189,326	52,366	27.66	8.54		50,035	95.55
2013-14	216,222	60,000	27.75	0.33		56,913	94.86
2014-15	239,668	75,000	31.29	12.77		71,215	94.95
2015-16	264,565	91,000	34.40	9.92		87,067	95.68
2016-17	317,174	110,700	34.90	1.47		107,085	96.73
2017-18	371,495	148,381	39.94	14.44		148,176	99.86
2018-19	442,541	167,000	37.74	-5.52		70,772*	42.38

Source: MOF Budget Summary Note : * up to March 2019

ছ) দেশের চলমান রাজস্বখাতের মূল্যায়ন :

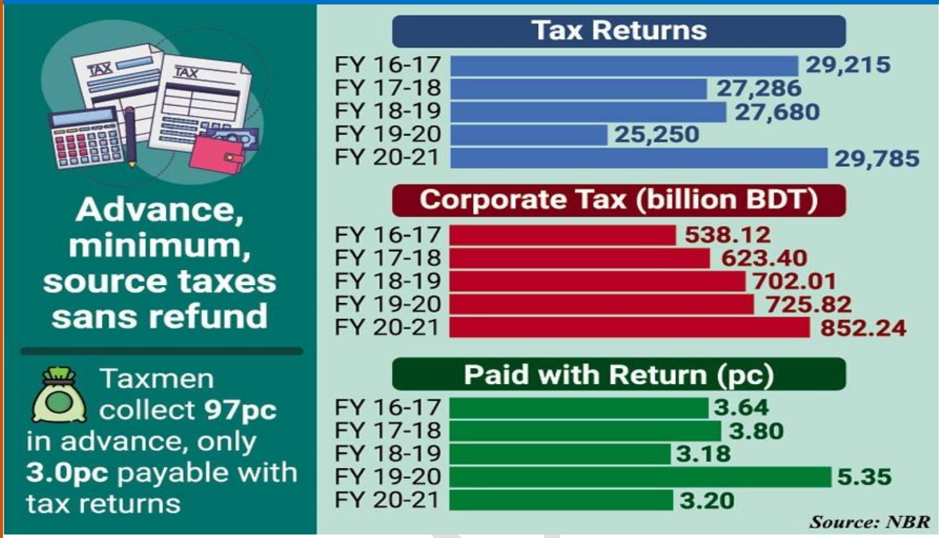

চলমান রাজস্বখাতের মূল্যায়ন :

রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের দিকথেকে বাংলাদেশ বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অদ্যাবধি অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের উল্ল্যেখযোগ্য খাতসমূহের মধ্যে- ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত আয়কর ও ভ্যাট, আমদানি ও রপ্তানির বিপরীতে অর্জিত শুল্ক এবং বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত রাজস্ব আয় উল্ল্যেখযোগ্য। জাতিয় বাজেটে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো সরকারের আমলেই লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭০%-৮৫% এর বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়নি স্মারণী-৫.১৮(২৩)। রাজস্ব আয় পর্যাপ্ত বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য বিদেশি ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হচ্ছে না।

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ছে আভ্যন্তরীণ ভোগ ও চাহিদা, ফলে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে দেশের অর্থনীতির আকার ও পরিধি, আর এসব কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারি সেক্টরগুলোর পরিধি ও জনবল এবং সেই সাথে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ, কিন্তু সে হারে বাড়ছেনা রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ও পরিধি। তাছাড়া, পুরোপুরি বিদেশি ঋণর্ভির না হয়ে নিজস্ব অর্থায়নে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা এখন সময়ের দাবিতে পরিনত হয়েছে। পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় না হওয়ায় ফলে জাতিয় বাজেটের আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি সমানতালে বৃদ্ধিপাচ্ছে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ এবং এ ঘাটতি পূরণ করতে প্রতিবছর বাড়ছে দেশি বিদেশি ঋণের পরিমাণ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যার পমিাণ দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৯১.৫২৪ বিলিয়ন (মাথাপিছু ৫৬৭ ডলার) [স্মারণী-৫.১৮(১৬)]।

২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের তালিকায় পৌছাতে আগামী দিনগুলোতে জাতিয় বাজেটের আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আরোও অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা, রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরা ব্যতিত নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার স্বপ্নদেখা অবান্তর, আর যতদিন না নিজস্ব অর্থায়নে পর্যাপ্ত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে, ততদিন উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখাও আমাদের পক্ষে অধরা রয়েই যাবে।

স্মারণী-৫.১৮(২৩) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে মোট আহরিত রাজস্ব অনুপাতে এন.বি.আর ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের চিত্র :-

Description	Financial Year (Taka in Billion)							
	2010-11	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Total Revenue :	**928.47**	**1,396.70**	**1,829.54**	**2,084.43**	**2,427.52**	**2,879.90**	**3,392.80**	**3,778.10**
NBR Tax Revenue :								
i) Income Tax	*210.05*	353	560.86	649.71	719.4	851.76	1,007.19	1,139.12
ii) As % of Total Revenue	*22.62*	*25.27*	*30.66*	*31.17*	*29.64*	*29.58*	*29.69*	*30.15*
i) Value Added Tax :	*270.92*	404.66	550.13	642.63	727.64	912.54	1,105.54	1,230.67
ii) As % of Total Revenue	*29.18*	*28.97*	*30.07*	*30.83*	*29.97*	*31.69*	*32.58*	*32.57*
i) Customs Duties	*244.93*	364.93	386.21	471.36	584.48	717.6	849.28	886.21
ii) As % of Total Revenue	*26.38*	*26.13*	*21.11*	*22.61*	*24.08*	*24.92*	*25.03*	*23.46*
Sub-total :	**725.9**	**1,122.59**	1,497.20	1,763.70	2,031.52	2,481.90	2,962.01	3,256.00
As % of Total Revenue	**78.18**	**80.37**	**81.83**	**84.61**	**83.69**	**86.18**	**87.30**	**86.18**

Source : BD Economic review

জ) সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এবং ২০৪১ সালের লক্ষ্য অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগামীতে সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা ও প্রশাসনিক অবকাঠামো পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করার পাশাপাশি দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিজস্ব অর্থায়ন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আগামী দিনগুলোতে সরকার পরিচালন ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিজস্ব অর্থায়ন বৃদ্ধিপাবে এটাই স্বাভাবিক, যার জন্য প্রয়োজন বাড়তি রাজস্ব আয়। অন্যথায় বাজেট ঘাটতি ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাবে, আর বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধিপাবে ব্যাপকভাবে, যাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। কাজেই, আগামীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সরকার পরিচালনায় সরকারের আর্থিক সক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য, যারজন্য প্রয়োজন রাজস্ব আয় পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অর্জিত সরকারি রাজস্বের গড়ে প্রায় ৩২% আয়কর, ৩১% ভ্যাট, ২৪% কাস্টমস্ ডিউটি এবং ১৩% অর্জিত হয় অন্যান্য খাতে।

সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

আয়কর ও ভ্যাটের পরিধি পর্যাপ্ত বৃদ্ধিপূর্বক বাস্তবতার নিরিখে করহার সমন্বয় করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করাই একমাত্র উপায়। কিন্তু সরকার ইচ্ছে করলেই আয়কর বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে পারেন না, যারজন্য প্রয়োজন অনুকুল পরিবেশ পরিস্থিতি ও সার্বজনীন আয়কর আদায় ব্যবস্থা, বাস্তবতার নিরিখে কর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং কর আদায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দেশে ব্যবসা বানিজ্যের অনুকুল পরিবেশ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়ে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ, তন্মধ্যে :-

১. জাতিয় বাজেটে বাস্তবতার নিরীখে রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা, যা আদায় করা সম্ভব।

২. রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে সক্ষমতার ভিত্তিতে আয়কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বণ্টণ এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের :-

   ক) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
   খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ।
   গ) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার অবসান।
   ঘ) দুর্ণীতি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
   ঙ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
   চ) সকলক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরা।

৩. দেশে একটি সহজ, সবার পক্ষে বোধগম্য এবং করদাতাদের করপ্রদান সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত আয়কর ব্যবস্থার প্রচলন করা, যাতে ধনীদের উপর বেশি এবং দরিদ্রদের উপর কম চাপ পড়ে।

৪. ব্যাক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে করহার ও করমুক্ত আয়সীমা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রেখে কর দেওয়ার সামর্থ আছে কিন্তু কর দেওয়া এড়িয়ে যান, এমন জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরুপনে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৫. কর্পোরেট করের ক্ষেত্রেও করহার অন্যান্য দেশের আলোকে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রেখে লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখানো এবং ব্যবসা চালু রয়েছে কিন্তু নিয়মিত আয়কর রিটার্ণ দাখিল করেন না, এমন প্রতিষ্ঠানের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা।

৬. কর বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে **" অধ্যায় ৫.১৯ - কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন "** এ প্রস্তাবিত সুপারিশ সমূহের বাস্তব ভিত্তি যাছাইয়ের অবকাশ রাখে।

৭. ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে ভ্যাটের পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি ভ্যাট দাতা প্রতিষ্ঠানের উপর আদায়কারি কর্মকর্তার অতিরিক্ত চাপ রয়েছে কিনা অথবা উক্ত কর্মকর্তার যোগসাজসে ভ্যাট ফাঁকি সংঘটিত হচ্ছে কিনা প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ক্ষতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি।

৮. শুল্ক বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে দেশে ব্যবসা বানিজ্যর গতি প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প সেক্টরের প্রসার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া জরুরি। কেননা, শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যে গতিশীলতা আসবে, পাশাপাশি বৃদ্ধি পাবে শুল্ক বাবদ রাজস্ব আয়।

৯. রাজস্ব আয়ের উপর চাপ কমাতে **"সরকারি ব্যয় সংকোচন"** নীতি কার্যকর ফল দেবে সন্দেহ নেই।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৫.১৯

কর ব্যবস্থা সহজীকরন।

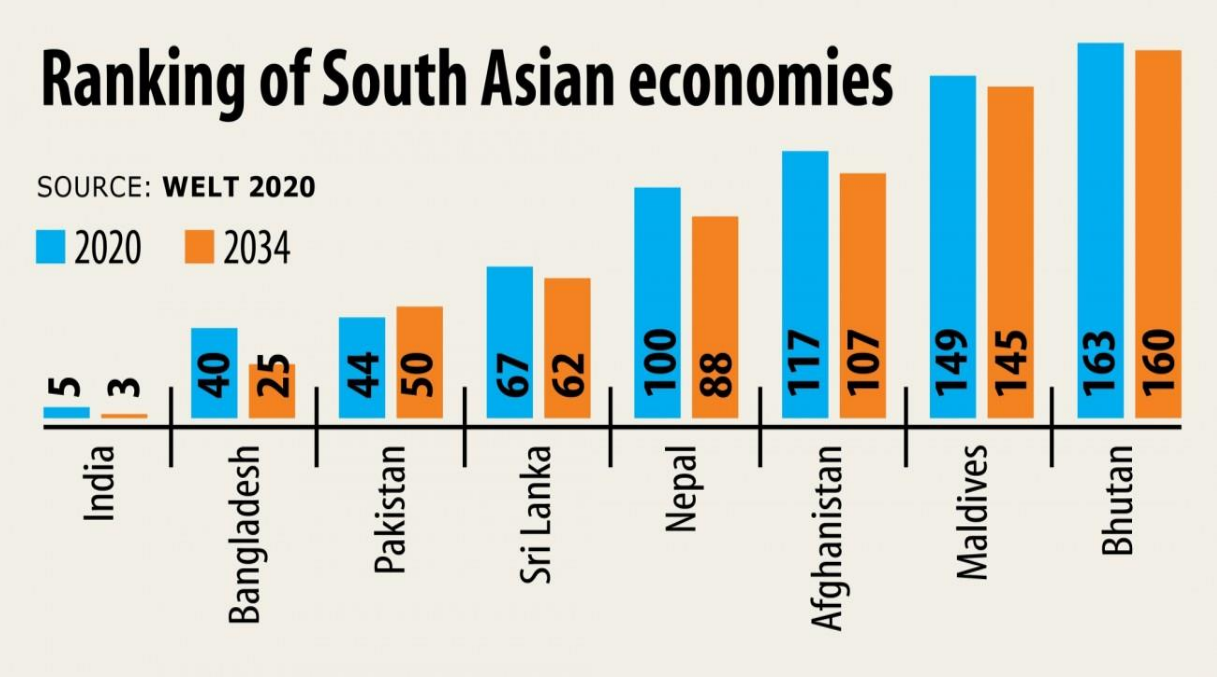

কর ব্যবস্থা সহজীকরন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) দেশে কর ব্যবস্থার সহজীকরন।
- ১) বিদ্যমান আইনের আওতায় কর আদায়।
- ২) আহরিত করের পরিমাণ কি দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ?
- ৩) আয়কর আহরণ প্রবৃদ্ধি/ঘাটতির চিত্র।
- ৪) বিশ্বব্যাপি ব্যাক্তিগত ও কর্পোরেট পর্যায়ে কর হার।

খ) দেশে বিদ্যমান আয়কর ব্যবস্থার মূল্যায়ন।

গ) কর আদায় ব্যবস্থা সহজীকরনে প্রস্তাবনা।
- ১) ব্যাক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে।
- ২) কর্পোরেট করের ক্ষেত্রে।

ক) দেশে কর ব্যবস্থার সহজীকরন :

দেশে কর ব্যবস্থার সহজীকরন :

একটি উন্নত কর ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সহজ, সবার পক্ষে বোধগম্য এবং করদাতাদের করপ্রদান সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে ধনীদের উপর বেশি এবং দরিদ্রদের উপর কম চাপ পড়ে। এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রগতিশীল হওয়া উচিৎ, যাতে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে সম্পদ বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। দেশে যতবেশি ব্যবসা বানিজ্যের অনুকুল পরিবেশ বিরাজ করবে, ব্যবসা বানিজ্যের তত বেশি প্রসার ঘটবে এবং নাগরিকদের মাঝে কর প্রদান সক্ষমতা ততবেশি বৃদ্ধিপাবে। কাজেই, জনগণের কাছথেকে আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশে ব্যবসা বানিজ্যের পর্যাপ্ত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, যারমধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ এবং ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়ন অন্যতম, যাতে জনগণের কর প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অন্যথায় নাগরিকদের মাঝে কর প্রদানে অনীহা এবং কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবনতা কখনোই কমবেনা এবং রাজস্ব আহরণে সরকারি লক্ষ্যমাত্রা সবসময়ই ব্যার্থ হতে বাধ্য। উদাহরনস্বরুপ, ইউরোপের দেশগুলোতে আয়কর আদায়ের হার গড়ে জি.ডি.পি অনুপাতে ৪০ শতাংশের উপরে, যেখানে বাংলাদেশে ৯.১ শতাংশ। তথাপি সেখানে কর প্রদানে কেউ অনাগ্রহী হয়না, কারন সেখানে সরকার নির্ধারিত কর প্রদান সক্ষমতা জনগনের রয়েছে।

দেশের প্রচলিত আয়কর আইন জটিল হওয়ার কারণে আয়কর আদায় পদ্ধতিও যথেষ্ট জটিল। ফলে এদেশের মানুষ সাধারণত স্বতঃস্ফুর্তভাবে আয়কর প্রদানে আগ্রহী হয়না এবং যারা নিয়মিত আয়কর রিটার্ণ দখিল করেন, আয়কর আইনের জটিলতা ও ফাঁক ফোকরের কারণে তাদের ভোগান্তিও চরমে। আয়কর আইনের জটিলতার সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একশ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারির স্বেচ্ছাচারিতা, ঘুষ, দুর্ণীতি ও অসাধু উপায়ে কর নির্ধারণের কারণে সরকার প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে একথা কম বেশি সবার জানা। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুতই প্রসারলাভ করছে, দেশে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ঘটছে, ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, পাশাপাশি বাড়ছে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনযাত্রার মান। সঙ্গত কারণে দেশে ব্যবসা বনিজ্য প্রসারের পাশাপাশি ব্যাক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কর প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিপাবে এবং দেশের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু বাস্তবে সে তুলনায় বাড়ছেনা সরকারের রাজস্ব আয়।

SJFBD

আয়কর এমন একটি বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা, যা সবসমসয় সবদেশে চালু ছিল, বর্তমানেও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বিশ্বের প্রায় সব দেশই সরকার পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য আয়করখাতে অর্জিত রাজস্বের উপর নির্ভরশীল। তাই দেশের আয়কর ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ সহজ ও সর্বসাধারণের বোধগম্য, যাতে দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রচলিত আয়করের নিয়মনীতি বুঝে শুনে নিজস্ব উদ্যোগে স্বপ্রণোদিত হয়ে আয়কর প্রদানে আগ্রহী হয়।

তাছাড়া, আয়কর আদায় পদ্ধতি এমন হওয়া উচিৎ যাতে বাস্তবসন্মতভাবে আরোপিত আয়কর বাবত সরকারের ন্যায্য পাওনা আদায়ে কারো ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভর করতে না হয় এবং আইনের

স্মারণী-৫.১৯(১) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে এন.বি.আর ও এন.বি.আর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের চিত্র :-

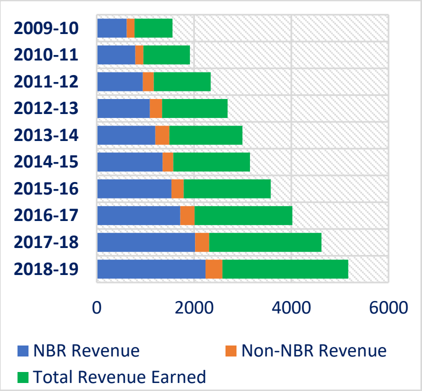

Source: NBR

ফাঁকফোকরে কেউ যাতে কর ফাঁকি দিয়ে কালো টাকার মালিক হতে না পারে। কারণ, কালো টাকা সবসময় দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকি এবং সুযোগ পেলেই পাচার হয়ে যায়। দেশের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক বা দুর্বোধ্য হলে দেশের অর্থনীতি যতই প্রসারিত হউকনা কেন, সরকারের রাজস্ব আয় কখনোই কাঙ্কিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পাবেনা এটা সর্বজনস্বীকৃত।

অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে রেভেনিউ বিশ্লেষণে দেখাযায়, এ দশ বছর সময়কালে এন.বি.আর আহরিত রেভেনিউ লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে গড়ে বছরে ৯১.৯৯%, যা দেশের মোট আহরিত রেভেনিউ অনুপাতে গড়ে ৮৩.৬৫% এবং মোট আহরিত রেভেনিউ অনুপাতে আয়কর বাবদ রেভেনিউ সংগ্রহ গড়ে ২৭.০৭% [স্মারণী-৫.১৯(২)] ।

স্মারণী-৫.১৯(২) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে এন.বি.আর এবং এন.বি.আর বহির্ভূত রাজস্ব আহরনের চিত্র :-

(Taka in Billion)

Fiscal Year	NBR Revenue					Non-NBR Revenue	Total Revenue (National)	NBR Achieve ment	NBR Revenue as % of Total Revenue	Income tax as % of total Revenue
	Revenue Target	Tax	VAT	Duty	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8 =6+7)	(9)	(10)	(11)
2009-10	610.00	174.28	217.62	228.51	620.42	159.12	779.54	101.71	79.59	22.36
2010-11	725.90	234.20	280.24	279.60	794.03	164.71	958.74	109.39	82.82	24.43
2011-12	918.70	291.34	345.73	313.53	950.59	222.79	1,173.38	103.47	81.01	24.83
2012-13	1,122.59	377.10	391.29	323.13	1,091.52	254.84	1,346.36	97.23	81.07	28.01
2013-14	1,360.90	438.49	437.26	332.45	1,208.20	289.11	1,497.31	88.78	80.69	29.29
2014-15	1,497.20	483.54	490.14	383.33	1,357.01	219.97	1,576.98	90.64	86.05	30.66
2015-16	1,763.70	523.47	560.81	451.99	1,536.27	252.92	1,789.19	87.10	85.86	29.26
2016-17	2,031.52	538.12	635.62	542.82	1,716.56	295.74	2,012.30	84.50	85.30	26.74
2017-18	2,481.90	623.40	786.94	612.79	2,023.13	288.40	2,311.53	81.52	87.52	26.97
2018-19	2,962.01	729.10	876.10	633.82	2,238.92	347.12	2,586.04	75.59	86.58	28.19
Average	**1,547.44**				**1,353.67**	**249.47**	**1,603.14**	**91.99**	**83.65**	**27.07**

Source: NBR *Note : NBR Revenue target is based on Original Budget.*

১) বিদ্যমান আইনের আওতায় কর আদায় :

বাংলাদেশে আয়কর অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ এর আওতায় কর আহরণ পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এ অর্ডিন্যান্সের ৭৫ ধারা মোতাবেক, প্রত্যেক ব্যাক্তি ডেপুটি কমিশনার আব ট্যাক্সেস বরাবরে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে বাধ্য ক) যদি নির্দিষ্ট আয়বর্ষে তাহার মোট আয় ঐ বছরের জন্য কর অযোগ্য সীমা অতিক্রম করেন; অথবা খ) পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মধ্যে তাহার আয়ের উপর কর নির্ধারিত হয় ।

কোনো নির্দিষ্ট আয়বর্ষে কারো আয় আয়করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলো কি না, ঐ ব্যাক্তির আয়কর রিটার্ণ দাখিল না করা পর্যন্ত আয়কর কতৃপক্ষ তা জানার উপায় নেই। তাছাড়া নির্দিষ্ট আয়বর্ষে কারো আয় ঐ বছরের জন্য আয়কর অযোগ্য সীমা অতিক্রম করলো কি না সে ধারণা এ দেশের কয়জন লোকে রাখে ? যদিওবা রাখে, তাহলে সৎভাবে তা প্রকাশ করার মত মানসিকতা কয়জনেরই বা আছে , তা এখন প্রশ্নের সন্মুখীন। সে কারণেই আয়কর কতৃপক্ষ প্রতিবছর ব্যাপক আয়েজনের মাধ্যমে নতুন করদাতার খোঁজে সার্ভে চালাতে হচ্ছে, আয়কর মেলার আয়োজন করতে হচ্ছে এবং আরোও কত কি ? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত উদ্যোগের পরেও কি পর্যাপ্ত আয়কর আদায় হচ্ছে ? লোকমূখে অহরহ বলতে শোনা যায়, প্রচলিত আয়কর আইন জটিল হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ আয়করের বেড়াজালে আটকা পড়তে ভয় পায়, ফলে ইচ্ছে থাকা সত্বেও অনেকে আয়কর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

বিদ্যমান আইনের আওতায় আয়কর আদায় :

উদাহরণস্বরুপ, HIES 2016 অনুযায়ী দেশে পরিবারের সংখ্যা ৩৯.৩৩ মিলিয়ন, তন্মধ্যে গ্রামে বসবাসরত ২৮.৩৬ মিলিয়ন এবং শহরে বসবাসরত ১১.০৭ মিলিয়ন। ঐ সময়ের হিসাব অনুযায়ী শহরে বসবাসরত ২৫.৭৩% (২.৮৫ মিলিয়ন) এবং গ্রামে বসবাসরত ৫.৩২% (১.৫১ মিলিয়ন) পরিবার পাকা/ বিল্ডিং বাড়িতে বসবাস করেন এবং প্রতিবছর এ সংখ্যা বাড়ছে। ঐ একই সময়ের হিসাব অনুযায়ী সারাদেশে টপ ৫% পরিবারের মাসিক গড় আয় ৪৫,১৭২ টাকা (গ্রামে ৩২,৫৬১ টাকা এবং শহরে ৫৬,৪৩৯ টাকা)। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিচার করলে শুধুমাত্র তারাই পাকা / বিল্ডিং ঘরে থাকে, যাদের আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে। সে দিকথেকে বিচার করলে শুধুমাত্র শহরে বসবাসরত আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারগুলোও যদি আয়কর রিটার্ণ দাখিল করেন, তাহলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমপক্ষে ২.৮৫ মিলিয়ন রিটার্ণ জমা হওয়ার কথা যা প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। অথচ এন.বি.আর ও অন্যান্য সূত্রের মতে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে আয়কর রিটার্ণ জমা পড়েছে যথাক্রমে ১.৫৩ মিলিয়ন, ১.৯ মিলিয়ন, ২.১ মিলিয়ন এবং ২.২ মিলিয়ন মাত্র স্মারণী-৫.১৯(৪) ।

স্মারণী-৫.১৯(৩) : ২০০৫-২০১৬ সময়কালে আহরিত মোট রাজস্ব অনুপাতে ট্যাক্স রেভিনিউ এবং জি.ডি.পি অনুপাতে ট্যাক্স রেভিনিউ :-

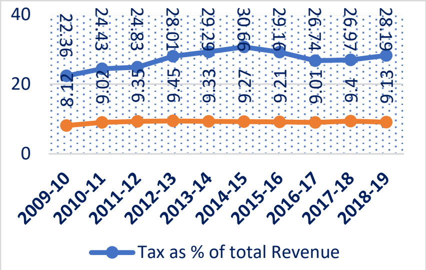

Source: NBR

স্মারণী-৫.১৯(৪) : অর্থবছর ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে ব্যক্তি পর্যায়ে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের চিত্র :-

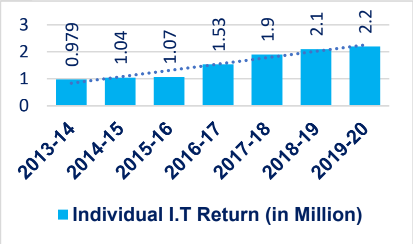

Source: CPD research and other media

২) আহরিত করের পরিমাণ কি দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ?

বিগত এক দশকের (২০১০-২০১৯) ব্যবধানে দেশের জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে গড়ে ৬.৮৯%, জাতিয় বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় চারগুণ, মাথাপিছু আয় ২০১০ সালে যা ছিল ইউ.এস.ডলার ৭৮১.১৫, ২০১৯ সাল নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ১,৮৫৫.৭৪। দেশের অর্থনীতির আকার ও প্রসার এবং ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভাল এটা মানতেই হবে। কিন্তু সে তুলনায় কি কর বাবত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে ?

Income Tax Fair-2021

SJFBD

আহরিত আয়করের পরিমাণ কি দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ?

২০০৯-১০ অর্থবছরে কর বাবত রাজস্ব আদায় ছিল টাকা ১৭৪.২৮ বিলিয়ন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাকা ৭৭৯.৫৪ বিলিয়ন। এ ১০ বছরের ব্যবধানে কর বাবত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিকভাবে টাকা ৫৫৪.৮২ বিলিয়ন, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে টাকা ৫৫.৪৮ বিলিয়ন। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ দেশে ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ১০,৬৬,০০০ টি, যাতে মার্চ ২০২০ নাগাদ সন্নিলিত জমার পরিমাণ টাকা ১২,১০,৪৯৮ কোটি। ২০১৯ সালের ড়িসেম্বর নাগাদ ১ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে এমন ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ৮৩,৮৩৯ টি, ২০০৬ সালের ড়িসেম্বর নাগাদ যার পরিমাণ ছিল ৮,৮৬৭টি, যারমধ্যে :-

১-৫ কোটি টাকার বেশি জমার হিসাব সংখ্যা ৪৩,৫৯৫টি।
২৫-৩০ কোটি টাকার বেশি জমার হিসাব সংখ্যা ৪৩৯টি।
৩০-৩৫ কোটি টাকার বেশি জমার হিসাব সংখ্যা ২৫৬টি।
৩৫-৪০ কোটি টাকার বেশি জমার হিসাব সংখ্যা ১৭৫ ট।
৪০-৫০ কোটি টাকার বেশি জমার হিসাব সংখ্যা ৩১৪টি।
৫০ কোটি টাকার বেশি জমার হিসাব সংখ্যা ১,০৪২টি।
স্মারণী-৫.১৯(৬)

২০০৭ থেকে ২০১৯ সময়কালে দেশে কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ৫,৭৬৭টি। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ১ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে এমন ৮৩,৮৩৯ টি ব্যাংক হিসাবে সন্মিলিত জমার পরিমাণ টাকা ৫,২৬,৯৯৭ কোটি, গড়ে প্রত্যেক হিসাবে ৬,২৮,৫৮,২১৬ টাকা। কোটি টাকার এ হিসাব সমূহে সন্মিলিত জমার এ পরিমাণ ঐ সময়ে দেশের সকল ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত টাকার ৪৩.৫৪%।

স্মারণী-৫.১৯(৫) : ১৯৭২ থেকে ড়িসেম্বর, ২০১৯ সময়কালে দেশে ১ কোটি টাকার বেশি ব্যাংক হিসাব বৃদ্ধির চিত্র :-

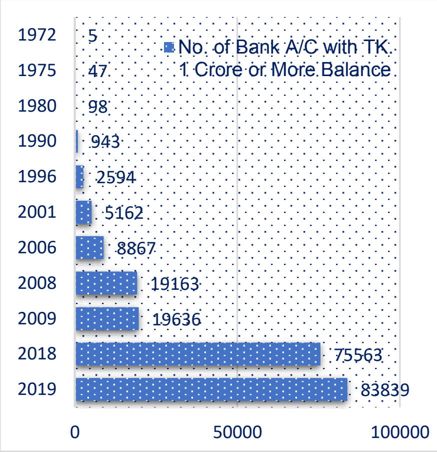

Source: Bangladesh bank Report and Daily Star

স্মারণী-৫.১৯(৬) : ডিসেম্বর, ২০১৯ সাল নাগাদ ১ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে এমন ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা :-

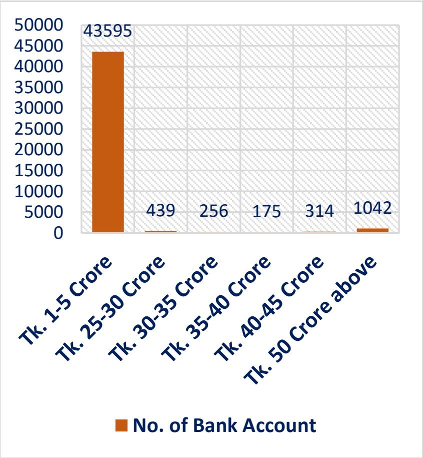

Source : Bangladesh Bank

২০১৮-১৯ করবর্ষে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার জন্য প্রযোজ্য করের হার :-

	মোট আয়	কর হার
১	প্রথম ২৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূণ্য
২	পরবর্তী ৪০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
৩	পরবর্তী ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%
৪	পরবর্তী ৬০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%
৫	পরবর্তী ৩০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২৫%
৬	অবশিষ্ট আয়ের উপর	৩০%

ধরা যাক ১ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে এমন ৮৩,৮৩৯ টি ব্যাংক হিসাবের মধ্যে ২০,০০০টি কর্পোরেট এবং অবশিষ্ট ৬৩,৮৩৯টি ব্যক্তিগত হিসাব। উপরে প্রদর্শিত করহার অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিগত হিসাবে জমাকৃত ৬২৮,৫৮,২১৬ টাকার উপর ২০১৮-১৯ আয়বর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির আয়করের পরিমাণ দাঁড়ায় গড়ে টাকা ১৮৪,১৭,৪৬৫/=, সেই হিসাবে :-

SJHBD

১) ৬৩,৮৩৯ টি ব্যাক্তিগত ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে প্রদেয় কর = টাকা ১১৭,৫৭৫ কোটি।
(১৮৪,১৭,৪৬৫ x ৬৩,৮৩৯)

২) ২০,০০০ কর্পোরেট হিসাবের বিপরীতে - বিভিন্ন সূত্রমতে ঐ অর্থবছরে কর্পোরেট ট্যাক্স আদায় হয়েছিল = টাকা ২৭,৩৭৫ কোটি।

৩) ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ দেশে ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ১০,৬৬,০০০টি। কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে এমন এ্যাকাউন্ট বাদে অবশিষ্ট ব্যাংক হিসাবের ৩০% ও যদি গড়ে ৫০,০০০/= টাকা আয়কর প্রদান করেন, তাহলে ঐ করবর্ষে কর বাবদ আয় দাঁড়ায় (৯৮২,১৬১ x ৩০% x ৫০,০০০/=) টাকা ১,৪৭৩ কোটি।

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ করবর্ষে কর বাবদ আয় দাঁড়ায় = টাকা ১৪৬,৪২৩ কোটি।
বাদ : ২০১৮-১৯ করবর্ষে প্রকৃত কর আদায় হয়েছিল .... = টাকা ৭২,৯১০ কোটি।

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ করবর্ষে কর কম আদায় হয়েছিল = টাকা ৭৩,৫১৩ কোটি।
===========

বলা বাহুল্য, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি যেহেতু দ্রুত এগুচ্ছে, কোটি টাকার ব্যাংক হিসাবের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকবে এটা স্বাভাবিক। তবে প্রত্যেক অর্থবছরে আদায়কৃত কর রাজস্ব দেশের ব্যাংক হিসাব সমূহে ঐ অর্থবছরে সংঘটিত লেনদেনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, ব্যাক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ে ব্যাংক লেনদেনের পরিমাণ আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, করযোগ্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যা প্রধান বিবেচ্য।

নোট : উপরের উদাহরণ শুধুমাত্র সার্বিক কর আদায় পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য উপস্থাপিত হয়েছে।

SJFBD

৩) আয়কর আহরণ প্রবৃদ্ধি/ঘাটতির চিত্র :

আয়কর আহরণ প্রবৃদ্ধি/ঘাটতির চিত্র :

আয়কর আহরণে বিভিন্ন জটিলতার কারণে খুব কম অর্থবছরে জাতিয় রাজস্ব বোর্ড তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত দশকে আয়কর সংগ্রহের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮.০৭%, তন্মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২২.১০%, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৪.৩৮%, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২৪.৪০%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৯.৮৮%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৬.২৮%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১০.২৭%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮.২৬%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.৮০%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৫.৮৫% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬.৯৬%। অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩, এ চার বছর আয়কর আদায় প্রবৃদ্ধি ২২% থেকে ৩৪% এর মধ্যে উঠানামা করলেও এ সময়কালে অন্যান্য বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধি ৮%-১৬% এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল [স্মারণী-৫.১৯(৭)]।

স্মারণী-৫.১৯(৭) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে আয়কর রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

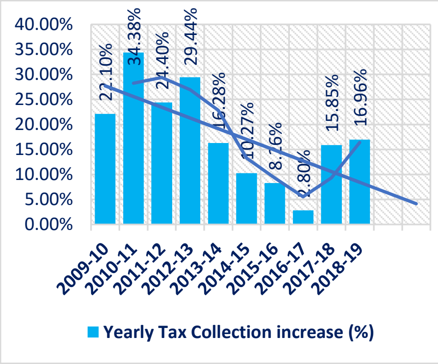

Source: NBR

কর প্রদানে সাধারণ মানুষের মাঝে ভয়ভীতি ও অনিহার কারণে প্রতিবছর বিশাল পরিসরে আয়কর মেলার আয়োজন ও বছরব্যাপি বিভিন্ন আইনি পদক্ষেপ নিয়েও আয়কর আদায়ে বড় ধরনের

স্মারণী-৫.১৯(৮) : অর্থবছর ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এন.বি.আর কতৃক আয়কর আহরণে ঘাটতির চিত্র :-

অগ্রগতি অর্জিত সম্ভব হয়নি। প্রতিবছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় গড়ে প্রায় ২২ শতাংশের উপরে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে এবং এ ঘাটতির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কর আদায়ে ঘাটতি ৯.২১%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ঘাটতি ১৩.৭৯%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৯.৪৩%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৫.২০%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৬.৮১%, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৭.৬১% এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঘাটতি ৩৫.৯১% [স্মারণী-৫.১৯(৮)] ।

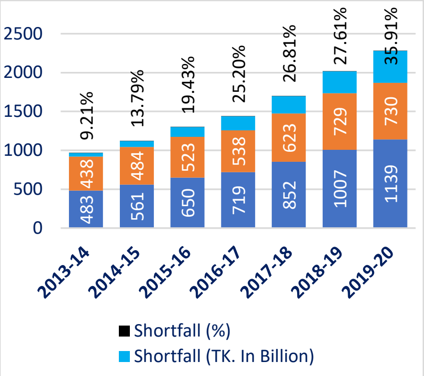

স্মারণী-৫.১৯(৯) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে আহরিত মোট রাজস্ব অনুপাতে আয়কর আহরণ এবং এ সময়কালে আয়কর আহরণ প্রবৃদ্ধির চিত্র :-

Fiscal Year	Revenue		Income Tax		
	Total Revenue (TK. In Billion)	Yearly Increase %	(TK. In Billion)	As % of total Revenue	Yearly growth %
2009-10	779.54	17.57	174.28	22.36	22.10
2010-11	958.74	22.99	234.2	24.43	34.38
2011-12	1,173.38	22.39	291.34	24.83	24.40
2012-13	1,346.36	14.74	377.1	28.01	29.44
2013-14	1,497.31	11.21	438.49	29.29	16.28
2014-15	1,576.98	5.32	483.54	30.66	10.27
2015-16	1,789.19	13.46	523.47	29.26	8.26
2016-17	2,012.30	12.47	538.12	26.74	2.80
2017-18	2,311.53	14.87	623.40	26.97	15.85
2018-19	2,586.04	11.88	729.10	28.19	16.96

Source: NBR

৪) বিশ্বব্যাপি ব্যাক্তিগত ও কর্পোরেট পর্যায়ে কর হার :

বিশ্বব্যাপি ব্যাক্তিগত ও কর্পোরেট পর্যায়ে কর হার :

২০২০ সাল নাগাদ সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী ব্যক্তি পর্যায়ে করের হার দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানে সর্বোচ্ছ ৫৫.৯৫% এবং চীনে দ্বিতীয় সর্বোচ্ছ ৪৫%। তারপরের অবস্থানে রয়েছে ভারত ৪২.৭৪%, দ. কোরিয়ায় ৪২%, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামে ৩৫%, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় ৩০%, মিয়ানমারে ২৫%, শ্রীলংকায় ২৪%, সিঙ্গাপুরে ২২% এবং কম্বোডিয়ায় ২০% [স্মারণী-৫.১৯(১০)] ।

কর্পোরেট ট্যাক্স রেট দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানে সর্বোচ্ছ ৩৫% এবং জাপানে দ্বিতীয় সর্বোচ্ছ ৩০.৬২%। তারপরের অবস্থানে রয়েছে ফিলিপাইন ও ভারত ৩০%, শ্রীলংকা ২৮%, দক্ষিণ কোরিয়া, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশে ২৫%, মালয়েশিয়ায় ২৪%, ভিয়েতনাম, চীন, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডে ২০% এবং সিঙ্গাপুরে ১৭% [স্মারণী-৫.১৯(১১)] ।

স্মারণী-৫.১৯(১০) : ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহে ব্যক্তিগত করের সর্বোচ্চ হার :-

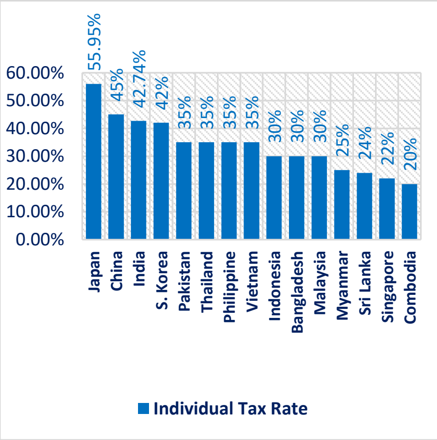

Source : KPMG

২০২০ সালের তথ্যানুযায়ী বিশ্বব্যাপি অঞ্চলভেদে কর্পোরেট ট্যাক্সরেট গড়ে এশিয়ায় ২১.৩২%, ইউরোপে ২০.২৭%, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে ২১.৭৭%, আফ্রিকায় ২৮.৪৫%, উত্তর আমেরিকায় ২৫.৮৫%, দক্ষিণ আমেরিকায় ২৭.২৩%, ওসেনিয়ায় ২৩.৭৫%, ও.ই.সি.ডি ভূক্ত দেশ সমূহে ২৩.৫৯% এবং সারাবিশ্বে গড়ে ২৪.১৮%। অঞ্চলভেদে ব্যাক্তিখাতে ট্যাক্সরেট গড়ে এশিয়ায় ২৮.৬৭%, ইউরোপে ৩১.৩০%, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে ৩৭.৪১%, আফ্রিকায় ৩১.৭৭%, উত্তর আমেরিকায় ৩৫%, দক্ষিণ আমেরিকায় ৩২.৩২%, ওসেনিয়ায় ৩৩.৪০%, ও.ই.সি.ডি ভূক্ত দেশ সমূহে ৪১.২২% এবং সারাবিশ্বে গড়ে ৩১.১৬% [স্মারণী-৫.১৯(১২)]। অর্থাৎ ব্যাক্তি ও কর্পোরেট উভয় পর্যায়ে আয়কর হারের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে।

স্মারণী-৫.১৯(১১) : ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের কর্পোরেট করের হার :-

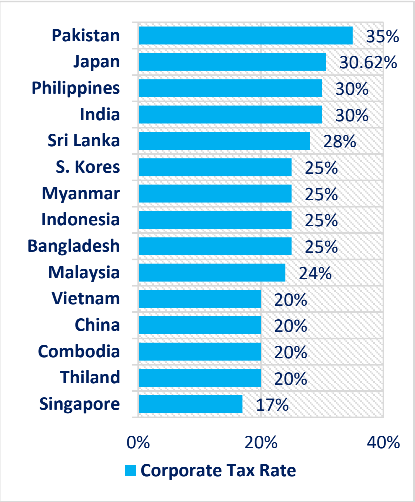

Source : KPMG

স্মারণী-৫.১৯(১২) : ২০২০ সালের তথ্যমতে বিশ্বব্যাপি অঞ্চলভেদে কর্পোরেট ও ব্যাক্তিগত গড় ট্যাক্স রেট :-

Region	Avg. Corporate Tax Rate (%)	Avg. Individual Tax Rate (%)
Asia	21.32	28.67
Europa	20.27	31.30
EU Region	21.77	37.41
Africa	28.45	31.77
North America	25.85	35.00
South America	27.23	32.35
Oceania	23.75	33.40
OECD	23.59	41.22
World Average	24.18	31.16

Source: KPMG

SJPD

খ) দেশে বিদ্যমান আয়কর ব্যবস্থার মূল্যায়ন :

বিদ্যমান আয়কর ব্যবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে , দেশের জি.ডি.পি এবং অর্থনীতির আকার, আয়তন ও প্রসার অনুযায়ী আয়কর আদায় ও আয়কর আদায়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দেশের জনসংখ্যা, পরিবারপ্রতি অর্জিত আয় এবং সরকারের ব্যয়ের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ফলে ঘাটতি বাজেট এ দেশের জাতিয় বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিদ্যমান আয়কর আইনের পদ্ধতিগত জটিলতা, দুর্বোধ্য ও আয়কর সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আয়কর বিষয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে সবসময় ভয়ভীতি কাজ করে, ফলে এদেশে জনগণের মাঝে স্বতঃস্পূর্তভাবে আয়কর প্রদানের প্রবনতা যথেষ্ট কম। আয়কর প্রদানে জনমনে এ ধরনের ভয়ভীতির ফলে এদেশের বেশিরভাগ মানুষ আয়কর প্রদানের ঝামেলা থেকে দুরে থাকতে পছন্দ করেন, ভবিষ্যতে কর রাজস্ব বৃদ্ধিরক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রধান অন্তরায়, যা দেশের ক্রমবর্ধমান সরকার পরিচালন ব্যয় মিটাতে ও ভবিষ্যতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিতে পারে।

দেশে বিদ্যমান আয়কর ব্যবস্থার মূল্যায়ন :

বিদ্যমান আইকর আদায় ব্যবস্থার অন্যতম দূর্বল দিকসমূহের মধ্যে রয়েছে :-

১. আয়করের হার এবং করমুক্ত আয়সীমা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর দ্বারা ধনী ও দরিদ্রের সম্পদ বৈষম্য কমিয়ে আনতে কি পরিমাণ কার্যকর তা পরিমাপ করা মুসকিল।

২. আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় ও সম্পদ অনেকটা অনুমান নির্ভর এবং রিটার্ণে করদাতার সকল ব্যাংক হিসাব প্রদর্শনের নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা খুব কমক্ষেত্রেই করা হয়, ফলে করদাতার প্রকৃত আয় ও সম্পদের তথ্য এতে প্রতিফলিত হয়না।

৩. কোনো ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্ব-ইচ্ছায় আয়কর রিটার্ণ দাখিল না করা পর্যন্ত কর আইনের আওতায় কর প্রদানের যোগ্য এমন করদাতা চিহ্নিত করা দুরুহ এবং বার্ষিক আয়কর রিটার্ণ জমা দেওয়া অথবা না দেওয়া ব্যাক্তি বিশেষের মর্জির উপর নির্ভরশীল। ফলে দেশে করদাতার সংখ্যা ও আদায়কৃত কর রাজস্বের পরিমাণ কাঙ্কিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।

৪. কর আইনের ফাঁক ফোকর, করদাতার চতুরতা এবং কর আদায়কারি কতৃপক্ষের যোগসাজসে কর ফাঁকি দেওয়া বা কর প্রদান এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ এতে বিদ্যমান। ফলে আয়কর রাজস্ব আদায়ে সরকারী লক্ষ্যমাত্রা বরাবরই ব্যার্থ হয় এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কর আদায়ে ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. কর প্রদান প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও দীর্ঘসুত্রিতা, আদায়কারি কতৃপক্ষের হয়রানি, কর অফিসে ঘুষ, দুর্ণীতি ও ভোগান্তির কারণে ইচ্ছা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অগণিত নাগরিক কর প্রদান এড়িয়ে চলেন।

৬. করপ্রদান প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর আইনজীবির সহায়তা ব্যাতিত কর প্রদান করা সম্ভব হয়না, যা সাধারণ করদাতাদের জন্য বাড়তি খরচ ও ঝামেলার বিষয়।

৭. কোম্পানির / প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রিটার্ণের সাথে অডিট রিপোর্ট দাখিল করা বাধ্যতামূলক হলেও অডিট রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা যাছাই করার প্রক্রিয়া এতে নেই। ফলে প্রচুর লাভ হওয়া প্রতিষ্ঠানও কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পার পেয়ে যাওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে।

৮. কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত অনেক বিষয় কর নির্ধারণী কতৃপক্ষের সন্তুষ্টির অথবা মর্জির উপর নির্ভরশীল। উদাহরনস্বরুপ, ব্যাক্তির ক্ষেত্রে পারিবারিক খরচ ও অন্যান্য আয়, কর কতৃপক্ষের ইচ্ছেমত বাড়ানো/কমানো এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে দাবিকৃত পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয় কর কতৃপক্ষের ইচ্ছেমত বাদ দেওয়া ইত্যাদি। অডিট রিপোর্ট যদি নির্ভরশীল হয় তাহলে রিটার্ণে দাবিকৃত খরচ যেমন প্রকৃত খরচ, অন্যদিকে অডিট রিপোর্ট যদি আইনের দৃষ্টিতে পুরোপুরি গ্রহনযোগ্য না হয়, তাহলে এ অডিট রিপোর্টের ভিত্তি কি ?

কাজেই, ভবিষ্যতে দেশের রাজস্ব আয় পর্যাপ্ত বৃদ্ধিকল্পে আয়কর আদায় পদ্ধতি সহজ ও সাধারণের বোধগম্য করে তোলাপূর্বক আয়করকে দেশের প্রধান রাজস্ব হিসাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে এখাতে পর্যাপ্ত রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত।

SJIBD

Amount (in million taka)	FY 2010-14	FY 2015-16	FY 2017-19	FY 2020-21
Tk 20,001-0.1 ml	120	150	nil	nil
Above 0.1 ml to 0.5 ml	350	500	150	150
Above 0.5 ml to 1.0 ml	350	500	500	500
Above Tk 1.0 ml to 10 ml	1000	1500	2500	3000
Above Tk 10 ml to Tk 50 ml	5000	7500	12,000	15,000
Above Tk 50 ml	10,000	15,000	25000	40,000

Compiled by Snehasish and Mahmud Co.

গ) কর আদায় ব্যবস্থা সহজীকরনে প্রস্তাবনা :

কর আদায় ব্যবস্থা সহজীকরনে প্রস্তাবনা :

বিদ্যমান আয়কর আইন অনুযায়ী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে রেগুলার, স্বনির্ধারণী বা সার্বজনীন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের আয়, ব্যয় ও সম্পত্তির বিবরণী সহ এবং কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ নির্দিষ্ট সার্কেলে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার বিধান চালু রয়েছে। বিদ্যমান আয়কর আইনের দুর্বোধ্য নিয়ম কানুনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে এদেশের প্রেক্ষাপটে খুব কম সংখ্যক করদাতার পক্ষে নিজে আয়কর রিটার্ণ সঠিকভাবে তৈরি করে জমা দেওয়া সম্ভব হয়। সিংহভাগ করদাতাই পরামর্শক মারফতে আয়কর রিটার্ণ তৈরি ও জমা দিতে হয়, যাতে বাড়তি খরচের বিষয় রয়েছে।

আয়কর আইনের ফাঁক ফোকর ও দুর্বলতার সুযোগে বেশিরভাগক্ষেত্রে দাখিলকৃত রিটার্ণগুলোতে করদাতার আয়, ব্যয় ও সম্পদের প্রকৃত তথ্যের পরিবর্তে কাল্পনিক তথ্যের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার অহরহ নজির দেখা যায়। এরফলে একদিকে যেমন আয়কর কতৃপক্ষের নিকট করদাতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা উপস্থাপিত হয়না, অন্যদিকে কাল্পনিক তথ্য সম্বলিত দাখিলকৃত ঐ সমস্ত রিটার্ণের ভিত্তিতে ধার্যকৃত আয়কর সরকারের প্রকৃত প্রাপ্য রাজস্ব নয়। এ ব্যবস্থায় সরকার প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে প্রকৃত রাজস্ব প্রপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি রিটার্ণে কাল্পনিক তথ্য সরবরাহের কারণে করদাতার নথিতে তার প্রকৃত আয় ও সম্পদের তথ্য প্রতিফলিত হয়না। আয়কর আইনের বিদ্যমান ফাঁকফোকর ও দুর্বলতার সুযোগে একশ্রেণীর অসাধু লোক তাদের প্রকৃত আয় ও সম্পদের হিসাব আয়কর কতৃপক্ষের নিকট আড়াল করার মাধ্যমে ন্যায্য আয়কর পরিশোধ না করে অবৈধ সম্পদ ও কালো টাকার পাহাড় গড়তে সক্ষম হয়, আর সরকার প্রতিবছর বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে অসাধু উপায়ে অর্জিত হাজার হাজার কোটি টাকার বৈধতা দিয়ে থাকে। যা দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিধারাকেই শুধু বিঘ্নিত করেনা, এর ফলে দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে অর্থপাছার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যমান আয়কর আইনের নিয়ম অনুযায়ী সকলশ্রেণীর করদাতার আয় নিরুপনের ক্ষেত্রে রিটার্ণের সাথে দাখিলকৃত করদাতার ব্যাংক হিসাবকেই মূখ্য বিবেচনা করা হয়। অথচ বহু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছেন যাদের একাধিক (অনেকক্ষেত্রে ৩/৪/৫/৬ কিংবা আরোও বেশি) ব্যাংক হিসাব রয়েছে, যে হিসাবগুলো কখনো আয়কর কতৃপক্ষের নজরে আসে না। কর নির্ধারণী পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিটার্ণের সাথে দাখিলকৃত ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের উৎস এবং তা করদাতার আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা খতিয়ে দেখা হলেও, বেশিরভাগক্ষেত্রে করদাতার দাবিকৃত খরচের গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ভর করে আয়কর কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর। ফলে, করনির্ধারণী পর্যায়ে আয়কর কর্তৃপক্ষের সাথে ঠিকঠাক সমঝোতা না হলে করদাতার প্রকৃত আয় বেশি বা কম হওয়ার ঘটনা এদেশে নৈমিত্তিক ও অহরহ ঘটনা, যা পরবর্তীতে আপিল, ট্রাইব্যুনাল ও হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এত ভোগান্তির রাস্তা পেরিয়ে কেউ স্ব-ইচ্ছায় কর দিতে আসবে এমন আশা অবান্তর।

SPFBD

অথচ, সাধারণ জনগণের বোধগম্য অনুযায়ী দেশে সহজ পদ্ধতিতে আয়কর আদায় প্রক্রিয়া চালু করা গেলে এবং সবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার বিধান রেখে দেশের ব্যাংকগুলোতে চালুথাকা ব্যাংক হিসাব সমূহে জমাকৃত অর্থ থেকে নির্দিষ্টহারে কর কর্তনের ববস্থা সম্বলিত করপ্রথা চালু করা গেলে, একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মাঝে করভীতি দূর হতো, অন্যদিকে সরকার প্রতিবছর ন্যায্য পরিমাণ রাজস্ব আদায়ে সক্ষম হতো এটা নিশ্চিত। এ জন্য প্রয়োজন হবে নির্দিষ্ট অংকের বেশি নগদ লেনদেনের উপর কঠোরভাবে কড়াকড়ি আরোপ করা।

বিদ্যমান আয়কর আইন বহাল রেখে, এতে ছোটখাটো দু-একটি পরিবর্তনের মাধ্যমে সকলের বেধগম্য ও সহজ উপায়ে আয়কর আদায় সম্ভব। যেমন, কোনো নির্দষ্ট আয়বর্ষে কোনো ব্যাক্তির মোট আয় ঐ বৎসরের জন্য নির্ধারিত করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলেই ঐ ব্যাক্তি কর রিটার্ণ দাখিল করতে বাধ্য, এ বিষয়ে কেউ কখনো বিরোধিতা করেছে বলে মনে হয়না, দ্বিমত শুধু ভোগান্তি ও দীর্ঘ সুত্রিতার ক্ষেত্রে।

বিদ্যমান আয়কর আইনের নিয়ম অনুযায়ী আয়কর রিটার্ণের সাথে করদাতার ব্যাংক ষ্ট্যাটম্যাণ্ট দাখিল করা বাধ্যতামূলক। কারণ, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের সাথে আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের সত্যতা যাছাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক ষ্ট্যাটম্যাণ্ট কর নির্ধারণী পর্যায়ে অন্যতম দলিল হিসাবে বিবেচিত। এটা পরীক্ষিত সত্য যে করদাতা ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান যেই হউক না কেন, সংশ্লিষ্ট আয় বর্ষের যাবতীয় আর্থিক নগদ লেনদেন ব্যাতিত অবশিষ্ট সকল আদান প্রদান একমাত্র ব্যংকের মাধ্যমেই সম্ভব। দেখার বিষয় শুধু করদাতার লেনদেনকৃত সকল ব্যাংক হিসাব কর কতৃপক্ষের নজরে আনা হলো কিনা।

সারাদেশে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক নগদ লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা নির্ধারণ পূর্বক অবশিষ্ট সকল লেনদেন চেকের মাধ্যমে সম্পাদনের নিয়ম চালু হলে, যে শ্রেণীর করদাতই হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার সকল আয় ও লেনদেন ব্যাংক ষ্টেটম্যাণ্টে প্রদর্শিত হতে বাধ্য। কেন্দ্রিয় ব্যাংকের নির্দেশনার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যাংকে চলমান সকল ধরনের (সঞ্চয়ী ও চলতি) হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রযোজ্য আয়করসীমা অতিক্রম করার পর থেকে প্রতিটি জমাকৃত অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে অগ্রিম কর কর্তনের বিধান চালু করলে, কর আদায় ব্যবস্থা বহুগুণ সহজ ও ঝামেলামুক্ত হওয়ার পাশাপাশি কর আদায়ের পরিমাণ উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিপাবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অগ্রিম কর কর্তনের ক্ষেত্রে মোট লেনদেদেনের উপর ফ্লাট রেট এ কর কর্তন না করে লেনদেনের ভলিউমকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে কম ভলিউমের জন্য কম রেট এবং অধিকতর বেশি ভলিউমের উপর বেশি রেট এ অগ্রিম কর কর্তনের বিধান থাকা প্রয়োজন, যাতে সংশ্লিষ্ট কর বর্ষে ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য কর হারের সাথে ব্যাংক কতৃক কর্তনকৃত করের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকবে।

বৎসরান্তে প্রত্যেক ব্যাংক হিসাব থেকে কর্তনকৃত টাকার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহ সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কোনো করদাতার বিভিন্ন উৎসে কর্তিত (ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস) কর সন্মিলিতভাবে ন্যায্য করের পরিমাণ থেকে বেশি মনে হলে, ঐ বছরের জন্য তিনি আয়কর রিটার্ণ দাখিল করবেন এবং অতিরিক্ত কর্তনকৃত কর ফেরত /সমন্বয় দাবি করবেন, অন্যথায় করদাতার রিটার্ণ দাখিলের কোনো প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আয়কর কতৃপক্ষের উচিৎ হবে ন্যায্য করের অতিরিক্ত কর্তিত কর সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে করদাতাকে ফেরত দেওয়া অথবা সমন্বয় করা। তাছাড়া, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে রাজস্ব বোর্ডের আয়কর আদায় সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।

বিদ্যমান আয়কর আইনে নিম্নোক্ত সংশোধনী সমূহের মাধ্যমে আয়কর আদায় পদ্ধতি আরোও সহজ ও বেধগম্য করে তোলাপূর্বক আয়কর আদায়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে :-

ক) ব্যাক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে :

SJFBD

১) বিদ্যমান কর আইনের আওতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান চালু রাখার পাশাপাশি প্রত্যেক ব্যাংকে রক্ষিত সঞ্চয়ী হিসাব সমূহে জমাকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করসীমা অতিক্রম হওয়ার পর থেকে জমাকৃত অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে (সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য প্রযোজ্য কর হারের ভিত্তিতে) কর কর্তনের বিধান চালু করা। এক্ষেত্রে মোট লেনদেনের উপর ফ্লাট রেট এ কর কর্তনের পরিবর্তে লেনদেনের ভলিউমকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে বিভিন্ন রেট এ কর কর্তনের বিধান থাকা প্রয়োজন, যাতে ব্যাংক কতৃক কর্তনকৃত কর ঐ বৎসরের জন্য প্রযোজ্য কর হারের ভিত্তিতে করদাতা কতৃক প্রদেয় প্রকৃত করের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। বৎসরান্তে প্রত্যেক ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা কর্তনকৃত টাকার স্বপক্ষে বর্তমান নিয়মে করদাতার অনুকূলে সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। উল্লেখ্য, বর্তমান নিয়মে জমাকৃত অর্থের উপর সারচার্জ ও অন্যান্য চার্জ এ কর্তনের বাহিরে থাকবে।

২) সবার জন্য বাৎসরিক আয়কর রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক না করে শুধুমাত্র কোনো করদাতার সংশ্লিষ্ট আয় বর্ষে তাঁর ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস থেকে কর্তনকৃত অর্থ ঐ বৎসরের জন্য প্রযোজ্য করের চেয়ে বেশি কাটা হলে অথবা অন্য কোনো ভূল ভ্রান্তি কিংবা অযৌক্তিক কিছু ঘটলে সেক্ষেত্রে ঐ করদাতা ইচ্ছে করলে বৎসরান্তে বিদ্যমান আইনে সংশ্লিষ্ট সার্কেলে রিটার্ণ দাখিল করার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্তনকৃত অর্থ ফেরত / সমন্বয় চাইবেন। কর কতৃপক্ষ উক্ত রিটার্ণে প্রদর্শিত তথ্য যাচই বাচইয়ের মাধ্যমে ৬০ দিনের মধ্যে চুড়ান্ত কর নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত কর্তিত কর ফেরত অথবা সমন্বয় করবেন। এ পর্যায়ে কর নির্ধারণে কোনো করদাতা সন্তুষ্ট না হলে বিদ্যমান নিয়মে তিনি আপিলাত জয়েন্ট কমিশনার অব ট্যাক্সেস বরাবরে আপিল করবেন।

৩) প্রবাসীদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট এবং তাদের পাঠানো রেমিটেন্স বর্তমান নিয়মানুযায়ী করমুক্ত থাকবে।

খ) কর্পোরেট করের ক্ষেত্রে :

১) ব্যাংক সমূহে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে জমাকৃত টাকার উপর এন.বি.আর নির্দেশিত হারে কর কর্তন করবেন, যা ঐ বৎসরের জন্য প্রযোজ্য কর্পোরেট কর হারের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদেয় প্রকৃত করের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকবে এবং বৎসরান্তে কর্তনকৃত টাকার সমর্থনে সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।

২) চলমান আয়কর আইনের আওতায় কোম্পানি সমূহ অডিট রিপোর্টসহ নিয়মিত আয়কর রিটার্ণ দাখিল করবেন এবং সংশ্লিষ্ট করবর্ষে ব্যাংক ও অন্যান্য কতৃপক্ষ কতৃক কর্তনকৃত কর সংশ্লিষ্ট করবর্ষে ঐ প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদেয় প্রকৃত করের চেয়ে বেশি হলে তা ফেরত অথবা সমন্বয় দাবি করবেন এবং কম হলে বর্তমান নিয়মে অবশিষ্ট কর রিটার্ণের সাথে জমা দিবেন। আয়কর কতৃপক্ষ সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে তা সুরাহার ব্যবস্থা থাকবে।

SJFBD

গ) সমগ্র দেশে ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান উভয়ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা নির্ধারণপূর্বক সকল লেনদেন চেক মারফত সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

বিদ্যমান আয়কর আইনে উপরোক্ত পরিবর্তন আনয়নের ফলে সরকার ও জনগণ নিন্মোক্তভাবে উপকৃত হবেন :-

১) সকল ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের করযোগ্য আয় থেকে নিয়ম মাফিক প্রকৃত পরিমাণ কর সংগৃহীত হবে। নতুন করদাতার সন্ধানে প্রতিবছর আয়োজন করে আয়কর মেলার প্রয়োজন নেই।

২) আয়কর আইনের জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা ও ফাঁকফোকরের কারণে করদাতার ভোগান্তি ও হয়রানি বন্ধ হবে, কর আদায়ে স্বচ্ছতা আসবে, জনগণের আয়কর ভীতি দূর হবে এবং সরকার জনগণের কাছথেকে প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ে সক্ষম হবে।

৩) যেহেতু প্রত্যেক ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট করবষের্র জন্য প্রযোজ্য কর মুক্ত আয়সীমা অতিক্রম করার পর থেকে ঐ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য হারে কর কাটা হবে, সেহেতু দেশে কালো টাকা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে।

৪) সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে রেজিষ্ট্রি করা হয়, ফলে সরকার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। এ পদ্ধতি অনুস্মরণের ফলে যেহেতু সকল লেনদেন ব্যাংক মারফত সম্পাদিত হবে, সেহেতু এজাতিয় ক্ষেত্রে লেনদেনকৃত অর্থের উপর প্রকৃত রাজস্ব আদায় হবে।

৫) কর আদায়ে বিড়ম্বনা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি এন.বি.আর এর কর আদায় সংক্রান্ত খরচ বহুলাংশে কমে আসবে।

****

SJFBD

অধ্যায় : ৫.২০

সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রিজার্ভ বৃদ্ধি।

সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রিজার্ভ বৃদ্ধি।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
খ) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের গুরুত্ব।
গ) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দিকথেকে দ. এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
ঘ) আভ্যন্তরীন মূলধন গঠন।
ঙ) আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ।
চ) বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ।
  ১. i) Definition of Foreign Exchange Reserve.
  ii) Reserve Management and Why is it Important ?
  iii) Objective of Foreign Exchange Reserve Management.
  iv) Optimal Level of Foreign Exchange Reserves.
  ২) দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ পরিস্থিতি।
  ৩) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহ।
  ৪) কেন বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ?
  ৫) বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
ছ) ব্যালেন্স অব পেমেন্টস।
জ) দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা।

ক) দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি :

দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি :

কোনো দেশের জাতীয় সঞ্চয় বলতে ঐ দেশের ব্যাক্তি ও সরকারি খাতে সঞ্চয়ের সমষ্টিকেই বুঝায়। এটি কোনো দেশের আয় বাদ ভোগ ও সরকারি ব্যয়ের সমান। জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো ব্যাক্তি ও সরকারি পর্যায়ে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া, যার অর্থ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া, যা দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, এবং মাথাপিছু আয় ও জীবন যাত্রার মানবৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা পালন করে এবং জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করে। Savings and investment are the basic requirements for economic growth and development in any nation. Savings and investment have been considered as two macro-economic variables for achieving price stability and promoting employment opportunities thereby contributing to sustainable economic growth (Shimelis, 2014). কাজেই, দেশে ব্যাক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে মূলধন বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে জি.ডি.পি অনুপাতে উল্ল্যেখযোগ্য হারে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধিকরা অপরিহার্য।

জাতীয় সঞ্চয়, যা মূলত পারিবারিক সেক্টর, প্রাইভেট কর্পোরেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টর এবং বিদেশি বিনিয়োগের সমন্বয়ে গঠিত। কোনো দেশের সন্তোষজনক জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঐ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বহিঃপ্রকাশ। জাতীয় সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধি একই সুত্রে গাঁথা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তাই পর্যাপ্ত সঞ্চয় এবং সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনশীলখাতে বিনিয়োগের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। একটি দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য অনুমান ঐ দেশের প্রবৃদ্ধি পরিমাপের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি বিনিয়োগ, বিনিময় হার, আয় এবং সম্পত্তি ইত্যাদি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে উচ্চ হারে জাতীয় সঞ্চয় ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত জরুরি, যা দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া। যে সমস্ত বিষয়ের উপর ব্যাক্তিখাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি নির্ভর করে, তন্মধ্যে- পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ, উচ্চ মাথাপিছু আয়, শিক্ষা, সামাজিক এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ অন্যতম, যার প্রায় সবক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দেশে ব্যাক্তি ও সরকারি খাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পর্যাপ্ত বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগও স্থবির থাকবে এটাই বাস্তব।

বিগত অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণে দেখাযায়, এ দশ বছর সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২০%-২৪%, জাতিয় সঞ্চয় ২৭%-৩০% এবং বিনিয়োগ ২৬%-৩১% এর মধ্যেই উঠানামা করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ছিল জি.ডি.পি অনুপাতে ২০.৮৬% এবং জাতীয় সঞ্চয় ২৯.৪৯%, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে জি.ডি.পি অনুপাতে যথাক্রমে ২৩.৯৩% এবং ২৮.৪১%। অন্যদিকে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ ছিল ২৬.২৩%, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে যা দাঁড়িয়েছে ২৮.৪১%। এ সময়কালে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি গড়ে ১৫.৮১%। এ দশ বছরের ব্যবধানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কোনোটাই কাঙ্কিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পায়নি।

স্মারণী-৫.২০(১) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয় এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগের চিত্র :-

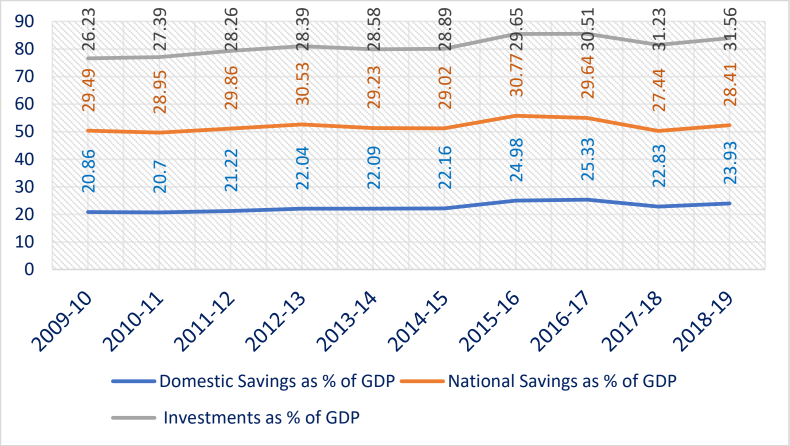

Source : National Accounts

খ) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের গুরুত্ব :

সঞ্চয় এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি অর্থনীতি উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ সংরক্ষণ করে, যা ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধিতে ব্যবহার করে। সঞ্চয় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কাঠামোগত সংস্কার তৈরিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করে, টেকসই অর্থনীতি গড়ার জন্য যা অপরিহার্য। হংকং, দ. কোরিয়া, তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরসহ বেশ কয়েকটি দেশ প্রমাণ করেছে যে মাথাপিছু নিন্ম জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি সত্বেও আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সম্ভব এবং টেকসই উন্নয়নে কার্যকর। এসব দেশে গড়ে জি.ডি.পির প্রায় ৩০% আভ্যন্তরীন সঞ্চয় সংরক্ষিত হয়, যা ঐ সমস্ত দেশে টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করেছে।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের গুরুত্ব :

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করতে অধিক হারে আভ্যন্তরীন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের বিকল্প নেই, কেননা সঞ্চয় প্রবণতার ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং ভোগের মাত্রা সঠিক পর্যায়ে থাকে, যা জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরাসরি ভূমিকা পালন করে। গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কারনে বাংলাদেশে আভ্যন্তরীন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :-

১. সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের ফলে দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে।

২. সঞ্চয় প্রবণতার ফলে দেশে ভোগের মাত্রা সঠিক পর্যায়ে থাকে।
৩. সঞ্চয়ের ফলে দেশের সামগ্রিক মূলধন বৃদ্ধি পায়, যা দেশের অর্থনীতিতে শক্ত ভীত তৈরি করে।
৪. এর ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে টেকসই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতীক।
৫. অর্থনৈতিক দুঃসময়ে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আর্থিক ঘাটতি দেখা দিলে সঞ্চিত অর্থ কাজে লাগে।

বিগত দশকে (অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯) সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় বিশ্লেষনে দেখা যায়, এ দশ বছরের ব্যবধানে দেশের জি.ডি.পির আকার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু জি.ডি.পি অনুপাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সেই তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি স্মারণী-৫.২০(২)।

স্মারণী-৫.২০(২) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে দেশে ভোগ, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের চিত্র :-

(TK. In Billion)

Items		Financial Year								
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1) GDP (TK. In Billion)	7,975	9,158	10,552	11,989	13,437	15,158	17,329	19,758	22,505	25,362
Consumption :										
i. Public	405	467	532	614	717	819	1,021	1,185	1,431	1,598
ii. Private	5,911	6,803	7,781	8,734	9,751	10,980	11,979	13,569	15,935	17,696
2) Total Consumption	6,316	7,270	8,313	9,348	10,468	11,799	13,000	14,754	17,366	19,294
3) Yearly Growth (%)	12.44	15.10	14.35	12.45	11.98	12.71	10.18	13.49	17.70	11.10
4) Consumption (% of GDP)		79.30	78.78	77.96	77.91	77.84	75.02	74.67	77.17	76.07
Investment :										
i. Public	373	482	608	796	880	1,034	1,155	1,465	1,794	2,071
ii. Private	1,721	2,030	2,374	2,607	2,960	3,345	3,983	4,564	5,235	5,934
5) Total Investment	2,094	2,512	2,982	3,403	3,840	4,379	5,138	6,029	7,029	8,005
6) Yearly Growth (%)	13.31	19.96	18.71	14.12	12.84	14.04	17.33	17.34	16.59	13.89
7) Investment (% of GDP)	26.23	27.39	28.26	28.39	28.58	28.89	29.65	30.51	31.23	31.56
8) Domestic savings (% of GDP)	20.86	20.70	21.22	22.04	22.09	22.16	24.98	25.33	22.83	23.93
9) National Savings (% of GDP)	29.49	28.95	29.86	30.53	29.23	29.02	30.77	29.64	27.44	28.41

Source: BD Economic Review

গ) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দিকথেকে দ. এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দিকথেকে দ. এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছনের সারিতে অবস্থান করছে। বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বাংলাদেশে ২৪.৮%, কম্বোডিয়ায় ২৫.৮%, ভারতে ২৮%, মালয়েশিয়ায় ২৮.৫%, মিয়ানমারে ২৯.৬%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৩.৩%, থাইল্যান্ডে ৩৩.৮%, দ. কোরিয়ায় ৩৪.২%, চীনে ৪৪.৯% এবং সিঙ্গাপুরে ৫৩.৮%। এ সময়কালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এ হার গড়ে ৩৪% স্মারণী-৫.২০(৩)।

স্মারণী-৫.২০(৩) : ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের চিত্র :-

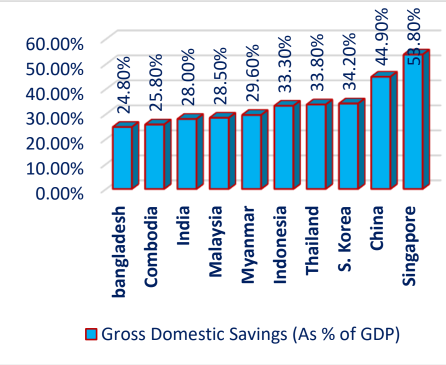

Source: World Bank Data

ঘ) আভ্যন্তরীন মূলধন গঠন :

আভ্যন্তরীন মূলধন গঠন :

আভ্যন্তরীন মূলধন বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাক্তি ও সরকারি পর্যায়ে আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধিকেই বুঝায়। কোনো দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আভ্যন্তরীণ মূলধন বৃদ্ধি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি, কেননা একমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। আভ্যন্তরীন মূলধন গঠণ, আভ্যন্তরীন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল।

অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বাংলাদেশে আভ্যন্তরীন স্থায়ী মূলধন (গ্রস) গঠন জি.ডি.পি অনুপাতে ২৭% থেকে ৩১% এর মধ্যে উঠানামা করেছে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাক্কলন অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে টাকা ৮,০০৫,৩৩৪ মিলিয়ন, জি.ডি.পি অনুপাতে যা ৩১.৫৬% (পাবলিক ৮.১৭% এবং প্রাইভেট ২৩.৪০%) স্মারণী-৫.২০(৪) ।

স্মারণী-৫.২০(৪) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ স্থায়ী মূলধন (গ্রস) গঠনের চিত্র :-

Financial Year	Public		Private		Total	
	TK. In Million	% of GDP	TK. In Million	% of GDP	TK. In Million	% of GDP
2010-11	481,504	5.26	2,029,788	22.16	2,511,292	27.42
2011-12	608,020	5.76	2,374,233	22.50	2,982,253	28.26
2012-13	796,211	6.64	2,607,486	21.75	3,403,697	28.39
2013-14	879,912	6.55	2,960,024	22.03	3,839,936	28.58
2014-15	1,033,929	6.82	3,344,722	22.07	4,378,651	28.89
2015-16	1,154,916	6.66	3,983,470	22.99	5,138,386	29.65
2016-17	1,464,719	7.41	4,563,583	23.10	6,028,302	30.51
2017-18	1,794,172	7.97	5,235,183	23.26	7,029,355	31.23
2018-19(p)	2,071,192	8.17	5,934,143	23.40	8,005,334	31.56

Source : National Accounts

ঙ) আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ :

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার শর্তাবলী পুরণ করার বিষয়ে ইতিমধ্যে জাতিসংঘ স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যা ২০২৪ সালে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। লক্ষ্য এখন ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পৌছানোর জন্য এস.ডি.জি ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা, যারমধ্যে শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিপূর্বক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট মাত্রায় জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অর্জন

আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ :

অন্যতম। এ লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার ইতিমধ্যেই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণয়ন করেছেন, যাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.৫%।

জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধিপূর্বক দেশে কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়ন অপরিহার্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮.৫% জি.ডি.পি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন ৩৬.৯৯%, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৩১.৭৫%। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে টাকা ৬৪.৯৬ ট্রিলিয়ন (ব্যাক্তিখাতে ৮১% এবং সরকারি বিনিয়োগ ১৯%), যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল (ব্যাক্তিখাতে ৭৪.৪২% এবং সরকারি বিনিয়োগ ২৫.৫৮%) । ২০২৫ সাল নাগাদ ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ ২৭.৩৫% এ উন্নীত করার মাধ্যমে (যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২৩.৬৩%) সরকার বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা পূরনের লক্ষ্য স্থির করেছেন।

অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বিশ্লেষণে দেখাযায়, এ সময়কালে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির গড় হার ১৫.০৯% এবং বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ জি.ডি.পি অনুপাতে ২২% - ২৩% এর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে **স্মারণী-৫.২০(৫)** । ব্যাক্তিখাতে সঞ্চয় পর্যাপ্ত বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে দীর্ঘসময় ধরে দেশে ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ স্থবিরতা বিরাজ করছে, যার অন্যতম কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে :-

১) দারিদ্রতা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা।
২) কর্মসংস্থান সংকট।
৩) ব্যাক্তি পর্যায়ে মূলধনের সীমাবদ্ধতা।
৪) জমির সীমাবদ্ধতা।
৫) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগের অপর্যাপ্ততা।
৬) বাস্তবতার নিরীখে কর্পোরেট ট্যাক্স আরোপিত না হওয়া।
৭) ব্যবসায়িক অনুকুল পরিবেশের অভাব।
৮) দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুযোগ সীমিত থাকা।
৯) ব্যাক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব।
১০)অনুন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ।

কাজেই, বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা শুধু স্থির করাই যথেষ্ট নয়, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নই বড় চ্যালেঞ্জ।

স্মারণী-৫.২০(৫) : অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা) এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগের চিত্র :-

Financial Year	Investment TK. In Billion	As % of total Investment		As % of GDP		
		Private %	Public %	Total %	Private %	Public %
2011-12	2,982	79.61	20.39	28.26	22.50	5.76
2012-13	3,403	76.61	23.39	28.39	21.75	6.64
2013-14	3,840	77.09	22.91	28.58	22.03	6.55
2014-15	4,379	76.39	23.61	28.89	22.07	6.82
2015-16	5,138	77.39	22.61	29.65	22.99	6.66
2016-17	6,029	75.70	24.30	30.51	23.10	7.41
2017-18	7,029	74.48	25.52	31.23	23.26	7.97
2018-19	8,005	74.57	25.43	31.57	23.54	8.03
2019-20(P)	8,879	74.42	25.58	31.75	23.63	8.12

Source : National Accounts and BD Economic Review.

চ) বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ :

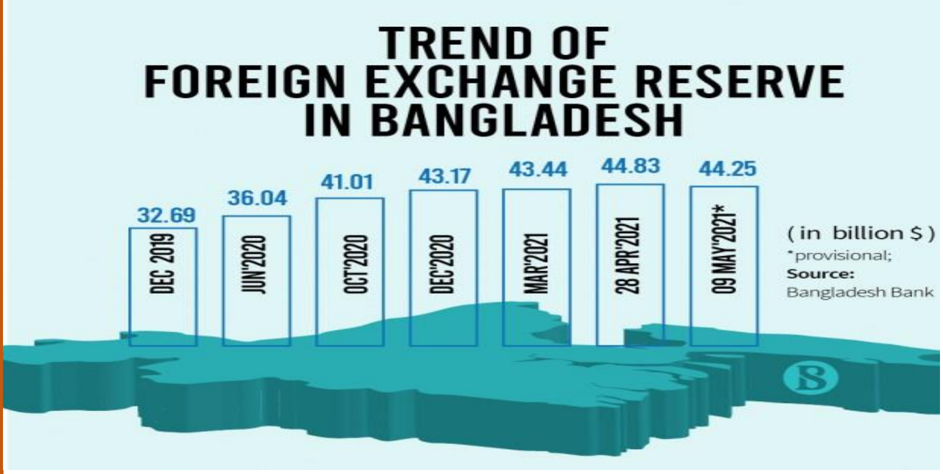

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ :

i) Definition of Foreign Exchange Reserve :

Foreign exchange reserves are external resources that are available and controlled by monetary authorities for direct financing of external imbalances, balance of payments, for indirectly regulating the magnitude of such irregularities through intervention in the currency market with the aim of acting on the exchange rate, and for other purposes (IMF 2013).

ii) Reserve Management and Why is it Important?

Reserve management is a process that ensures that adequate official public sector foreign assets are readily available to and controlled by the authorities for meeting a defined range of objectives for a country or union. In this context, a reserve management entity is normally made responsible for the management of reserves and associated risks. Typically, official foreign exchange reserves are held in support of a range of objectives including to:

- support and maintain confidence in the policies for monetary and exchange rate management including the capacity to intervene in support of the national or union currency;
- limit external vulnerability by maintaining foreign currency liquidity to absorb shocks during times of crisis or when access to borrowing is curtailed and in doing so;
- provide a level of confidence to markets that a country can meet its external obligations;
- demonstrate the backing of domestic currency by external assets;
- assist the government in meeting its foreign exchange needs and external debt obligations; and
- maintain a reserve for national disasters or emergencies.

iii) Objective of Foreign Exchange Reserve Management:

Reserve management should seek to ensure that: (i) adequate foreign exchange reserves are available for meeting a defined range of objectives; (ii) liquidity, market, and credit risks are controlled in a prudent manner; and (iii) subject to liquidity and other risk constraints, reasonable earnings are generated over the medium to long term on the funds invested. (Source: IMF)

iv) Optimal Level of Foreign Exchange Reserves :

As the matter is controversial, clear cut definition on this issue is difficult. However, the first attempt at determining or calculating the optimal foreign exchange reserves, is found in Heller's (1966). Heller's research and evaluation of the optimal size of foreign exchange reserves is devised on the precautionary motives. In his view, the determination of the optimal level of foreign exchange reserves is particularly important following three parameter settings:

- Costs of adjustment to external imbalances (measured as the propensity to import),
- The cost of holding liquid foreign exchange reserves (measured as the yield spread between the yield on the foreign exchange reserves that are consistent with the adopted reference portfolio and the yield on domestic bonds) ; and
- The likelihood that there will be a need for foreign exchange reserves of a certain size or value (which is based on historical data or past external imbalances).

These rules imply that the foreign exchange reserves held at a level that are equivalent to :

- Quarterly imports (as counter shocks on the current account)
- From 5% to 20% of the monetary aggregate M29 (in order to maintain confidence in the local currency in the case of developing currency crisis) ; and
- The value of all debt obligations falling due in the next twelve months (in case of sudden interruption or suspension of short-term capital inflows).

Alternatively, the accumulation of foreign reserves can be a “byproduct” of the Government, or a strategy that is focused on maintaining undervalued national currency with the aim of encouraging exports. In this case, the foreign exchange reserves are not motivated by the need to harmonize consumption and prevent external shocks, but they are more a result of activities of sterilization of the foreign exchange market (Heller 1966). (Source : Researchgate)

২) দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ পরিস্থিতি :

বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার উৎস প্রধানত তিনটি, যথা :-

১. বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স।
২. রপ্তানি আয়। ; এবং
৩. বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান।

২০০৮-৯ অর্থবছরের আগ পর্যন্ত দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এক অংকের ঘরে সীমাবদ্ধ ছিল। **২০০৮-৯** অর্থবছর থেকে রপ্তানি আয় ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, পাশাপাশি বৃদ্ধিপেতে থাকে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ২০০৮-৯ অর্থবছরের শেষে

রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ১০.৩৪ বিলিয়ন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের শেষে যা দাঁড়ায় ৩৫.৮৫ বিলিয়ন।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ পরিস্থিতি :

অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৩-১৪ এ ৬ (ছয়) বছর সময়কালে দেশে রিজার্ভের পরিমাণ বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ইউ.এস.ডলার ১.৯৯৭ বিলিয়ন এবং অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ এ ৬ (ছয়) বছর সময়কালে রিজার্ভের পরিমাণ বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ইউ.এস.ডলার ২.২৫৫ বিলিয়ন স্মারণী-৫.২০(৬) ।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সাথে বাংলাদেশের রিজার্ভ বৈষম্য দূর হবে আশাকরা যায়, তবে এজন্য রপ্তানি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান দুটোই সমানতালে বৃদ্ধিই একমাত্র উপায়।

স্মারণী-৫.২০(৬) : বিগত অর্থবছর ২০০৮-৯ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অগ্রগতির চিত্র :-

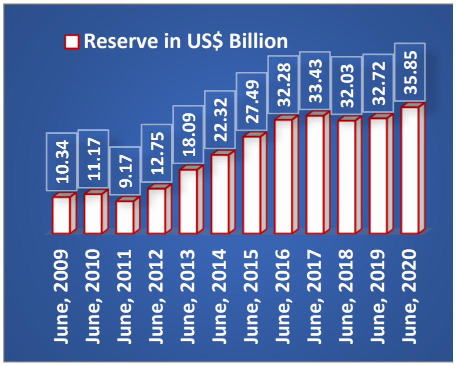

Source: Indexmodi and Bangladesh Bank

৩) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহ :

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহ :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা এবং তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিগত দুই দশকের এ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ২০০০-১ থেকে ২০০৫-৬ সময়কালে বিদেশে কর্মরত শ্রমসংখ্যা ছিল গড়ে ২৪৬,০০০ জন এবং তাদের পাটানো রেমিটেন্স গড়ে বছরে ইউ.এস.ডলার ৩.১৮ বিলিয়ন। অর্থবছর ২০০৬-৭ থেকে ২০০৯-১০ সময়কালে বিদেশে কর্মরত শ্রমসংখ্যা গড়ে ৬৫৫,৫০০ জন এবং রেমিট্যান্স গড়ে বছরে ৮.৬৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বিদেশে কর্মরত শ্রমসংখ্যা গড়ে ৬১৪,০০০ জন এবং রেমিট্যান্স গড়ে বছরে ১৩.৯০ বিলিয়ন ডলার এবং অর্থবছর ২০১৮-১৯ (মার্চ পর্যন্ত) কর্মরত শ্রমসংখ্যা ৫৫৭,০০০ জন এবং রেমিট্যান্স ১১.৮৭ বিলিয়ন ডলার। অর্থবছর ২০০০-১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের বিদেশে কর্মরত শ্রমসংখ্যা ও রেমিট্যান্সের তথ্য [স্মারণী-৫.২০(৭)] এর মাধ্যমে তুলেধরা হলো ।

স্মারণী-৫.২০(৭) : অর্থবছর ২০০০-১ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বিদেশ কর্মরত শ্রমিক ও তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স এর চিত্র :-

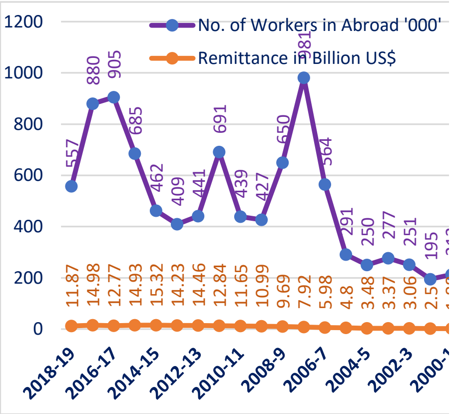

Source: BD Economic Review

৪) কেন বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ?

বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৪ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে পৌছাচ্ছে এটা এখন অনেকটা নিশ্চিত এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশে পৌঁছানের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেহেতু অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়া উচিত ঐ পর্যায়ের দেশ সমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ। ২০২৪ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধির গুরুত্ব :

পর স্বল্প আয়ের দেশের সুবিধাবলী তখন বাংলাদেশের জন্য আর প্রযোজ্য হবেনা, যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ, দাতা সংস্থা সমূহ কতৃক প্রদত্ত ঋণ ও অনুদান এবং ব্যবসা বানিজ্যেরক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার তখন অনেকটা সীমিত হয়ে আসবে। ঐ সময়ে দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে তাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর উপর বাড়তি চাপ পড়বে এটা স্বাভাবিক।

যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি আয় ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স এর কারণে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল সব দেশের তুলনায় বাংলাদেশের রিজার্ভ অদ্যাবধি সর্বনিম্নে। ২০১৯ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশের তুলনায় রিজার্ভ ভিয়েতনামে ১.৪৮ গুণ, ফিলিপাইনে ২.৪৪ গুণ, মালয়েশিয়ায় ৩.০৬ গুণ, ইন্দোনেশিয়ায় ৩.৯০ গুণ, থাইল্যান্ডে ৬.০৬ গুণ, সিঙ্গাপুরে ৮.৩৮ গুণ, দ. কোরিয়ায় ১১.৬৫ গুণ, ভারতে ১২.২৬ গুণ, হংকংয়ে ১২.৯১ গুণ, জাপানে ৩৭.৮২ গুণ এবং চীনে ৯৬.৮৩ গুণ [স্মারণী-৫.২০(৮)]। কাজেই, ভবিষ্যতে অনাকাঙ্কিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং দেশে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড আরো বেগবান করতে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা উচিৎ, যা বিশ্ব সমাজে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতির উপস্থিতি জানান দিতে সক্ষম হবে।

৫) বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দিকথেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দু-একটি দেশ ব্যাতিত অন্যান্য প্রায় সকল দেশের পিচনে অবস্থান করছে। জানুয়ারি ২০১৯ সালে গ্লোবাল বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ র‍্যাংকিংয়ে ১৯৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৯ তম, যেখানে ভিয়েতনাম ৪০, ফিলিপাইন ২৯, মালয়েশিয়া ২৫, ইন্দোনেশিয়া ১৯, থাইল্যান্ড ১২, সিঙ্গাপুর ১১, দ. কোরিয়া ৯, ভারত ৮, হংকং ৭, জাপান ২ এবং চীন ১ম স্থানে রয়েছে।

ঐ সময়ে বাংলাদেশের রিজার্ভ ইউ.এস.ডলার ৩৩.৪২ বিলিয়ন, যেখানে ভিয়েতনামে ৪৯.৫০ বিলিয়ন, ফিলিপাইনে ৮১.৫৭ বিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ১০২.৪০ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ১৩০.২০ বিলিয়ন, থাইল্যান্ডে ২০২.৬০ বিলিয়ন, সিঙ্গাপুরে ২৭৯.৯০ বিলিয়ন, দ. কোরিয়ায় ৩৮৯.২০ বিলিয়ন, ভারতে ৪০৯.৮০ বিলিয়ন, হংকংয়ে ৪৩১.৪০ বিলিয়ন, জাপানে ১,২৬৪ বিলিয়ন এবং চীনের ৩,২৩৬ বিলিয়ন [স্মারণী-৫.২০(৮)]।

স্মারণী-৫.২০(৮) : গ্লোবাল র‍্যাংকিং ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এর চিত্র :-

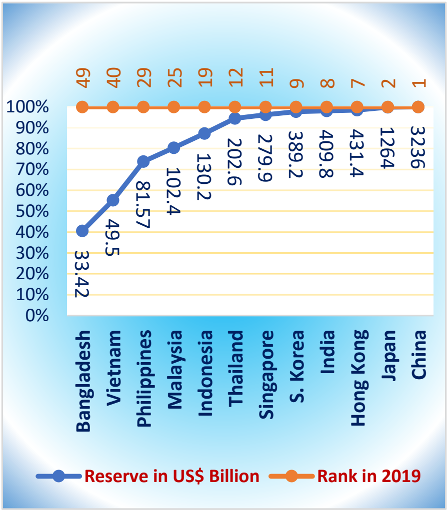

Source: Indexmodi Note: Higher Rank indicates lower position

ছ) ব্যালেন্স অব পেমেন্টস :

কোনো দেশের চলতি হিসাবের পজেটিভ উদ্বৃত্ত যেমন ঐ দেশের শক্ত অর্থনীতির পরিচয় বহন করে, ঠিক তেমনি চলতি হিসাবের নেগেটিভ উদ্বৃত্ত ঐ দেশের প্রতিকুল বানিজ্য ভারসাম্য ও সীমিত বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এর বহিঃপ্রকাশ। বিগত দশকে দেশের চলতি হিসাবের লেনদেন বিশ্লেষণে দেখাযায়, ২০০৯-১০ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ৩,৭৩৭ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত থাকলেও ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ এ দুই অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি যথাক্রমে ১,৬৮৬ মিলিয়ন ও ৪৪৭ মিলিয়ন ডলার।

তারপর একটানা চারবছর (অর্থবছর ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) পর্যন্ত চলতি হিসাবে পজেটিভ উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ইউ.এস.ডলার ২,৩৮৮ মিলিয়ন, ১,৪০৬ মিলিয়ন, ৩,৪৯২ মিলিয়ন এবং ৪,২৬২ মিলিয়ন। তারপর ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে চলতি হিসাবে আবার ঘাটতি ব্যালেন্স দেখা দেয়, যেমন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঘাটতি ইউ.এস.ডলার ১,৩৩১ মিলিয়ন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঘাটতি ৯,৭৮০ মিলিয়ন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ঘাটতি ৪,২৭০ মিলিয়ন ডলার স্মারণী-৫.২০(৯)।

স্মারণী-৫.২০(৯) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের দেশের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তঃ

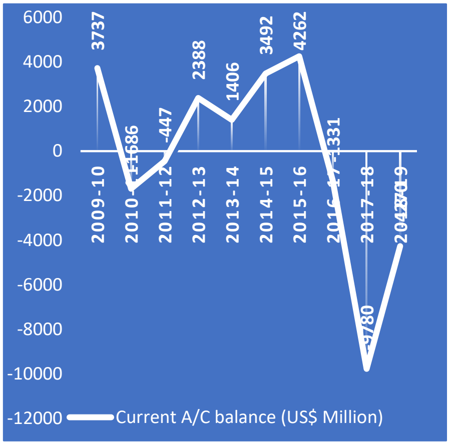

Source: BD Economic Review

স্মারণী-৫.২০(১০) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এর চিত্র :-

Particulars	Financial Years									(In Million US$)
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1) Trade balance	- 5,152	-9,935	-9,320	-7,009	-6,794	-6,965	-6,460	-9,472	-18,258	-10,695
2) Services (net)	-1,240	-2,612	-3,001	-3,162	-4,099	-3,186	-2,708	-3,288	-4,574	-2,370
3) Primary Income	-1,484	-1,454	-1,549	-2,369	-2,635	-2,252	-1,915	-1,870	-2,392	-1,922
Current Transfer :										
a) Workers Remittance	10,987	11,513	12,735	14,338	14,116	15,170	14,717	12,769	14,982	10,410
b) Other Transfer	626	802	688	590	818	725	628	530	462	307
4) Current Transfer	11,613	12,315	13,423	14,928	14,934	15,895	15,345	13,299	15,444	10,717
5) Current A/C Balance	3,737	-1,686	-447	2,388	1,406	3,492	4,262	-1,331	-9,780	-4,270
6) Capital Transfer	488	642	482	629	598	496	464	400	292	156
Financial A/C :										
a) FDI (Net)	913	775	1,191	1,726	1,432	3,697	3,787	4,691	4,381	3,847
b) Others (net)	-1,551	-124	245	1,137	1,381	-2,430	-2,843	-444	4,695	-124
7) Financial A/C :	- 638	651	1,436	2,863	2,813	1,267	944	4,247	9,076	3,723
8) Errors and Omission	-722	-263	-977	-752	666	-882	-634	-147	-473	-108
9) Overall balance	2,865	-656	494	5,128	5,483	4373	5,036	3,169	-885	-499

Source: BD Economic review and Bangladesh bank Data *Up to February, 2019

জ) দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবনা :

সঞ্চয় ব্যাক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে মূলধন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, যা দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা, মাথাপিছু আয় ও মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা পালন করে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ জি.ডি.পি অনুপাতে উচ্চহারে জাতিয় সঞ্চয় নিশ্চিতপূর্বক আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির এই নীতি গভীরভাবে অনুস্মরন করে আসছে এবং অর্থনীতির টেকসই গতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে উচ্চ বেকারত্বের হার, নিন্ম মাথাপিছু আয়, উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান , সেখানে ব্যাক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় রীতিমত কঠিন, যা দেশে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধিরক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। আগামীতে ব্যাক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে সঞ্চয় বৃদ্ধিকরাপূর্বক উল্লেখযোগ্য হারে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরা সম্ভব না হলে, ২০২৪ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং ২০৪১ সালের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে এটা নিশ্চিত। যদিও সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আগামী পরিস্থিতি মোকাবেলায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮.৫% জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অর্জন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন, যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন ৩৬.৯৯%, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৩১.৭৫%। ২০২৫ সাল নাগাদ ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ ২৭.৩৫% এ উন্নীত করার মাধ্যমে (যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২৩.৬৩%) সরকার বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা পূরনের লক্ষ্য স্থির করেছেন। উল্লেখ্য, বিগত এক যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ জি.ডি.পি অনুপাতে ২০%-২৩% এর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কাজেই, আগামীতে দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে উচ্চহারে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার বিকল্প নেই, যার জন্য প্রয়োজন উচ্চহারে জাতিয় সঞ্চয় নিশ্চিত করা, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য যা একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ। কেননা, যে সমস্ত অনুকুল পরিস্থিতির উপর আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি নির্ভর করে, তার সবকটিই বাংলাদেশে অপ্রতুল। তথাপি সাধ ও সাধ্যের যথাসাধ্য সমন্বয় পূর্বক এক্ষেত্রে আমাদেরকে কামিয়াব হতেই হবে, এর বিকল্প নেই। আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে কাঙ্কিত পর্যায়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সরকারের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সমূহকে আরোও গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে নিন্মোক্ত প্রস্তবনা সমূহ পেশকরা হলো :-

ক) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধিকল্পে :-

১) গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহের, যেমন চাষাবাদের পাশাপাশি মাছ চাষ, হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশু পালন, ফল ও শব্জি উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার

করা, যাতে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে বসবাস করতে পারে এবং দৈনন্দিন খরচ মিটিয়ে কিছু সঞ্চয় করার সুযোগ পায়।

২) গ্রাম পর্যায়ে কৃষিখাতের পাশাপাশি হস্ত ও কুঠির শিল্পের প্রসার এবং উপজেলা পর্যায়ে এস.এম.ই খাতের প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্রতা হ্রাস পায়।

৩) দেশে কারিগরি শিক্ষার বিস্তারকল্পে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহনে অপারগ তাদের জন্য মাধ্যমিক পরবর্তী দুই বৎসরের কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, যাতে প্রত্যেক ব্যাক্তি নিজ উদ্যোগে স্বকর্মে নিয়োজিত হয়ে আয় রোজগারে সমর্থ হয, যা ব্যাক্তি পর্যায়ে কর্মসংস্থান সমস্যা লাগবের পাশাপাশি মাথাপিছু আয় এবং ব্যাক্তিখাতে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

৪) জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প সমূহে, যেমন- সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড, পোষ্টঅফিস সেভিংস ইত্যাদিক্ষেত্রে ব্যাক্তি ও পারিবারিক সঞ্চয়ের সুযোগ প্রসারিত করার পাশাপাশি সুদহার বৃদ্ধি এবং লভ্যাংশের উপর পুরোপুরি আয়কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা।

৫) শহর ও গ্রাম সকলক্ষেত্রে জীবন যাত্রার ব্যয় সীমিত রাখতে কার্যকরভাবে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে ব্যাক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ করে সঞ্চয়ের সুযোগ পায়।

৬) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি খাতে ব্যয় সীমিত রাখতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে সীমিত আয়ের মানুষ জীবনযাপন ব্যয় নির্বাহ করার পর আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয়ের সুযোগ পায়।

৭) মানুষের মাঝে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারিভাবে গণমাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচার চালানো।

৮) গ্রাম ও শহর পর্যায়ে পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা, যাতে প্রতিটি পরিবারের সদস্যসংখ্যা তাদের আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে এবং দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করে কিছু সঞ্চয়ের সুযোগ থাকে।

খ) আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে করনীয় :

১) দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ নিশ্চিত করা।

২) ব্যাক্তি পর্যায়ে মূলধন গড়ে উঠার লক্ষ্যে সারাদেশে পারিবারিক সঞ্চয় ব্যবস্থা জোরদার করা এবং মূলধন স্বল্পতা দূরীকরনে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ নিশ্চিত করা।

৩) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তোলা, যাতে আবাসন, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে সহজে ও দ্রুত সংযোগ পায়।

৪) সকল ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর বাস্তবতার নিরীখে সামর্থের ভিত্তিতে কর্পোরেট ট্যাক্স ও ভ্যাট রেট আরোপ করা, যা পরিশোধে প্রতিষ্ঠানের সমস্যা না হয় এবং যা ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিরক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫) ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নে আগ্রহী করে তোলা, যাতে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

৬) উৎপাদনমুখী শিল্প কারখানা সমূহে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে চলতি মূলধন সরবরাহের বিষয়ে ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

৭) প্রতিষ্ঠানের লাভজনক পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতি অর্থায়নকারী ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা, যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান সহজে রুগ্ন হয়ে পড়তে না পারে, যা উদ্যোক্তা ও ব্যাংক উভয়পক্ষের বিনিয়োগ ঝুকি হ্রাস করতে দারুন কাজ দেবে।

৮) ব্যাক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা।

৯) ছোট ও মাঝারি বিনিয়োগকারিরা টিকে থাকতে ট্যাক্স ও ভ্যাট সুবিধার পাশাপাশি শিল্পের কাঁচামাল ও মেশিনারীজ আমদানিতে বাড়তি সুবিধা প্রদান করা।

১০)শেয়ার বাজারের পরিসর বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে সাধারণ বিনিয়োগকারিগণ বিনিয়োগে আকৃষ্ট হন এবং লাভবান হতে পারেন।

১১) প্রত্যেক রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে রপ্তানির উপর নগদ প্রণাদনা ও অন্যান্য সরকারি সহযোগিতা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা, যাতে রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ ঝুকি হ্রাস পায়।

১২)শিল্প সেক্টরের উপযোগি দক্ষ শ্রমবাহিনী গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা।

১৩) বিভিন্ন দেশের সাথে বানিজ্য উন্নয়নে শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক বানিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশে ব্যবসা ও শিল্পের প্রসারে সরকারি তৎপরতা বৃদ্ধিকরা।

১৪) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন, দুর্ণীতি দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা, যা যুগ যুগ ধরে দেশে ব্যবসা বানিজ্যের বিস্তারে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে।

****

অধ্যায় : ৫.২১

সরকারি দায়দেনা সীমিত রাখা।

OUTSTANDING FOREIGN DEBT BY CREDITOR (FY2018)

In million dollars

World Bank (IDA)	14,202
Asian Development Bank	8,848
Japan	4,705
China	1,997
Short-term debt	1,947
Guarantees (SOE)	4,030
Others (bilateral and multilateral)	6,593

DOMESTIC DEBT BY TYPE (FY2018)

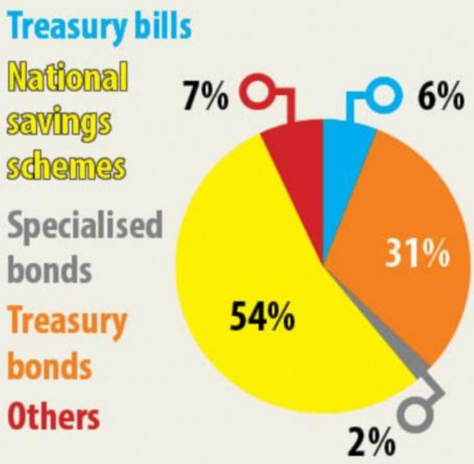

SOURCE: IMF

সরকারি দায়দেনা সীমিত রাখা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) সরকারি দায়দেনা।

১) বৈদেশিক বকেয়া ঋণ পরিস্থিতি।
২) আভ্যন্তরীণ বকেয়া ঋণ পরিস্থিতি।
৩) বাংলাদেশ ও দ. এশিয়ার অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
৪) সরকারি ঋণের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান।

খ) মূদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি।

গ) সরকারের দায় দেনার বিষয়ে মন্তব্য।

ক) সরকারি দায়দেনা :

সরকারি দায়দেনা :

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যাপ্ত শক্তিশালি না হওয়ায় এবং আভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণ ও রাজস্ব আয় তুলনামূলক অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারের আমলে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস ও বিদেশি দাতা সংস্থা সমূহের কাছথেকে ঋণ নিয়ে বাজেট ঘাটতি পূরন করা অনেকটা রেওয়াজে পরিনত হয়েছে। অবশ্য বিশ্বব্যাপি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বিদেশি ঋণের উপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্প উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রকল্পের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করতে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে এ ঋণ নেওয়া হয়। বিদেশি ঋণ তখনই স্বস্তিদায়ক হয় যখন ঐ সমস্ত ঋণ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণের কিস্তি ও সুদ যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হয়। অন্যথা এই ঋণ দেশের জনগণের জন্য মারাত্মক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, যেমনটি হয়েছে শ্রীলংকার ক্ষেত্রে।

২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সরকারি ঋণের পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৯১,৫২৪ মিলিয়ন (জি.ডি.পি অনুপাতে যা ৩৩.৯৯%), যার প্রায় ৫৬% আভ্যন্তরীণ ঋণ এবং অবশিষ্ট ৪৪% বৈদেশিক ঋণ। বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ এর যৌথ প্রকাশনা Debt Sustainability Analysis Report 2019 অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণের দিকথেকে বাংলাদেশ ঝুকিমুক্ত অবসস্থানে রয়েছে। তবে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ঝুকি বৃদ্ধি পাবে।

স্মারণী-৫.২১(১) : বিগত এক দশক (২০০৯-২০১৮) সময়কালে বাংলাদেশের দেশি/বিদেশি মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ, জি.ডি.পি অনুপাতে (%) এবং মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ :-

Debts	Financial Years									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gross Public Debts (USD Million)	40,455	40,283	44,620	48,024	54,486	60,985	65,470	73,411	79,964	91,524
Debt as % of GDP	39.54	35.49	36.62	36.22	35.82	35.27	33.68	33.33	32.62	33.99
Debt Per Capita	271	267	292	310	348	395	419	465	501	567

Source: Countryeconomy.com

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল

বৈদেশিক বকেয়া ঋণ পরিস্থিতি :

১) বৈদেশিক বকেয়া ঋণ পরিস্থিতি :

২০১৮-১৯ অর্থবছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৫৯.৭৬ বিলিয়ন, জি.ডি.পি অনুপাতে যা প্রায় ১৯.৩%। বহুমুখী এবং দ্বিপক্ষিয় ঋণ চুক্তির আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে এ সমস্ত ঋণ নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে ব্যাক্তিখাতে ব্যবসা বানিজ্য উন্নয়নে কিছু কিছু বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এ সময়কালে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের আনুমানিক ৫% স্বল্পমেয়াদি এবং অবশিষ্ট ৯৫% দীর্ঘমেয়াদি ঋণ।

বিগত এক দশকের (২০০৯-২০১৮) বৈদেশিক বকেয়া ঋণের স্থিতি পর্যালোচনায় দেখাযায়, ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৈদেশিক বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ইউ.এস.ডলার ২৩.৭৮ বিলিয়ন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে যা দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ৫৯.৭৬ বিলিয়ন। এ সময়কালে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫.৯৮ বিলিয়ন, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৬০ বিলিয়ন (১০%)। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে বৈদেশিক ঋণের হার ছিল ২৩.৭%, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯.৩%। এ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে বৈদেশিক ঋণের হার গড়ে ১৯.৬৩% [স্মারণী-৫.২১(২)] ।

স্মারণী-৫.২১(২) : অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে বৎসরান্তে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি .-

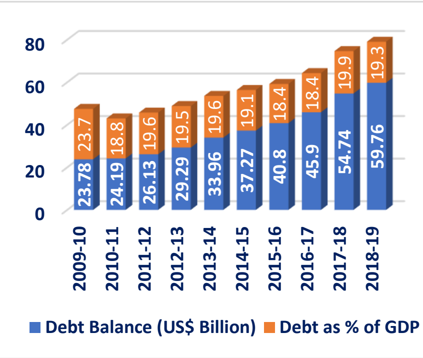

Source: Bangladesh Bank Data

স্মারণী-৫.২১(৩) : বিগত দশকে বৎসরান্তে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ, চলতি হিসাবে জমা এবং জি.ডি.পি অনুপাতে বকেয়া ঋণের হার :-

(US$ Billion)

Items	Financial Year									
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
External Debt in :										
Public Sector	22.13	22.61	24.53	26.47	29.44	29.45	32.00	35.36	40.77	45.51
Private Sector	1.65	1.58	1.60	2.82	4.52	7.82	8.80	10.54	13.97	14.25
a) Total External Debt :	**23.78**	**24.19**	**26.13**	**29.29**	**33.96**	**37.27**	**40.80**	**45.90**	**54.74**	**59.76**
b) Growth Rate (%)	**5.31**	**1.72**	8.02	12.09	15.94	9.75	9.47	12.50	19.26	9.17
c) Current A/C Receipt	**30.61**	**37.68**	**40.35**	**44.62**	**48.03**	**49.85**	**52.62**	**51.24**	**56.72**	**64.05**
➢ Current A/C Receipt (As % of Debt)	128.70	155.71	154.4	152.3	141.4	133.8	129.0	116.6	103.6	107.2
➢ Debt as % of GDP	23.70	18.8	19.6	19.5	19.6	19.1	18.4	18.4	19.9	19.3

Source: Bangladesh Bank Data

২) আভ্যন্তরীণ বকেয়া ঋণ পরিস্থিতি :

বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যানুযায়ী ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মোট সরকারি ঋণের প্রায় ৫৬% আভ্যন্তরীণ ঋণ, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, এক তৃতীয়াংশ ট্রেজারি বন্ড এবং অবশিষ্টাংশ স্পেশিয়ালাইজড ও অন্যান্য বন্ড। বিগত এক দশকের (২০০৯-২০১৮) আভ্যন্তরীণ বকেয়া ঋণের স্থিতি পর্যালোচনায় দেখাযায়, ২০০৯-১০ অর্থবছরে আভ্যন্তরীণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল টাকা ৩.৭০৭ ট্রিলিয়ন, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে

টাকা ১৪.৪১৭ ট্রিলিয়ন। এ সময়কালে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে টাকা ১০.৭১ ট্রিলিয়ন, বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে টাকা ১.০৭১ ট্রিলিয়ন (১৬.১৭%)। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ ঋণের হার ছিল ৩৬.১৯%, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৬.৯৪%। এ সময়কালে জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ১.০৮% [স্মারণী-৫.২১(৪)]।

বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ এর যৌথ Debt Sustainability Analysis Report 2019 অনুযায়ী ২০১৮ সাল নাগাদ মোট আভ্যন্তরীণ ঋণের ৫৪% সেভিংস সার্টিফিকেট, ৩১% ট্রেজারি বন্ড, ৬% ট্রেজারি বিল, ৭% স্পেলাইজড বন্ড এবং ২% অন্যান্য বন্ড [স্মারণী-৫.২১(৫)]।

আভ্যন্তরীণ বকেয়া ঋণ পরিস্থিতি :

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট টার্গেট অনুযায়ী সরকার ব্যাংকিং ও অন্যান্য উৎস থেকে ১০৯,৯৮৩ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে, যারমধ্যে ব্যাংকিং সোর্স থেকে ৮৪,৯৮০ কোটি এবং অন্যান্য উৎস থেকে ২৫,০০৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট সেপ্টেম্বর, ২০২০ অনুযায়ী এ ঋণের বিপরীতে জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২০ সময়কালে ১২,৮৭৯ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

স্মারণী-৫.২১(৫) : ২০১৮ সালের আভ্যন্তরীণ ঋণের শ্রেণীবিভাগ :-

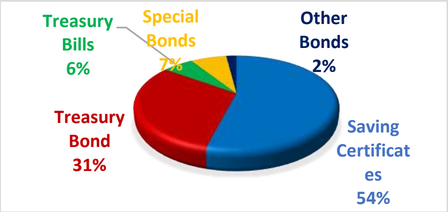

Source: World Bank Data

স্মারণী-৫.২১(৪) : ২০০৫-২০১৮ সময়কালে বৎসরান্তে মোট আভ্যন্তরীণ ঋণ এবং জি.ডি.পি অনুপাতে (%) আভ্যন্তরীণ ঋণের চিত্র :-

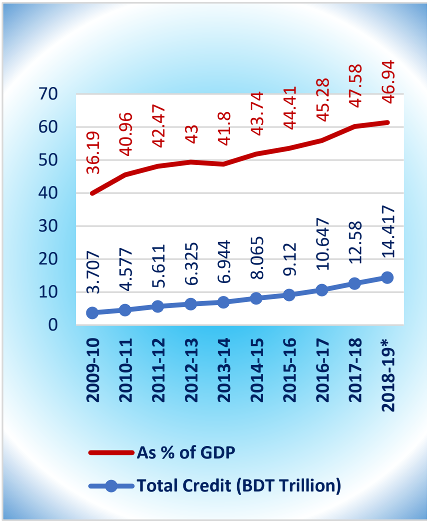

Source: World Bank Data

৩) বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির আকার অনুযায়ী বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবণতা ও জি.ডি.পি অনুপাতে ঋণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী এ সময়ে জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ ঋণের হার পাকিস্তানে ১৮.১%, মিয়ানমারে ২৫.৭%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৭.৮%, বাংলাদেশে ৪৫.৩%, শ্রীলংকায় ৪৯.৯% এবং ভারতে ৫০%। ঐ একই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ ঋণের হার মালয়েশিয়ায় ১২০.৯%, ভিয়েতনামে ১৩৭.৯%, থাইল্যান্ডে ১৪৩.৩%, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৫২.১%, চীনে ১৬৪.৭% এবং জাপানে ১৭৪.৯% [স্মারণী-৫.২১(৬)]।

স্মারণী-৫.২১(৬) : ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের জি.ডি.পি অনুপাতে আভ্যন্তরীণ ঋণের হার (%):

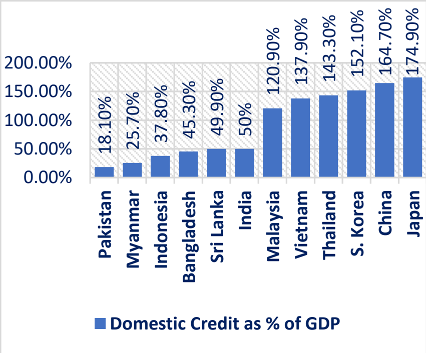

Source: World Bank Data

সরকারি ঋণের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

৪) সরকারি ঋণের দিকথেকে বাংলাদেশের অবস্থান :

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আভ্যন্তরীণ খাত থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, সরকারের মোট ঋণ ও মাথাপিছু ঋণের দিকথেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় আজো অনেকটা ভালো অবস্থানে রয়েছে, দেশের অর্থনীতির জন্য যা স্বস্তিদায়ক। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ যেহেতু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য বিদেশি ঋণের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কমে যাওয়ার অর্থ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ভাটাপড়া, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে যা মারাত্মক ক্ষতিকারক। সেক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন উৎসথেকে যথাসময়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি ঋণ কম্বোডিয়ায় ২৮.৬৪%, বাংলাদেশে ৩৩.৯৯%, পাকিস্তানে ৭১.৬৯%, ইন্দোনেশিয়ায় ৩০.০৯%, ফিলিপাইনে ৩৮.৯২%, ভারতে ৬৮.০৫%, থাইল্যান্ডে ৪২.০৮%, শ্রীলংকায় ৮৩.২৮%, মালয়েশিয়ায় ৫৫.৫৭% এবং দ. কোরিয়ায় ৩৭.৬৮%। ঐ সময়ে মাথাপিছু সরকারি ঋণ (ইউ.এস.ডলার) কম্বোডিয়ায় ৪৩১, বাংলাদেশে ৫৬৭, পাকিস্তানে ১,১২২, ইন্দোনেশিয়ায় ১,১৬৪, ফিলিপাইনে ১,২০৭, ভারতে ১,৩৬৭, থাইল্যান্ডে ৩,০৯৪, শ্রীলংকায় ৩,৪১৫, মালয়েশিয়ায় ৬,১৫০ এবং দ. কোরিয়ায় ১১,৯০২ ডলার [স্মারণী-৫.২১(৭)]।

স্মারণী-৫.২১(৭) : ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে জি.ডি.পি অনুপাতে সরকারি ঋণ এবং মাথাপিছু ঋণের চিত্র :-

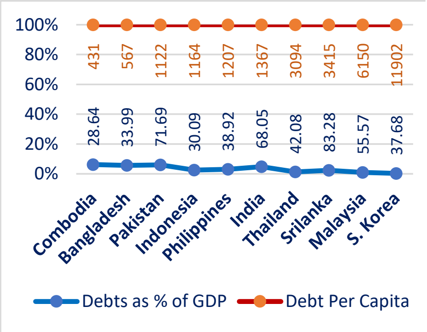

Source: Countryeconomy.com

খ) মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি :

মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি :

বিগত দশকে দেশে মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে অনেকটা সহনীয় পযায়ে অবস্থান করেছে, দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির জন্য যা স্বস্তিধায়ক। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে প্রকৃত জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৫%, বিপরীতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১০.৯%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত জি.ডি.পি ৫.২% এর বিপরীতে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৭%। এ সময়কালে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬.৭৪% এবং মুদ্রাস্ফীতির হার গড়ে ৬.৮৫% [স্মারণী-৫.২১(৮)]।

স্মারণী-৫.২১(৮) : অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে দেশে জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রস্ফীতির চিত্র :-

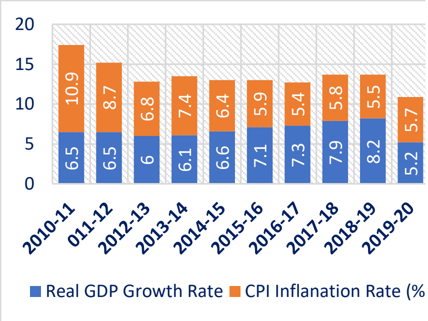

Source : National Accounts

গ) সরকারের দায় দেনার বিষয়ে মন্তব্য :

সরকারের দায় দেনার বিষয়ে মন্তব্য :

সরকারি দায়দেনা সীমিত রাখতে পারা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। তবে, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে উন্নয়নমূলক বড় প্রকল্প সমূহে অর্থয়নের জন্য বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য আরোও বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার মত ভাল অবস্থানে রয়েছে। যেহেতু বৈদেশিক ঋণ স্বল্প সুদে ও দীর্ঘ মেয়াদে নেওয়া হয়, সেহতু এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে **২০৪১** সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বৈদেশিক অর্থায়নে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে আরোও বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া আবশ্যক।

তবে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমিয়ে আনা উচিৎ, কেননা, আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বড় আকারের সরকারি ঋণ আভ্যন্তরীন ঋণ প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যা মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

****

অধ্যায় : ৫.২২

দুর্নীতি দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

দুর্ণীতি দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) দুর্ণীতি দমন।
   ১) দুর্ণীতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
   ২) দেশে দুর্ণীতির সামগ্রিক চিত্র।
   ৩) ঘুষ ও দুর্ণীতির শিকার জনগোষ্ঠির হার (%)।

খ) দুর্ণীতির পন্থা ও প্রকারভেদ।
   1. Approaches to corruptions.
   2. Types of corruption.

গ) বাংলাদেশে দুর্ণীতি এত ব্যাপক ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠার কারণ সমূহ।

ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দুর্ণীতির বিরুপ প্রভাব।

ঙ) কার্যকর দুর্ণীতি দমণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রস্তবনা।

ক) দুর্নীতি দমন :

দুর্নীতি দমন :

দুর্নীতি একটি জঘণ্য সামাজিক ব্যাধি। বিশ্বব্যাপি যুগ যুগ ধরে এ ব্যাধি বিকশিত হয়েছে এবং এর দৌরাত্ম চলে আসছে । দুর্নীতির কোনো ধরাবাধা নিয়ম বা স্থান নেই। ছোট প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত এ ব্যাধি বিস্তৃত, একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে যা অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

দুর্ণীতির সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক এবং এটি একটি অমিমাংশিত বিষয়। সংক্ষেপে দুর্নীতি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি " ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা, অন্যের অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বপালনে অবহেলা এবং সেবা প্রদানে স্বজনপ্রীতি ও হয়রানিকে দুর্নীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।" ব্যাপক অর্থে "দুর্ণীতি বিশ্বব্যাপি দেশে দেশে একটি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে যার উৎপত্তি, ব্যাক্তি পর্যায় থেকে রাস্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত যে রাহুগ্রাস বিস্তৃত, যারথেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপি অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।"

বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি অতি সাধারণ বিষয়, বর্তমানে যা অনেকটা লাগামহীন বলা চলে। সর্বস্তরে অপ্রতিরোধ্য ঘুষ ও দুর্ণীতির কারনে দেশের শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্য দূরুহ করে তোলার পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন খাত থেকে প্রতিবছর হাজার হাজর কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছেন এবং তথাকথিত এ ঘুষ ও দুর্ণীতির কারেণে দেশের সকল সেক্টরে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ দশক এরিমধ্যে পেরিয়ে গেছে, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও মানুষের জীবনমানে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতিও এসেছে, কিন্তু অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় দর্ণীতির সূচকে বিগত সময়গুলোতে বাংলাদেশর কোনো অগ্রগতিই হয়নি বলা চলে। গ্লোবাল দুর্ণীতির সূচকে ২০০৫ সালে ১৫৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫৮ তম, অর্থাৎ দুর্ণীতির শীর্ষ শিখরে এদেশের অবস্থান। ২০১০ সালে ১৭৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা এগিয়ে ১৪৩তম এবং ২০১৫ সালে আরোও কিছুটা এগিয়ে ১৩৯তম হলেও, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দুর্ণীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৩-১৪৯ এর মধ্যে উঠানামা করছে। অর্থাৎ ২০১৫-২০১৯ এ পাঁচ বছর সময়কালে দেশে দুর্ণীতির মাত্রা ছিল অনেকটা অপ্রতিরোধ্য [স্মারণী-৫.২২(১)] ।

স্মারণী-৫.২২(১) : ২০০৫-২০১৯ সময়কালে Global Corruption Perception Index (CPI) এ বাংলাদেশের অবস্থান :-

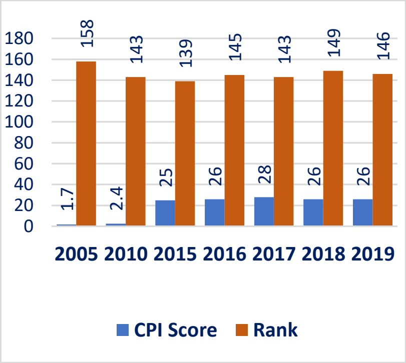

Source: CPI Index
Note: Higher Rank indicates lower position

১) দুর্ণীতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

Global Corruption Perception Index (CPI) , 2019 অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের উর্ধ্বে বাংলাদেশের অবস্থান। ঐ সময়ের র‍্যাংকিং অনুযায়ী ১৮০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬, যেখানে সিঙ্গাপুর ৪র্থ, হংকং ১৬, জাপান ২০, ভূটান ২৫, দ. কোরিয়া ৩৯, মালয়েশিয়া ৫১, চায়না ৮০, ভারত ৮০, ইন্দোনেশিয়া ৮৫, ভিয়েতনাম ৯৬, থাইল্যান্ড ১০১, নেপাল ১১৩, ফিলিপাইন ১১৩, পাকিস্তান ১২০, মালদ্বীপ ১৩০ এবং মিয়ানমার ১৩০ তম স্থানে অবস্থান করছিল।

SJIFBD

দুর্ণীতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান :

CPI Index 2019 অনুযায়ী ১৮০ দেশের মধ্যে দুর্ণীতিতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থান :

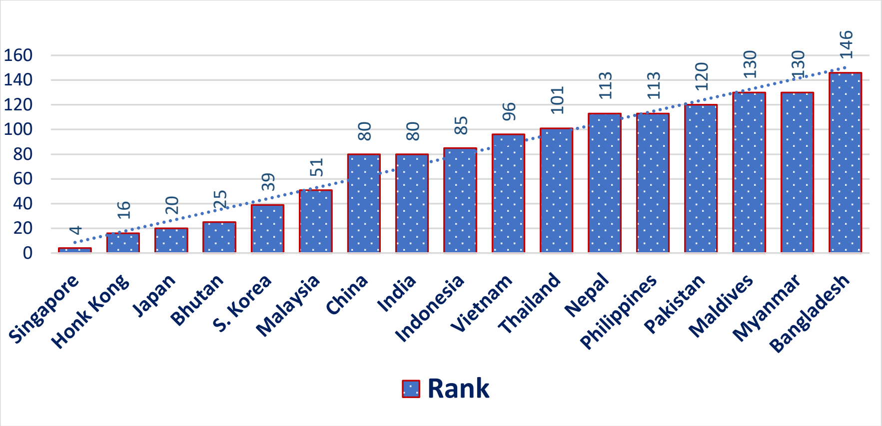

Source: CPI Index 2019 Note: Higher Rank indicates lower position

দেশে দুর্ণীতির সামগ্রিক চিত্র :

২) দেশে দুর্ণীতির সামগ্রিক চিত্র :

সিংহভাগ দুর্ণীতি সাধারনত সংঘটিত হয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে। দেশের সেবাখাতে সংঘটিত দুর্ণীতির উপর টি.আই.বি কতৃক প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী ঐ বছর দেশের সেবাখাতে সংঘটিত হওয়া ঘুষ ও দুর্ণীতির প্রাক্কলিত পরিমাণ টাকা ১০৬.৮৯ বিলিয়ন, যারমধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ঘুষ ও দুর্ণীতি সংঘটিত হয়েছে ভূমি সেবা খাতে, টাকা ২৫.১৩ বিলিয়ন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইন শৃংখলা রক্ষাকারি সংস্থা টাঃ ২১.৬৭ বিলিয়ন ও বিচারিক সেবা টাঃ ১২.৪২ বিলিয়ন [স্মারণী-৫.২২(২)] ।

প্রতিটি ঘুষ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারিকে নির্দিষ্ট মাত্রায় বেনিফিট দিতে হয়, যা সাধারণত ঘুষের অংকের কয়েকগুণ। উদাহরনস্বরুপ, প্রতি ১০,০০০/= টাকা ঘুষের বিপরীতে গড়ে ১,০০,০০০/= টাকা বেনিফিট দিয়ে থাকলেও ঐ বছর ১০,৬৮৮.৯ কোটি টাকা ঘুষ ও দুর্ণীতির বিপরীতে শুধু সার্ভিস সেক্টরে সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ টাকা ১,০৬৮.৮৯ বিলিয়ন, যা ঐ অর্থবছরের জাতিয় বাজেটের এক তৃতীয়াংশের চেয়েও বেশি।

স্মারণী-৫.২২(২) : টি.আই.বি রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন সেক্টরে সংঘঠিত হওয়া ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত লেনদেনের হিসাব :-

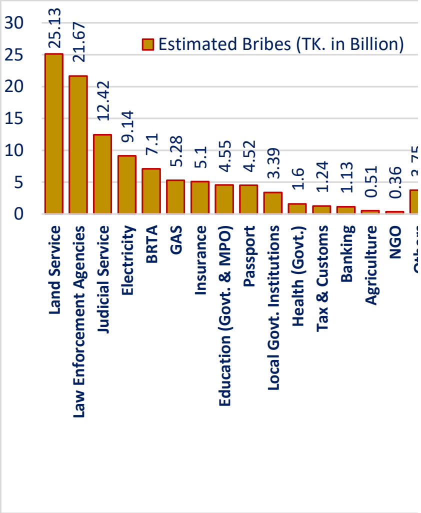

Source : TIB Report 2017

৩) ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার জনগোষ্ঠীর হার (%) :

ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার জনগোষ্ঠীর হার (%) :

টি.আই.বি রিপোর্ট ২০১৭ এর তথ্যানুযায়ী ঐ বছর সেবা নিতে গিয়ে সারাদেশে গড়ে ৬৬.৫% জনগণ ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন, যারমধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারি সংস্থা কতৃক ৭২.৫%, এক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাসপোর্ট অধিদপ্তর কতৃক ৬৭.৩%, বি.আর.টি.এ কতৃক ৬৫.৪% এবং বিচারিক সংস্থা কতৃক ৬০.৫%। তারপরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে যথাক্রমে ল্যান্ড সার্ভিস ৪৪.৯%, শিক্ষা ৪২.৯%, স্বাস্থ্য ৪২.৫%, কৃষি ৪১.৬%, বিদ্যুৎ ৩৮.৯%, গ্যাস ৩৮.৩%, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৬.৭%, ইনস্যুরেন্স ১২.৩%, ট্যাক্স এন্ড কাষ্টমস ১১.১%, ব্যাংকিং ৫.৭%, এন.জি.ও ৫.৪% এবং অন্যান্যখাতে ২২% স্মারণী-৫.২২(৩) ।

স্মারণী-৫.২২(৩) : টি.আই.বি রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী বিভিন্নখাতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার জনগোষ্ঠির হার (%) :-

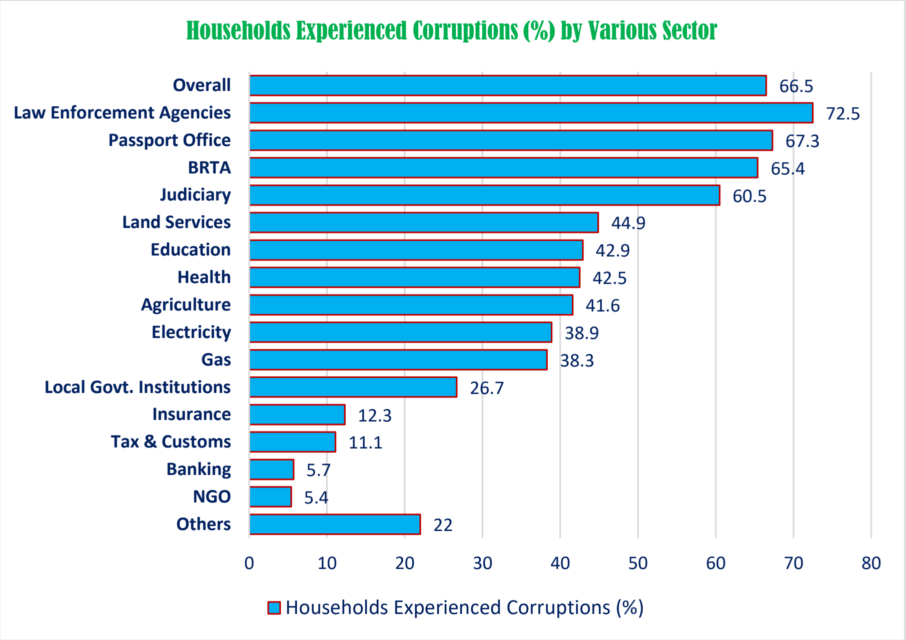

Source : TIB Report 2017

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য উপাত্ত শুধুমাত্র দেশের সার্ভিস সেক্টরের ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির উপর জরিপকৃত একটি হিসাব মাত্র। দেশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া বৃহদাকারের অর্থনৈতিক লুটতরাজের হিসাব, যেমন- প্রতিবছর দেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা, ব্যাংকখাতে হাজার হাজার কোটি টাকার অনিয়ম, দর্নীতি ও ঋণ খেলাপি, আন্ডার ও ওভার ইনভয়েজিং এর মাধ্যমে বিশাল অংকের কর ফাঁকি ও টাকা পাচার, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত বিশাল অংকের অবৈধ অর্থ সম্পদ এবং সমাজের আনাছে কানাছে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া অজস্র দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির হিসাব এ জরিপে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং কখনো সম্ভব হবেও না। ফলে দেশে কালো টাকার দৌরাত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ছে দেশের অর্থনীতি কুক্ষিগত করার প্রতিযোগিতা। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ কতৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, এদেশের জাতিয় অর্থনীতির প্রায় ৪০% ব্ল্যাক ইকোনমির আওতায় রয়েছে, প্রতিবছর জাতিয় বাজেটে কালো টাকা সাদা করার অবাধ সুযোগ দেওয়ার পরও বছরের পর বছর যার অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে।

খ) দুর্নীতির পন্থা ও প্রকারভেদ :

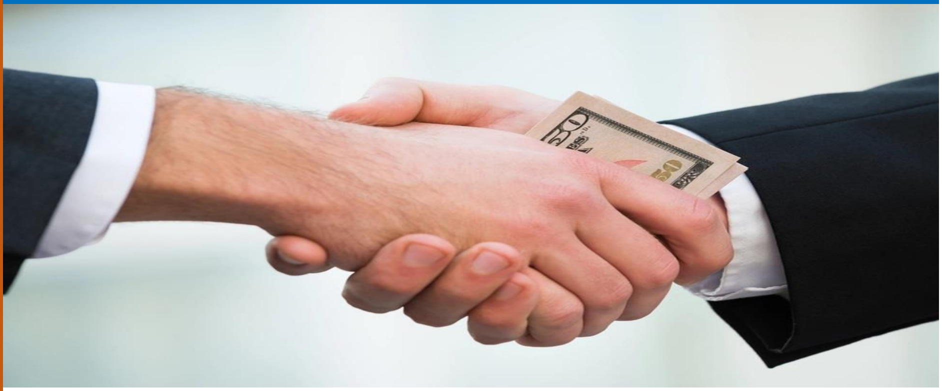

দুর্নীতির পন্থা
ও প্রকারভেদ :

১) দুর্নীতির পন্থা :

দুর্নীতি বহু পন্থায় সংঘটিত হয়, তবে সচরাচর পন্থা সমূহের মধ্যে ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদান প্রদান, দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসদাচারণ ও হয়রানি করা, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, আত্মসাৎ এবং প্রভাবশালির হস্তক্ষেপ অন্যতম। টি.আই.বি রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী ঐ সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত হওয়া দুর্নীতি সমূহের মধ্যে ঘুষ গ্রহণ ৪৯.৮%, দায়িত্ব পালনে অনীহা ৩৯.৯%, অসদাচারণ ও হয়রানি ৬.৯%, প্রতারণা ৩.৫%, স্বজনপ্রীতি ২.৭%, আত্মসাৎ ২.৬% এবং প্রভাবশালির হস্তক্ষেপ ২.৫%।

উপরোক্ত দুর্নীতি সমূহ ছাড়াও ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দেশে সংঘটিত হওয়া বড় আকারের দুর্নীতি সমূহের মধ্যে রয়েছে :-

- **টাকা পাচার :** সুইস ব্যাংকের রিপোর্ট অনুসারে ২০১৬ সাল নাগাদ সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি নাগরিকদের জমা সি.এইচ.এফ ৬৬৭.৫ মিলিয়ন (টাঃ ৫৩.৪০ বিলিয়ন) এবং একই সময়ে ঐ ব্যাংকে ভারতীয় নাগরিকদের জমা সি.এইচ.এফ ৬৭০ মিলিয়ন, যদিও ভারেতের জি.ডি.পি সাইজ বাংলদেশের জি.ডি.পি সাইজের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বড়। ২০১৬ সালে সুইস ব্যাংকগুলোতে বৈদেশিক অর্থ জমার হার ১ শতাংশের নিচে হলেও, ঐ বছর বাংলাদেশি নাগরিকদের জমা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। (ফাইন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস ২৭/৭/২০১৭)।
- **ঋণ খেলাপি :** বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ টাঃ ৭৪,৩০৩ কোটি, তার আগের অর্থবছরে যা ছিল টাঃ ৬২,১৭২ কোটি, যা ঐ সময়ে দেশে মোট বকেয়া ঋণের ৯.৩১%।
- **আন্ডার এন্ড ওভার ইনভয়েজিং :** বিভিন্ন সুত্রের মতে দেশের মোট আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যের আনুমানিক ১০% আন্ডার এন্ড ওভার ইনভয়েজিং হয়, যার মধ্যমে প্রতিনিয়ত শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার পাশাপাশি বিশাল অংকের টাকা বিদেশে পাচার করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যের আকার ছিল ইউ.এস.ডলার ৯০,৬৬৮ মিলিয়ন। ১০% হিসাবে ঐ অর্থবছরে বানিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং এর পরিমাণ ইউ.এস.ডলার ৯,০৬৭ মিলিয়ন (টাঃ ৭৬,১৬৩ কোটি)।
- **ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি :** সিপিডি ষ্টাডি ২০১৮ অনুযায়ী অর্থবছর ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সন্নিলিত লোকসানের পরিমাণ টাঃ ২২,২০১ কোটি।

২) দুর্নীতির প্রকারভেদ :

দুর্নীতির প্রকারভেদ কিছুটা বিতর্কিত বটে, তবে বাস্তবে সংঘটিত হওয়া দুর্নীতির ধরণ অনুযায়ী দুর্নীতিকে নিন্মোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :-

১) ব্যাক্তি পর্যায়ের দুর্নীতি ।
২) প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি।
৩) রাজনৈতিক দুর্নীতি ; এবং
৪) রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশে বর্তমানে সকল পর্যায়ে সব ধরনের দুর্নীতি সমানতালে মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে, স্বদিচ্ছা থাকা সত্বেও যা সহসা নিয়ন্ত্রণে আনা সরকারের জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ ও সময়সাপেক্ষ বটে।

স্মারণী-৫.২২(৪) : বাংলাদেশে বিভিন পন্থায় সংঘঠিত হওয়া দুর্নীতির হার :-

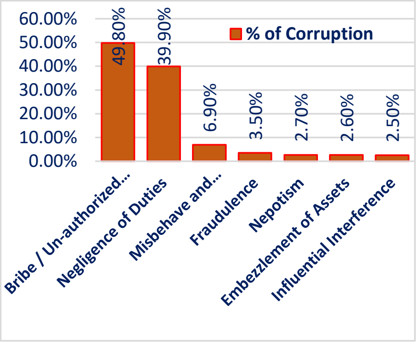

Source: TIB Survey 2017

গ) বাংলাদেশে দুর্নীতি এত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠার কারণ সমূহ :

দুর্নীতি যদিও কমবেশি সবদেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে, তথাপি দেশ ও অর্থনীতিভেদে দুর্নীতির ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত অনুন্নত ও স্বল্প আয়ের দেশ সমূহে দুর্নীতির প্রকোপ বেশি হয় এবং উন্নত অর্থনীতির দেশ সমূহের দুর্নীতি অনুন্নত অর্থনীতির দেশ সমূহ থেকে কিছুটা ভিন্নতর হয়। অনুন্নত অর্থনীতির দেশ সমূহে প্রশাসনের সকলস্তরে দুর্নীতির খোলামেলা ও অবাধ প্রকোপ থাকলেও, উন্নত দেশসমূহে ক্ষেত্র বিশেষে এ দুর্নীতি হয়ে থাকে অত্যন্ত সীমিত ও গোপনীয়তার সাথে। বাংলাদেশের মত অনুন্নত সমাজে দুর্নীতি এত ব্যাপক ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।
২. রাষ্ট্রীয় নীতিতে দুর্নীতি দমনে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকা।
৩. রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন দলের নেতা কর্মীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়া।
৪. দেশে আইনের শাসন পুরোপুরি বলবৎ না থাকা।
৫. দুর্নীতির কার্যকর দমনে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকা।
৬. অনুন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মান নিন্ম হওয়ার কারনে মানুষের মাঝে সততা ও নৈতিকতার অভাব।
৭. দেশে প্রফেশনাল এথিকস্ ও নিয়ম মেনে না চলা।
৮. শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষা ও দেশাত্ববোধের উপর জোর না দেওয়া।
৯. ব্যাপক আয় বৈষম ও সম্পদের অসম বন্টনের ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ব্যাপকতর হওয়া।
১০. প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ না করা।
১১. প্রশাসনের শীর্ষ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সৎ ও যোগ্য লোকের অভাব থাকা।
১২. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে যথাযথ রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব।

ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দুর্ণীতির বিরুপ প্রভাব :

অত্যন্ত ছোট্ট ভূখন্ডের অধিকারি এদেশটি জনসংখ্যার ভারে নুহ্যমান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকথেকে যা আজো অনেক বেশি পশ্চাদপদ এবং দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। ২০১৯ সাল নাগাদ এ দেশে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ইউ.এস.ডলার ১,৮৫৬, ঐ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দুয়েকটি দেশ ব্যাতিত অন্য প্রায় সব দেশের তুলনায় যা সর্বনিম্ন [স্মারণী-৫.২২(৫)] ।

তবে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে তৈরি পোশাকখাতের উত্থান এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের জন্য আশির্বাদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে বিশ্বে মর্যাদার আসনে উপনীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এখন আমাদের দ্বারপ্রান্তে। বর্তমান সরকার বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপলব্দি করতে পেরেছেন এবং এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান করে নিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এখন সমস্যা দেশের সর্বস্তরে দীর্ঘসময় ধরে চলে আসা লাগামহীণ দুর্ণীতি, ক্রমেই যা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। অতীতের সরকারগুলো দুর্ণীতির এ অপ্রতিরোধ্যতাকে ব্রুক্ষেপই করেনি, যা আজ দেশ ও জাতির উন্নয়নেরক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। অপ্রতিরোধ্য এ দুর্ণীতি দেশের চলমাল উন্নয়ন কর্মকান্ডকেই শুধু বাধাগ্রস্ত করছেনা, ঘুষ, দুর্ণীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার আর্থিত ক্ষতি, কালো টাকার উত্থান, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পাশাপাশি দেশে চরম সামাজিক অবক্ষয়ের জন্ম দিয়েছে। যে দুরাবস্থা থেকে সহসা বেরিয়ে আসতে না পারলে ভবিষ্যতের সকল স্বপ্ন ধুলিস্মাৎ হতে বাধ্য।

SJBD

স্মারণী-৫.২২(৫) : ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে মাথাপিছু আয়ের চিত্র :-

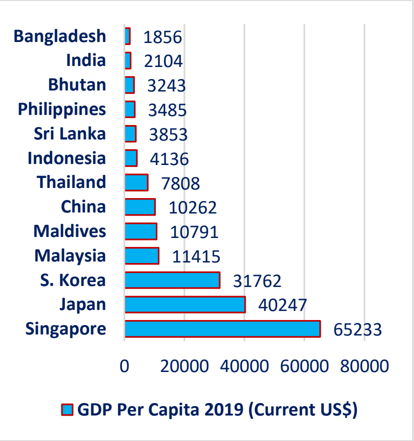

Source: World Bank Data

দেশে অপ্রতিরোধ্য দুর্ণীতির প্রভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যে সমস্তক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়, তন্মধ্যে রয়েছে :-

১. সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দুর্ণীতির প্রভাব বেড়ে যাওয়ার ফলে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড মারাত্মক ব্যাহত হওয়া।
২. দুর্ণীতিগ্রস্ত সমাজে অবৈধ উপায়ে আয়ের চর্চা বেড়ে যায়, ফলে দেশে কালো টাকার দৌরাত্ম বেড়ে যায়।
৩. দুর্ণীতিগ্রস্ত সমাজে নৈতিকতা লোপ পায়, হিংসা হানাহানি বৃদ্ধি পায়, ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়।
৪. দুর্ণীতির সূচকে এগিয়ে থাকার ফলে বহিঃর্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে নষ্ট হচ্ছে।
৫. দুর্ণীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পায়, ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

৬. দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে অফিসিয়াল প্রটোকল অনেকটা অকেজো হয়ে পড়ে, ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং অধীনস্ত কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে পাত্তা দেয় না।
৭. অবৈধ আয়ের প্রতি মানুষের ঝোক বেড়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমতে থাকে এবং দেশে শিক্ষার হার হ্রাস পায়।
৮. দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে ঘুষ লেনদেন ব্যাতিত সরকারি সেবা পাওয়া দুরুহ, ফলে সকল স্তরে সরকারি সেবার মান হ্রাস পায়।
৯. অযোগ্য, দুর্নীতি পরায়ণ ও কালো টাকার অধিকারি গোষ্ঠীর দৌরাত্ম বেড়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ঐ গোষ্ঠীর নিকট নতজানু হয়ে পড়ে।
১০. দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে কালো টাকার দাপড়ে আইনের শাসন অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে যায়, ফলে ঐ সমাজে ন্যায় বিচার আশাকরা দুরুহ।
১১. দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই থাকে, ফলে ঘণ ঘণ রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদল হয়, কোনো দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।
১২. সততা ও নৈতিকতার অবসান হয় বলে দুর্নীতগ্রস্থ দেশে উন্নত জাতি গঠণ প্রায় অসম্ভব।
১৩. দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ক্ষমতার পালাবদলের নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষাকরা সম্ভব হয়না বলে ঐ সব দেশে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন।
১৪. দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে সশস্ত্র বাহিনী সাধারণত ক্ষমতালিপ্সু হয়ে থাকে, ফলে যে কোনো সময় সশস্ত্র বাহিনি কতৃক ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা থেকে যায়, যা একটি দেশের গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষারক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুকি।
১৫. দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের অর্থনীতি অভাবগ্রস্থ হওয়ার ফলে অন্য কোনো দেশ পারতপক্ষে ঐ দেশকে বিশ্বাস করেনা এবং ঐ দেশের সাথে বানিজ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে অনীহা প্রকাশ করে।
১৬. দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের মানুষ সাধারণত টাকার পিছনেই ছুটে, প্রগতিশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তি অর্জনে তাদের আগ্রহ থাকেনা।
১৭. সবচেয়ে বড় কথা, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের লোকজন সাধারণত নীতি নৈতিকতার ধার ধারেনা, ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঐ দেশের মানুষ অবিশ্বাসি ও কম মর্যাদার অধিকারি হয়ে থাকে।

ঙ) কার্যকর দুর্নীতি দমণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রস্তবনা :-

বর্তমানে দেশের সর্বস্তরে দুর্নীতি যে হারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এ জঘণ্য পরিস্থিতি থেকে দ্রুত উত্তোরণ অত্যন্ত জরুরি। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় নীতিতে দুর্নীতি দমনকে সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর বাস্তবসন্মত কারণসমূহ খুঁজে বের করাপূর্বক দুর্নীতির কার্যকর দমনে কঠোর ও বাস্তবসন্মত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এজন্য প্রয়োজন দুর্নীতি নির্মূলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার, যা এ সমস্যার

গভীরে প্রবেশ করে দুর্নীতির এ ব্যাপকতার আসল কারণ ও ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করার মাধ্যমে এর কার্যকর দমণে বাস্তবসন্মত সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। দেশের অর্থনীতির নির্বিঘ্ন বিকাশ নিশ্চিত করতে এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধ করার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়তে প্রতিটিক্ষেত্রে ঘুষ ও দুর্নীতির কার্যকর দমন এবং দুর্নীতি সমূলে উৎপাটনে সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে একটি অহিংস ও দুর্ণতিমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আগানো অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় এ জগণ্য ভাইরাস ক্রমান্বয়ে গোটা জাতিকে কুলুষিত করে তোলার পাশাপাশি দেশের সকল অর্জন ব্যার্থ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

দুর্ণীতির কার্যকর দমণে প্রস্তবনা সমূহ :-

দেশে ঘুষ ও দুর্ণীতির কার্যকর দমন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভীতিহীন ও দুর্ণীতিমুক্ত সমাজ গঠনে প্রস্তবনা সমূহ নিন্মে তুলেধরা হলো :-

১. দুর্ণীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার।
২. রাষ্ট্রীয় নীতিতে দুর্ণীতি দমনকে সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর কার্যকর দমণে দৃঢ় প্রত্যয় ও জিরো ট্রলারেন্স নীতি অবলম্বন করা।
৩. দেশে আইনের শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা।
৪. দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরকার ও বিরোধীদল উভয়ের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ।
৫. দলের নেতাকর্মীরা যাতে দুর্ণীতিগ্রস্থ হয়ে না পড়ে এবং সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য দলের হাইকমান্ড থেকে মাঠপর্যায়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ।
৬. মাঠপর্যায়ে দর্ণীতি পর্যবেক্ষণ ও কার্যকর দমণে আইন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সমূহের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক দুর্ণীতি পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত সংস্থা এবং পর্যাপ্ত জনবল থাকা উচিত। উদাহরণস্বরুপ, বর্তমানে শুধুমাত্র দুদকের সীমিত কার্যপরিসর ও স্বল্প জনবল নিয়ে দুর্ণীতি দমন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুর্ণীতির কার্যকর দমণে হয় দুদকের কার্যপরিষর ও জনবল আরোও বৃদ্ধি করতে হবে, অথবা সেক্টরভিত্তিক এ ধরনের আরোও নিয়ন্ত্রণসংস্থা প্রতিষ্ঠাপূর্বক মাঠপর্যায়ে সংঘটিত দর্ণীতি সমূহের কঠোর ও ব্যাপক নজরদারির ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।
৭. অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিবেশ মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে তোলে। কাজেই দুর্ণীতির কার্যকর দমনে মানুষের আয় রোজগার বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নপূর্বক সকল পর্যায়ের মানুষের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
৮. শিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গও দুর্ণীতিতে জড়িয়ে পড়ছে অহরহ। এ অবস্থার উন্নয়নে প্রত্যেক প্রফেশনের জন্য সুনর্দিষ্ট এথিকস্ ও নিয়ম থাকা জরুরি, যা অমান্য করলে শাস্তি পাওয়া বাধ্যতামূলক।
৯. শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিকশিক্ষা ও দেশাত্ববোধ অন্তর্ভূক্তি করণপূর্বক শিক্ষা জীবনের শুরুথেকে এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত, যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক নৈতিকতা ও দেশপ্রেম নিয়ে গড়ে উঠে এবং নিজেকে বাঙ্গালি পরিচয় দিতে গৌরববোধ করে।
১০. ব্যাপক আয় বৈষম্য ও সম্পদের অসম বণ্টন সমাজে ধনী দরিদ্রের তফাৎ দৃশ্যমান করে তোলে এবং মানুষের মাঝে শেণীভেদের জন্ম দেয়। এ শ্রেণীভেদ গোছাতে দুর্ণীতির মাধ্যমে অবৈধ পথে আয় করে ভাগ্য ফেরাতে মানুষ তখন মরিয়া হয়ে উঠে। কাজেই, দুর্ণীতি রোধে সমাজে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
১১. দুর্ণীতিগ্রস্থ সমাজে মানুষ অতিমাত্রায় লোভী ও অর্থপিপাসু হয়ে উঠে, ফলে প্রশাসনে কর্মরত ব্যাক্তিবর্গ নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে অবৈধ উপার্জনে মত্ত হয়ে পড়ে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই প্রশাসন যন্ত্রের পুরোটাই সবসময় সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত।

১২. সরকারিরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :

ক) প্রশাসনের শীর্ষ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সৎ, যোগ্য ও পরিক্ষিত দেশপ্রেমিক ব্যাক্তিবর্গের নিয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়োজিত কর্মকর্তা নিজে ও নিজ দপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচরীদের ঘুষ ও দুর্ণীতিমুক্ত রাখার লিখিত অঙ্গীকার আদায় করা, কেননা কোনো দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা দুর্ণতিগ্রস্ত হলে ঐ দপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারি ক্রমান্বয়ে দূর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য।

খ) সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিদের সরকারের বরাবরে বার্ষিক সম্পদ বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা।

১৩. মাঠপর্যায়ে দুর্ণীতি ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের তথ্য সংগ্রহের জন্য **"জাতিয় অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা"** গঠণ করা, যে সংস্থার কাজ হবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঘুষ, দুর্ণীতি, অনিয়ম এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ পূর্বক পরবর্তী এ্যাকশনের জন্য দুদক বা সরকার নির্ধারিত এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করা, কিন্তু এ সংস্থা নিজে কোনো এ্যাকশনে যেতে পারবে না। নিন্মে এ সংস্থার উল্ল্যেখযোগ্য কার্যাবলি সমূহের ধারণা দেওয়া হলো :-

ক) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঘুষ, দুর্ণীতি, অনিয়ম, আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনযাপন, নামে বেনামে সম্পত্তি ক্রয়, গোপন বিনিয়োগ ইত্যাদি যাচাই বাচাই ও এতদ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা।

খ) তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ পূর্বক পরবর্তী এ্যাকশনের জন্য দুদক বা সরকার নির্ধারিত এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করা।

গ) দুদক বা সরকার নির্ধারিত এজেন্সি এ সমস্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ নেবেন।

ঘ) অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা কতৃক দাখিলকৃত সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে দুদক বা সরকার নির্ধারিত এজেন্সি যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নিলেন কিনা তা নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় কতৃক নিয়মিতভাবে তদারকির আওতায় থাকবে।

ঙ) সকল সরকারি অফিস সি.সি.টি.ভি ও অন্যান্য আধুনিক তথ্য সংগ্রহ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা এবং এ সমস্ত নেটওয়ার্কে অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার থাকা।

চ) অনিয়ম ও দুর্ণীতির বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ছ) এ সংস্থার কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী অনিয়ম ও দুর্ণীতিতে জড়ালে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা।

উল্ল্যেখ্য, বিভিন্ন দপ্তরের আভ্যন্তরীণ তথ্য সংগ্রহের জন্য দপ্তর সমূহে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্য থেকে বাড়তি বেতন প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দিয়ে এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য বাড়তি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে সাশ্রয়ী খরচে এ সংস্থার কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।

****

SIFBD

অধ্যায় : ৫.২৩

প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন।

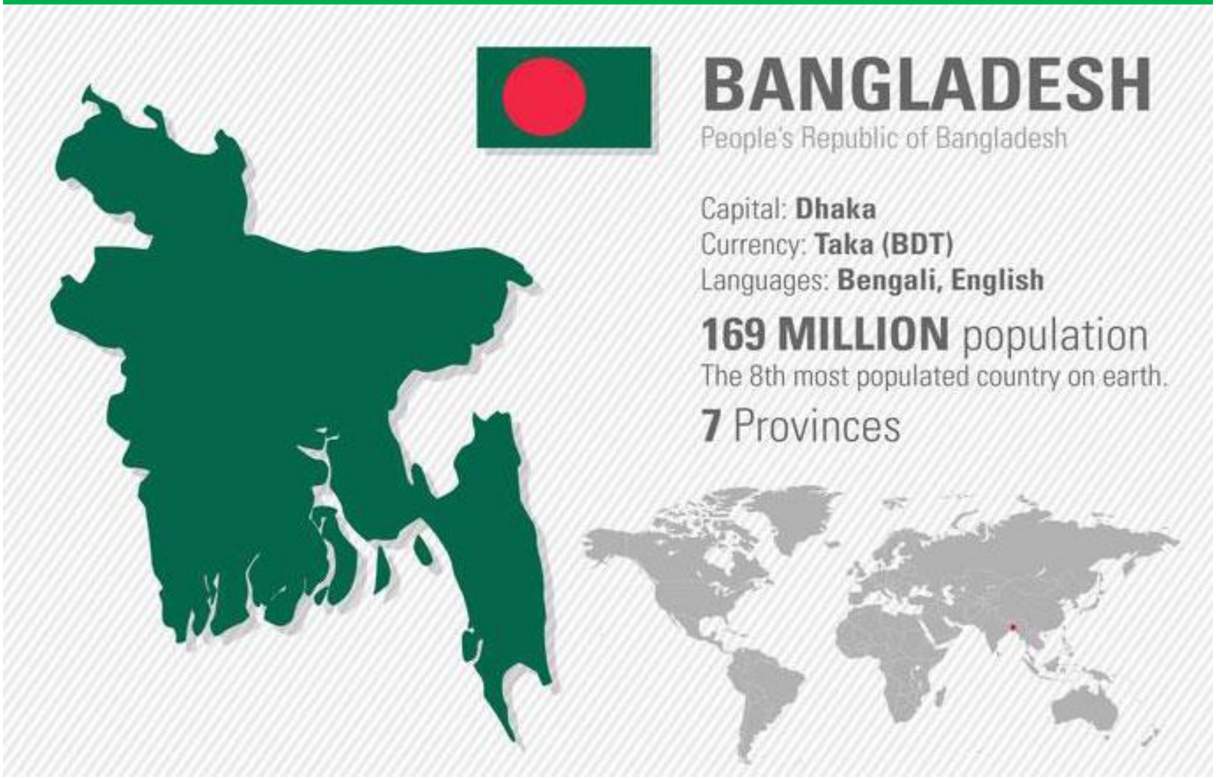

প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন।

অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় সমূহ :

ক) প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন।

১) প্রশাসনিক সংস্কার কি এবং কেন ?

২) বাংলাদেশে চলমান প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস।

খ) দেশে চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন।

গ) বাংলাদেশের উল্ল্যেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার সমূহ।

ঘ) বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার কেন অপরিহার্য ?

ঙ) চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উল্ল্যেখযোগ্য দূর্বলতা সমূহ।

চ) দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রস্তাবনা।

State of the Administrative Accountability in Bangladesh

ক) প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন :

প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন :

কোনো দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঐ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, মানসন্মত সরকারি পরিসেবা বিতরন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভীত হিসাবে কাজ করে। সামগ্রিকক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকারিতা, প্রশাসনের সকল স্তরে চেইন অব কমান্ড, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, মাঠপর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিক্ষেত্রে সরকারি এজেন্ডা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করাই উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত ও যুগোপযোগি হওয়ার অর্থ দেশে আইনের শাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা, নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক অগ্রগতি, মানসম্পন্ন সরকারি পরিসেবা এবং সুসংহত গণতান্ত্রিক পরিবেশের নিশ্চয়তা।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা মূলত বৃটিশ শাসনামল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটি নিপীড়ন মূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে শোষনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন শাসনামলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দফায় দফায় সংস্কার হয়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যা অনেকটা সেকেলে ও গতানুগতিক হিসাবে বিবেচিত। ফলে চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকলক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, ঘুষ, দুর্ণীতি, দলীয়করণ, স্বেচ্ছাচারিতা, আন্ত ক্যাড়ার কোন্দল ইত্যাদি ব্যাপকভাবে মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে, যা দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সরকারি পরিসেবা বিতরনে জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ করে তুলছে, যা নিয়ে সুশীল সমাজ, দাতা সংস্থা এবং এন.জি.ও সমূহ অহরহ আপত্তি তুলে আসছে দীর্ঘ সময় থেকে। কারণ, বিশৃঙ্খল প্রশাসনিক ব্যবস্থা কোনো দেশেই সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিতে পারেনা।

সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং সরকারি সেবা সহজীকরনে এদেশে জনপ্রশাসন ব্যবস্থা অদ্যাবধি কোনো সরকারের আমলেই প্রয়োজন অনুযায়ী পুরোপুরি সংস্কার হয়নি। দেশে জনপ্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে গঠিত সংস্কার কমিশন / কমিটি সমূহের সুপারিশমালা দু-একটি ক্ষেত্রে আংশিক বাস্তবায়িত হলেও এ সম্পর্কিত বেশিরভাগ সুপারিশ বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। উদাহরনস্বরুপ, ১৯৭৭ সালে গঠিত পে এন্ড সার্ভিস কমিশন এবং ১৯৮২ সালের প্রশাসনিক সংস্কার ও পূণর্গঠন কমিটির রিপোর্ট কার্যকর হলেও এক্ষেত্রেও অনেক বিকৃতি লক্ষ্য করা গেছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়নে প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দিক থেকে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বিশ্বে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের পেছনে অবস্থান করছে। বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী " Government Effectiveness" এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ২৩.৫৬, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা দেশেসমূহের মধ্যে ভূটানের স্কোর ৬৪.৯০, থাইল্যান্ড ৬৫.৮৭, মালয়েশিয়া ৭৯.৩৩, দ. কোরিয়া ৮৮.৪৬ এবং জাপান ৯৩.৭৫। এ তালিকায় উল্ল্যেখযোগ্য ৫ (পাঁচ)টি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সন্নিলিত স্কোর ১১০.২৬, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। এক্ষেত্রে সর্বাধিক এগিয়ে থাকা দেশসমূহের মধ্যে ভূটানের সন্নিলিত স্কোর ৩১৯.৯৮, মালয়েশিয়া ৩৩১.৮২, দ. কারিয়া ৪০৬.৫৬ এবং জাপান ৪৪০.৮২ [(স্মারণী-৫.২৩(১)]।

স্মারণী-৫.২৩(১) : State of Governance Indicators 2019 এ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের অবস্থান :-

Country	Percentile Rank in 2019					Total Scores
	Govt. Effectiveness	Regulatory Quality	Rule of Law	Control of Corruptions	Voice & Accountability	
Bangladesh	23.56	15.38	27.88	16.35	27.09	110.26
Pakistan	25.96	27.40	26.44	21.15	23.15	124.10
Vietnam	53.85	41.83	53.37	34.13	11.82	195.00
China	71.63	42.79	45.19	43.27	6.40	209.28
Philippines	54.81	55.29	34.13	31.25	47.29	222.77
Sri Lanka	48.08	47.60	53.85	44.23	43.84	237.60
Indonesia	60.10	51.44	42.31	37.98	52.71	244.54
Thailand	65.87	60.58	57.69	39.42	24.14	247.70
India	59.62	48.56	52.40	47.60	57.64	265.82
Bhutan	64.90	39.42	72.60	91.83	51.23	319.98
Malaysia	79.33	73.56	73.08	62.50	43.35	331.82
S. Korea	88.46	82.21	86.06	76.92	72.91	406.56
Japan	93.75	88.46	90.38	89.90	78.33	440.82

Source: World Bank Report 2019

তবে আশার কথা হচ্ছে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও বিশৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও ২০১০ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এ সময়কালে কৃষিখাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও জ্বালানি সহ বিভিন্নক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ডজনখানেক মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে জি.ডি.পিতে বড় আকারের উত্থান ঘটবে আশাকরা যায়। তাছাড়া এ সময়কালে সামাজিক ও অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এ সমস্ত অগ্রগতির স্বীকৃতি স্বরুপ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় পৌছানোর শতাবর্লী পূরনের স্বীকৃতি দিয়েছে, যারফলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় যুক্ত হওয়ার কথা। ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় পোঁছানো এখন বাংলাদেশের পরবর্তী স্বপ্ন।

বলা বাহুল্য, অতীতের এসমস্ত অর্জন ধরে রাখার পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে উন্নত দেশের তালিকায় স্থান পেতে বাংলাদেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যুগোপযুগী করে তোলা এখন অপরিহার্য। কারণ উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যাতিত উন্নত দেশ ও জাতি গঠণ অসম্ভব।

প্রশাসনিক সংস্কার কি এবং কেন ?

১) প্রশাসনিক সংস্কার কি এবং কেন ?

প্রশাসনিক সংস্কার হচ্ছে কোনো দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুক্তিকীকরন ও যুগোপযোগী করে তোলার একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া, যা আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মাঠ প্রশাসনের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানসন্মত উন্নয়ন এবং সরকারি সেবা সহজীকরনের পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করে। আরো বিস্তারিত বলতে গেলে Administrative reform means planned, intentional and methodical use of authority to change the structure and procedural system of public bureaucracy. The attitudes and behavior of the public bureaucrats may also be a matter of change in order to boost and speed up organizational effectiveness and attain nation's development goals. Administrative reform is defined " as the deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its goals, structures, and procedures with a view to improving it for developmental purposes" (UN 1983, 1).

প্রশাসনিক সংস্কারের মূল লক্ষ্য সমূহ হচ্ছে :

- সরকারি এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক কাঠামো কার্যকরভাবে শক্তিশালি করন।
- নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধন।
- সেবার মানোন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে পদ্ধতিগত সংস্কার।
- প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুগোপযোগি করে গড়ে তোলার মাধ্যমে সরকারি সেবা বিতরণ সহজ ও সাশ্রয়ী করে তোলা; এবং
- প্রশাসনের সকল স্তরে কার্যকর ও দক্ষ অর্থনৈতিক ও নৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা শক্তিশালি করে তোলা।

প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থায় যে সমস্ত মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়, তন্মধ্যে রয়েছে :

১) আইন ও নীতিকাঠামো উন্নয়নের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ ও উন্নত হয়।
২) নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।
৩) সরকারি কার্য প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থা উন্নত হয় ; এবং
৪) সেবা বিতরন ব্যবস্থায় মানসন্মত অগ্রগতি সাধিত হয়।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত কারণে প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসাবে সিভিল সার্ভিস সংস্কার সর্বাগ্রে বিবেচ্য। প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে প্রত্যেক দেশ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চেষ্টা চালিয়ে আসছে, বাংলাদেশও এর ব্যাতিক্রম নয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিভিন্ন সরকারের আমলে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সংস্কারের চেষ্টা চালিয়ে আসছে, যদিও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রশাসনে দুর্নীতি ও দলীয়করণ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে একটি যুগোপযোগি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হোঁচড় খেয়েছে বার বার। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে দক্ষ ও পেশাদারিত্বমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে প্রশাসনিক সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর অতিবাহিত হলেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি সেবা সহজ উপায়ে জনগনের দ্বারগোড়ায় পৌঁছাতে একটি আধুনিক ও সুসংহত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অদ্যাবধি অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তনের প্রয়াস দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দ্বারা কৃত্তিমভাবে প্রভাবিত। ১৯৪৭ সাল অবধি বাংলাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, পরবর্তীতে যা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এদেশ নির্বাচিত ও অনির্বাচিত /সামরিক সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। প্রত্যেক সরকারের

আমলে স্ব-স্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সংধিান সংশোধন করা হয়েছে, যা এদেশে জনপ্রশাসনের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শাসন ব্যবস্থা ও সরকারি সেবার মানকে করে তুলেছে প্রশ্নবিদ্ধ।

কাজেই, একটি আধুনিক, দক্ষতাভিত্তিক ও যুগোপযোগি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা আরোও বেগবান ও সুসংহত করে তুলতে এবং প্রশাসনকে জনগনের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সরকারি সেবা আরোও সহজ করে তুলতে এদেশের জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। একটি দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং শক্তিশালি উদ্যোগই কেবল সর্বস্তরের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে দেশবাসীকে এমন কার্যকরি প্রশাসনিক সংস্কার উপহার দিতে সক্ষম।

২) বাংলাদেশে চলমান প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস :

বাংলাদেশে চলমান প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস :

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা অতীতে দীর্ঘ সময় ধরে এদেশে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থারই বিকশিত রুপ। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল এবং ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের অংশ ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি সরকার প্রথা চালু করা হয়, যেখানে সরকার প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়, যা ১৯৯১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৯১ সালে পুণরায় সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় ফর্মে ফিরে আসে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মূলত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সমস্ত মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলো কেন্দ্রিয়ভাবে সচিবালয়ে রাখা হয়েছে, যা মূলত নীতিমালা প্রণয়ণ, বাস্তবায়ন এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করছে। ২০২১ সাল নাগাদ দেশে ৩৯টি মন্ত্রণালয় এবং ৫২টির বেশি বিভাগ চালু রয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সচিব, যারা যুগ্ন সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারি এবং সহকারি সচিবদের সহায়তায় কাজ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে পুরো সরকারের সন্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হলো মন্ত্রিপরিষদ। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রায় ২৫ জন মন্ত্রী, ৭ জন উপদেষ্টা, ১৮ জন প্রতিমন্ত্রী ও ৩ জন উপমন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত এ মন্ত্রিপরিষদ।

অন্যদিকে, কেন্দ্রিয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর প্রতিনিধিত্বকারি ডিভিশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি সংস্থাগুলো মাঠপর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনিক, পরিসেবা সরবরাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। পাশাপাশি ১৭৮ টির বেশি বিভাগ রয়েছে যারা সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ। এছাড়াও রয়েছে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশন সমূহ, যেগুলো মূলত রাষ্ট্রপতির আদেশ, অধ্যাদেশ এবং আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের প্রশাসনিক বিন্যাস নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

SJHBD

Administrative Structure		
1	Area of the Country	147,610 km^2
2	Divisions	8 nos.
3	Districts	64 nos.
4	Upazila	522 nos.
5	City Corporation	12 nos.
6	Powra Shova	330 nos.
7	Union Council	4,576 nos.
8	Wards	41,184 nos.

খ) দেশে চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন :

দেশে চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন :

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এরিমধ্যে ৫০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। দীর্ঘ এ যাত্রায় এদেশের শাসন ব্যবস্থা একাধিক সামরিক ও বিভিন্ন বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। ১৯৭১-১৯৭৫ এর মাঝামঝি পর্যন্ত বেসামরিক সরকার, ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত সামরিক সরকার এবং ১৯৯১ থেকে পুণরায় বেসামরিক সরকারের অধীনে এদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন শাসনামলে ক্ষমতা কুক্ষিগত ও দীর্ঘস্থায়ী করতে বিভিন্ন সময়ে নিজেদের সুবিধামত প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেগলো বেশিরভাগই মূলতঃ এদেশের সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত এবং অনেকক্ষেত্রে আরোও অস্বচ্ছ, অদক্ষ ও দুর্ণীতিপরায়ন করে তুলেছে। ফলে ১৯৮০ দশকের গোড়ার দিকে এদেশের জনপ্রশাসন ব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছিল, যে পরিস্থিতি সামাল দিতে সে সময়ে বিভিন্ন দাতা সংস্থা এদেশের কাঠামোগত প্রশাসনিক সংস্কার পরিকল্পণার আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও উন্নয়ন পর্যালোচনায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এযাবৎ বহু সমীক্ষা পরিচালনা করেছে, যারমধ্যে Public Administration Efficiency Study by USAID in 1999 এবং ১৯৯৬ সালে এতদসংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত প্রতিবেদনে সিভিল সার্ভিস কাঠামো, প্রশাসনিক দক্ষতা, গতিশীলতা, ব্যবস্থাপনা, যোগ্যতাভিত্তিক পদোন্নতি, আন্তঃসার্ভিস বিরোধ নিস্পত্তি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বিকেন্দ্রিকরনের বিষয়গুলো সবসময়ই সংস্কার এজেন্ডার অংশ ছিল। বলা বাহুল্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ঐ সমস্ত প্রতিবেদন এবং প্রশাসনিক সংস্কারে তাদের সুপারিশ এযাবৎ কোনো সরকারের আমলেই আলোর মুখ দেখেনি। কোনো সরকারের আমলে গৃহীত প্রশাসনিক সংস্কার প্রশাসনিকক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখলেও পরবর্তী সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তা বিলুপ্ত করেন। উদাহরনস্বরুপ, ১৯৮২ সালে এরশাদ সরকার কর্তক প্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেলেও পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে বি.এন.পি সরকার তা বাতিল করে দেন।

বিশ্বব্যাংক, ইউ.এস.এইড এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে বাংলাদেশে চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা যথেষ্ট সেকেলে এবং ত্রুটিযুক্ত, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ও সরকারি পরিসেবা সহজীকরনের ক্ষেত্রে যা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যার্থ হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থার মতামত ও বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ নিন্মে তুলেধরা হলো (সুত্র : আবু ইলিয়াস সরকার) :-

১. ঐতিহাসিকভাবে জনজীবনের প্রত্যেক স্তরে সরকারের ভূমিকা বিস্তৃত। ফলে সরকারকে মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়, যার অনেকগুলো বেসরকারি সংস্থা এবং প্রাইভেট সেক্টরে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।
২. রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের অভাবে প্রশাসনিক পর্যায়ে আমলাতন্ত্র ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে, ফলে সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দীর্ঘসুত্রিতার পাশাপাশি সরকারি পরিসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. দেশে সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিয়ে সকল মহলে প্রশ্ন রয়েছে।
৪. চলমান প্রক্রিয়ায় সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া পুরোপুরি কেন্দ্রিভূত হওয়ার ফলে অধীনস্ত সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও কার্যকারিতা অত্যন্ত সীমিত।
৫. প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছ্বতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়টি যথেষ্ট অস্পষ্ট।

SJHBD

৬. সরকারি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার সংস্কৃতি চালু রয়েছে, ফলে প্রশাসনিক কার্যকলাপের বড় অংশই জনসাধারনের কাছে অস্পষ্ট থাকে।

৭. চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি অকার্যকর জন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা, যেখানে আন্তঃশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান, মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশের অনুপস্থিতি এবং কর্মদক্ষতা ও মূল্যায়নের মধ্যে যোগসুত্রের অভাব রয়েছে।

৮. সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারীদের মাঝে দুর্ণীতির অনুশীলন ব্যাপকভাবে বিরাজমান, যার অন্যতম কারণ হিসাবে কম পারিশ্রমিক, নৈতিক অবক্ষয় এবং দুর্ণীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নমনীয়তাই বহুলাংশে দায়ী।

৯. সিভিল সার্ভিসে রাজনীতিকীকরনের প্রভাব বিদ্যমান। প্রশাসনে রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় থাকায় অনেক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যেমন রাজনৈতিক হয়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ও বাধাবিপত্তির সন্মুখীন হতে হয়।

১০. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাড়ারদের হাতে কার্যনির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কতৃপক্ষের ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী শাখার আধিপত্যকে আরোও বাড়িয়ে দিয়েছে, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

১১. সামগ্রিকভাবে সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারীদের নিন্মমানের পরিসেবা প্রদানের জন্য সকলক্ষেত্রে সমালোচনা ও দোষারোপের স্বীকার হতে হয়। প্রশাসনে রাজনীতিকীকরন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি পরিসেবার মান ক্রমান্বয়ে আরোও হ্রাস পাচ্ছে।

গ) বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার সমূহ :

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার সমূহ :

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ২০২০ সময়কালে বিভিন্ন সরকারের আমলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রায় ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে, যারমধ্যে সিভিল সার্ভিস কাঠামো উন্নয়ন, বেতন কাঠামো পরিবর্তন, পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে জনবল নিয়ন্ত্রণ, মাঠ প্রশাসন, এস.এস.পি, সেক্রেটারিয়েট সিস্টেমস এবং প্রশাসনিক কাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত সংস্কারগুলো অন্যতম।

স্মারণী-৫.২৩(২) : MAJOR ADMINISTRATIVE REFORMS IN BANGLADESH TILL 2020 :

SL	Committees / Commissions	Year	Type of Reforms
1	Administrative Re-organization Committee	1971	Organizational set-up for the govt. after Emergence of Bangladesh.
2	Administrative and Service Structure Re-organization Committee.	1972	Civil Service Structure
3	National Pay Commission	1972	Pay Issues
4	Pay and Service Commission	1977	Service Structure and Pay Issues.
5	Martial Law Committee for Examining Organizational set-up of Ministries/ Divisions/ Directorates and other Organizations.	1982	Organizations and Rationalization of Manpower in Public Sector Organization.
6	Committee for Administrative Reform and Re-organization.	1982	Reorganization of District / Upazilla and Other Field Level Administration.
7	National Pay Commission	1984	Pay Issues
8	Secretaries Committee on Administrative Development.	1985	Promotion Aspects.
9	Special Committee to Review the Structure of Senior Service Pool.	1985	Structure of Senior Service Pool.

10	Cabinet Sub-committee.	1987	Review of SSP and Promotions Aspects.
11	Committee to Re-examine the Necessity of Keeping Certain Government Offices in the Light of Changed Circumstances.	1989	Necessity or Otherwise of Keeping Certain Government Offices.
12	National Pay Commission	1989	Pay Issues
13	Commission for Review of Structure of the Local Government.	1991	Structure of Local Government.
14	National Pay Commission	1996	Pay Issues
15	Administrative Re-organization Committee.	1996	Structure and Rationalization of Manpower Across Ministries / Divisions/ Directorates.
16	Local Government Commission	1997	Strengthening of Local Government Institutions.
17	Public Administrative Reform Commission.	2000	Improving Transparency, Efficiency, Accountability and Effectiveness of Public Administration and Institutional & procedural changes, Improvement of Service and Value for Money at all levels of Administration.
18	Regulatory Reform Commission	2007	Review all government rules & regulations and identify those that should be annulled, modified or left unchanged and make suitable recommendations for dynamism into governance, administrative and the economy.
19	National Pay Commission	2009	Pay Issues

Source: ABU ELIAS SARKER, UNDP 1993; USAID 1989; World Bank 1996.

ঘ) বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার কেন অপরিহার্য ?

বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার কেন অপরিহার্য ?

প্রশাসনিক সংস্কার হচ্ছে কোনো দেশের পাবলিক সেক্টর পরিচালনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত সংস্কার, যা প্রশাসন ব্যবস্থায় দেশীয় ও বৈশ্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে খাঁপ খাইয়ে নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। দেশে রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন, সরকার পরিবর্তন অথবা সরকার পরিচালন ও সরকারি সেবা প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত কোনো সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বা ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আমলাতান্ত্রিক শক্তির সহযোগীতা ও সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সহযোগীতা ও সমর্থন নিশ্চিত করা হয়। প্রকৃত অর্থে প্রশাসনিক সংস্কার হচ্ছে একটি দেশের জনপ্রশাসন পরিচালনায় আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে তুলতে এবং সরকারি সেবা প্রক্রিয়ায় মান বৃদ্ধিকল্পে প্রশাসন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সমন্বয় সাধন, যা একটি দেশের সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনামলের ধারাবাহিকতায় পরিচালিত হওয়া একটি সেকেলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এদেশে অদ্যাবধি সংঘটিত হওয়া প্রশাসনিক সংস্কার সমূহের দু-একটি ব্যাতিত বেশিরভাগই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, যেগুলো মূলতঃ অতীতের সরকারগুলো ক্ষমতায় টিকে থাকতে ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে আমলাতান্ত্রিক সমর্থন আদায়ের অপকৌশল বলা চলে। প্রশাসন ব্যবস্থার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার এদেশে কোনো সরকারের আমলেই হয়নি।

ফলে এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সরকারি সেবার সর্বস্তরে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্ণীতি ও স্বজনপ্রীতি ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান, যা দেশী ও বিদেশী সকল মহলে সমালোচনা ও অনাস্থার স্বীকার হচ্ছে অহরহ। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মূল্যায়নে কার্যকারিতা ও মানদন্ডের দিকথেকে বাংলাদেশের চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ও অকার্যকর, দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশের তুলনায় যা একদমই পিছিয়ে রয়েছে।

প্রশাসন ব্যবস্থা যুগোপযোগী ও জনকল্যাণমূখী না হওয়ার কারনে শুধুমাত্র দেশের জনগণ যে প্রকৃত সেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়, এর দ্বারা সামাজিক স্থিতিশীলতা, ব্যবসা বানিজ্য ও বিনিয়োগের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যার ফলে দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে সময় সময় দেশের জনপ্রশাসন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ও মানোন্নয়ন বিশ্বব্যাপি একটি সাধারণ বিষয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর ৫০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে দেশের রাজনীতি, সামাজিক ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এরিমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পাওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেচে। ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেতে দেশে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই, যার জন্য প্রয়োজন আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সকল মহলের সার্বিক সহযোগীতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থা সমূহের সহযোগীতায় উন্নত বিশ্বের আলোকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমেই কেবল এদেশে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, আগামীতে যা হবে এদেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার।

বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control of Corruptions and Voice of Accountability) সন্মিলিত স্কোর বাংলাদেশের ১১০.২৬, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের স্কোর ১২৪.১, ভিয়েতনাম ১৯৫, চীন ২০৯.২৮, ফিলিপাইন ২২২.৭৭, শ্রীলংকা ২৩৭.৬০, ইন্দোনেশিয়া ২৪৪.৫৪, থাইল্যান্ড ২৪৭.৭০, ভারত ২৬৫.৮২, ভূটান ৩১৯.৯৮, মালয়েশিয়া ৩৩১.৮২, দ. কোরিয়া ৪০৬.৫৬ এবং জাপান ৪৪০.৮২ স্কোরের অধিকারি।

স্মারণী-৫.২৩(৩) : বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার ৫টি গুরুত্বপূর্ণক্ষেত্রে সন্মিলিত স্কোরের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের অবস্থান :-

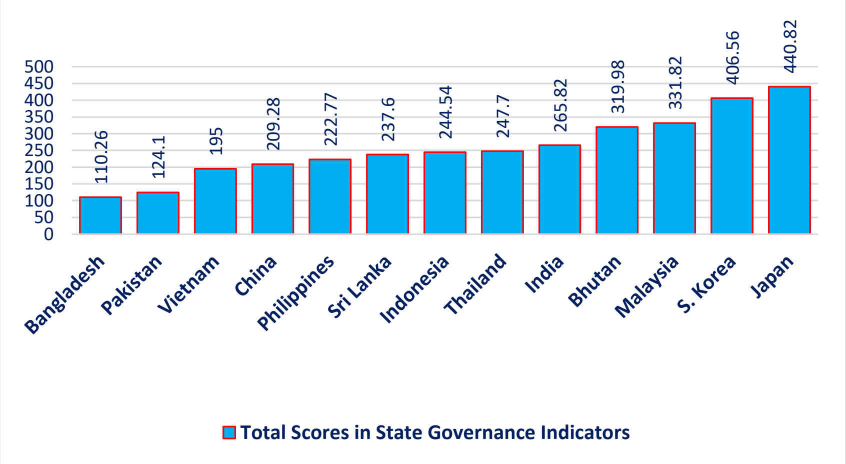

Source: World Bank Report 2019

ঙ) চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য দূর্বলতা সমূহ :

চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য দূর্বলতা সমূহ :

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় অদ্যাবধি যুগোপযোগী সংস্কার না হওয়ার কারণে প্রশাসনে কাঠামোগত জটিলতা এবং নীতি নির্ধারণী ও সেবা বিতরনের ক্ষেত্রে অদক্ষতা, দীর্সূত্রীতা, দুর্ণীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় রাজনীতির প্রভাব ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান, যা দেশের সামগ্রীক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে এবং দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। সরকারি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান সমূহে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অদক্ষতা, অদূরদর্শীতা ও দুর্ণীতিগ্রস্ততার কারনে মাঠপর্যায়ে দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিরাজমান। সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে রাজনীতিকীকরন, নিয়োগ, পদোন্নতি, দপ্তর বন্টন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং এসমস্তক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব বিস্তার এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে দুর্ণীতিগ্রস্থতার কারণে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সম্ভব হয়না, যা সরকারি সেবার মানকে দেশে বিদেশে ক্রমাগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে এবং সরকারের অর্জনগুলোকে ম্লান করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিরাজমান উল্ল্যেখযোগ্য সমস্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে :-

প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সমূহ :

- কর্মকর্ত/কর্মচরীদের মাঝে দুর্ণীতি, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ আত্মসাতের প্রবল মনোভাব।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে দক্ষ জনবলের অভাব।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদবন্টনের নিয়ম অনুপস্থিত।
- ঘন ঘন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বদলি।
- বিভাগ/দপ্তরসমূহের মাঝে আন্ত সমন্ময়ের অভাব।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে স্বচ্ছ্বতা ও জবাবদিহিতার অভাব।
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অদক্ষতা ও অদুরদর্শিতা।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে রাজনীতিকীকরন ও দলীয় প্রভাব বিস্তার।
- কর্মকর্ত/কর্মচারীদের অযৌক্তিক আচরণ এবং আইন বহির্ভূত কর্মকান্ড।
- সরকারি সম্পদ রক্ষায় দায়িত্বহীনতা।
- পরিকল্পণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা, অদক্ষতা ও দীর্ঘসূত্রিতা।

রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ :

- প্রশাসনিক কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।
- নিয়োগ, পদোন্নতি, দপ্তরবন্টন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে দলীয় প্রভাব বিস্তার।
- মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের উপর স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অযাচিত প্রভাব বিস্তার।

সামাজিক সমস্যা সমূহ :

- সর্বস্তরে আইনের শাসন বলবৎ না থাকা।
- সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহন না থাকা।
- প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অন্যান্য মিড়িয়ার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ।
- বিরোধী দলের উপর দমন পীড়নে আইন শৃক্ষলা বাহিনীর ব্যবহার।
- সাধারণ জনগণের মাঝে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা না থাকা।
- সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব।

SJIBD

অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহ :

- বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধ।
- বেতন কাঠামো নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে অসন্তুষ্টি।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সঠিক ও নিয়মিত নিরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকা।
- আর্থিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক মান ও বিধিবিধান মেনে না চলা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ আত্মসাৎ।
- দুর্ণীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান ও নিয়ন্ত্রণ না থাকা।

অন্যান্য সমস্যা সমূহ :

- সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে সঠিক অনুপ্রেরনার অভাব।
- দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতির বিধান চালু না থাকা।
- চাকরিক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও বেতন কাঠামো নিয়ে অসন্তুষ্টি।
- আন্ত ক্যাড়ার কোন্দল।
- সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী, নৈতিকতা ও সেবার মনোভাব অনুপস্থিত।

কাজেই, দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে প্রশাসনিকক্ষেত্রে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সমূহ নিরষনে আপাদমস্তক সংস্কারের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী, আধুনিক ও টেকসই প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে যে কোনো সরকারের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কেননা, মানসম্মত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যাতিত মানসন্মত উন্নয়ন একদমই অসম্ভব।

চ) দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

State of the Administrative Accountability in Bangladesh

প্রশাসনিক সংস্কার নিঃসন্দেহে একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সাধারণভাবে প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্য হলো সরকারী কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সরকারি পরিসেবার মানোন্নয়ন। কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে কেন্দ্রিয় ও মাঠপর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা সুসংহত করার মাধ্যমে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন, রাজস্ব আদায় জোরদার এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর হয়, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে।

স্বাধীনতার পর থেকে সুশীল সমাজ, এন.জি.ও এবং দাতা সংস্থাগুলো বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় অতীতের সামরিক/বেসামরিক বিভিন্ন সরকারের আমলে প্রশাসনের বিভিন্নক্ষেত্রে এযাবৎ প্রায় ১৯টি সংস্কার

দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রস্তাবনা :

কার্যকর হয়েছে, যদিও এ সমস্ত সংশোধনীর বেশির ভাগই ছিল আংশিক এবং ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার অপকৌশল মাত্র। প্রশাসনিক ব্যবস্থার যুগোপযোগী করনে প্রয়োজনীয় ও পুর্ণাঙ্গ সংস্কার অদ্যাবধি কোনো সরকারের আমলেই হয়নি। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, ঘুষ, দুর্ণীতি এবং দলীয়করন ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান, যা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার যথার্ততাকে দেশে বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। দেশে টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে উন্নত দেশের তালিকায় স্থান পেতে হলে প্রয়োজন একটি দক্ষ, মানসন্মত ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যারজন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক সংস্কার। সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তবনা নিন্মে তুলে ধরা হলো :-

১) সর্বস্তরে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন।
২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যতার্থতা যাছাইয়ে সুশীল সমাজের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩) প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় দক্ষ আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
৪) দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে পুলিশ বিভাগের সংস্কার ও আধুনিকায়ন।
৫) প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরন।
৬) সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৭) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি নিশ্চিত করা এবং এসমস্তক্ষেত্রে দুর্ণীতি ও দলীয়করণ পুরোপুরি বন্ধ করা।
৮) প্রশাসনের সকল স্তরে দুর্ণীতি, দলাদলি ও আন্তঃকোন্দল বন্ধে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ।
৯) মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
১০)প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানোন্নয়নে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ।
১১) দূর্ণীতির বিষয়ে সরকারের জিরো ট্রলারেন্স নীতি অবলম্বন এবং দুর্ণীতি দমনে বাস্তবসন্মত উদ্যোগ গ্রহণ করা ।
১২)সরকারি পরিসেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ই-গভর্নেস প্রথার পুরোপুরি প্রবর্তন এবং সেবা বিতরনের সকলক্ষেত্রে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা।
১৩) গণতন্ত্র সুসংহত করতে গণমাধ্যম ও বাক স্বাধীনতার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস।
১৪)নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বাস্তবধর্মী ও কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
১৫) জাতিয় নির্বাচনে নমিনেশন প্রদানেরক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দেশপ্রেম ও দেশাত্ববোধের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা।
১৬) জাতিয় নির্বাচন পদ্ধতির পূণর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন।
১৭) সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, আবাসন এবং জীবনমান উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ঠ বিষয় সমূহের যুগোপযোগি করন।
১৮) সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে অর্থ আত্মসাৎ ও তহবিল তসরুপ বন্ধে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে IAS / BS পুরোপুরি মেনে চলার পাশাপাশি নিয়মিত নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।
১৯) সরকারি সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং এর যথাযথ সংরক্ষণে কার্যকর নীতি অবলম্বন।
২০) বিরোধী দলের দাবি দাওয়া উপস্থাপনের জন্য রাজপথে হরতাল, মিছিল ও ভাংচুর না করে গণতান্ত্রিক উপায়ে পার্লামেন্টে উপস্থাপন প্রক্রিয়া চালু করা।
২১) খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যমান ও বাজার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
২২) কর্মমূখী শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও বাসস্থান উন্নয়ন এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে আইন প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।

****

SJEBD

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবি হউক।

References :-

1. **Primary Report on Agricultural Census of Bangladesh 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Agriculture%20Sensus%202019.pdf
2. **Ten years of Progress of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/10years%20Development%20Data.pdf
3. **Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh -2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Agriculture1%20Year%20Book%202017-18.pdf
4. **Bangladesh Statistics 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Bangladesh%20%20Statistics-2018.pdf
5. **Bangladesh Disaster related Statistics – 2015 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Disaster_Climate_Statistics%2015.pdf
6. **Report on the Household Income and Expenditure Survey 2016 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Final%20Report%20on%20HIES%202016.pdf
7. **Bangladesh Economic Census 2013 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/FinalReport%20Part%201%20%20Economic%20Sensus-2013.pdf
8. **Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Key_English.pdf
9. **Bangladesh Labor Force Survey 2016-**17 : file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/LFS_2016-17.pdf

10. **MAPPING OF HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS IN BANGLADESH (WHO) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/mapping-of-health-professional-education-institutions-report-2019.pdf
11. **Bangladesh Economic Review 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Economic%20Review-Agriculture,%202018.pdf
12. **Bangladesh Economic Review 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/MOF%20Report%20on%20Economic%20situation.pdf
13. **Bangladesh Economic Review 2020 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Appendix%20on%20Economic%20Review%202020.pdf
14. **Bangladesh Statistics 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Bangladesh%20Statistics%202019.pdf

15. **POPULATION PROJECTION OF BANGLADESH Dynamics and Trends 2011-2061 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/PopulationProjection.pdf
16. **Poverty and extreme poverty, 2017, 2018 and 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Poverty%20_%20Extreme%20poverty.pdf
17. **BANGLADESH STRATEGIC PLAN ON AGRICULTURAL AND RURAL STATISTICS (2016-2030) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/SPARS_Final_BBS_Rev_090817.pdf
18. **Statistical Pocketbook of Bangladesh 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Statical%20Yearbook%202019.pdf
19. **Statistical Year Book Bangladesh 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Statstical%20Year%20Book%20-2018.pdf
20. **Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/SVRS_Report_2018_29-05-2019(Final).pdf
21. **Chapter- Seven Technical and Vocational Education :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Technical%20Education.pdf
22. **WOMEN AND MEN IN BANGLADESH Facts and Figures 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Women%20and%20men%20in%20Bangladesh-Facts%20and%20figures%202018.pdf
23. **Yearbook of Agricultural Statistics-2017 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Statistics%20Folder/Yearbook-2017-Final-05-05-2018.pdf
24. **Health Systems Development Programme of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Community%20Clinics%20System.pdf
25. **Consumer Price Index (CPI), Inflation Rate and Wage Rate Index (WRI) in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/CPI_January19.pdf
26. **SDG HEALTH AND HEALTH-RELATED TARGETS :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/EN_WHS2016_Chapter6.pdf
27. **Independent Evaluation of Community Based Health Services in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Evaluation%20of%20Community%20based%20health%20Services.pdf
28. **Costed Implementation Plan for the National Family Planning Programme, Bangladesh 2016-2020 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Family%20Planning.pdf
29. **Family Planning and the 2030 Agenda for Sustainable Development :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/familyPlanning_DataBooklet_2019.pdf
30. **HEALTH BULLETIN BANGLADESH 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/HB%202018%20final.pdf
31. **Health Financing in Bangladesh – Scarcity and its impact – South Asia Journal :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Health%20Financing%20in%20Bangladesh.pdf
32. **Health Facilities in Bangladesh under DGHS :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Health%20Institutes%20in%20Bangladesh.html
33. **National Health Policy 2011 (Bangla) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Health%20Policy%202011%20(1).pdf

CJFBD

34. **People's Participation in Health Services: A Study of Bangladesh's Rural Health Complex :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Health%20Systems%20in%20bangladesh.pdf
35. **Health Tourism: A Demographic Study on the Outbound Health Tourists from Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Health%20Tourism.pdf
36. **HEALTH BULLETIN BANGLADESH 2017 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/HealthBulletin2017.pdf
37. **Healthcare Network of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Healthcare-Network-BD.pdf
38. **Bangladesh: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage: 2018 revision :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Immunization%20Survey.pdf

39. IMPORTANT FACTORS FOR MEDICAL TOURISM IN BANGLADESH: A COMPARITIVE ANALYSIS

40. **Journey to SDGs 2030 for Health :** file://C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/JourneytoSDGs2030%20forHealth_Fin_ed2.pdf
41. **Tuberculosis Control in Bangladesh:** Annual Report 2017 : file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/NTPC%20(T.V)%20%20Report-2017(DG%20Health).pdf
42. **Research article : Are 'Village Doctors' in Bangladesh a curse or a blessing? :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/Village-Doctors-in-Bangladesh.pdf
43. **Independent Evaluation of Community Based Health Service in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/WHO%20Report%20on%20Community%20Clinics.pdf
44. **Independent Evaluation of Community Based Health Services in Bangladesh (By WHO) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Health%20Development%20files/WHO%20Report-2019%20on%20Health.pdf
45. **Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh Survey Report January-June, 2019 :** **file**:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Investment/FDI%20in%20Bangladesh.pdf
46. OPTIMAL LEVEL OF FOREIGN RESERVES – EXAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA : (PDF) OPTIMAL LEVEL OF FOREIGN RESERVES – EXAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (researchgate.net)
47. **PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Investment/Private%20sector%20Development.pdf
48. **Administrative Reform in Bangladesh : Three Decades of Failure :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Administrative%20Reforms/Administrative%20Reform.pdf
49. **Administrative Reform in Bangladesh : Ideology, Initiatives and Obstacles :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Administrative%20Reforms/Administrative%20Reformin%20-%20researchgate.pdf

50. Problems and challenges of public administration in Bangladesh: pathway to sustainable development : (PDF) Problems and challenges of public administration in Bangladesh: pathway to sustainable development (researchgate.net)
51. **UNDP AND PUBLIC ADMINISTRATION REFORM :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Administrative%20Reforms/Public%20Administration%20Reforms.pdf
52. **Public Administration in Bangladesh: Reflection on Reforms1 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Administrative%20Reforms/Reflection%20on%20reform.pdf

53. ANTI-CORRUPTION STRATEGIES IN BANGLADESH: MAJOR ISSUES AND CHALLENGES : (PDF) ANTI-CORRUPTION STRATEGIES IN BANGLADESH: MAJOR ISSUES AND CHALLENGES (researchgate.net)
54. Corruption in Bangladesh : file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Corruption%20Related/Causes%20of%20Corruptions%20in%20Bangladesh.html
55. **CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TIB Report) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Corruption%20Related/Corruption%20Perception%20Index%202019%20by%20TIB.pdf
56. Corruption, Causes and Consequences : file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Corruption%20Related/Corruption,%20causes%20and%20consequences.pdf
57. **Decentralised Governance, Corruption and Anti-corruption Measures: An Enquiry in Bangladesh Experience (CPD Report) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Corruption%20Related/Corruption-and-Anti-corruption-Measures%20by%20CPD-ODI.pdf
58. **The Impact of Corruption on Economic Development of Bangladesh: Evidence on the Basis of an Extended Solow Mode (Stockholm University) :**

file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Corruption%20Related/Impect%20of%20Corruption%20in%20the%20Society.pdf

59. **Overview of corruption and anti Corruption in Bangladesh (TIB Report 2019) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Corruption%20Related/overview-of-corruption-and-anti-corruption-in-bangladesh-2019.pdf
60. **Corruption in Service Sector : national Household Survey 2017 (TIB Report) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Corruption%20Related/TIB%20Report-English.pdf
61. Understanding Cultural Causes of Corruption: The Case of Bangladesh : (PDF) Understanding Cultural Causes of Corruption: The Case of Bangladesh (researchgate.net)
62. **An Evaluation of the Tax System in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/bangladesh%20tax%20system.pdf
63. **BANGLADESH DEVELOPMENT UPDATE Towards Regulatory Predictability (World Bank) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Bangladesh-Development-Update.pdf
64. **BANGLADESH DEVELOPMENT UPDATE Tertiary Education and Job Skills (World Bank) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Bangladesh-Development-Update-Tertiary-Education-and-Job-Skills.pdf
65. **Bangladesh Poverty Assessment Facing Old and New Frontiers in Poverty Reduction :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Bangladesh-Poverty-Assessment-Facing-Old-and-New-Frontiers-in-Poverty-Reduction.pdf
66. **Budget Speech 2019-20 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Budget_Speech_2019-20_English_Final_Print.pdf
67. POTENTIAL OF PERSONAL INCOME TAX IN BANGLADESH, An Examination of Survey Data (CPD Working Paper 126) : file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/CPD-Working-Paper-126-Potential-of-Personal-Income-Tax-in-Bangladesh.pdf
68. **Destination Bangladesh (PWC) :** file://C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/destination-bangladesh%20by%20PWC.pdf
69. **Public Finance in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Public%20Finance%20in%202017,%202018%20and%202019.pdf
70. **FAIR TAX MONITORSUB ITLE Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Revenue%20system%20of%20Bangladesh.pdf
71. **Policy Research Working Paper 8730 : A Look at How Much Countries Are Spending on Infrastructure (World Bank) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Economic%20Development/Worldbank%20research%20on%20development.pdf
72. **Bangladesh Female Participation in Technical Education (World Bank) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Bangladesh-Female-participation-in-TVET.pdf
73. **Bangladesh Tertiary Education Sector Review (World Bank) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Bangladesh-Tertiary-Education-Sector-Review-%20World%20Bank%20Report.pdf
74. **Challenges of Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Challenges%20of%20TVET%20in%20Bangladesh.pdf
75. **Pocket Book On Bangladesh Education Statistics-2017 (BANBAIS) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Education%20Pocketbook%202017.pdf
76. **EDUCATION SECTOR PLAN (ESP) FOR BANGLADESH FISCAL YEARS 2020/21 – 2024/25 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Education%20sector%20plan%20bangladesh.pdf
77. **Global Knowledge Index (GKI) 2020 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Global-Kowledge-Index-2020.pdf
78. **Statistical Yearbook Bangladesh 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Statistical%20Yearbook%202019.pdf
79. **Situation Analysis of Bangladesh TVET Sector: A background work for a TVET SWAp :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/Technical%20Education.pdf
80. **Bangladesh Technical Education Board Annual Report 2018**-2019 : file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/TVET%20Annural%20Report_2018-2019.pdf
81. **Bangladesh University Grant Commission Annual Report 2018 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/UGC%20Annual%20Report-2018.pdf

82. **World Intellectual Property Indicators 2020 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Education/wipo_pub_941_2020.pdf
83. **Bangladesh: Joint Bank-Fund Debt Sustainability Analysis 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Govt%20Debts%20and%20Borrowings/Govt%20debts%20analysis%202019.pdf
84. **NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS (Provisional Estimates of GDP, 2019-20 and Final Estimates of GDP, 2018-19) :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Govt%20Debts%20and%20Borrowings/National%20Accounts%202020.pdf
85. **EU27 FDI Flows with Bangladesh :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Bangladesh%20and%20EU%20Trade%20Statistics.pdf
86. **Review of Bangladesh's Engagement in Preferential Trading Arrangements :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Bangladesh%20Engament%20in%20Trade%20Agreements.pdf
87. **COOPERATION AGREEMENT between the European Community and the People's Republic of Bangladesh on partnership and development :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Bangladesh%20EU%20cooperation%20agreement.pdf
88. **Bangladesh Trade Profile (WTO) :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/bangladesh%20Trade%20Profile-WTO.pdf
89. **BANGLADESH DOING BUSINESS BLUEPRINT 2019-20 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Bangladesh-Doing-Business-Blueprint-2019-20.pdf
90. **Prospects for Economic Integration of BIMSTEC: Trade and Investment Scenario :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/BIMSTEC_Trade%20&%20Investments.pdf
91. **BIMSTEC - A Vibrant Economic Bloc :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/BIMSTEC-analysis%20by%20WTC.pdf
92. **Economy Profile of Bangladesh "Doing Business 2020 Indicators" :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Business%20start%20timing%20in%20bangladesh.pdf
93. **EXPORT-IMPORT POLICY OF BANGLADESH :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Export%20&%20Import%20Policy.pdf
94. **Economic Policy Paper on Export Diversification Tools :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Export%20Diversification%20Tools.pdf
95. **WORLD INVESTMENT REPORT 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/FDI%20in%202019.pdf
96. **Foreign Trade of Bangladesh: Its Composition, Performance, Trend, and Policy :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Foreign_trade_of_Bangladesh.pdf
97. **The Least Developed Countries Report 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Leased%20Developed%20Countries%20Report%20by%20UNCTAD.pdf
98. **Leather Sector Export Roadmap of Bangladesh :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Leather%20Sector%20Export.pdf
99. **Market Access Issues: EU-Bangladesh Trade Regime A Case Study on Market Access - Myths and Realities :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Market%20Aeecss%20barrierrs.pdf
100. **Strategy for Export Diversification 2015-2020 of Bangladesh : Breaking into new markets with new products :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/potential_Strategy-for-Export-Diversification.pdf
101. **AGREEMENT ON SOUTH ASIAN FREE TRADE AREA (SAFTA) :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/SAFTA%20Agreement.pdf
102. **Strengthening Competitiveness in Bangladesh—Thematic Assessment A Diagnostic Trade Integration Study (World Bank) :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/Trade%20Development%20Directions%20by%20the%20World%20bank.pdf
103. **World Trade Statistical Review 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/World%20Trade%20Statistics%202019.pdf
104. **WORLD TRADE REPORT 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/WTO%20Report%202019.pdf
105. **World Trade Statistical Review 2020 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Import%20&%20Export%20related%20Files/WTO%20Report%202020.pdf

106. **Challenges of Ready-Made Garments Sector in Bangladesh: Ways to Overcome :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Challenges%20of%20Ready-Made%20Garments%20Sectorin.pdf

107. **CPD RMG Study 2016 : DATA UNIVERSE' OF BANGLADESH'S RMG ENTERPRISES Key Features and Limitations :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/CPD-Working-Paper-RMG-Enterprises.pdf

108. **LABOUR MARKET PROFILE BANGLADESH – 2020 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Labor%20market%20Status%20in%20BD%20by%202020.pdf

109. **Overview of Major Industries in Bangladesh :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Major%20Industries%20in%20Bangladesh%20.pdf

110. **Manufacturing Sector of Bangladesh-Growth, Structure and Strategies for Future Development :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Manufacturing%20Sector%20Growth%202012.pdf

111. **National Industrial Policy 2016 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/National%20Industry%20Policy%202016%20.pdf

112. **USAID/BANGLADESH COMPREHENSIVE PRIVATE SECTORASSESSMENT :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Private%20sector%20assessment%20of%20bangladesh%20by%20USAID.pdf

113. **Prospects and Challenges of Industrialization in Bangladesh :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Prospects%20of%20industrialiazion%20in%20BD.pdf

114. **Ready-Made Garments Sector of Bangladesh: Its Growth, Contribution and Challenges :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/RMG%20Sector%20Study.pdf

115. **STATE-OWNED ENTERPRISES AND CLUSTER-BASED INDUSTRIALIZATION: EVIDENCE FROM BANGLADESH :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/State%20owned%20Enterprise%20survey%202019.pdf

116. **Survey of Manufacturing Industries (SMI) Bangladesh 2012 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Suevey%20of%20Mfg.%20Ind%20-%20SMI-%202012.pdf

117. **Survey of Manufacturing Industries Bangladesh 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/Survey%20of%20Mfg.%20Ind.%202019.pdf

118. **The Power and Energy Sector of Bangladesh: Challenges of Moving beyond the Transition Stage :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Industrial%20Sector/The-Power-and-Energy-Sector-of-Bangladesh.pdf

119. **7th Five Year Plan : 2016-2020 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Infrastructure/7th_FYP_18_02_2016.pdf

120. **DOING BUSINESS 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Infrastructure/Ease%20of%20doing%20biz%20Index%202019.pdf

121. **Investing in Infrastructure: Building for the Long Term :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Infrastructure/Future%20Infrastructure%20Plan.pdf

122. **GLOBAL INFRASTRUCTURE OUTLOOK :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Infrastructure/Global%20Infrastructure%20Outlook-2017.pdf

123. **INFRASTRUCTURE IN ASIA AND THE PACIFIC :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Infrastructure/Infrastructure%20in-South-Asia.pdf

124. **National Sustainable Development Strategy :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Infrastructure/National%20Sustainable%20Development%20Strategy.html

125. **Blue Economy of Bangladesh: Opportunities and Challenges for Sustainable Development :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Blue%20Economy/Blue%20Economy%20of%20BD-%20Researchgate.pdf

126. **Toward a Blue Economy: A Pathway for Sustainable Growth in Bangladesh** :
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Blue%20Economy/Blue-Economy-Report-Bangladesh-Nov2018.pdf

127. **Fisheries resources of Bangladesh: Present status and future direction :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Fisheries/Fisheries%20resources%20of%20Bangladesh.pdf

128. **THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE 2020 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Fisheries/The%20State%20of%20World%20Fisheries%202020.pdf

129. **YEARBOOK OF FISHERIES STATISTICS OF BANGLADESH 2018-19 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Fisheries/Year%20book%20of%20Fisheries%20Statistics%202018-19.pdf

130. **BANGLADESH COUNTRY INVESTMENT PLAN FOR ENVIRONMENT, FORESTRY AND CLIMATE CHANGE (2016 – 2021) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Forest/Bangladesh%20Investment%20plan%20for%20Environment,%20Forest%20and%20Climate%20Change.pdf
131. **Government of the People's Republic of Bangladesh Forest Investment Programme :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Forest/Forest%20Investment%20Programme.pdf
132. **BANGLADESH FORESTRY MASTER PLAN 2017-2036 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Forest/Forest%20Master%20Plan%20for%202016-21.pdf
133. **NATIONAL FORESTRY POLICY, 2016 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Forest/Forest%20Policy%202016.PDF
134. **Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990-2011 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Forest/Forest%20sector%20GDP%20by%20Country.pdf
135. **Forest Resources of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Forest/Forest%20resources%20of%20Bangladesh%20-%20Country%20report.htm
136. **Flood and Flood Management in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/Flood%20and%20Flood%20Management%20in%20Bangladesh.pdf
137. **Impacts of flood and its possible solution in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/floodimpactandpossiblesolutioninbangladesh.pdf
138. **Natural Disasters and Management Systems of Bangladesh from 1972 to 2017: Special Focus on Flood :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/Natural%20disaster%20and%20management%20system%20in%20Bangladesh.pdf
139. **Water Management in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/Policy-Brief-November-Issue-2_Final.pdf
140. **Water Scarcity in Bangladesh : Transboundary Rivers, Conflict and Cooperation :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/PRIO%20Report%20-%20Water%20Scarcity%20in%20Bangladesh.pdf
141. **Tidal River Management (TRM) : Community Based River Basin Management and Climate Change Adoption in Southwest Costal Region of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/tidal%20river%20management(TRM).pdf
142. **Utilization and Conservation of Water Resources in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/Water%20Resources%20of%20Bangladesh.pdf
143. **WATER GOVERNANCE IN BANGLADESH :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/water_governance_in_bangladesh.pdf
144. **WATER SUPPLY SITUATION ANALYSIS :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Water%20and%20River%20Management/Water%20Supply%20Situation%20Analysis.html
145. **Natural Resource and Environmental Planning in Chittagong District of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Natural%20Resources/Natural%20Resource-%20Researchgate.pdf
146. **BANGLADESH POWER SECTOR, An appraisal from a multi-dimensional perspective (part-1) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/Bangladesh%20Power%20Sector%20by%20EBL.pdf
147. **GAS SECTOR MASTER PLAN BANGLADESH 2017 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/Bangladesh_Gas%20Sector%20Master%20Plan.pdf
148. **Bangladesh: Legal Framework on Mineral Exploration :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/BangladeshLegal%20Framework%20on%20Mineral%20Resources.pdf
149. **BP Statistical Review of World Energy 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/BP%20Review%202019-full-report.pdf
150. **BPDB Annual Report 2018-19 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/BPDB%20Annual_Report_2018-19.pdf
151. **Prospect of Underground Coal Gasification in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/Coal%20gasification%20in%20Bangladesh.pdf
152. **BANGLADESH NATIONAL CONSERVATION STARTEGY : ENERGY AND MINERALS :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/Energy%20and%20Minerals%20of%20Bangladesh.pdf

153. **Energy Scenario Bangladesh 2018-19 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/Energy%20Scenario%202018-19.pdf

154. **Power Division Annual Report 2019-2020 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/POWER%20DIVISION%20ANNUAL%20REPORT-%202019-2020.pdf

155. **Bangladesh Power Sector Review for 2020 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/Power%20sector%20review%20by%20researchgate.pdf

156. **Transforming the Power Sector in Developing Countries: Geopolitics, Poverty, and Climate Change in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/Power-Transformation-Bangladesh-final-web-version.pdf

157. **Issues, Constraints and Countermeasures of Development through NonRenewable Natural Resources: Bangladesh Country Study :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/renewable_natural_resource.PDF

158. **The Power and Energy Sector of Bangladesh: Challenges of Moving beyond the Transition Stage :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Power%20and%20Energy/The-Power-and-Energy-Sector-of-Bangladesh.pdf

159. **UN E-Government Survey 2020 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf

160. **Annual Report, Bangladesh Hi-tech Park 2018-19 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Annual%20Report%202018-19%20-%20Hi-tech%20park%20Authority.pdf

161. **ASIAN INFRASTRUCTURE FINANCE 2019, Bridging Borders: Infrastructure to Connect Asia and Beyond :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Asian-Infrastructure-Finance-2019.pdf

162. **Bangladesh Development Update Towards regulatory predictability 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Bangladesh-Development-Update-Towards-Regulatory-Predictability.pdf

163. **Bangladesh's Digital Revolution :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Bangladesh's%20Digital%20Revolution.pdf

164. **Development Planning in Bangladesh: 7th Five Year Plan and SDG Implementation :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Development%20Planning%207FYP%20&%20SDG.pdf

165. **Digital Bangladesh – Vision 2021:** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Digital%20bangladesh.pdf

166. **e-Government Master Plan for Digital Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/e-Government%20Masterplan%20for%20Digital%20Bangladesh_V6.0%20(2).pdf

167. **E-Governance in Bangladesh: Present Problems and Possible Suggestions for Future Development :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/E-govt.%20evaluation%20by%20researchgate.pdf

168. **The Global Competitiveness Report 2019 :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/GlobalCompetitivenessReport2019.pdf

169. **Information and Communication Technology (ICT) Status, issues and future development plans of Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/ICT%20and_future_development_plans_in_bangladesh.pdf

170. **Information and Communication Technology (ICT) Industry in the Fourth Industrial Revolution, Prospects and Challenges for Workers in Asia-Pacific :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/ICT%20Industry%20Revolution.pdf

171. **ITEA ARTEMIS-IA HIGH-LEVEL VISION 2030, Opportunities for Europe :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/ITEA%20ARTEMIS-IA%20high-level%20vision%202030,%20v2013.pdf

172. **Ministry of Science and Technology, Annual Report 2018-**19 : file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Ministry%20of%20Science%20and%20Technology%20-Annual%20Report-2018-2019%20FINAL.pdf

173. **Problems and Prospects of IT and IT Enabled Services Outsourcing in Bangladesh :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Problems%20&%20Prospect%20of%20IT%20Industry,%20Bangladesh.pdf

174. **Service Industry in Bangladesh Economy : Opportunities and Challenges :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Service%20Sector%20of%20BD%20by%20Researchgate.pdf

175. **SERVICES POLICY REVIEW OF BANGLADESH (I) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Service%20Trade%20of%20Bangladesh.pdf

176. **SERVICES POLICY REVIEW OF BANGLADESH (II) :** file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/Service%20Trade%20of%20Bangladesh%20(II).pdf

177. **The ICT Industry White Paper of Bangladesh 2017 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/The-ICT-Industry-White-Paper-of-Bangladesh_BASIS_IBPC_ehlatifee_2017.pdf
178. **Services trade in numbers :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/World%20Service%20Trade%20Indicator%20by%20WTO.pdf
179. **ICT Policy of Bangladesh 2018 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/IT%20Sector/তথ্য%20ও%20যোগাযোগ%20প্রযুক্তি%20নীতিমালা%20২০১৮.pdf
180. **Bangladesh Development Update Moving Forward 2021: Connectivity and Logistics to Strengthen Competitiveness :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/Service%20Sector/BangladeshDevelopmentUpdateSpring2021.pdf
181. **Evolution of Service Sector in Bangladesh: An Overview :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/Service%20Sector/Evolution_of_Service_Sector_in_Bangladesh.pdf
182. **Coastal and Marine Tourism in the Future :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/Tourisam%20Sector/Coastal%20and%20Marine%20Tourism%20in%20the%20Future.pdf
183. **TRAVEL & TOURISM : GLOBAL ECONOMIC IMPACT & TRENDS 2020 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/Tourisam%20Sector/Global_Economic_Impact_&_Trends%20of%20Tourism%202020.pdf
184. **Foreign Tourist Arrival in Bangladesh (Top Twelve Countries) during 2010**-2019 :
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/Tourisam%20Sector/International%20Torist%20Visitors%20in%20bangladesh.pdf
185. **Tourism in Bangladesh: Present Status and Future Prospects :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Service%20Sector/Tourisam%20Sector/Tourism-in-Bangladesh-Present-Status-and-Future-Prospects_.pdf
186. **AFFORDABLE HOUSING CAPTURING BANGLADESH'S "MISSING MARKET" :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Afordable%20Housing%20in%20Bangladesh.pdf
187. **BANGLADESH 2020 A Long-Run Perspective Study by the World Bank :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Bangladesh%20by%202020%20by%20World%20Bank.pdf
188. **Survey on Occupied Residential Houses and Real Estate Services 2018 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/BBS%20Survey%20on%20Housing.pdf
189. **URBAN SOCIOECONOMIC ASSESSMENT SURVEY 2019 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/BBS%20Urban%20Survey%202019.pdf
190. **REAL ESTATE MARKET BANGLADESH :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/housing%20market%20in%20bd.pdf
191. **BARRIERS CONSTRAINING THE LOW AND MIDDLE INCOME HOUSING FINANCE MARKET IN BANGLADESH (World Bank) :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Low%20and%20middle%20income%20housing%20finance%20-%20world%20bank.pdf
192. **Bangladesh Voluntary National Reviews (VNRs) 2020 Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/SDG_2020_Bangladesh_Report.pdf
193. **Bangladesh Country Report : HABITAT III :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Urban%20Development%20Directorate.pdf
194. **STRATEGY FOR URBAN SECTOR DEVELOPMENT IN BANGLADESH :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Urban%20Development%20strategy.pdf
195. **Bridging the Urban Divide i n B a n g l a d e s h :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Urban%20productivity.pdf
196. **Urbanization and Economic Development of Bangladesh: The Primacy of Dhaka and Competitiveness :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Urbanization%20and%20Economic%20Development.pdf
197. **Urbanization in Bangladesh: Present Status and Policy Implication :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/Urbanizationin%20status%20in%20bangladesh.pdf
198. **Demographia World Urban Areas 16th Annual Edition 2020.06 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/World%20Urban%20Areas.pdf
199. **World Urbanization Prospects 2018 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Urbanization/World%20Urbanization%202018.pdf
200. **Role of Agriculture in Bangladesh Economy: Uncovering the Problems and Challenges :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Agricultural%20sector%20Development%20approach.pdf

201. **Banking Sector in Bangladesh: Moving from Diagnosis to Action :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Banking-Sector-in-Bangladesh.pdf
202. **Bangladesh Disaster-related Statistics 2015 : Climate Change and Natural Disaster Perspectives :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/Climate%20Disaster%20Survey,%202015.pdf
203. **A research paper on Economic Dialogue on Inclusive Growth in Bangladesh :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/EDIG-Research-Paper-No.-1.pdf
204. **The Sustainable Development Goals Report 2018 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/SDG_report-2018.pdf
205. **SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BANGLADESH PROGRESS REPORT 2020 :**
file:///C:/Users/User/Desktop/Misc.%20Folder/Proverty%20Reduction%20Module/Reference%20Files%20(PDF)/Related%20Other%20Files/Other%20Files/SDGs-Bangladesh_Progress_Report%202020.pdf

- সমাপ্ত -

SJFBD